সংখ্যা—৭-১২

ভারতী

৩৫শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩১৮ [৭ম সংখ্যা

আগমনী।

বরষার অবসান, স্নিগ্ধ প্রকৃতির প্রাণ
শরতের মধুর পরশে,
বাদল আসেনা নামি, বজ্রনাদ গেছে থামি
বসুন্ধরা মগন হরষে!
মিঠা কড়া রৌদ্র নিয়া শীতল সমীর দিয়া
অভিনব দৃশ্য অভিনয়,
অগণিত তারকায় অম্বর ভরিয়া যায়
আগমনী নহবতে কয়!
বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আসিছে বরষ পরে
মহামায়া শক্তি বিধায়িনী,
সুমঙ্গল শঙ্খ রবে মুখরিত দিক্ সবে
আনন্দের শুভ সম্মিলনী!
আসিছেন বঙ্গমাতা, নাশিতে হৃদয় ব্যথা
সন্তানের চিত্তে অধিষ্ঠান,
দুঃখ দৈন্য করি দূর আশা মন্ত্রে ভরপূর
করেছেন ভকত পরাণ!
দরিদ্র অনাথ জন আজি কত আকিঞ্চন
পূজিবারে অভয়চরণ,
যেই শক্তি আছে যার, সর্ব্বস্ব করিয়া সার
মাতৃপদ করিবে অর্চ্চন।
এস মা এস মা প্রাণে, যেন আত্মবলিদানে
পারি তোমা পূজিতে তারিণি,—
বরষি আশীষ স্নেহ এই তুমি বর দেহ;
ষড়রিপু বিনাশকারিণী।

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

শঙ্করের বিচারগুলির প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে, তাহার অদ্বৈত দর্শন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এজন্যই আমরা সংক্ষেপে শঙ্করের অদ্বৈতমতের সারমর্ম্ম পাঠকের নিকটে উপস্থিত করিতেছি।

শঙ্করের মতে যাহা কিছু আছে, বা ছিল, বা হইবে, জ্ঞেয় (objects of consciousness) বা জ্ঞানের বিষয় রূপেই আছে, বা ছিল, বা হইবে। জ্ঞানের অবিষয় কোন অচেতন জ্ঞেয়বস্তু, কথাই বিরুদ্ধ। জড় এবং চেতনের পার্থক্য এই যে চেতন-বস্তু সকলকেই আপনার জ্ঞান-ক্রিয়ার বিষয় করে, জড় তাহা করিতে অক্ষম। চেতন স্বতঃই নিজেকে নিজে জানে, "সম্বিদেষা স্বয়ংপ্রভা", এবং নিজের কথা নিজে স্মরণ করে। জড়ের সে শক্তি নাই। শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই যে জ্ঞানেতেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, জ্ঞানেতেই স্থিতি, জ্ঞানেতেই লয়। জ্ঞান জ্ঞাতারই উপাধি বা গুণকর্ম্মবিশেষ, এবং জ্ঞাতাতেই অভিন্ন ভাবে অবস্থিত। জ্ঞানের মধ্যে জ্ঞেয়, এবং জ্ঞাতার মধ্যে জ্ঞান, অতএব জ্ঞেয় এবং জ্ঞান, জ্ঞাতা হইতে অভিন্ন—"গুণগুণিনোরভেদাৎ।" বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বলিতেছেন :—"ইদানি ভূতানীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" —তাহার উপরে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন :—"এই সমস্তই আত্মা, এ কথা কিরূপে বলা যায়? যেহেতু সকলের মধ্যেই চিদাত্মা সঙ্গে সঙ্গেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, অতএব সকলই চিৎস্বরূপ। যাহা পরিত্যাগ করিলে যাহার গ্রহণ অসম্ভব, তাহা তদাত্মকই।"* যথা, কনক-কুণ্ডলের কনক পরিত্যাগ করিলে, কুণ্ডলের গ্রহণ অসম্ভব, অতএব কুণ্ডল কনকাত্মক। আবার বলিতেছেন : "উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়কালে প্রজ্ঞান ব্যতিরেকে অপর সমস্তেরই অসত্তা, অতএব সমস্তই প্রজ্ঞানরূপী ব্রহ্ম-স্বরূপ বা আত্মস্বরূপ।" ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিতেছেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি"—শঙ্কর তাহার উপরে তদীয় ভাষ্যে বলিতেছেন :—"নাম এবং রূপাদি দ্বারা ব্যাকৃত এই দৃশ্য জগৎ, যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা গ্রহণ করা যায়, তাহা ব্রহ্মই। এ সকলের ব্রহ্মত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কারণ তেজ, বারি এবং অন্ন প্রভৃতি ক্রমে এ সকল সেই ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়। বিনাশকালে সেই জননক্রম অনুসারেই বিপরীতদিকে এ সকল সেই ব্রহ্মেতেই লয় প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মেতেই মিলিয়া যায়। আবার স্থিতিকালে সেই ব্রহ্মেতেই প্রাণ ধারণ করে। তিন কালেই এ সকলের ব্রহ্মাত্মতা একরূপ —ব্রহ্ম ব্যতিরেকে তাহাদের গ্রহণ অসম্ভব। অতএব এই জগৎ ব্রহ্মই।"† শঙ্করের

---

* চিন্মাত্রানুপপত্যৈব সর্ব্বত্র চিৎস্বরূপতৈব। হেয়স্বরূপব্যতিরেকেণা গ্রহণং যস্য, তস্য তদাত্মকত্বমেব লোকে দৃষ্টং।" "উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়কালেষু প্রজ্ঞানব্যতিরেকেণাভাবাৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্মব্যতিরেকেণ সর্ব্বমিতি।"

† "ইদং জগন্নামরূপব্যাকৃতং প্রত্যক্ষাদিবিষয়ং ব্রহ্ম।" "ব্রহ্মাত্মতা ত্রিষুকালেষু বিশিষ্টং তদ্ব্যতিরেকেণা গ্রহণাৎ। অতস্তদেবেদং জগৎ।"

মতে একই আত্মা সর্ব্বভূতে প্রকাশমান। পাঠক তাঁহার তত্ত্বামলক নামীয় দ্বাদশশ্লোকী কবিতাটি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন। একই চুম্বক লৌহ-খণ্ডের উত্তর এবং দক্ষিণ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্মশালী কেন্দ্রের ন্যায়, একই জ্ঞাতা বা আত্মার জ্ঞাতৃত্ব এবং জ্ঞেয়ত্ব দুইটি কেন্দ্র বা দিক্‌মাত্র। জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের যোগই জ্ঞান। জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান বেদান্তে এই তিনটির মিলিত নাম 'ত্রিপুটী'। পঞ্চদশী বলিতেছেন "জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে ত্রিপুটী-জন্য দ্বৈতভাবের অভাব হেতু, এক তুমা পুরুষই ছিলেন। প্রলয়কালেও জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞান এই ত্রিপুটীভাব থাকিবে না।" *

শঙ্করের মতে আত্মা এক, এবং নাম রূপাদি সর্ব্ববিধ উপাধির অতীত, কেবল জ্ঞাতৃস্বরূপ। পাঠক, উপাধি শব্দটি বেদান্তে সচরাচরই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার অর্থ কি? "যাবৎকালমবস্থায়ী ভেদহেতুরূপাধিতা।" (পঞ্চদশী)। "সাময়িক পরিবর্ত্তনশীল ভেদ-হেতুর নাম উপাধিতা।" যে ভেদ বা বিশেষত্ব বস্তুর স্বরূপভূত (proprium) নয় তাহাকেই উপাধি (Accident) বলা যায়,—যথা, লৌকিক ব্যবহার দৃষ্টে বলা যায় নেপালের মহারাজার মহারাজত্ব তাঁহার স্বরূপভূত (proprium), কিন্তু গণ্ডগ্রামের মহারাজার মহারাজত্ব তাহার উপাধি (Accident) মাত্র। সেইরূপে তোমার দেহ, যাহার জ্ঞান স্বপ্নকালে থাকে না, এবং তোমার মনবুদ্ধি, যাহার জ্ঞান সুষুপ্তিকালে থাকে না,—এ সকল তোমার উপাধি (Accident), কিন্তু তোমার চৈতন্য বা সাক্ষিস্বরূপত্ব যাহা জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন কালেই সমভাবে বর্ত্তমান (কারণ সুষুপ্তিরও স্মৃতি থাকে), তাহাই তোমার আত্মার স্বরূপভূত (proprium)। যাহা কিছু পরিচ্ছিন্নভাবে ধারণা করা যায়, তাহাই অনাত্মা বা আত্মার উপাধিমাত্র। এজন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে "স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে"—। শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন, সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা (উপাধি সকল পৃথক করিয়া) সকলের ব্যক্তিগত আত্মা এক প্রত্যগাত্মস্বরূপে উপসংহৃত হইলে, দ্রষ্টার দ্রষ্টৃত্ব, ইহা নয়, উহা নয়, যাহা কিছু ধারণা করা যায় তাহা নয়, এইরূপে তুরীয় ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতেই পর্য্যবসিত হয়। বস্তুতঃ তুমি যদি তোমার আত্মাকে নামরূপগুণাদি সর্ব্ববিধ পরিচ্ছিন্ন এবং পরিবর্ত্তনশীল উপাধি হইতে "মুঞ্জাদিবেষিকাং"—মুঞ্জঘাস হইতে তাহার ইষিকার (Flower-stalk) ন্যায় পৃথক্ করিয়া দর্শন কর, তখন দেখিবে 'তোমার আত্মা', আমার 'আত্মা' ইত্যাদি ভেদ তিরোহিত হইয়া যায়। এজন্যই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে:—"যে তুরীয় আত্মা ব্রহ্মাদি দেবগণ মধ্যে প্রকাশমান, তাহাই আবার পতঙ্গাদির মধ্যেও প্রকাশমান।" শঙ্কর বৃহদারণ্যকভাষ্যে আত্মার

---

* ভূতোৎপত্তেঃ পূর্ব্বা তুমা ত্রিপুটীবৈতবর্জ্জনাৎ; জ্ঞাতৃ-জ্ঞান জ্ঞেয়রূপা ত্রিপুটী প্রলয়েঽপি যো ভবেৎ—পরিচ্ছেদ ১১। পঞ্চদশী। টীকা, "ত্রয়াণাং জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়-রূপাণাং পুটানাং আকারো যঃ সমাহারস্ত্রিপুটী।"

"তং সর্ব্বাত্মানং প্রত্যগাত্মস্বরূপেণোপসংহৃত্য দ্রষ্টুর্হি দ্রষ্টারং নেতিনেত্যাত্মানং তুরীয়ং প্রতিপদ্যতে।"

নানাত্ববাদীদিগের আপত্তি বর্ণন করিতেছেন : —"অনেকে বলেন যে ব্রহ্ম বা আত্মার একত্ব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিরুদ্ধ। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি সকলই পৃথকরূপেই প্রত্যক্ষ হইতেছে। অতএব ব্রহ্মৈকত্ববাদিরা প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ কথা বলিতেছে। আবার শ্রোত্রাদি দ্বারা শব্দাদির উপলব্ধি-কর্ত্তা, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্ত্তা, ও প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন সংসারী জীব বলিয়া অনুমিত হয়, অতএব যাহারা এ সকলের মধ্যে এক ব্রহ্মই বা আত্মাই প্রকাশমান এরূপ বলিয়া থাকেন, তাহারা অনুমান-বিরুদ্ধ কথা বলেন।" শঙ্কর এই সকল আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন :—"প্রত্যক্ষ অনুভূত শ্রোত্রাদিগ্রাহ্য শব্দাদি দ্বারা ব্রহ্মের একত্ব কিরূপে অপ্রমাণিত হয়? শব্দাদির ভেদ দ্বারা কি আকাশের (বায়ুর বলিলেও ক্ষতি নাই—প্রাচীনদিগের মতে শব্দ আকাশের গুণ) একত্ব অপ্রমাণিত হয়? না, তাহা হয় না। তবে শব্দস্পর্শাদির ভেদ দ্বারা ব্রহ্মেরও একত্ব অপ্রমাণিত হয় না। আর যে বলা হয় প্রতি শরীরে শব্দাদির উপলব্ধি-কর্ত্তা এবং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-কর্ত্তা সংসারী জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন এরূপ অনুমান হয়, অতএব ব্রহ্মৈকত্বে অনুমান বিরোধ,—তাহার উত্তরে জিজ্ঞাস্য এই, কে এই ভিন্নত্ব অনুমান করে? যদি বল আমরা সকলেই করি। তবে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা বলিতে কাহাকে লক্ষ্য কর? শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, আত্মা ইহাদের প্রত্যেকে কি পৃথক্ পৃথক্ অনুমান করে? তাহা বলিবে না। বোধ হয় বলিবে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি সাধনযুক্ত আত্মা সকল অনুমান করিয়া থাকে, কারণ একটি ক্রিয়া অনেক কারক দ্বারা সাধিত হয়। অনুমানও ত একটি ক্রিয়া। তবে তোমাদেরও ত অনেকত্ব প্রসঙ্গ হইল, কারণ 'আমরা' বলিতে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, এবং আত্মা অনেকগুলি বুঝায়। অহো! অপুচ্ছশৃঙ্গ তার্কিক বলীবর্দ্দদিগের কি অনুমান-কৌশল। যে আপনাকেই জানে না, সেই মূঢ় কিরূপে আত্মা সম্বন্ধীয় ভেদ বা অভেদ বুঝিতে পারিবে? সে কিইবা অনুমান করিবে, আর কি লিঙ্গ বা সাধন দ্বারাই অনুমান করিবে? আত্মার মধ্যে এমন কোন ভেদ প্রতিপাদক লিঙ্গ নাই, যে লিঙ্গ দ্বারা এক আত্মা হইতে অন্য আত্মার পৃথকত্ব সাধিত হইবে। নামরূপ প্রভৃতি যে সকল লিঙ্গ বা ব্যাবর্ত্তক গুণ অবলম্বন করিয়া সচরাচর আত্মভেদ সাধিত হয়, সেই সকল নামরূপাদি নিত্য আত্মার পরিবর্ত্তনশীল উপাধি মাত্র, আকাশের সম্বন্ধে ঘটকমণ্ডলু-ভৃঙ্গিত্র প্রভৃতি যেমন। আকাশের নিজের মধ্যে যেমন কোন ভেদলিঙ্গ নাই, আত্মার মধ্যেও সেইরূপ কোন ভেদলিঙ্গ নাই। যাহারা নিজের আত্মাকে অন্য আত্মা হইতে ভেদ করিয়া থাকে, তাহাদের শত তার্কিক মিলিয়াও আত্মার ভেদ লিঙ্গ দেখাইতে পারিবে না। আত্মা ইন্দ্রিয়াদির অবিষয়, অতএব স্বতঃই তাহাতে ভেদ-লিঙ্গ দর্শন অসম্ভব। যাহা কিছু লোকে একজনে অন্য জনের আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া কল্পনা করে, তাহা নামরূপ প্রভৃতি উপাধি ভিন্ন আর কিছুই নয়। আত্মা নিত্য, অতএব সেই সকল নামরূপাদি অনিত্য উপাধি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। নামরূপাদি উপাধিসকলের উৎপত্তি এবং প্রলয় আছে—ব্রহ্ম বা আত্মা তাহা

হইতে অন্যরূপ। অতএব লিঙ্গাভাব হেতু আশ্মরথ্যের অনুমানের বিষয়ই নয়, তখন অনুমান বিরোধ কিরূপে হইতে পারে?*

এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে অদ্বৈত-মত নানারূপ—শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, এবং দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদ। শঙ্কর নিজে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। তিনি তাঁহার সূত্রভাষ্যে তিন প্রকার অদ্বৈতবাদের উল্লেখ করিয়া নিজের মত প্রকাশ করিতেছেন, "আচার্য্য কাশকৃৎস্নের মতে পরমেশ্বরই অবিকৃতভাবে জীবরূপে অবস্থিত। ব্রহ্ম হইতে জীব কোন-রূপ ভিন্ন নয়। আশ্মরথ্যের মতেও পরমে-শ্বরের সহিত জীবের অভিন্নত্ব সম্বন্ধই শ্রুতির অভিপ্রায়, কিন্তু শ্রুতিতে জীবকে ঈশ্বরের আশ্রিত বলা হইয়াছে, এবং এই প্রতিজ্ঞা-সিদ্ধির জন্য জীবেশ্বরের মধ্যে এক প্রকার কার্য্যকারণভাবও শ্রুতির অভিপ্রেত। ঔডুলোমির মতে জীব এবং ঈশ্বরের অবস্থান্তর —সাপেক্ষ ভেদ এবং অভেদ স্পষ্টই দেখা যায়। এ সকল মতের মধ্যে কাশকৃৎস্নীয় মতই শ্রুত্যনুসারী জানা যায়, কারণ তত্ত্বমসি প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য যাহা প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছু, এইমত তাহারই অনুসারী।† শঙ্করের এই কথা দ্বারাও দেখা যাইতেছে যে তিনি কাশকৃৎস্নের শুদ্ধাদ্বৈত মতেরই পক্ষপাতী।

শ্রীবিজয়দাস দত্ত।

উন্মাদিনীর কাহিনী।

ছুটিছে এলোর দল, সর্ব্ব-অঙ্গে কোলাহল;
ছুটিছে বালিকা দল, সর্ব্ব-অঙ্গে বাসিনী।
বাজে শঙ্খ, জ্বলে ধূপ। একি শোভা অপরূপ;
রূপ যে ফাটিয়া পড়ে তোর হের-কামিনী।

সেই আঙ্গুলের দাগ, যাহার সে রক্তরাগ,
এখনো লাগিয়া আছে সেই পূজা-বালানে।
হো হো হো হো হাসি পায়, এ দাগ কি ধোয়া যায়,
চির রাঙা রহু জবা, সিঁদুরের মাখামে।

---

* চতুর্থস্ত প্রথমং ব্রাহ্মণং। বৃহদারণ্যকভাষ্য।

† ব্রহ্মসূত্র—অ ১—পা ৪—সূ ২২।

তোর সেই সিংহোপর, কার্ত্তিকের সে মযূর,
হেরি কত হাসি খুসি আমার সে বালিকা।
শুনিয়া সানাই বাঁশী, কচি মুখে উচ্চ হাসি!
কোথায়, কোথায় গেল, সে গোলাপ কলিকা!

তোর পাশে ঘেঁষে ঘেঁষে, নবীন পুত্তলি মেয়ে
দিল কত করতালি, মহানন্দে মগনা :—
পাখীটি, পাখোর মেয়ে, নাহি বুঝি তোর চেয়ে,
তাই তারে কেড়ে নিলি ওলো ঈর্ষা-ললনা!

"বলির সামগ্রী ও যে, দশ হাত দশ খুঁজে
"লইবেন দশভুজা,—যা রে দুষ্ট বালিকা।
"না বধিলে ওর প্রাণ হবে মহা অকল্যাণ
"হাড়, হাড়, হাবাগিত,—কুধিবেন অম্বিকা।

সে রাত্রিতে গৃহ-স্বামী, নরনারী, দাসদাসী,
হেরিল, অদ্ভুত স্বপ্ন,—যোগমায়া আসিয়া,
"চাহি না রে রাগবলি, চাহিনা রে রাগবলি,
রাগবলি মহাপাপ"—কহে দেবী রুষিয়া।

দশম রাগের যবে, বলি দিতে উচ্চ রবে,
আসরে তুলিল দাঁড়া, দুই ভুজ আস্ফালি।
বালিকা ধাইয়া ছুটে, ঘাতকের পথে লুটে,
কোথা দুর্গা? দুর্গা হোলো, নৃত্য-কালী করালী।

১৬

থাকিতে আমার প্রাণ যবে না এ বলিদান,
আমি ভালবাসি,তবে'—কহিল সে বালিকা,
তবু অসি সর্ব্বনাশী পড়িল কণ্ঠেতে আসি,
আমার বালিকা হ'ল ছিন্ন মস্তা কালিকা।

১৭

হতবুদ্ধি দাঁড়াইয়া, ভয়ে, কম্পে, চীৎকারিয়া
ঘাতক কহিল কাঁদি,—"একি কাণ্ড করিলাম।
আজি কাটা মুণ্ড চুমে, পড়িয়া জননী ভূমে,
আগমনী না ফুরাতে কি বিজয়া হেরিলাম!

তার পর কত বর্ষ, সয়ে দুঃখ, সয়ে হর্ষ,
এল, গেল,—কিন্তু তবু কি জাগ্রতে স্বপনে,
হেরি সেই ভীমা ছায়া মেঘে মেঘে কহে মায়া,
জীবে দয়া নাহি যথা থাকি নে সে ভবনে।

উপাসনা, আরাধনা, সকলিরে বিড়ম্বনা;
সর্ব্বজীবে যারে সেই সেই উপাসক রে।
আমায় পূজার ছলে। নরনারী দলে দলে,
আজি বাঙ্গালীর ঘরে প্রতি ঘাতকরে।

হেরিয়া শিশুর মুখ, মা হেরয়ে পায় সুখ,
যত যত হেরে তথা বাছার বদন যে।
মোরো শুন দুগ্ধ বয়, কত হয় সুখোদয়,
রূপের ও মুখচন্দ্র করিয়া চুম্বন যে।

২১

দুঁইদে একটি পাতা সর্ব্বাঙ্গেতে মাখে মাখা,—
আমি লজ্জাবতী-লতা বিশ্বের জননীরে।
ফনিরে করায় স্নান, সহে না এ অপমান;
চন্দন চর্চ্চিত দেহে ভস্মের লেপনী যে।

২২

আবার এসেছে বঙ্গে সেই সিংহবাহিনী।
ভাঙ্গ-ভাগীরথী পারা, ছুটিছে আনন্দ ধারা,
আবারে হাসিবে মায়া চন্দ্রচূড়া যামিনী।
রজনীহাসার বাসে আমার বরণী হাসে,
পতির আসার আশে পুলকিতা কামিনী।
কতল কিঙ্কিণী সাজে, কুলের কাঞ্চনী রাজে,
আমি কিন্তু একি হেরি কিবা দিবা রজনী
চারি ধারে চারি ধারে কবিরাজ অবনী!

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন।

জগন্নাথ।

(প্রাচীন ইতিহাস)

রাজা নাই, প্রজা নাই,—ব্রাহ্মণ নাই, চণ্ডাল নাই—নিখিলের এক-ই আসন! কারণ, তিনি জগন্নাথ,—জগৎ তাঁহারই লীলাস্থল,—আমরা তাঁহারই সন্তান,—তাঁহার স্নেহ, তাঁহার করুণা, তাঁহার নির্ম্মালা আমরা সকলেই পাইব,—ধনী বলিয়া কেহ বেশী না,—গরীব বলিয়া কেহ কম না! আভিজাত্যের ঢক্কা এখানে নীরব, হীনের অন্তর্দ্বাহ-ক্রন্দন এখানে মূক! তাই শাক্ত আর বৈষ্ণব আর শৈব এখানে আসিয়া সবাই এক হইয়া গিয়াছে—এক দেবতা, এক পূজা, এক আহার! তাই ভাবি, ভক্তি কি স্বর্গীয়! শত বক্তৃতায় যে সাধনার সিদ্ধি স্বপ্ন তৈ কিছু নয়,—এক ভক্তি তাহার স্বপ্নই ঘুচাইয়া দিয়া, সত্যের বর্ত্তিকা জ্বালিয়া দিতেছে! এবং এই কারণেই, শিল্প এখানে স্বল্প হইলেও এ প্রেমের পীঠের মাহাত্ম্য অল্প নয়। শুধুই যে আকাশস্পর্শস্পর্দ্ধিত উচ্চ চূড়ার জন্য, জগন্নাথের আদর,—তাহাও বলিতে পারি না। তাহা হইলে তালী-তরু ফেলিয়া লোকে গোলাপ-চারাকে রত্ন-বৎ যত্ন করিত না। মিসেস্ ম্যানিং বলিয়াছেন,—"It is somewhat imposing owing to its size . . . and it is far inferior in point of art." (১) তাই আগেই বলিয়াছি, কিসের জন্য জগন্নাথের এত আদর!

জগন্নাথের অপার মহিমা, শত শাস্ত্রে ও পুরাণে কথিত হইয়াছে। পুরাণের সে পুরাণ' কথা এখানে আর তুলিয়া কাজ নাই—

---

(১) Ancient and Medioeval India, By Mrs. Manning. Vol. I. p. 427.

কোন হিন্দু তাহা পাঠ করেন নাই? (২) বিষ্ণুর পরিত্যক্ত শঙ্খ এখানেই পড়িয়াছিল, তাই ইহার অপর নাম শঙ্খতীর্থ। শঙ্খতীর্থ কতদূর?

"যৎক্ষেত্রস্পর্শতো বিপ্রাঃ সমুদ্রস্তীর্থরাট স্মৃতঃ।
ক্রোশত্রয়োন্নতিযুতে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে।
শঙ্খাকারেঽপি তন্মধ্যে রাজতে নীলভূধরঃ॥

নীলাদ্রিমহোদয়।

যে ভূমির পুণ্যস্পর্শ লাভ করিয়া সমুদ্র তীর্থশ্রেষ্ঠ; সেই তিন ক্রোশ বিস্তৃত শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে নীলভূধর বিরাজিত। মন্দিরের কথা বলিব, আগে ইতিহাসের কথা কিছু বলি।

আমরা বৌদ্ধযুগ হইতে আমাদের কাহিনী আরম্ভ করিলাম।

বৌদ্ধযুগ।—৪৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে, কুশীনগরে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের পরে, তাঁহার শিষ্য ক্ষেম-কর্ত্তৃক বুদ্ধদন্ত উৎকলে আনীত হয়। ব্রহ্মদত্ত তখন উৎকলের রাজা। তাঁহার রাজধানী ছিল দন্তপুরে। (৩) তিনি আপন রাজধানীতে উৎসব-সমারোহের মধ্যে বুদ্ধদন্তের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহার পর, সম্রাট অশোক কলিঙ্গ আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। কথিত আছে, কলিঙ্গের যুদ্ধে অগণ্য নরহত্যা দর্শন করিয়া অশোক সাতিশয় অনুতপ্ত হন। এবং সেই সর্ব্বজন-কামা অনুতাপই তাঁহার জীবনে নবভাবের প্রেরণা আনয়ন করে। অশোক হইতে গুপ্তবংশের রাজগণের কাল অবধি, উৎকল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী থাকে। (খৃ পূঃ ২৫০—৩১৯ খৃষ্টাব্দ)

ব্রহ্মদত্তের বংশধরগণের মধ্যে গুহশিব প্রসিদ্ধ নরপতি। (৩৭০—৩৯০ খৃষ্টাব্দ) তিনি একজন ভক্ত বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহার ধর্ম্মে ব্যাঘাত দিতে লাগিল,—ক্রুদ্ধ হইয়া গুহশিব সমস্ত ব্রাহ্মণ সভাসদকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। গুহশিব স্বাধীন ছিলেন না,—অধিপতি পাণ্ডুর অধীনে তিনি রাজকার্য্য পরিচালন করিতেন। পাণ্ডু হিন্দু ছিলেন। নির্ব্বাসিত সভাসদ্‌গণ পাণ্ডুর নিকটে উপস্থিত হইয়া আপনাদের নির্ব্বাসন-কাহিনী প্রকাশ করিলেন। তৎশ্রবণে উদ্দীপ্তরোষ পাণ্ডু গুহশিবের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু বুদ্ধের অহিংসা-মন্ত্র যাঁহার কণ্ঠে নিত্য উচ্চারিত হয়,—নরশোণিতে মেদিনীপ্লাবন তাঁহার ধর্ম্ম নয়। গুহশিব, যুদ্ধের বদলে বুদ্ধের দন্ত লইয়া শুদ্ধচিত্তে পাণ্ডুর নিকটে

(২) যাঁহারা প্রাচীন পুস্তকে জগন্নাথের কথা জানিতে চান, তাঁহারা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পড়িতে পারেন:—স্কন্দপুরাণ। কূর্ম্মপুরাণ। শক্তিসঙ্গম তন্ত্র। পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা। বংশাবলী। নারদপুরাণ। নীলাদ্রিমহোদয়। ব্রহ্মপুরাণ। কপিল-সংহিতা। পুরুষোত্তমাত্মা। শঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ ও কাশীদাসের মহাভারত।

(৩) এই দন্তপুর এখন কোথায়? কারগুসান বলেন, আধুনিক পুরী, প্রাচীন দন্তপুর। ডাঃ হাণ্টারেরও ঐ মত। কিন্তু ডাঃ রাজেন্দ্রলাল বলেন, বালেশ্বর ও মেদিনীপুরের মধ্যস্থলে অধুনাপ্রসিদ্ধ দাঁতন নামে যে গ্রাম আছে, তাহাই প্রাচীন দন্তপুর। বুদ্ধদন্ত যখন সিংহলে যায়, তখন তাহা তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে জাহাজে তোলা হয়। পুরী হইতে তাম্রলিপ্ত অনেকদূর, কিন্তু বর্ত্তমান দাঁতন হইতে তাম্রলিপ্ত বড় বেশীদূর নয়।

উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধ হইল না,—শত্রু পাণ্ডু মিত্র হইলেন। তৈলের সংস্পর্শে লৌহের মরিচা থাকে না—পাণ্ডুও বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। কিছুদিন যায়। মালব-দেশের রাজকুমার বুদ্ধদন্ত দেখিতে আসিলেন। তিনি গুহশিবের কন্যাকে বিবাহ করিয়া দন্তমন্দিরের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইলেন। ইতিহাসে তিনি দন্তকুমার নামে প্রসিদ্ধ। এবং প্রত্নতাত্ত্বিকগণের অনুমানে, তিনিই পুরাণের ইন্দ্রদ্যুম্ন।

ইহার পূর্ব্বেই, পাণ্ডু, স্বস্তিপুররাজকে যুদ্ধে নিহত করিয়া আপনিও পরলোকে প্রস্থান করিয়াছিলেন। স্বস্তিপুররাজের আত্মীয়গণ, সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক বুদ্ধদন্তগ্রহণাশায় দন্তপুর আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধ, অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। কাজেই অনিচ্ছাবাধ্য গুহশিব, বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধের নিমিত্ত রণ-ক্ষেত্রে গমন করিলেন। এবং নিহত হইলেন।

বিপদ দেখিয়া দন্তরক্ষক দন্তকুমার এবং তাঁহার পত্নী হেমমালা, বুদ্ধদন্ত লইয়া ছদ্মবেশে তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হইলেন। এবং অর্ণবপোতে আরোহণপূর্ব্বক সিংহলে যাত্রা করিলেন। শ্রীমেঘবাহন তখন সিংহলের রাজা। তাঁহার রাজত্বকাল, ৩২০—৩৩০ খৃষ্টাব্দ। (৪) তাহার পক্ষে কয়েক বৎসরের ঘটনা অনেকটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

তবে, এই অন্ধকার-যুগেই, সেই পবিত্র বুদ্ধদন্তের পূতঃ স্মৃতির উপরে সর্ব্বজননমস্য শ্রীজগন্নাথের সৃষ্টি হয়। এই সময়ে, জগন্নাথের পূজার সহিত বৌদ্ধপদ্ধতি জড়িত ছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে, বুদ্ধ-দন্তের গৌরবেই যে জগন্নাথ পুষ্ট,—একথা অবশ্যস্বীকার্য্য! কিন্তু বিশ্বকোষ-সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু, শ্রীক্ষেত্রে বৌদ্ধপ্রভাবের কথা অস্বীকার করেন। স্বমতপোষণার্থ, তিনি যে সকল তর্ক-যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন,—দৃঢ়তর প্রমাণের মুখে তাহা বায়ু-তাড়িত কার্পাসের মত উড়িয়া যায়। আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে তাহা দেখাইব।

ঐতিহাসিক যুগে উৎকলে যে সকল ঘটনা হইয়াছে,—জগন্নাথ তাহার কেন্দ্র। সুতরাং অতঃপর উৎকলের একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস না প্রদান করিলে, আমাদের বক্তব্য অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে।

রক্তবাহুর উৎকল-জয়।—ইতিহাসে, জগন্নাথের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই, ৩১৮ খৃঃ অব্দে। (৫) সেই সময়ে, রক্তবাহু নামক একজন দুর্দ্দান্ত জলদস্যু পুরী আক্রমণ করে। রক্তবাহু যে কে এবং কোথা হইতে আসিল, তাহা নিশ্চিতরূপে কেহই জানে না। ইতিহাস এখানে নীরব। কেবল জানা যায়, সে যবন। পুরীর কালেক্টার লি সাহেব বলেন, "ইহারা গ্রীসীয় বাক্ট্রিয়। ইহারা জাহাজে করিয়া আর্ম্মেনী বা লোহিত-সমুদ্র বা এসিয়া মাইনরের দিক হইতে আসিত। আগমনকালে, ইহাদের অত্যাচারে তীরবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশই জর্জ্জরিত হইয়া উঠিত।" (৬)

(৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. vi. p. 858.

(৫) Hunter's Orissa. I.

(৬) W. H. Lee's "A short history of the Town of Puri or Jagannath. p.p. 3 4.

যবন রক্তবাহু, তাহার অসংখ্য সৈন্যের সহিত পুরীর উপকূলে অবতরণ করিল। তাহার আক্রমণ সম্বন্ধে একটী স্থানীয় কাহিনী আছে। তাহাতে কল্পনার অভাব নাই। কিন্তু অনেক স্থলেই তাহা ইতিহাসের বিরোধী নয়। আমরা এখানে তাহা সংক্ষেপে বলিয়া লইলাম।

রক্তবাহু গোপনে পুরীর দিকে অগ্রসর হইল। তাহার অভিপ্রায়, পুরী আক্রমণ। কিন্তু পুরীর রাজা, এই বলবান বিপক্ষের সহিত বলপরীক্ষায় সাহসী না হইয়া জগন্নাথের মূর্ত্তি ও দেবতার অলঙ্কারাদি লইয়া, সোনপুর গোপালীর দিকে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে, যবনেরা পুরীতে আসিয়া, রাজাকে দেখিতে পাইল না। ফলে, তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া নগর আক্রমণপূর্ব্বক অসংখ্য অধিবাসীকে নিহত করিল। এবং তৎপরে পলায়িত রাজার অনুসন্ধানে তৎপর হইল। উপায়ান্তর অভাবে, আমাদের সাহসী রাজা, দেবমূর্ত্তিকে ভূগর্ভে লুকাইয়া রাখিয়া গভীর জঙ্গলের ভিতরে পলায়ন করিলেন।

এদিকে, রক্তবাহু কয়েকজন লোকের মুখে রাজার পলায়নসংবাদ শ্রবণ করিল। তখন সে সমুদ্রের উপরে লম্ফ দিয়া গিয়া বলিল, "তবে রে পাজী! রাজা তোর সুমুখ দিয়া পলাইয়া গেল, আর তুই কি না সব জানিয়া শুনিয়াও আমাকে কিছু বলিস নাই? দাঁড়া, তোকে আচ্ছা শাস্তি দিব!" ব্যাপার বড় সুবিধার নয় বুঝিয়া, সমুদ্র তাড়াতাড়ি ক্রোশপানেক হটিয়া পলাইয়া গেলেন। কিন্তু তাহার পরেই, কি ভাবিয়া আবার পাহাড়ের মত উচ্চ হইয়া তীরের উপরে আসিয়া লাফাইয়া পড়িলেন। সমুদ্রের জলে সমস্ত দেশ ভাসিয়া গেল। ইহার ফলেই চিল্কা হ্রদের উৎপত্তি। সমুদ্রের বিক্রমে, রক্তবাহুর অনেক সৈন্য মরিয়া গেল। জঙ্গলের ভিতরে রাজাও প্রাণত্যাগ করিলেন। (১)

মৃত রাজার পুত্র ইন্দ্রদেব, এই ঘটনার পরে সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। কিন্তু রক্তবাহু, পুরীর আশা পরিত্যাগ করিল না। সে পুনর্ব্বার পুরী আক্রমণ করিল, রাজাকে নিহত করিল, এবং নিজে পুরীর রাজা হইয়া বসিল। রক্তবাহুর পরে, তাহার বংশধরগণ পরবর্ত্তী দেড়শতাব্দকাল পুরীর সিংহাসন পরিত্যাগ করে নাই।

কেশরী বংশ।—অতঃপর, কেশরী-বংশের অভ্যুদয়। ৪১৩ খৃষ্টাব্দে মহাবীর যযাতিকেশরী যবনগণকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার বীরত্ব ও পরাক্রমে যবনগণের অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। যাহারা জীবিত রহিল, তাহারা পলায়ন করিল। এই সময় হইতে, পুরীর মন্দিরে একরূপ রোজনামচা লিখিত হইতে লাগিল। তাহার নাম, মাদলা-পঞ্জী। তাহা তালপত্রে লিখিত। অতএব বলা যাইতে পারে, এখন হইতে উৎকলের প্রকৃত ইতিহাসের আরম্ভ।

যযাতিকেশরী বহু অনুসন্ধানের পরে, চিল্কা হ্রদের তটভূমি হইতে জগন্নাথের মূর্ত্তি উদ্ধার করিলেন। মূর্ত্তির জন্য কনতিবিলম্বে দেবমন্দির নির্ম্মিত হইল। দৈনিক পূজার

(১) Stirlings "An Account of Orissa."

যাত্রাদি নির্ব্বাহের জন্য প্রচুর দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দ্ধারিত হইল। এবং যাহাতে যাবতীয় কার্য্য সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পাদিত হয়, মহানুভব যযাতিকেশরী তাহার কোনও ত্রুটি রাখিলেন না। (৪০১ শকাব্দার এই শ্রাবণ)। এই সকল পুণ্য কার্য্যের জন্য, যযাতিকেশরী দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন আখ্যালাভ করিলেন। অদ্যাবধি শ্রীমন্দিরের সকল কার্য্য তাঁহারই নিয়মানুসারে নির্ব্বাহিত হয়।

যযাতিকেশরীর পরবর্ত্তী রাজগণ, ইতিহাসে কেশরীবংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। মাদ্‌লাপঞ্জীর মতানুসারে যযাতির শাসনকাল ৪৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। যযাতির মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র সূর্য্যকেশরী সিংহাসন লাভ করেন। তাহার পর ৪২ জন রাজা উৎকলভূমি শাসন করেন। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে কেশরীবংশের পতন হয়।

কিন্তু এই বহুশতাব্দব্যাপী রাজবংশের শাসনকালের মধ্যে পুরীর মন্দিরের কোন শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। কেশরীবংশীয়গণ শৈব ছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই, কেবল ভুবনেশ্বরের মন্দিরগঠন লইয়া আপন আপন জীবনকাল সমাপ্ত করিয়া ছিলেন। অনেকে অন্যান্য শিল্পকার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিয়া ছিলেন বটে,—কিন্তু সে গুলির সমস্তই শ্মশানপতি গৃহস্থবৈরাগী মহাশিবের নামে উৎসর্গিত,—জগন্নাথের তাহা হইতে কিছু লভ্য হয় নাই।*

গঙ্গাবংশ।—তাহার পর বৈষ্ণবধর্ম্মী গঙ্গাবংশীয় রাজগণের শাসনকাল। আমরা, এই বংশের কয়েকজন রাজার নামের তালিকা এখানে সংকলন করিয়া দিলাম।

প্রথম বংশ।১। ভূ-কপিলদেব। (১৪৭৪—১৫১৩)। ২। পুরুষোত্তম দেব। (১৫১৪—১৫৪৩)।

দ্বিতীয় বংশ। ১। গঙ্গামুকুন্দ দেব। ১৪৪৪—১৫—৯১) ইঁহার রাজত্বকালে, ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে কালাপাহাড়, দেবমূর্ত্তি নষ্ট করে। সেই সময়ে ইঁহার মৃত্যু হয়।

২। রামচন্দ্র দেব। (১৫৯২—১৬২৪) ইঁহার রাজত্বকালে, উৎকলে মোগলশাসন আরম্ভ হয়। ৩। বলভদ্র দেব (১৬২৫—১৬৪১) ৪। প্রতাপরুদ্র দেব (৮), (১৬৪২—১৬৭৪) ৫। জয়সিংহ দেব (১৬৭৯—১৭০৪) ৬। হরিকিষণ দেব (১৭০৬—১৭১৫) ৭। গোপিনাথ দেব (১৭১৬—১৭২৫) ৮। রামচন্দ্র দেব (১৭২৬—১৭৫৬) ৯। বীরকিশোর দেব (১৭৩৭—১৭৭৯) ইঁহার রাজত্বকালে উৎকলে মহারাষ্ট্রশাসনের আরম্ভ। তাঁহার গুরু শ্রীমন্দিরের পশ্চিম তোরণ প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎকর্ত্তৃক মন্দিরের প্রস্তরপ্রাচীর এবং নরেন্দ্র সরোবরের সোপানাবলী নির্ম্মিত হয়। কণারকের অরুণস্তম্ভ উৎকলে আনীত হয়।

১০ জয়সিংহ দেব (১৭৮০—১৭৯৭) মুকুন্দ দেব (১৭৯৪—১৮১৭) ইঁহার

---

(৮) রাজা প্রতাপরুদ্রই কপিলাশ পর্ব্বতের "কপিলেশ মহাদেবের" মন্দিরনির্ম্মাণ করেন। প্রবাদ, গোহত্যার পাপমোচনার্থ তৎকর্ত্তৃক উক্ত পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। Major Kittoe's Account. (J. R. A. S. B. Vol. VII. p. 685.)

রাজত্বকালে উৎকলে, ইংরাজশাসনের আরম্ভ। (৯)

আমার বিবেচনায় এই কালনির্ণয়ে কিছু কিছু গোলযোগ আছে। এখানে তাহার সম্যক্ আলোচনা অসম্ভব। আমরা, স্থানাভাবের জন্য হিন্দু রাজত্বের সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে পারিলাম না। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ-কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত বহু শিলালিপি প্রভৃতিতে আরও অনেক রাজার নাম পাওয়া যায়। (১০) ঐ সকল রাজার মধ্যে অনেকে বেশ পরাক্রান্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। পাদটীকায় একজন রাজার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা উদ্ধৃত হইল। (১১)

আফগান-গণের সহিত বিবাদ-আরম্ভ।—১২১২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের শাসন-কর্ত্তা ঘিয়াস্ উদ্দীন, উৎকল আক্রমণ করিলেন। এই সময় হইতেই উৎকলভূমির সহিত মুসলমানগণের সংস্রব উপস্থিত হয়। এবং অনেকবারই জগন্নাথের বিগ্রহ লইয়া বিগ্রহ উপস্থিত হয়।

ঘিয়াসউদ্দীনের বিক্রমে উৎকল-রাজ তাঁহাকে করপ্রদান করিতে স্বীকৃত হন। কিছুদিন নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হইল। তাহার পর, বঙ্গের আর একজন শাসন-কর্ত্তা, তোঘন খাঁ, সসৈন্যে উৎকলের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু উৎকলপতিও তখন দুর্ব্বল-হস্তে অসিধারণ করিতেন না। তাঁহারাও আফগানগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রবল যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, আফগানগণ উৎকল প্রান্ত হইতে বিতাড়িত হইলেন। আফগানেরা এ অপমান ভুলিতে পারিলেন না। দশবৎসর পরে, তাঁহারা পুনর্ব্বার উৎকল আক্রমণ করিলেন। অবিলম্বে সমর উপস্থিত হইল। বিজয়লক্ষ্মী উৎকল ভূমির প্রতি প্রসন্না—আফগানগণ পুনর্ব্বার পরাস্ত হইলেন। উৎকলের সে বীরবাহু আজ কোথায়? (১২)

ইহার পরের ঘটনা, একখানি লিপিপাঠে জানা যায়। কপিলেশ্বর-গজপতি নামে এক পরাক্রান্ত রাজা, উৎকলশাসন করিতেন। তাঁহার বংশের এক ব্যক্তির নাম চন্দ্রদেব। চন্দ্রদেবের পুত্রের নাম, গুহিদেব পাত্র। গণদেব, তাঁহারই পুত্র। তিনি তুরস্কজাতীয় হুজন

---

(৯) See History of Pooree: By Drij Kishore Ghose.

(১০) যাঁহারা উড়িষ্যার শিলালিপির বিষয় জানিতে চান, তাঁহারা W. H. Lee's "Inscriptions in the District of Puri" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিবেন।

(১১) নিম্নলিখিত লিপিতে যে রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি তোলঙ্গপতি ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক উৎকল জিত হইয়াছিল। পুরীর ব্রহ্মেশ্বর মন্দির হইতে লিপিখানি পাওয়া যায়।

"He (Janamenjaya) was a celebrated emperor, master of the kingdom of seven limbs of wonderful understanding in power and morals, charitable, most virtuous, a hero, and like Raja Yayati, an ornament of the earth;" প্রভৃতি। Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VIII. p. 560.

(১২) Hunter's Orissa.

রাজকুমারকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। (১২) লিপির কালনির্ণয় করিলে বোঝা যায়, উক্ত দুইজন রাজকুমারদ্বয়, সম্ভবতঃ বামনীবংশীয় নবাব দ্বিতীয় আলাউদ্দীন সার দুই জন সেনাপতি।

ঐতিহাসিক আলি বীন বলেন, আমেদ সা ১৪৩৪ অব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ১৪৫৭ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে, তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু অন্য একখানি পুস্তকের মতে, আরও চারি বৎসর পরে আমেদসার মৃত্যু হইয়াছিল। (১৩)

হুমায়ুন সা'র পরে (১৪৬১—৩রা ফেব্রুয়ারী) (১৪) উড়িষ্যার একজন রাজা, আফগানরাজ্য আক্রমণ করেন। বামনী বংশীয় নিজামসা তখনি সুলতান। তিনিও সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক উৎকল রাজের আক্রমণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। উৎকলপতির অধীনে দশ হাজার পদাতিক এবং চারি শত অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। কিন্তু সুলতানের সেনাপতি সা মুহাম্মদ,—কেবল ঈশ্বরের করুণার প্রতি নির্ভর করিয়া, মাত্র এক শত ষাট জন বর্ম্মধারী অশ্বারোহী লইয়া উৎকলপতিকে আক্রমণ করিলেন। দিবাবসান কালে যুদ্ধ সমাপ্ত হইল। উৎকলরাজ, সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া, রণক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। (১৫)

উপরলিখিত সংগ্রাম-কাহিনী নামী উপকথার প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই। সৈন্য সংখ্যার বাহুল্য রণজয়ের কারণ নয়, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু দশ হাজার পদাতিক এবং চারি শত অশ্বারোহী সৈন্যকে যে এক শত ষাট জন মাত্র অশ্বারোহী সৈন্য পরাজিত করিয়াছিল, ইহা স্বীকার করি না। ভিতরে, একটু কল্পনা,—একটু গোলমাল,—একটু পক্ষপাতিতা আছে।

কিছুদিন পরে, বাঙ্গলার আর এক

---

(১২) Indian Antiquary. 1891. Vol. XX, November সংখ্যার ৩০০—১০ পৃষ্ঠায় এই প্রয়োজনীয় লিপির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আমরা আবশ্যকবোধে কতক অংশ উদ্ধার করিলাম :—

6. Verse :—Let him be ever victorious the brave and illustrious Kapilesvara Gajapati ; who have worshipped the Lord of three Worlds, the crest jewel of the black-mountain (?) the blessed God Jagannahtha &c.

7. His capital, the City called kataka on the bank of Mahanadi, &c.

8. Just as the full moon from the Ocean, the glorious Chandradeva was produced in his race. From him sprang the famous Guhedeva patra, as Guha from Mahesa.

9. From this favourite of the earth came the victorious King Ganamahipati, who (because) he vanquished with His arms two Turushka princes, was therefore called Rantaraya &c,"

(১৩) Tazkarat-ul-Muluk.

(১৪) ফেরিস্তা বলেন, ২৮শে আষ্টোবর।

(১৫) Burhan-i-Maasir ; By Ali Bin Azizullah Tabataba ; এই বইখানি ফেরিস্তার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল।

জন শাসনকর্ত্তা,—সলিমান, উৎকল আক্রমণ করেন। আকবর তখন ভারতসম্রাট। এবং মুকুন্দদেব তখন উৎকলের সিংহাসনে। উপস্থিত বিপদে, মুকুন্দ দেব ভীত হইলেন না। তিনি সাতিশয় ক্ষিপ্রকারিতার সহিত দুর্গাদিনির্ম্মাণপূর্ব্বক আপনার অবস্থান, দৃঢ়তর করিয়া তুলিলেন। ফলে, বিপক্ষের আক্রমণ ব্যর্থ হইল। মুসলমানেরা সেবারে প্রস্থান করিল। (১৬)

কালাপাহাড়।—কিন্তু তাহার কিছু দিন পরেই সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা। সুলেমানের মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু সেনাপতি কালাপাহাড়, উৎকল আক্রমণ করিল। (১৫৫৮ খৃষ্টাব্দ) রাজা মুকুন্দ দেবেরও সাহস ও বীরত্বের অভাব ছিল না,—কিন্তু চির-চঞ্চলা ভাগ্যলক্ষ্মী এবারে তাঁহার প্রতি বিরূপা। রাজপদের নিকটে আর একবার হিন্দু ও মুসলমানের বল পরীক্ষা হইল। মুকুন্দদেব পরাস্ত হইলেন এবং সম্মুখযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল মরণকে আলিঙ্গন করিলেন।

বিজয়োল্লাসের সহিত কালাপাহাড়, দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইল। এবং পথি মধ্যে ইতস্ততঃ যত হিন্দু দেবালয় তাহার চক্ষুতে পড়িল,—সমস্তই বিনষ্ট হইল। সমগ্রউৎকলব্যাপী বিরাট ধ্বংসস্তূপ অদ্যাপি সেই অত্যাচারের আঘাত বক্ষে লইয়া বিরাজমান,—সে ক্ষতে আর কখনও ঔষধ পড়ে নাই। জনপ্রবাদ বলে, কালাপাহাড়ের গোচর্ম্মনির্ম্মিত ঢক্কার ভীম আরাবে, দেবতাদের পাষাণ অঙ্গ সকল দেহ-বিমুক্ত হইয়া, স্খলিত হইয়া পড়িত। কালাপাহাড়ের আক্রমণের ভীষণতা, ইহাতেই স্বপ্রকাশ।

প্রেমের দেবতা জগন্নাথ,—যুদ্ধে তাঁহার চির-বিতৃষ্ণা! বিপদ দেখিলেই তিনি মন্দির ছাড়িয়া সরিয়া পড়িয়াছেন,—এমন একবার নয়,—দুই বার নয়,—বহুবার। তখন ভূ-গর্ভ বৈ তাঁহার নাস্তঃপন্থা! এবারেও তাহা হইল। কিন্তু কালাপাহাড় বড় চতুর। দেবতার পলায়নসংবাদ সে পূর্ব্বাহ্নেই সংগ্রহ করিয়াছিল; অতএব জগন্নাথ, এবার আর আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। কালাপাহাড় তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া আসিল এবং তাঁহাকে সর্ব্বভুক্ অগ্নির লোলিহান জিহ্বায় সমর্পণ করিল।—কিন্তু আশ্চর্য্য! সেই দণ্ডেই কালাপাহাড়ের মৃত্যু হইল। অবশ্য, এই মৃত্যুকাহিনীও জনপ্রবাদের নিজস্ব। ইতিহাস এখানে কোন কথা কয় নাই।—আমরাও ইহার সত্যাসত্য লইয়া আর নাড়াচাড়া করিলাম না। যাহা হোক,—কালাপাহাড়ের মৃত্যুর পরে, জগন্নাথের দগ্ধাবশিষ্ট মূর্ত্তি,—বেগবতীবাহিনীকর্ত্তৃক ভাগীরথীর প্রবহমান স্রোতঃমুখে পুনর্ব্বার স্বদেশে আনীত হইল। ইহাই মাদলা পঞ্জীর বিবরণ। (১৭)

পরবর্ত্তী সিংহাসনবৎসরকালের ইতিহাস, বিশৃঙ্খলতার এক লোচনীয় কাহিনী! দেবালয় ধ্বংস-চূর্ণ,—তাহাতে দেবতা নাই! সমগ্র দেশে প্রজার হাহাকার বাজিয়া উঠিয়াছে,—সিংহাসনে রাজা নাই! তাহার পর, ১৫৮০

(১৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal.

(১৭) Hunter's "Orissa"—Vol. I.

খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্র দেব রাজা হইয়া বসিলেন। তিনি পুনর্ব্বার দেবালয়ের মধ্যে দারুব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু আবার বিপদ আসিল। গোলকুণ্ডা হইতে মুসলমান আক্রমণকারিগণ আবার উৎকলের উপরে পতিত হইল। সে যুদ্ধেও উৎকলপতি পরাজিত হইলেন। (১৮)

দাউদ খাঁ যখন বাঙ্গলার আকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁর নিকটে পরাস্ত হন,—তখন তিনি কটকে পলাইয়া আসেন। কিন্তু কটকে আসিয়া, তিনি আত্মরক্ষাতেই অধিক ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে, জগন্নাথ ভয়ে ভয়ে থাকিলেও, কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হন নাই। রণক্ষেত্রে দাউদ খাঁর মৃত্যু হইলে, তাঁহার সেনাপতি কতলু খাঁ, মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। কিন্তু পরাস্ত হইয়া অবশেষে সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হন। কিছুদিন কতলু খাঁই উৎকলের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। তাঁহার পরে, ঈশা খাঁ নামক একব্যক্তি দাউদের পুত্রগণের ভার-গ্রহণ করিলেন। তাহাদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য, রাজা মানসিংহ তাহাদিগের হস্তে উড়িষ্যার শাসনভার ন্যস্ত রাখেন। কিন্তু তাহারা শান্ত থাকিবার পাত্র নয়। দুই বৎসর পরে ঈশা খাঁর মৃত্যু হইল। সুযোগ পাইয়া, পাঠানেরা আবার জগন্নাথের মন্দির আক্রমণ করিল। আকবর খাঁ, এই ঘটনায় অত্যন্ত উত্যক্ত হইলেন। সকলেই জানেন, তিনি একজন সাম্যবাদী সম্রাট ছিলেন। তিনি রাজা মানসিংহকে পুনর্ব্বার কটকে প্রেরণ করিলেন। পাঠানেরা চিরদিনের জন্য উৎকল হইতে বিতাড়িত হইলেন। (১৯)

মোগল রাজত্ব। অতঃপর উড়িষ্যায় মোগল রাজত্বের আরম্ভ। তোডরমল্ল আসিয়া উড়িষ্যার বন্দোবস্ত করেন। তাঁহাদের সময়েও জগন্নাথ দু একবার বিপদে পড়িয়াছিলেন।

(১৫৯২ খৃঃ অব্দে) "জলেশ্বর, ভদ্রক, কটক, কলিঙ্গ ও রাজমহেন্দ্রী, এই ৫ সরকার ও ৯৯ পরগণায় বিভক্ত হইয়া ৪২, ৬৮, ৩৩০ টাকা তাহার জমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ... আকবরের সময় কলিঙ্গ ও রাজমহেন্দ্রী উড়িষ্যার সরকাররূপে গণ্য হইলেও মোগলেরা চিল্কা হ্রদের দক্ষিণে আপনাদিগের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ... সাজাহানের রাজত্বকালে ১৬২৭ হইতে ১৬৫৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা বাঙ্গলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র সুবার পরিণত হয়। ... মুর্শিদকুলীর জামাতা সুজাউদ্দীন খাঁ। প্রথমতঃ উড়িষ্যার নায়েব দেওয়ান পরে নায়েব নাজিমও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ... নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময় উড়িষ্যার অধিকাংশ ভূভাগ মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হয়।" (২০) ১৬১২ হইতে ১৬২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নুরজাহানের ভ্রাতাপতি ইব্রাহিম খাঁ, উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার পদ অধিকার করিয়াছিলেন।

আওরঙ্গজেবের সময়েও জগন্নাথদেব

(১৮) Stirling's "An Accont of Orissa.

(১৯) Elphinstone's "History of India" Vol. II. p.p. 243—244.

(২০) নিখিলবাবুর "মুর্শিদাবাদের ইতিহাস" প্রথম খণ্ড ৪৪৯—৫১ পৃষ্ঠা।

অনেক কষ্টে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। একরাম খাঁ, সম্রাটের আদেশে মন্দির ধ্বংস করিবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু উৎকলরাজের চাতুর্য্য ও কৌশলে মন্দির ধ্বংস হইতে হইতে হয় নাই। (২১)

নিখিলবাবু লিখিয়াছেন :

"মুজা খাঁ মুর্শিদকুলী খাঁ বাহাদুরকে রত্নমঞ্জরী উপাধিপ্রদান করিয়া, উড়িষ্যার শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করেন। • • • মহম্মদ তকীর শাসনকালে পুরুষোত্তমের রাজা জগন্নাথ দেবের বিগ্রহ লইয়া, উড়িষ্যার সীমা অতিক্রম করিয়া চিল্কা হ্রদের পারে পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। (২২) • • মুর্শিদকুলী খাঁ ও মীর হাবিব (তাঁহার দেওয়ান) প্রথমে পুরুষোত্তমের রাজাকে জগন্নাথের মূর্ত্তিসহ পুরী আগমন করিতে ও পুরাতন দেবমন্দিরে দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিতে আদেশ দেন এবং তাঁহার প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার নিবারণেরও চেষ্টা করেন। ইহাতে ও অন্যান্য বন্দোবস্তে ক্রমে ক্রমে উড়িষ্যা প্রদেশের আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল।"

কিন্তু আলিবর্দ্দী খাঁ নবাব হইয়া কুলী খাঁকে উৎকল শাসন হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টায় রহিলেন। ইহার ফলে, উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। বীরেশ্বরের নিকটে একটী যুদ্ধে, সেনাপতি মীর জাফরের বীরত্বে আলিবর্দ্দী খাঁ জয়লাভ করিলেন। (২৩) কুলী খাঁর পরিবর্ত্তে আলিবর্দ্দীর জামাতা সৈয়দ আহম্মদ উৎকলের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তিনি বড় ভাল লোক ছিলেন না। আপন অত্যাচারের জন্য আহম্মদ, দেশে অশান্তির আগুন জ্বালিয়া তুলিলেন। (২৪) বিপক্ষেরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। আহম্মদ সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইলেন। বিপদ দেখিয়া স্বয়ং আলিবর্দ্দী উৎকলে আসিয়া বিপক্ষপক্ষকে পরাস্ত করিলেন। তাঁহার নিয়োগে মসুম খাঁ, উৎকলের শাসনকর্ত্তা হইলেন।

মারহাট্টা শাসন।—১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ উৎকল অধিকার করেন। এবং পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর—১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা উৎকলের শাসন-দণ্ড পরিত্যাগ করেন নাই। (২৫)

তাঁহাদিগের রাজত্বকালে, উৎকলবাসিগণের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই 'সাইলক দি য়ুয়' এক একটীর দ্বিতীয় সংস্করণ ছিলেন। বিবিধপ্রকারে প্রজাবর্গের রক্ত-শোষণ করিয়াও, তাঁহাদের তৃপ্তি হইত না।

কিন্তু সে অত্যাচার কদাপি শ্রীমন্দিরের অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করে নাই। ঠাকুর জগন্নাথ, বেশ নিরাপদ-ব্যবধানে বসিয়াই

(২১) Tabcirat-ul-Nazirin.

(২২) এখানে নিখিলবাবু বোধ করি ভ্রমে পড়িয়াছেন। চিল্কা হ্রদ উৎকল-সীমার বাহিরে নয়—উড়িষ্যারই মধ্যে।

(২৩) Mutakherin.

(২৪) তারিখ ইউসফী।

(২৫) Orme p.274, Madras edition. 1861.

দৈনিক নিয়মিত পান-ভোজন উপভোগ করিয়া এবং অবসরকালটীকে সুবেশ নর্ত্তকি-গণের নূপুর-শিঞ্জিতের কলগুঞ্জনে মধুরমধুর করিয়া তুলিয়া দিনের পর দিনগুলি কাটাইয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরেরও কিছু কিছু শ্রীবৃদ্ধি যে হয় নাই—তাও নয়।

ইংরাজ শাসন।—১৮০৩ খৃষ্টাব্দে, লর্ড ওয়েলেসলি সসৈন্যে উৎকলভূমির দিকে অগ্রসর হন। এবং দুএকটী খণ্ডযুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণ, তাঁহাদের সম্মুখে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়,—অধিকন্তু, উৎকল রাজলক্ষ্মীও ইংরাজের সেই বিজয়-পতাকার তলে আত্ম-দান করেন। (২৬)

রক্তবাহুর পর পাঠান, পাঠানের পর মোগল, মোগলের পর মারহাট্টা এবং তৎপরে ইংরাজ; তাহার উপর কেশরীবংশ গঙ্গাবংশ (২৭) প্রভৃতি দেশীয় রাজগণ;—পাষাণ মন্দিরের আঁধারকন্দরে বসিয়া বৃদ্ধ জগন্নাথ, স্তিমিত দীপালোকে এতগুলি জাতির পদাঙ্ক গণনা করিয়াছেন। সাগরের সে বালুকা-বেলার পদাঙ্ক, পলকপরে সিকতার উপরেই স্বপ্নপ্রতিম মিলাইয়া গিয়াছে; কিন্তু বিবিধপ্রকারে অত্যাচারিত এবং লাঞ্ছিত হইয়াও,—তিনি যে, হিন্দুর গণনাতীত তীর্থ দেবতার মত, প্রলয়-ঝটিকার চকিত দীর্ঘ-শ্বাসবৎ মিলাইয়া যান নাই, ইহাই আশ্চর্য্য এবং সৌভাগ্যের কথা! (২৮)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

নিভৃতের প্রয়োজন।

গ্রীষ্ম দুপুরে কোথায় গোপনে
হলো উপাদান—আহরণ,
তবেত সহসা নীরদ পুঞ্জে
বরিষার বারি বরিষণ।
ধরার অঠরে নিভৃতে গোপনে
হ'লো কত যুগ আয়োজন,
তবে ত সহসা বিশ্ব আলোকি
মহাপুরুষের আগমন?

অজ্ঞাতবাসে বনে কান্তারে
হ'লো ধীরে বল—উপচয়,
কুরু পাঞ্চাল—বিরাট সমরে
পাণ্ডব তবে লভে জয়।
কাজ হ'বে যত বিকট বিপুল
আগে তাহা তত ঘটাহীন,
তত ধীরে ধীরে নীরবে নিভৃতে
আয়োজন চলে নিশিদিন।

শ্রীকালিদাস রায়।

---

(২৬) Hunter's Statistical Accounts of Orissa.

(২৭) প্রসিদ্ধি আছে, গঙ্গাবংশীয়গণের পূর্ব্বপুরুষ বঙ্গদেশীয় ছিলেন। আমরা স্থানাভাবের জন্য সে সকল কথা আলোচনা করিতে পারিলাম না,—তাই উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। Vide "Mackenzie Collection.

(২৮) উৎকলের ইতিহাস সম্বন্ধে, পুরাতন ভারতীতে শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সিংহ মহাশয় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। পাঠকেরা ইচ্ছা করিলে, তাহাও পড়িতে পারেন।

আর্য্যভটীয় সঙ্খ্যালিখন।

(লঘু আর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে।)

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ, কি সাহিত্য, কি গণিত, কি দর্শন সমস্তই প্রায় ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে লিখিত। কদাচিৎ দুই একখানি গদ্যময়। জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি শাস্ত্রে সঙ্খ্যার অজস্র পাত অপরিহার্য্য; সুতরাং ছন্দের সৌকর্য্যার্থে অক্ষরের দ্বারা সঙ্খ্যার নাম লিখিবার প্রথা বহুপূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত আছে। সচরাচর দুইটি নিয়ম পাওয়া যায়। প্রথমটিতে এক দুই ইত্যাদি প্রথম দশ বা দ্বাদশ সঙ্খ্যাকে চন্দ্র, পক্ষ প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে; যথা, ,চন্দ্র শশি=১; পক্ষ=২; নেত্র=২; বেদ=৪; বাণ=৫; ঋতু=৬; সমুদ্র, উদধি, লোক, মুনি, অশ্ব,=৭; পর্ব্বত, নগ, বসু, সর্প, অগ্নি,=৮; গ্রহ=৯; আকাশ, খোম=০ দিক=১০; আদিত্য, সূর্য্য=১২ ইত্যাদি। এই নিয়মে একটি শব্দ যত সঙ্খ্যক বস্তু বুঝায় বা যতগুলি বস্তুর নাম, সেই সঙ্খ্যার জন্য সেই সেই শব্দ ব্যবহৃত হয়। সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ নয়টি, সুতরাং গ্রহ এই শব্দ ৯ সংখ্যাবাচক। সেইরূপ প্রলয়কালে দ্বাদশ সূর্য্য উদয় হয়, তাই সূর্য্য শব্দ দ্বাদশ সঙ্খ্যাবাচক। এই সঙ্কেতের সাহায্যে সমস্ত রাশির নামকরণের একটি নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে। "অঙ্কানাং বামতো গতিঃ" এই সূত্রে একক, দশক প্রভৃতি স্থান হইতে বামদিকের শেষ অঙ্ক পর্য্যন্ত সঙ্খ্যার নাম লেখা হয়। ৫৭১ এই রাশি লিখিতে হইলে "শশিবানলোকাঃ" এইরূপ বিপরীত বা বিলোম গতিতে লিখিতে হইবে। শশি=১, বান=৫, লোক=৭—এই তিন সঙ্খ্যা দক্ষিণ হইতে বামদিকে লিখিলে ৭৫১ হইল।

উক্ত নিয়মে অনেক সময়ে গোলযোগ উপস্থিত হয়। যেমন এক সঙ্খ্যার জন্য দুই বা ততোধিক শব্দের ব্যবহার হয়, তেমনি এক শব্দে যখন দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সঙ্খ্যার সূচনা হয় তখনই প্রকৃত অর্থবোধ দুরূহ হইয়া উঠে। 'লোক' শব্দ, "ভূঃ ভুবঃ" ইত্যাদি সপ্ত লোক আছে বলিয়া ৭ম এই সঙ্খ্যার সূচক; কিন্তু কেহ কেহ তিন লোক ধরিয়া সেই লোক শব্দে ৩ এই সঙ্খ্যা ধরেন। এইরূপ ব্যর্থ কিন্তু অধিক নাই তাই রক্ষা।

দ্বিতীয় নিয়মটি অতি প্রাচীন। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে উহা বিধিবদ্ধ আছে;—

একং দশ শতঞ্চৈব সহস্রমযুতং তথা।
লক্ষঞ্চ নিযুতঞ্চৈব কোটিরর্ব্বুদমেব চ॥
বৃন্দঃ খর্ব্বো নিখর্ব্বশ্চ শঙ্খশ্চৈব মহাংস্তথা।
অন্ত্যাৎ মধ্যাৎ পরার্দ্ধঞ্চ দশবৃদ্ধ্যা যথোত্তরং॥

এক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে দশ গুণ করিয়া এক এক স্থান গণিত হয়, ইহাতে ১ হইতে ৯ এবং ০ এই দশ সঙ্খ্যারই ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং পর পর যুক্ত হইয়া সমস্ত রাশিই বুঝায়। পরার্দ্ধই সঙ্খ্যার শেষ সীমা। বিষ্ণুপুরাণেও ইহাই উক্ত হইয়াছে (৬ অধ্যায়, ৩ শ্লোক)। একটি প্রাচীন গ্রন্থে পরার্দ্ধের দশগুণ এক স্থান "ভূরি" নামে নির্দ্দিষ্ট আছে। এক

হইতে পরার্দ্ধ অষ্টদশম স্থান (১০১৮) সুতরাং ভূরি=১০১৯। কিন্তু কোন শাস্ত্রে 'ভূরি'র উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরার্দ্ধই গণনার শেষ সীমা।

কোন কোন প্রাচ্যবিদ্বেষী একশ্রেণী তথাকথিত মহাপণ্ডিত ভারতের সমস্ত প্রাচীন গৌরব, শিক্ষা, সভ্যতা, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি এমন কি আমাদের তাবৎ ধর্ম্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও দর্শন পাশ্চাত্য প্রাচীন গ্রীসের অনুসৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমাদের জ্যোতিষ, গণিত, দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্র যে গ্রীস্ হইতে আসিয়াছে তাহার প্রমাণ সংগ্রহই ইহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অধুনা অনেক পুরাতত্ত্ববিৎ এ সম্বন্ধে ঘোর সন্দিহান হইয়া প্রকৃত তথ্য পাইয়াছেন, এবং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন যে সভ্যতায়, বিদ্যাগৌরবে, ধর্ম্মে এবং শিল্প, স্থাপত্য ও বিজ্ঞানে—এক কথায় সকল বিষয়েই ভারতবর্ষ শিক্ষক এবং গ্রীস্ তাহার ছাত্র। এ বিষয়ে আমাদের ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই দুই মহাত্মার কৃতিত্ব বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। এইরূপ কতিপয় মহাপুরুষের যত্নে ও চেষ্টায় ভারতের লুপ্তগৌরব কিয়ৎপরিমাণে পুনঃস্থাপিত হইতেছে বটে, কিন্তু ইয়ুরোপে এখনও অনেকে যদিও মুখে তত কিছু বলিতে পারিতেছেন না ও অকাট্য প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে দাঁড়াইতেও পারিতেছেন না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে গ্রীসের ঘোর পক্ষপাতী, প্রমাণ ও অবসর খুঁজিতেছেন। কেহ কেহ অবিনের উর্ণনাভধর্ম্মী,—নিজ জালে জড়িত হইয়া কিম্ভূতকিমাকার অবস্থায় অহমিকায় নামোল্লেখে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে ভারতের রাজকর্ম্মচারী, সুতরাং ক্ষান্ত রহিলাম; কিন্তু বিচক্ষণ পাঠক স্বল্প আয়াসেই তাঁহাদের পাইবেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা বলেন যে উপরিউক্ত সঙ্খ্যা ও তাহার স্থান বিভাগের আদি প্রবর্ত্তক গ্রীস্! এ বিষয়ে বিজ্ঞ পুরাতত্ত্ববিদের নিরপেক্ষ মত গ্রাহ্য। তাঁহাদের মতে উহা ভারতের নিজস্ব।

উপরিউক্ত সঙ্খ্যালিখন প্রণালী দুইটিই সুপ্রচলিত। দ্বিতীয়টি প্রাচ্য প্রতীচ্য সকল দেশে সকল ভাষার সমান ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে কিছুদিনের জন্য একটি নূতন নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। এই তৃতীয় নিয়মটি জ্যোতিষী আর্য্যভটের প্রবর্ত্তিত; ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

প্রাচীন কুসুমপুর বা পাটলিপুত্র (আধুনিক পাটনা) প্রদেশে বহু পূর্ব্ব কাল হইতে গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চ্চা ও উন্নতি হইতেছিল। সেই দেশের জ্যোতিষের সহিত আর্য্যভটের নাম সংশ্লিষ্ট আছে। তিনি আর্য্যভটীয় নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাহাতে নিজ জন্ম বৎসর লিখিয়া গিয়াছেন।

ষষ্টির্ব্দানাং ষষ্টি, র্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দা, স্তদিহ মম জন্মনোঽতীতাঃ
কালক্রিয়াপাদ, ১০॥

"তিনটি যুগপাদ এবং ষষ্টিগুণিত ষষ্টি (৩৬০০) বৎসর ব্যতীত হইলে আমার জন্ম হইতে ত্র্যধিক বিংশতি (২৩) বৎসর অতীত হইল"।

যুগের চতুর্থাংশ যুগপাদ। সত্য, ত্রেতা,

দ্বাপর ও কলি এই চারি নামে চারি যুগপাদ—প্রত্যেকটি গড়ে ১০৮০০০০ সৌর বৎসরব্যাপী। জ্যোতিষের মতে এক যুগ অর্থাৎ এই চারি যুগপাদের পর ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ অবস্থা বিবর্ত্তিত হইয়া প্রথমের ন্যায় পুনরাবর্ত্তিত হইবে। এক্ষণে, মহাভারত হইতে আমরা জানিতে পারি যে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যত্যাগ ও পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান হইতে কলিযুগপাদ আরম্ভ। শিলালিপি প্রভৃতি প্রকৃষ্ট প্রমাণ সহযোগে ইহাও জানা গিয়াছে যে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩১০২ বর্ষে উক্ত ঘটনা হইয়াছিল। সুতরাং খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ ৩১০২ হইতে (জ্যোতিষ গণনার মতে) চতুর্থ যুগপাদ কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। এ বিষয় বিশেষরূপে গত মাসের ভারতীতে আলোচিত হইয়াছে। এই স্থলে আর্য্যভটের জন্মাব্দ স্থির করা যায়। চতুর্থ যুগপাদের ৩৬০০ বৎসর 'ব্যতীত' হইলে (৩৬০০—৩১০২) ৪৯৮ খৃষ্টাব্দ হয়; সেই বৎসর আর্য্যভটের বয়স ২৩ বৎসর হইয়াছিল; সুতরাং আর্য্যভট খ্রীষ্টিয় ৪৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি যে কুসুমপুরে জন্মগ্রহণ করেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। তাঁহারই গ্রন্থে আছে :—

ব্রহ্ম ভূপরিভূগুরবি, ভূজগুরু কোণভগণানভ্যর্চ্চ্য।
আর্য্যভটস্ত্রিহনিগদতি, কুসুমপুরেঽভ্যর্চ্চিতং জ্ঞানং॥

গণিতপাদ, ১।

"ব্রহ্ম, ধরিত্রী, (ভূ), চন্দ্র, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি (কোণ), নক্ষত্রসেনা (ভগণ) ইহাদের নমস্কার করিয়া আর্য্যভট এই পুস্তকে (ইহ) কুসুমপুরে যে বিজ্ঞান (জ্ঞানং) অভ্যর্চ্চিত হয় তাহাই বলিতেছে (নিগদতি)।" ইহাতে কুসুমপুরে জন্মের কথা নাই। ঐ প্রদেশে যে জ্যোতিষমত প্রচলিত ছিল তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তখন তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর ছিল।

গ্রন্থকার নিজ গ্রন্থের নাম রাখিয়াছিলেন "আর্য্যভটীয়"; কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত উহার নাম "আর্য্যাষ্টশত" বলিয়াছেন, কারণ উহাতে ১০৮টি আর্য্যাবৃত্তের শ্লোক আছে। উহার টীকাকার পরমাদীশ্বর উহাকে সিদ্ধান্তের মধ্যে না ফেলিয়া তন্ত্রের অন্তর্গত করিয়াছেন। উহার আধুনিক নাম "আদি আর্য্যসিদ্ধান্ত" বা "লঘু আর্য্যসিদ্ধান্ত"।

আর্য্যভটীয়ে প্রথমে উপক্রমণিকা স্বরূপ দশ শ্লোকাত্মক গীতি ছন্দে সূর্য্যাদি গ্রহের বিবর্ত্তনকাল বর্ণিত হইয়াছে, উহার নাম "দশগীতিকা সূত্র"। এই উপক্রমণিকার পূর্ব্বে ভূমিকা স্বরূপ নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক আছে।

প্রণিপত্যৈকমনেকং
কং সত্যং দেবতাং পরংব্রহ্ম।
আর্য্যভটস্ত্রীণি গদতি
গণিতং কালক্রিয়াং গোলং॥ ১॥
বর্গাক্ষরাণি বর্গে
ঽবর্গে ঽবর্গাক্ষরাণি কাৎ ঙমৌযঃ।
খ দ্বিনবকে স্বরানব
বর্গে, ঽবর্গে নবান্ত্যবর্গে বা॥২॥

প্রথমটিতে পুস্তকের অধ্যায় বিভাগ :—গণিতপাদ, ৩৩ শ্লোক; কালক্রিয়াপাদ, ২৫ শ্লোক; গোলপাদ ৫০ শ্লোক। সকল শ্লোকগুলিই আর্য্যাবৃত্ত। দ্বিতীয় শ্লোকটিতে সংখ্যাক্ষর নাম লিখনের সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত; ইহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। শ্লোকটির অর্থ এই :—"ক হইতে বর্গাক্ষরগুলি বর্গস্থানে

এবং অবর্গাক্ষরগুলি অবর্গ স্থানে (বসিবে); ঙ ও ম মিলিয়া য হয়; স্বরবর্ণ নয়টি নবক স্বরের প্রত্যেক বর্গ ও (পরবর্ত্তী) অবর্গ এই স্থান দ্বয় একটি করিয়া বসিবে। অথবা, নবমের পর যে বর্গ স্থান তাহাতে বসিবে"। এই শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা ও ভাবার্থ আবশ্যক। কতক পরমাদীশ্বরের টীকা হইতে এবং কতক পরবর্ত্তী শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া উহার অর্থ বুঝিতে হইবে।

দশগুণিত হইয়া এক হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত ১৮টি স্থান পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে ঐ ১৮টি স্থানকে দুই দুই করিয়া নয়টি দলে (নিবন্ধকে) বিভক্ত করা হইয়াছে। এইরূপ স্থান বিভাগের ফলে দেখা যায় যে প্রত্যেক দলের প্রথম স্থানগুলি বর্গরাশি এবং দ্বিতীয় স্থানগুলি অবর্গরাশি; (নোট দেখুন)।*

এ স্থলে ১, $১০^{২}$, $১০^{৪}$, $১০^{৬}$, ইত্যাদি দলের প্রথম স্থানগুলি বর্গসংখ্যক এবং ১০, $১০^{৩}$, $১০^{৫}$ ইত্যাদি দ্বিতীয় স্থানগুলি বর্গসংখ্যা নহে। ১×১=১; ১০×১০=$১০^{২}$; $১০^{২}\times১০^{২}=১০^{৪}$ ইত্যাদি বর্গ সংখ্যা। সুতরাং একক, শতক, অযুতক, নিযুতক প্রভৃতি স্থান গুলিকে বর্গ স্থান বা ওজ স্থান বলা যায়; এবং দশক, সহস্রক, লক্ষক, কোটি প্রভৃতি স্থানগুলিকে অবর্গ স্থান বা যুগ্ম স্থান বলে। প্রত্যেক দলের প্রথম স্থান বর্গস্থান এবং দ্বিতীয় স্থান অবর্গ স্থান। এক একটি দল এক একটি স্বরবর্ণ দ্বারা সূচিত হয়। অকার বলিলে একক ও দশক এই দুই স্থান বুঝাইবে। ইকারে শতক ও সহস্রক; উকারে অযুত ও লক্ষ; ঋকারে নিযুত ও কোটি, ইত্যাদি। হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরে কোন প্রভেদ ধরা হয় না। প্রত্যেক স্বরবর্ণের একটি বর্গস্থান ও তৎপরবর্ত্তী অবর্গ স্থান এই দুইটির অধিকার।

যুক্ত স্বরবর্ণে সংখ্যা বুঝায় না। যেমন ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরযুক্ত হইলে তবে শব্দ হয়, সেইরূপ সংখ্যা ও তাহার স্থান যুক্ত হইলে তবে রাশি হয়। ক হইতে ম পর্য্যন্ত পঁচিশ টি ব্যঞ্জন বর্ণের ১, ২, করিয়া ২৫ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকের একটি একটি মান আছে; যথা :—

ক	১	চ	৬	ট	১১	ত	১৬	প	২১
খ	২	ছ	৭	ঠ	১২	থ	১৭	ফ	২২
গ	৩	জ	৮	ড	১৩	দ	১৮	ব	২৩
ঘ	৪	ঝ	৯	ঢ	১৪	ধ	১৯	ভ	২৪
ঙ	৫	ঞ	১০	ণ	১৫	ন	২০	ম	২৫

ক বর্গ, চ বর্গ, ট বর্গ প্রভৃতি উপরি উক্ত পঁচিশ টি ব্যঞ্জন "বর্গাক্ষর"। ইহারা সকলেই হলন্ত। নিম্ন নিজ মানের সংখ্যা বুঝাইয়া যে যে স্বরবর্ণে যুক্ত হয়, সেই সেই স্বরবর্ণের "বর্গ স্থান" অধিকার করে। "বর্গাক্ষররাশি বর্গে"। উদাহরণ যথা :—ক = কৃ × অ। কৃ = ১, অ এই স্বরের বর্গ স্থান একক সুতরাং

---

* ১, ১০ ; $১০^{২}$, $১০^{৩}$; $১০^{৪}$, $১০^{৫}$; $১০^{৬}$, $১০^{৭}$; $১০^{৮}$, $১০^{৯}$; $১০^{১০}$, $১০^{১১}$,
অ ই উ ঋ ঌ এ
$১০^{১২}$, $১০^{১৩}$; $১০^{১৪}$, $১০^{১৫}$; $১০^{১৬}$, $১০^{১৭}$,
ঐ ও ঔ

P30480

ক = ১ + ১ = ১। কি = কৃ + ই। ই কারের বর্গস্থান শতক (১০^{২}) এবং অবর্গ স্থান (১০^{৩}) সহস্র ; এস্থলে বর্গস্থান লইতে হইবে, সুতরাং কি = ১ × ১০০ = ১০০। সেইরূপ খি = খ্ × ই = ২ × ১০০ = ২০০ ; ডি = ৪০০ ; মি = ২৫০০ ; ধি = ১৮০০ কারণ ইকার বর্গাক্ষরে যুক্ত আছে বলিয়া তাহার বর্গস্থান (১০০) লইতে হইবে। সেইরূপ হু = দ্ × উ ; দ্ = ১৮ এবং উকারের বর্গস্থান অযুত = ১০^{৪} ; সুতরাং হু = ১৮০০০০। ধ্ = ধ্ × ঋ ; ধ্ = ১৯ এবং ঋকারের বর্গস্থান নিযুত = ১০^{৫} ; সুতরাং ধ্ = ১৯০০০০০০। অতএব দেখা যাইতেছে যে বর্গাক্ষরের পক্ষে স্বরবর্ণের নিম্নলিখিত স্থান হইবে; নোট দেখুন *

অন্তঃস্থা য হইতে হ পর্য্যন্ত আটটি ব্যঞ্জন অবর্গাক্ষর। উহাদের মান "ডমৌযঃ" এই সূত্রে পাওয়া যায়। ঐ সূত্রের অর্থ এই যে ড এবং ম মিলিয়া য হয়। উপরি উক্ত নিয়মে

ড = ড্ + অ = ৫ × ১ = ৫
ম = ম্ + অ = ২৫ × ১ = ২৫
মিলিয়া হইল ৩০

অপিচ য = য্ × অ = য্ × ১০ (এস্থলে অকারের অবর্গ স্থান (১০) ধরা হইল।)

সুতরাং য্ × ১০ = ৩০ ;
অতএব য্ = ৩।

ইহার পর ক্রমান্বয়ে পর পর সংখ্যা বসিবে। সুতরাং অবর্গাক্ষর গুলির মান যথা—

য	৩	শ	৭	অন্তঃস্থা ব দেবনাগর
র	৪	ষ	৮	হিলাম,নচেৎ বর্গাক্ষর
ল	৫	স	৯	ন ইহার সহিত একা-
ব	৬	হ	১০	কৃতি হইয়া পড়ে।

এই অবর্গাক্ষর গুলিও হলন্ত এবং যে যে স্বরবর্ণ যুক্ত হইবে তত্তৎসূচিত অবর্গ স্থানে বসিবে। "অবর্গেহবর্গাক্ষরাপি"। উদাহরণ যথা :—রি = র্ + ই = ৪ × ১০০০ = ৪০০০। এইরূপ ব্ = ৮ × ১০০০০০০০ আট কোটি ইত্যাদি। দ্বিতীয় টীকায় স্বরবর্ণের বর্গস্থান দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক স্থানের পরবর্ত্তী (দশগুণিত) স্থান গুলি ঐ ঐ স্বরের অবর্গস্থান। এক্ষণে কোন রাশি লিখিতে হইলে তাহার যে কোন সংখ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া একটি বা দুইটি অঙ্ক লইয়া তৎস্থানে উপযুক্ত স্বরবর্ণ যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বসাইতে হয়। কোন লিখিত রাশির অঙ্কপাত করিতে হইলে যদি যুক্তাক্ষরের পরে স্বরবর্ণ থাকে তাহা হইলে ঐ স্বরবর্ণ

বর্গাক্ষরের পক্ষে। (হ্রস্ব দীর্ঘ সমান)

অ	১	এক	=
ই	১০	শত	=
উ	= ১০০০	অযুত	
ঋ	= ১০০০০০	নিযুত	=
ঌ	= ১০০০০০০	অর্ব্বুদ	=
এ	= ১০০০০০০০	খর্ব্ব	=
ঐ	= ১০০০০০০০০	শঙ্খ	=
ও	= ১০০০০০০০০০	সাগর	=
ঔ	= ১০০০০০০০০০০	মধ্য	=

যুক্তাক্ষরের প্রত্যেক অক্ষরে লাগিবে। গ্রি= গি×রি, স্থু=যু×কু ইত্যাদি।

কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

১। বৃহস্পতির বিবর্ত্তন কাল "গ্রি চু ভ" ইহার সঙ্খ্যা নিরূপণ কেরূপ হইবে তাহা নীচে নোটে দেওয়া হইল।

২। সৌর বিবর্ত্তন কাল "খ্যাষু"।

এইরূপ সঙ্খ্যাঙ্কের লিখনপ্রণালী বিশিষ্ট উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। ইহার উদ্দেশ্য কি? আমার বোধ হয় যাহাতে অঙ্কগুলি সহজে ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে লিখিতে পারা যায় সেই উদ্দেশেই এইরূপ সংক্ষেপে অক্ষরের দ্বারা সঙ্খ্যা ও স্থানের সূচনা করা হইয়াছে। ইহাতে অনায়াসে যে কোনও বৃত্তে বা মাত্রার শব্দ বিন্যাস করিয়া তাবৎ সঙ্খ্যাই ছন্দে লিখিত হইতে পারে।

উপরি বর্ণিত প্রথায় আমরা তিনটি বিষয় দেখিতে পাই। (১) স্বরবর্ণের হ্রস্ব ও দীর্ঘ এই ভেদ রাখা হয় নাই; (২) বর্গীয় অক্ষর গুলিকে অধুগ্ম (ওজ) স্থানে (একক, শতক, অযুত ইত্যাদি) দেওয়া হইয়াছে; (৩) অন্তঃস্থ বর্ণ চারিটি, য, ব, র এবং হ ইহাদের কেবল যুগ্ম স্থান (দশ, সহস্র, লক্ষ ইত্যাদি) দেওয়া হইয়াছে এই তিনটি নিয়মই এই প্রথার অঙ্গ। ইহার ফলে সমস্ত রাশিই ছোট ছোট শব্দে অতি সংক্ষেপে লিখিতে পারা যায়। অনেক স্থলে শ্রুতিকঠোরতা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে; বিকট সন্ধি ও সংযুক্তাক্ষর ব্যবহার করিতে হয়। যথা খ্যু; ঙ্কু, শ্ব্য, চ্ম্ল্য, শ্ল্ক্ষ্ম ইত্যাদি। উপরিলিখিত উদাহরণ দুইটি শ্রুতিকটু নহে কিন্তু প্রায়ই সংশ্লেষভেদী বিকট শব্দ আসিয়া পড়ে—মাত্রা অনুসারে ছন্দের মধ্যে চলিলেও শুনিতে এবং উচ্চারণ করিতে কষ্ট হয়। কোন সঙ্খ্যাবাচক একটা শব্দ অনেক সময় একটা দুরূহ মন্ত্রের মত শুনায়। এক জ্যোতিষী বলিয়াছেন যে এইরূপ লিখনপ্রণালী তান্ত্রিক মন্ত্র সাধনের অঙ্গই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। উপর উপর দেখিলে বাস্তবিক এই ভাবই মনে উদয় হয়; কিন্তু একটু ভাল করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে কেবল ছন্দের সৌকর্য্যার্থে ও সংক্ষিপ্ততার অনুরোধেই এই প্রথা কল্পিত হইয়াছিল। আর্য্যভটই যে এই প্রথার আবিষ্কারক তাহাও বলা যায় না। "কুসুমপুরেভ্যর্চ্চিতং জ্ঞানং" যে কেবল জ্যোতিষমাত্র বা এই লিখন ধারাও নহে তাহা স্থির করা দুষ্কর।

১। গ্রি = গি + রি; চু = চু + যু;

সুতরাং গি = গ্ + ই = ২ × ১০০ (বর্গ ইকার) = ২০০
রি = র্ + ই = ৪ × ৪০০০ (অবর্গ ইকার) = ৪০০০
চু = চ্ + উ = ৬ × ১০০০০ (বর্গ উকার) = ৬০০০০
যু = য্ + উ = ৩ × ১০০০০০ (অবর্গ উকার) = ৩০০০০০
ভ = ভ্ + অ = ২৪ × ১ (বর্গ অকার) = ২৪

একুনে ৩৬৪২২৪ বৎসর।

খ্যা = খ্ + যু; খ্ = খ্ + উ = ২ × ১০০০০ (বর্গ উ) = ২০০০০
যু = য্ + উ = ৬ + ১০০০০০ (বর্গ ঋ) = ১০০০০০
খ্যা = খ্ + ঋ = ৪ + ১০০০০০০ (বর্গ ঋ) = ৪০০০০০০

একুনে ৪৩২০০০০ বৎসর।

এ স্থলে এই প্রথার দোষগুণ বিচার করিতে হইলে এই মাত্র জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে আর্য্যভট ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও গণিতবেত্তা এই প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, এবং আর্য্যভটও ইহা অন্য কোথাও ব্যবহার করেন নাই। উদ্ভাবিত হইবার অল্প দিন পরেই ইহার ব্যবহার একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, এবং যত্নরক্ষিত পুস্তকজালের ন্যায় ইহা সেই সময়ের নিদর্শন স্বরূপ রহিয়াছে। ইহার কারণ এই প্রণালীর জটিলতা। মনে মনে কোনও রাশিকে এই নিয়মে লেখা এক-প্রকার অসম্ভব। কাগজ কলম বা খড়ি না লইলে কোন একটি বিকট শব্দ ব্যবচ্ছেদ করিয়া উহার দ্বারা কি সংখ্যা বুঝায় নিরূপণ করা অসাধ্য। মনে কর ১৫৮২২৩৭৫০০ এই সংখ্যাকে "এক শত আটান্ন কোটি বাইশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচ শত" লিখিলে যেরূপ বুঝা যায়, এবং ঐরূপ লেখাও সহজসাধ্য। "এক বৃন্দ পঞ্চ অর্ব্বুদ অষ্ট কোটি দ্বাবিংশতি লক্ষ সপ্ত ত্রিংশতি সহস্র পঞ্চ শত" এইরূপ লিখিলে যদিও একটু বেশি লম্বা হয় তথাপি দুষ্কর বা দুর্ব্বোধ্য নহে। অথবা প্রাচীন মতে "বানানাং শতং জলধির্নেত্রঞ্চ পঞ্চদ্বয়ং অহি বাণৌ চ" এইরূপ লিখিলেও স্বল্প আয়াসেই বোঝা যায় এবং একেবারে সহজেই ঐ অঙ্কটি রাখিতে পারা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান নিয়মে যদি ঐ রাশিটির নাম লিখি "ঙি শি বৃ নৃ খৃ ধৃ", তাহা হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে অক্ষর ব্যবচ্ছেদ করিয়া অঙ্কপাত না করিলে মনে মনে ঠিক করা অসম্ভব।

ঙি — ৫ × ১০০ (বর্গ ই) = ৫০০
শি = ৭ × ১০০০ (বর্গ ই) = ৭০০০
বৃ = ২৩ × ১০০০০ (বর্গ উ) = ২৩০০০০
নৃ = ১৫ × ১০৮ (বর্গ ঌ) = ১৫০০০০০০০০
খৃ ধৃ = খৃ + ধৃ ;
খৃ = ২ × ১০৭ (বর্গ ঋ) = ২০০০০০০
ধৃ = ৮ × ১০৭ (অবর্গ ঋ) = ৮০০০০০০০

মোট ১৫৮২২৩৭৫০০

ব্যবধ্ব্যুর্ব্বি ঙি

পাঠক, বিশেষতঃ গণিতজ্ঞ পাঠক পাঠিকা, বুঝুন ব্যাপার কি দুষ্কর! তাই এই বিকট উদ্ভাবনা কেবল পুঁথিগত হইয়াই রহিয়াছে।

আবার একটি গোলযোগ। দেবনাগর অক্ষরে ঌকারের আকৃতি হ্লৃ এবং ৯কারান্ত ল, লৃ, এই বর্ণের আকৃতি হ্লৃ। কোন বর্ণের সহিত সংযুক্ত হইলে উভয়ের আকৃতি সমান, হ্লৃ। কিন্তু ৯ যদি বর্গাক্ষরে যুক্ত থাকে তাহা হইলে উহার স্থান অর্ব্বুদ, এবং অবর্গাক্ষরে বৃন্দ; লৃ শব্দে পাঁচ কোটি বুঝায়। সুতরাং প্রকৃত অর্থ বুঝিতে গোল বাধে। একটী উদাহরণ যথা,—"ছ্লৃ"। বাঙলায় লিখিলে উহা ছৃ অথবা ছ্লৃ এই দুই বুঝাইতে পারে। কিন্তু উভয়ের কত পার্থক্য তাহা দেখ। ছৃ = ৭ × ১০৮ = সাত অর্ব্বুদ; ছ্লৃ = ছৃ + লৃ নিযুত + ৫ কোটি = সাতান্ন কোটি! সুতরাং বুঝা যায় যে আর্য্যভটীয় আধুনিক দেবনাগর অক্ষরে প্রথমে লিখিত হয় নাই; অথবা সেই সময়ের দেবনাগর বর্ণমালায় ৯কার ও লৃ এই দুয়ের আকৃতি এক হ্লৃ না হইয়া কোনরূপ ভিন্ন সঙ্কেত ছিল যাহাতে উভয়ের পার্থক্য প্রতীয়মান হইত। অধুনা প্রচলিত দেব-

নাগর বর্ণমালায় ঐ বিভিন্নতা লুপ্ত হইয়াছে এবং উচ্চারণের সাম্য থাকায় অক্ষরের আকৃতিরও সাম্য দাঁড়াইয়াছে।

আর্য্যভটীয় ধারার একটী বিশেষত্ব দেখা যায়। এই নিয়মে আমরা ১০০০ বা ২০০০ কে এক শব্দে লিখিতে পারি না। লিখিতে হইলে দশ শত বা কুড়ি শত লিখিতে হইবে। ইহার কারণ ১ এবং ২ বর্গাক্ষর ক ও খ দ্বারা সূচিত হয় এবং সহস্র অবর্গস্থান, কেবল অবর্গাক্ষরের অঙ্ক। দশ ও কুড়ি এই দুইটিই বর্গাক্ষর এ এবং ন দ্বারা সূচিত হয়, সুতরাং উহাতে শতসোতক টীকার যুক্ত করিয়া ১০×১০০=ক্লি, এবং ২০×১০০=ন্লি এইরূপে যুগাইয়া এক হাজার ও দুই হাজার লিখিতে হইবে। তিন হাজারের অঙ্ক অবর্গাক্ষর ঘ থাকায় ঘি হইবে। ঐ স্থলে ইকারের অবর্গস্থান সহস্র লইতে হইবে। সেইরূপ এক লক্ষ বা দুই লক্ষ লিখিতে হইলে দশ অযুত (এ্য) এবং কুড়ি অযুত (ন্য) লিখিতে হইবে। দশ সখ্যাসোতক বর্গাক্ষর এ এবং অবর্গাক্ষর হ উভয় বর্ণই আছে। কিন্তু এ্য এই অক্ষরে কেবল বর্গস্থান অধিকার করে বলিয়া উহাতে দশ, সহস্র, লক্ষ ইত্যাদি ($১০^১$, $১০^৩$, $১০^৫$ ইত্যাদি) সখ্যাই বুঝাইবে, এবং হ অবর্গাক্ষর কেবল অবর্গস্থান অধিকার করে বলিয়া উহাতে শত, অযুত, নিযুত ইত্যাদি ($১০^২$, $১০^৪$, $১০^৬$ ইত্যাদি) সখ্যাই বুঝাইবে। কিন্তু হ দ্বারা যে সব সখ্যা বুঝায় (শত, অযুত ইত্যাদি) সেই সমস্ত সখ্যাই আবার বর্গাক্ষর ক (=১) দ্বারা বুঝাইতে পারে। যথা এক শত=১×১০০ (কি) অথবা ১০×১০ (হ); এক অযুত=১×১০০০০ (কু) অথবা ১০×১০০০ (হি); এক নিযুত=১×১০০০০০০ (কৃ) অথবা ১০×১০০০০০ (হ); ইত্যাদি।

যতই দোষ থাকুক, আর্য্যভটীয় আমাদের নিজস্ব। গ্রীস্ অথবা ইউরোপীয় অন্য কোনও প্রাচীন দেশে এরূপ চমৎকার ও সুমহান্ ব্যাপার দেখা যায় না। ইহা কেবল শাকারভোজী একনিষ্ঠ তত্ত্ববিৎ ভারতীয় ঋষির মস্তিষ্কেই সম্ভবে। তথাপি দুই একটী "সভ্য" আছেন যাঁহারা মনে করেন যে এই বিরাট অঙ্ক লিখন প্রথার বীজ প্রাচীন গ্রীসে নিহিত! প্রমাণ নাই—তাহাতে কি হয়? তাঁহাদের এক ধুয়া "Knowing the Greek source of the greater part of the astronomy, ect., which we have in the আর্য্যভটীয় and subsequent works, we naturally think of the possibility of a similar origin for this system of numeration." ওহো! কি সুযুক্তি!

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পালিভদ্র কোথায় ?

ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই পালিভদ্র বা পালিবোথরার নাম শুনিয়াছেন। এই পালিভদ্রের অবস্থান সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি কথা বলিব।

সকলেই জানেন, ভারতের সুখসমৃদ্ধির কথা শ্রবণ করিয়া ম্যাসিডোনিয়ার অধিপতি আলেকজন্দার নানা দেশ জয় করিয়া ও নানারূপ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পঞ্চনদ-প্লাবিত পঞ্চাবে প্রবেশ করেন। পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। ইতিহাস পাঠে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহাতে তৎপূর্ব্বে আর কোন পাশ্চাত্য জাতি ভারতে আসিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। অনেকে বলেন, পারস্যপতি দারায়স্ তৎপূর্ব্বে ভারতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আলেকজন্দারের ভারতাগমন অবিসংবাদী সত্য ঘটনা। তাঁহার পুরুরাজের সহিত সংগ্রামের কথাও কেহ অস্বীকার করেন না।

আলেকজান্দার পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ভারতের শস্যশ্যামলক্ষেত্র, ভারতের রত্নাদি, ভারতের পর্ব্বত ও নদী, ভারতের শ্রীসম্পন্ন নগরাদি দর্শন করিয়া আলেকজন্দার বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, পুণ্যতোয়া ভাগিরথী যে সকল প্রদেশ প্লাবিত করিয়া সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে, সে সকল দেশ অধিকতর উর্ব্বর ও সুন্দর। জাহ্নবীর ন্যায় নদী যে জগতে নাই, সে সংবাদ তাঁহার কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। সুতরাং এই গঙ্গাদর্শনে—যে সকল স্থানের মধ্য দিয়া বিষ্ণুপাদোদ্ভবা, হরজটাবিহারিণী জাহ্নবী প্রবাহিতা হইয়াছে, সেই সকল দেশ অধিকারে—তাঁহার প্রবল বাসনা উদ্দীপিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার শ্রান্ত ক্লান্ত সৈন্যগণ একবাক্যে আর অগ্রসর হইতে অসম্মত হইল। তখন তিনি ক্ষুণ্ণ মনে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। এই প্রত্যাবর্ত্তনের পথ আগমনের পথ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইল। স্বদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে—কেবল স্থলপথের উপর নির্ভর না করিয়া, জলপথের আবিষ্কারেও—তিনি মনোনিবেশ করেন। সমুদ্রপথ আবিষ্কারেও তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

আলেকজন্দারের অন্যতম সুযোগ্য সেনাপতি ও প্রতিনিধি সেলুকাস ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে সামান্য যত্নবান ছিলেন না। আলেকজন্দার অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার স্থাপিত সুদূর পঞ্চনদ-রাজ্যের মূলভিত্তি অপেক্ষাকৃত শিথিল হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। সে সময়ে প্রাসজী-অধিপতি চন্দ্রগুপ্ত প্রবল পরাক্রমে হিন্দু-সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যাপৃত ছিলেন। পঞ্চনদ প্রদেশস্থ যে কয়টী নগরে আলেকজন্দারের বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল, সেই নগরগুলি স্বরাজ্যভুক্ত করিবার নিমিত্ত চন্দ্রগুপ্ত সচেষ্ট হন। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বিদেশী ম্যাসিডোনিয়ান সৈন্য অবস্থান করিবে, ইহা চন্দ্রগুপ্তের সহ্য হইল না। কাজেই তাঁহার বিপুলবাহিনী আলেকজন্দারের অর্জ্জিত রাজ্যাধিকারে উদ্যত হইল। সেলুকসও বলপরীক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত

হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এণ্টিগোনাস্ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হওয়ায় সেলুকসকে ভারতভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।

সেলুকাসের ভারতাধিকারের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক জষ্টিন যে আভাস প্রদান করিয়াছেন, (১) আমরা তাহার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে অক্ষম। প্লুটার্ক বলেন, আলেকজন্দার অপেক্ষা সেলুকাস ভারতের অধিকতর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্লুটার্ক সেলুকাসের চরিত্রাদি বর্ণনাকালে যেরূপ লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, যদি তাঁহার রাজ্য সম্বন্ধীয় ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক বর্ণনায় তদ্রূপ লেখনী চালনা করিতেন, তাহা হইলে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারা যাইত। প্লিনি বলেন, আলেকজন্দার ভারতের যে অংশ জয় করিয়াছিলেন, সেলুকস তদপেক্ষা অধিকদূর প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। প্লিনির মতে, গঙ্গা যেখানে সাগরসঙ্গে পতিত হইয়াছে, সেলুকস তদূর পর্য্যন্ত—গিয়াছিলেন। সেলুকসের এই দেশজয়ে পালিভদ্রের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।(২) মুলো বেয়ার বলেন, প্লিনির কথামত সেলুকস ২২৪৪ রোমান মাইল অগ্রসর হইয়াছিলেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল ডাক্তার উইলিয়ম রবার্টসন ডি ডি বলেন, সেলুকাসের এই অভিযান অসম্ভব ব্যাপার। সেলুকস সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত গমন করিলে ঐ সকল প্রদেশের ভৌগলিক, ঐতিহাসিক এবং অন্যান্য বর্ণনা প্রাচীন ইতিহাসে নিশ্চয়ই পরিদৃষ্ট হইত, এবং ঐসকল অধিকৃত প্রদেশের প্রকৃত বৃত্তান্তাদি তদানীন্তন কালের পাশ্চাত্য জাতি অবগত থাকিতেন।

৩২১—২৯৭ খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীতে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয় হয়। সেলুকসের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যসীমা পঞ্জাবের গ্রীক সাম্রাজ্যের সীমান্তে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। (৩) চন্দ্রগুপ্ত মগধ রাজ্যেশ্বর হইলেও তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্যের যে বিবরণী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার পালিভদ্র নগরের অবস্থান সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

সেলুকস যখন ইউফ্রাটিস নদীতীরে প্রতিদ্বন্দ্বী এণ্টিগোনাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে বাধ্য হন, তখন তাঁহার চতুর কর্ম্মচারী ম্যাগাস্থিনিসকে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় দূতস্বরূপ রাখিয়া যান। ম্যাগাস্থিনিস বহুবৎসর যাবৎ পালিভদ্র নগরে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই পালিভদ্র চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল কি না, তাহা নিঃসংশয়রূপে বলা যাইতে পারে না। মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র সে সময়ে কুসুমপুর এবং পুষ্পপুর নামেও অভিহিত হইত। অজাতশত্রু নামক নরপতি খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮১ অব্দে এইস্থানে রাজত্ব করেন। তিনি পাটলি নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া উহার প্রসিদ্ধিবিস্তারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। এই পাটলিপুত্র

(১) Justin lib XV. c. 4.
(২) Pliny Nat. Hist, lib VI. c. 17.
(৩) Strabo lib XV. p. 1028.

আধুনিক পাটনার কিয়দ্দূরবর্ত্তী স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাকেই গ্রীকেরা পালিবোথরা নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, অনেক ঐতিহাসিক এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এরূপ সিদ্ধান্তের কোন কারণ দেখিতে পাই না। কারণ পালিভদ্র যাবনিক শব্দ নহে। উহা যদি পাটলিপুত্রের অন্যতম নাম হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রামাণিক সংস্কৃতাভিধানে উহার উল্লেখ দেখিতে পাইতাম। সংস্কৃত অভিধানাদিতে পাটলিপুত্রের অন্যতম নাম কুসুমপুর বা পুষ্পপুর বলিয়া উল্লেখ আছে।

পাটলিপুত্রের অপভ্রংশ পালিবোথরা না হইয়া পালিভদ্রের অপভ্রংশ পালিবোথরা হওয়াই সুসঙ্গত। মেজর রেনেল পালিভদ্রের অবস্থান সম্বন্ধে যাহা নির্দ্দেশ করেন, তৎসম্বন্ধে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক মতে পালিভদ্র গঙ্গা ও হিরণ্যবহা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। আরিয়ান বলেন, পালিভদ্র গঙ্গা এবং হিরণ্যবহা নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত। এই হিরন্যবহার বর্ণনাকালে তিনি বলিয়াছেন, হিরণ্যবহা নদী যদিও গঙ্গা ও সিন্ধু অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু অন্যান্য নদী অপেক্ষা বৃহত্তর ও প্রবলতর ছিল (৪)। গঙ্গার নিম্নেই যে যমুনা স্থান পাইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। আরিয়ানের বর্ণনা পাঠে উপলব্ধি হয় যে, তিনি গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলেই পালিভদ্রের অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শোণ নদের অপর নাম হিরণ্যবহা, তাহা সকলেই জানেন। গ্রীক ইতিহাসবেত্তারা হিরণ্যবহাকে (Erannabois) ইরাণাবোয়স বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু নানা কারণে তাঁহাদিগের এই উক্তির সমীচীনতা স্বীকার করিতে পারি না। আমাদিগের মনে হয়, উহা যমুনার নামান্তর।

এই পালিভদ্র যে প্রয়াগ (বর্ত্তমান এলাহাবাদ)—পাটনা বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থান নহে—তৎসম্বন্ধে কয়েকটী প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মোগল সম্রাট আকবরসাহ এখানে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া ইহার এলাহাবাদ নামকরণ করেন। এলাহাবাদের হিন্দুনাম প্রয়াগ। প্রয়াগ অতি প্রাচীন নগর —হিন্দুর প্রাচীন পবিত্র তীর্থ। প্রয়াগবাসীদিগকে প্রয়াগী আখ্যা প্রদান করা হয়। এই প্রয়াগী শব্দের সহিত "প্রাসঈ" শব্দের বিশেষ সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, "প্রাসঈর" রাজধানী পালিভদ্র ছিল। (৫) প্রয়াগ দুর্গে এখনও সম্রাট অশোকের কীর্ত্তিস্তম্ভ বিরাজ করিতেছে। মগধ রাজ্য যে প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং উহা এক সময়ে রাজধানীরূপে পরিগণিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা কোনমতে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না।

মেজর রেণেলের মতে, পাটলিপুত্রের অন্য নাম পালিভদ্র। তাঁহার ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার দুইটী কারণ পরিলক্ষিত হয়। পালিভদ্র যে দুইটী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত

ছিল, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। বর্ত্তমান পাটনা নগরের কিয়দ্দূরে মৃত্তিকাগর্ভে একটী নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাকেই পাটলিপুত্র বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। যাঁহারা পাটলিপুত্রকে পালিভদ্র বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন, তাঁহারা বলেন, পূর্ব্বে এই স্থানে শোণ নদের সহিত গঙ্গা সম্মিলিত হইয়াছিল। কাজেই নদী-সঙ্গমে পালিভদ্র অবস্থিত বলিয়া যে বর্ণনা আছে, তাহার সহিত ইহার বর্ণনার ঐক্য আছে।

এখন তর্কানুরোধে যদি স্বীকারই করা যায় যে, এই স্থানে শোণ নদের সহিত গঙ্গা পূর্ব্বে সম্মিলিত হইয়াছিল, তাহার পর, কালবশে—ভারতীয় নদীর স্বাভাবিক ধর্ম্মানুসারে—শোণ ও ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় উভয় নদীই এক্ষণে বহুদূরে অবস্থান করিতেছে—উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বহুক্রোশ হইয়াছে, তথাপি প্রাচীন ইতিহাসে গঙ্গার ও তৎসম্মিলিত নদীর যে বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সহিত শোণের সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয় না—বরং বিস্তর পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয়। শোন কখনই যমুনার ন্যায় প্রবল ছিল না। ইতিহাসবেত্তা আরিয়ান স্পষ্টই বলিয়াছেন,* গঙ্গা ও সিন্ধুর নিম্নেই যে নদী প্রবলা, সেই নদীর সহিত গঙ্গা যথায় সম্মিলিত হইয়াছে, সেই সঙ্গমস্থলে পালিভদ্র নগর অবস্থিত। কাজেই আমরা পাটলিপুত্র অপেক্ষা প্রয়াগকেই পালিভদ্র নগরের অভ্রান্ত নাম বলিয়া স্থির করিতে বাধ্য।

মেগাস্থিনিসের দ্বিতীয় যুক্তি, তক্ষশীলা (বর্ত্তমান এটক নগর) হইতে গঙ্গার মোহনার দূরবর্ত্তিত্ব। এ সম্বন্ধে রেণেল সাহেব প্লিনির বৃত্তান্ত বা তালিকা পাঠে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। (৬) প্লিনিকৃত এই দূরবর্ত্তিতার তালিকা যে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। প্লিনির হিসাব ধরিলে পালিভদ্র নগর গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের ৪২৫ মাইল দূরে অবস্থিত বলিতে হয়। কিন্তু এলাহাবাদ হইতে পাটনা প্রায় দুই শত মাইল দূরবর্ত্তী হইবে। এই হিসাবে পাটলীপুত্রকে পালিভদ্র বলিয়া স্বীকার করিতে কেহ সম্মত হইবেন কি? হয় বলিতে হইবে, প্লিনির হিসাব ভ্রমসঙ্কুল, নতুবা স্বীকার করিতে হইবে, গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল বর্ত্তমান সময়ে যেখানে আছে, তথা হইতে সে সময়ে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল। পেরোক্ত তর্ক, কেহই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না। কারণ, প্রয়াগ আধুনিক নগর নহে—পুরাণেতিহাসেও ইহার বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল যে পরিবর্ত্তিত হয় নাই, তৎসম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

মেগাস্থিনিস যখন পঞ্জাব হইতে পালিভদ্রে গমন করেন, তখন যে সকল স্থান অতিক্রম করিয়াছিলেন, সে দেশগুলি জলাকীর্ণ, শস্যাদিপূর্ণ বলিয়া উল্লিখিত আছে। পাঞ্জাব হইতে মগধে যাইতে হইলে এলাহাবাদ অতিক্রম করাই সম্ভবপর। বিশেষতঃ গ্রীকেরা পূর্ব্বাপর শুনিয়াছিল যে, যে

(৬) Nat. Hist. lib VI c. 17.

সকল প্রদেশ দিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছে, সেই সকল প্রদেশ ধনধান্যপূর্ণ, সমৃদ্ধিশালী ও বহুজন অধ্যুষিত। ভাগীরথীর বর্ণনায় আকৃষ্ট হইয়া গ্রীকেরা বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত অভিযান করিতে সর্ব্বদাই সমুৎসুক ছিল। এরূপ স্থলে, গঙ্গার সৈকতভূমি পরিত্যাগ করিয়া মেগাস্থিনিসের অন্য পথ অবলম্বন করাও সম্ভবপর নহে। লাহোর হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত প্রদেশগুলির শ্রীসমৃদ্ধি অবলোকন করিয়া মাগাস্থিনিস মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং তাহাই শতমুখে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পালিভদ্র সম্বন্ধে মাগাস্থিনিসের বর্ণনা পাঠে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, তিনি প্রয়াগের বর্ণনাই করিয়াছেন। এই খানেই তিনি চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাৎলাভ করেন। সে সময়ে ভাগীরথীতীরে চন্দ্রগুপ্ত সৈন্যসহ অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বলেন, পালিভদ্র অতি বৃহন্নগর ছিল। উহা দৈর্ঘ্যে অন্যূন দশ মাইল বা পাঁচ ক্রোশ, প্রস্থে দুই মাইল বা এক ক্রোশ ছিল। পালিভদ্র চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। উহাতে ৬৪টী তোরণ-দ্বার ও ৫৭০টী গম্বুজ ছিল। পাটলিপুত্রের যে ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে উহার ঐরূপ বিস্তৃতি ছিল বলিয়া অনুমিত হয় না। বরং প্রয়াগকেই ঐরূপ নগর বলিয়া স্থির করিতে ইচ্ছা হয়।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রতিশোধ।

মাধবেশ্বর ও মাণিকলাল এক পিতামহের সন্তান এবং সরিকি বিবাদহিসাবে উভয়ে উভয়ের পরম শত্রু!

যেখানে রক্তের যত নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান, শত্রুতার তীব্রটাও সেখানে তত বেশী, প্রবীণেরা এরূপ বলিয়া থাকেন! এ ক্ষেত্রেও ইহার ব্যত্যয় ঘটে নাই!

সামান্য খুঁটীনাটী অবলম্বন করিয়াও উভয় পক্ষের 'লাঠিয়ালগণ' সমান তেজে বীরত্ব প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতনা, সুতরাং মীমাংসা ও সামঞ্জস্যের মধ্যে আসিবার কোনো সম্ভাবনা আপাততঃ দেখা যাইতনা।

মাধবেশ্বর ও মাণিকলাল উভয়েরই ভূসম্পত্তি ও নগদ সম্পত্তি-যথেষ্ট! ক্ষুদ্র পল্লী-গ্রামে তাহাদের বাস; গ্রামবাসীগণ ক্রমে ক্রমে দুই দলে বিভক্ত হইয়া, কেহ মাধবেশ্বরের, কেহ মাণিকলালের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল!

মনোমালিন্যের সূত্রপাতেই মাণিকলালের পিতা পৈতৃক ভদ্রাসনের পার্শ্বস্থ ভূখণ্ডে নিজের বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিলেন; এবং ছোট একটা রাস্তা বাহির করিয়া পুরাতন বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তার সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়াছিলেন!

বাড়ীর সম্মুখেই স্থাপিত দেববিগ্রহ সিদ্ধেশ্বরীমূর্ত্তি; কোনও স্থানে বা কার্য্যে যাইবার পূর্ব্বে এই সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীতে প্রণাম করিয়া যাওয়াই এই পরিবারের প্রাচীন রীতি!

এখন মাণিকলালের পিতা তাঁহার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যে ছোট রাস্তা বাহির করিয়া-

ছিলেন, সে রাস্তা তিনি ঠিক সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীর সম্মুখেই পুরাতন ভস্রাসনের রাস্তার সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই পূর্ব্বাচরিত রীতি অনুযায়ী সিদ্ধেশ্বরী প্রণাম করিবেন।

বলা বাহুল্য, দেবমন্দির ও মন্দির সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র ভূখণ্ড উভয় পক্ষেরই সাধারণ সম্পত্তি!

কিন্তু ইহাতেও এক গোল উঠিল! প্রতিবৎসর বিজয়ার দিন প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে যাইবার সময় ও বিসর্জ্জন দিয়া ফিরিবার পথে, উভয় পক্ষ সিদ্ধেশ্বরী মন্দির যথারীতি প্রণাম করিতে আসিত! এবং পূজার কয়-দিনও উভয় পক্ষ হইতে দেবালয়ে পূজা দেওয়া হইত! সুতরাং কোন্ পক্ষ আগে পূজা দিবে এবং প্রণাম করিয়া যাইবে, ইহা লইয়া প্রতিবৎসরই একটা অনর্থক বিবাদের সৃষ্টি এই সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীতেই হইত!

তার পর উভয় পক্ষ পালাক্রমে এক এক বৎসর পূজা দিবে এবং প্রণাম করিয়া যাইবে, এমনি একটা সাময়িক মীমাংসাও মধ্যে হইয়াছিল।

(২)

আবার মায়ের পূজা আসিয়াছে! উৎসাহ ও আনন্দে বাঙ্গলার পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে!

গত বৎসর যাদবেশ্বর সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে আগে পূজা দিয়াছে, এবং প্রণামও করিয়াছে। এবার মাণিকলালের পালা!

সপ্তমীর প্রভাত! শেফালিকার গন্ধ আর প্রভাতী সানাইয়ের করুণ রাগিণী, একটা অপূর্ব্ব আনন্দ সংবাদ দিকে দিকে প্রচার করিতেছিল।

যাদবেশ্বরের পত্নী সুরমা আসিয়া কহিল, "ওগো, পূজাটা আজ প্রথম দেওয়া যায় না?"

—"কোন্ পূজা?"—ধূমপান নিরত যাদবেশ্বর কহিল।

"এই সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীর পূজা"—

"তা' আর কি ক'রে হয়, এবার ওদের পালা,"—

"ওগো, আমি যে খোকার বামো'র সময় 'মানত' করেছিলেম্"—

যাদবেশ্বরের ললাট কুঞ্চিত হইল!

"তা' না দিলে অমঙ্গল হবে যে"—কাতর কণ্ঠে সুরমা কহিল!

"বাঃ, এ নিয়ে কি এখন একটা লাঠালাঠি কর্‌ব?"—বিরক্তির স্বরে যাদবেশ্বর কহিল!

"তা' একবার ঠাকুরপো'কে বলে' পাঠাও না কেন!"

সুন্দরী স্ত্রীর আব্দার; বিশেষ যাদবেশ্বরও একটু"—"ছিলেন! ত'া সেটা লোকে বলে! আমরা ততটা বিশ্বাস করিনা!!

যাদবেশ্বর মাণিকলালের নিকট লোক পাঠাইল।

মাণিকলাল উত্তর দিল শুধু ছোট্ট দুটি কথায়—

"তা' অসম্ভব!"

সংবাদবাহী সেটাকে অবশ্য পল্লবিত করিয়া বলিয়া গেল!

যাহারা 'বিবাদ বাধাইয়া' মজা দেখিতে চাহে, তাহাদের এমনি ভাবে একটু আধটু বাড়াইয়া না বলিলে চলে না।

(৩)

যথা সময়ে মাণিকলালের পক্ষ পূজা দিতে

আসিয়া দেখিল, যাদবেশ্বর নিজেই উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার পূজা দেওয়াইতেছেন! মন্দিরসম্মুখস্থ অপরিসর ভূখণ্ড লাঠিয়ালে পরিপূর্ণ!

মাণিকলালের পক্ষ প্রস্তুত ছিলনা। সহজেই তখন হঠিয়া আসিল! ক্ষুণ্ণমনে মাণিকলাল গেয়ে যাইয়া পূজা দিয়া আসিল!

অষ্টমী ও নবমী পূজার দিন বিশেষ কোনও গোল হইল না!

তার পর আসিল বিজয়ার দিন! কূটবুদ্ধি যাদবেশ্বর বুঝিয়াছিল, মাণিকলাল চুপ করিয়া থাকিবার 'পাত্র' নহে! বিজয়ার দিন একটা গোল বাধাইবেই!

প্রথমেই মাণিকলালের বাড়ীর প্রতিমা বাহির হইয়া গেল! সঙ্গে দু'চারিজন লোক! তার পর যাদবেশ্বরের বাড়ীর প্রতিমা বাহির হইয়া গেল! যাদবেশ্বর লোকজন সঙ্গে নিয়া সগর্ব্বে সিদ্ধেশ্বরী বাড়ী প্রণাম করিতে গেল! এবার মাণিকলালের লোক বাধা দিল! মাণিকলাল পূর্ব্ব হইতে সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ী লাঠিয়াল 'জমা' করিয়া রাখিয়াছিল!

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে 'দাঙ্গা' চলিল! যাদবেশ্বরের লাঠিয়ালেরা মাণিকলালের পক্ষের লোকের লাঠির চোট সহ্য করিতে না পারিয়া হঠিয়া আসিল!

এমন সময়ে যাদবেশ্বরের বাড়ীর সদর দরজা খুলিয়া গেল! প্রায় পঁচিশ জন "যোয়ান্" লাঠিয়াল বাহির হইয়া আসিয়া—মাণিকলালের পরিশ্রান্ত লোকগুলির উপর লাঠি চালাইতে লাগিল! শেষ পর্য্যন্ত যুঝিয়া মাণিকলালের লাঠিয়ালগণ পিছে হঠিল—একেবারে মাণিকলালের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল! রোষে, ক্ষোভে মাণিকলাল বাড়ী ফিরিয়া আসিল!

প্রতিমা বিসর্জ্জনান্তে যাদবেশ্বরের দল যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন সেই ক্ষুদ্র বিজয়ীদলের আনন্দ কলরবে ও ঢক্কা নিনাদে ক্ষুদ্র গ্রামখানি মুখরিত হইয়া উঠিল!

(৪)

দুপুর রাত্রে হঠাৎ একটা গোলমাল শুনিয়া মাণিকলালের নিদ্রাভঙ্গ হইল। পত্নী পঙ্কজকে ডাকিয়া মাণিক জিজ্ঞাসা করিল—

'কিসের গোল এ?"—

"চল ছাতে গিয়া দেখিব!"—তখন কম্পিত পদে উভয়ে ছাতে গিয়া উঠিল! ছাতের আলিসার উপর বুকে ভর দিয়া উভয়ে চাহিয়া দেখিল—যাদবেশ্বরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ প্রজ্জ্বলিত মশালের আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে! অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত কতকগুলি ছদ্মবেশী লোক ছুটাছুটি করিতেছে! কি ব্যস্ততা তাহাদের!!

মাণিকলাল অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"সর্ব্বনাশ, ডাকাত পড়েছে যে!

"ওমা, সেকি?"—কম্পিতকণ্ঠে পঙ্কজ কহিল!

"পঙ্কজ, নেমে যাও মার কাছে!"—উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে মাণিকলাল নামিয়া গেল! বাহিরের শত্রু দেখিয়া ঘরাউ বিবাদ সে ভুলিয়া গেল। এখানে যাদবেশ্বরের স্বার্থ ও তাহার স্বার্থ যে একই,—তাহার অন্তরাত্মা সে কথা তাহাকে বুঝাইয়া দিল।

চণ্ডীমণ্ডপে লাঠিয়ালেরা ঘুমাইতেছিল।

মাণিকলাল নিঃশব্দে তাহাদের উঠাইল; তারপর তেমনি নিঃশব্দে নিজেও লাঠি হস্তে যাদবেশ্বরের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল!

মুহূর্ত্তের মধ্যে সেখানে এক তুমুল কোলাহল উঠিল! শুধু চীৎকার, আর লাঠির শব্দ!

কয়েক মিনিটের মধ্যে ডাকাতের দল, বেগতিক দেখিয়া, সুশিক্ষিত সৈন্যের ন্যায় সরিয়া পড়িল!

কিন্তু উভয় দলের লাঠিয়ালে তখন সংগ্রাম বাধিল। যাদবেশ্বর জানিলেন—মাণিকলালেরই এ কীর্ত্তি। তিনি সেই আলোকিত প্রাঙ্গণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বয়ং উত্তেজিতকণ্ঠে তাঁহার লাঠিয়ালদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। সেই উত্তেজনাকোলাহলে মাণিকলাল এবং তাহার দলের কথা শূন্যে বিলীন হইতে লাগিল। মাণিকলাল আত্মরক্ষা করিতে করিতে সহসা এক দারুণ লাঠির আঘাতে ভূপাতী হইয়া পড়িলেন। তখন সহসা যেন সকলের নেশা ছুটিয়া গেল—মুহূর্ত্তে লাঠিয়ালগণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল,—মাণিকলালের দল হায় হায় করিয়া কাঁদিয়া কহিল—"বাবুমশয় যে আমাদের নিয়ে এখানে এল, ডাকাতের হাত থেকে তোদের বাঁচাতে—আর তোরা কিনা তাকেই মারলি!"

যাদবেশ্বর তখন সব বুঝিলেন,—মাণিকলালের কাছে বসিয়া কাতরকণ্ঠে ডাকিলেন—মাণিক—

মাণিক বলিল—দাদা—

ভ্রাতাকে জীবিত দেখিয়া যাদবেশ্বর রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কম্পিতবক্ষের মধ্যে তাহাকে টানিয়া লইলেন,—অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—মাপ কর ভাই, মাপ কর।

মাণিকলাল কাতর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল—'দাদা—প্রণাম—আজ এ বিজয়ার মিলন।'

বলিতে বলিতে ভ্রাতার আলিঙ্গন মধ্যে সে মূর্চ্ছিত, নীরব হইয়া পড়িল! এইরূপে ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধ-দ্বন্দ্ব বিজয়ার দিনে এই শোক ঘটনায় চির মিলনে পর্য্যবসিত হইল।

প্রেম।

ওরে প্রেম তবে সঙ্গোপন,
অগাধ সাগর জলে কোথায় আছিস ক'লে
শুক্তি মাঝে মুক্তার মতন
দরিদ্রের আশাতীত ধন!

শুভ লগ্নে দুর্লভ নিমেষে
দূরতম স্বর্গ ছাড়ি স্বাতির অমৃত বারি
অপার সমুদ্রে পড় এসে
অতুলন সৌন্দর্য্যের বেশে।

বিশ্ব মাঝে ত্রিদিবের সার—
প্রাণপণ সাধনায় যে তোরে খুঁজিয়া পায়
অতলের তল মিলে যায়—
মর্ত্ত্য জন্ম সার্থক তাহার!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস।*

মাতৃভূমিক রজনীকান্ত গুপ্ত আইনব্যবসায়ে মাতৃসেবা করিয়াছেন। তাহার ফল এই মহাকায় বঙ্গরূপ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস। এই ইতিহাস পূর্ব্বে খণ্ড খণ্ড আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা পূর্ণকলেবরে পরিপুষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই অমূল্য গ্রন্থের গবেষণা, চেষ্টা, ও পরীক্ষিত সত্যঘটনা এমন বিশদ ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যে পড়িতে পড়িতে হৃদয় এক অদ্ভুতপূর্ব্বভাবে পূর্ণ হয় এবং তাহারি সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকারের সর্ব্বত্যাগী অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা মনে আসিয়া তাঁহার অকাল মৃত্যুতে লোকে ব্যথিত হইতে হয়। আমাদের বঙ্গসাহিত্যে কাব্য নভেলাদি, উপন্যাস প্রভৃতির অভাব নাই কিন্তু এ প্রকার ইতিহাস এই প্রথম। ইহা সূচনা হইতে পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত এরূপ সত্য ঘটনার সমাবেশে জীবন্ত ভাব পরিপূর্ণ যে পড়িতে পড়িতে সব যেন প্রত্যক্ষ দৃষ্টি গোচর হয় এবং অতীত ঘটনার শোচনীয় উপসংহারে হৃদয় নিষ্পিষ্ট হইয়া উঠে। ইতিহাসের সত্য নির্ণয় করিতে রজনীকান্ত যে বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা এই গ্রন্থ পাঠে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই অত্যধিক পরিশ্রমে গ্রন্থকারের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া অকালে মৃত্যু হয় নতুবা আমরা আরও কত ঐতিহাসিক রত্নের বিশুদ্ধ তত্ত্ব অবগত হইতে পারিতাম এবং তাঁহার সার্থক শ্রমসম্ভূত আরও কত উপাদেয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডার অলঙ্কৃত করিত সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশে বীরত্ব বা সাহসের যে অভাব নাই, রাজভক্তি প্রভুভক্তিও যে অসাধারণ এই পুস্তকের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে তাহা জাজ্বল্যমান। লেখকের বিচিত্র বর্ণনায় এই সকল ঘটনা উপন্যাস হইতেও মনোমুগ্ধকর, পাঠকালে উৎসাহে যেন মন উত্তেজিত হইয়া উঠে। আমাদের স্থান সঙ্কীর্ণ, তথাপি আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটি স্থল উদ্ধৃত করিবার লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না।—

চতুর্থ ভাগ, ১৭ পৃষ্ঠা। "দিল্লীর যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে একজন সৈনিক পুরুষ লিখিয়াছেন,—"একদা যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে আমার কামানসমূহ বৃক্ষের পার্শ্বভাগে আনীত হইয়াছিল। আমি গোলাবৃষ্টি করিয়া, বিপক্ষদিগকে অগ্রসর হইতে বাধা দিয়াছিলাম। যাহারা আহত হইয়াছিল, তাহাদিগকে তুলিতে করিয়া পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলাম। আমার একজন ভারতবর্ষীয় কামান-পরিচালকের পায়ে গুলি লাগিয়াছিল, ইহাতে তাহার হাঁটুর নীচের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। যে সকল ঘোড়ায়রা কামান পরিচালিত হইতেছিল, এই আহত ব্যক্তি তদসমুদায়ের একটির উপর অধিষ্ঠিত ছিল। আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, কামান থামাইতে বলিলাম এবং তাহাকে ঘোড়া হইতে নামাইতে চাহিলাম। সে কহিল, "সুর পরওয়া নেহি সাহিব।" আমি যদি পীড়াপীড়ি করিয়া, তাহাকে ঘোড়া হইতে না নামাইতাম এবং তুলিতে না তুলিয়া দিতাম, তাহা হইলে সে ঘোড়ার উপরেই থাকিত। আমার যে সকল ভারতবর্ষীয় লোক ছিল, তাহারা এই ভাবে সাহসের পরিচয় দিয়াছিল।"

পঞ্চম ভাগ, ৭৩ পৃষ্ঠা। "এই সঙ্কটকালে ইউরোপীয়দিগের এতদ্দেশীয় ভৃত্যগণ প্রভুভক্তির ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পরাঙ্মুখ হইল না, তাহারা বন্দুক পিস্তল প্রভৃতি অস্ত্র আনিয়া আপনাদের প্রভুদিগকে দিল। এই সময়ে যদি সিপাহীদিগের মধ্যে ঐক্য থাকিত, তাহা হইলে ইউরোপীয়দিগের কেহই তাহাদের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইতেন না। * * যখন সিপাহীগণ উত্তেজিত

* রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। দুইখণ্ডায় দুই খণ্ডে সমাপ্ত, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৩৲ টাকা। প্রথম খণ্ডে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এবং দ্বিতীয় খণ্ডে চতুর্থ পঞ্চম ভাগ সন্নিবেশিত। ৩০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি হইতে প্রকাশিত।

হইয়া ফিরিঙ্গীর পোষিতে আপনাদের বলবতী হিংসার তৃপ্তি সাধনে উদ্যত হইয়াছিল, তখন তাহাদের দলের অনেকেই সেই বিপদ ও তাহাদের স্বজাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত ফিরিঙ্গীর জীবন রক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিল। শাহাজাদপুরেও এইরূপ প্রায় ১০০ প্রভুভক্ত সিপাহী তাহাদের অফিসারদিগের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়।

যজ্ঞদীকান্ত গুপ্ত।

এইরূপে হতাবশিষ্ট ইউরোপীয়দিগের জীবন বিপদের হইয়া উঠে।"

একটি রমণীর সাহসের ঘটনাও এখানে উল্লেখযোগ্য। চতুর্থ ভাগ, ১০৫ পৃষ্ঠা। "পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের একটি কৃষকতনয়ার পরাক্রমে অনিষ্টে- কারক সময়ে ইংরেজ সৈন্য যেরূপ বিস্ময়স্তম্ভিত

হইয়াছিল, শিবিরে ইংরেজদের শিবিরস্থিত সৈনিকেরা একটি মুসলমানমহিলার পরাক্রমদর্শনে সেইরূপ ভীত ও বিস্মিত হইয়াছিল। এই নারী অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত ও অশ্বে অধিষ্ঠিত হইয়া, ইংরাজসৈন্য আক্রমণ করিয়াছিল। * * * উক্ত মহিলা শেষে অবরুদ্ধ হইলে সেনাপতি উইলসনের আদেশে সুচিকিৎসিত হয়। তাহার আবির্ভাবে মুসলমানসৈন্য অধিকতর উৎসাহযুক্ত ও উত্তেজিত হইবে ভাবিয়া, কাপ্তান হডসন্ তাহাকে পুনর্ব্বার বন্দী করিতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে এই নারী পুনর্ব্বার অবরুদ্ধ হইয়া অম্বালায় প্রেরিত হয়। ইংরেজের শিবিরে এইরূপ রোমাঞ্চ আর্কের আবির্ভাব উপস্থিত যুদ্ধের ইতিহাসে অতি বিস্ময়কর ঘটনা নহে।"

ইংরাজ সেনাপতিগণও তাঁহাদের অধীনস্থ সিপাহীগণকে কিরূপ ভালবাসিতেন—নিম্নলিখিত ঘটনাটি তাহার দৃষ্টান্তস্থল। চতুর্থ ভাগ, ৫০ পৃষ্ঠা। "এদিকে সিপাহীদলের অধিনায়কগণ তাহাদের অনুরাগভাজন, তাঁহাদের প্রীতির পাত্র, তাঁহাদের বিশ্বাসের অধিতীয় আস্পদ সৈন্যগণ যখন বীরত্বে, অধ্যবসায়ে আপনাদের সাময়িক চিহ্ন পরিত্যাগ করিতে লাগিল, বীরত্বের পরিচয়সূচক গৌরবকর অস্ত্রশস্ত্র যখন একস্থানে স্তূপাকার করিতে লাগিল, তখন তাঁহারা ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন। প্রীতিপাত্রদিগের এইরূপ অধোগতিদর্শনে যুদ্ধাভিমানে ও যুদ্ধবেশে সজ্জিত থাকিলেও তাঁহাদের লজ্জার আবির্ভাব হইল। গভীর বিষাদে মর্ম্মান্তিক অনুতাপে দুঃসহ দুঃখে, তাঁহাদের কেহ কেহ আপনাদের অস্ত্রাদি উন্মোচিত করিয়া সিপাহীদিগের পরিত্যক্ত সেই স্তূপাকার অস্ত্ররাশির মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। সিপাহীদিগের প্রতি তাঁহাদের গভীর সমবেদনা এইরূপে প্রদর্শিত হইল, এবং যে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে তাঁহাদের অনুগত জনগণের দুর্গতি ও অবমাননার এক শেষ ঘটিল, সেই কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিও তাঁহাদের বিরাগ এইরূপে পরিস্ফুট হইল।"

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস প্রত্যেক বঙ্গবাসীর পাঠ করা কর্ত্তব্য মনে করি এবং যাঁহাদিগের বঙ্গীয় পুস্তকের পাঠাগার আছে এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস গ্রন্থখানি তাহাতে রক্ষা না করিলে পাঠাগার যে অঙ্গহীন হইবে অসঙ্কোচে তাহা বলিতে পারি। গ্রন্থের ভূমিকায় রজনীকান্তের প্রিয় সুহৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার জীবনব্রতের বিষয় যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা উদ্ধার করিয়া দিলাম। "বঙ্গসাহিত্যের সেবা রজনীকান্তের জীবনের মুখ্যতম ব্রত ছিল। তিনি আপন ক্ষমতানুসারে সেই ব্রত যথাসাধ্য পালন করিয়াছেন, সেই ব্রত পালনেই আপনার সমগ্রশক্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি আর কোন কাজই করেন নাই। তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী লেখক বঙ্গদেশে অনেক জন্মিয়াছেন; বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের স্থান অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত। তাঁহাদের কার্য্যের সহিত তদ্কৃত কার্য্যের তুলনায় কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু একমাত্র বঙ্গসাহিত্যের সুতরাং বঙ্গমাতার সেবা ব্রতে সমগ্র জীবন উদ্‌যাপনের উদাহরণ অধিক আছে কি না জানি না। এই অনুরক্ত সন্তানের অকালমরণে বঙ্গমাতা সন্তাপিত হইবেন সংশয় নাই।" শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী গ্রন্থকর্ত্তার জীবনচরিত সংক্ষিপ্তাকারে পুস্তকের মুখবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন।

অবশেষে,—পুস্তকখানির একটি সুলভ সংস্করণ করিতে আমরা অনুরোধ করি। তাহা হইলেই ইহা সর্ব্বসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে আসিতে পারে।

বঙ্কিম-যুগের কথা।

(২)

আপনারা এমন এক গগনের কল্পনা করিতে পারেন কি,—যাহার উদয়-তোরণে উষার তারা, বক্ষঃদেশে মধ্যাহ্ন-ভানু, অস্ত-শিখরে নির্ব্বাণ-ম্লান সূর্য্য-দীপক এবং রজনী-বাসরে তারাকুসুমমালা চন্দ্রমার শঙ্খ-শুক্তিমা,—সকলই এককালে পরিদৃশ্যমান? প্রকৃতির আকাশে বিবর্ত্তমান উদয়াস্তলীলা দেখি,—চাঁদ যায়, সূর্য্য আসে, সূর্য্য যায়, চাঁদ আসে,—পরে পরে পরে—একের পতনে অপরের উত্থান। কিন্তু তথাকথিত আকাশের দৃশ্য একটু বিচিত্র,—সেখানে উদয়াস্তের মধ্যে কোনি প্রভেদলেখা নাই, পরন্তু মিলন-রেখা বিস্তৃত; এবং সে মিলন যতদূর প্রাণরঞ্জক হইতে হয়!*

তাহা আমাদের সাহিত্য গগন। তাহার একদিকে উষাতারকাবৎ রবীন্দ্রনাথ, এক-দিকে মধ্যাহ্নতপনপ্রতিম বঙ্কিমচন্দ্র, একদিকে অস্তসূর্য্যসঙ্কাশ গুপ্তকবি ও অক্ষয়কুমারাদি এবং অপরদিকে সোমসমতুল মধুসূদন, গ্রহউপগ্রহতুল্য হেম-নবীন দীনবন্ধু প্রভৃতি ও অযুততারকানিভ বহু নবীন ভাবুক ভক্ত —কেহ ফুটিয়াছেন, কেহ ফুটিতেছেন, কেহ ফুটিবেন!

কিন্তু সে দৃশ্য এখন নাই। উদয়াস্ত-লীলার তেমন বৈচিত্র্য, এখন অতীত স্বপ্নের কথা। তখন বঙ্কিমের গল্প-গুজবের আড়ালে প্রাণস্পর্শিনী শিক্ষা, মধুসূদনের মধুচক্রের মধুময়ুরা রচনা, হেমচন্দ্রের তূর্য্য-স্বননে প্রবুদ্ধ ভারতের উত্তেজনা, নবীনের শিমাকে পলাশীর সুপ্ত সমর-নির্ঘোষের নবজাগ্রৎ অনুরণন, দীনবন্ধুর অম্লান দর্পণে ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের স্বরূপ এবং রবীন্দ্রনাথের মুরলী গুঞ্জনে কোমলকম মূর্চ্ছনা—হায় রে, সে দিন গত! সৌভাগ্যবশতঃ রবীন্দ্রনাথ অদ্যাপি বিদ্যমান; শতচন্দ্রের কাল চলিয়া গিয়াছে, এক চাঁদেও আকাশ আলো করে—তিনিও বঙ্গ ভবন আলো করিয়া আছেন।

বঙ্গলক্ষ্মীর অন্তঃপুরও এতৎকালে নীরব ছিল না। যেখান হইতে, আমরা কেবল কলকাকলি কলাপের মৃদু শিঞ্জন-গুঞ্জনের আশা করিতেছিলাম, সেখানে সহসা যে আবার পদ্মাসনার কর-ধৃত বীণার তারে,—তারে তারে তারে বিচিত্র স্বরগ্রাম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে, তাহার সম্ভাবনা, স্বপ্নসম্ভবা ছিল। আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, যে আলনা-আঁকা ঠাকুরঘরটি অন্তঃপুরেই বিরাজমান এবং সেই ঠাকুরঘরটির ভিতরেই মা সরস্বতীর লীলা-নিকেতন। পরন্তু, ভোরের স্বর্ণরাগ যেমন আলোক-সাগর হইতে ফুটিয়া ওঠে না,—আঁধারের নিকষেই তাহার রম্য বর্ণ-বিকাশ,—তেমনি সাহিত্য-গগনের এই আলোক প্রভাত-বিভা, বাহিরের আলোকাময় কর্ম্মভূমিতে আত্মপ্রকাশ করে নাই,—তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল অন্তঃপুরের তামসী যবনিকা ভেদ করিয়া! এবং তাহারই প্রসাদাৎ, আজ আমরা বরণীয়া বিদুষী রমণিমণিশিরোমণিস্বরূপা স্বর্ণকুমারী, কামিনী ও গিরীন্দ্রমোহিনীপ্রমুখ "ধন্যি মেয়েদের"

পাইয়াছি। সাহিত্যক্ষেত্রে, আজ তাঁহাদের প্রতিভা ও প্রভাব, সর্ব্বজনমান্য। বোধ হয়, বঙ্কিমের "দুর্গেশনন্দিনী"র পরে, সর্ব্ব-প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস,—পুরনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর। তাহা "দীপ-নির্ব্বাণ।" এ কথা লইয়া, বাঙালীর গর্ব্ব প্রকাশ করিবার কারণ, যথেষ্ট আছে। আবার বলি, সেকি যুগ,—যখন সর্ব্বত্র আতঙ্কান্ত সমাজে এক অনাহত রব বিসারিত হইয়া গিয়াছিল,—ভারতি! জননি! জাগৃহি, জাগৃহি, জাগৃহি!!

এবারেও আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটী জীবনীকথা বলিব। কিন্তু এই সুযোগে বলিয়া রাখি, আমরা একেবারে সকলের কথা গুছাইয়া বলিতে পারিব না। যখন যাহা পাইব, পাঠকগণকে উপহার দিব; সেইজন্য শৃঙ্খলার সহিত সকল বিষয় আলোচনা করিতে পারিব না। অবস্থা বুঝিয়া, ভরসা করি গুণগ্রাহী পাঠকগণ, অক্ষম লেখককে ক্ষমা করিবেন।

প্রথমে, বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশ নন্দিনী"র কথা বলি। সকলেই জানেন, "দুর্গেশ নন্দিনী" তাঁহার প্রথম উপন্যাস। বইখানি বাহির হইলে, "হিন্দু পেট্রিয়টে" তাহার সুসমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচনা, বঙ্কিমের হস্তগত হইল। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্মুখেই তাহা পড়িতে লাগিলেন। এখন, সমালোচক, মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন, যে স্কটের আইভ্যান্ হো'র ছায়ায় 'দুর্গেশনন্দিনী' রচিত। বঙ্কিমচন্দ্র, সেই জায়গাটা পড়িয়াই চমকিয়া উঠিলেন। এবং পূর্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ণ, তুমি কি 'আইভ্যান্ হো' পড়েছ? আমি ত পড়ি নি।" পূর্ণবাবু তখন খুব উপন্যাস পড়িতেন। তিনিও বলিলেন "না, আমি ও বই পড়িনি।" কিন্তু বঙ্কিমবাবু, সেই সমালোচনায় কিছু আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। আনন্দের কারণ, তিনি তখন নবীন লেখক। তিনি, 'আইভ্যান হো' না পড়িয়াও যাহা লিখিয়াছেন তাহার সহিত যে স্কটের মত বিশ্ব-বিখ্যাত লেখকের রচনার সাদৃশ্য আছে,—ইহা তাঁহার পক্ষে গৌরবের কথা।

বঙ্কিমচন্দ্র, গানবাজনা বড় ভালবাসিতেন। কাঁটালপাড়ার যদুনাথ ভট্টাচার্য্য নামে একটি লোক থাকিতেন। তিনি সুকণ্ঠ ও সুবাদক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে পঁচিশ টাকা মাহিনা দিয়া নিজের বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। মাহিনার সঙ্গে আর একটি চমৎকার বরাদ্দ ছিল—কিঞ্চিৎ গঞ্জিকা! যদুনাথ, বঙ্কিমচন্দ্রকে 'হারমোনিয়ম' বাজাইতে শিখাইতেন। বঙ্কিম, নিজে গাহিতে বড় ভাল পারিতেন না। গলা ছিল পূর্ণবাবুর। পূর্ণবাবু গান ধরিতেন, বঙ্কিম বাজাইতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভাল কবিতা রচনা করিতে না পারিলেও, তাঁহার গান রচনায় বেশ শক্তি ছিল। তাঁহার উপন্যাসে, যে গানগুলি আছে—তাহার সঙ্গে সুর সংযোগ করিয়াছিলেন যদুনাথ। যদুনাথ এখন নাই।

কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে তখন গান বাজনার বড় ধুম হইত। এক একদিন রাত্রি এগারটা, বারটা পর্য্যন্ত আসর জমিয়া থাকিত। কখনও কখনও কবিবর হেমচন্দ্রের বাড়ীতে আসর বসিত। সেখানে

দীনবন্ধু, প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার পি, মিত্র (বোধ হয় তখনও ব্যারিষ্টার হন নাই) প্রভৃতি উপস্থিত থাকিতেন। বঙ্কিম ত থাকিতেনই। মাঝে মাঝে জগদীশনাথও দেখা দিতেন। সে দিন, গান বাজনা আর শেষ হইতে চাহিত না। কোন কোন দিন কেবল গল্পই চলিত। গল্পগুজবেও একটু বিশেষত্ব ছিল। বঙ্কিম হয়ত একটী হাসির গল্প ধরিতেন এবং বলিতে বলিতে নিজেই হাসিয়া ফেলিতেন। হেমচন্দ্র, আবার আর একটী গল্প বলিয়া তাহার উত্তর দিতেন,—কিন্তু নিজে না হাসিয়া থাকিতে পারিতেন না। তারপর, দীনবন্ধুর পালা। তিনি গল্প বলিতেছেন, আর ঘরশুদ্ধ লোক হাসিয়া খুন হইবার যোগাড়; কিন্তু দীনবন্ধু নিজে বেজায় গম্ভীর,—হাসিয়া ফেলিয়া তিনি কখনও হাসিকে বাসি করিতেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র, ইলিশ মাছের ভারি ভক্ত ছিলেন। আর সে মৎস্য-ভক্তি বড় যে সে রকম ছিল না,—আট, নয় খানা মাছ তাঁর পাতে পড়িতে না পড়িতে যথাস্থানে প্রস্থান করিত! মাংসেও তাঁহার অচলা তৃপ্তি ছিল! এই মাংসপ্রিয়তা, শেষ বয়সে বোধ-করি কিছু কমিয়াছিল। বঙ্কিম, শেষে হবিষ্য ধরিয়াছিলেন,—কিন্তু বেশী দিন তাহা চালাইতে পারেন নাই। পত্নীর মিনতিতে, তাঁহাকে হবিষ্য ছাড়িতে হইয়াছিল।

বঙ্কিম, নিজে যেমন খাইতে ভাল বাসিতেন—বন্ধুদের খাওয়াইতেও তেমনি। বন্ধুজনেরা বাড়ীতে আসিলে, অন্ততঃ পক্ষে দুখানা গরম লুচি না খাওয়াইয়া কাহাকেও অমনি ছাড়িয়া দিতেন না। লুচি যোগাইতেন স্বয়ং বঙ্কিম-গৃহিণী। রন্ধনে তাঁহার একটু হাতযশ ছিল।

কাঁটালপাড়ার বাহিরবাটীতে তিনটী ঘর, একটী বড় হল্ ও একটী 'সাথ্রুম' ছিল। বন্ধুবান্ধব আসিলে, সেইখানে আসর আপ্যায়ন হইত। সকালবেলায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতে বসিতেন। বিকালটা আমোদেই কাটিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের অধ্যয়ন-স্পৃহার কথা সকলেই জানেন। কলিকাতায় যখন আসিতেন, তখন রাশি রাশি বই কিনিয়া লইয়া যাইতেন। বইগুলি থাকিত, একটী ব্যাগে। যখন জগদীশ বাবুর বাড়ীতে যাইতেন, জগদীশ বাবুর পুত্র খগেন্দ্রবাবু, ব্যাগের ভিতর হইতে মাঝে মাঝে লুকাইয়া বই সরাইতেন। বঙ্কিম, জগদীশ বাবুকে এক দিন বলিলেন, "হ্যাঁহে, আমার ব্যাগের ভিতর থেকে বই সরায় কে?"

জগদীশ বলিলেন, "ও আর কার কাজ—পগেন নিশ্চয়!"

বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করাতে খগেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, আমিই বই নি বটে!"

"কেন রে!"

"আজ্ঞে, আমরা পড়ব না বুঝি?"

"বাপু, আমাকেই পড়তে দাও আগে।"

"বাঃ! আগে আমরাই পড়ি,—তারপর আপনি।"

বঙ্কিম, খুব হাসিতে লাগিলেন।

পত্নিপ্রেম, বঙ্কিমের জীবনকে পুষ্পপেলব করিয়া তুলিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, যখন ক্রোধে অস্থির, কেহ তাঁহার কাছে যাইতে সাহস করিতেছে না, তখন তাঁহার স্ত্রী নিকটে

গিয়া তাঁহার কথা লইয়া এমনি এক হাসির গল্প ফাঁদিয়া বসিতেন, যে বঙ্কিমের রাগ একেবারে জল! হায় সতি, এমন আশুতোষ স্বামীকে অকালে হারাইয়া তোমার যে মনোকষ্ট, তাহা ভাবিয়া আমার চোখে জল আসিতেছে, মা!

বঙ্কিমচন্দ্রের একটী বলিব।

মহারাষ্ট্র স্বর্ণময়ী, তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের শাল দান করিতেছিলেন। যে কর্ম্মচারীর উপরে শাল বিলাইবার ভার, বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। একজন পণ্ডিত, সেই সন্ধান পাইয়া জগদীশবাবুর বাড়ীতে আসিয়া হাজির। সেখানে শ্রীযুত খগেন্দ্র-নাথকে বলিয়া কহিয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটে তাঁহার অনুরোধপত্র লিখাইয়া লইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র, অনুরোধপত্র দেখিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আমি কাকেও সুপারিশ দিতে ভালবাসি না। তবে, খগেন্দ্র আমার স্নেহ-ভাজন, তার কথা আমি ঠেলতে পার্ব্ব না, কাজেই এবারে আপনার কার্য্যোদ্ধার হ'ল।"

পণ্ডিত মহাশয়, বঙ্কিমচন্দ্রের আলয়ে দু' একদিন থাকিয়া শাল লইয়া ফিরিলেন। ফিরিবার সময়ে, বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "ঠাকুর, আমাদের বাড়ী থেকে শূন্য হাতে ফিরলে— আপনি আমার প্রতি বড় প্রসন্ন হবেন বলে বোধ হচ্ছে না। তা এই যৎসামান্য কিছু দিলুম, নিন।" বলিয়া ঠাকুরের হাতে একখানি ১০ টাকার নোট গুঁজিয়া দিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের চারি ভ্রাতাই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ ছাড়া সকলেই সাহিত্যসেবী। সঞ্জীবচন্দ্রের কথা পরে বলিব, আগে সর্ব্বকনিষ্ঠ পূর্ণবাবুর কথাই বলিয়া লই।

পূর্ণবাবুই বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্যমান শেষ স্মৃতি। তাঁহাকে দেখিলে, বঙ্কিমচন্দ্রকে মনে পড়ে। সেই প্রতিভাব্যঞ্জক দীর্ঘ নাসিকা, সেই মর্ম্মভেদী দৃষ্টি। পূর্ণবাবু, বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা তিন বৎসরের ছোট।

তিনি বহুদিবস সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়াছেন বটে,—কিন্তু এদিকে তাঁহারও বয়স অল্প নয়। বঙ্কিমচন্দ্র, নিজেই বলিতেন, "অনেকে আমার মত করে লিখ্‌তে চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু চন্দ্রশেখর ও পূর্ণ ছাড়া আর কেউ অবিকল আমার মত লিখ্‌তে পারে না।" বঙ্কিমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস "চন্দ্রশেখরে" পূর্ণচন্দ্রের লিখিত একটি পরিচ্ছেদ আছে। তাঁহার "কৃষ্ণকান্তের উইলে"র তিন চারিটি পরিচ্ছেদ পূর্ণচন্দ্র লিখিয়া দিয়াছেন। আফিংএর নেশায় বুড়া কৃষ্ণকান্ত যখন ঝিমাইতে ঝিমাইতে স্বপ্ন দেখিতেছেন, সেই স্থানটি পড়িয়া সকলেই নিশ্চয় হাসিয়াছেন। সেই চমৎকার হাস্যরসোজ্জ্বল স্বপ্নকাহিনীটীও পূর্ণচন্দ্রকর্ত্তৃক লিখিত।

"বঙ্গদর্শন" বাহির করিয়া, বঙ্কিমবাবু, পূর্ণচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন, "তুমি বঙ্গদর্শনে কিছু লেখ; উপস্থিত আমি উপন্যাস চালাতে পারছি না।"

তাহার ফলে বঙ্গদর্শনে "মধুমতী" এবং "শৈবলিনী সহচরী" নামক উপন্যাসদ্বয় বাহির হয়। উপন্যাস সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার স্থান নাই। তবে, এ কথা ঠিক,

যে যিনিই উক্ত উপন্যাস খানি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই তাহার ভাষা, ঘটনা-সংস্থান ও বর্ণনপ্রণালীতে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইয়াছেন। উক্ত উপন্যাস খানি ছাড়া, পূর্ণবাবু বঙ্গদর্শনে মাঝে মাঝে অন্য লেখাও দিতেন। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পোপ,

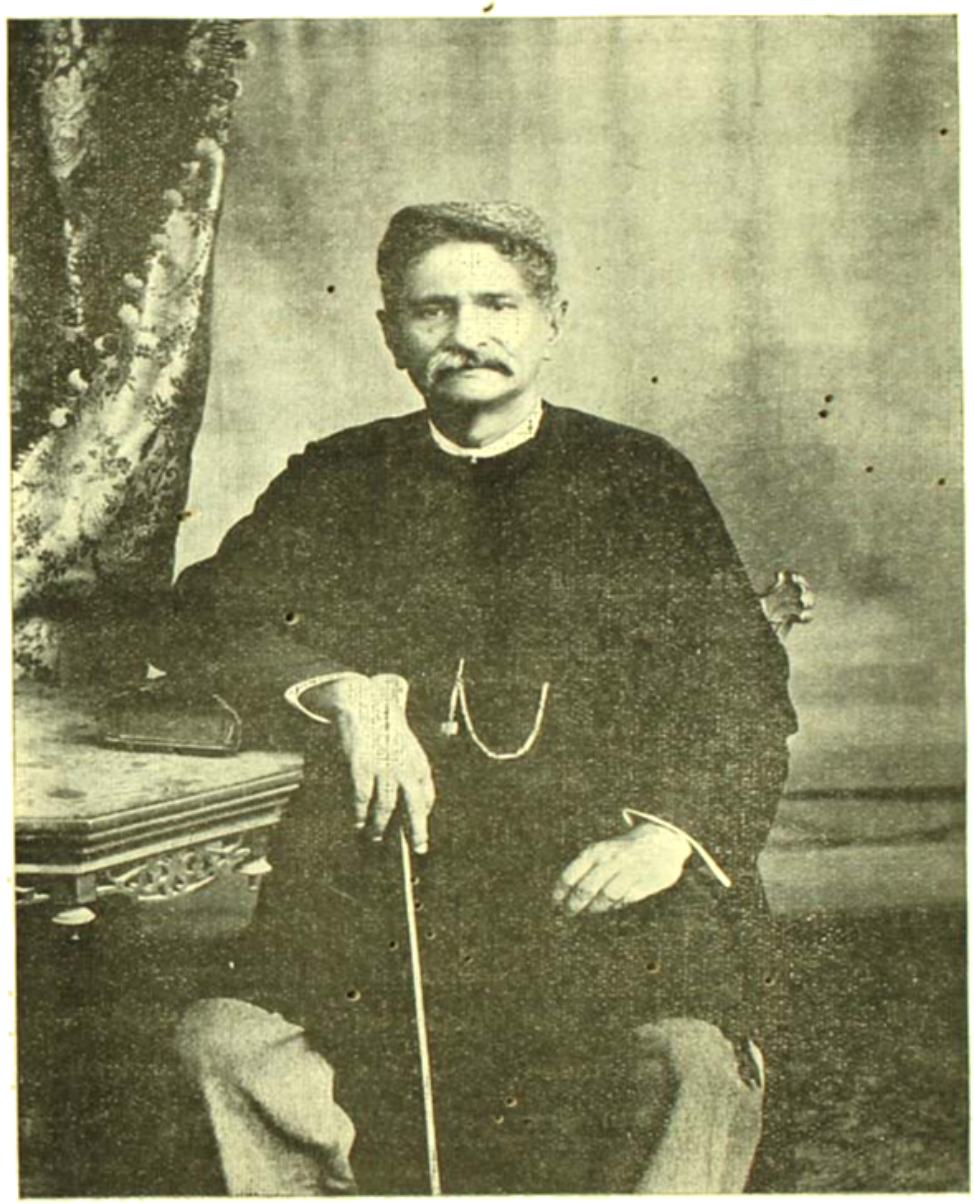

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তাঁহার "মধুমতী" নামক উপন্যাসখানি করিয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে, অনুবাদ ইংরাজিতে অনুদিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ হয় নাই, বলিতে পারি না।

"ভারতী"র প্রতি পূর্ণচন্দ্রের স্নেহ যথেষ্ট। তিনি বলেন, "আজকালকার মাসিক কাগজের ভিতরে 'ভারতী'কেই আমি বেশী ভালবাসি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক পুস্তক ইংরাজকর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে। এক একখানি অনুবাদ, অতি অপূর্ব্ব ব্যাপার হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন "গোপাল উড়ের যাত্রা।" অনুবাদক দেখিলেন, গোপাল কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম, অতএব অনুবাদেও তাহা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। তার পর, "উড়ে",—কিনা উড্ডীয়মান, অর্থাৎ flying!—যাত্রা কিনা, গমন অর্থাৎ visit! সুতরাং "গোপাল উড়ের যাত্রা" অনুবাদে হইয়া দাঁড়াইল "Gopal's flying visit" এই সকল নানা কারণে বঙ্কিমবাবু, ইংরাজী অনুবাদকে একেবারেই সুনজরে দেখিতেন না। একবার, মিঃ ফিলিপ নামে এক জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, পূর্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি যদি "কপালকুণ্ডলা"র ইংরাজী অনুবাদে হাত দেন, তাহা হইলে বঙ্কিম বাবু কোন আপত্তি করিবেন কি না?

পূর্ণবাবু বলিলেন, "আপত্তি করিবেন।" যাহা হোক, ফিলিপ সাহেব, বঙ্কিমের মত জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। এবং এ কথাও বলিয়াছিলেন, যে এরূপ অনুবাদে তিনি ইয়োরোপে পরিচিত হইবেন।

বঙ্কিম বাবু, তদুত্তরে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। পরন্তু, ইহাও লিখিয়াছিলেন, যে ইয়োরোপে আমি আমার নাম প্রচার করিতে চাহি না। যে দেশের জন্য আমি উপন্যাস লিখিয়াছি, সেই দেশে আমার নাম হইয়াছে। তাহাই যথেষ্ট।

কিন্তু ফিলিপ সাহেব, বঙ্কিমের নিষেধ মানিলেন না। তিনি বিলাতে গিয়া, "কপালকুণ্ডলা"র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিলেন। ফলে, বঙ্কিমবাবু অসন্তুষ্ট হইলেন। এবং তাঁহার চেষ্টায় বিলাতের একখানি কাগজে উক্ত ইংরাজী অনুবাদের এক প্রতিকূল সমালোচনা বাহির হইল। পরিণামে, উক্ত ইংরাজী অনুবাদের বিক্রয় বন্ধ হইয়া গেল। শুনিতেছি, সংপ্রতি উহা পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রহ্মতেজঃ বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে তাহা বঙ্কিমের ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র একদিন 'ইডেনগার্ডেন' বেড়াইতে গিয়াছেন। বিভাগীয় কমিশনর মিঃ মন্‌রোও তখন বাগানে বেড়াইতেছিলেন। উভয়ে উভয়ের পরিচিত, কিন্তু বঙ্কিম আস্তে আস্তে তাঁহার একপাশ দিয়া চলিয়া গেলেন,—সাহেবকে সেলাম করিলেন না। সাহেব ত' চটিয়া লাল। ফলে বঙ্কিমচন্দ্র, সদর হইতে সুদূর মফঃস্বলে,—বালেশ্বরে বদলী হন। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "এটা একটা সেলাম-তোলার ফল।"

যে রোগে তিনি লোকান্তরিত হন, সেই রোগের বীজ তাঁহার দেহে যৌবন হইতেই আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সেদিকে তিনি একেবারেই দৃষ্টি দিতেন না।

এই কাল রোগ যে তাঁহার পরমায়ু তিলে তিলে ক্ষয় করিতেছে, বহুকাল পর্য্যন্ত কেহ তাহা জানিতেও পারেন নাই—এমন কি তাঁহার স্ত্রী পর্য্যন্ত না। তাঁহার সহিষ্ণুতাকে ধন্যবাদ।

তৎপরে, এই রোগের আক্রমণচিহ্ন যখন তাঁহার দেহে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হইয়া পড়িল, আত্মীয় স্বজন তখন শঙ্কিত হইলেন। নাম মনে নাই—একজন কে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "বঙ্কিম বাবু, রোগের কথা আপনি বেশী চিন্তা কর্ব্বেন না,—তাতে অনিষ্ট হতে পারে।"

বঙ্কিম বাবু অবহেলার সহিত বলিয়াছিলেন, "হাঃ, কেই বা ওর কথা নিয়ে ভেবে মরে, আর কে-ইবা সে জন্যে ভয় পায়। তুমিও যেমন!"

শুনিয়াছি, বঙ্কিমবাবুর কৃত গীতার বিশদ ব্যাখ্যা ও নবসংস্করণের ধর্ম্মতত্ত্বের পাণ্ডুলিপি অদ্যাপি অপ্রকাশিত আছে। কবে বাহির হইবে?

মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র, বৈদিক বিষয় লইয়া প্রবন্ধরচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। রোগের আক্রমণে তখন তাঁহার দেহ জর্জ্জর,—কিন্তু সেদিকে বঙ্কিমের লক্ষ্য নাই,—তিনি জাগিয়া পড়িতেছেন, নোট লইতেছেন,—লিখিতেছেন!

বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুপ্রীতির কথা, গতবারে কিছু বলিয়াছি,—এবারেও বলিব। তাঁহাদের ভিতরে যে কতটা খোলাখুলি ভাব ছিল, নিম্নে সমাহৃত ঘটনাটীই তাহার উদাহরণ। ৺দীনবন্ধু মিত্র, একবার রাজকার্য্য বশতঃ আসাম অঞ্চলে গিয়াছিলেন। সেখানে গাছের ছালের একরূপ নূতন জুতা দেখিয়া, বঙ্কিমের জন্য একযোড়া ক্রয় করিলেন। যথাকালে, বঙ্কিমের কাছে জুতা আসিল। বঙ্কিমচন্দ্র, মোড়ক খুলিয়া এক যোড়া জুতা ও দীনবন্ধুর একখানা চিঠি পাইলেন।

দীনবন্ধু, বঙ্কিমকে চিঠিতে কেবল লিখিয়াছিলেন "কেমন জুতো!"

বঙ্কিমও তখনই চিঠির উল্টাপিঠে উত্তর লিখিয়া, দীনবন্ধুর কাছে পাঠাইয়া দিলেন, "তোমার মুখের মত!"

নূতন সাহিত্যিকের সৃষ্টি করিতে না পারিলে, সাহিত্যের উন্নতি অসম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বুঝিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি তাহার প্রমাণ।

রমেশ বাবুকে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "রমেশ, তুমি বাঙ্গলা লেখনা কেন?" রমেশবাবু, সবিস্ময়ে কহিলেন "আমি? বলেন কি মশায়! আমি ভট্‌চলা ক'রে বাঙ্গলায় কথা কইতেই পারি না, তা আর লিখব কি?"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন "তুমি ত' ইংরেজীতে লিখে থাক, ভাব আর চিন্তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। আর বাঙ্গলা ভাষায় তুমি যেমন কথা কও, তেমনি ভাবে সেই ভাব আর চিন্তাগুলিকে লেখায় ফুটিয়ে তুল্‌তে চেষ্টা করনা কেন?"

বঙ্কিমচন্দ্রের কথাতেই অবশেষে রমেশচন্দ্র বঙ্গ-সাহিত্যচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

গতবারে, বঙ্কিমের যে আত্মচরিতের কথা বলিয়াছিলাম,—সংপ্রতি তাহার সংবাদ পাইয়াছি। এখন বুঝিতেছি, তাহা প্রকৃত 'আত্মচরিত' নয়। বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান কতকগুলি ঘটনার একটী সামান্য স্মৃতিলিখন রাখিয়া গিয়াছেন মাত্র। আকারে তাহা চারি পাঁচ পৃষ্ঠার অধিক হইবে না। সুতরাং, তাহাকে 'আত্মচরিত' বলা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র, বৈষ্ণব ছিলেন। রাধাকৃষ্ণ,

তাঁহাদের কুলদেবতা। দেবতার প্রতি তাঁহার অসামান্য ভক্তি ছিল। তিনি সাতিশয় কীর্ত্তনানুরাগী ছিলেন। শুধু তিনি বলিয়া নয়—তাঁহার ভ্রাতৃগণও। সংকীর্ত্তনকালে, প্রগাঢ় ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় পরিপ্লুত হইয়া যাইত এবং তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান যেন বিলুপ্ত হইয়া যাইত,—তিনি যেন পাগলের মত হইয়া উঠিতেন। দেবপদে এরূপ ভক্তি সচরাচর দুর্লভ।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যে অদ্বিতীয় প্রতিভাবান পুরুষ, এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। বঙ্কিমচন্দ্র, যখন প্রথমে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উদ্যত হন, তখন তাঁহাকে যে সকল গুরুতর বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুভব্য। পরন্তু তৎপরবর্ত্তী আর কাহাকেও সে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই।

"আলালের ঘরের দুলাল", "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" ও "কথাসরিৎসাগর" প্রভৃতি পুস্তকের ভাষাই, তখন আদর্শ ভাষা। কিন্তু সে ভাষায়, উচ্চাঙ্গনমন্বিত সাহিত্যসৃষ্টি অসম্ভব ছিল। সেইজন্য, প্রথমেই তাঁহাকে এমন ভাষার সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল, যাহা লেখকের ইঙ্গিতমাত্র মনঃকল্পিতা কল্পনাকে, উচ্চভাবকে এবং সূক্ষ্মচিন্তাকে আপনার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে। এ কাজ যে কিরূপ কঠিন কাজ, তাহা এক মাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই বুঝিয়াছিলেন,—আমরা তাহা বুঝিতে পারিব না।

তাহার পর প্রকৃত উপন্যাস কাহাকে বলে, বাঙ্গালী তাহা জানিত না। বঙ্কিমচন্দ্র, সর্ব্বপ্রথমে তাহা দেখাইয়াছেন। পরন্তু, কাব্য আর নাটক আর উপন্যাসের বর্ণিত চরিত্রের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য যথেষ্ট। প্রথম দ্রষ্টার পক্ষে, সেই বৈপরীত্যটুকু অন্তরঙ্গম করা বড় সাধারণ কার্য্য নয়। তাহার পর রাজনীতি ও সমাজনীতি, ধর্ম্মমর্ম্ম, ও শিল্পগতি, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব এবং বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতি যেদিক দিয়াই দেখ, বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বস্থলেই উপস্থিত।

আমাদের লেখনীমুখে ভাষা দিয়াছিলেন তিনি এবং তৎসৃষ্টা মহিমময়ী ভাষাই অদ্যাপি আমাদের অবলম্বনীয়া;—অতএব তাঁহার নিকটে আমরা যত ঋণী,—এমন আর কাহার কাছে? ফলতঃ, শ্যামলিতা বঙ্গভূমি, তাঁহার পদার্পণে সর্ব্বজননমস্যা হইয়াছেন;—আমরাও তাঁহার স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া অন্যকার মত বিদায় গ্রহণ করিলাম। আগামী বারে অন্যান্য কথা হইবে।

ভুলোনা।

(ফার্সী হইতে)

আর আকর্ষণে ধনুঃ হয় বক্র নত,
শরক্ষেপ হয় তা'র দ্রুত তীব্র তত;
শত্রু ধ্রুব করে যদি নম্রতা স্বীকার,
ভুলোনা ভুলোনা তাহে, নির্ব্বন্ধ আমার।

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

চয়ন।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

ষষ্ঠ খণ্ড।

শ্রাবস্তি।

শ্রাবস্তি রাজ্যের পরিধি প্রায় ছয় সহস্র লি। রাজধানী মরুভূমি তুল্য এবং জনশূন্য। রাজধানীর সীমা নির্ণয় করা যায় না। প্রায় ২০ লি স্থান লইয়া রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এখনও অল্পসংখ্যক অধিবাসী এই স্থানে বাস করে। প্রচুর শাকশব্জী পাওয়া যায়। জলবায়ু মনোরম। অধিবাসীরা সচ্চরিত্র ও পরিশ্রমেতা। ইহারা বিদ্যাভ্যাসে রত এবং ধার্ম্মিক। শতাধিক সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়; মাত্র কয়েকটী যতি থাকেন। ইহারা সম্মতি-সম্প্রদায়-ভুক্ত। একশত দেবমন্দিরে বহুসংখ্যক বিধর্ম্মী বাস করে। তথাগত যখন এই পৃথিবীতে বাস করিতেন, এইস্থানে প্রসেনজিৎ রাজার রাজধানী ছিল। রাজধানীর অভ্যন্তরে প্রাচীর ভিত্তিমূল দেখিতে পাওয়া যায়; রাজা প্রসেনজিতের প্রাসাদের ইহাই মাত্র অবশিষ্ট আছে।

পূর্ব্বদিকে নিকটে একটী পুরাতন ভগ্নাবশেষের উপর ক্ষুদ্র স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে; এই স্থানে রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেবের জন্য সাধারণ মহাশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার আরও পূর্ব্বে শুদ্ধোদনের গৃহের স্থান নির্ণয়ের জন্য একটী স্তূপ আছে। শুদ্ধোদনের গৃহের নিকটেই একটী বৃহৎ স্তূপ। এই স্থানেই একজন অঙ্গুলিমালা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অঙ্গুলিমালাগণই শ্রাবস্তির অপরাধী শ্রেণী। তাহারা জীব-মাত্রকেই হত্যা করে এবং সুযোগ পাইলে নগরের ও জনপদের অধিবাসীদিগকে হত্যা করিয়া, ঐ সকল মৃত ব্যক্তির অঙ্গুলি দ্বারা মালা প্রথিত করিয়া মস্তকে পরিধান করে। পূর্ব্বোক্ত অঙ্গুলিমালা অঙ্গুলির সংখ্যা পূর্ণ করিবার জন্য নিজ গর্ভধারিণীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব এই সংবাদে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহাকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য গমন করেন। দূরে পৃথিবীপতিকে দেখিয়া অঙ্গুলিমালা আহ্লাদিত হইয়া বলিল "এইক্ষণ আমি স্বর্গে অগ্রগমন করিতে পারিব; আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী শিক্ষক বলিয়াছিলেন যে, যে বুদ্ধকে বা তাঁহার মাতাকে হত্যা করিতে সক্ষম হইবে, সে ব্রহ্মস্বর্গে জন্মলাভ করিবে।" অঙ্গুলিমালা নিজ মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "বৃদ্ধা! যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি ঐ শ্রমণকে হত্যা না করিতে পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি নিশ্চিন্ত থাক।" যখন অঙ্গুলিমালা তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ছুরিকা লইয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন তথাগত ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। পৃথিবীপতি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তুমি কেন তোমার মন্দ অভিপ্রায় চরিতার্থ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছ এবং কেনই বা মনকে প্রশ্রয় দিতেছ?" অঙ্গুলিমালা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া বুদ্ধদেবকে ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা জানাইল এবং অধ্যবসায় সহকারে ধর্ম্মার্জ্জন করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নগরে ৫।৬ লি পশ্চিমে জিতবন। এইস্থানে প্রসেনজিৎ-রাজার মন্ত্রী বুদ্ধদেবের জন্য একটী বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই স্থানে একটী সঙ্ঘারাম ছিল, বর্ত্তমানে ভগ্নাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট আছে।

পূর্ব্বদিকের সিংহদ্বারের উভয়পার্শ্বে ১০ ফুট উচ্চ স্তম্ভদ্বয় নির্ম্মিত হইয়াছে। বামপার্শ্বের স্তম্ভের পাদদেশে একটী চক্র খোদিত আছে; দক্ষিণদিকের স্তম্ভোপরি একটি ষণ্ডের মূর্ত্তি অঙ্কিত। উভয় স্তম্ভই রাজা অশোক-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। যতিগণের বাসস্থান সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে।

একটী মাত্র ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহগুলির চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই গৃহে বুদ্ধদেবের একটী মূর্ত্তি আছে।

শুদ্ধোদন দয়াশীল ও বিজ্ঞ ছিলেন। তিনি যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং ইহার বিতরণেও মুক্ত হস্ত ছিলেন। তিনি আতুর ও অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন করিতেন এবং অনাথ ও বৃদ্ধদিগের প্রতি কৃপা পরবশ ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহাকে লোকে অনাথনাথ বলিত। তিনি বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের কথা শ্রুত হইয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ ভক্তিমান হইয়া তাঁহার নামে একটী বিহার নির্ম্মাণে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি বুদ্ধদেবকে তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ স্থান গ্রহণের জন্য আহ্বান করিলেন। পৃথিবীপতি সারিপুত্রকে উপদেশ দিবার জন্য তাঁহার সহযাত্রী হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। সুবৃক্ষ এবং উচ্চস্থানে স্থাপিত বলিয়া তাঁহারা রাজার চিত্তরঞ্জন উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিলেন। রাজা পরিহাস করিলেন; যদি তোমরা সুবর্ণ মুদ্রা দ্বারা ঐ স্থান আচ্ছাদন করিতে পার, তাহা হইলে আমি ইহা বিক্রয় করিতে পারি।

শুদ্ধোদন ইহাতে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। ঐ স্থান আচ্ছাদিত করিবার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ ধনকোষ উন্মুক্ত করিলেন। সামান্য মাত্র স্থান আচ্ছাদিত হইতে বাকী ছিল। রাজা তাঁহাকে নিরস্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন কিন্তু তিনি বলিলেন "বৌদ্ধধর্ম্ম সত্যের উপর নির্ভর; আমি এই স্থানে সুবর্ণের বীজ প্রোথিত করিব।" তৎপরে সেই শূন্য স্থানে তিনি বিহার নির্ম্মাণ করিলেন।

পৃথিবীপতি আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন উদ্যানের ভূমি ক্রয় করিয়া শুদ্ধোদন দান করিয়াছেন। এই সময় হইতে এই স্থানকে জিতবন ও অনাথপিণ্ডদ এই উভয় নামেই অভিহিত করা হৌক।"

এই উদ্যানের উত্তরপূর্ব্ব দিকে একটি স্তূপ আছে। এই স্থানে তথাগত, পীড়িত ভিক্ষুকে জল দ্বারা ধৌত করিয়াছিলেন। পুরাকালে, যখন বুদ্ধ পৃথিবীতে বাস করিতেন, তখন একটী পীড়িত ভিক্ষু দুঃখিত চিত্তে বিজনে বাস করিত। পৃথিবীপতি তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি কষ্টে তুমি নির্জ্জনে বাস কর? ভিক্ষু উত্তর করিল "আমি স্বভাবতঃ অমনোযোগী ও অলস কোনদিন পীড়িতের শুশ্রূষা করি নাই; এইরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ায় আমাকেওকেহই শুশ্রূষা করে না।" তথাগত ইহাতে দয়াদ্রচিত্ত হইয়া বলিলেন "বৎস। আমিই তোমার সেবা করিব।" এবং তাহাকে মস্ত হইয়া স্পর্শ করিবামাত্র পীড়া আরোগ্য হইল। পরে তাহাকে বহির্দ্দেশে আনয়ন পূর্ব্বক নূতন মাদুরে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং তাহার গাত্র ধৌত করিয়া নূতন বস্ত্র দান করিলেন। পরে বুদ্ধ ঐ ভিক্ষুকে বলিলেন "এই সময় হইতে পরিব্রাজী হইয়া কার্য্য কর।" এই কথা শ্রবণ করিয়া, ভিক্ষু তাহার আলস্যের জন্য অনুতাপ করিয়া কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

উদ্যানের উত্তর পশ্চিম কোণে একটী ক্ষুদ্র স্তূপ আছে। মুদ্গলায়পুত্র এই স্থানে নিজ ঐশ্বরিক শক্তিবলে সারিপুত্রের কোষরবন্ধ উপাধে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। পুরাকালে বুদ্ধদেব যখন উরুবেলা তীরে মনুষ্য ও দেবতাদিগের সংসর্গে বাস করিতেছিলেন, তখন কেবল মাত্র সারিপুত্র অনুপস্থিত ছিলেন তখন বুদ্ধ মুদ্গলায়পুত্রকে সারিপুত্রকে আনয়নের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

সারিপুত্র সেই সময় নিজ ভিক্ষুকের বেশ সংস্কারে নিযুক্ত ছিলেন। মুদ্গলায়পুত্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "প্রভু এইরূপ অন্তঃতপ্ত হ্রদতীরে বাস করিয়া, আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।" সারিপুত্র বলিলেন "এই বেশ সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন; পরে আমি আপনার সঙ্গী হইব।" মুদ্গলায়পুত্র বলিলেন যে "যদি আপনি শীঘ্র না আইসেন, তবে আমি আমার ঐশ্বরিক শক্তিবলে আপনাকে ও আপনার বস্ত্রকে সেই স্থলে লইয়া যাইব।" তখন সারিপুত্র নিজ কোষরবন্ধ উন্মুক্ত করিয়া, ও উহা ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে "যদি আপনি এই কোষরবন্ধ উত্তোলন

করিতে পারেন, তবে আমি আপনার সহযোগী হইব।" মুদ্গলাপুত্র নিজ ঐশ্বরিক শক্তি পরিচালন পূর্ব্বক কিছুতেই উহাকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না। পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। পরে নিজ ঐশ্বরিক শক্তি বলে তুষিতাতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে সারিপুত্র তাঁহার উপস্থিত হইবার বহুপূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়া সভায় উপদেশদান করিতেছেন। মুদ্গলাপুত্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন "এইক্ষণ আমি দেখিতে পাইতেছি যে অলৌকিক ক্ষমতা পরিচালন জ্ঞানের ক্ষমতার সমতুল্য নহে।"

বর্ষিত স্তূপের নিকটেই একটী কূপ। তথাগত পৃথিবী বাসকালীন নিজ ব্যবহারার্থ এই কূপ হইতে জল উত্তোলন করিয়াছিলেন। নিকটেই অশোকরাজ নির্ম্মিত একটী স্তূপ আছে; ইহাতে তথাগতের কয়েকটী পরীর চিহ্ন আছে: এই স্থানে তাঁহার ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও ধর্ম্মপ্রচারের চিহ্নও আছে। এই সকল ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য রাজা একটী স্তম্ভ ও স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থানের চতুর্দ্দিকে নিত্য ভয় সঞ্চারিত হয়; অনেক দৈব ঘটনাও ঘটিয়া থাকে। কোন কোন সময় স্বর্গীয় বাদ্য শ্রুত হয়, আবার কোন সময় স্বর্গীয় গন্ধ প্রবাহিত হয়। শুভসূচনা এত দেখিতে পাওয়া যায় যে উহা বর্ণনাতীত।

যে স্থানে ব্রহ্মচারীগণ একটী বেশ্যাকে হত্যা করিয়া বুদ্ধদেবের প্রতি ঐ হত্যা আরোপণের চেষ্টা করিয়াছিল সঙ্ঘারামের পশ্চাদ্ভিকেই সেইস্থান। তথাগত ভয়শূন্য, জ্ঞানী, দেবতাগণের পূজিত এবং ধার্ম্মিক ও সিদ্ধপুরুষগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেন। অধিবাসীবৃন্দ পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে আমরা তথাগতের সম্বন্ধে কোন কুৎসা প্রচার করিব। এতদুদ্দেশ্যে তাহারা উপরোক্ত বেশ্যাকে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচার শ্রবণ করাইবার জন্য তথায় আমন্ত্রণ করিল এবং পরে সমবেত জনমণ্ডলী তাহার উপস্থিতি জ্ঞাত হইলে তাহাকে গোপনে হত্যা করিয়া বৃক্ষতলে প্রোথিত করিয়া রাখিল। পরে রাজনিকট অভিযোগ দেখাইয়া, রাজাকে এ মৃত্যুর কথা জ্ঞাত করিল। রাজা অনুসন্ধানের আদেশ দিলেন এবং যথাস্থানে ঐ দেহ পাওয়া গেল। তখন অধিবাসিগণ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "এই শ্রমণ গৌতম লোকের নিকট সৎ নীতি ও তিতিক্ষা প্রচার করে কিন্তু এইরূপ এই স্ত্রীলোকের সহিত ব্যবহার করিয়া পরে যাহাতে কুৎসা প্রচার না হয় তজ্জন্য ইহাকে হত্যা করিয়াছে। এইরূপ বাহ্যিক ও মৃদুতার স্থলে সুনীতি ও জিতেন্দ্রিয়তা কি প্রকারে দেখিতে পাব?" আকাশস্থ দেবতাগণ একবাক্যে বলিতে লাগিলেন "ইহা দুষিত অধিবাসীগণের মিথ্যা অপবাদ।"

সঙ্ঘারামের একশত পদ পূর্ব্বদিকে একটী বৃহৎ-সুরঙ্গীর খাল; এই স্থানে দেবদত্ত বুদ্ধদেবকে বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগে হত্যা করিবার চক্রান্ত করাতে নরকে পতিত হইয়াছিল। দেবদত্ত রাজা দোধনদেবের পুত্র। দ্বাদশ বৎসর একান্ত মনে অধ্যয়ন করিয়া তিনি অষ্টতি সংজ্ঞা লোকে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। পরে লোক বশতঃ তিনি ঐশ্বরিক শক্তি উপার্জ্জনে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তিনি কুসজীবিদের সহিত একত্র হইয়া তাহাদের বলিলেন "আমারও বুদ্ধদেবের ন্যায় ৩০টি—চিহ্ন আছে। আমারও অনেক সদ্গুণ আছে। আমি তথাগতাপেক্ষা কিসে হীন?" এই প্রকার বিবেচনা করিয়া তিনি বুদ্ধদেবের শিষ্যগণের মনে মিথ্যা জন্মাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু বুদ্ধের আজ্ঞাবহ এবং বুদ্ধের ন্যায় অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সারিপুত্র ও মুদ্গলাপুত্র বুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচার করিয়া সকল শিষ্যগণকে একত্রিত হইবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তখন, দেবদত্ত নিজ প্রভাববে বিষস্থাপন করিয়া বুদ্ধকে প্রণাম করিবার সময় হত্যা করিতে মানস করিলেন। পরে অজাতশত্রুর অনেক দূর হইতে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবা মাত্র পৃথিবী দ্বিধা হইল এবং তিনি জীবন্তে নরক-গামী হইলেন।

ইহারই দক্ষিণে অল্প একটী স্থানে, কুকালি ভিক্ষুণী বুদ্ধদেবের কুৎসা প্রচার করিয়া জীবন্তে নরকে গিয়াছিল। রাজপুত্র তিষ্য বুদ্ধকে নিন্দা করিয়া জীবন্তে নরকে প্রেরিত হইয়াছিল। এক সময়ে

বুদ্ধদেব দেবতা ও মনুষ্যের নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিতে ছিলেন, তখন একজন স্ত্রীলোক দূর হইতে সমবেত জনবৃন্দ মধ্যে বুদ্ধদেবকে দেখিয়া স্থির করিল যে, "আমাই আমি বুদ্ধের স্বপন বিনষ্ট করিব; তাহা হইলে আমার প্রভুরই যশ দিগ্‌দিগন্ত বিস্তৃত হইবে। পরে শরীরের সহিত একখণ্ড আট বন্ধন করিয়া সে ধর্ম্মসভার নিকট উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল "তোমাদের এই ধর্ম্মপ্রচারক আমার সহিত সহবাস করিয়াছে এবং আমার গর্ভে এইরূপ ইহারই সন্তান রহিয়াছে।" অবিশ্বাসীরা ইহা বিশ্বাস করিল কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বুঝিলেন যে ইহা কুৎসা মাত্র। এই সময়ে দেবরাজাধিপতি শক্র এ বিষয়ে সকলের সন্দেহ দূরীভূত করিবার জন্য, সেই ইন্দুরের জন দ্বারা যে বন্ধন দ্বারা কাষ্ঠখণ্ড আবদ্ধ ছিল, উহা ছেদন করিলেন। ইহাতে পদ করিয়া ঐ কাষ্ঠখণ্ড ভূপতিত হইল। এই পদে ধর্ম্মসভা চমৎকৃত হইলেন। এই দৃশ্যে সমাগত ব্যক্তিগণ আহ্লাদে অভিভূত হইলেন এবং অনন্তর সভাস্থ এক ব্যক্তি কাষ্ঠখণ্ড উত্তোলন করিয়া স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই কি তোমার পুত্র?" তৎপর পৃথিবী বিদীর্ণ হইল এবং সেই স্ত্রীলোকটী সর্ব্বসমক্ষে নরকে প্রেরিত হইয়া উপযুক্ত শাস্তি পাইল।

এই তিনটি স্থানের গভীরতা নির্ণয় করা যায় না; গ্রীষ্ম ও হেমন্ত কালে যখন অন্যান্য হ্রদ ও পুষ্করিণী জলহীন হয়; তখনও এই তিনটি স্থানে জলের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

সঙ্ঘারামের ৩০।৪০ পদ পূর্ব্বে ৬০ ফুট উচ্চ একটী বিহার। ইহাতে পূর্ব্বোক্তিমূলী উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। তথাগত যখন প্রাচীনকালে এই পৃথিবীতে বাস করিতেন, তখন তিনি এই স্থানে অবিশ্বাসীদিগের সহিত তর্ক করিয়াছিলেন। আরও পূর্ব্বে বিহারের সমতুল্য একটি দেবমন্দির আছে। সূর্য্যোদয় কালে দেবমন্দিরের ছায়া বিহারের উপর পতিত হয় না কিন্তু সূর্য্যাস্তকালীন বিহারের ছায়া দেবমন্দিরে পতিত হয়।

এই বিহারের ৩০ লি পূর্ব্বে একটী স্তূপ আছে। এই স্থানে সারিপুত্র অবিশ্বাসীদিগের সহিত তর্ক করিয়াছিলেন। যখন শুদ্ধোদন জিতবন বিহার নির্ম্মাণার্থ ক্রয় করিয়াছিলেন, তখন সারিপুত্র স্থান পর্য্যবেক্ষণের জন্য শুদ্ধোদনের সঙ্গগামী হইয়াছিলেন। এই সময়ে অবিশ্বাসীদিগের ছয় জন পণ্ডিত তাঁহার ঐশ্বরিক ক্ষমতা বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সারিপুত্র তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। নিকটেই একটি বিহার এবং উহার সম্মুখেই একটী স্তূপ। এই স্থানে তথাগত অবিশ্বাসীদিগকে পরাজিত করিয়া বিশাখার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

স্তূপের দক্ষিণে, যে স্থানে বুদ্ধদেব বিশাখার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন তথায় বিরুদ্ধকরাজ শাক্যবংশ ধ্বংস করিবার জন্য একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বুদ্ধদেবকে দেখিয়া সৈন্যাধিনীকে বিদায় দিয়াছিলেন। বিরুদ্ধকরাজ সিংহাসনারূঢ় হইয়া প্রাক্তন অপমানের প্রতিশোধ লইবার একদল সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া, গ্রীষ্মান্তে সৈন্যবিন্যাস পূর্ব্বক অগ্রসর হইলেন। জনৈক ভিক্ষু এই সংবাদ অবগত হইয়া বুদ্ধদেবকে নিবেদন করিল। পৃথিবীপতি এই সময় একটী শুষ্ক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট ছিলেন। রাজা বিরুদ্ধক ওঁহাকে এইভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া কিছু দূরে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, বুদ্ধকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইস্থানে প্রচুর নবীন ও ছায়াশীল বৃক্ষ থাকা সত্ত্বেও কি কারণে আপনি এই শুষ্ক বৃক্ষমূলে আসীন আছেন?" পৃথিবীপতি উত্তর করিলেন "আমি যে স্বজনের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই বংশের শাখা প্রশাখা শুষ্ক হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। সুতরাং সেই বংশীয় লোকের আর ছায়া ভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই।" রাজা এই সদুত্তর শুনিয়া বলিলেন "পৃথিবীপতি তাঁহার বংশের প্রতি সম্মান দেখাইয়া আমাকে পরাস্ত করিলেন।" এই বলিয়া রাজা বুদ্ধদেবকে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করিয়া, নিজ সৈন্যদের বিদায় দিয়া সবেগে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইহার সন্নিকটেই একটি স্তূপ আছে; শাক্য-

কুমারীগণকে এই স্থানেই হত্যা করা হইয়াছিল। রাজা বিদূরক শাক্যবংশ ধ্বংস করিয়া নিজ জয় ঘোষণা করিবার জন্য অন্তঃপুর হইতে ৫০০ শত শাক্য কুমারিকে আনয়ন করেন। কুমারিগণ ঘৃণা ও ক্রোধে রাজা ও রাজপরিবারকে নিন্দা করিতে থাকে। রাজা এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের হত্যার আদেশ দেন। রাজকর্ম্মচারিগণ, রাজাদেশ প্রতিপালনে তৎপর হইয়া প্রথমতঃ কুমারিগণের হস্ত পদ ছেদন করিয়া পরে তাহাদের কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করে। কুমারিগণ দুঃখে বুদ্ধদেবের সাহায্য প্রার্থনা করে। পৃথিবীপতি নিজ পুণ্যবর্দ্ধন শক্তি দ্বারা কুমারিদের যন্ত্রণা ও সন্তাপের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া একজন ভিক্ষুকে নিজ কৌষেয় বস্ত্রসহ তথায় পাঠাইয়া কুমারিগণের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচার করিতে আদেশ করেন। তদন্তে তাহারা দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তৎপর দেবাধিপতি শক্র ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কুমারিগণের অস্থিসংগ্রহান্তর দাহ করেন। জনশ্রুতি এইরূপই শুনিতে পাওয়া যায়।

শাক্য কুমারিগণের হত্যার নিদর্শন স্বরূপ স্তূপের সন্নিকটেই একটি শুষ্ক হ্রদ আছে। এই স্থানেই বিদূরকরাজ সসৈন্যে নরকে পতন করেন। পৃথিবীপতি শাক্যকুমারিগণকে দর্শন করিয়া জিতবনে প্রত্যাগমন করেন এবং তথায় ভিক্ষুগণকে বলেন যে বিদূরক রাজার নরক হইয়াছে; সাতদিবস পরে রাজা অগ্নিতে দগ্ধ হইবেন। রাজা এই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হন। সপ্তদিবসেও তাঁহার কোন হানি না ঘটাতে তিনি আনন্দিত চিত্তে পরিবারবর্গসহ এই হ্রদতীরে উপস্থিত হইয়া মদ্যপান ও স্ত্রীতাদি দ্বারা আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার ভয় দূরীভূত হয় নাই। যখন তিনি দ্রুতবেগে এইরূপে বিহার করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ তরঙ্গ মধ্য হইতে অগ্নি উত্থিত হইয়া তাঁহার ক্ষুদ্র নৌকাকে দাহ করিল এবং রাজা নিজেও যন্ত্রণাভোগ করিবার জন্য নিম্নতম নরকে পতন করিলেন।

সঙ্ঘারামের ৩০ লি উত্তর পশ্চিমে আমরা আম্র-বনোদ্যানে পৌঁছি। এই স্থানে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন আছে এবং অনেক ধার্ম্মিক পুরুষ এই স্থানেই সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। এই সকলস্থলেই প্রস্তরলিপি বা স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

প্রাচীন কালে এই দেশে ৫০০ শত দস্যু ছিল। উহারা নগর ও গ্রাম মধ্যে বিচরণ ও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। রাজা প্রসেনজিৎ তাহাদের ধৃত করিয়া প্রত্যেকের চক্ষু উৎপাটন পূর্ব্বক, তাহাদের এক নিবিড় বনমধ্যে পরিত্যাগ করেন। দস্যুগণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বুদ্ধদেবের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকে। তথাগত এই সময়ে জিতবনের বিহারে ছিলেন এবং তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তিবলে দস্যুগণের করুণ রব শ্রবণ করিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আদেশ করিলেন—"হে সুনীল পর্ব্বত বীর পবন প্রবাহে ঔষধিপত্র বহন করিয়া ইহাদের দৃষ্টিশক্তি দান কর।" এই আদেশে তৎক্ষণাৎ তাহারা দৃষ্টি শক্তি লাভ করিয়া দেখিল যে, পৃথিবীপতি তাহাদের সম্মুখে বর্ত্তমান। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পরমানন্দিত চিত্তে তাহারা বুদ্ধদেবকে পূজা করিল এবং তাহাদের ভ্রমণ যষ্টি তথায় রোপিত করিয়া প্রস্থান করিল। এইপ্রকারে ঐ সকল যষ্টি বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে।

রাজধানীর প্রায় ১৬ লি উত্তর পশ্চিমে একটী প্রাচীন নগর আছে। তখনকার যখন মনুষ্যের বিশ হাজার বৎসর পরমায়ু ছিল তখন কস্যপ বুদ্ধ এই নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নগরের দক্ষিণে একটী স্তূপ আছে। শিক্ষালাভ করিয়া তিনি তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। নগরের উত্তরে একটী স্তূপে কস্যপ বুদ্ধের শরীর রক্ষিত আছে। উপরোক্ত দুইটী স্তূপই অশোকরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্থান হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ৫০০ লি যাইয়া আমরা কপিলবস্তুতে পৌঁছি।

সঞ্চিত ধন।

১

তন্দ্রাবসানে বৃদ্ধা যখন নয়ন উন্মীলন করিল, তখন চিম্‌নির আগুন প্রায় নিভিয়া গিয়াছে। সে শাল খানি টানিয়া, তাহার অনাবৃত স্কন্ধদেশ আবৃত করিয়া, তাহার পুরাতন ঘড়িটির দিকে চাহিল। সে নিজে অত্যন্ত বৃদ্ধা হইলেও ঘড়িটি তাহার অপেক্ষাও বৃদ্ধ। ঘড়িটি আজীবন বিহারের সময় তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সাথী।

"আজ ওরা বড়ই দেরী করিতেছে,—" বৃদ্ধা মৃদু মৃদু স্বরে আপনা আপনি বলিতে লাগিল। "চায়ের সময় হইয়া গিয়াছে, —পিপাসায় আমার গলা শুকাইয়া গিয়াছে, উহারা কি আমার কথা ভুলিয়াই গেল?"

এমন সময় কুটির দ্বার ঠেলিয়া যুবক-যুবতী দুইজন প্রবেশ করিল। তাহারা বৃদ্ধার পুত্র ও পুত্রবধু। আজ পঞ্চদশ বৎসর পতিহীনা, চলৎশক্তিরহিতা বৃদ্ধা ইহাদের গলগ্রহ। তাহাদের দেখিয়া বৃদ্ধা একটু ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—

"আজ এত দেরী যে?"

যুবক কোন উত্তর না দিয়া পার্শ্বের গৃহে প্রবেশ করিল,—যুবতী একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া রুক্ষস্বরে বলিল,—

"তোমার চায়ের সময় হইলেই বুঝি আমাদের আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবে? টমের তো কাজ আছে, আমিও বসিয়া খাই না। আমাদের তো দিন রাত চেয়ার ঠাসিয়া বসিয়া আগুন পোয়াইলেই চলে না!"

করুণকণ্ঠে বৃদ্ধা বলিল,—

"তাহাতো সত্যই বাছা! তোমরাই খাটিয়া সারা হইলে,—আমিতো এখন কোন কাজেই লাগি না। শুধু তোমাদের গলগ্রহ হইয়া আছি।"

পুত্রবধূ আর কিছু বলিল না—উঠিয়া ছোট একটি টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম সাজাইতে লাগিল। দেওয়ালসংলগ্ন ছোট আলমারী হইতে রুটি ও মাখন বাহির করিল। চা প্রস্তুত হইলে স্বামীকে ডাকিয়া, বৃদ্ধার চেয়ার ঠেলিয়া টেবিলের নিকট লইয়া গিয়া তাহার সম্মুখে এক পেয়ালা চা ও এক খণ্ড মাখনশূন্য রুটি রাখিয়া দিল। বৃদ্ধা চা খাইতে খাইতে ভীতনয়নে একবার পুত্র ও একবার পুত্রবধূর মুখের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহার প্রিয়তম ঘড়িটির মত, এই পুত্র ও পুত্রবধূর মুখের প্রত্যেক ভাব তাহার বিশেষ পরিচিত হইয়া গিয়াছিল। তবে সে উভয়ের মধ্যে এইটুকু তফাৎ দেখিত যে, ঘড়িটির চেহারা জীবন ভরিয়া সে এক রকমই দেখিয়াছে, কিন্তু পুত্র ও পুত্রবধূর দৃষ্টি অধিকাংশ সময়েই কঠিন ও স্নেহশূন্য।

চা পান শেষ হইল, টম উঠিয়া পাইপ ধরাইয়া পুনরায় বাগানে গেল। পুত্রবধূ চায়ের বাসন ধুইয়া মুছিয়া যথা সময়ে তুলিয়া রাখিল। তারপর স্বশ্রূর চেয়ারখানি ঠেলিয়া পুনরায় চিমনির নিকট সরাইয়া দিয়া বাগানে স্বামীর সহিত মিলিত হইল।

বৃদ্ধা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল! আহা! তাহারা যদি দয়া করিয়া একদিনও তাহার চেয়ারখানি বাগানে বাহির করিয়া দিত,—

তাহা হইলে উন্মুক্ত আকাশের নির্ম্মল সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহার প্রাণটা বিমল আনন্দে পূর্ণ হইত। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর সে তাহার শয্যা ও এই চেয়ার খানির উপরই কাটাইয়াছে,—সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর উদার গগনের স্নিগ্ধ বায়ু তাহার অঙ্গস্পর্শ করে নাই।

দিনের আলোক ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল,—সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল, সে পুনরায় তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

সহসা বাহিরে পুত্র ও পুত্রবধূর কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। পুত্র বলিতেছে,—

"—যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়, টের পাইলে কি হইবে বুঝিতেই পার ছাপ্।"

স্ত্রী উত্তর করিল,—

"হ্যাঁ মাকে এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ঠিক।

কিন্তু এস্থান ত্যাগ করিতে আমার মন সরিতেছে না। গৃহ শূন্য অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ান তো বড় সুখের নয়!"

টম বলিল,—

"তা কি করিব বল? চাকরী যখন গিয়াছে তখন উপবাস করিয়া তো মরিতে পারি না। কাজের চেষ্টায় বাহিরে হইতেই হইবে।" বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার সমস্ত শরীরের রক্ত দ্রুত চলিতে লাগিল,—সে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আজ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সে নববধূ রূপে এই কুটিরে প্রবেশ করিয়া ছিল,—ইহার প্রত্যেক জিনিষ প্রত্যেক কোণের সহিত তাহার কত সুখদুঃখস্মৃতি বিজড়িত। ইহার এক এক খানি ইষ্টক তাহার এক একখানি অস্থিতুল্য। সে আবেগ পূর্ণস্বরে আপনা আপনি বলিতে লাগিল,—

"না—না—তাহা হইতে দিব না। যাহারা আমার জন্য অনেক করিয়াছে,—আমি সে জন্য অকৃতজ্ঞ নই। কুটীর ত্যাগ করিতে দিব না। তোদের অকর্ম্মণ্য বুড়ী না আজ দেখাইবে সে একেবারে অকৃতজ্ঞ নয়।"

প্রিয়তম ঘড়িটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে মৃদু হাসিল। ঘড়িটির পশ্চাদ্ভাগে, একটি গুপ্ত স্থান ছিল,—সে কথা আর কেহই জানিত না। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে গৃহধর্ম্ম আরম্ভ করিয়া সে এক পেনী দুই পেনী করিয়া সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সঞ্চিত অর্থ সেই গুপ্ত স্থানে রাখিত।

পেনী হইতে শিলিং, শিলিং হইতে পাউণ্ড, এইরূপে এক শত পাউণ্ড সে যে কি করিয়া সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা তাহার স্বামী পর্য্যন্ত কোন দিন টের পান নাই। মৃত্যুর সময় পুত্রকে সেই ধন সমর্পণ করিবে ইহাই প্রাণের একান্ত বাসনা ছিল। পুত্র ও পুত্রবধূর বাক্যালাপ শুনিয়া সেই মুহূর্ত্তেই সে স্থির করিয়া ফেলিল যে,—সেই সঞ্চিত ধন কলাই তাহাদিগের হস্তে সে সমর্পণ করিবে। বৃদ্ধা কল্পনাচক্ষে দেখিল ক্লান্সির সুন্দর কঠোর মুখখানা বিস্ময়ে ও আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে,—টমের শ্রান্তদৃষ্টি হর্ষ ও ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কল্পনা চক্ষে এই দৃশ্য দেখিয়া তাহার হৃদয়ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সহসা পুনরায় পুত্রের কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল,—

"হাঁ। দেখ ন্যান্সি, আমাদের বেশী ঘুরিয়া মরিতে হইবে না। আমি কোন স্থানে কিছু গুপ্তধনের আবিষ্কার করিয়াছি। তাহা দিয়া আমরা অন্য কোন ভাল স্থানে গিয়া কিছু দিন বেশ সুখে থাকিতে পারিব,—ততদিনে চেষ্টা করিয়া কাজের যোগাড়ও হইবে।"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ন্যান্সি বলিল,—"তুমি কি বকিতেছ? আমি তো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!"

হাসিতে হাসিতে টম বলিল,—"বুঝিবে কি করিয়া? আমি সেদিন মায়ের ঐ পুরাণ খাঁড়িটা মেরামত করিতে গিয়া উহার পিছনে একটি গুপ্ত স্থান আবিষ্কার করিয়াছি। তাহার মধ্যে একটা থলিতে একশো চকচকে সভারিন আছে।" "টম!" সোৎসুক ভাবে ন্যান্সি বলিল,—"টম! সত্যই বলিতেছ?"

"সত্য নয়তো কি মিথ্যা? আজ রাত্রে মা ঘুমাইলে ঐ থলি বাহির করিয়া আমরা দুই জনে এ কুটির ত্যাগ করিয়া যাইব।" বৃদ্ধা দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনিতে লাগিল।—

ন্যান্সি বলিল,—

"আর মা? তাঁর কি বন্দোবস্ত হইবে?" ঘৃণাপূর্ণ স্বরে টম উত্তর করিল,—

"ও বুড়ীটাকে কে সঙ্গে করিয়া ঘুরিবে? ও বোঝা এখন ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলে বাঁচি। এখানে অনাথ আশ্রম আছে,—তাহারা সংবাদ পাইলেই আসিয়া লইয়া যাইবে।"

একটু ভর্ৎসনার সুরে ন্যান্সি বলিল,—"অনাথ আশ্রম! ছিঃ টম!"

"আমরা অনেক দিন তাহাকে পালন করিয়াছি, আর পারি না। এখন অনাথ আশ্রম তার কাজ করুক।"

তাহারা দূরে সরিয়া গেল,—তাহার পুত্রের শেষ কথা গুলি বৃদ্ধার বক্ষে আসিয়া শেলের মত বিঁধিতে লাগিল। সে বলিতেছিল,—

"ও বুড়ীটার কথা ভাবিয়া তুমি মন খারাপ করিও না ন্যান্সি! সে এতদিন আমাদের কথা ভাবে নাই, টাকাগুলি লুকাইয়া রাখিয়া আমাদের ঘাড়ে বসিয়া খাইয়াছে। ভাগ্যে আমি সেদিন ঐ খাঁড়িটা মেরামত করিতে গিয়াছিলাম,—না হইলে কি হইত ভাবিয়া দেখতো? বুড়ী মরিয়া গেলেই তো আর জানিতে পারিতামনা,—ওটাকে হয়তো বিক্রী করিয়া ফেলিতাম। আজ রাত্রেই ও টাকাগুলি লইয়া আমরা দুজনে এ কুটির হইতে চলিয়া যাইব।" তাহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। কম্পিতবক্ষ দুই হস্তে চাপিয়া, বৃদ্ধা অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে কষ্টে তাহার ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল,—তাহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তাহার প্রিয়তম পুত্র,—তাহার প্রথম সন্তান আজ তাহাকে ভিখারিণীর ন্যায় অনাথিনী আশ্রমবাসী করিবার কল্পনা করিতেছে! চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে লজ্জানম্র নববধূরূপে যে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই গৃহ হইতে বিতাড়িত করিবার আয়োজন করিতেছে! হায়-নিয়তি! এইরূপ অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা, এইরূপ অকৃতজ্ঞতা কি সম্ভব? দুর্ব্বল চলৎশক্তিহীনা মাতাকে এইরূপে ত্যাগ করিয়া

যাইতে তাহার পাষাণহৃদয়ে কি মুহূর্ত্তের জন্যও একটু অনুতাপ আসিবে না? হা রে হতভাগ্য সন্তান! যে ধনের লোভে এই নিষ্ঠুরতা করিতে উদ্যত হইয়াছ, মুহূর্ত্তপূর্ব্বে মাতা যে সেই ধনই তোমাকেই সমর্পণ করিবার কল্পনা করিতেছিল!

অশ্রুহীন শ্রান্ত নেত্র তুলিয়া সে একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল,—তার পর পুনরায় চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া দুই হস্তে শ্রান্ত মস্তক রক্ষা করিল। এই কুটিরে আর একরাত্রি সে বাস করিতে পারিবে। কত সুন্দর মধুর পবিত্র স্মৃতিতে এই কুটির পরিপূর্ণ—ইহার সহিত তাহার জীবনের সকল সুখদুঃখ বিজড়িত। মৃত্যু কতবার তাহার করাল ছায়া নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে শোকাতুর করিয়াছে—প্রিয়জনকে মৃত্যুর কোলে তুলিয়া দিতে কতবার তাহার হৃদয় চূর্ণ হইয়াছে। একটি অবাধ্য কুপথগামী পুত্রকে গৃহতাড়িত হইতে দেখিয়া মাতৃহৃদয় অসহনীয় দুঃখ সহ্য করিয়াছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল দুঃখস্মৃতি পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল,—সুখ স্মৃতি সকল উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছিল। তাহার জীবনের সন্ধ্যা গত হইয়া রাত্রি সমুপস্থিত,—জীবনের অবশিষ্টাংশ সে এই কুটিরেই যাপন করিয়া, সময় হইলে এই সকল পবিত্র স্মৃতির মধ্যেই আপনার মুক্ত আত্মা অনন্তের পানে ছুটাইয়া দিবে, এই আশাই হৃদয়ে সর্ব্বদা পোষণ করিত। কিন্তু হায়! একি হইল? এ পাপ-রোধ করিবার শক্তি তো তাহার নাই,—সে যে বড় দুর্ব্বল! সে যে অশক্ত!

চিমনির আগুন নিভিয়া গিয়া গৃহ ক্রমেই শীতল হইতেছিল। টেবিলের উপস্থিত ল্যাম্পের তেল ফুরাইয়া গিয়াছিল,—বাতি দু-একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া, একেবারে নির্ব্বাপিত হইল। বৃদ্ধার সে জ্ঞান ছিল না,—তাহার হৃদয়ে আজ যে ঝড় উঠিয়াছে তাহার তুলনায় এই অন্ধকার তাহার নিকট কি!

সহসা বাহিরের দ্বারে কে মৃদু করাঘাত করিল।

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল,—"কে?"—কেহই কোন উত্তর দিল না। কিন্তু পরক্ষণেই দ্বার খুলিয়া গেল, একটা দীর্ঘাকৃতি লোক প্রবেশ করিয়া, দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ করিল, বৃদ্ধা অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করিল,—কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না, "তুমি কে? কি চাও?" বলিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। আগন্তুক কোন উত্তর না করিয়া, তাহার স্বর লক্ষ্য করিয়া, তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভীতি-বিহ্বল স্বরে বৃদ্ধা বলিল,—

"তুমি যদি অর্থের সন্ধানে আসিয়া থাক তবে ফিরিয়া যাও! আমাদের কিছুই নাই,—আমরা বড় দরিদ্র।"

এই বার আগন্তুক কথা কহিল। বৃদ্ধার চরণতলে বসিয়া, তাহার মুখের প্রতি তাকাইয়া বলিল,—

"আমি চোর নহি। আমাকে চিনিতে পারিতেছনা—মা! আমি যে "ডিক্"!

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল,—"ডিক্!"

তাহার প্রিয়তম পুত্র ডিক্! তাহার গৃহতাড়িত পুত্র ডিক্! শৈশবে মাতৃস্তন্য পান করিতে করিতে নির্ম্মল চক্ষু দুটি মাতার মুখের প্রতি স্থাপন করিয়া শুভ্র হাসিরাশি যখন মাতার হৃদয় বিমল আনন্দে পূর্ণ করিত,—তখন হতভাগিনী মাতা স্বপ্নেও ভাবে নাই,—সেই ডিক একদিন তাহার হৃদয় চূর্ণ করিবে। যৌবনে স্খলিতচরিত্র হইয়া, যেদিন পিতাকর্ত্তৃক গৃহতাড়িত হয়, সেদিন মাতার পক্ষে কি ভীষণ পরীক্ষার দিন গিয়াছিল!

আজ বিশ বৎসর পরে সেই ডিককে সম্মুখে দেখিয়া মাতার হৃদয় স্নেহসিক্ত হইল। স্নেহবিগলিত স্বরে বৃদ্ধা বলিলেন,—"ডিক! এতদিন পরে এলি বাবা! আজ পোনর বৎসর তোর পিতা আমাদের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন। তুই এতদিন কোথায় ছিলি? কোথা হইতে এতদিন পরে আসিলি?"

"আমি না আসিয়া থাকিতে পারিলাম না। মাগো! আমি জানি সকলে আমাকে ঘৃণা করিলেও, তুমি কখনই করিবে না। আমি পলায়ন করিয়া আসিয়াছি। সারাদিন ঝোপে ঝোপে লুকাইয়া ফিরিয়াছি। আজ দুইদিন কিছু খাই নাই—মা।"

"তুই কোথায় ছিলি? কিসের ভয়ে লুকাইয়াছিলি?"

"আমি জেল হইতে পলাইয়াছি—আজ দুদিন তারা আমার অনুসরণ করিতেছে। পাইলেই ধরিয়া লইয়া যাইবে,—তাহা অপেক্ষা আত্মহত্যা করা শ্রেয়ঃ।"

"জেল হইতে!" বেদনাপূর্ণস্বরে মাতা বলিলেন "জেল হইতে!" হায় ডিক্! এ কি কথা শুনাইলি!"

কাতরকণ্ঠে ডিক বলিল,—

"তুমিও বিমুখ হইবে—মা! আজ তিন দিন জঙ্গলে ফিরিয়াছি,—তোমার কাছে আসিতেছি এই আশ্বাসেই সে দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করিতে পারিয়াছি। তুমি বাঁচিয়া আছ কিনা জানিতাম না,—তবু একবার না আসিয়া পারিলাম না। তোমার এই অকৃতজ্ঞ সন্তান তোমার অমূল্য ভালবাসার কথা কখনই ভোলে নাই! তুমিও আমাকে তাড়াইয়া দিও না—মাগো! আমি বেশিক্ষণ থাকিতে পারিব না—এই কাপড়গুলি পরিবর্ত্তন করিবার মত কিছু কাপড় চোপড়, ও সামান্য কিছু অর্থ পাইলেই আমি চলিয়া যাইব,—আমার নামও আর তুমি শুনিতে পাইবে না।"

ডিকের কাতর কণ্ঠনিঃসৃত কথাগুলি শুনিতে শুনিতে মাতৃহৃদয় ব্যথিত হইল,—তাহার এই অকৃতজ্ঞ সন্তানকে বক্ষে টানিয়া লইবার জন্য—তাহাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল! এ যে তাহারই অধিকার! এ অধিকার হইতে যে সে বহুদিন বঞ্চিত আছে! টম ও তাহার হৃদয়হীনা স্ত্রীতো তাহাকে চায় না,—তাহারা তো তাহার স্নেহ পাইবার জন্য ব্যাকুল হয় না! সেতো তাহাদিগের নিকট ভার মাত্র! কিন্তু এই পাপী সন্তান মাতার নিকট স্নেহ ও সাহায্যলাভের জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে! সে যে বড় অসঙ্কোচে মাতৃহৃদয়ে অধিকার স্থাপন করিতে আসিয়াছে! ডিকের

কাতর মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার হৃদয় স্নেহ ও বেদনায় প্লাবিত হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে তাহার ক্ষীণহস্ত ডিকের মস্তকোপরি স্থাপন করিয়া বলিল,—

"হ্যাঁ যাহা আমি তোমাকে রক্ষা করিব। কিন্তু টম্ তোমাকে দেখিতে পাইলে আর রক্ষা নাই,—ভাগ্যে তাহারা এখন গৃহে নাই। ঐ ঘরে যাও, টমের কাপড় চোপড় যাহা পাও পরিয়া লও—তার পর ঐ আলমারীতে খাদ্যদ্রব্য সামান্য কিছু বোধহয় আছে—কিছু খাইয়া লও যাদু! কতদূর যাইতে হইবে তাহার ঠিক কি?"

ডিক বেশ পরিবর্ত্তনের জন্য পার্শ্বের গৃহে প্রবেশ করিলে, বৃদ্ধা ভীতিবিহ্বলনেত্রে একবার চারিদিকে চাহিল। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার মাতৃহৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছিল, কি করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে, এই চিন্তায় আকুল হইল।

সহসা সে চমকিয়া উঠিল! তাহার দৃষ্টি সেই পুরাতন ঘড়িটির উপর পড়িয়াছিল। টম তো আজ তাহার যত্ন সঞ্চিত সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করিয়া এই বিজন কুটিরে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। সেতো এই অর্থ ডিককে সমর্পণ করিয়া তাহাকে নিরাপদ করিতে পারে। সে যে ছোট শিশুটির মত তাহার পদতলে বসিয়া তাহাকে সুমধুর "মা" রবে ডাকিয়াছে!

ডিক্ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিল,—মাতার নির্দ্দেশমত দেওয়ালের গাত্রস্থিত আলমারী হইতে কিছু রুটী ও মাংস বাহির করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। মাতা সতৃষ্ণনয়নে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। এইতো তাহার হারাধন ফিরিয়া আসিয়াছে,—কিন্তু—কিন্তু এখনই তো সে আবার চলিয়া যাইবে! তাহার কুঞ্চিত কপোল বাহিয়া দু ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে ত্রস্তে তাহা মার্জ্জনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"ডিক্! তুমি এখান হইতে কোথায় যাইবে?" ডিকের আহার শেষ হইয়াছিল,—সে টেবিলের নিকট হইতে চেয়ার সরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—বহুদূরে! সেখানে দেবী প্রতিমা ও একটি অনিন্দ্য সুন্দর শিশু আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। মাগো! আমার সেই অসহায় শৈশবের কথা স্মরণ করিয়া ক্ষমা কর। আমার নিকট যে অর্থ আছে তাহাদ্বারা আমি বেশী দূর যাইতে পারিব না।—সামান্য কয়েকটি শিলিং হইলেই আমি কোন রকমে চলিয়া যাইতে পারিব বোধহয়। তাহা না হইলে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

তাহার বাহুতে হস্তার্পণ করিয়া দৃঢ়স্বরে মাতা বলিল,—

"অর্থ তোমায় আমি দিব। কিন্তু বাবা! আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর আর কখনও অসৎ পথে যাইবে না,—ভদ্র সন্তানের মত জীবন যাপন করিবে।"

ম্লাননেত্রে মাতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া ডিক্ কহিল,—

"তোমার নিকট শপথ করিতেছি, নির্ব্বিঘ্নে স্ত্রীপুত্রের নিকট পৌঁছিতে পারিলে আর কখনও মন্দ পথে যাইব না,—ভদ্র সন্তানের মত জীবন যাপন করিব।"

পুরাতন ঘড়িটির প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া মাতা বলিল,—

"বাছা! ঐ ঘড়িটির পিছনে একটি গুপ্ত স্থান আছে, তাহাতে একটি ব্যাগে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা আছে। বিবাহের পর হইতে অতি কষ্টে ঐ অর্থ সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছি, কিন্তু একটি মুদ্রা অদ্যাপি স্পর্শ করি নাই। আজ আমার আশীর্ব্বাদের সহিত উহা তোমায় সমর্পণ করিলাম,—ভগবান তোমায় রক্ষা করুন।"

"স্বর্ণমুদ্রা!" ডিক্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, স্বর্ণমুদ্রা! কিন্তু মা! উহাতে তোমার প্রয়োজন নাই?"

ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বৃদ্ধা বলিল,—না বাবা! উহার দ্বারা আমার কি প্রয়োজন? কষ্ট করিয়া সঞ্চয় করিয়াছি। এক্ষণে নূতন জীবন আরম্ভ করিবার জন্য উহা তোমায় দিলাম। ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর আমার কি হইতে পারে?"

ডিক্ মাতার নির্দ্দেশ মত ঘড়ির পশ্চাদ্ভাগস্থিত একটি স্প্রীং টিপিয়া ধরিল,—একটি ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া গেল,—তাহার মধ্যে একটি ব্যাগ! তাহা বাহির করিয়া বিস্মিতনেত্রে মাতার প্রতি চাহিয়া বলিল,—"এ যে ভয়ানক ভারী,—কত মুদ্রা আছে?"

"এক শত পাউণ্ড!" গর্ব্বভরে বৃদ্ধা বলিল, "এক শত পাউণ্ড! চল্লিশ বৎসরের সঞ্চয়!"

ডিক বলিল,—

"মা! এ সব অর্থ আমি লইব না,—ইহা হইতেই পারে না। তোমার এত ভালবাসার যোগ্য আমি কোন দিন নই,—তোমাকে চিরকাল কষ্টই দিয়াছি। এই অর্থ লওয়া অপেক্ষা জেলে ফিরিয়া যাওয়া আমি শ্রেয় বিবেচনা করি।" মৃদু হাসিয়া মাতা বলিল,—

"লও বাবা লও ইহাতে কোন দোষ নাই। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি,—আজ আছি কাল নাই, কে কখন উহা চুরি করিয়া লইয়া যাইবে তাহার ঠিক কি? তোমার স্ত্রী পুত্রের জন্য উহা তোমায় দিলাম।"

মাতার পদতলে নতজানু হইয়া দুই হস্তে তাহাকে বেষ্টন করিয়া গদ্‌গদ্ স্বরে ডিক্ বলিল,—

"মাগো! যখন সকলে বিমুখ হইয়াছিল, তখন তোমার অসীম স্নেহের কথা স্মরণ করিয়াই বাঁচিয়া ছিলাম। জেল হইতে বাহির হইয়া তোমার কথা মনে করিয়াই প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তখনও জানিতাম না তুমি এইরূপে তোমার স্নেহ আমাকে জানাইবে। তুমি আজ শুধু আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিলে না,—আমাকে পুনর্জ্জন্ম দান করিলে, আমাকে নরক হইতে উদ্ধার করিলে, তোমায় আর কি বলিব, মা! তোমার স্মৃতি হৃদয়ে লইয়াই আমি সকল বিপদ, সকল প্রলোভন জয় করিব।"

ডিক্ দেখিল, তাহার মাতার মুখ অসীম সুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে পুনরায় বলিল,—"মা! তুমি ঠিক কথা বলিতেছ তো? এ অর্থে তোমার কোন প্রয়োজন নাই?"

মস্তক সঞ্চালন করিয়া মাতা বলিল,—"না বাবা! টম ও তাহার স্ত্রী আমার জন্য সবই করে। আমার কোন কষ্ট নাই।"

অল্পক্ষণ পরে কুটিরের দ্বার উন্মোচন করিয়া ডিক্ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। তাহার পদশব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমে বাতাসে মিলাইয়া গেলে, তাহার মাতা একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চেয়ারের গায় ঢলিয়া পড়িল। সেই নিশ্বাসের সঙ্গে যেন তাহার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা সে বিসর্জ্জন দিল। ডিকের পদশব্দের সঙ্গে সঙ্গে যেন এ জগতের সহিত তাহার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। নিজের জন্য কোন ভয়, কোন ভাবনা আর তাহার রহিল না, সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

* * *

টম্ ও ন্যান্সি যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিল, তখন রাত্রি গভীর। টম অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়াছিল, সুতরাং তাহার মেজাজ বড়ই রুক্ষ হইয়াছিল। গৃহ প্রবেশ করিয়া গৃহ অন্ধকার দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—বেজায় অন্ধকার! বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে বাতিতে একটু বেশী তেল দিয়া গেলে কি দোষ হইত?"

ন্যান্সি বলিল,—"চুপ-চুপ আস্তে কথা বল, একটা দিয়াশালাই দাও এখনই বাতি ধরাইয়া দিতেছি।"

বাতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেই ন্যান্সির দৃষ্টি চেয়ারোপবিষ্টা বৃদ্ধার উপর পড়িল, সে একটু দুঃখিতভাবে বলিল,—

"আহা! মাকে বিছানায় দিয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, বেচারী সেই অবধি চেয়ারে বসিয়া আছে।"

টম একটি সুবৃহৎ হাই তুলিয়া বলিল, তবে দাও ওকে বিছানায়,—তারপর আমাকে কিছু খাইতে দাও। কাল সকালেই চলিয়া যাইতে হইলে হাতে অনেক কাজ আছে।"

বৃদ্ধা দুই হস্ত বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া অপেক্ষাকৃত কোমলস্বরে ন্যান্সি বলিল,—

"মা! ওঠ—শুইতে যাইবে চল। পর-ক্ষণেই সর্পাহতের ন্যায় চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"টম্—টম্। এ যে মৃতদেহ।"

টম্ নিকটে আসিয়া মাতার স্থির মুখের প্রতি চাহিল। একি! মুখে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন সব মিলাইয়া গিয়া একটি শান্ত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ মুখ যে আনন্দভরা! টম বলিল,—ন্যান্সি! যাহা হয় ভালর জন্যই হয়। এখন আর এই অর্থ আমায় চুরী করিতে হইবে না, উহা এখন ন্যায়তঃ আমারই। আমিই তাহার উত্তরাধিকারী।" টম গৃহ পার হইয়া ঘড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

সহসা মৃত্যুর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ভীষণ চীৎকার ধ্বনি উত্থিত হইল,—ন্যান্সি—ন্যান্সি—সর্ব্বনাশ হইয়াছে সমস্ত অর্থ চুরী গিয়াছে।"

"চুরী?" ন্যান্সি বলিল,—"চুরী! তবেই ঠিক হইয়াছে! চোর দেখিয়া ভয় পাইয়াই তাহা হইলে মার মৃত্যু হইয়াছে।" স্বামীতে স্ত্রীতে মিলিয়া অর্থের জন্য বিলাপ করিতে লাগিল। কিন্তু সেই অর্থের বাস্তব সংবাদ সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বকর্ম্মের জাগ্রৎ অন্তর্য্যামী প্রহরী ও একটি প্রাণভয়ে ভীত পলাতক আসামী ভিন্ন কেহই জানিল না।

মাতৃঋণ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আরাম-কুঞ্জ।

"না, জ্যাক্, তোমার কোন ভয় নেই আর তোমাকে জিমনেসে যেতে হবে না—সেখানে কখনো তোমাকে পাঠাব না আমি। তারা তোমার গায় হাত তোলে—এত দূর স্পর্দ্ধা তাদের! বেশ করেছ, তুমি পালিয়ে এসেছ! ছিঃ বাবা—চোখ ছল ছল করছে কেন, এখনও? না, ভয় কি? আর কখনো তোমায় আমি কাছ-ছাড়া করব না। এ বেশ দেশ—কোন গোলমাল নেই—গাড়ীর ঘড়-ঘড়ানি নেই, লোক জনের ভিড় নেই। বাড়ীতে কত কি পুষেছি দেখবে—পায়রা, খরগোশ, মুরগী, ছাগল, গাধা। ভাল কথা, এখনও আজ তারা খেতে পায় নি। আমি সব ভুলে গেছি। তোমাকে দেখে কিছু মনে ছিল না। তুমি সুরুয়া খেয়ে একটু ঘুমোবে চল। সারা পথ হেঁটে তোমার বড় কষ্ট হয়েছে। আহা, কাল আমি যখন নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় শুয়ে আরামে ঘুমচ্ছিলাম, তখন বাছা আমার সেই অন্ধকার রাত্রে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছ! কি ভয়ঙ্কর জ্যাক! ঐ শোন, পায়রাগুলো ডাকছে—আমি তাদের খাওয়াইগে—তুমি সুরুয়াটুকু খেয়ে এখন একটু ঘুমোও।"

ইহা ধীরপদে চলিয়া গেল!

জ্যাকের চক্ষে নিদ্রা আসিল না। একটু বিশ্রাম,—তার পর স্নান শেষ করিয়া রন্ধন-কারিণী আর্কার তৈয়ারী সুরুয়া পান করিয়া তাহার ক্লান্তি অনেকখানি ঘুচিয়া গেল। নূতন দেশের অভিনবত্বে, মাতৃদর্শনলাভে, কিশোর হৃদয়ের সহজ প্রফুল্লতায় নিমেষেই সে গতরাত্রের সমস্ত ক্লেশ ভুলিয়া গেল। সে মুগ্ধ নেত্রে দেখিল, কি অপূর্ব্ব শান্তি, অভাবনীয় বিরামে চারিধার ভরিয়া রহিয়াছে!

তাহার ছোট গৃহটি সূর্য্যালোকে ঝল্ ঝল্ করিতেছিল। বাহিরে পল্লীর সরল অনাড়ম্বর শোভা, বৃক্ষশ্রেণীর পত্রঘন শাখায় বসিয়া পাখীর ঝাঁক কলকাকলী তুলিয়াছে, ছাদে অসংখ্য পারাবতের কলরব—সর্ব্বোপরি মাতার মিষ্ট কণ্ঠস্বর,—সমস্ত হইতে কি বিপুল মধুরতা নির্ঝরের মত সহস্রধারে ঝরিয়া পড়িতেছে! যেন চারিদিকে কি এক মহা উৎসবের রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে! জ্যাকের চিত্ত একটি নিশ্চিন্ত আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিল।

কিন্তু এ আনন্দে একটু বিঘ্ন ঘটিল। সহসা সে দেখিল, মাতার শয়নকক্ষে দেওয়ালে আর্জেন্তাঁর এক সুবৃহৎ তৈলচিত্র ঝুলানো—মুখেশ্বরের একটা বিকটভাব—চোখ দুটাতে হিংসার জলন্ত বহ্নি—শত চেষ্টাতেও চিত্রকর এ ভাব ঢাকিতে পারে নাই।

জ্যাক ভাবিতে লাগিল। কোথায় সে? সে কি এখানেই থাকে? তবে দেখা নাই, কেন? অবশেষে চিত্রখানার সম্মুখে থাকা অসহ্য বোধ হওয়ায় জ্যাক মার নিকট গেল।

ইঁহা তখন মুরগীগুলাকে আহার দিতে ছিল। আদরিণী সেবাপরায়ণা নারীর

মুখ কি এক মহিমার আলোকে বিচিত্র সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। জ্যাক সগর্ব্বে মার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আর্কা আসিয়া কহিল, "এইটিই বুঝি, ছেলে? বেশ ছেলেটি।"

"নয় কি, আর্কা? আমিত বলেও ছিলাম।"

"ছেলেটি ঠিক মার মত হয়েছে—বাপের মত কোনখানাই নয়। যেমন মুখ চোখ, তেমনি গড়ন।"

বাপের মত! কথাটা জ্যাকের বুকে শেলের মত বিঁধিল। বাপ!

"ঘুম হলোনা, বুঝি, জ্যাক—তবে এস, সব দেখবে।" বলিয়া ইদা জ্যাককে লইয়া ঘর দেখাইতে চলিল।

গ্রামের প্রান্তে ছোট বাড়ীখানি,—দেখিতে ছবির মত সুন্দর। চারিধারে ছোটখাট বন—অদূরে একটা নদী বহিয়া চলিয়াছে—জানালা হইতে তাহার ক্ষীণ স্রোত রুপালি সুতার মত দেখা যায়। নদীর পরপারে ঝোপের মধ্য দিয়া সরুপথ জাগিয়া রহিয়াছে—সে যেন কোন্ অজানা স্বপ্নরাজ্যের সীমানায় গিয়া মিশিয়াছে।

একটি সজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া ইদা কহিল, "এই ঘরে উনি কাজকর্ম্ম করেন।"

এই উনিটি কে—তাহার পরিচয় লইবার জন্য জ্যাক এতটুকু ঔৎসুক্য জানাইল না। শুধু তাহার মর্ম্মস্থল হইতে আলামর একটা তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ইদার অজ্ঞাতে নীরবে বায়ুতে মিলাইয়া গেল।

মৃদুস্বরে ইদা কহিল, "উনি দেশ বেড়াতে গেছেন। শীঘ্রই ফিরবেন। আমি তাঁকে তোমার আসার কথা আজই লিখব। তাহা খুসী হবেন তিনি। তাঁর মেজাজটা একটু রুক্ষ হলেও, বড় ভাল লোক তিনি—তোমায় খুবই ভালবাসেন। তুমিও তাঁকে ভালবেস, জ্যাক। বাসবে ত? তোমাদের দুজনের মধ্যে ভালবাসা না হলে, আমার মনে কখনো আমি সুখ পাব না।"

কথাটা বলিয়া ইদা দেওয়ালে লম্বিত আর্ক্রেঁর তৈলচিত্রখানার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। তার পর কহিল, "বল, জ্যাক, তুমি তাঁকে ভালবাসবে—বল, তা শুনলে তবে আমি আশ্বস্ত হব।" ইদা জ্যাককে আপনার বুকে চাপিয়া ধরিল।

ইদার কণ্ঠস্বরে একটা করুণ সুর বাজিয়া উঠিল। জ্যাক সরিয়া মার মুখের দিকে চাহিল, ধীর স্বরে কহিল, "বাসব।"

তার পর উভয়েই সে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সেদিনকার প্রফুল্ল উষ্ণল আকাশে এই মেঘের কৃষ্ণবিন্দুটুকু কোনমতে মুছিয়া ফেলা গেল না।

সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধ রিভাল বেড়াইতে আসিল। রিভাল এতিঁয়ো গ্রামের প্রবীণ ডাক্তার। গ্রামের ভদ্র-ইতর সকল শ্রেণীর লোকই রিভালের সদাশয়তায় তাহার গুণমুগ্ধ। রিভাল আসিয়া জ্যাকের সহিত আলাপ করিল। তাহার পিঠ চাপড়াইয়া স্নেহে কত কথা জিজ্ঞাসা করিল। স্নেহের ভিখারী বালক বৃদ্ধের ব্যবহারে চমৎকৃত হইল।

ডাক্তার চলিয়া গেলে গৃহের দ্বার রুদ্ধ হইল। তার পর রাত্রি আসিল। ঝিলার

গানে চারিধার ঝঙ্কৃত মুখরিত হইয়া উঠিল। রাত্রে জ্যাক নিদ্রিত হইলে ইদা আর্জেন্তঁকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিল। জ্যাক আসিয়াছে সে সংবাদ দিয়া, জ্যাকের প্রতি আর্জেন্তঁর একটু স্নেহ ও সহানুভূতি, সে কাতরভাবে ভিক্ষা চাহিল। বেচারা জ্যাক—তাহার জন্য আর কিছু না—শুধু একটু করুণা এতটুকু স্নেহ! সে নিতান্ত অভাগা!

দুই দিন পরে পত্রের উত্তর আসিল।

পত্রে মাতার দুর্ব্বলতার প্রতি বক্র ইঙ্গিত ও তিরস্কার এবং বালকের শিক্ষার অভাবের উল্লেখ ছিল। তবু ইদার মনে হইল—পত্রে তেমন রূঢ়তা নাই! আর্জেন্তঁ লিখিয়াছে, মনোভোঁর স্কুলে অনর্থক ব্যয় হইতেছিল—কারণ স্কুলের দশা আর তেমনটি নাই—তথাপি সেখান হইতে জ্যাকের পলাইয়া আসাটা কোনমতে সমর্থন করা যায় না—তাহা খুবই অন্যায় হইয়াছে। যাক্, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা আর ফিরান যায় না—তবে বালকের ভবিষ্যতের ভার আর্জেন্তঁ লইতে প্রস্তুত আছে। এতিঁয়োতে ফিরিয়া—আর একসপ্তাহ পরেই সে ফিরিবে—আর্জেন্তঁ এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবে।

এই সাতদিন জ্যাক যে সুখে কাটাইয়াছিল, তাহার সমগ্র জীবনে—কি শৈশবে কি পরজীবনে—এমন সুখ আর কখনও সে পায় নাই। গৃহে মাতার সঙ্গ, বাহিরে বন, বাগান, নদী,—ঘর বাহিরের সমস্তই যেন তাহার নিজস্ব! গৃহে বাহিরে মুক্ত আনন্দে সে ছুটিয়া বেড়াইতেছে—ইদাকে সর্ব্বক্ষণ দেখিতে পাইতেছে—আদর আবদারে এতটুকু ত্রুটি নাই! প্রাণ খুলিয়া হাসির তুফান তুলিতেছে—যেন জ্যাকেরই জন্য পৃথিবীর যত কিছু আনন্দ উল্লাস বিধাতা উদার হস্তে চারিধারে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন।

আর্জেন্তঁর নিকট হইতে আর একখানি পত্র আসিল—কল্য সে এতিয়োতে আসিয়া পৌঁছিবে।

আর্জেন্তঁ জ্যাককে স্নেহ ও সহানুভূতির চক্ষে দেখিবে বলিয়া পত্রে স্বীকার করিলেও ইদার মন সুস্থির ছিল না। ষ্টেশনে ইদা জ্যাককে লইয়া গেল না—পথে কাতর অনুনয়ে একবার সে আর্জেন্তঁর করুণা আকর্ষণের চেষ্টা করিবে—সহসা জ্যাককে দেখিলে আর্জেন্তঁ যদি রাগিয়া উঠে—এই ভয়েই জ্যাককে গৃহে রাখিয়া আর্জেন্তঁর অভ্যর্থনার জন্য ইদা গাড়ী লইয়া ষ্টেশনে গেল। জ্যাককে বলিয়া গেল,—"জ্যাক তুমি বাগানে থেকো—ফস্ করে ওঁর সুমনে এসোনা। আমি ডাকলে তবে এস—কি জানি—" কথাটা শেষ না করিয়াই ইদা ষ্টেশনে চলিয়া গেল।

মার কথা শুনিয়া জ্যাক দমিয়া গেল। তাহার পর কখন গৃহদ্বারে গাড়ী আসিয়া থামিয়াছে, জ্যাক তাহা জানিতেও পারিল না। সহসা সে মার স্বর শুনিল,—মা ডাকিতেছে,—"জ্যাক এদিকে এস!"

জ্যাকের বুক কাঁপিয়া উঠিল। এইবার!

কক্ষে প্রবেশ করিয়া কোনমতে আর্জেন্তঁকে অভিবাদন করিয়া জ্যাক দাঁড়াইল। আর্জেন্তঁ বক্তৃতা সংক্ষেপেই সারিয়া লইল—বক্তৃতায় স্নেহও একটু যে মিশাল না ছিল, এমন নহে।

আর্জেন্তঁ কহিল, "জ্যাক—তোমাকে মানুষের মত হতে হবে, কাজ করতে হবে।

কাজ! কাজ! কাজ ছাড়া থাকা চলবে না। জীবনটা ধূলাখেলা নয়। বেশী কিছু করতে হবে না—শুধু আমি যা বলব, তাই করবে, তাহলে আমিও ভালবাসব আর সকলেই সুখে থাকতে পারব। আমি এখন এই চাই—আমার নিজের যথেষ্ট কাজ আছে—অবসর খুবই কম—তবু তোমাকে মানুষ করে তোলবার জন্য তোমার দিকে একটু মন দিতেই হবে। ঘণ্টা দুই আমি তোমার জন্য খরচ করব—তোমার শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য।

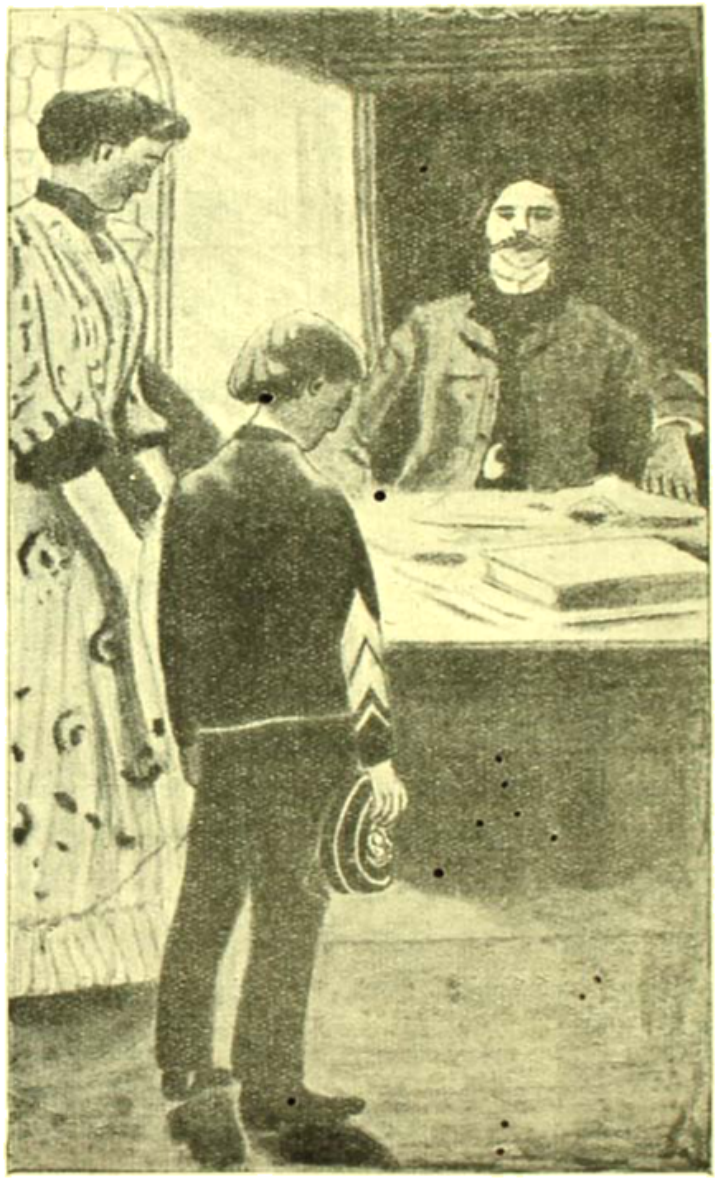

যদি আমার মতে চলতে পার—তবেই আমার মত কাজের লোক হতে পারবে—সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তি হবে, নাহলে যেমন অপদার্থ আছ, তেমনই থেকে যাবে।"

"শুনছ, জ্যাক?" পুত্র-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী মাতা সাগ্রহে সানন্দে কহিল "তোমার জন্য উনি নিজের কত ক্ষতি করছেন, বুঝছ ত জ্যাক?"

"হাঁ, মা।"

"থাম, সালটি," আডেল্ফ কহিল, "আগে আমি জানতে চাই - আমার কথা থাকবে কিনা—আমি অবশ্য বাধ্য করছি না যে এরকমভাবে চলতেই হবে।"

"বল, জ্যাক, পারবে ত?—"

মাতাকে আডেল্ফকে সালটি নামে সম্বোধিত হইতে দেখিয়া জ্যাক কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল! তাই চট্ করিয়া সে কথাটার উত্তর দিতে পারিল না। সহসা চমক ভাঙ্গিলে, "পারব" বলিয়া জ্যাক

কক্ষ ছাড়িয়া দ্রুত নীচে নামিয়া আসিল। তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিতেছিল—মাথার ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছিল—সে নীচে আসিয়া একটা শূন্যকক্ষে প্রবেশ করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে নিদ্রা ভাঙ্গিলে জ্যাক দেখিল, তাহার কক্ষের দেওয়ালে একটা ফ্রেমে বাঁধা কাগজ ঝুলিতেছে। কাগজে কবির আঁকাবাঁকা অক্ষর ছড়ানো রহিয়াছে—নিকটে আসিয়া জ্যাক দেখিল, মোটা অক্ষরে লেখা রহিয়াছে,—

রুটিন।

তাহার পর জীবনের একটা গতী নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে—পড়াশুনার ধারা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। দিনের মুহূর্ত্তগুলাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করা হইয়াছে—"ছয়টায় শয্যাত্যাগ। ছয়টা হইতে সাতটা—প্রাতর্ভোজনাদি। সাতটা হইতে আটটা—পড়া—আটটা হইতে নয়টা—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রাচীরগাত্রে অসংখ্য ছিদ্র করিলে যেমন সে ছিদ্রের মধ্য দিয়া যথেষ্ট বায়ু প্রবেশ করেনা, আলোক-প্রবেশেরও তেমন সুবিধা থাকে না—তেমনই ভাবে দিনটাকে অসংখ্য ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—লাটিন, গ্রীক, বীজগণিত জ্যামিতি, দেহতত্ত্ব, ব্যাকরণ, সকল বিষয়েই শিক্ষালাভ করিতে হইবে। তাহার এই বিক্ষিপ্ত অংশগুলাকে জুড়িয়া কোন্ সুদূর শুভ মুহূর্ত্তে এক অখণ্ড জ্ঞানের স্তূপে পরিণত করিয়া তুলিবে।

কিন্তু এ ধরাবাঁধা নিয়মে চলা বালকের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। বালকের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এত জিনিষ ধরিবার মত স্থান ছিল না। কাজেই তাহার চিত্ত স্ফূর্ত্তির অভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

অপরাহ্নে রৌদ্রের তাপ কমিয়া আসিলে সে যখন গ্রহের স্তূপের মধ্যে আপনাকে মগ্ন দেখিত, কিম্বা আপনার কপিবুকের দিকে ঝুঁকিয়া চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অক্ষরগুলা ক্রমে তাহার চোখের সম্মুখে অস্পষ্ট হইয়া উঠিত, তখন বাহিরের মুক্ত বায়ু ও স্বাধীন আনন্দলাভের জন্য তাহার চিত্ত স্বভাবতই অস্থির হইয়া উঠিত। তাহার মনে হইত একবার যেমন পলাইয়াছিল, আবার তেমনই সে কোথাও পলাইয়া যায়!

মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়া বসন্ত অজস্র পুষ্পের স্নিগ্ধ সুরভি বহিয়া আনিত, প্রকৃতি আপনার সমুজ্জ্বল আসন বিছাইয়া বালককে সস্নেহে আহ্বান করিত, জ্যাক তখন বহি বন্ধ করিয়া বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট পাখীর গানে চাহিয়া থাকিত, কখনও সে দেখিত, কাঠবিড়ালী কোমল পুচ্ছ তুলিয়া এগাছে ওগাছে কি আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে! বাহিরে সারা বন তখন অজস্র ফুটন্ত গোলাপে ভরিয়া লালেলাল হইয়া গিয়াছে, তখন ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকিয়া, "Rosa—the Rose—গোলাপ" মুখস্থ করা কি দারুণ কষ্টকর! আর কোন কথা জ্যাকের মনে আসিত না—সে শুধু ভাবিত, কেমন করিয়া সে মুক্ত রৌদ্রালোকে, মুক্ত বায়ুতে আপনাকে অবাধে ছাড়িয়া দিবে!

কিছু দিন পরে "অপদার্থ— বোকা" বলিয়া

আর্জেন্ট, জ্যাকের শিক্ষার ভার ছাড়িয়া দিল। ইদা করুণদৃষ্টিতে শুধু জ্যাকের পানে একবার চাহিল, কোন কথা বলিল না। জ্যাক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। এতদিন যেন সে কয়েদীর মত বদ্ধ ছিল—আজ ছাড়া পাইয়াছে—সে মুক্ত, স্বাধীন! ছাড়া পাইয়া জ্যাক বনের দিকে ছুটিল। পাখীর গানে আকাশ তখন ভরিয়া গিয়াছে,—ফুলের গন্ধে চারিদিক মাতিয়া উঠিয়াছে—নদীতে নৌকা ছুটিয়া চলিয়াছে,—প্রজাপতির দল ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়াইতেছে, জ্যাক নৌকা দেখিয়া প্রজাপতি ধরিয়া নিজবেগে সময় কাটাইয়া দিল।

সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলে, গৃহের নিস্তব্ধতার প্রথমটা যেন তাহার নিশ্বাস রোধ করিয়া আসিল! ইদা তাড়াতাড়ি আসিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "চুপ, গোল করোনা। উনি কাজ করছেন—বই লিখছেন।"

জ্যাক তখন অতিরিক্ত সতর্ক হইতে গিয়া, দরজা সশব্দে বন্ধ করিয়া ফেলিল, ছোট টেবিলটা উল্টাইয়া ফেলিল! ইদা আসিয়া আবার বলিল, "শান্ত হয়ে থাক জ্যাক—শব্দ করো না।" আর্জেন্ট বহি লিখিতেছেন—কাজ করিতেছেন।

প্রকাণ্ড খাতা লইয়া প্রথম পৃষ্ঠায় গ্রন্থের নাম "কষ্টের কন্যা" আঁকাবাঁকা ছাঁদে লিখিয়া ভাবসংগ্রহের জন্য আর্জেন্ট কক্ষমধ্যে উদ্বেগাকুল ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়! তবু এক ছত্র লেখা বাহির হয় না। জানালার ধারে আসিয়া আকাশ, মাঠ, বাগান, নদী দেখিয়া তাহার সমস্ত ভাবের বন্যায় কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠে, কিন্তু কলমটি হাতে লইলেই সে ভাবস্রোত কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। খাতার পৃষ্ঠা যেমন শূন্য তেমনই শূন্য রহিয়া যায়! জীবনের চারি ধারে কি প্রচুর কাব্য—কিন্তু তাহা যেন আর্জেন্টর সহিত শত্রুতা করিয়া বসিয়া আছে—তাহার হস্তে কোনমতে ধরা দিবে না। গ্রামের গ্রাম্য লতাপাতাদেরা এমন কুটিরে থাকিয়াও যদি গ্রন্থ লেখা না যায় ত সে দোষ রাখিবার যে ঠাঁই নাই!

ইদা আসিয়া বলিল, "কি লিখলে?"

আর্জেন্ট বলিল, "এসেছ তুমি—আচ্ছা, বস!"

ইদা কহিল, "আমি জানতে এলাম, "কষ্টের কন্যা" কতদূর লেখা হল?"

"কষ্টের কন্যা? তুমি জান, কষ্ট লিখতে গেটের কত বছর লেগেছিল! ঠিক দশটি বৎসর! তবু ত তিনি যে যুগে বাস করতেন সেটাকে সত্যযুগ বললেও চলে! লোকের মনে এতটুকু নীচতা ছিল না, হিংসাদ্বেষ ছিল না—সহানুভূতিতে সকলের মন ভরা ছিল! আর এখন—উঃ, চারিধারে সকলে ষড়যন্ত্র করে বসে আছে, প্রতিভাশালী লোককে মাথা তুলতে দেবে না—তাকে যেমন করে হোক, নিষ্ঠুর সমালোচনা করে, উৎসাহ না দিয়ে—দমিয়ে দেবে।"

আর্জেন্ট খাতা খুলিয়া ভাবের সন্ধান না পাইয়া শেষে সংবাদপত্র পাঠ করিতে বসে। প্রথম ছত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মুদ্রাকরের নামটি অবধি—কোন কথাই সে বাদ দেয় না। সংবাদপত্র খুলিয়া সে যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাতে মনোনিবেশ করে যে, দেখিলে মনে হয় যেন সে তাহার অপ্রকাশিত উপন্যাসের

সমালোচনার সন্ধান করিতেছে, কিম্বা কল্পিত নাটকের চরিত্রানুশীলন পাঠ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে! সংবাদপত্র-পাঠে তাহার অসন্তোষ বাড়ে বিনা কমে না! দেশের লক্ষ্মীছাড়া সংবাদপত্রগুলা এত লোকের সংবাদ দিতে কাতর হয় না, শুধু তাহার সন্ধান লইতে হইলেই সকলের মর্ম্মনাশ উপস্থিত হয়—তাহার সন্ধান রাখিবার জন্য একটুকু আগ্রহও করে না!

জগতে সকলে সুখী, সকলেই ভাগ্যবান! তাহাদিগের নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে—অথচ কি সব নাটক!. তাহাদের গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে—কি—বা গ্রন্থ! শুধু তাহার গ্রন্থগুলাই অপ্রকাশিত রহিয়া যায়! আরও দুঃখের কথা ছিল ইহা যে, কোন একটি ভাব তাহার মনের মধ্যে দেখা দিয়া যখন প্রকাশের অবসরটুকু খুঁজিয়া পায় না, তখন অপরে সেই ভাবেরই সহিত কোনমতে পরিচয় স্থাপন করিয়া অবাধে গ্রন্থ ছাপিয়া ফেলে! সে প্রকাশ করিয়া কাহারও নিকট না বলিলেও, লোকগুলা তাহার মন হইতে তাহার ভাবগুলাকে কেমন করিয়া ছিনাইয়া লইয়া যায়! প্রতি সপ্তাহেই দেখা যাইত, আর্জেন্ট'র মনের কথা, নূতন ভাব কেমন করিয়া জানিয়া ফেলিয়া কোন না কোন গ্রন্থকার নিতান্ত নির্লজ্জের মত গ্রন্থ ছাপিয়া দিয়াছে!

একদিন আর্জেন্ট ইহাকে কহিল, "দেখ, কাল ক্লাব থিয়েটারে এক বই দেখে এলাম,—হুবহু আমার ঐ "আতলাতাঁর আপেল" নাটকখানার সঙ্গে মিলে যায়!"

"কি ভয়ঙ্কর! তোমার বই চুরি গেছে! তোমার বইখানা গেল কোথায়?"

"এখনও লেখা হয় নি—সবেমাত্র লিখব মনে করছিলাম—নাঃ, লিখতে দিলে না আর, দেখছি।"

নিষ্ফল আক্রোশে আর্জেন্ট যখন নির্লজ্জ গ্রন্থকারগণের অসমসাহসিক চৌর্য্যবৃত্তির প্রাবল্য ও ঈর্ষাপরায়ণ সমালোচকগণের কটূক্তির উল্লেখ করিয়া আপনার প্রতিভা-স্ফুরণের সহস্র বিঘ্নের কথায় ভোজনকাল সরগরম করিয়া দেয়, ইদা তখন একান্ত করুণভাবে প্রিয় কবির মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, এবং জ্যাক কথাটি না কহিয়া, নত মুখে নিঃশব্দে আপনার ভোজনব্যাপার সমাধা করিয়া যায়। কিন্তু সে সময়ে দৈবাৎ যদি কখনও আর্জেন্টর দৃষ্টির সহিত জ্যাকের দৃষ্টি মিলিত, তখনই জ্যাক ভয়ে শিহরিয়া উঠিত। নিষ্ফলতার আক্রোশে কবির রোষের মাত্রা যখন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, তখন জ্যাক একদিন স্পষ্ট বুঝিল, তাহার বিরুদ্ধে এ অগ্নি জ্বলিবার বিলম্ব আর বিলম্ব নাই, শুধু সামান্য একটু ছুঁতা পাইলেই ভীষণ ভাবে জ্বলিয়া তাহাকে দগ্ধ করিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ಅಗಸ್ತ್ಯನಿಗೆ ರಾಮನು ಶ್ರೀರಾಮ ಕವಚವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಭಾಗ

ভারতে নাট্যের উৎপত্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ধর্ম্ম ও নাট্য

যে সর্ব্বপ্রথম প্রমাণ-লেখাটি ভারতীয় নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত সাক্ষ্য প্রদান করে, সেই প্রমাণ-লেখাটিতে, নব-নাট্যকলার সহিত কৃষ্ণের কাহিনী সংজড়িত। সম্ভবত এই প্রকার সম্মিলন একটা আকস্মিক ব্যাপার মাত্র। কিন্তু এই সম্মিলনকে অক্লেশে সমর্থন করাও যায়। যে লোকবিশ্রুত তরুণ নায়ক গোপীগণের প্রাণবল্লভ ও দৈত্যগণের বিজেতা, তিনি যেরূপ উদীয়মান ভারতীয় নাট্যের নায়ক-পদের যোগ্য এমন আর কোন্ দেবতা? বহুশতাব্দী হইতে, ভারতীয় নাট্য-ইতিহাসের সহিত কৃষ্ণপূজার ঘনিষ্ঠ সংস্রব পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগে এই কৃষ্ণপূজাই অবসাদ-ম্রিয়মাণ নাট্যকলাকে সঞ্জীব করিয়া তুলিয়াছিল এবং আমাদের কালেও এই কৃষ্ণপূজাই ভারতীয় নাট্যে নবজীবন সঞ্চারিত করিয়াছে। কৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম্মসকল রঙ্গপীঠে অভিনীত হইয়া থাকে। কৃষ্ণজন্মাষ্টমীর উৎসব সমূহ নাট্যাকারে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণজন্মাষ্টমীর অভিনয় আমাদের খৃষ্টমাস-উৎসবকে স্মরণ করাইয়া দেয়। একটা মণ্ডপ-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাকে গো-শালার ধরণে সজ্জিত করা হয়, এবং তাহার মধ্যস্থলে, একটা শয্যায় দেবকীর একটি মূর্ত্তি শুয়াইয়া রাখা হয়। দেবকীর সমীপে শিশু কৃষ্ণ; কৃষ্ণের ওষ্ঠাধর মাতৃস্তনে দৃঢ়ন্যস্ত। সেখানে যশোদার মূর্ত্তিও আছে; যশোদার ক্রোড়ে একটি নবজাত কন্যা; দেবগণ ও দৈত্যগণ এই মূর্ত্তিদিগকে ঘিরিয়া আছে। বাসুদেব অদিহস্তে দণ্ডায়মান; অপ্সরারা গান গাহিতেছে; গন্ধর্ব্বেরা নৃত্য করিতেছে; দেবকীর মুক্তিলাভে গোপীগণ উৎসব আমোদ করিতেছে! এই "প্রেক্ষণক" দেখিতে দেখিতে রাত্রি অতিবাহিত হয়। এই কৃষ্ণ-লীলার অভিনয়ে নৃত্য অনুষ্ঠিতব্য। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এ বিষয়ে ভক্তদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। গোপীদিগের সহিত মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাস-মণ্ডল নামে একপ্রকার মণ্ডলাকার উন্মদ নৃত্যের উদ্ভাবন করিয়াছেন।

নাট্য-সৌভাগ্যে কৃষ্ণ রামেরই সমান; রামকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে ভবভূতি, মুরারী, রাজশেখর এবং আরও অজ্ঞাত নাট্যকার, বাল্মীকির নায়ককে বাহা-বাহা শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে, আদরে নামাইয়াছেন। উহাদের অপেক্ষা কম শিক্ষিত কিন্তু উহাদেরই ন্যায় ভক্তিমান কতকগুলি নাট্য-গুণী এই চিরপ্রিয় পুরাতন কাহিনীটিকে নাট্যাকারে পরিণত করিয়া জনসাধারণের সমক্ষে প্রদর্শন করিত। এখনও রামায়ণোক্ত পাত্রগণের রূপ ধারণ করিয়া, রামলীলার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রামসীতার বিবাহ, সীতাহরণ, রাবণের পরাজয়, এই সমস্ত দৃশ্য,—কুতুহলী ও ভক্ত অসংখ্য

তীর্থযাত্রীর সম্মুখে, খোলা মাঠে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ১২ বৎসর বয়সের তিনটি বালক রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু ইহাতে পাত্রদিগের কথোপকথন আদৌ নাই। কেননা, এস্থলে কথোপকথন শ্রুত হওয়া অসম্ভব। বিশাল গগনতলে, অভিনেতাদিগের কণ্ঠস্বর জনতার কোলাহলে বিলীন হইয়া যায়। তা ছাড়া রামায়ণের গল্প কে না জানে, তাই উহা কথায় ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন হয় না। কতকগুলি সজীব সচল অনন্ত চিত্রপরম্পরার দ্বারা সমস্ত ব্যাপারটা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এ'ত আবার কালমাহাত্ম্যে, এই নাট্য-দৃশ্যের মধ্যে কতকগুলি অভাবনীয় চিত্তাকর্ষণের উপাদান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে;—বন্দুকের আওয়াজ ও আতসবাজি। যাই হোক, উৎসব-আনন্দের এই সকল আধুনিক উপকরণ সত্ত্বেও, দর্শকবৃন্দের এরূপ অনন্ত উৎসাহে, এরূপ অকপট ভক্তির উচ্ছ্বাস যে, রামলীলা দেখিয়া Jacquemont এইরূপ বলিয়াছিলেন; "একটা ধর্ম্মোৎসবের অভিনয় দেখিব, এই মনে করিয়া এখানে আসিয়াছিলাম; কিন্তু যাইবার সময় মনে হইল, আমি আসল ধর্ম্মোৎসবই দেখিলাম।"

বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারই অভিনেতাদিগের হাতে সহজে ধরা দেন নাই; "দশরূপের" আরম্ভ-ভাগে গ্রন্থকার দশ অবতারের সহিত, নাটকের দশটি বৃহৎ শ্রেণীর যে নৈকট্য ঘটাইয়াছেন তাহা গ্রন্থকারের কল্পনার নিদর্শন মাত্র। সে যাহাই হউক, Abbe Dubois একদল নাট্যসম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা দাক্ষিণাত্যে "দশ অবতারের" অভিনয় করিয়া বেড়াইত; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উহা কিরূপ ধরণের নাটক তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। (১) "দশ অবতার" ছাড়া বিষ্ণুর পৌরাণিক কাহিনী হইতে, অন্যান্য প্রসঙ্গেও নাট্যরচিত হইয়াছে। "বৃহৎ কথা পৈশাচী"র গ্রন্থকার যিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন সময়ে (সুবন্ধু এই সময়ের কথা বলিয়াছেন)—সম্ভবতঃ তৃতীয় শতাব্দীতে, রাজা হালের একজন আশ্রিত সভাসদ্ ছিলেন—তিনি লাসবতী নাম্নী একজন নটীর ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, লাসবতী স্বকীয় পিতা লাসকের সহিত মিলিয়া, নারীরূপধারী বিষ্ণুর অমৃত-হরণ এই বিষয়ের একটা নাটক অভিনয় করিতেন। রাজা, লাসবতীকে অমৃতিকার ভূমিকা অভিনয় করিতে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হন এবং ঐ বালিকাটিকে তাহার পিতার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া স্বকীয় অন্তঃপুরে স্থাপন করেন।

বিষ্ণুর প্রতিদ্বন্দ্বী শিব ভারতীয় প্রাচীন নাট্যের বরণীয় দেবতা। তাঁহাকেই কালী-দাস ও শ্রীহর্ষ (নাগানন্দ ছাড়া) সূত্রধর ও ভবভূতি, তাঁহাদের নাটকের আরম্ভেই আহ্বান করিয়াছেন। এই দেবতা যুগপৎ ভয়ঙ্কর ও শুভঙ্কর। শতরুদ্রিয়ের বৈদিক মন্ত্রে, ইনি সূত্রধরদিগের, রথকারদিগের ও কুম্ভকারদিগের এবং আরও অন্যান্য ব্যবসায়ীদিগের রক্ষক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন; সুতরাং তিনিই

(১) Moeurs des peuples de l' Inde.

নটদিগেরও স্বাভাবিক রক্ষক। তিনিই তাণ্ডব নামক প্রচণ্ড নৃত্যের উদ্ভাবক; পক্ষান্তরে, পার্ব্বতী লাস্য নামক কোমলকান্ত লঘু নৃত্যের প্রবর্ত্তক। তিনি "নটেশ্বর", তিনি "মহানট", তিনি "নাট্যপ্রিয়"। তিনি মধুরভাবে হাস্য করেন, মধুরভাবে গান করেন, এবং বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া থাকেন। (২)

পশুপত নামক এক শৈবসম্প্রদায় আছে। সেই "পশুপতসূত্রে" শিবের ছয় প্রকার নিত্য নৈবেদ্যের মধ্যে, নৃত্য-গীতও আদিষ্ট হইয়াছে; এবং এই নৃত্য ও গীতের লক্ষণও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (৩) গন্ধর্ব্ব-শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে শিবের বিবিধ গুণ ও স্বরূপ কীর্ত্তন করাই গীত। নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুসারে, অন্তরের ভাব বাহিরে প্রকাশ করিয়া, অঙ্গ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত হস্ত পদের সঞ্চালনই নৃত্য। "মালবিকাগ্নিমিত্রে" নাট্যাচার্য্য গণদাস নৃত্যের এইরূপ গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন :—

"দেবের বাঞ্ছিত অতি, নেত্রতৃপ্তিকর যজ্ঞ,
বলে মুনিগণ।
রুদ্র এরে নিজ অঙ্গে, হর-গৌরী দুই ভাগে
করেন স্থাপন।
ত্রৈগুণ্য-সমুদ্ভব, নানা-রসে সমন্বিত
লোকের চরিত্র ইথে হয় প্রদর্শিত।
বহুবিধ প্রকারের, ভিন্ন রুচি মানবের,
সবারি সমান প্রিয়—নৃত্য-আরাধিত॥"

শৈবধর্ম্মের যে একটি নিকৃষ্ট রূপ—সেই তান্ত্রিক ধর্ম্মে, গুহ্য ও অশ্লীল অনুষ্ঠানাদির সহিত ধর্ম্মাভিনয়ও যুক্ত হইয়াছে। "বটুক"-দিগের অনুষ্ঠানে, ৫ হইতে বৎসর বয়সের বালকেরা শিবের ভূমিকা এবং ১০ হইতে ১২ বৎসর বয়সের বালিকারা শক্তির ভূমিকা গ্রহণ করিত; এবং ভক্তেরা উহাদিগকে সাক্ষাৎ দেবতা (দেবতা বুদ্ধ্যা) জ্ঞান করিত।" (৪)

ব্রাহ্মণেরা যাহাকে পোষণ করিত ও আপনাদের কাজে লাগাইত, সেই ভাট্যাকলার সহিত, নাস্তিক-সম্প্রদায়গণ যুদ্ধ ঘোষণা করে। "বৌদ্ধসূত্রে",—নৃত্য, গীত, বাদ্য ও কথকতার কোন বৈঠকে ভক্তদিগের উপস্থিত থাকা একেবারেই নিষিদ্ধ হইয়াছে। উহাদের এই সনির্ব্বন্ধ নিষেধ হইতেই সপ্রমাণ হয় যে,—যে ব্যাধির প্রতিকারের জন্য উহারা উদ্যত, সেই ব্যাধিটা কতটা ব্যাপক ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; ভাট্যানুরাগ লোকের মধ্যে এতটা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে ধর্ম্মপ্রচারক-দিগের আক্রমণে কোন ফল হয় নাই। কোন সজ্জন গৃহস্থ, নাট্যকলার অনুশীলন বর্জ্জন করিতে পারিত না। তাই, বুদ্ধের জীবন-চরিত-লেখকেরা, এই সকল দূষনীয় কলাবিদ্যাও

---

(২) মহাভারত XIII ১০১।

(৩) নকুলীশ, "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে" উদ্ধৃত, ১৭-১৮। আমার অনুবাদ দ্রষ্টব্য! "Pacupata, et le systeme Caiva"—পৃঃ ২০১।

(৪) Catalogue Oxford Manuscripts, Analysis of the "Kulamava-tantra" পৃঃ ৪১।

বুদ্ধের উপর আরোপ করিয়াছে। বাল্যকাল অতীত হইলে, বুদ্ধ আচার্য্যগণের সমক্ষে বিশ্ববিদ্যার পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইল, অন্যান্য বিদ্যার মধ্যে তিনি "বীণা, যন্ত্রবাদ্য, নৃত্য, গীত, কথকথা, আবৃত্তি প্রহসন, লাস্য, নাট্যাভিনয়—এই সকল কলা বিদ্যাতেও পারদর্শী হইয়াছেন।" (৫) এমন কি, বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থও নাট্যকলা হইতে একটা উপমা গ্রহণ করিয়াছে; এক স্থলে বুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়াছে—"তিনি মহাধর্ম্ম সংক্রান্ত নাট্যদর্শনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।" (৬) কঞ্জুরের তিব্বতীয় গ্রন্থসংগ্রহের অন্তর্গত "বিনয় পীঠিকায়", বুদ্ধের সমসাময়িক রাজা বিম্বিসার কর্ত্তৃক, নাগরাজ গিরিক ও মনোরমকে ভোজ দিবার প্রসঙ্গে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে :—নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উপবিষ্ট হইলে, বাদ্য বাজিয়া উঠিল। নাট্যাচার্য্যেরা তোটক-ছন্দে গান আরম্ভ করিয়া দিল, এবং অন্যেরা নৃত্য করিতে লাগিল। দুইটী ব্রাহ্মণ-যুবক, উপতিষ্য ও মৌদ্গল্যায়ন প্রথমে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন……কিন্তু যখন বাদ্য থামিল এবং নৃত্যগীত চলিতে লাগিল, যুবক কলিত উপতিষ্যকে বলিল :—"নৃত্য, গীত, বাদ্য তোমার কেমন লাগিল? উহা কি উত্তম? …" (৭)

স্পষ্টাক্ষরে নিষিদ্ধ হইলেও, বৌদ্ধেরাও ধর্ম্মপ্রচারের উপায় স্বরূপ নাট্যাভিনয়ে প্রবৃত্ত হইত। প্রাচীন কাহিনীর সংগ্রহগ্রন্থ অবদান-শতকে (৮) বর্ণিত হইয়াছে, একজন নটী কিরূপে একটি বৌদ্ধ নাটকের অভিনয় করিয়া বিশুষ্ক জীবনের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। কুবলয়া নাম্নী একজন উৎকৃষ্ট নর্ত্তকী ও বাদন-নিপুণা রমণী রমণী-সুলভ সর্ব্বপ্রকার গুণে বিভূষিতা। নাট্য সম্প্রদায় এই মোহিনীর রূপগুণে বিমুগ্ধপ্রায় হইয়াছিল। তখনি বুদ্ধ তাহাকে জরাগ্রস্তা কদাকার বৃদ্ধার আকারে রূপান্তরিত করিলেন। সে এইরূপ অবমানিতা হইয়া সকাতরে মহাপ্রভুর প্রসন্নতা যাচ্ঞা করিল, তখন বুদ্ধদেব তাহার সম্প্রদায়সমেত তাহাকে অর্হৎপদে উন্নীত করিলেন। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ফলে, সে শাক্যমুনির প্রসাদে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। এই সময়ে বুদ্ধ ক্রকুচ্ছন্দ শোভাবতী নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

দক্ষিণাপথ হইতে একজন নাট্যাচার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইল। নাট্যাচার্য্য ভাগবতের প্রার্থনায় রাজা শোভ, নটসম্প্রদায়কে একটা নাট্যশালা দেখাইয়া দিয়া নাট্যাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিলেন :—"তুমি আমার সম্মুখে একটি বৌদ্ধ নাটক (বৌদ্ধনাটকম্) অভিনয় করিবে? নটেরা বলিল—যে আজ্ঞা মহারাজ, আমরা অভিনয় করিব। রাজা পরীক্ষা করিয়া একটি বৌদ্ধ নাটক নির্ব্বাচন করিলেন। মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া

---

৫ ললিত বিস্তার, XII পৃঃ ১১৪।
৬ "বিপুল-ধর্ম্মাত্মক-দর্শন-প্রবিষ্ট ইতি উচ্যতে" ঐ XXXVI
৭ Schrefner Indian Studies III ৩৩
৮ VIII শতক, পঞ্চম ইতিহাস।

রাজা উপবিষ্ট হইলে নাট্যাচার্য্য বুদ্ধের ভূমিকা এবং অন্যান্য নট ভিক্ষুদের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গপীঠে অবতীর্ণ হইল। রাজা পরিতুষ্ট হইয়া, যথাপর নাই আনন্দিত হইয়া, নাট্যাচার্য্যকে ও তাহার সম্প্রদায়কে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিলেন।" এই নট সম্প্রদায়ই কুবলয়ার সমভিব্যাহারে রাজগৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়। আর একটি বৌদ্ধকাহিনী ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে নীত হয়, এবং উহা একটি তিব্বতীয় সংগ্রহগ্রন্থে সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহাও একজন নটের কাহিনী। এই নটও কোন এক মহোৎসব উপলক্ষে নাট্যাকারে পরিণত বুদ্ধের জীবন-কাহিনী অভিনয় করিবার উদ্দেশে দক্ষিণাপথ হইতে রাজগৃহে আগমন করে। ধর্ম্মসাধন ও স্বার্থসাধন এই দুই-ই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাহার এতদূর স্পর্দ্ধা যে,সে ভিক্ষুদিগকেও দলে টানিয়া লয় এবং তজ্জন্য সে নিদারুণ শাস্তিও ভোগ করে। ভিক্ষুরা তাহার সহিত মিলিয়া অভিনয় করে এবং এইরূপে তাহার সর্ব্বনাশ ঘটায়। ভাগ্যক্রমে সে অনুতাপ করে, এবং তাহার পর তাহাকে ক্ষমা করা হয়। হর্ষকৃত নাগানন্দে একটা পুরাতন কাহিনী চলিয়া আসিয়াছে; সম্ভবতঃ কেবল হর্ষের নামেই নাগানন্দ ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। নচেৎ অন্যান্য বৌদ্ধ নাটকের ন্যায় ইহাও বিলুপ্ত হইত।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের এরূপ বিদ্বেষ ছিল, যে, ঐ ধর্ম্মের স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিবার জন্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সচেষ্ট হইয়াছিল। বোধ হয় সেই কারণেই বৌদ্ধ নাটকগুলিতে, সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে চলিত গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ করিতে বৌদ্ধদিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়।

তিব্বতের বৌদ্ধ বিহারে, বসন্ত উৎসব ও শারদীয় উৎসব উপলক্ষে বৎসরের মধ্যে দুই বার প্রকৃত ধর্ম্মনাটক অভিনয় করিবার প্রথা সংরক্ষিত হইয়াছে। উহাতে দেখা যায়, ভিক্ষুরা ভাল প্রেতযোনি ও গৃহস্থ বৌদ্ধেরা খারাপ প্রেতযোনি ও মানুষ সাজিয়া আইসে। নটেরা বহুমূল্য উদ্‌ভট পরিচ্ছদ ও অদ্ভুত ধরণের মুখোস্ ধারণ করে। প্রথমে নাট্য সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক একসঙ্গে স্তব-স্তুতি ও আশীর্ব্বচন সুর করিয়া পাঠ করে; পরে, একজন খারাপ প্রেতযোনি একজন মানুষের নিকট আসিয়া বাক্‌চাতুর্য্যের দ্বারা, নানাপ্রকার রসিকতার দ্বারা, তাহাকে মন্দ পথে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে। যখন সেই প্রেতযোনির অধঃপাতের উপক্রম হইয়াছে এমন সময়, কতকগুলি লোক সেই মনুষ্যের সাহায্যে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং যাহাতে আবার তাহার সুমতি হয় তাহার চেষ্টা করে। উহারা আসিয়া পড়ায়, দুষ্ট প্রেতযোনিরাও সাহায্য লাভের চেষ্টা করে। এই সময়ে নাট্য সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক আসিয়া উপস্থিত হয় এবং দুই দলের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে থাকে। মনুষ্যেরা, সাহায্যের জন্য সৎ প্রেত-যোনিদিগকে ("ড্রাগ্‌শেদ্") আহ্বান করে; তাহারা তখনই আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন উভয়ের মধ্যে আর তুল্য-বলে যুদ্ধ হয় না। দুষ্ট প্রেতযোনিরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করে; এবং দেবতা ও মানুষেরা তাহাদিগের অনুধাবন করিয়া গর্জ্জন দ্বারা তাহাদিগকে

দারুণ আঘাত করে। মোট কথা,—এই নাট্যাভিনয়ে ধর্ম্মতত্ত্বঘটিত বাদানুবাদের সহিত খুব স্থূল ধরণের প্রহসন, এবং লৌকিক নাট্যের লক্ষণগুলির সহিত ধর্ম্মনাট্যের লক্ষণগুলি সম্মিলিত হইয়া থাকে। এই সকল নাটকের উৎপত্তিসম্বন্ধে ভিক্ষুগণ কিছুই অবগত নহে। চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে উহারা এই সকল নাটকের অভিনয় করিয়া আসিতেছে। ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান সমূহের রক্ষণশীলতা যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ তাহাতে আমরা ন্যায্যরূপে অনুমান করিতে পারি যে, ভারতের প্রাচীন বিহার সমূহে ভক্তদিগের সমক্ষে যেরূপ ধর্ম্ম নাট্যের অভিনয় হইত, ইহা তাহারই অবিকল প্রতিরূপ। আবার ব্রহ্মবাসীদিগের সাহিত্যেও বৌদ্ধকাহিনীসকল নাট্যাকারে পরিণত হইয়াছে দেখা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই সকল নাটকের নাম ছাড়া আর আমরা কিছুই অবগত নহি। নাগানন্দের ন্যায়, এই সকল নাটকের আখ্যানবস্তুও জাতক হইতে গৃহীত।

কি লৌকিক, কি পারমার্থিক—উভয় প্রকার নাটকই চীনবাসী বৌদ্ধদিগের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। (৯) মৌদ্গলায়ন যাহার নায়ক, এইরূপ একটি নাটকের স্থূল মর্ম্ম M. Grood বিবৃত করিয়াছেন। সমস্ত চীনীয় নাট্য রচনার যেরূপ ধরণ, এটিও সেই ধরণের একটি গীতিনাট্য। অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানের দিনে, ও শ্রাদ্ধ বাসরে এই নাটকটির অভিনয় হইয়া থাকে। মৌদ্গলায়নের জননী, না জানিয়া মাংস ভোজন করেন। তাঁহার পুত্র ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ঐবিষয়ে জিজ্ঞাসা বাদ করিলেন। জননী শপথ করিয়া বলিলেন, তিনি এই বিষয়ে নির্দ্দোষ। তখনই চারিদিক্ হইতে কতকগুলি দৈত্য সমুত্থিত হইয়া তাঁহাকে লইয়া চলিয়া গেল। মৌদ্গলায়ন কঠোর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার জননী সর্ব্বপ্রকার নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। তাঁহাকে এই যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি কৃতসংকল্প হইলেন। সমস্ত লোক অতিক্রম করিয়া তিনি নরকে প্রবেশ করিলেন, পাপীদিগের সমস্ত দণ্ডপ্রকরণ স্বচক্ষে দেখিলেন, দেখিলেন তাঁহার মাতা হুতাশনে দগ্ধ হইতেছেন। তাঁহার স্থানে তিনি আপনাকে স্থাপন করিতে চাহিলেন, কিন্তু দৈত্যেরা তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিল। তিনি শাক্যমুনির নিকট সকাতরে যাচ্ঞা করিলেন, তাঁহাকে যেন উলম্বার উপদেশটি প্রদান করা হয়;—"একমাত্র সমবেত পুরোহিতবর্গই, মৃতব্যক্তিকে নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারে।" এইরূপে তিনি তাঁহার জননীকে উদ্ধার করিতে আসিলেন। সমস্ত নাট্যকার্য্যের মধ্যে, দুই ব্যক্তি—একজন শূকরের রূপ ধারণ করিয়া, আর একজন বানর কিংবা কুকুরের রূপ ধারণ করিয়া বরাবর মৌদ্গলায়নের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে এবং মৌদ্গলায়নের তীব্র শোকের সহিত তাহাদের হাস্য-পরিহাস মিশ্রিত করিতেছে।

নাট্যশালার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের যে সংস্রব ছিল তাহা অন্যান্য প্রমাণ-লেখ্যের দ্বারা সপ্রমাণ হয়; কোন কোন গ্রন্থকার নাট্য প্রকরণের সহিত যে সুপরিচিত ছিলেন, তাহা

(৯) আমেদের প্রসিদ্ধ উৎসব সমূহ,—Annales Guimet, XII, ১৩১৬

তাঁহাদের গ্রন্থের রচনা হইতেই উপলব্ধি হয়। তাহার দৃষ্টান্ত, সদ্ধর্ম-পুণ্ডরীক-নামক গ্রন্থের অনুশীলন করিয়া M. kern এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; "ললিত বিস্তারের ন্যায়, সদ্ধর্ম-পুণ্ডরীক, মহাকাব্যের আকারে রচিত নহে। ইহা নাট্যলক্ষণাক্রান্ত; ইহা ধর্ম্মনাটকের ধরণে রচিত। ইহার প্রধান নায়ক (একমাত্র নায়ক নহেন) মহাপ্রভু শাক্যসিংহ। ইহাতে ধারাবাহিক কথোপ-কথনের সমাবেশ আছে; এবং অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা করিয়া ইহাতে একটা ঐন্দ্রজালিক প্রভাব প্রকটিত হইয়াছে। এই সমগ্র নাটকের বিচিত্র দৃশ্যগুলি এমনভাবে দর্শকের সমক্ষে স্থাপিত হয় যে, দর্শক বুদ্ধের শক্তি ও মহিমা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে এবং বুদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ বুদ্ধের অতুল্য জ্ঞানেরও পরিচয় পায়। এই নাটকের প্রস্তাবনায় বা 'নিদানে' ভারতীয় নাট্যরীতির সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়।

নিদানের শেষভাগে মঞ্জুশ্রী এই মহা-নাটকের মূল-ঘটনার জন্য শ্রোতৃবর্গের মনকে প্রস্তুত করিয়া রাখেন। তিনি তাহাদিগকে জানাইয়া দেন, যে মহাপ্রভু যোগনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া স্বকীয় বিজ্ঞান ও অসীম শক্তি প্রকাশ করিবেন।" (১০)

নাট্যের যাহা সহায়ভূত সেই নৃত্যগীত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হইলেও, সিংহলে প্রথম বৌদ্ধ রাজাদিগের সময় হইতে, সমাজ ও ধর্ম্মঘটিত মহোৎসবের উহাই মুখ্য উপাদান। তাহার দৃষ্টান্ত,—তামুলগণ পরাজিত হইলে পর, মহারাজা দুটুগামেণি নর্ত্তকীবৃন্দে পরিবৃত হইয়া, মহাসমারোহে বিজয়োৎসব করিলেন; তা ছাড়া, নর্ত্তকী ও বাদকদিগের মধ্যে অবস্থিত হইয়া তিনি মহাস্তূপ স্থাপন করিলেন। (১১)

তাঁহার ভ্রাতা মহাদাত্তিকো আর একটি স্তূপ স্থাপন করিবার সময় ঐ একই প্রকারে উৎসব করেন। "তিনি নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করিলেন।" (১২) অবশেষে তিনি ডাগোবার (মন্দির), উপর বাদ্যকারী দেবতাদের চিত্র অঙ্কিত করাইলেন। (১৩) ওস্তাদের হাতে আঁকা ঐ ধরণের চিত্র আজিও অজন্তার 'ফ্রেস্কো'-চিত্রে পরিদৃষ্ট হয়।

চিত্রকর Griffiths, যিনি কেবল সৌন্দর্য্যের দৃষ্টিতে ঐ সকল চিত্র পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কঠোর উপদেশ ও মন্দির বিভূষিত মূর্ত্তিগুলির সাংসারি-কতা—এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিপরীত ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। "অজন্তার চিত্রকর যাহারাই হোক্ না কেন, তাহারা নিশ্চয়ই সংসারী। সচরাচর

সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক। অনুবাদ। Sacred Books of the East XXI; Introduction—

জীবনের দৃশ্যসমূহ, সমারোহযাত্রা, গায়ক-গায়িকাবৃন্দ, বাদক-বাদিকাবৃন্দ অনেক স্থলে লালিত্য সহকারে এবং সকলস্থলেই যথাযথ রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। এইরূপ চিত্রচনা করিতে হইলে, এই সকল দৃশ্যের সহিত চিত্রকরের পরিচিত থাকা আবশ্যক, সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকা আবশ্যক, অভ্রান্ত স্মরণশক্তি থাকা আবশ্যক। ইহা নিশ্চিত,—বুদ্ধের দশটি আদেশের মধ্যে বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যদিগকে প্রকাশ্য স্থানের 'তামাসা' প্রভৃতি দর্শন করিতে যে নিষেধ করিয়াছিলেন, এই নিষেধ-আজ্ঞা তাহারা পালন করে নাই। আমি যতগুলি চিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিয়াছি, প্রত্যেক চিত্রেই হস্তভঙ্গী অতি চমৎকার; চিত্রকর যে ভাবটি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে, ঠিক সেই ভাবটি উহার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।" (১৪)

নাট্যশালার সহিত জৈনদিগের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা বড় একটা জানা নাই; যে সকল জৈন গ্রন্থের অনুশীলন হইয়াছে তাহার সংখ্যা এত অল্প যে উহা হইতে একটা ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তথাপি আমরা কতকটা অনুমান করিতে পারি, জৈন-ধর্ম্মের আচার-নীতি ও রাষ্ট্রনীতি উহার প্রতিদ্বন্দ্বী বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় একই ভাবে অনুপ্রাণিত।

উভয় ধর্ম্মেই শাস্ত্রীয় আদেশের খুব কড়াকড়, কিন্তু লৌকিক ব্যবহার শিথিল।..."যেখানে ইতিহাস পঠিত হয়, মল্লযুদ্ধ হয়, কথকথা হয়, নাট্যাভিনয় হয়, গীতবাদ্য হয়, বীণা বাদন হয় সেখানে কোন ভিক্ষু যাইবেক না, ইত্যাদি।" (১৫)..তথাপি দেবতারা সুখ সম্ভোগকে অবজ্ঞা করেন না। যখন সূর্য্যাক্ষ নামক দেবতা মহাপ্রভুকে পূজা করিবার নিমিত্ত মহাবীর নগরে উপনীত হন, তখন তাঁহার সমস্ত নাট্যবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া বুদ্ধদেবকে পূজা করেন। যে সকল দেবতা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল তাহারা ৩২ প্রকারে নৃত্য করিলেন, চারি প্রকার ধরণে বাদ্য বাজাইলেন, এবং চারি প্রকার গীত গাইলেন; এবং আরও কিছুপরে, গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে, —তাহারা চার প্রকার নৃত্য করিলেন এবং চারি প্রকরণের নাট্যাভিনয় করিলেন। (১৬)

সর্ব্বশেষে,—সংস্কৃতভাষায় জৈনগণকর্ত্তৃক রচিত অনেকগুলি নাটক আছে—যাহার আখ্যানবস্তু জৈন-কাহিনী হইতে গৃহীত। দৃষ্টান্ত যথা—যশশ্চন্দ্রের "রাজমতি-প্রবোধ" যাহার নায়ক অর্হৎ-নেমী।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

(১৪) Burgess প্রণীত Archeological Survey of West India এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(১৫) আয়ারঙ্গ সুত্তম্ II, ১১, ১৪।

(১৬) রাজেন্দ্রলাল, "Indian Studies" গ্রন্থে উদ্ধৃত (XVI-৩৮

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপনিবাসী অসভ্যজাতি।

প্রশান্ত মহাসাগরে ওসেনিয়া নামে অনেকগুলি ছোট বড় দ্বীপ আছে। উহার মধ্যে টোঙ্গা, তাহিতো, সমোয়া ও হবাই আদি দ্বীপপুঞ্জের নাম পালিনেসিয়া এবং ফিজি, নিউ ক্যালিডোনিয়া, সলোমানাদি দ্বীপ সমূহ মেলানেসিয়া নামে অভিহিত। এই কারণে প্রথম দ্বীপপুঞ্জের অসভ্য জাতিকে পালিনেসিয়ান ও দ্বিতীয় দ্বীপপুঞ্জের অসভ্যদিগকে মেলানেসিয়ান বলা যায়। ইহারাই এখানকার আদিমনিবাসী। প্রথমে ইহারা দারুণ অসভ্য ছিল। যখন হইতে ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্য জাতিরা এই সকল দ্বীপপুঞ্জে গমনাগমন আরম্ভ করিল, সেই সময় হইতে ইহাদের অসভ্যতার পরিমাণ কিছু কিছু খর্ব্ব হইতে লাগিল বটে, কিন্তু ইহার সহিত উহাদের ধ্বংসেরও সূচনা হইল। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে নূতন নূতন রোগের সৃষ্টি সহকারে তাহাদের সংখ্যাও হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল।

পালিনেসিয়া দ্বীপপুঞ্জ প্রথমে জনশূন্য ছিল। এখানকার আদিমনিবাসীগণ তখন অন্যস্থানে বাস করিত। ইহাদের দেহের বর্ণ ও উচ্চতা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইহারা উত্তর পশ্চিম প্রদেশ কিম্বা সীমান্ত হইতে আসিতেছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছয় ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ। ইহাদের কেশ ভ্রমরকৃষ্ণ, সুচিক্কন ও সুদীর্ঘ। পূর্ব্বে ইহারা অতিশয় পরিশ্রমী সদাচারী ও নিষ্ঠাবান এবং কৃষিকর্ম্মে বিশেষরূপে দক্ষ ছিল। ইউরোপীয়দিগের সংসর্গে আসিয়া বলবীর্য্য হারাইয়া এক্ষণে ইহারা অকর্ম্মণ্য ও হীন হইয়া পড়িয়াছে। কচী ও তরকারি ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহাদের অধিকাংশ লোকেই নিরামিষভোজী। নানারূপ শিল্প কার্য্যে ইহারা সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাকে; নৌকাগঠনে ও সন্তরণে ইহারা অত্যন্ত পটু। সচ্ছত নামক এক প্রকার বৃক্ষের ছালে এখনও এমন সুন্দর কাপড় তৈয়ার করে যে দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। অপর প্রকার বৃক্ষের ছাল পেঁতো করিয়া উহার মধ্য হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আঁইস গুলি বাহির করিয়া লয় ও উহার দ্বারা "মেটাকাপড়" প্রস্তুত করে। ধনুর্ব্বাণ ও ভালাই (বর্শা জাতীয় এক প্রকার অস্ত্র) ইহাদের প্রধান অস্ত্র। ইহারা প্রস্তর কাটিয়া কোঁদালে নির্ম্মাণ করে এবং কোন কোন অস্ত্র শিলুক দ্বারাও প্রস্তুত করিয়া থাকে। অধিকাংশ পালিনেসিয়ান এখন খৃষ্টান। প্রথমে ইহারা চন্দ্র ও সূর্য্যের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা ও উপাসনাদি করিত। হবাই দ্বীপনিবাসীরা এখনও দেব পূজা করে। এখানে একটি আগ্নেয়গিরি পর্ব্বত আছে। পূর্ব্বে ইহারা দেবতাদের সম্মুখে নরবলি পর্য্যন্ত দিত। এখন নরবলি ব্যতীত প্রচুর খাদ্য দ্রব্য ও মদ্যাদির দ্বারা প্রাচীন রীতি অনুসারে দেবতার পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের প্রাচীন দেবমূর্ত্তি সকল পাশ্চাত্য সভ্যতার আশীর্ব্বাদে স্থানভ্রষ্ট হইয়া কতক নষ্ট হইয়া গিয়াছে ও কতক ইউরোপে যাদুঘরের শোভা সম্পাদন করিতেছে।

এই সকল অসভ্য জাতির তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া সভ্যাভিমানীদের মনে যুগপৎ ভয় ও ঘৃণার উদয় হইত। দর্শোৎসবেই এই তাণ্ডব নৃত্যের বাহুল্য দেখা যাইত। ইহাদের মধ্যে আর একটি ভীষণ প্রথা এই ছিল যে, দুর্ব্বল লোকদিগকে ইহারা জীবিত

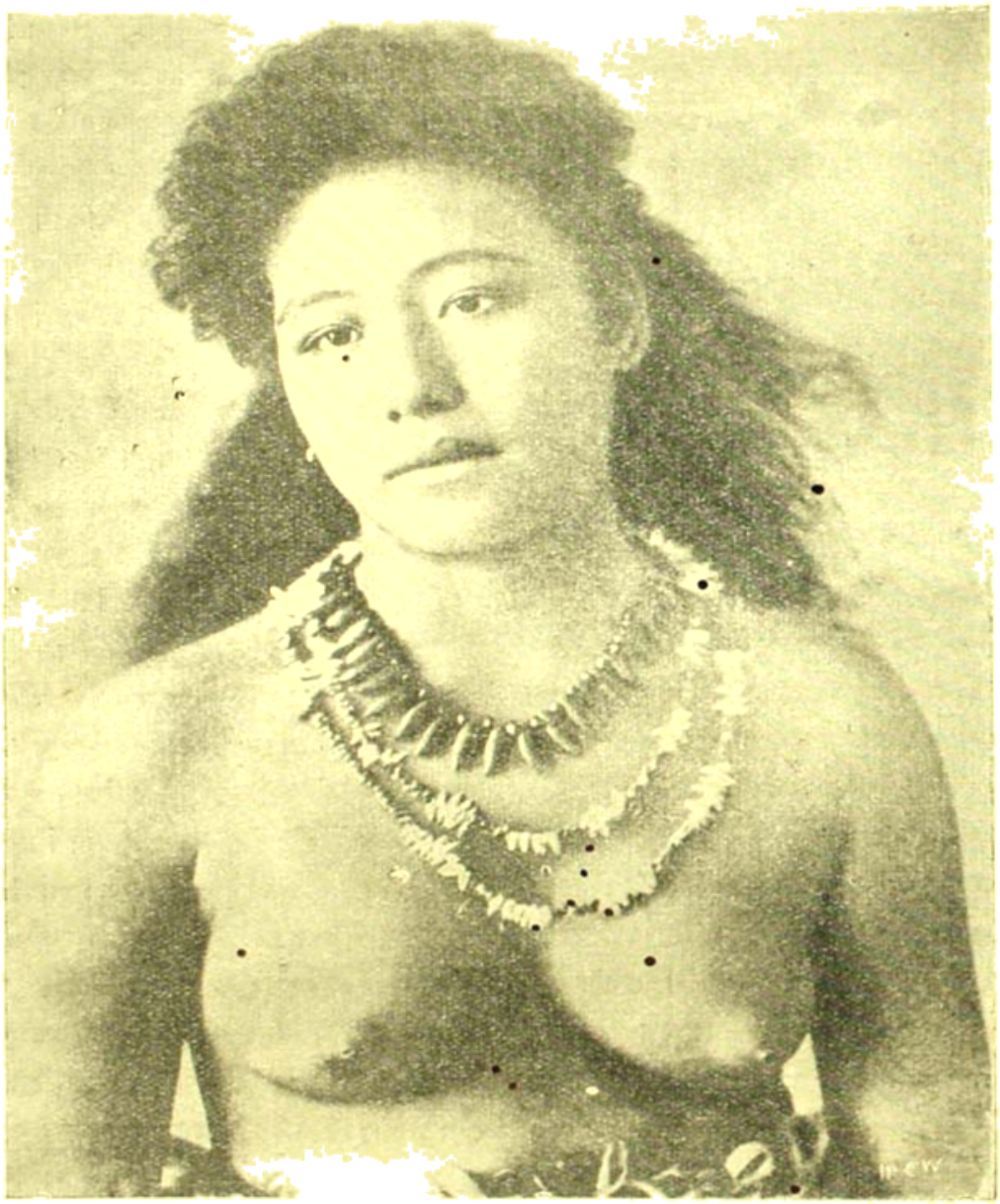

সমোয়া দ্বীপের রমণী।

রাখিত না; বৃদ্ধ ও রুগ্ন বালকদিগের গলায় বলবান লোকেই সমাজকলেবর পরিপুষ্ট করিয়া রজ্জু লাগাইয়া মারিয়া ফেলিত। কদাচিৎ ও থাকিত।

ইউরোপবাসীর সংসর্গে আসিয়া ইহাদিগের প্রাচীন আচার ব্যবহার বহুল পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে ও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া ইহারা কোট পেণ্ট পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রথমে ইহারা সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় থাকিত; এখনও ইহাদের মধ্যে পুরুষ ও রমণী

সলোমা দ্বীপের কুমারী

উভয়েই অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় থাকে—অর্থাৎ কেবল কটীদেশে একখণ্ড ছোট বস্ত্র জড়াইয়া রাখে মাত্র। কিন্তু যাহারা সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহারা সমস্ত দেহ ঢাকিয়া

রাখে। তাহার নৃত্য কতক পরিমাণে বন্ধ হইলেও উৎসব সময়ে ইহারা নৃত্য করিয়া থাকে। সমোয়া দ্বীপনিবাসীরা পূর্ব্বে বৃক্ষপত্র দ্বারা অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিত। কিন্তু উৎসবের সময় এক প্রকার লম্বা জামা ব্যবহার করিত। ইহাদের মধ্যে ধার্ম্মিক নর্ত্তকেরা নৃত্যের সময় এমন এক প্রকার দীর্ঘ টুপি ব্যবহার করিত যে তদ্দর্শনে সভ্যজাতিরা হাস্যসম্বরণে অক্ষম হইতেন।

হবাইদ্বীপের আদিম নিবাসীরা পূর্ব্বে পক্ষির পালক দ্বারা এক প্রকার বিচিত্র মূল্যবান কোট প্রস্তুত করিত। উহা তৈয়ার করিতে প্রায় এক বৎসর লাগিত। কোন পার্ব্বণ উপলক্ষে এই কোট ইহারা পরিধান করিত। কিন্তু এই পুরাতন অঙ্গাচ্ছাদন ইউরোপ ও আমেরিকার হ্যাটকোটের নিকট এখন পরাজিত হইয়া ক্রমশ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। পালিনেসিয়া ও মেলিনেসিয়ার আদিমনিবাসীদের ইতিহাস সম্বন্ধে বহু পুস্তক রচনা হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে ইহারা অনায়াসে ইহাদের সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে। এই সকল দ্বীপে ইংরাজেরা প্রায় একশত বৎসর গমনাগমন করিতেছে।

টোঙ্গা দ্বীপবাসীরা এখনও ছরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত উর্ণি পরিয়া তাহাদের দেহের শ্রীসম্পাদন করিয়া থাকে। ইহারা স্ত্রীপুরুষ উভয়েই কেবলমাত্র কটিদেশে এক টুক্‌রা বস্ত্রাচ্ছাদন দিয়া লজ্জানিবারণ করে। যুবতীরা পিতা মাতা ও গুরুজনের সম্মুখে ঐ অবস্থায় আসিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই একই প্রকার অলঙ্কার পরিধান করে। ইহারা পক্ষীর পায়ের হাড় ও মকর মৎস্যের দন্ত-নির্ম্মিত হার পরিধান করিতে বড় ভাল বাসে। ঝিনুক ও বনফলের বীচির দ্বারাও হার নির্ম্মাণ করিয়া পরে। পক্ষীর পালক ও ঠোঁট কখনও কখনও হারের সঙ্গে গাঁথিয়া দেয়। শূকরের অস্থিতে প্রস্তুত আংটী ও তাবিজ ইহাদের অতিশয় প্রিয়। প্রত্যেকের কর্ণ ছিদ্রে হস্তিদন্ত নির্ম্মিত কিম্বা সাধারণ হাড়ের মোটা মাকড়ি ঝোলান থাকে। যদিও ইহারা অনম্বা তথাপি শরীরের প্রতি ইহাদের বিশেষ যত্ন। দিবসে ইহারা দুই তিন বার স্নান করে এবং কেশের পারিপাট্য ও শোভাসম্পাদনের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। স্ত্রীপুরুষ সকলেই স্ব স্ব কেশ পরিষ্কার করিয়া ঝিনুক, পাখীর পালক ও পুষ্পাদির দ্বারা বিভূষিত করে। এই কার্য্যে তাহারা প্রায় এক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করে। উহারা কাষ্ঠের বিচিত্র তাকিয়া এরূপ কৌশলে নির্ম্মাণ করে যে তাহাতে মস্তক রাখিলে কেশের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় না। এই কঠিন তাকিয়াতে মস্তক রাখিতে যদিও তাহাদের খুব কষ্ট হয় তথাপি কেশের জন্য তাহারা এ কষ্ট অনায়াসে সহ্য করিয়া থাকে। দ্বীপবাসীরা সকলেই সোমপায়ী। এই সোমরসের নাম "কাবা"। কেহ কেহ ইহাকে আবাও বলে। সমোয়া দ্বীপবাসীরা উৎসবের সময় যে কাবা পান করে তাহা একরূপ বৃক্ষের শিকড় হইতে প্রস্তুত। উৎসবের সময় হাজার হাজার লোক একত্রিত হইয়া আপন আপন মর্য্যাদা অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলে পর 'কাবা' পরিবেষণ আরম্ভ হয়। প্রথমে একটী সুন্দরী যুবতী ইহা নারিকেলের

মালাতে পূর্ণ করিয়া সমাগত ব্যক্তির মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানভাজন তাঁহার নিকট লইয়া উপস্থিত হয়। তিনি উহা এক নিঃশ্বাসে পান করেন, তার পর যথা নিয়মে সকলে পান করিতে থাকে। কোন কোন দ্বীপে কেবল কুমারীগণই কাবা প্রস্তুত করে।

সঁমোয়া দ্বীপের রাজা—শিরস্ত্রাণ ও বেষ্টনী বস্ত্রের অভিনিবিষ্ট কারুকার্য্য লক্ষণীয়।

অতিথিসৎকার বিষয়ে অন্যান্য জাতির প্রত্যেক গ্রামে একটী জমিদার বা রাজা অপেক্ষা সঁমোয়া জাতি অধিকতর উদার। আছেন। তিনি অতিথি সৎকারের জন্য নিজ

কন্যার উপর ভার প্রদান করেন। অতিথির বাসের জন্য একটী পৃথক গৃহের ব্যবস্থা করা হয়। অনেক কুমারী অতিথি শুশ্রূষার জন্য সেই গৃহে সমাগত হয়। অতিথির আনন্দ বর্দ্ধন ও তাহাকে সুখী করিবার জন্য ইহারা সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করে। উৎকৃষ্ট মাংস ও মৎস আপনারা ব্যবহার না করিয়া অতিথিকে প্রদান করে। বহু পূর্ব্বে টোঙ্গা-দ্বীপ নিবাসীরা রোগীকে রোগ মুক্ত করিবার মানসে দেবতার নিকট নরবলিতে পর্য্যন্ত বলি দিত; কিন্তু এখন উহা বন্ধ হইয়াছে। আমাদের দেশের সতীদাহ প্রথার ন্যায় গ্রামের কোন প্রধান পুরুষের মৃত্যু হইলে তাহার পত্নীকে বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে শীঘ্র মুক্তি দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইত। কিন্তু বিধবা মাত্রেই এ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত ইহারা মৃতের সৎকার করে এবং দেড় বৎসর অবধি অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে। মৃত্যুর দ্বিতীয় দিবসে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়া হয়। তাহার পর আপনাদের মস্তক মুণ্ডন করে। এমন কি যুবতীরাও তাহাদের সখের কুঞ্চিত কুন্তলরাশিকে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়। মৃত ব্যক্তির সহিত হাড়, ফুলের মালা, হাড়, বিনুক, কড়ি প্রভৃতি সৌখিন দ্রব্যগুলি তাহার কবরে দেওয়া হয়।—অশৌচের সময় ইহারা কাঁসেরের এক টুক্‌রা চেটাই ব্যবহার করে ও বৃক্ষ বিশেষের পাতার মালা পরিধান করে।

ইহাদের বিবাহ অতিশয় আড়ম্বরের সহিত হইয়া থাকে। কখনও কখনও একটী কুমারীর অনেকগুলি প্রণয়ী দেখিতে পাওয়া যায়; তখন তাহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হয়—সেই যুদ্ধে এমন কি কাটাকাটি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গুপ্ত বিবাহ কিম্বা গন্ধর্ব্ববিবাহ আদৌ বিবাহ বলিয়া গণ্য হয় না।

সলোমন দ্বীপবাসীদের আকৃতি যেমন ভীষণ তাহাদের অন্তরও তেমনি কুটিলতা ও নিষ্ঠুরতায় ভরা। ইহারা অত্যন্ত সাহসী এবং অন্যান্য দ্বীপবাসীর অপেক্ষা শরীরে বলিষ্ঠ। লুটপাট করিতেও ইহারা বিশেষ পটু। ইহারা ধনুর্ব্বাণ ও ডালাই লইয়া নৌকা করিয়া নিকটস্থ দ্বীপবাসীদিগকে আক্রমণ করে ও লুটপাট করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আনে। ইহাদের নৌকা অত্যন্ত প্রকাণ্ড ও সুগঠিত। প্রত্যেক নৌকায় ৪০।৫০ জন অস্ত্রধারী পুরুষ থাকে। শত্রু সম্মুখীন হইলে ইহারা অস্বাভাবিক রণবিক্রম প্রকাশ করে। ইহাদের বাণদ্বারা যে সমস্ত লোক আহত হয়, ইহারা তাহাদের মস্তক কাটিয়া আনিয়া আপনাদের গ্রামের একস্থানে স্তূপাকারে সজ্জিত করিয়া রাখে। এই স্তূপটী তাহাদের মনে সর্ব্বদাই নিষ্ঠুরতার একটী ভীষণ দৃশ্য জাগাইয়া রাখে। এই স্তূপের নিকট ইহারা দলবদ্ধ হইয়া আনন্দে নৃত্য করে। সলোমন দ্বীপবাসীরা আপনাদের কর্ণদ্বয় বিদ্ধ করে এবং ছিদ্র দুইটীকে কৌশলে এত বড় করে যে একখণ্ড কাষ্ঠফলক উহার ভিতর যায়।

এই দ্বীপপুঞ্জের নিকট ওগেনবিলি নামক একটী ছোট দ্বীপ আছে। এই দ্বীপবাসীদের মনুষ্য না বলিয়া রাক্ষস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারা শোণিতপিপাসু

মনুষ্যখাদক। কোন অপরিচিত ব্যক্তি আর আনন্দের সীমা থাকে না। এখানে আসিলে তাহার প্রাণরক্ষার কোন তাহাকে ধরিয়া প্রথমে বাঘের মত তাহার উপায় নাই। এরূপ ব্যক্তি পাইলে তাহাদের উষ্ণ শোণিত পান করে, পরে তাহার

সলোমন দ্বীপের রক্তপিপাসু যোদ্ধা।

মাংস ভক্ষণ করিয়া জঠরানলের শান্তি করে। সাড়া পড়িয়া যায়। ইহারা এত ক্রূর যে সেদিন তাহাদের গ্রামে একটা যেন মহোৎসবের নিকটস্থ দ্বীপবাসীদের সহিত অকারণে কলহ

করিয়া তাহাদের মস্তক কাটিয়া আনে। মনুষ্যভক্ষন ইহাদের একটী প্রমোদ খেলা এবং নরমাংস প্রিয় ভক্ষ্য বস্তু। ইহাদের গ্রামে কাহারও মৃত্যু হইলে—মৃতব্যক্তি ইহাদের উদরে সমাধি লাভ করে।

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

অন্নপূর্ণার মন্দির।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গ্রামের প্রান্তভাগে নিম্নগামিনী নদীটি বহিয়া যাইতেছে। গ্রীষ্মতাপে ক্ষীণকায়া কিন্তু ক্ষিপ্রগতিশালিনী। তীরে বাগানের ফলের বাগানে নারিকেল তাল প্রভৃতি বৃক্ষগুলা অতি উচ্চ মস্তক তুলিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। প্রদোষের মৃদু বায়ুস্পর্শে কচিৎ এক আধবার মাথা নাড়িতেছে। বৃক্ষান্তরালে শিব-মন্দিরের শ্বেত গাত্র সম্পূর্ণ লুক্কায়িত, কেবল পিত্তল নির্ম্মিত ত্রিশূলটি পশ্চিমাকাশস্থিত সূর্য্যের রক্তরাগে উজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়াছে। এখনও লোক সমাগম হয় নাই কেবল বাবুদের বহুবায়ে নির্ম্মিত সুপ্রশস্ত চিক্কণ সোপান বাহিয়া একটী বালিকা ঘাটে নামিতেছিল। তাহার কক্ষে পিত্তল কলসী, স্কন্ধে একখানা বস্ত্র ও গামছা। বালিকা সোপানের শেষ সীমায় পৌঁছিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছিল;—তাহাকে না দেখিয়া শুষ্ক বস্ত্রখানা সোপানে রাখিয়া জলে নামিয়া পড়িল। গা ডুবাইয়া অন্য মনে জল লইয়া কুলি করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে সোপানের পরে আর একটী বালিকা আসিয়া দাঁড়াইল, প্রথমা বালিকাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া ধীরে ধীরে সোপান বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া একটু শব্দ করিতেই প্রথমা সচকিতে ফিরিয়া দেখিয়া হাসিয়া বলিল "উঃ ভয় দেখেছিল।" দ্বিতীয়া একটু ঠাট্টার স্বরে বলিল "ইঃ কচি খুকী! এমন অন্যমনস্ক হয়েছিস্ যে টেরও পেলি নে! কতক্ষণ এসেছিস্?

"অনেকক্ষণ। তোমার আজ এত দেরী কেন? অন্য দিন তুমিই ত আগে এস।"

"বলব এখন। তুই অমন এক মনে কি ভাবছিলি আগে বল।" প্রথমা ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল "ভাবব আবার কি?"

"না বই কি?" এই বলিয়া দ্বিতীয়া সখীর গাত্রে জল ছিটাইয়া দিল। তথাপি প্রথমা নীরবে কাপড় কাচিতে লাগিল। দ্বিতীয়া তখন তাহার কাপড় খানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বল্‌না— বল্‌তেই হবে।" প্রথমা একটু বিরক্তির স্বরে বলিল "আঃ কি কর ভাই ছাড়না।" দ্বিতীয়া কাপড় ছাড়িয়া দিয়া অভিমানে মুখ ফিরাইল। প্রথমা তখন অনুতপ্তা হইয়া বলিল "তোমার বড় রাগ করা অভ্যাস ভাই। যাক্ আমারি দোষ হয়েছে—কি বল্‌ব বল?"

"মুখ ভার করে ছিলি কেন?"

"নতুন কথা কিছুই নয়। আমাদের সংসারের কথা কি তুমি জাননা—তাই কেবল লজ্জা দাও!" দ্বিতীয়া একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল "ওঃ সেই দুঃখ। আমি ভাবলুম বুঝি—"

"তোমার মুখে একথা খাটে বইকি।" প্রথমা এই কথা বলিতে না বলিতে দ্বিতীয়া তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—"আমার মত ভাবনায় যদি আজ পড়তিস্ ত না জানি তুই কি করতিস্! তাও তবুও ত আমি তোর মত শুক্‌নো মুখে নেই।" প্রথমা দ্বিতীয়ার পানে স্থির আয়ত চক্ষে চাহিল। প্রকৃতির শোভা যেন চতুর্গুণ বাড়াইয়া সুনিপুণ চিত্রকর একখানি চিত্রিত প্রতিমা নদীবক্ষে স্থির ভাবে দাঁড় করাইয়া দিল। মৃদুল বায়ুভরে কবরীভ্রষ্ট দুএকগাছি কেশ মৃদু মৃদু দুলিতেছিল, নদী সুনীল বক্ষ দর্পণে সে মূর্ত্তি যেন তুলিয়া লইতেছে। হীনতেজ রবির আরক্তিম কিরণ সে চিত্রের সৌন্দর্য্য আরও বাড়াইয়া তুলিল! প্রকৃতি মমতাময়ী, ভাগ্য দেবতা নিষ্করুণ! বালিকা মৃদু কণ্ঠে বলিল "তোমার কিসের দুঃখ কমলা? তুমি বড় লোকের আদরের মেয়ে, চারিদিকে সুখ সম্পদ ঐশ্বর্য্য, তাই সোনা মার হাসিমুখ; তাঁদের কোন কষ্ট যাতনা তোমায় দেখতে হয়না, শুনতে হয়না,—তোমার কি দুঃখ? কি কষ্ট?"

"তা কি থাকতে পারে না? গরীব হওয়াই বুঝি সব চেয়ে দুঃখ!" বালিকা একটু অসহিষ্ণু ভাবে বলিল "তা জানিনা।" তাহারা যে গরীব তাহা লোকের কাছে বলিয়া বেড়ান' বালিকার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সে চুপ করিয়া রহিল। কমলা বলিল, "সত্যি ভেবে ছাখ ওসব কষ্ট ত অতি সহজেই নষ্ট হতে পারে,—কিন্তু যারা মনের কষ্ট পায় তাদের কষ্ট কিসে শেষ হয় বল দেখি?"

"সতী অনিচ্ছাতেও একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার তাহলে সেই রকম কষ্ট কিছু হয়েছে বুঝি?"

"আমি বড় লোকের মেয়ে আমার আবার কষ্ট কি—দুঃখ কি সতি!

"মাপ কর ভাই আমার দোষ হয়েছে। কি হয়েছে বল না?"

জানিস্ আমার বিয়ে!'

"বিয়ে? কবে?

"বোধ হয় মাসখানেকের মধ্যেই। জিজ্ঞাসা কর্‌বিনা কার সঙ্গে?"

সতী একটু হাসিয়া বলিল "সে জানা আছে। বিশু দাদার সঙ্গে।"

"না রে— তাহ'লে আর মজা কি—আর একটা কে,—আজ সম্বন্ধ এসেছে।"

"সতী বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া বলিল "তবে তুমি যে বল বিশুদাদা ভিন্ন কাউকে বিয়ে করবেনা, তোমার বাপ মা বুঝি ওখানে বিয়ে দেবেন না?"

"ওখানে ত কোন দিন কথা হয়নি;— তাঁদের এতে আর দোষ কি।"

"তবে তুমি ও রকম কথা নিজেই বুঝি বলতে? কেউ শুন্‌লে কি লজ্জা!"

"ওঃ লজ্জায় ত মরে গেলাম। আমার যদি ইচ্ছে হয়ত কেন বল্‌বনা।"

"তারপরে এখন? বাপমাকে বুঝি ঐকথা বলবে?"

"তাইত ভাবছি। কিন্তু তার আগে যাঁর মন জানার দরকার তাঁর মন জানার কি হয়?" দুঃসাহসিকা কমলার পানে চাহিয়া সতী বিস্মিত ভাবে বলিল "কার মন জানবার দরকার—বিশুদাদার? ছি ছি কি লজ্জার কথা! তোমার ভাই খুব সাহস

ত?" কমলা বিস্ময় ও বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল "তা ভিন্ন এতে আর উপায় কি আছে? তুই বুঝি কোন বই কিচ্ছু পড়িস্ না?"

সতী একটু ক্ষুণ্ণ ভাবে বলিল "রামায়ণ মহাভারত পড়ি।" কমলা ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল "হবেই ত সব পড়। আজ আমাদের বাড়ী বেড়াতে আস্‌বি? ভাল বই পড়তে চাস্‌ত' দিতে পারি।"

সতী সহসা একটু থমকিয়া গেল। তাহার মনে অমনি কমলা ও তাহার অবস্থাভেদের কথা উদয় হইল—একটু জোরের সহিত বলিল "না সে সব বইয়ে আমার দরকার নেই।"

"তা না থাক্ আজ আস্‌বি ত?"

"বল্‌তে পারিনা। জ্যেঠাই মা যদি না বকেন ত' যাব।"

"আচ্ছা তোর মা অত ভাল মানুষ, আর জ্যেঠাইমা অমন কেন?"

"জানি না। এখন উঠি চল, রাস্তায় লোক হবে।"

উভয়ে সোপান বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। কলসী লইয়া উঠিতে সতীর কষ্ট হইতেছে দেখিয়া কমলা বলিল "অত বড় একটা কলসী না আন্‌লেই নয়?"

"না আন্‌লে চল্‌বে কেন?"

"কেন চল্‌বেনা—তোর মা-বা নিয়ে যান্ না কেন?"

"তাঁরা যদি নিতে পারেন ত' আমিও কেন পারবনা?"

"তোর বোন্ সাবিত্রীটা সেটা নিয়ে গেলেও ত পারে।"

"আহা সে যে ছেলে মানুষ"!

কমলা ঠোঁট কুলাইয়া বলিল "তারীত ছেলে মানুষ! তোর চেয়ে মোটে ত দু বছরের ছোট।"

"ও রকম কথা ব'লনা ভাই। সে আমার চেয়ে ঢের বেশী সহ্য করে। তোমাদের বড় লোকের ঘরে ও রকম মেয়ে সহজে দেখ্‌তে পাবেনা তা জেনো। ছোট ভাইটির যত আব্‌দার সে সহ্য করে, দাদার দৌরাত্ম্য, জ্যেঠাইমার বকুনি, বাবার ফরমাস্ সে যত মেনে চলে আমি তার একাংশও পারি না। গরীবের ঘর বলে তার অত গুণও তোমাদের চোখে পড়ে না।"

কমলা একটু অপ্রস্তুত হইয়া নীরবে রহিল। সতীর সঙ্গে তাহার এই এক অদ্ভুত রকমের ভালবাসা। সে অবশ্য সতীকে ব্যথা দিবার জন্য ব্যথা দেয় না, অভ্যাসবশত ঐরূপ অহঙ্কারসূচক বাক্য তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়। সতীও তাহা নীরবে সহ্য করেনা, বিলক্ষণ দু কথা শুনাইয়া দেয়। সতী অত্যন্ত অভিমানী এবং কেহ অন্যায় কিছু বলিলে সহিতেও প্রস্তুত নয়। কিন্তু তথাপি কেহ কাহারও উপরে বেশীক্ষণ রাগ করিয়া থাকিতে পারে না। কমলা অপ্রস্তুত হইল রাগ করিল, কিন্তু বেশীক্ষণ নীরব থাকিতে পারিল না। বলিল "বেশ ভাই। আমি যেন তাই বল্‌লাম, তুইও কি কথা শোনাতে কম করিস্?" সতী তখন একটু হাসিয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিল "তুমিও শোনাও না কেন?"

"আমি ভাই তা আর কই পারি! এখন আমাদের বাড়ী কবে যাবি বল?"

"যাব যেদিন হয় একদিন।"

"তা হবেনা, তোর সঙ্গে পরামর্শ করতে

হবে, তুই নইলে হবেনা—আসিস্ একটু শীগগির ক'রে—বুঝ্‌লি ?"

"আচ্ছা"!

কমলা তারাপুরের প্রসিদ্ধ ধনীদার ঘরের মেয়ে। বড়বাবুর আদরের দুহিতা, সর্ব্বসুখভোগে লালিতপালিতা। তথাপি রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের কন্যা সতীর সঙ্গে তাহার যে কেন সখ্য ছিল তাহা বলা কিছু কঠিন। দরিদ্রের সঙ্গে ধনপতির সৌহার্দ্যবন্ধন একটু বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। কমলা যে এরূপ বাটীতে কিছু খোঁটা না সহ্য করিত তাহা নহে, এবং দরিদ্রদের যেমন একটা গূঢ় অভিমান ধনীদের উপরে দেখা যায় তাহারি বশে সতীর অভিভাবিকারাও এজন্য তাহাকে অনুযোগ করিত। উভয় পক্ষ হইতেই এ ঘটনাটা সকলের আলোচনীর বিষয়েরই অন্তর্ভূত। তথাপি কেহ কাহারও সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিত না। এ ব্যাপারের সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে যে রমণীতে রমণীতে সৌন্দর্য্যে সমবয়সে এবং বালোচিত সঙ্গলিপ্সার যে আকর্ষণ তাহাতেই এ কাণ্ডটা ঘটিয়াছিল। কমলা ত্রয়োদশ—সতী দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা মাত্র। তাই তাহাদের এমন অসম ভালবাসা এখনো টিঁকিয়া আছে।

কমলা বাটী গিয়া একখানা খাটের উপরে শুইয়া পড়িল। বিবাহের সংবাদে সতীই সে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। কেননা আজ প্রায় তিন বৎসর হইতে সে তাহার বিবাহের বিষয় ভাবিয়া রাখিয়াছিল। যেদিন সে ঘাটে সাঁতার দিতে গিয়া কিছুদূর ভাসিয়া গিয়াছিল সেদিন বিশ্বেশ্বরই তাহাকে জল হইতে উদ্ধার করে। একথা আর কেহ জানে না কেবল সতী মাত্র জানে। কমলা সেই ঘটনার পর হইতে এই তিন বৎসরে যত পুস্তক পড়িয়াছে তাহাতে এরূপ স্থলে একই কথা লেখে। বিশ্বেশ্বর দেখিতেও মন্দ নয়, নবা যুবক, সম্ভ্রান্ত, বিবাহও হয় নাই। সেও সুন্দরী, ধনীর কন্যা এবং অবিবাহিতা, এরূপ স্থলে ভালবাসা এবং তৎপরিণামে বিবাহ ত অবশ্যম্ভাবী। ভালবাসাটার সন্ধান যদিও এপর্য্যন্ত মুখোমুখী রকমে হয় নাই, কেননা বিশ্বেশ্বরের বাড়ী অন্য পাড়ায়, সে বাড়ীর মধ্যে তাহার গমনাগমনও নাই, সেই ঘটনার পরে বিশ্বেশ্বরের সহিত তাহার ধরিতে গেলে একরকম দেখা সাক্ষাৎই হয় নাই। কিন্তু উপরিউক্ত অনিবার্য্য নীতিঅনুসারে সে তাহাকে ভালবাসিতে বাধ্য, বাসেও, অতএব বিশ্বেশ্বরই বা কেন না বাসিবে! যদিও তাহার এই বিবাহের সম্বন্ধেও বিশ্বেশ্বরের কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছেনা কিন্তু অমন অনেক পুস্তকেই হয়! শেষ পাতে কিন্তু মিলন ঘটেই। যেখানায় তা না ঘটে সে বইয়ের গ্রন্থকারকে কমলা অভিশম্পাত দিয়া থাকে, এবং জীবননাটকের সেরূপ শেষাঙ্ক সে দেখিতেও ইচ্ছা করেনা।

কমলা অনেকক্ষণ শুইয়া পড়িয়া ভাবিল। একজন খাবার খাইতে ডাকিতে আসিলে তাহাকে তাড়া দিয়া ঘরের বাহির করিয়া দ্বারে খিল দিল। একখানা নূতন পুস্তক আসিয়াছিল, সেইখানা খুলিয়া তাড়াতাড়ি শেষ পৃষ্ঠা দেখিল, দেখিল নায়ক নায়িকা সেখানে অতি আরামে ঘরকন্না করিতেছেন। একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কমলা তখন খাটে শুইয়া বই

খানা পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িতে পড়িতে কখন যে মন লাগিয়া গেল এবং পড়িতে পড়িতে আর সব কথা ভুলিয়া গিয়া নায়ক নায়িকার দুঃখে কাঁদিয়া কাটিয়া কখন যে বই বুকে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, মি এবং মাতার দ্বার ঠেলাঠেলিতে জাগিয়া উঠিয়া সে সব কথা স্মরণেও আনিতে পারিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সবে মাত্র প্রভাত হইতেছে! জীর্ণ ক্ষুদ্র খাটীখানির দাওয়াতে বসিয়া অকালবৃদ্ধ রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বসিয়া তামাকু টানিতেছিলেন। নিকটে কড়িকাঠ হইতে ঝুলানো একটা পিঞ্জরের মধ্যে সদ্য জাগরিত টিয়া পাখীটি কয়েকবার "দুর্গা দুর্গা, তারা ব্রহ্মময়ী, হরেকৃষ্ণ প্রভৃতি নাম পড়িয়া আপাততঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাসি ও তামাকু টানা শব্দের প্রতিধ্বনি করিতেছিল। জীর্ণ খড়ের ছাওয়া রান্নাঘরের পীঁড়ায় একধারে কুকুরটা শুইয়া আরামে নাক ডাকাইতেছিল, প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটা আম্রবৃক্ষের নিম্নে খোঁটায় বাঁধা গাভীটি সস্নেহে বৎসকে লেহন করিতেছিল। চারিদিকই স্থির ধীর; বাতাস নিতান্ত নিরুদ্বেগ চিত্তে প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বস্থিত কলাগাছ কটির পাতাগুলি নাড়িতেছে, গাছের তাহাতে তেমন চাঞ্চল্যের ভাব নাই। ভট্টাচার্য্য বোধ হয় ভাবিতেছিলেন যে, সবই এমন নিশ্চিন্ত এমন স্থির কেবল মানুষই এত উদ্বেগচিত্ত এত চাঞ্চল্যপূর্ণ কেন? পাখীটা আনন্দে পড়িতেছে, ব্যঙ্গ করিতেছে, গাভীটা সস্নেহে বৎসকে আদর করিতেছে, কুকুরটা নির্ভাবনায় ঘুমাইতেছে; তাহাদের ত' চিন্তার লেশও নাই। তাহারাও ত খায় কিন্তু সেজন্য ভাবিয়া মরে না। তাহাদের জন্য যে মানুষেরা ভাবিতেছে তাহারা যেন ইহা স্থির নিশ্চিত জানে। তবে মানুষের জন্য কেহ ভাবেনা কেন? মানুষকেই কেন খাটিয়া ভাবিয়া নানা কৌশল করিয়া উদর পুরাইতে, সংসার চালাইতে হয়। পৃথিবীটা এমন পক্ষপাতী কেন? যাহা লইয়া তাহার গৌরব, সেই মানুষের উপর তাহার করুণা এত কম কেন?

ভাবিতে ভাবিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেখানে ধুমের একটা কুণ্ডলী সৃজন করিয়া ফেলিলেন। বহুপুরাতন কদ্দাকারমাত্র অবশিষ্ট ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহের দরজা খুলিয়া একটী রমণী বাহির হইয়া আসিলেন। সরু লাল পেড়ে একখানি বস্ত্র মাত্র পরিধান, হস্তে দুই-গাছি সাদা শঙ্খ, ললাটে সিন্দুর বিন্দু, এই সামান্য বেশেই যেন দাওয়া খানি আলো হইয়া উঠিল। দরিদ্রের বিষাদাচ্ছন্ন অঙ্গন যেন লক্ষ্মীর পবিত্র চরণ স্পর্শে হাসিয়া উঠিল। রমণী কুয়া হইতে জল তুলিয়া ঘরে চৌকাঠে ছড়াইয়া দিল, পরিষ্কৃত তুলসীতলাটি হস্ত দ্বারা নিকাইয়া ফেলিল। হাত ধুইয়া স্বামীর নিকটে এক ঘটী জল ও একটা দাঁতন রাখিয়া গলবস্ত্র হইয়া মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। মৃদুস্বরে বলিল, "এত সকালে উঠেছ? কাল রাত্রে অত বুকবেদনা করেছিল ঠাণ্ডা কেন লাগাচ্ছ?" হুঁকা দেওয়ালের গাত্রে ঠেস দিয়া রাখিয়া মুখ হইতে একটা ধূমকুণ্ডলী বহির্গত করিয়া ভট্টাচার্য্য বলিলেন "চুলোয় যাক্ বুকের ব্যথা, মরণ হ'লেও ত' বুঝ্‌তাম; নিশ্চিন্দি হ'তে

পার্ব্বতে। না মলে ত' আর নিস্তার নেইই।" মর্ম্মাহতা সাধ্বী নীরবে ভূমিতে দৃষ্টি করিয়া রহিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নীরবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আত্মবুকের প্রতি চাহিলেন। স্ত্রী ধীরে ধীরে বলিল, মুখ ধোও।"

"মুখ দোব যখন হয়, তখন চাল ডাল কিছু আছে ত?"

স্ত্রী নীরবে ঘাড় নাড়িল। স্বামী উচ্চ স্বরে বলিলেন "কর্ত্তা বিক্রীর টাকাগুলো সবই ফুরিয়েছে?"

"অতি অল্পই ত দাম হয়েছিল, তিনমাস সেই টাকাতেই ত' চল্‌ল—আর কত দিন চল্‌বে?"

"না চল্‌বে ত আমিই বা আর কি করব? চুরী করব না ভিক্ষে করব?"

স্ত্রী নীরবে চক্ষের জল মুছিল। স্বামী বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তোমরা কেবল ঐ জান; কাঁদলে যদি উপায় হত তো আমিও না হয় কাঁদ্‌তাম।" তার পরে ঈষৎ নম্রস্বরে বলিলেন" আজকে আর আমি পুরতে পাচ্চিনা, কোন রকমে আজ চালিয়ে নাও কাল তখন দেখা যাবে।"

ভট্টাচার্য্য উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়ার গমন করিলেন। স্ত্রী একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একগাছা ঝাঁটা হস্তে লইয়া উঠানে ঝাঁট দিতে দিতে দুএক বার ডাকিলেন "সতি সতি"? দ্বার খুলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে একটী কুসুম কলিকা তুল্যা বালিকা দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল, মাতাকে মার্জ্জনকার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠানে নামিয়া আসিয়া বলিল "কি মা?"

"সতী এখনো ওঠেনি? উঠোনটা ঝাঁট দিত, আমি ততক্ষণ জলগুলো তুলে নিতাম", "আমি জল তুল্‌ছি" বলিয়া বালিকা কূপের নিকটে ছুটিল। মাতা নিবারণ করিলেন "অত জল তুল্‌তে পার্‌বিনা, কষ্ট হবে যাপ আমি যাচ্চি।" বালিকা সে কথা না মানিয়া জল তুলিতে আরম্ভ করিল। আহ্নী বেশী কথা বলিতে জানিতেন না, কন্যাকে আরও দুএক বার নিবারণ করিয়া নীরবে নিজ কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন।

সহসা বিধবা জ্যেঠাইমা 'সুপ্রভাত সুপ্রভাত' বলিতে বলিতে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাহুকে গৃহ কার্য্যে নিযুক্তা দেখিয়া সুউচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "মাগো ঝিয়ের ত কাজ কর্ম্মের খুব ধুম লাগিয়েছ, এদিকে কাল চাল বাড়ন্ত বলেছি তা বুঝি হুঁস্ নেই? ঠাকুর পো গেল কোথায়? বাজার যাক্‌না এইবেলা, এখনি কালীপদ উঠে খেতে চাইবে—গয়লা মাগী কাল দুধটুকুও দেয়নি গা। আর দেবেই বা কি যে তোমা দের গতিক, সাত জন্মে দামটি দেবার নাম করবেনা! সে দুঃখী মানুষ দেবে কোথা থেকে?

একটু কাতর কণ্ঠে জাহ্নবী বলিলেন "এখন ওসব কথা থাক্‌না দিদি। এই মাত্র কত দুঃখ করে গেলেন, শুনতে পেলে বেশী মনঃক্ষুণ্ণ হবেন, আমাদের ত ও নিত্যকার কথা। আর গয়লার যা বল্‌ছ, গয়লার বেশীত পাওনা নেই, খালি এই মাসেরটা পাওনা।"

জ্যেঠাইমা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন "তাই বা কি কম হ'ল, তোমাদের ভাল কথা বলবার যো নেই। আমায় এতে কি এত গরজ!

তবে ছেলেটা দুধ না পেলে কই হয় তাই বলি! তা মরুক গে—"এইরূপে বকিতে বকিতে জ্যেঠাই মা গরুকে বিচালি দিতে গেলেন। আমার তাঁহার শোক উথলিয়া উঠিল, "হতভাগা গরু, অপেয়ে গরু, বাছুর বড় হ'ল আর দুধ দেবে না কেবল খাবে। অমন গরু ভাগাড়ে যায় না কেন।" সাবিত্রী ম্লান মুখে একবার বলিল "ভাল করে কই খেতে পায় যে দুধ দেবে?" জ্যেঠাই মা সেকথা কানেও তুলিলেন না। নিদ্রিত কুকুরটাকে গিয়া এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিলেন। যেচারা কেঁউ কেঁউ করিতে করিতে পলাইল। ব্যাপার দেখিয়া পাখীটা চুপ্ হইয়া গিয়াছিল, জ্যেঠাই মা সম্মুখে আর কাহাকেও না দেখিয়া নীরব পক্ষীটার উদ্দেশে "হতভাগা বাড়ীর হতভাগা পাখী, সকালে একটা দেবতার নাম মুখে নেই" "ইত্যাদি কতকগুলা বকিলেন।"

গোলমালে সতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। বাহিরে আসিয়া সকলকে উঠিতে দেখিয়া অপ্রস্তুত হইয়া মৃদুস্বরে বলিল এত বেলা হয়ে গিয়েছে। কথাটা জ্যেঠাইমার কর্ণে গেল তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন "আলো ধর গো, মেয়ে অন্ধকারে দেখ্‌তে পাচ্চেনা।" সতী নিজেকে দোষী দেখিয়া সেকথার আর কোন উত্তর দিলনা। মাতাকে উঠাইয়া দিয়া আপনি বাসন মাজিতে বসিয়া গেল। জাহ্নবী বলিলেন "হবে আমি নেয়ে আসি?" "যাও" বি.

ভট্টাচার্য্য মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্র ষোড়শ বর্ষীয় পুত্র হরিশঙ্কর আসিয়া বলিল "টোলে না গেলে কেবল বক্‌তে পার, কিন্তু আর কিছুরি বেলায় আক্কেল দেখতে পাই না। শুধুপায়ে পাঁচটা ছেলের মধ্যে যাওয়া যায় কি? আমার চটী চাই—আজই চাই।" জাহ্নবী আসিয়া পুত্রের হস্ত ধরিয়া বলিলেন "হাঁ এখন ওসব কথা বলোনা বাবা এখন অমনি যাও, এর পরে—"

"এর পরে কি? ক'দিন এরকম ক'রে যাওয়া যায়। বাবা আজই আমার চটী চাই।"

রামশঙ্কর একটু উগ্রকণ্ঠে বলিলেন "গরীবের ছেলের অত বড়মানুষী কেন? যাদের যেমন অবস্থা তারা তেমনি ভাবে চল্‌বে! আমি তোদের পায়ে চুরী কর্‌তে যাব নাকি?"

জ্যেঠাই মা অমনি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন "তা ওরা কি জানে! না দেবে ত বাপ হয়েছিলে কিসের-জন্য? যুগ্যি ছেলে অমনি মাথা হেঁট করে থাকে তা লজ্জা হয় না?" তিন বৎসর বয়স্ক কালীশঙ্কর আসিয়া মাতার আঁচল ধরিয়া বলিল" মা কিদে খেতে দে মা।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় ত্বরিত পদে গৃহের মধ্যে গিয়া আল্‌না হইতে চাদর গ্রহণ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে জাহ্নবীও গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "চাদর নিয়ে কোথায় যাবে?"

ভট্টাচার্য্য অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। কনিষ্ঠ পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া জাহ্নবী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠানে নামিলেন "কোথায় যাচ্চ? কোথায় যাচ্চ?"

"কিছু উপায় কর্‌তে পারি ত' ফিরব নইলে এই শেষ জাহ্নবী।" বলিতে বলিতে ভট্টাচার্য্য বাটীর বাহির হইয়া গেলেন। জাহ্নবী ব্যাকুল কণ্ঠে জ্যেষ্ঠপুত্রকে বলিলেন "হরি যা যা,

কোথায় যাচ্ছেন ভাগ্, বুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আয়, যা হরি যা"।

"যাবেন আবার কোথায়! আপনি ফিরে আসতে হবে। আমি চাঁদপুরে নরেন বাবুদের গাড়ী চল্লাম, তিনি আমায় সেখানে কত থাকতে বলেন আমি তোমাদের কথা মনে করে থাকি না, তা আজ থেকে এই বিদায় হচ্ছি এবাড়ীর অন্ন যে ছোঁয় সে চামার।"

জাহ্নবী বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সতী বাসন মাজা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রাতাকে বলিল" ছিছি দাদা তুমি হ'লে কি? তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে! যেওনা, ছি, ফেরো। তোমরা যদি আমাদের এমন করে ফেলে যাবে ত' আমাদের গতি কি আছে। ফেরো, বাবাকে ফেরাও।" "তোদের যা খুসী বকুক, আমি নিশ্চয়ই যাব"। বলিতে বলিতে হরিশঙ্কর বাটীর বাহির হইল। সাবিত্রী ছুটিয়া গিয়া ভ্রাতার দুই হস্ত ধরিল "দাদা তোমার পায়ে পড়ি রাগ করোনা, বাবাকে যেতে দিওনা, বাবাকে ডেকে আন গে।"

বালিকাকে সজোরে এক পার্শ্বে ঠেলিয়া দিয়া হরিশঙ্কর চলিয়া গেল।

জাহ্নবী শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া নীরবে উঠানে বসিয়া পড়িলেন, মুখ অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে আবরিত। সতী চিত্রপুত্তলির ন্যায় ছাই-মাখা হাতে দাঁড়াইয়া রহিল, সাবিত্রী আবার গিয়া ঘর নিকাইতে আরম্ভ করিল; কিন্তু হস্তের কার্য্য সে চক্ষের জলে দেখিতে পাইতেছিল না। কেবল জোঠাইমা উচ্চ চীৎকার ও ক্রন্দনে পাড়াসুদ্ধ লোককে ব্যাপারটা জানাইতে লাগিলেন।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মনের বেগে গ্রাম প্রান্তের রাস্তা দিয়া একেবারে মাঠের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। সত্যই তিনি "যেদিকে দুই চক্ষু যায় সেইদিকে" যাইবার মতই চলিতে লাগিলেন। আলে বাধিয়া হোঁচট খাইতেছেন পদে কণ্টক বিদ্ধ হইতেছে কিছুই গ্রাহ্য নাই। পাশের ভূমিতে পরাণ মণ্ডল বসিয়া তুঁই নিড়াইতেছিল, সে বলিল, "ঠাকুর এদিকে এমন ক'রে কোথায় যাচ্ছেন।" "যমের বাড়ী"। বলিয়া ব্রাহ্মণ চলিতে লাগিলেন। "ভট্‌চাজ্ মশায়! এদিকে- অমন করে কোথায় যাচ্ছেন?"

ব্রাহ্মণ মুখ তুলিয়া দেখিলেন তাঁহাদের পাড়ার বিশ্বেশ্বর মৈত্র। কোঁচা ও পায়ের কাপড় একটু উঁচু করিয়া ধরিয়া ঢেলাভূমি ভাঙিতে ভাঙিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ব্রাহ্মণ থামিয়া দাঁড়াইলেন, পাছে কাহারো সঙ্গে দেখা হয় বলিয়া তিনি বিপথ ধরিয়াছিলেন, দেখিলেন তাহাতেও নিস্তার নাই। বিশ্বেশ্বর নিকটে আসিয়া সসম্মানে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?"

"কোন দিকের প্রতি আমার পক্ষপাত নেই— একদিকে যাকোক যাচ্ছি দেখতেই পাচ্ছ বাপু"।

"কেন কেন? এদিকে ত পথ নেই—মানুষ ত চলেনা—আপনি এদিকে কোথায় যাবেন?"

"কেন বাপু এইত তুমি চলছ, মানুষ চলে না বলছ কি করে।"

"আমার কথা ছেড়ে দেন, সোজা রাস্তায় ফিরতে দেরী হবে বলে এই দিক দিয়ে যাচ্ছি।"

"আমারও তাই মনে করে নাওনা কেন।"

"আমি তারাপুরের মহাজনদের কুঠীতে গিয়েছিলাম—একটা কারবার করবার চেষ্টায় ফিরবার সময় রাস্তা কম হবে বলে এই পথ দিয়ে চলছি।"

"আমিও একটা ব্যাপারে কিছু কাজেই চলেছি বাপু, বিনা কাজে কে কবে মাঠ ভাঙে?"

"ভট্টাচার্য্য মশায়, আপনি লুকুচ্ছেন। যদি বলবার মত হয় অনুগ্রহ করে বলুন না কেন। আমরা আপনার স্নেহের পাত্র, সন্তান তুল্য, আমার কাছে সঙ্কোচ করবেন না।"

"সঙ্কোচ কিসেই বাপু, সঙ্কোচ কিসের।"

"আমি যদি আপনার সামান্য উপকারে লাগি ত কৃতার্থ জ্ঞান করব।"

ভট্টাচার্য্য একবার স্থির নেত্রে যুবার মুখের দিকে চাহিলেন। অতি সরল উদার আগ্রহ-পূর্ণ মুখ,—ব্যঙ্গ বা ছলনার চিহ্নমাত্র বর্জ্জিত। ভট্টাচার্য্য মৃদুকণ্ঠে বলিলেন "তুমি যে রকম ছেলে একথা তোমার যোগ্য তা জানি; কিন্তু বল দেখি আমি কেন তোমার উপকার গ্রহণ করব? আমি কার কোন্ উপকার করেছি যে অন্যের উপকার নেব?"

"উপকার নয় স্নেহের বশে—স্নেহের জোরে নেন।"

"ও কথাই নয়। শোন তবে, আমি বাড়ী থেকে একটা কিছু উপায়ের চেষ্টায় বেরিয়েছি। কিছু উপায় না হয় নিজের একটা উপায়ও ত করে নিতে পারব।"

বিশ্বেশ্বর একটু শিহরিয়া উঠিল। ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল "কি উপায় খুঁজতে পাচ্ছেন—কাজ কর্ম্মের সন্ধানে কি?"

"প্রথম তাই।"

"আচ্ছা আমার উপকার না নেন তারা-পুরের কুঠীতে চলুন, টাকা দশেক মাইনের একটা কর্ম্মচারী চাই, করতে পারবেন?"

"এখনি, কিন্তু মাইনেটা এ মাসে আমায় আগাম—আজকেই দিতে হবে।"

"আচ্ছা, আসুন।"

উভয়ে চলিলেন, বিশ্বেশ্বর একবার অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া এক ফোঁটা অশ্রু মুছিল, অবস্থাটা সে অনুভবে বুঝিয়া লইল।

(ক্রমশঃ)

শোক সংবাদ।

মহারাজা কুচবিহার।

কিছু কাল হইল মহারাজা বাহাদুরের শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি প্রবাসে ইংলণ্ডে চিকিৎসার জন্য গিয়াছিলেন। এই এক বৎসরের মধ্যে তিনবার সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তাঁহার অসাধারণ শারীরিক বলের গুণে সে সকল রোগ কাটাইয়া উঠেন। সকলেরি আশা ছিল তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া আত্মীয় স্বজন এবং তাঁহার ভক্ত প্রজাবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। কিন্তু সে সৌভাগ্য ঘটিল না। তিনি গত ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে আত্মীয় স্বজন এবং প্রজাবর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় প্রজাবৎসল রাজা অল্পই দেখা যায়।

কুচবিহারের ধনী দরিদ্র সকলেই তাঁহার সৌজন্যে মুগ্ধ। আপামর সাধারণকে তিনি স্নেহ চক্ষে দেখিতেন, স্বীয় রাজ্যে উন্নতিকল্পে সদ্ভাব সাধনে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে কখনো কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার সৌজন্য ইউরোপীয় এবং স্বদেশীয় বন্ধুবর্গকে চির দিন নির্দ্বিচারে আপ্যায়িত করিয়াছে। এই শিষ্টাচারের গুণে আজ তাঁহার জন্য স্বদেশী বিদেশী উভয়েই মর্ম্মাহত। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা অক্টোবর তারিখে মহারাজ বাহাদুরের জন্ম হয় এবং অনতিকাল পরে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় দশ মাস বয়সে তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সিংহাসন অধিরোহণ করেন। প্রথম হইতেই ইংরাজ বাহাদুর এই রাজনিপ্তর শিক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই তত্ত্বাবধানে তিনি রক্ষিত হয়েন। কাশী, বাঁকিপুর পাটনা প্রভৃতি স্থানে কলেজে রাজকুমার শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম দিল্লীদরবারে উপস্থিত ছিলেন। একবিংশতি বৎসর বয়সে রাজ্যশাসন ভার প্রাপ্ত হন। তিনি চিরকালই ইংরাজরাজের ভক্ত বন্ধু ছিলেন। যখন সীমান্ত প্রদেশে কিম্বা অন্যত্র যুদ্ধ ঘোষণা হইয়াছে তখনই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তিনি তাঁহাদের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছেন। এই সকল উপকারের প্রতিদানস্বরূপ তিনি সম্রাট এডওয়ার্ডের A. D. C পদ লাভে সম্মানিত হন। ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি যদিও রাজনৈতিক কোনও আন্দোলনে কখনও যোগদান করেন নাই তবুও স্বদেশের উন্নতি কল্পে সর্ব্বদাই উৎসাহী ছিলেন এবং মুক্তহস্তে দান করিতেন। কোনও সদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রার্থনা করিয়া কেহ কখনও তাঁহার নিকট হইতে বিফলমনোরথ হইয়া রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসে নাই।

রাজোচিত বদান্যতার জন্য তিনি যেমন খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তেমনি বীরোচিত দৃঢ়চিত্ততার জন্যও সম্মান যোগ্য। কোনও সৎকার্য্য সমর্থনে প্রস্তুত হইলে তাহা যতই দুরূহ হউক না কেন কিছুতেই নিরস্ত হইতেন না। ইলবার্টবিলের আন্দোলনের ফলে যখন ভারতবাসী ইংরাজবর্গ ভারত-বন্ধু লর্ড রিপনের বিরোধী হন, এমন কি পরম ভারতবাসী অনেকেই তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনে যখন ভীত হইয়াছিলেন তখন রাজপ্রতিনিধি রিপনের বিদায়কালে তাঁহাকে বিশেষরূপ সম্মান দেখাইবার জন্য যে মহতী সভা আহূত হয় মহারাজা বাহাদুর তাহার সভাপতিত্ব পদ গ্রহণ করিয়া দেশের এবং দেশ-বন্ধুর গৌরব রক্ষা করেন। এই বীর নৃপেন্দ্রের মৃত্যুতে যে লক্ষ্মীস্বরূপিনী মহারাণীর জীবন একান্ত শূন্য হইয়া গেল, তাঁহার জন্য আমাদের হৃদয় স্বতই মর্ম্মবেদনায় ব্যথিত হইতেছে। তিনি চিরদিনই স্বামীর সৎকার্য্যের সহায়তা এবং গৃহের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। অতিথি সৎকারে তিনি ভারতবর্ষীয় আদর্শ রমণীর ন্যায় মধুরভাষিণী ও প্রিয়কারিণী। রাজোচিত অকার্পণ্য সত্ত্বেও সুসম্ভ্রান্তা ইন্দ্রাণীর ন্যায় উজ্জ্বল শোভায় যাঁহাকে চিরদিন দেখা অভ্যস্ত তাঁহাকে যে বিধবার ম্লান বেশে দেখিতে হইবে এ শোচনীয় কথা কখনও মনে কল্পনাতেও উদয় হয় নাই—ঘটনায় এখন তাহাও ঘটিল! এ দুঃখ রাখিবার যেন স্থান নাই। অনাথের

নাথ করুণাময় বিধাতা তাঁহার এবং পিতৃহীন সন্তানবর্গের মনে সান্ত্বনা বিধান করুন এবং নবীনরাজা পিতৃগৌরব বিভূষিত হইয়া দেশের গৌরব এবং পিতার নাম রক্ষা করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

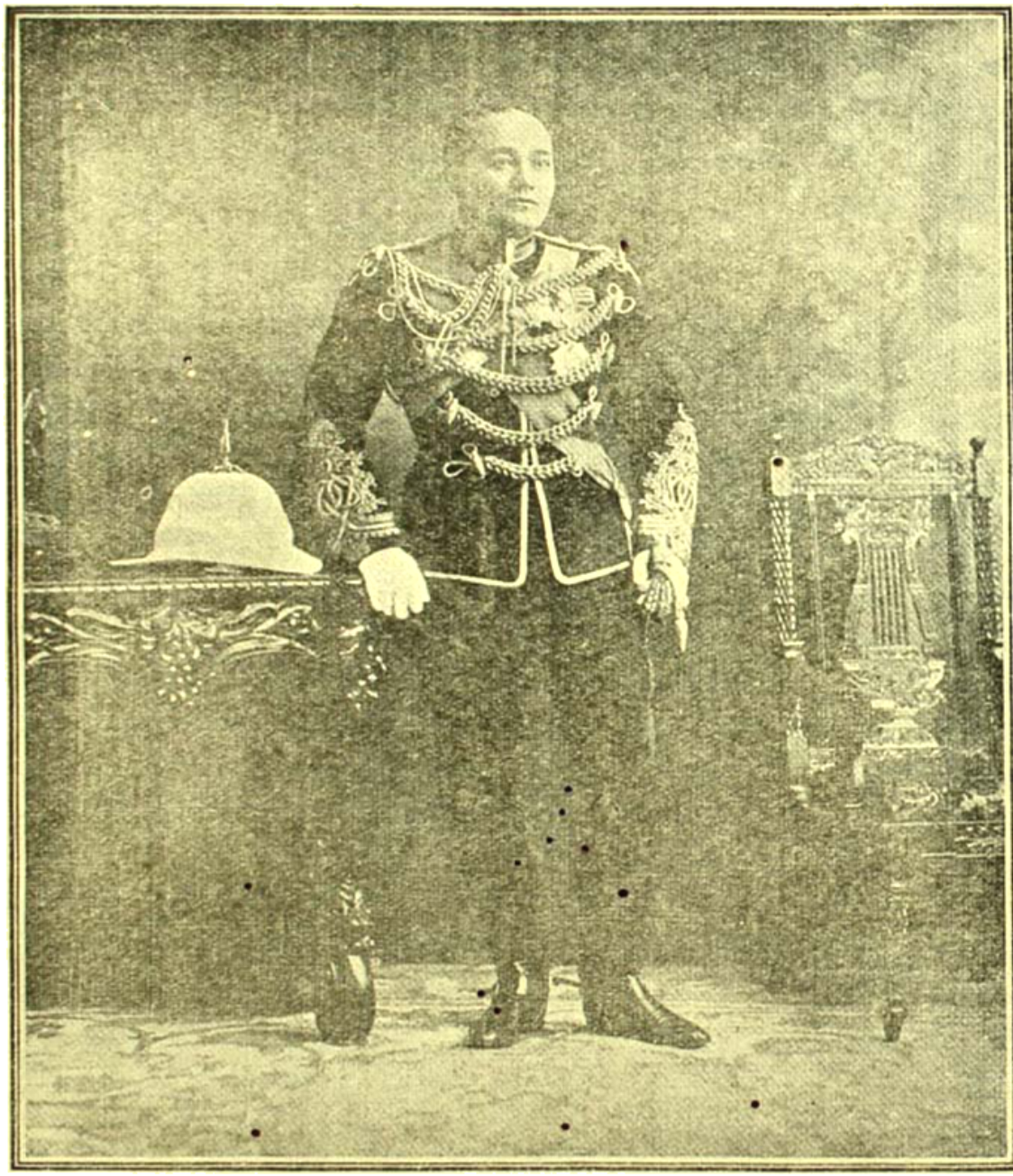

কুচবেহারের মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী।

আর্য্যা নিবেদিতা।

যে কয়জন সহৃদয়া বিদেশিনী নারী ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাহার মধ্যে নিবেদিতা সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা। তাঁহার বুদ্ধি বিদ্যা দেহ মন তিনি একান্ত ভাবে এই দুর্ভাগা দেশের মঙ্গলের জন্যই নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন—তাঁহার নিবে-

দিতা নাম জীবনে মরণে সার্থক করিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্ম্মের ব্যাখ্যা এবং উদ্দীপনাপূর্ণ বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া অনেকগুলি পাশ্চাত্য স্ত্রীপুরুষ হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রামকৃষ্ণ প্রচার মঠে আসিয়াছিলেন, নিবেদিতা তাহাদের একজন। ইনি আইরিস আমেরিকান বংশে জন্মগ্রহণ করেন, ইহার ইউরোপীয় নাম কুমারী মেরি নোবল। ভারতবর্ষের কোন দুঃখের ক্রন্দন তাঁহার নিকট ব্যর্থবিলাপ মাত্র ছিল না; সেবা শুশ্রূষা ও সহানুভূতি দানে সর্ব্বদাই নিবেদিতা তাহা দূর করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, মহামারী, এবং স্বদেশী দুর্দ্দিনে তাঁহার কল্যাণ হস্ত, প্রতিভা দীপ্ত হৃদয়, একাগ্র নিষ্ঠা, অশ্রান্ত চেষ্টা কখনই কোন কঠিন কর্ত্তব্য হইতে বিমুখ হয় নাই। হৃদয়ে তিনি যে ভারতবর্ষের উজ্জ্বল প্রশান্ত মহান আদর্শ ধারণ করিয়া কর্ত্তব্য পথে চলিয়াছিলেন তাহা একদিনের জন্যও ম্লান হইতে দেখি নাই। তাঁহার ভারত প্রীতি, ভারতবাসীর প্রতি মমতা, সহানুভূতি, অতীতের মহিমা জ্ঞান, এবং ভবিষ্যতের উদীয়মান অপূর্ব্ব গৌরব তিনি যে সরল নিষ্ঠার সহিত বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য মনে হয় এবং তুলনায় আপনাদিগের হীনতা, দুর্ব্বলতা, ক্ষীণ বিশ্বাস দেখিয়া হৃদয় হতাশায় জ্বলিয়া উঠে। নিবেদিতার, অকাল মৃত্যুতে আজ আমাদের একটি অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমিক উৎসাহী বন্ধু চিরকালের জন্য চলিয়া গেলেন। এই অকস্মাৎ বিপদ যথার্থই আমাদিগকে কাতর ও হতবুদ্ধি করিয়াছে। যিনি চলিয়া গিয়াছেন তাঁহার স্থান আর কখনো পূর্ণ হইবে কি না কে বলিতে পারে। এই প্রবাসে, আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে তাঁহার মৃত্যু—

হইয়াছে—তবু তিনি চরিত্র গুণে এমন অনেক আত্মীয় সদৃশ বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন যাহারা আজ তাঁহার শোকে একান্ত কাতর।

নিবেদিতার মাতা এমন কন্যারত্ন হারাইয়া আজ কত শোক করিতেছেন, তাঁহার বন্ধুগণ কত বিলাপ করিতেছেন! তাঁহাদের জন্য আমাদিগের প্রাণ একান্ত ব্যথিত। নিবেদিতা যে আদর্শের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন ভারতের যে উন্নতির জন্য অক্লান্ত অধ্যবসায় দেখাইয়া গেলেন সেই আদর্শ সেই একাগ্রতা আমাদিগকে কর্ত্তব্যে দৃঢ়তর নিষ্ঠাদান এবং সম্মুখ ভবিষ্যৎ সুন্দর ও উজ্জ্বলতর করণ জন্য ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা করি। মঙ্গলের মূলীভূত কখনই ব্যর্থ হয় না ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিপিনচন্দ্র পালে এবং সরকার বাহাদুর।—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বোম্বাই অঞ্চলে পৌঁছিবামাত্র রাজদ্রোহ সূচক প্রবন্ধ লিখিবার জন্য অভিযুক্ত এবং ধৃত হন। বিচারে তাঁহার লঘু পরিশ্রমের সহিত ছয়মাসের কারাদণ্ড হইয়াছে। বিচারালয়ে স্বীয় দোষ এবং অবিবেচনা স্বীকার করিয়া বিপিনবাবু সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন এবং সরকার বাহাদুর যে তাঁহার দোষ মার্জ্জনা করিয়া লঘুদণ্ড বিধান করিয়াছেন ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয়। রাজা যদি প্রজার প্রতি পুত্রোচিত ব্যবহার করেন তাহা হইলে রাজা প্রজা এবং দেশের মঙ্গল সাধিত হয়। আমাদের বিবেচনায় পুরাতন দিনিদলের কথা জনসাধারণকে একেবারে ভুলিতে দেওয়াই গভর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রকৃত সমীচীন কাজ।

তুর্ক ইতালিক সমর।—তুর্ক এবং ইতালীর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ইতালি তুর্কসাম্রাজ্যের নিকট ত্রিপলির জন্য অন্যায় দাবী করিয়াছিলেন তাহা তুর্করাজ দিতে অস্বীকার করায় এই অভিযান। এ যুদ্ধের ফলাফল কি হইবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত তবে সম্প্রতি কোনই শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। রোমে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে—ত্রিপলি বন্দর প্রবেশ কালে একখানি ইতালীর যুদ্ধ জাহাজ অবিস্ফোরিত জলমগ্ন হওয়ায় বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তুর্কদিগের রসদ বন্ধ হওয়ায় তাহাদিগের অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। বুলগেরিয়া; গ্রীসের যুদ্ধে তুর্কগণ সম্পূর্ণ পরাজিত এবং তাড়িত হইয়াছেন। ইউরোপীয় অন্যান্য রাজগণ তুর্কইতালির মধ্যস্থতা করিতে বিরত হইয়াছেন—কেননা ইতালী ত্রিপলি সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে না পারিলে যুদ্ধে কিছুতেই বিরত হইবেন না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ইতালীর পক্ষ হইতে যে ভাব আসিয়াছে তাহাতে জানা যায়—তুর্ক সৈন্যাধ্যক্ষগণ সন্ধি করিবার জন্য উৎসুক—সুলতানের আদেশের বিরুদ্ধে তাঁহারা আত্মসমর্পণ করিতে চাহেন এইরূপ জনশ্রুতি। উভয় পক্ষের সম্মান রক্ষা করিয়া শীঘ্র শান্তিস্থাপন হইলে সকলদিকেই মঙ্গল।

কুমারী সোরাবজির অভিমত।—কুমারী কর্ণেলিয়া সোরাবজি অন্তঃপুরিকা বঙ্গীয় রাজা এবং জমিদার পত্নীদিগের আইন সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের অভিভাবকের যাহাতে সুবন্দোবস্ত হয় সেই তত্ত্বাবধান করাই তাঁহার বিশেষ কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের জন্য ইনি সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে প্রভূত বেতন পাইয়া থাকেন। এই সূত্রে বঙ্গীয় অন্তঃপুরিকাদিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় খুবই সম্ভব। কিন্তু তিনি সম্প্রতি ইংলণ্ডে ভারতবর্ষীয় অভিজাত এবং সাধারণ নারীগণের যেরূপ চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে অবাক হইতে হয়। যে দেশে সীতা সাবিত্রী নারীচরিত্রের আদর্শ, যে দেশে স্বামীভক্তি নারীদিগের ধর্ম্ম,—সেখানে

কোনও নারী যে স্বীয় স্বার্থের ইচ্ছা পূরণের জন্য স্বামীকে হত্যার এবং আপনাকে অগ্নিতে বিসর্জন করিতে পারে, সামান্য দুএকটি টাকার জন্য স্বামীর গলায় সাংঘাতিক অস্ত্র ব্যবহার করাইয়া তবে সন্তুষ্ট হয় এ সংবাদ অত্যধিক নূতন বলিয়া বোধ হইল। ভারতে এরূপ হীন কিছুই হয়ত থাকিতে না পারে এমন আমরা বলি না। তবে ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তই ভারত ভরিয়া সর্ব্বত্র বিরাজমান। দুঃখের বিষয় ভারতমহিলার সেই আদর্শ-প্রতিমাখানি মিস মেয়োরঘির নয়নে পড়িল না, তিনি কেবল দেখিলেন যাহা সচরাচর অন্য কেহ দেখে না, জানে না, এবং ভারতবর্ষের পক্ষে বিলাস অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে করে। ভারতবর্ষীয় নারীচরিত্রের এরূপ অবমাননা বিদেশী সমাজে একজন শিক্ষিত ভারতবর্ষীয় দ্বারা হইতে দেখিয়া স্বতঃই আর্য্যা নিবেদিতার কথা মনে পড়ে। তিনি বিদেশী হইয়াও কি মমতা কি শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রমের চক্ষে এদেশবাসীদিগকে দেখিয়া গিয়াছেন! সে শ্রদ্ধা যে কেবলমাত্র ভারতবাসীকে সম্বোধিত করিয়াছে তাহা নয় তাঁহার উদার উন্নত হৃদয়কে আমাদের সম্মুখে অবারিত করিয়া দিয়া আমাদের আন্তরিক প্রীতিও আকর্ষণ করিয়াছিল। আর ভারতীয় বেশে সজ্জিতা এই ভারতবাসিনী মিস মেয়োরঘি ভারতের অন্তর্নিহিত স্নেহ কেমন করিয়া নির্লজ্জভাবে অবহেলা নারীগণের অসভ্য শিক্ষাভাব বিদেশে সাধারণ সভায় সভ্যসমাজে হইয়া প্রচার করিলেন, তাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় কুমারী মেয়োরঘি প্রচার করিয়াছেন আরো তিন বৎসর পরস্পরায় শিক্ষিত হইলে ভারতরমণী তবে জীবনের কর্ত্তব্যপালনে সক্ষম হইবে। যে দেশে সীতা, সাবিত্রী, পদ্মা, লীলাবতী, ঠাকুরাই, লক্ষ্মীবাই রাণী অহল্যা এবং রাণী ভবানীর দৃষ্টান্ত প্রত্যেক ভারত-রমণীর হৃদয়ে জাজ্বল্যমান আছে সেখানে আদর্শ, শিক্ষা দীক্ষা এবং চেষ্টার জন্য ভবিষ্যতে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না ইহা আমরা গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারি।

রাখীবন্ধন।—রাখীবন্ধন করিয়া বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের দিন যে প্রতি বৎসর নূতন করিয়া স্মরণ করা হয় ইহাতে যে কোনরূপ রাজদ্রোহিতার পরিচয় পাওয়া যায় না তাহা গত কলাই বিপাল রাজধানীবাসীদিগের ব্যবহার দেখিয়া সম্পূর্ণ বোধগম্য হয়। কোথাও কোনরূপ গোলযোগ কিম্বা শান্তিভঙ্গ হয় নাই। দোকান হাট সব বন্ধ ছিল, কলিকাতাবাসী প্রায় সকলেই অশৌচ রক্ষা করিয়াছিল। গঙ্গাস্নান, বন্দেমাতরম কীর্ত্তন এবং রাখীবন্ধন ব্যতীত আর কোন বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় নাই। বেলা চারি ঘটিকার পর অপরাহ্নে শোভাযাত্রা করিয়া অগণ্য লোক সমবিব্যাহারে বঙ্গীয় দেশনায়কগণ Federation Hall নামে সম্মিলিত হইলেন। সেখানে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়কে সভাপতির পদে বরণ করা হয়। তিনি বক্তৃতায় বলেন; বাঙ্গালীর একতাবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য লর্ড কার্জ্জন যে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করিয়াছিলেন তাহা সাধিত হয় নাই, বিভাগ সৌকর্য্যার্থে যে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করা হইল বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে—বিভাগ বিরাট ঘটিয়াছে কিন্তু সুবিধা কিছুই হয় নাই। মুসলমান হিন্দুর মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব সৃজন করিবার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। এখন অনেক মুসলমানই বেদিতেছেন এই ব্যবচ্ছেদের ফলে তাঁহাদিগকে নানা অসুবিধা সহ্য করিতে হইতেছে বিশেষতঃ ইহাতে তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা বিস্তারের সমূহ অসুবিধা ঘটিতেছে। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমান প্রায় সকলেই একমত—তবুও যদি এ বিষয়ের প্রতিকার হওয়া আর সম্ভব না হয় তবে সাধারণের একান্ত প্রার্থনা যাহাতে পূর্ব্ববঙ্গে দ্বিতীয় High Court প্রতিষ্ঠিত না হয়। তাহাতে যে মহা অকল্যাণের সৃষ্টি হইবে তাহা কিছুতেই নিবারণ করা সম্ভব হইবে না। ভারত সম্রাট শীঘ্রই আসিবেন তিনি নিশ্চয়ই এমন কোন কল্যাণকর অনুষ্ঠান করিয়া যাইবেন যাহাতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের মঙ্গল সূচনা হইবে, এখন ইহাই সকলের আশা।

লাঠি নিষেধ। বাঙ্গালী বহুদিন হইতে আত্ম-রক্ষার সমস্ত অস্ত্রবর্জ্জিত কেবলমাত্র একখানি ক্ষীণ

মাত্র তাহার সম্বল ছিল। সম্প্রতি রাজবিদ্রোহে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহাকে অসুবিধা সহ্য করিতে হইতেছে তাহা অধিক বলা বাহুল্য। পথে ঘুরিয়া ভাড়া করিলে তাহার প্রতিকার করাও কঠিন। মেসবাসীগণ সকলে একমতে এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিলে রাজপুরুষগণ নিশ্চয়ই প্রকার এ চরম লাঞ্ছনা দূর করিবেন। তাঁহারা ত সামান্য বিষয়ে মিটিং করিয়া সময় নষ্ট করেন আর এই গুরুতর বিষয়ে কেন যে চুপ করিয়া আছেন,—দেশের আপামর লোকের অসুবিধা জানিয়া দূর করিতে গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতেছেন না—তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের এই ঔদাসীন্য দেখিয়া স্বতঃই নিজেদের উপর অশ্রদ্ধা উপস্থিত হয়।

সমালোচনা।

যুথিকা। (প্রথমখণ্ড) শ্রীযুক্ত নাগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। ভারতী, ৩৭নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ কর্তৃক প্রকাশিত। (রাজসংস্করণ) মূল্য দুই টাকা। এই গ্রন্থে আটটি গল্প পরিবেষিত হইয়াছে। গল্পগুলি ছোট নহে। এগুলিকে সংক্ষিপ্ত উপন্যাস বলিলেই ঠিক হয়। প্রচ্ছদপটে বেশ "বেহালি" গল্পটিকে লেখিকার কৌশল বিদ্যা মূর্ত্তিমতী হইয়াছে। অপর গল্পগুলির জন্যও স্থানে স্থানে চেষ্টা করা হইয়াছে—"প্রথম আহবে বেমরিয়া হইতে লাগিল "সমর-সঙ্কল্প" ইত্যাদি। আর একটি ত্রুটি, উল্লেখ করা আমরা কর্ত্তব্য বিবেচনা করি—প্রত্যেক মাসিকপত্রের মধ্যে শিক্ষিতা হাতেই প্রায় আজকাল কথার ইংরাজীর মুণ্ডপাত বিসর্জ্জন দিয়া কথা কহেন—"বেহালি" গল্পের "ভৌমি" এবং "প্রত্যুষ" গল্পের "লাবণ্য"—দুইটি অমন মূর্ত্তিমতী। অথচ লেখিকা, এই চরিত্র দুইটিকে ইহাদের সমাজের অন্তর্গত করিয়া অঙ্কিত করেন নাই। যাহা হউক, গল্পগুলি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি পাইয়াছি—উপাখ্যান গুলিতে বৈচিত্র্য আছে—এবং প্রতি গল্পেই লেখিকার চরিত্রাঙ্কণের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা ভাবের অনুযায়ী।

ভিখারিণী। নাটক। শ্রীযুক্তা অমলা দেবী প্রণীত। ১৮২ নং বেচারাম ষ্ট্রীট, ভারতী লাইব্রেরি হইতে শ্রীযুক্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত; সমাজমোহন যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা। এখানি লেখিকার প্রথম প্রয়াস। গল্পটি পড়িতে বেশ লাগে, আখ্যানভাগ কৌতূহল উদ্রিক্ত করে। কিন্তু নাটকের action উহাতে নাই। নাটকের পরিবর্ত্তে পুস্তকখানি উপন্যাস হইলেই ভাল হইত। আশা করি লেখিকার বিকাশ উন্মুখ শক্তি তাঁহার দ্বিতীয় প্রয়াসে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

চীন ভ্রমণ। ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মল্লিক এম, এ, এল ডি প্রণীত। এম, সি মজুমদার কর্ত্তৃক ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১০ পাঁচ সিকা মাত্র। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণে আমরা এ গ্রন্থের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলাম। লেখকের অক্লান্ত অধ্যবসায়। লেখক আখ্যায়িকা ছাড়া যেখানেই গিয়াছেন, যেন সমাজমুকুরের সহিতই তাহা নিবিষ্ট করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার বহুস্থান পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহার ফলে গ্রন্থের উপাদেয়তা সবিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের বহু সুধীবর্গ ও উপভোগ্য এই গ্রন্থ সুধাধবলি আখ্যায়িকা সাহিত্যে সম্পদ স্বরূপ গণ্য হইবে, সে বিষয়ে আমাদের এতটুকু সন্দেহ নাই। গ্রন্থচিত্রের সমাবেশে বঙ্গবাসীদিগের দিবা পরিস্ফুট হইয়াছে পড়িতে কোথাও বাধে না।

মণিভদ্র।—বৌদ্ধযুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিরচিত। সমবিভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "৩ আতঙ্ক ও অবসাদ গ্রন্থগুলিতে যে সকল মহনীয় চরিত্রোৎকর্ষের ৩০ আদর্শ আছে সেগুলিকে সময়োপযোগিভাবে চিত্রিত করিয়া

প্রকাশ করিলে ও আমাদের তরুণ বয়স্ক ছাত্রবৃন্দের পক্ষে বিশেষ হিতকর হইতে পারে, এই আশায় * * উপন্যাসখানি সংকলন করিয়াছি।" দুর্ভাগ্যের বিষয়, উপন্যাস হিসাবে 'অগ্নিগর্ভ' ব্যর্থ হইয়া হইয়াছে। উপন্যাসের আট কোথাও এতটুকু লক্ষিত হইল না। উপাখ্যানটিতে রোমান্সের প্রচুর উপাদান ছিল, কিন্তু গ্রন্থকার মহাশয়ের নির্জ্জীব ভাষার চাপে রোমান্সের রস মারা পড়িয়াছে। ভাষার ভঙ্গিও সর্ব্বত্র একরূপ নহে। গ্রাম্যভাষা ও পণ্ডিতীভাষার মিশ্রণে বহুস্থলেই রসভঙ্গ হইয়াছে।

ব্যবহারিক কৃষি-দর্পণ।—(প্রথম খণ্ড) কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ২৮৩নং বিডন রো, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা; মাত্র। কৃষিব্যবসায়ের প্রতি অনুরাগ বহু শিক্ষিত ও ভদ্র ব্যক্তির মধ্যে দেখা যাইতেছে, ইহা দেশের পক্ষে শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থে ভূমি নির্ব্বাচন, ভূমি কর্ষণ, সার, এবং ইক্ষু, কার্পাস, শণ, পাট প্রভৃতির চাষ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে। গ্রন্থকার নিজে একটি কৃষিশালার পরিচালক সুতরাং তাঁহার আলোচনা ও মতামতের মূল্য আছে। আলোচনার ভাষাটুকুও যেন সহজ ও সরল কোনরূপ অযথা আড়ম্বরের ভারে নিষ্পীড়িত হয় নাই। কৃষিকার্য্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই গ্রন্থখানি পাঠে উপকৃত হইবেন। গ্রন্থের মূল্য কিছু অতিরিক্ত বলিয়া মনে হইল। মূল্য হ্রাস করিয়া দিলে গ্রন্থখানি সাধারণের পক্ষে সহজ প্রাপ্য হইবে এবং গ্রন্থকারেরও যে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে, তাহা আমাদিগের মনে হয় না।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

খাদ্য। শ্রীযুক্ত ডাক্তার চুনিলাল বসু রায় বাহাদুর প্রণীত। এক বৎসর যাইতে না যাইতেই এই গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ আবশ্যক হইল। ইহা হইতেই বুঝা যায় জনসাধারণের নিকট পুস্তকখানি কত আদৃত হইয়াছে। আমাদের দেশের ও পাশ্চাত্য খাদ্যসম্বন্ধীয় পুস্তক সকল হইতে সার সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার মধ্যে দুইটী নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে, একটি অধ্যায়ে খাদ্য সম্বন্ধীয় কতকগুলি তত্ত্বের আলোচনা ও অপরটিতে কতিপয় সাধারণ রোগে পালনীয় স্বাস্থ্যবিধির ও পথ্যাপথ্যের নির্দ্দেশ আছে। আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা এই পুস্তক পড়িয়া যারপরনাই উপকৃত হইবেন এবং সাধারণ লোকেও পুস্তকখানি পড়িয়া অনেক আবশ্যকীয় বিষয় পালন করিতে পারেন।

একটি বিষয়ে আমার সহিত চুনিবাবুর মতের একান্ত অমিল আছে। তিনি আমিষ ভোজনের ঘোরতর পক্ষপাতী দেখেন। ইহার বিপক্ষে তিনি যে সকল কারণের উল্লেখ করিয়াছেন সেগুলি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি না। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ভাল দুধ আদৌ সাধারণে পাওয়ার অভাবে দেশের মাংসপেশী সবল হয় না; মাংস ঘাঁটা ডিম ইত্যাদি অল্প আয়তনে সারাল ও সহজপাচ্য খাদ্য হওয়ায় নিঃসন্দেহ তাহার অনেক প্রতিযোগিতা হইতে পারে। আমাদের দৈনিক কাজ আজ-কাল অনেক কঠোর হইয়াছে। পরিমিত পরিমাণে এই শ্রেণীর খাদ্য খাওয়াইতে পারিলে শিশুজীবনে শরীর গড়িবার পক্ষে অনেক উপকার হয়। এবং যাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম করেন তাঁহারাও সুস্থশরীর থাকেন এত শীঘ্র শীঘ্র জরাগ্রস্ত হইয়া পড়েন না। হলবার্ট সেনসবের ও সাবারল্যাণ্ডের খাদ্য সম্বন্ধীয় পুস্তকে এ সম্বন্ধে অনেক সদ্যুক্তি দেখান আছে। আয়তনে সরল ও সারে কম এমন খাদ্য খান্ বলিয়াই আমাদের দেশের লোকের এত দুর্ব্বলতা। বিভিন্ন রোগে যেমন বিভিন্ন রকমের চিকিৎসা আবশ্যক তেমনি আমাদের এদেশের এই দুর্ব্বলতা নিবারণের জন্য মাংসের স্থান সারাল খাদ্যই মহৌষধ। বিশেষ বাল্যজীবনে ইহা বড়ই ফলদায়ক।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কার্ত্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩৪, গুরু বাগিচার রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

আলেকজান্ডারের জন্ম

হাকিম মহম্মদ খাঁ অঙ্কিত

ভারতী

৩৫শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ [৮ম সংখ্যা

অন্নপূর্ণার মন্দির ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

বিশ্বেশ্বর নিতান্তই একটি গ্রাম্য যুবক। তাহার পিতা গ্রামের মধ্যে বেশ বর্দ্ধিষ্ণু লোক কিন্তু বাহ্যিক চালচলনে তাহা কিছুমাত্র প্রকাশ হইত না। কৃপণ বলিয়া তাঁহার বরঞ্চ অখ্যাতিই ছিল। সামান্য একতালা বড় বাড়ী, অনেক গুলি গরু বাছুর, গাড়ী বলদ প্রভৃতিতে গোয়াল পরিপূর্ণ এবং ঘাস গম প্রভৃতির গোলায় গোলাবাড়ীতে পা দিবার ঠাঁই নাই। অথচ তেমন বেশী চাকর চাকরাণী রাঁধুনী পানসামার ধুম নাই, টেবিল চেয়ার আয়না দেরাজে বৈঠকখানাও সজ্জিত নয়,—নিতান্তই সাধাসিধা গ্রাম্য গৃহস্থের বাটী। লোকে কিন্তু বলিত বুড়া টাকার কুমীর। সংসারে তাঁহার একমাত্র পুত্র বিশ্বেশ্বর ও তাহার মাসী অন্নপূর্ণাঠাকুরাণী। ইহাঁরা অতিশয় ধনবতী বলিয়া প্রবাদ আছে। মাতৃহীন বিশ্বেশ্বরকে পালন করিতে যখন তিনি নারায়ণচন্দ্র মৈত্রের গৃহস্থালীতে প্রবেশ করিলেন তখন লোকের হৃদয়ে একটা ঈর্ষার তুফান উঠিয়াছিল।

একমাত্র পুত্র বলিয়া নারায়ণ মৈত্র বিশ্বেশ্বরকে কখন চক্ষের আড়াল করিতে পারিতেন না। সেজন্য বিশ্বেশ্বর গ্রাম্য স্কুলে এণ্ট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল মাত্র। কিন্তু লোকে বলাবলি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়িয়াও সে যথার্থ একটা সুশিক্ষিত ছাত্র। সংস্কৃত উপাধিধারী বিদ্যার্ণব বিদ্যাবাগীশ তর্কচঞ্চু সরস্বতীরা তাহার সংস্কৃত জ্ঞানের কাছে পরাজিত হইত। এবং একজন এম এ উপাধিধারী বিদ্বৎশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতও বাবুদের বাড়ীতে আত্মীয়তা সূত্রে আসিয়া এই গ্রাম্য যুবকটির অসাধারণ ভাষাজ্ঞান দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। ইত্যাদি নানা প্রকার গুজব বিশ্বেশ্বরের নামে সে গ্রামের পুরুষ মহলে প্রচারিত ছিল কিন্তু মেয়েমহলে এ সব উড়ো কথা স্থান পাইতনা কেননা; তাঁহারা বেশ জানিতেন যে বিশ্বেশ্বর একটী অতি ভালমানুষ মুখ-চোরা ও সুছেলে।

বিশ্বেশ্বরকে বলিতে গেলে গ্রামের লোক কেহ বেশীর ভাগ কখন দেখিতেই পাইত না। দ্বাবিংশ বৎসরের অধিকাংশ কাল তাহার নিজের গৃহকোটরের মধ্যেই কাটিয়া গিয়াছে। সমবয়সী যুবকদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বেড়ান, বা লম্বা গল্পগুজব করা জীবনে তাহার কখন ঘটে নাই। ষোড়শ বৎসরে এণ্ট্রেন্স পাশের পর স্কুল ছাড়িয়া সেই যে সে নিজের কক্ষে ঢুকিয়াছে এপর্য্যন্ত স্নানাদি সময়ে ভিন্ন কেহ তাহাকে কখন বাহিরেই দেখে নাই। অন্তঃপুরস্থ সে কক্ষে কাহারো প্রবেশাধিকার

ছিল না, নহিলে দেখিতে পাইত, তক্তার উপরে রাশি রাশি পুস্তক ও মেজের উপর মাতুরে উপবিষ্ট যুবক সম্পূর্ণ ভাবে পাঠনিমগ্ন। তাহার পিতার এ বিষয়ে বাধকুণ্ঠতা ছিলনা এবং পুত্রের এরূপ স্বভাবে তিনি বেশ সুখীই ছিলেন। সংসারের কোন চিন্তা এ পর্য্যন্ত পুত্রকে তিনি দেন নাই। ইচ্ছা করিয়াছিলেন বিবাহ দিয়া পুত্রকে সব বুঝাইয়া দিয়া তিনি শেষাবস্থায় কাশীবাসী হইবেন, কিন্তু কাল সহসা আসিয়া তাহার নোটীস জারি করিল। পুত্রকে এক প্রকার সব বুঝাইয়া দিয়া ও মানীর হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি তাঁহার অভিনয় শেষ করিয়া গেলেন।

বিশ্বেশ্বর প্রথমে দিশাহারা হইয়া পড়িল। সাহিত্যের নিভৃত কোটর হইতে তাহাকে একেবারে সংসারের মধ্য স্থানে একাকী অসহায় ভাবে দাঁড় করাইয়া দিয়া পিতা সরিয়া গেলেন! এ যেন নূতন জন্মগ্রহণ! কিন্তু সংসার তাহার পক্ষে জটিল নয়, পিতার শৃঙ্খলাও অতি পরিষ্কার এবং তাঁহারি নির্দ্দিষ্ট বিশ্বেশ্বরের মস্তকটি ততোধিক পরিষ্কার। ইতিপূর্ব্বে সে যেমন অবাধে সাহিত্য সাগরের মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইত সংসারের মধ্যেও সেইরূপ সচ্ছন্দে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সংসারের সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও তাহার বোধ হইল যথেষ্ট সময় আছে; সে সময় সে কিরূপে কাটাইতে পারে তাহার উপায় দেখিতে লাগিল। কারবারটা বাড়াইয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিয়া, কতকগুলা নূতন জমী ও বাগান কিনিয়া তাহার উন্নতি করিয়া সম্প্রতি সে নদীর ধারে অনেক খানি স্থানে কি একটা অভিপ্রায়ে লম্বা একটা বাড়ী নির্ম্মাণের বন্দোবস্তে নিযুক্ত হইয়াছে। ইতি মধ্যে গ্রামা দেবতা ভবানী মন্দিরের সংস্কার কার্য্য হইয়া গিয়াছে, সুপ্তাবশেষ বৃহৎ 'কালী সাগরের' পঙ্কোদ্ধার হইয়া জলে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। মহিমাপুরের ভাঙ্গন বাঁধটা প্রতিবার ভাঙ্গিয়া গ্রাম জলে প্লাবিত হইয়া যায় তাহার বিশেষ রূপে সংস্কার হইতেছে। কে এ সব করিয়াছে সকলে জানিত না, কিন্তু কেহ কেহ বলিত যে কৃপণ নারায়ণ বৈত্রের অর্থগুলারই সদ্গতি হইতেছে। কোন কোন পরহিতাকাঙ্ক্ষী বিশ্বেশ্বরকে ডাকিয়া বুঝাইয়া বলিত, বাপু পরের কাজে গোঁজা না দিয়ে নিজের একটা বড় কিছু করনা কেন, নামটাও থাকবে, ভালও হবে। বিশ্বেশ্বর সে কথা উড়াইয়া দিয়া বলিত অত বড় বড় কীর্ত্তি করা কি আমার সাধ্য! দু চার টাকায় যা হয় সেই পর্য্যন্ত"। যিনি একটু বিচক্ষণ তিনি বলিতেন "সেকি বাবু এসব কাজে যে বিস্তর টাকা লাগ্‌ছে বোধ হয়"। বিশ্বেশ্বর তাচ্ছিল্য ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিত "কোথায়। বেশী খরচ কি আমার সাধ্য।"

মাসিমাতা অন্নপূর্ণাঠাকুরাণী এতদিন সচ্ছন্দে গৃহস্থালির সমস্ত গৃহিণীপনাই বহন করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু সহসা তাঁহার একস্থানে যেন একটু বেখাপ্পা ঠেকিল। তাঁহাদের নিস্তরঙ্গ অল্প সুখদুঃখে মিশ্রিত সংসারটি একটু নূতনত্বে ভরিয়া উঠে এমন ইচ্ছা জন্মিল। পুত্র স্থানীয় বিশুকে একদিন বলিলেন "তাখরে আমার একটা সাধ হয়েছে।" কি মাসিমা?" "সকলের বাড়ী কেমন ছোট ছোট বউঝিতে আলো করে থাকে আমার ঘর একেবারে

ফাঁকা।" "কি করবে বল মাসিমা—মানুষ ত' ফরমাসে গড়েনা, ভগবান দেন্ নি উপায় কি।"

"তা বলে একটী মানুষকে ত' ফরমাসে পড়েই লোকে সংসারে আনে। আমার একটি টুকটুকে বউ এনে দেনা কেন।"

মাসিমার সাধ শুনিয়া বিশ্বেশ্বর হাসিয়া আকুল হইল; সে হাসি আর থামে না। মাসী রাগিয়া বলিলেন "এত হাসি কিসের বল দেখি বাপু! এখন যে বউ না আন্লে লোকে নিন্দা করবে।" "মাসিমা," আপনার নাক কেটে পরের যাত্রা মানুষের স্বভাব। পরের মেয়ে ঘরে এনে কেন বলদেখি একটা জঞ্জাল করা! আমরা মাবেপোয়ে কি মন্দ আছি?"

"মন্দ কেন থাকবি! কিন্তু এর মধ্যে আর একটি এলে আরও ভাল থাকব।"

একটি এলে বলবে আর একটি, মানুষের ইচ্ছে কেবল বেড়েই চলে। তার চেয়ে ভগবান যে ক'টিকে জন্মাবচ্ছিন্নে এক জায়গায় দিয়েছেন সেই কটিকে নিয়ে সুখসচ্ছন্দে থাক।" "এমন ক্ষেপাছেলেও ত' দেখিনি। ওসব আর শুন্বনা। আমি মেয়ে ঠিক্ করব বলে রাখ্‌ছি। "তা তুমি যত ইচ্ছে মেয়ে ঠিক করনা কেন। আমিও তোমায় চার পাঁচটা দিতে পারি।"

"তা বেশ ত বল্‌না, ওর মধ্যে একটিকে পসন্দ করে নিলেই হবে।"

"বাঃ একটিকে পসন্দ করবে আর সব গুলি বুঝি ফিরে যাবে! তা হবেনা, সব গুলো নিতে হবে। তাহলে বউয়ে ঝিয়ে তোমার বাড়ী খুব জাঁকিয়ে উঠ্‌বে।"

"ক্ষেপামী রাখ্‌। সত্যি করে বল বিয়ে এখন করবি কিনা।"

"আমার মত নিয়ে কি তুমি মত করছ! তুমি, যত পার বাড়ীতে বউ ঝি আন আমি কিন্তু বলে রাখছি পশ্চিমের সব দেশ একবার দেখতে যাব। তুমি কাশী বৃন্দাবনের গল্প কর আমি কেবল শুনে যাই, এবারে আমি এলে তোমায় ঠকিয়ে দেব। প্রথম বাবার গয়া করতে হবে। তুমি যদি সঙ্গে না যাও-মাসিমা, আমায় না খেয়েই শুকিয়ে মরতে হবে।"

"আমি কি বল্‌ছি তোর সঙ্গে যাব না, না তোকে একা ছেড়ে দেব! কিন্তু বিয়েটা করে গয়া করতে গেলে হ'ত না বিশু!"

"তা হলে আমি একাই যাই তুমি বিয়ের বন্দোবস্ত কর!"

"তুই না থাকলে কার বিয়ের বন্দোবস্ত করব!"

"সে তুমি জান।"

"এমন ছেলে কখনও দেখিনি বাবু। আচ্ছা চল আগে ঐগুলোই সেরে আসা যাক।

এ সব কথা এই পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল। বৈকালে বিশ্বেশ্বর তাঁহার নবনির্ম্মিত কলা বাগানের তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় একটি মেয়ে একটি ক্ষুদ্র মৃৎ কলসে জল লইয়া তাহার সম্মুখে পড়িল। বালিকা তাহাকে রাস্তা দিবার জন্য গ্রাম্য ক্ষুদ্রপথের পার্শ্বস্থ কচলার গাছে ঘেঁষিয়া যাওয়াতে বিশ্বেশ্বর আস্তে ব্যস্তে বলিল "অত বিপথে কেন যাচ্ছ? এ সময়ে সাপ টাপ থাকে রাস্তায় দাঁড়াও না।" বালিকা একটু হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল "আপনি তবে কেন অত পগারের মধ্যে নাম্‌ছেন?" বিশ্বেশ্বর সে কথার উত্তর না দিয়া "রাস্তা দিয়ে যাও" বলিয়া বালিকার পার্শ্ব অতিক্রম করিয়া

অগ্রসর হইল। বালিকা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বিশ্বেশ্বর রাস্তার বাঁক ফিরিতে গিয়া দেখিল, বালিকা ও পূর্বস্থানে দাঁড়াইয়া আছে। বিশ্বেশ্বর ইয়া একটু দাঁড়াইল; দেখিল শীল তাহাকে নিরীক্ষণ মাত্র সে দৃষ্টি নামাইল। রিল হয়ত বালিকার পরক্ষণেই মনে চেনা বোধ যাহা মনে বার

গম-
ছিল, চাহি-
র সহসা মনে
প্রয়োজন আছে।
এ মেয়েটি যেন চেনা
ছে। কে, যা কাহার কন্যা
যা কিন্তু ইহাকে যে সে দুই তিন
রাছে তাহা মনে পড়িল। কৌতূহল
। বিশ্বেশ্বর ফিরিয়া বালিকার নিকটে
। দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কাদের
য়ে?"

"ভট্টাচার্য্যদের।"

"কোন্ ভট্‌চায? রামশঙ্কর ভট্‌চাযের
ঘরে বুঝি তুমি?"

"হাঁ।" বিশ্বেশ্বর দেখিল বালিকা আর কিছু বলে না অগত্যা সে ফিরিয়া চলিল। নিজে হইতে কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। কেহ কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছে অথচ সঙ্কোচে পারিয়া উঠিতেছে না তাহা বুঝিয়াও সে তাহার কোন সহায় করিয়া উঠিতে পারে না। নিজেও এক রাশ সঙ্কোচ লইয়া মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়ায়। তবে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যকে যে সেদিন ওরূপে বলিতে পারিয়াছিল তাহার কারণ সে তাহার দাসীর কাছে তাঁহার দুরবস্থার কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিল এবং ...কোমল মনে তাহা জাগিয়াই

বলি-
আবার
বল্‌ছিলে?"

সতী সঙ্কোচে
অথচ না বলিলেও নয়,
হইতে হয় এবং হয়ত সং-
করা হয়। বিশ্বেশ্বর ব্যাপার
একটু নিকটে আসিয়া নিম্নকণ্ঠে
"বল না, লজ্জা কি?"

সতী অনেক কষ্টে বলিল,—"কমলা আপনাকে বলেছে—"

"কমলা? কমলা কে?"

"সতী একটু বিস্মিত একটু দুঃখিতভাবে বলিল "তাকে চেনেন না? বাবুদের বাড়ীর মেয়ে, যাকে আপনি একবার জল থেকে তুলেছিলেন।" বিস্মিত বিশ্বেশ্বর একটু হাসিয়া বলিল "ওঃ সেত অনেক দিনের কথা। তা কি?"

ছিল। মনেও ভাবিয়া রাখিয়াছিল যে রামশঙ্কর বা তাহার পুত্র কাহাকেও একটা কার্য্য দিতে পারিলেই তাহাদের দুঃখ দূর হইবে। ভদ্রসন্তান কেহ যে তাহার কাছে অর্থ প্রত্যাশা করে বা তাহার কাছে সংসারের লোক যে কেহ কখনও কোন দাবী রাখে তাহা সে স্বপ্নেও মনে আনিত না। সে কথা ভাবিতেও তাহার মনে সঙ্কোচ হইত। ভট্টাচার্য্যের চাকরীর ঠিক করিয়া দিয়া সে আর তাঁহার কোন খোঁজ রাখিত না। দুই দিনের চিন্তা তাহার এক দিনের মধ্যেই মিটিয়া গিয়াছিল।

বিশ্বেশ্বরকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সতী আবার তাহার পানে চাহিল। অনুচ্চ কণ্ঠে "আপনাকে—আপনাকে" বিশ্বেশ্বর ফিরিয়া আসিল, বলিল, "আমায় "হাঁ"। "কি বল?"

অস্থির হইয়া উঠিতেছিল, পথীর কাছে মিথ্যাবাদী ীর পক্ষে অন্যায়ও বুঝিয়া আর বলিল

কমলা বলেছে—আপনাকে—আপনার না কি বিয়ের কথা হচ্ছে?"

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া ফেলিল, মাসিমার ইচ্ছাটা যে গ্রামে এর মধ্যেই রটিয়া গিয়াছে তাহাতে সে খুব আমোদিত হইল। হাসিতে হাসিতে বলিল "হ্যাঁ" হচ্ছে বৈকি! তাতে কি হয়েছে?"

সতী মস্তকটা যতদূর সম্ভব নত করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল "কমলা বলেছে আপনাকে বিয়ে করবে।" সতীর এই অদ্ভুত কথায় বিশ্বেশ্বরের বিস্ময়ের অপেক্ষা হাসি বেশী আসিতেছিল, কিন্তু সতীর লজ্জা দেখিয়া বুঝিল তাহার সমক্ষে অত হাসাটা যুক্তিযুক্ত নয়, বলিল "কেন তার কোথাও বিয়ের কথা হচ্ছে না বুঝি?" সতী ঠাট্টাটা না বুঝিয়া সরল ভাবায় বলিল, "হ্যাঁ, চাঁদপুরের জমিদারদের বাড়ী। সে তা করবে না।" "সত্যি নাকি?" 'হ্যাঁ'। বিশ্বেশ্বর গম্ভীর মুখে বলিল "সেই খানেই বিয়ে করতে বলো। গাঁয়ে খুব ঘটা হবে আমরা কত ভোজফলার খাব আশা করছি; তারা খুব বড় লোক।"

সতী লজ্জাস্নিগ্ধনেত্রে বিশ্বেশ্বরের পানে চাহিয়া বলিল "আপনারাও ত বড়লোক, খুব ঘটা করতে পারবেন।"

"পাগল হয়েছ, তাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা।"

"কমলাকে কি বলব?" আবার বিশ্বেশ্বর হাসিয়া ফেলিল। অতি কষ্টে মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল "বলো যে আমায় যদি বর হ'তে হয় তা হলে সে বিয়ের ভোজ ফলার কিছুই খেতে পাব না। উপোস করে করে মরতে হবে খালি! অনেক দিন থেকে আশা করে আছি এ বিয়েতে খুব খাব। কাজেই বর হতে পাচ্ছি না, বুঝেছ?" সতী দুঃখিত হইয়া পড়িল কিন্তু বিশ্বেশ্বরের কথা শুনিয়া তাহার হাসিও পাইল। বলিল "আপনি ঠাট্টা কচ্ছেন।"

"না না সত্যিই বলছি; তার কথা রাখতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিতও হচ্ছি। কিন্তু কি করি বল, খাওয়াটার আশাও কোন মতে ত্যাগ করতে পাচ্ছি না।"

সতী তখন গমনোন্মুখী হইল। বিশ্বেশ্বর বলিলেন "তোমার নাম কি?"

"সতী!"

"তোমার দাদা বাড়ী এসেছে? তোমার বাবা সেদিন বলেছিলেন—"

"হ্যাঁ।" এই বলিয়া—সতী কিছুদূর চলিয়া গেল। বিশ্বেশ্বর সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার বাবা তারাপুরের কুঠিতে রোজ যান?" চলিতে চলিতে সতী বলিল, "যান।"

বিশ্বেশ্বরের আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল, তাহাদের কোন অভাব কোন কষ্ট আছে কি না,—কিন্তু সে কথার প্রারম্ভেই সতী চকিতভাবে চলিয়া গেল এবং তাহার নিজেরও সঙ্কোচ কাটিল না, জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইল না। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সেই দিনের পর আর তাহার সহিত সাক্ষাতাদি করেন নাই এবং পাছে তিনি কিছু মনে করেন বলিয়া সে দু একদিন ইচ্ছা করিয়াও তাঁহার নিকটে যাইতে পারে নাই। শেষে তাঁহার আর কোন উচ্চবাচ্য নাই দেখিয়া বুঝিল যে তাঁহার আর কোন অভাব নাই। সে দিনের

সেই অনাহারী পরিবারকে আসন্ন বিপদ হইতে সে যে একটা উপায়ের পথ দেখাইয়া দিতে পারিয়াছিল তাহা মনে করিয়া ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মাসে মাসে দশটী করিয়া টাকা আনিয়া দিয়া ভাবেন যে স্ত্রীপুত্র-কন্যাগণের ঋণ হইতে তিনি মুক্ত হইয়া গিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে ভাবিবার বা করিবার আর তাঁহার কিছু নাই। তাই তিনি সচ্ছন্দচিত্তে যথাসময়ে যাহাহারটি করিয়া দুই তিন ছিলিম তামাকু সেবন করিয়া একটু নিদ্রা যেন, পরে উঠিয়া সযত্নসংস্থাপিত জলে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া কাপড় চাদরটা একটু ঝাড়িয়া পরিয়া কার্য্যে বাহির হন্। রাত্রি আটনয়টার সময় গৃহে ফিরিয়া পুনর্ব্বার সযত্ন সজ্জিত ঈষদুষ্ণ অন্ন ব্যঞ্জন সেবন করিয়া আরামে নিদ্রা যেন। পুত্র হরিশঙ্কর টোল অনেকদিন ছাড়িয়া দিয়াছে, চাঁদপুরের বাবুদিগের সংসর্গেই তাহাকে বেশী দিন থাকিতে হয়; কেননা তাঁহাদের সখের থিয়েটারের সে একজন প্রধান গৌরবের জিনিষ। স্ত্রীজাতির পার্ট একটু করিতে সে অদ্বিতীয় এবং তাহাকে বেশ মানায়ও। সেজন্য বাবুরা তাহাকে ছাড়িয়া দেয় না। মাসের মধ্যে যে দুদিন সে বাড়ীতে আসে সে দুই দিন মাতা ভ্রাতা ভগিনীকে নাকের জলে চোখের জলে করিয়া নিজেও তাক্তবিরক্ত চিত্তে চলিয়া যায়। এ কদর্য্য গৃহের কদর্য্য অন্নব্যঞ্জন কদর্য্যশয্যা আর তাহার পসন্দ হয় না। ভট্টাচার্য্য সেজন্য বিশেষ দুঃখিতও নন। বড়লোকের নজরে পড়িয়া শেষে ওর হয়ত একটা ভালমত কাজকর্ম্ম জুটিতে পারে ভাবিয়া এবং পুত্রের টেরি ছড়ি ধুতী সার্ট সিগারেট দেখিয়া পরম নিশ্চিন্তচিত্তে তিনি তামাকু টানিতে থাকেন। কেবল জাহ্নবী দেবী বিরলে চক্ষুজল মোছেন, মাতার অশ্রু দেখিয়া মেয়ে দুটাও কাঁদিয়া ফেলে।

কেবল বিশ্রাম ছিল না এই তিনটি প্রাণীর। সাংসারিক কর্ম্মের অবসরে জাহ্নবী অনেক কার্য্য করিতেন। যথা, তুলা পেঁজা, সৈতা কাটা, পাটের দড়ি কাটা প্রভৃতি। কন্যাদ্বয়ও নীরবে মাতার কর্ম্মে সহায়তা করিত। জাহ্নবী সূচের কাজও উৎকৃষ্টরূপে জানিতেন কিন্তু তাহাতে পয়সার ঝুলায় না, কাজেই এই অল্পব্যয়সাধ্য কার্য্যের দ্বারা সংসারের অভাব কোনরকমে পূরণ করিয়া লইতেন। দশটি টাকায় সকল খরচ সংকুলান হওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাহা ছাড়া ভবিষ্যতের জন্য, সময় অসময়ের জন্য কিছু সঞ্চয় করারও দরকার। স্বামীর ত ওই শুষ্ক অবস্থা, তিনি হাঁপের রোগী। কন্যা দুইটী বড় হইল, রূপ থাকিলে কি হইবে, রূপ গুণ যাহাতে ঢাকিয়া যায় গৃহে তাহারই অভাব, কে তাহাদের বিবাহ করিবে আর কেই বা তাহার চেষ্টা করে। জাহ্নবী নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভগবানকে স্মরণ করেন।

শুষ্ক দ্বিপ্রহর। তাহাদের রান্নাবান্না ঘরনিকান' প্রভৃতি-সমস্ত কার্য্য শেষ হইল। বিড়ালটা আরামে তুলসীতলায় শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে, কুকুরটা দাওয়ার নীচে শুইয়া পড়িয়াছে। উঠানে মাচার

লাউ কুমড়ার পাতাগুলা রৌদ্রে যেন ঝুইয়া ঝুইয়া পড়িতেছে, পরিষ্কার 'নিকানো পোঁছান' উঠানটির একধারে কলাগাছের ঝাড়টি সতেজে রৌদ্রকে উপেক্ষা করিয়া শ্যামকান্তিতে দর্শকের চক্ষু জুড়াইয়া দিতেছে। উঠানের আমগাছে পাকা আমগুলি টুক্‌টুকে হইয়া ঝুলিতেছে; গাছের পত্ররাশির মধ্য হইতে পক্ক আমস্বাদে ছুই কোকিল এক একবার সাড়া দিতেছে কু কু কু। জাহ্নবী কতকগুলা পাট বাহির করিয়া আনিয়া জলে নরম করিতে লাগিলেন, সাবিত্রী সেগুলা গুছাইতে লাগিল। সতী একবার মাতার পানে চাহিয়া কুণ্ঠিত মুখে বলিল "মা কমলা শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে, একবার যাব?"

"যাও, কিন্তু বড় বোদ্দুর মা, একটু পরে গেলে হ'ত না?"

"তা হোক্, বেলা গেলে পথে লোক হয়। সাবিত্রী যাবি? সাবিত্রী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"না।"

"তবে আমি কার সঙ্গে যাই মা? একা যাব?"

মা বলিলেন "সাবিত্রী যা না মা, সতী একা যাবে কি ক'রে?"

সাবিত্রী রৌদ্রতপ্ত রাঙা মুখখানি ফিরাইয়া, ললাট হইতে রুক্ষ চুলের গোছটা পশ্চাতে সরাইয়া ফেলিয়া মিনতি পূর্ণ চক্ষে চাহিয়া বলিল "তুমি কালীকে নিয়ে যাওনা দিদি। আমি আজ মার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ি কেটে দেখ্‌ব, পারি কিনা। আমি আজ যাব না।"

ভ্রাতা কালীপদকে অনেক রকম প্রলোভন দিয়া ও তাহার মস্তকে একখানা গামছা জড়াইয়া সতী তাহাকে কোড়ে লইয়া বাটীর বাহির হইল। মা ডাকিয়া বলিলেন, "একখানা গামছা মাথায় দিলি না সতী"—রোদ্দুর লাগবে।" সতী সে কথায় মনোযোগ না করিয়া চলিয়া গেল।

বড়লোকের বাড়ী। প্রবেশ করিতেই যেন পা কাঁপিয়া যায়। আজ প্রায় ছই বৎসর কমলা শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার পর সে এবাড়ী আসে নাই। তখনকার অপেক্ষা এখন বয়স বেশী হইয়াছে, সঙ্কোচও বাড়িয়াছে। ধনগর্ব্বিতারা সহজে কেহ কথা কহেন না অথচ চাহিয়াও দেখেন। সতী মনে মনে বলিল আর কোনদিন আসা হইবে না। কিন্তু কমলা যখন ছুটিয়া আসিয়া তাহার গলা ধরিল তখন সতীর বিরাগটুকু ভাসিয়া গেল। এই ছই বৎসরে কমলা আরও সুন্দর হইয়াছে, মোটা হইয়াছে, বস্ত্রে আভরণে সৌভাগ্যের দীপ্তি তাহার শরীরে ঝল্‌মল্ করিতেছে। সতী কথা কহিল না কেবল মুগ্ধ নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। কমলাও প্রথমটা কথা কহিতে পারিল না, এ যেন সে সতী নয়। দারিদ্র্যের মধ্যেও যে গর্ব্বিত সুন্দর মুখখানি কে যেন ভাঙিয়া চুরিয়া গড়াইয়াছে। মাথায় খানিকটা লম্বা হইয়াছে কিন্তু যেন একটু কৃশ। রুক্ষ একরাশি চুল তাহার ক্ষীণ সুকুমার সৌন্দর্য্যের ছায়ার ন্যায় তনুখানি বেড়িয়া রহিয়াছে। অধরে শান্ত হাসি কিন্তু উজ্জ্বল আয়তচক্ষু ম্লান বিষাদময়। কমলা তাহার গলা বেড়িয়া ধরিয়া বলিল "এত কঠিন হয়েছিস্ লো,—আজ ৩ দিন এসেছি মোটে ৮ দিনের কড়ারে। আমি

যদি যেতে পেতাম ত' এসেই ছুটে চলে যেতাম, বড্ডি প্রাণ।" সতী একটু হাসিল কমলা আবার বলিল "এত রোগা হয়ে গেছিস্ কেন ভাই ?"

"রোগা কোথায়! আজ কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা ?"

"প্রায় দু বছর হ'তে চল্‌ল আর কি। এমন জায়গায়ও গিয়ে পড়েছি ভাই যে একদিন কোথাও যাবার যো নেই। এই কত সাধাসাধনা করে তবে এসেছি।" বলিয়া কমলা একটু হাসিল। হাসি দেখিয়া সতীও একটু হাসিল। বলিল "কার সাধ্য সাধনা করে আনতে পেলি? বাড়ীর লোকের ?"

"কার আবার ? শ্বশুর শাশুড়ী কি তাঁদের ছোলদের ওপরে কথা কইতে পারেন ? আমার 'বা' কিন্তু মধ্যে মধ্যে বাপের বাড়ী যেতে পায় আমার ভাগ্যে কিন্তু তা হয় না। আমার যা-কে আমি বলি তাতে সে কত ঠাট্টা করে, বলে এখন নতুন কিনা এরপরে কিছু থাকবে না, আমাদেরও নতুনে অমন ছিল লো। কি মানুষ ভাই! বাপের বাড়ীও আসতে দেবে না।"

উভয়ের গল্প চলিতে লাগিল। কমলার সুখসৌভাগ্যের বর্ণনা শুনিয়া সতী সত্যই আনন্দিত হইল। দুই বৎসর পূর্ব্বের ঘটনাটা তাহার মনের মধ্যে এক একবার জাগিত, আর না জানি কমলা কেমন আছে ভাবিয়া সে ব্যাকুল হইয়া উঠিত। বিবাহের সময়ে কমলার ম্লানমুখ ও বিরক্তিপূর্ণ ভাবে সতী মনে বড় কষ্ট পাইয়াছিল। বিশ্বেশ্বরের প্রতি মনে বড় রাগ হইয়াছিল। এত দিনে সে আশঙ্কা ঘুচিয়া গেল। কিন্তু ভারী একটা কৌতূহল মনের মধ্যে নড়িয়া নড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল কিন্তু অনুচিত ভাবিয়া সে ইচ্ছা সে সম্বরণ করিল। অনেক গল্পের পর কমলা বলিল, "নিজের কথাই কেবল বলে যাচ্ছি—তোর কথা কিছু বল।"

"আমার কি কথা ?"

"বিয়ের কথা! আর কতদিন আইবুড় থাকবি—বিয়ে হবে না ?"

সতী একটু হাসিল। "হাস্‌লে হবে না—বল্‌না, বিয়ের কথা কিছু হচ্চে না ?"

"আমি তার কি জানি।"

"কচি খুকী আর কি! গাছ পাথর নেই।"

"তা কি কর্‌ব! বিয়ে কি অমনি বল্লেই হয় কমলা। বাপ মা আগে পাগল হয়ে উঠ্‌বেন, ঘর দুয়োর সব বিক্রী হবে, সবাই গাছ তলায় দাঁড়াবে তবেত' বিয়ে হবে।"

"আঃ কি বলিস্ তার ঠিক নেই! এত সুন্দর তুই, কতলোকে আদর করে নেবে!"

"তুই নিবি? নিস্‌ত বল"। বলিয়া সতী হাসিল, কিন্তু সে হাসি দেখিয়া কমলার চক্ষে জল আসিল। ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "তাইত ভাই তবে উপায় কি হবে ?"

"উপায় কিসের! এমনি থাকব আর বাপ মার বুকের রক্ত জল করব। যেমন আছি তেমনি থাকতে যে আমার বেশী অসাধ তা তাবিস্ না, কেবল ভাবি এত কষ্টের উপরও তাঁহাদের আবার একি গলগ্রহ।"

"উঠ্‌লি যে ?"

"আর বস্‌ব না। পথে লোক হবে এই বেলা যাই ভাই।"

"কাল আবার আস্‌বি?"

"কাল হয়ত হবেনা, তুই থাক্‌তে থাক্‌তে আর একদিন আস্‌ব।"

"একদিন আস্‌বি! এমন হয়েছিস্ সতী? আমি কতক্ষণে তোর দেখা পাব ভাব্‌ছি আর তুই সচ্ছন্দে বল্‌ছিস্ একদিন আস্‌ব! বেশ ভাই, খুব যাহোক।"

হাসিয়া ভাইটীকে কোলে লইয়া সতী বাড়ী চলিয়া গেল। বাড়ী গিয়া দেখে মহামারী ব্যাপার। অতবড় চোদ্দ বছরের ধাড়ী মেয়েকে বড় লোকের বাড়ী যেতে দিতে লজ্জা করে নাই, এই বলিয়া জোঠাই মা লজ্জার ঘৃণার কণ্ঠের স্বর সপ্তমে চড়াইয়া দিয়াছেন। "আজ আসুক ঠাকুর পো, এর প্রতিকার করে তবে জলগ্রহণ কর্‌ব।"

রাত্রি আটটার পরে রামশঙ্কর বাটী আসিলেন। সাবিত্রী গিয়া তাঁহার পা ধুইবার জল দিল, হাত মুখ মুছিতে গামছা দিল, এবং শেষে একখানা পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। জাহ্নবী অন্নব্যঞ্জন বাড়িয়া দিলে, রামশঙ্কর ভোজনে বসিলেন। সতী কালীপদকে এতক্ষণ ঘুম পাড়াইতে বদ্ধ করিতেছিল। এক্ষণে ক্লান্ত হইয়া তাহাকে শয্যার উপরে ফেলিয়া পিতার নিকটে আসিয়া বসিল। কালীপদ উচ্চ চীৎকার করিল। সতী সাবিত্রীকে বলিল "তুই যা আমি বাবাকে বাতাস করি!" সাবিত্রী তখন ভ্রাতাকে ক্রোড়ে করিয়া চাঁদ দেখাইতে দেখাইতে বাহু দোলাইতে দোলাইতে মৃদুস্বরে ছড়া আবৃত্তি করিতে লাগিল। বালকও দিদির সঙ্গে সঙ্গে আধ আধ বোল দিতে দিতে ঢুলিতে লাগিল।

জাহ্নবী দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া স্বামীর ভোজন দেখিতেছিলেন। একবার দীপালোকিত সতীর মুখে দৃষ্টি পড়িল। বাহিরে প্রস্ফুট চন্দ্রালোকে দরিদ্রের জীর্ণ অঙ্গনে অর্দ্ধস্ফুট কমল কলিকাটির প্রতি দৃষ্টি করিলেন, অজ্ঞাতে তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে একটা নিশ্বাস বহির্গত হইল। সতী শুনিতে পাইয়া একবার মার প্রতি চাহিল।

জোঠাইমা এতক্ষণ নাক ডাকাইয়া দিবা ঘুমাইতে ছিলেন, যথা সময়ে তাঁহার কুম্ভকর্ণের স্বভাবের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। গম্ভীর গুরুপদক্ষেপে রন্ধন গৃহের পীঁড়ায় উঠিলেন, সকলে প্রমাদ গণিল। ধীরে ধীরে গিয়া একখানা পীঁড়া পাতিয়া রামশঙ্করের সম্মুখে বসিলেন। রামশঙ্কর মুখ তুলিয়া একবার দেখিয়া পুনশ্চ আহারে মনঃসংযোগ করিলেন। তখন জোঠাইমার ধৈর্য্য রক্ষা অসম্ভব হইল। কাংস্যকণ্ঠে বাহির হইয়া উঠিল—

"বলি গিলে ত যাচ্ছ; এদিকে বছরের যার বছরের কবে দুই মেয়ে যে গলায় আড় হয়ে লাগ্‌ল তা কি টের পাচ্ছনা? "চাঁস পবন" কি নেই! চক্ষু কি গিয়েছে?"

রামশঙ্কর বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তা কি কর্‌ব টাকা না চাল্‌লে মেয়ে কি করে পার কর্‌ব!"

"কেন বাপ হ'তে পেরেছিলে? মেয়ে দুটো মনমরা হয়ে বেড়ায়, বাছাদের মুখের-দিকে চাইবার কেউ নেই গো। একি কথাই বাপ মা গো! একবার ভাবেনা, সচ্ছন্দে মুখে ভাত তোলে।" জাহ্নবী মৃদুস্বরে বলিলেন

"দিদি এখন ওসব কথা কেন তুলছ, ওকথাত' আছেই, এখন"—এইবার কণ্ঠ গগন ভেদ করিল,—"ঐজন্যেই এসংসারে এক দিন থাকতে ইচ্ছে করে না! মরুক গে, আমার এত কি জ্বালা! আমি কেন মরি, যখন বাপ মা নিশ্চিন্ত তখন আমি কোন "হিদের কুটুম বিদে!" আমার কেন এত ঝক্কি। আমারত' জাত যাবেনা গালে চুণ কালি পড়বে না শত্রুর হাসবেনা!" রামশঙ্কর অন্ন ছাড়িয়া উঠিতে গেলেন। সতী দুই হাতে পিতার পা চাপিয়া ধরিল "বাবা বাবা উঠোনা, খাও।" রামশঙ্কর সরোষে পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন "হয় তোরা মর্ নয় আমি"—বলিতে বলিতে তাঁহার হাঁপানি উঠিয়া পড়িল, কাসিতে কাসিতে তিনি ঘাম দিয়া শুইয়া পড়িলেন, জাহ্নবী ত্রস্তে আসিয়া স্বামীকে ধরিলেন, বুক পিঠ ডলিয়া দিতে লাগিলেন, সাবিত্রী ছুটিয়া আসিয়া পিতাকে বাতাস করিতে লাগিল। সতী কাঠের মত বসিয়া রহিল।

প্রকৃতিস্থ হইয়া বহু অনুনয়ে রামশঙ্কর আহার শেষ করিলেন। জাহ্নবী স্বামীকে পান তামাকু দিতে গেলেন; সতী তখন ধীরে ধীরে গিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। স্বামীকে সুস্থ করিয়া জাহ্নবী আসিয়া দেখিলেন পায়ের কাছে বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে সাবিত্রী পাখা দ্বারা বিড়াল তাড়াইতেছে। জাহ্নবী বলিলেন "সতী কই?"

"দিদি শুতে গিয়েছে, তুমি জাত দাও, আমি ডেকে আনি।"

সাবিত্রী গিয়া শয়ানা সতীকে ডাকিল "দিদি খেতে এস।" দিদি উত্তর দিল না।

"দিদি খেতে এস, মা বলে আছেন, ওঠো," দিদি উঠিলনা।

"ওঠো দিদি তোমার পায়ে পড়ি। বাবার কথায় কি রাগ কত্তে আছে—উনি কত কষ্টে অমন করে বলেন তাত' আমার চেয়ে তুমি বেশী বোঝ। ওঠো দিদি।"

সতী মুখের কাপড় খুলিয়া অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বলিল "তুই যা আমি আজ খাবনা, খিদে নেই। তোরা খা গে।"

"আমি তাহ'লে আজ তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব। ওঠো দিদি চল।"

"সর্দ্দিস্ত্রী হচ্ছী আমার! কথা শোন, তুমি গিয়ে খাও গে, আমার অসুখ করেছে।" "সে কথা আমি শুনবনা, অন্তত দুটী ও তোমায় মুখে দিতে হবে।"

জাহ্নবী আসিয়া সতীর হস্ত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন। স্থির কণ্ঠে বলিলেন "তোরা শুদ্ধ যদি এমন অবুঝ হোস্ তাহ'লে আমার মরণই ভাল। খেতে চল্"।

তখন সকলে নীরবে গিয়া আহার কার্য্য সমাধা করিল।

প্রভাতে রামশঙ্কর কয়েক ছিলিম তামাকু টানিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন "আখ পাত পুঁততে ত' আজ থেকেই আরম্ভ কর্লেম, কিন্তু সঙ্গতির মধ্যে ত' বাড়ীখানি। যেমন তেমনি পাত্রে দিতেও অন্ততঃ চার পাঁচশ টাকার দরকার। বাড়ীখানা বিক্রী বা বন্ধক ছাড়া আর গতি নেই। বাবুদের কাছে যদি বাড়ী খানা বন্ধক দিতে পারা যায় তো চেষ্টা দেখি।" জাহ্নবী বলিলেন "আগে পাত্রের খোঁজ কর তবে টাকার কথা।" রায় শঙ্কর বলিলেন "তুমি তাই বলছ আমি জানি আগে টাকার খোঁজেরই দরকার। যেমন টাকা জোটাতে পারবে তেমনি পাত্রও

পাব। মেয়ের দারে ভিটেটুকুও এইবার যাবে।" জাহ্নবী একবার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সতী ঘুমাইতেছে। সে একথা শুনিতে পায় নাই দেখিয়া একটু শান্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর 'সাবিত্রী' ব্রত উদ্‌যাপনের মহা ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। বাড়ীতে বড় বড় জোল কাটিয়া রান্না বান্না হইতেছে,ময়রারা সন্দেশ আনিয়া মহা দোরগোলের সহিত ওজন করিতেছে, গোয়ালারা বাঁকে বাঁকে দই ক্ষীর আনিয়া দালান ভরিয়া ফেলিতেছে; প্রতিবাসীরা বড় বড় কাঠের কেঠো লইয়া ভীম পরাক্রমে মশলা মাখিতেছে, সুদর্শন চক্রের ন্যায় ঝাঁজরা হাতাধারী ব্রাহ্মণ কুল-তিলক রাবণের ভোজের উপযুক্ত কড়ায় লুচি ভাজিতেছে—গন্ধে দিঙ্‌মণ্ডল পুলকিত। ভাঁড় কটরা ও পাতে উঠান পরিপূর্ণ; নিস্তব্ধ বাটী খানি আজ পাড়া মাথায় করিয়া তুলিয়াছে। বিশেশ্বরও নিতান্ত ব্যস্তভাবে মাসিমাতা যখন যা ফরমাইস করিতেছেন তাহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত। অন্নপূর্ণাঠাকুরাণী ব্রত সমাপনান্তে ললাটে রক্ত চিহ্ন তিলক ধারণ করিয়া পট্টবস্ত্রে মূর্ত্তিমতী শান্তিদেবীর ন্যায় কোথায় কিসের অভাব হইতেছে তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত। ক্রমে ব্রাহ্মণভোজন শেষ হইল, অন্নপূর্ণার হস্তে তাম্বুল যজ্ঞোপবীত ও দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া ওঁহারা আশীর্ব্বাদ করিলেন। অন্নপূর্ণা স্নেহসজল চক্ষে বিশ্বেশ্বরকে সেইখানে প্রণত করাইয়া বলিলেন, "ইহাকেই সকলে আশীর্ব্বাদ করুন।"

বহু সমাদরের সহিত সধবাদিগের ভোজন সমাপ্ত হইল। জাহ্নবী সতী ও সাবিত্রীকে লইয়া নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণার মুগ্ধ চক্ষু পুনঃ পুনঃ সতীর উপরে নিপতিত হইতেছিল। যখন তাম্বুল ও দক্ষিণা বস্ত্রাদি গ্রহণান্তে সধবারা বিদায় লইতে লাগিলেন তখন অন্নপূর্ণা জাহ্নবীকে মৃদুস্বরে বলিলেন "বৌ একটু ব'সে আমার সঙ্গে দেখা করে যেও, দুটো কথা আছে।" জাহ্নবী অগত্যা বসিলেন।

গোলযোগ কিছু মিটাইয়া অন্নপূর্ণা আসিয়া একখানা আসন টানিয়া লইয়া নিকটে বসিলেন। বলিলেন "বৌ তোমার বড় মেয়েটির বয়স কত হোল? জাহ্নবী ম্লান মুখে বলিলেন "তের চোদ্দ হ'ল বই কি দিদি।"

"বিয়ের কথা কোথাও হচ্চে?"

"চেষ্টা দেখছেন, এখনও ত কোথায় হয়নি।"

"এমন সুন্দর মেয়ে লোকের এত দিনে লুফে নেবার কথা, এত দেরী হচ্চে কেন?" জাহ্নবী নীরবে রহিলেন। "আমি যদি বিশুর এমনি একটি বউ পাই।" সতী নত মস্তকে বসিয়া ধীরে ধীরে ঘামিয়া উঠিতেছিল। জাহ্নবী ক্ষীণস্বরে বলিলেন "বিশুর কনের অভাব কি দিদি! এর চেয়েও কত ভাল ভাল মেয়ে পাবে।"

"তোমার মেয়ে দুটির বড় গুণও শুনতে পাই; বড় হওয়ার পর থেকে ওদের একদিনও আর দেখিনি। তা দেখ বউ আমি একেবারেই কথাটা ফেলছি! তোমার বড় মেয়েটিকে আমায় দাও।"

জাহ্নবী কিছুক্ষণ যেন বাক্‌শূন্য হইয়া

রহিলেন। অতি কষ্টে ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন "দিদি আমার মেয়ের কি এত ভাগ্যি হ'তে পারে যে—"

"ওসব কথা রাখ। এমন মেয়ের ভাগ্যি হবেনা ত' কার হবে! মা আমার সাক্ষাৎ রাজলক্ষ্মী। বড় ঘেমেছ মা, এস একটু বাতাস দি।" অন্নপূর্ণা আঁচল দিয়া সতীকে বাতাস দিতে লাগিলেন এবং সতী দ্বিগুণ ঘামিতে লাগিল। সাবিত্রী তাহার কাছে একটু ঘেঁসিয়া আসিয়া বসিল এবং হাসি-ভরা মুখে তাহার দিদির পানে এক একবার চাহিতে লাগিল। জাহ্নবী বলিলেন "রাত হল দিদি, তবে উঠি।"

"আমার কথার উত্তর কি দিচ্ছ? সতীকে আমার দেবে না?"

"দিদি সতী যদি তোমার পায়ে স্থান পায় তো সতীর পরম ভাগ্য। সতী তোমারই এতে আর আমাদের কি কথা থাকতে পারে দিদি। তবে বিশুর মত হবে ত?"

"সতীকেও যদি তার পসন্দ না হয় তো জানব বিয়ে তার অদৃষ্টে নেই। কিন্তু শোন বৌ, একথা এখন বাইরে বেশী না ছোটে যেন। যে ছেলে, অন্যের মুখে শুনলে হয়ত কিছু একটা করে বসবে, আমি ক্রমে ক্রমে সব ঠিক করব। কিন্তু কোন আশঙ্কা করনা তোমার মেয়েকে পসন্দ হবেনা এমন ছেলে হতেই পারেনা। মাস দুই একটু সবুর কর, আমি কথা দিয়ে রাখ্‌লাম।"

বাটী আসিয়া জাহ্নবী স্বামী চরণে সমস্ত নিবেদন করিলেন। ভট্টাচার্য্য শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। স্ফূর্ত্তিতে তিনি ধরাকে সরাজ্ঞান করিলেন। "তবে আর ভাবনা কিসের, বিশ্বেশ্বর যে ছেলে, ও কখন টাকা চাইবেনা, বাড়ী খানা বেঁচে যাবে। যা খরচ হবে তা এখন কারও কাছে ধারলাত করে নিলেই হবে—কি বল? ক্রমশঃ শোধ দেওয়া যাবে" ইত্যাদি। জাহ্নবী একবার বলিলেন "এখনি অত আনন্দ করনা, যদি ভবিতব্যি থাকে ত হবে, কিছুত' বলা যায় না।"

"না না ওরা এক কথার মানুষ, আর বিশু অতি ভাল ছেলে! আর আমার মেয়ের রূপও নিতান্ত কম নয়! গ্রামের মধ্যে আর কার মেয়ে ও রকম আছে বল দেখি?" ইত্যাদি। কন্যার রূপের গর্ব্বে তিনি সহসা অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। জাহ্নবী নীরবেই রহিলেন; এ অতর্কিত অসম্ভাবিত উচ্চ আশা তাঁহার অন্তঃকরণ যেন গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না।

দুই চারি দিন পরে অন্নপূর্ণা একদিন সতী ও সাবিত্রীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। সতীর যাইতে অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু না গেলেও নয়। অন্নপূর্ণা দুই জনকে অতি আদরে অভ্যর্থনা করিলেন। দুইজনকে নিকটে বসাইয়া গল্প করিতে লাগিলেন। স্নানান্তে শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিয়া শুভ্র উপবীত গাছটি মার্জ্জনা করিতে করিতে বিশ্বেশ্বর ভোজনার্থ মাসিমাতার নিকটে আসিল। তাহাদের দেখিয়া একবার পিছাইয়া আবার কি ভাবিয়া একধারে মাসিমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল "মেয়ে দুটী কাদের মাসিমা?" মাসিমা সকৌতুকে বলিলেন, "বল দেখি কাদের?" বিশ্বেশ্বর চাহিয়া দেখিতে লাগিল, সতী ত' লজ্জায় অধোমুখী। সাবিত্রীরও একটু লজ্জা

করিতেছিল কেননা মাসিমার ইচ্ছা জানিত। বিশ্বেশ্বর চাহিয়া বলিল ও সতী, না মাসিমা? আর টুটি?"

"সতীর বোন, সাবিত্রী। বল দেখি বিনু কেমন মেয়ে দুটি?"

"বেশ! তুমি বুঝি নিমন্ত্রণ করে এনেছ মাসিমা? আজ কি ব্রত?"

"ব্রত না হলে বুঝি আপনাদের লোককে খাওয়ায় না? তুই এদের সঙ্গে গল্প কর আমি ভাত বাড়িগে।" মাসিমা চলিয়া গেলেন, বিশ্বেশ্বর একটা জানালার উপরে উপবেশন করিয়া বলিল "সতি তোমার ছোট ভাইটির নাম কি? তাকে আননি কেন?" সতী লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল, তাহার আগাগোড়া রক্ত লোহিত গোলাপের মত ফুটিয়া উঠিতেছিল, কপাল বাহিয়া ঘর্ম বারি ঝরিয়া পড়িতেছিল। দিদির বিপদ দেখিয়া সাবিত্রী মৃদুস্বরে বলিল "তার নাম কালীপদ, সে ঘুমিয়েছে।"

তোমার নাম বুঝি সাবিত্রী? "হঁা"।

"তোমাকে আমি খুব ছোট বেলায় দেখেছি, তাতেই চিনতে পারি নি। সতীকে আমি অনেক বার দেখেছি। সতী! তুমি পড়তে পার? কি কি বই পড়েছ? রামায়ণ মহাভারত পড়েছ?" সতী তথাপি উত্তর দিতে পারিল না। বিশ্বেশ্বর তাহার এত বেশী লজ্জা দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। সাবিত্রী সতীর হইয়া উত্তর দিল "দিদি রামায়ণ মহাভারত পড়েছে।" "তুমিও পড়েছ ত?" সাবিত্রী মস্তকটা একটু নত করিল।

আহারাদির পরে তাহারা বাটী চলিয়া গেলে মাসিমা বলিলেন "দুটী মেয়ের মধ্যে কোনটি বেশী সুন্দর বল দেখি?

"বেশী সুন্দর?" বিশ্বেশ্বর একটু বিস্মিত হইয়া বলিল "দুটি-ই ভাল, কে বেশী কে কম আমি অত দেখিনি। একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন মাসিমা?"

"তোর একটু জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে কি না পরখ করতে সতী মেয়েটির পানে হ'তে চোখ যেন নামাতে ইচ্ছে করে না।

"সত্যি নাকি? তা হবে। মেয়ে দুটি খুব ভাল বটে। ওদের সংসারের আর কোন কষ্ট নেই নয় মাসিমা!"

"না কষ্ট কিসের! তবে মেয়েটি বড় হওয়ায় ভারী ভাবনায় পড়ে গিয়েছে।"

"কেন কেন? ভাবনা কিসের?"

"বিয়ে না দিতে পারলে ভাবনা নয়? টাকা নাই, ভাল পাত্র পাচ্চে না, অমন সুন্দর মেয়ে।" বিশ্বেশ্বর অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া বলিল "তা তুমি টাকা ধার দেওনা কেন মাসিমা আহা বেচারীরা।" মাসীমা রাগ করিয়া বলিলেন "আমারত টাকা ধরছে না, তাই উপদেশ দিতে এলে! টাকা হ'লেই ভাল ছেলে মেলে কি না। অমন মেয়ের যুগ্যি ছেলে অমনি সহজে মিলতে পারে?"

"তা সত্যি মাসিমা! আমি তাহ'লে একটু খোঁজে থাকব কেমন? যদি ভাল ছেলে পাই। তুমি কিন্তু টাকা দেবেত! মাসিমার আর সহ্য হইল না, বলিলেন "যা তোর সঙ্গে আর আমি বকতে পারি না, এমনও ছেলে।" ছেলে মাসিমার এ রাগের অর্থ না বুঝিয়া অম্লান প্রফুল্লমুখে আপনার পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিল।

মাসাবধি কাটিয়া গেল। বিশ্বেশ্বর এক দিন কার্য্যগতিকে ভট্‌চায বাড়ীর সম্মুখ দিয়া আসিতেছে; দেখিল শুভ্রসুন্দর নগ্নকায় কালীপদ একটা গোবৎস ধরিয়া খেলা করিতে করিতে এতই উন্মত্ত যে গাভী তাহাকে মারিতে আসিতেছে, তাহা তাহার হুঁস নাই। বিশ্বেশ্বর এক লম্ফে গিয়া বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সরিয়া দাঁড়াইল, গাভী বৎসকে মুক্ত দেখিয়া বালককে ত্যাগ করিয়া বৎসের প্রতি ধাবমান হইল। বিশ্বেশ্বর বালককে আদর করিয়া অভয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমার নাম কি খোকা?" খোকা গম্ভীরমুখে বলিল "কোকা নয় আমি কালীপদ"। "কালীপদ এখনি যে তোমায় গরুতে গুঁতুত।"

"ইস্! আমি গরুকে এক লাঠি বসিয়ে দিতাম।"

তখন কিন্তু বালক কাঁপিতেছিল। বিশ্বেশ্বর তাহাকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। দ্বারের নিকট হইতে কে ডাকিল "কালী!" বিশ্বেশ্বর ফিরিয়া দেখিল সতী। সতীও থমকিয়া দাঁড়াইল, বিশ্বেশ্বর তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন "এখনি একে গরুতে মারত, ছেলেদের একটু সাবধানে রাখ্‌তে হয়।" সতী কথা কহিল না, বিশ্বেশ্বর তাহার ক্রোড়ে বালককে দিতে গেলে সতী একটু পিছাইয়া গেল, পাছে কেহ দেখে বলিয়া সে বিব্রত। কালীকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিয়া বিশ্বেশ্বর বলিল "ওকে কোলে নাও, এখনও ভয়ে কাঁপ্‌ছে।" সতী ভ্রাতাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল কিন্তু লজ্জায় সেও কাঁপিতেছিল, বিশ্বেশ্বর বলিল, "তোমরা আর মাসিমার কাছে যাও না?" উত্তর না দিয়া সতী বাটির মধ্যে প্রবেশ করিল। বিশ্বেশ্বর একটু ক্ষুণ্ণ হইল। এরূপ স্থলে একটা কথা কওয়া উচিত, নহিলে নিতান্ত অকৃতজ্ঞের মত দেখায়। লজ্জার মাত্রা এত বেশী হওয়াটা মোটেই শোভন নহে।

দুই মাস অতিবাহিত হইল তখন মাসিমা দেখিলেন তাঁহার মূর্খ ছেলেটিকে স্পষ্ট বলার প্রয়োজন, নহিলে সে বুঝিবে না বা বুঝিতে চাহিবে না। একদিন অসময়ে পুত্রকে ডাকিয়া বিনাড়ম্বরে বলিলেন "তোমার বিয়ের আমি সব স্থির করেছি, আস্‌ছে মাসে সতীর সঙ্গে তোমার বিয়ে।"

বিশ্বেশ্বর এইবার একটু স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটিয়া গেলে বলিল, "সেকি মাসিমা! সতিরা যে আমাদের সম্পর্কে কি হয়।"

"কি আবার হয়, স্বজাতি, একটু দূর সম্পর্কের কুটুম্ব, তাতে বিয়ে আটকায় না।"

"আটকায় বৈকি। আরে ছিঃ ছিঃ ওদের ভাই হরি আমায় দাদা বলে ডাকে; ওরাও হয়ত কত দিন বিশুদাদা বলে ডেকেছে। ছিছি মাসিমা।"

"তবে তুই কি বিয়ে করবিনে? বিয়ে করলে অমন মেয়ে আর কোথায় পাবি।"

"তা নিশ্চয় পাওয়া যাবে মাসিমা, যদি তাই হয় তখন তোমাকে কুৎসিত মেয়ে না এনে দিলেই ত হোল! এখন তুমি আমার বিয়ের কথা বলোনা মাসিমা।"

"আর কবে বিয়ে করবি শুনি! ২৪ বৎসর পার হ'তে চল্‌লি, নিতান্ত কি ছেলেমানুষ আছিস্ যে এখনও ছেলেমী করবি। আমি এই শেষ বলছি শোন, আমি কথা দিয়েছি,

ছ মাস তারা আশা করে বসে আছে। এখন যদি আমার এ রকম অপমান করিস্ ত আমি আর তোর সংসারে থাকব না।" বিশ্বেশ্বর কাতর হইয়া পড়িল। "মাসিমা এতদিন আমায় মাপ করেছ ত অন্ততঃ আরও বছর খানেক মাপ কর তোমার পায়ে পড়ি মাসিমা! আমি মনটা বেশ করে তৈরী করে নিই।"

"আচ্ছা মন কি তৈরী করনি বল্‌ত? বিয়ে কি কেউ করে না?"

"করবে না কেন? কিন্তু আমি ত এর পূর্ব্বে আর করিনি। কাজেই ভয় পেয়ে যাচ্ছি মাসিমা। আমি মনকে কতদিন সান্ত্বনা দিয়ে রেখেছি তাকে আমি স্বাধীন রাখব। কিন্তু তুমি এমন করে বল্‌লে সে আশা আমার বিসর্জ্জন দিতেই হবে। তবে একটু সময় দাও এমন করে বেঁধে ফেলনা মাসিমা।"

মাসিমা হতাশচিত্তে বলিলেন "তারা এক বছর কিছু মেয়ে চাইতে পারবে না। আমি তাদের কাছে আর মুখ দেখাব না বিশু। আমার মতুলপুর তাহলে ছাড়তে হবে।"

"তুমি ছাড়লে আমিও ছাড়ব মাসীমা। দ্যাখ আমার চেয়ে অনেক ভাল পাত্র আমি তাদের করে দেব, তাতে যত টাকা লাগে দেওয়া যাবে; তারা তাহ'লে কিছু মনে করবে না।"

"যা জানিস্ কর্ বিশু! কিন্তু এমন মেয়ে তুই পায়ে ঠেল্‌লি তোকে শেষে পস্তাতে হবে।" মাসিমা নিরাশচিত্তে থামিলেন, কিন্তু মনে অত্যন্ত বেদনা পাইলেন, বিশ্বেশ্বর তাহা বুঝিয়াও কিছুতে মন ফিরাইতে পারিল না। বিবাহ না করাই যেন তাহার স্বপক্ষ হইয়া গিয়াছিল এখন নিজেকে কিছুতেই বিবাহের দেশে সাজাইতে পারিল না। সতীকে কি মতলবে মাসিমা আনিতেন, এখন সে বুঝিতে পারিল। সে না বুঝিয়া নির্দ্দয়ের মত ব্যবহার করায় সতীর আরক্তলজ্জার স্মৃতি আজ মনে পড়িতেই সে সবেগে বলিয়া উঠিল "ছিঃ ছিঃ! না সে কোনমতেই হবে না।"

পরদিন রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিকটে গিয়া বহু আত্মীয়তা জ্ঞাপনান্তে বিশ্বেশ্বর বলিল "সে একটি উত্তম পাত্র স্থির করিতেছে এবং ভগিনীর বিবাহে ভ্রাতার যেমন অধিকার সেই অধিকারে সমস্ত ভার নিজে বহন করিয়া কৃতার্থ হইতে চায়।" রামশঙ্কর ক্রোধে অন্ধকার দেখিলেন, তাঁহার আত্মসম্মানে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। তাহার কন্যা কি এতই হেয়? গর্ব্বিত বচনে বলিলেন "বাপু, তোমার কাছে অত্যন্ত ঋণী আছি, আর বোঝা বাড়াইব না; আমার কন্যার ভার আমিই বহন কর্‌তে পারব তুমি নিশ্চিন্ত থাক।" বিশ্বেশ্বর অনেক সাধা সাধনা করিল, ফল ঘটিল। অগত্যা বিশ্বেশ্বর বিষণ্ণবদনে মাসিমাকে সমস্ত নিবেদন করিল। তিনি দুঃখে লজ্জায় অভিমানে বলিলেন "আমি কিছুদিন গিয়ে কাশী বাস কর্‌ব, এখন এদের মুখ দেখাতে পারব না। তুমি ব্যবস্থা কর।" বিশ্বেশ্বর গৌরবে সমস্ত উদ্যোগ করিল। মাসিমা কাশী যাত্রা করিলেন। কথা ছিল বিশ্বেশ্বর পথ হইতে ফিরিবে কিন্তু সেও টেনে উঠিয়া বসিল। মাসী বলিলেন "তুমি কোথা যাবে।"

"যেখানে তুমি যাবে? আমায় আবার মা হারা করবে মাসিমা!" মাসী আর কিছু না বলিয়া তাহার মস্তকটা ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। (ক্রমশ)

পার্ব্বত্য প্রদেশে নারীর প্রভাব।

আলোচনা করিলে পূর্ব্বপ্রান্তে নারীর প্রভাব সমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এক সময়ে ভারতের স্থান অধিকার করিয়াছিল। খ্রীষ্ট জন্মের

খাসিয়ার রমণী।

উত্তরপূর্ব্বপ্রান্তে মণিপুর, এবং ব্রহ্মপুত্র নদী পার্ব্বত্য ভূভাগ এক সময়ে নারীর গৌরবে হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীরভূমি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ গৌরবান্বিত ছিল। পাশুব সংস্রব ও পীঠস্থান

প্রতিষ্ঠা অনার্য্যদেশে আর্য্যত্ব বিকাশের সূচনা ও প্রথম উদ্যোগ বলিয়া যদি ধরা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐ পুরুষ প্রধান প্রবল স্রোতের সম্মুখে নারী আপনার

খৃষ্টান খাসিয়া রমণী।

মহীয়সী মূর্ত্তি লইয়া বিরাজিত হইয়া পড়িতেন। আর্য্য সভ্যতাকে অকূল প্রান্তে আশ্রয় দিয়া নাগকন্যা উলূপী, কচ্ছ প্রদেশবাসিনী হিড়িম্বা, নারীত্বের মহিমায় আপনাদিগকে খর্ব্ব করিয়া- ও মণিপুর-রাজদুহিতা চিত্রাঙ্গদা ভীমার্জ্জুনরূপী ছেন। নাগা, কাছাড়ী ও মণিপুরী জাতির

ভিতরে বাস্তব জীবনে যদিও নারীর স্থান বাঙ্গালী রমণীর বহু উর্দ্ধে অবস্থিত, তবুও মনে হয় পাতিব্রত্যসংস্রবহীন পীঠস্থান পরিপূর্ণ অনার্য্য পরিপূর্ণ দেশের মহিলাবৃন্দের সম্মুখে ইঁহারাও কৃপার পাত্র।

ঐংট্ট অঞ্চলে একটী কথা আছে,

"পাণ্ পানি নারী।
তিনই জৈন্তা পুরী

খাসিয়া পাহাড়ে উৎপন্ন খাসিয়া পাণ্ তীব্র ঝাল রসে পরিপূর্ণ কিন্তু গুণগ্রাহী জাতির (?) ভিতরে সম্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া বাংলা পাণ্ অপেক্ষা তবুও যেন তাহার অধিকতর সার্থক জন্ম!! বাঙ্গালী সমাজে ভোজনান্তে পাণ্ গ্রহণ একটা উপসর্গ মাত্র, কিন্তু খাসিয়াদিগের ভিতরে অব্যাহত গতিতে পাণ্ চর্ব্বন মানবজীবনের সার সুখ। পিতামাতার মৃত্যু হইলে তাহারা বলে যে, "তিনি ভগবানের গৃহে বসিয়া পাণ্ খাইতেছেন! আর পরিব্রাজকেরা বলিয়া থাকেন, খাসিয়া পাহাড়ের জলের মত স্বচ্ছ-সলিল আর কোথাও নাই। সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে মিশর দেশীয় জনৈক পরিব্রাজকও এই কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই পাণ্ ও 'পানি'র মহিমা তাহাদের নারীর মহিমার নিকটে অতি তুচ্ছ।

কিংবদন্তী আছে যে, পঞ্চপাণ্ডব যখন এই অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে আসেন, তখন জয়ন্তিয়া পাহাড় প্রভৃতি "নারীদেশ" নামে অভিহিত ছিল। তথাকার সৈন্য, সেনাপতি ও সম্রাট সকলেই নারী ছিলেন। কলির অধিকারমুক্ত মনে করিয়া পাণ্ডবেরা এই দেশে প্রবেশ করেন নাই। এই নারীপ্রদেশ এক সময়ে নীলাচলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তন্ত্রতা কামাখ্যা মন্দিরের কুমারী-প্রাধান্য আর্য্যধর্ম্মের উপরে এই মহীয়সী নারীজাতির স্বাধিকার লাভের প্রয়াসফল নহে কি? কালক্রমে সিদ্ধেশ্বর, রূপেশ্বর, ক্রমদীশ্বর প্রভৃতি হিন্দু-তীর্থের প্রভাবে, বিশ্বকর্ম্মার পূজাপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পাসিয়া পাহাড়ের পূর্ব্বভাগে নারীর গৌরব মুছ হইয়া আসে। কিন্তু পশ্চিম প্রান্তে আজও পর্য্যন্ত সমাজে নারীর যে শ্রেষ্ঠ অধিকার রহিয়াছে তাহা বিলাতের ভোটপ্রার্থী নারীগণেরও কল্পনাতীত।

হিন্দুগণ ব্রহ্মাকে লোকপিতামহ ও মনুকে মানবজাতির আদিপুরুষ ভাবিয়া পুরুষ প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। খাসিয়ারা 'কা আই বাই', নামক নারীকে লোকমাতামহীর স্থানে স্থাপন করিয়া নারীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। অধিকাংশ খাসিয়া ললপতিরা রমণীর নামে গোত্রে পরিচয় দিয়া থাকে। পার্ব্বত্য প্রদেশে নারীর প্রভাব কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহা মেজর গার্ডেন প্রণীত "The Khasis" নামক পুস্তক হইতে কয়েকটী প্রাচীন খাসিয়া কাহিনীর উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছি।

এই প্রসঙ্গে 'কা ইউ শিবাই'এর নাম উল্লেখ যোগ্য। তিনি দিয়েংদো সম্প্রদায়ের লোকমাতা। কথিত আছে যে, এই নারীর পূর্ব্বপুরুষ প্রথমে জয়ন্তিয়ার অধিবাসী ছিলেন। পরে রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইলে তাঁহারা কপিলী নদীর পরপারে চলিয়া যান। কিন্তু কয়েক পুরুষ পরে জ্ঞাতি-কুটুম্বদের এই রমণী নানা বিপদের সহিত সংগ্রাম করিয়া অবশেষে নংক্রোম গ্রামে

আসিয়া গ্রাম পত্তন করেন। এই উপলক্ষে দৈনিক পারিশ্রমিক দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি প্রত্যেক মজুরকে কুড়িকড়া করিয়া শি-বাই উপাধি প্রাপ্ত হন; এই

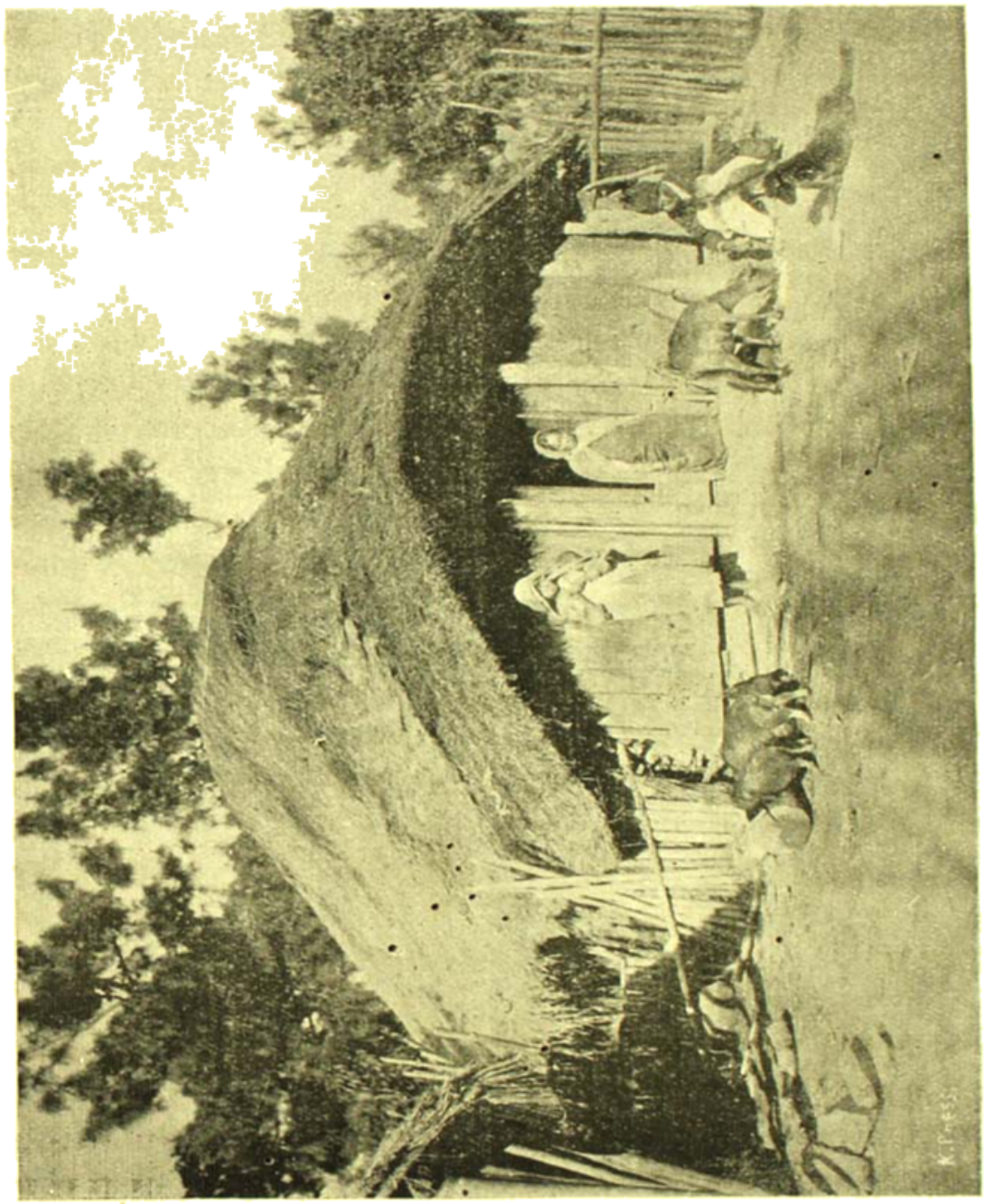

খাসিয়া রমণী।

নারী সর্ব্ব প্রথমে খাসিয়াদিগকে খনিজ পদার্থ হইতে লৌহ নিষ্কাশন ও লৌহাস্ত্র নির্ম্মাণ প্রণালী শিক্ষা দিয়া খাসিয়া পাহাড়ে লৌহের কারখানা বসাইয়া ছিলেন।

এস্কাইলাস, ইউরিপিডিস্ প্রভৃতি গ্রীক-মনস্বীগণের রচনায় অনুপ্রাণিত ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্টন তাঁহার Samson Agonistes গ্রন্থে দেলিলার চিত্রে নারীত্বকে পশুত্বের সমশ্রেণীভুক্ত করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। কিন্তু খাসিয়া সমাজে দেলিলার অনুরূপ আর একটী নারীর নাম কিরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হয় তাহা উল্লেখ যোগ্য। উপাখ্যানটী এইরূপ :—"মলিনিয়াং পরিবারের কিলং রাজা খুব সাহসী ও ধর্ষ ব্যক্তি ছিলেন; তিনি সমস্ত সিন্তেং ও সিলং প্রদেশ জয় করিয়া আপন মন্ত্রর রাজ্যের বিস্তৃতি সাধনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। যুদ্ধে যাইবার সময় সৈন্যসামন্তের তাঁহার বড় একটা প্রয়োজন হইত না। যুদ্ধে তিনি অনেকবার পরাস্ত ও নিহত হইতেন; কিন্তু পর দিবসেই আবার জীবন লাভ করিয়া শত্রুসৈন্যকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেন। তাঁহার হস্তপদ কর্ত্তন করিয়া গিরি গহ্বরে ফেলিয়া দিলেও দৈব-শক্তিতে তাঁহার পুনর্জ্জীবন লাভ হইত। সিন্তেং রাজা এহেন শত্রুকে দ্বারদেশে উপস্থিত দেখিয়া ভয়বিহ্বলিত হইয়া পড়েন। পরে একজন রূপসী নারী কিলং রাজার উপর প্রেমের অধিকার স্থাপন করিয়া, অশ্রুদেকে রাজহৃদয় দ্রবীভূত করিয়া সন্ধান পাইলেন যে কিলং রাজার প্রাণশক্তি তদীয় অস্ত্রের ভিতরে নিহিত ছিল। রাজা প্রত্যহ স্নান করিতেন, এবং অস্ত্রগুলি বাহির করিয়া ধুইয়া আবার উদরে পুরিয়া রাখিতেন। নিত্যধারী হইয়া তিনি যতদিন অস্ত্রধৌত করিবেন, ততদিন তাঁহার মৃত্যু নাই! সিন্তেংরাজ এই গূঢ় তথ্য অবগত হইয়া আর একদিন স্নানের সময় কিলং রাজাকে আক্রমণপূর্ব্বক তাহার অস্ত্রগুলি সংগ্রহ করতঃ চিরদিনের জন্য তাঁহাকে হত্যা করেন।" কিলং রাজার অস্ত্রের ন্যায় হিন্দু স্ত্রীলোকের কেশে সমস্ত শক্তি নিহিত ছিল। দেলিলা আপন স্বামীকে বিপদগ্রস্ত করিয়া কবির লেখনী মুখে "Hyena" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।—পরন্তু খাসিয়া রমণী দেশের শত্রুকে নিপাত করিতে গিয়া আপনার রূপ, যৌবন ও সতীর সতীত্বকে বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিতা হন নাই—এই বলিয়া লোকমুখে আজিও তাঁহার গুণগান চলিতেছে। দেলিলা স্বামীদ্রোহী রমণী, কিন্তু কিলংরাজদ্রোহী খাসিয়া নারী দেশোদ্ধারিণী!! নারীর শক্তিতে সম্পন্ন এই দেশোদ্ধার ব্যাপারকে মিল্টন হইতে খাসিয়ারা কিরূপ ভিন্ন চক্ষে দেখিয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য।

কা-লিকাই আর একজন নারী, তিনি আপন সন্তানের শোকে উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হইতে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন। আজিও তাঁহার পতন স্থানে "নো-লি-লিকাই" নামক জলপ্রপাত মাতৃহৃদয়ের সেই শোকগাথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া গিরিগহ্বরে মিলিয়া যাইতেছে।

এইরূপ নারী জাতির উপাখ্যানের সহিত খাসিয়াদিগের মাতৃস্নেহ, দেশপ্রেম, নগরপত্তন, শিল্পচর্চ্চা, অস্ত্রনির্ম্মাণ প্রভৃতি জাতীয় সাধনার প্রথম ইতিহাস জড়িত রহিয়াছে। এই জাতির ভিতরে নারীর বর্ত্তমান অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, আর্য্যজাতি যেরূপ পিতৃশাসিত সাধনায় বলীয়ান্ হইয়াছে, এই পার্ব্বত্য অনার্য্যজাতি সেইরূপ মাতৃ-শাসিত সাধনায় আপন সমাজ আজিও

পরিপুষ্ট করিয়া চলিতেছে। খাসিয়া জাতিরা কম প্রাপ্ত হইয়াছিল। নিজ খাসিয়া পাহাড়ে
হিন্দুধর্ম্মের গৌরবোজ্জ্বল আলোক সর্ব্বাপেক্ষা এক মহাদেবের মন্দির ভিন্ন হিন্দুর বিশেষ

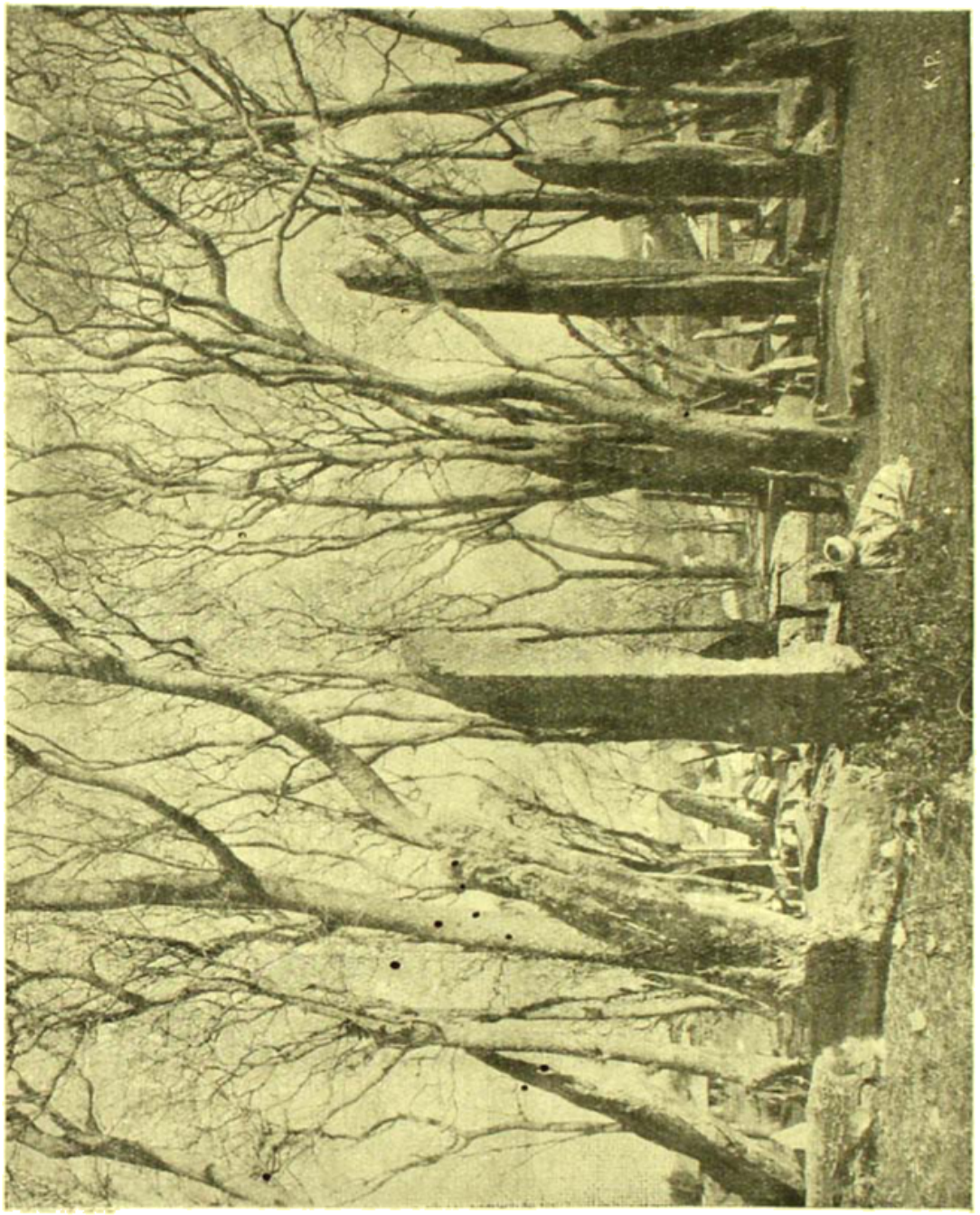

কোন দেবস্থান নাই। আধুনিক যুগে বৎসরের অন্ত বৈকাবর্ষ লোকপ্রিয় হইয়া
এক জন শ্রীহট্টবাসী বৈষ্ণবের চেষ্টায় কয়েক উঠিয়াছিল বটে, তবে তাহার স্থায়ী ফল

সমাজের উপর প্রতিফলিত হয় নাই। এই সকল কারণে নারীর প্রভুত্ব খাসিয়া পাহাড়ে অনেকটা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

পিতৃগৃহেই খাসিয়া কন্যার বিবাহ হয়। স্ত্রী কখনও স্বামীর গৃহে গমন করে না। পিতা সন্তানের জন্মদাতা ও অন্নদাতা, কিন্তু মাতুল স্বয়ং রক্ষয়িতা, জীবন মরণের প্রশ্ন উঠিলে মাতুলই একমাত্র আশ্রয়। মাতামহীই গৃহের কর্ত্রী। নারী এক সময়ে একাধিক বিবাহ করিতে পারেন না, কারণ দেবতার আশীর্ব্বাদ

কুলপবিত্রতা রক্ষা করা নারীর একান্ত কর্ত্তব্য। তবে স্বামীর সহিত বিবাহবন্ধন প্রকাশ্যভাবে ছিন্ন করিয়া তিনি পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারেন। বিবাহের পূর্ব্বে অর্জ্জিত পুরুষের বিত্তে মাতার অধিকার ও বিবাহের পরে পুরুষ যে ধন অর্জ্জন করেন, তাহাতে স্ত্রী ও কনিষ্ঠা কন্যারই শ্রেষ্ঠ অধিকার; পুত্রেরা সামান্য অংশমাত্র প্রাপ্ত হয়। পুরুষ কখনও স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারেন না। স্ত্রীলোকের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠা কন্যা, অভাবে কনিষ্ঠা দৌহিত্রী, তদভাবে ভগিনীর কনিষ্ঠা কন্যা, তদভাবে মাতৃস্বসার কনিষ্ঠা কন্যা ইত্যাদি প্রকারে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়। যদি নারীকুলে কেহ না থাকে তবে কনিষ্ঠপুত্র সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে। পুরুষ কেহ স্বার্জ্জিত সম্পত্তি অর্জ্জন করিলে, পত্নী পুনর্ব্বিবাহিতা না হইলে সেই সম্পত্তির অর্দ্ধেক প্রাপ্ত হন, অপরার্দ্ধে মাতার ও মাতার নারী-কুটুম্বের অধিকার জন্মে। কনিষ্ঠা কন্যা ধর্ম্মানুষ্ঠানের ও কুলদেবতার তৃপ্তিসাধনের একমাত্র অধিকারিণী। জাপানীদিগের "সিন্তো" ধর্ম্মের মত পূর্ব্ব পুরুষের উপাসনা ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। "কা-সি সিনসার"—আদ্যাশক্তি সর্ব্বপ্রধান দেবতা; কিন্তু মানবী লোকমাতামহী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মানের পাত্রী। ধর্ম্মকর্ম্মে পুরোহিতের অধিকার আছে বটে কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহাকে কা-সো ব্রি উপাধিধারিণী নারীর সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। বস্তুতঃ, লিংদো, সো ব্রির প্রতিনিধি মাত্র। সো ব্রি পূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া দেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশে পুরুষ লিংদো পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। নারী-শাসনের পূর্ণ প্রভাবের সময় পূজা পার্ব্বণে লিংদোর স্থান ছিল না। লোংক্রেম রাজ্যে এখনও লিংদোর প্রাধান্য নাই ধনাধিপত্তি সীমেরও আধিপত্য নাই। মধ্যযুগের রোমীয় পোপের মত ঐহিক ও পারত্রিক উভয় অধিকার দখল করিয়া নারী পুরোহিত বিরাজিত আছেন। তবে রাজকার্য্য পরিচালনার সুবিধার জন্য তাহার আত্মীয়স্বজনের ভিতরে কাহাকে ও প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া 'সীম' উপাধি দিয়া থাকেন। মৃত্যুর পরে মৃত ব্যক্তির অস্থি মাতৃকুলের সমাধিতেই প্রোথিত হয়। এবং প্রত্যেক সমাধিতেই কুলমাতার নামে কেন্দ্র স্থলে এক খণ্ড প্রস্তর স্থাপিত হয়। পুরুষের নামীয় কোনও প্রস্তর এই কেন্দ্রফলক হইতে উচ্চতর বা বৃহত্তর হইতে পারে না।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, নারীর প্রভাব ও প্রতাপ প্রাচীন সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ধনাধিকারিণী ও ধর্ম্মানুষ্ঠানকারিণী নারী, কুললক্ষ্মী ও গৃহ দেবতারূপিণী নারী শ্মশানক্ষেত্রে পর্য্যন্ত

পুরুষের উপরে সগর্ব্বে অধিকার ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত থাকিতেন। আর্য্যজাতির আগমনের পূর্ব্বে নারীর শক্তিতেই পূর্ব্বভারত শাসিত হইত। শক্তিশালিনী অনার্য্য কুল-দেবতাগণ কি আর্য্যসংস্রবে সংস্কৃত হইয়া বাঙ্গালীর গৃহ কোণে মঙ্গলময়ী গৃহদেবতারূপে আজিও নারীসমূহের বেদবহির্ভূত বহুতর ব্রত পার্ব্বণের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বিরাজ করিতেছেন?

সে যাহা হৌক্, আমরা ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, পালিয়া দেশে পূর্ব্বভাবে এবং মণিপুরী কাছাড়ী, নাগা প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিশেষভাবে ও খ্রীষ্টো রায় নামক অঙ্গদেশ জাতির ভিতরে ক্ষীণভাবে নারীর প্রভুত্ব এখনও ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই নারী প্রাধান্য সম্বন্ধে বাঙ্গালার লোকতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরঞ্জনীরঞ্জন দেব।

বঙ্গাব্দ এবং কোলম্ কলিচুরি ও লৌকিক সম্বৎ।

বিগত ভাদ্র সংখ্যার "ভারতীতে" শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামী মহাশয় "ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ" নামক প্রবন্ধে কয়েকটি ঐতিহাসিক বিষয়ের উল্লেখ করিয়া—তৎ-সমুদয়ের রহস্যোদ্ঘাটন জন্য অনুসন্ধিৎসু হইয়া কয়েকটী প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধের একস্থানে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশের বৎসর গণনা করিবার বিভিন্ন প্রণালীর উল্লেখ পূর্ব্বক ভারতের প্রচলিত কয়েকটী সম্বতের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি একটী হিন্দি ডাকের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন "কোলম্, কলিচুরি ও লৌকিক সম্বৎ কি? আমাদের পঞ্জিকার প্রথম পৃষ্ঠায় শোভিত আমাদের বঙ্গাব্দই বা কি? কোন্ নরপতি বা কোন্ ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটন হইতে এ বর্ষগণনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে? অথচ সন্ বঙ্গাব্দ এবং ফসলী তিনটী বর্ষ গণনার অতীতাব্দ এক"। এ প্রবন্ধে প্রথমে বঙ্গাব্দ সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

বর্ত্তমানে বঙ্গাব্দ, সন্ এবং ফসলী ১৩২৮, ইংরাজী ১৯২১ এবং ১৩৪৯ হিজরী চলিতেছে। ইংরাজী এবং বাঙ্গালা বৎসর সৌর মাস হিসাবে এবং হিজরী চন্দ্রমাস হিসাবে গণনা করা হইয়া থাকে। ইংরাজি ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩২৮ বাদ দিলে ৫৯৩ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ বৎসরে কোন বিখ্যাত ঘটনা ঘটে নাই; অন্ততঃ প্রচলিত ইতিহাস সমূহে সেরূপ কোন ঘটনার উল্লেখ নাই এবং বঙ্গাব্দ যে ঐ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ তাহা কোন ইতিহাসেই লিখিত নাই। এই সময়ের কিছু কাল পরেই হর্ষ সম্বতের প্রচলন হইয়াছিল একথা জানিতে পারা যায়। কিন্তু এই হর্ষ সম্বৎ সর্ব্ববাদী সম্মতভাবে ৬০৬ খৃষ্টাব্দে স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং এই হর্ষ সম্বৎ বঙ্গাব্দ নহে। তদ্ভিন্ন খৃষ্টীয় ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দীতে যে যে অব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল, অধিকাংশ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে তাহাদের উল্লেখ আছে—কিন্তু এই সময়ে বঙ্গাব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন

ইতিহাসেই কোনরূপ বিবরণের উল্লেখ নাই। সুতরাং খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে অথবা ৫৯৩ খৃষ্টাব্দে যে বঙ্গাব্দের প্রচলন হয় নাই তাহা এক প্রকার নিশ্চিত।

বঙ্গাব্দের সহিত হিজরীর তুলনা করিলে দৃষ্ট হয় যে এক্ষণে উভয় অব্দের মধ্যে একাদশ বৎসরের পার্থক্য। মুসলমানেরা তাঁহাদের বৎসর চান্দ্র মাস হিসাবে গণনা করিয়া থাকেন। ঐ চান্দ্র বৎসর হিসাবে গণিত সময় ৩০ বৎসরের এক একটী চক্রে বা যুগে বিভক্ত। এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ১৯ বৎসর ৩৫৪ দিন, এবং অবশিষ্ট একাদশ বৎসর, ৩৫৫ দিন হিসাবে গৃহীত হয়। সুতরাং মুসলমানদিগের চান্দ্র বৎসর গড়ে ৩৫৪ দিন, ৮ ঘণ্টা, ৪৮ মিনিটে গণনা করা হইয়া থাকে। আমাদিগের সৌর বৎসর ৩৬৫ দিন, ৫ ঘণ্টা ৪৫ সেকেণ্ড হিসাবে গণনা করা হয়; সুতরাং সৌর এবং চান্দ্র বৎসরে পার্থক্য ন্যূনাধিক ১০ দিন ২১½ ঘণ্টা। এই হিসাবে গণনা করিলে দেখা যাইবে যে ন্যূনাধিক ৩৫৪ সৌর বৎসরে হিজরী এবং বঙ্গাব্দে একাদশ বৎসরের প্রভেদ হইবে। সুতরাং অনুমান হয় যে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে হিজরী এবং বঙ্গাব্দের বৎসর এক ছিল।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট আকবর সাহ ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার মতে তাঁহার রাজত্বকাল হইতেই বঙ্গাব্দ ও হিজরী সম্বন্ধে পার্থক্য হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং আকবরের সময় হইতে হিজরী, সৌরমাস হিসাবে গণনা হইয়া বঙ্গাব্দে পরিণত হইয়াছে, এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক নহে।

আকবর ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎকালে ৯৬৩ হিজরী চলিতেছিল। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এই ৯৬৩ হিজরীর সহিত সৌর বৎসর যোগ করিলে বঙ্গাব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৫৫ সৌর বৎসর গত হইয়াছে। ইহার সহিত ৯৬৩ হিজরী যোগ করিলে বঙ্গাব্দ ১৩১৮ হইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক উপরোল্লিখিত যুক্তির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা। বিখ্যাত "এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা" নামক গ্রন্থে (Encyclopadia Britannica. 9th Edition Vol Indian Chronolgy) "ভারতবর্ষের সালের বিবরণ" নামক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ আছে।—

"The Bengalee era also supposed to be derived from the Hegira; but the era is measured by solor time and therefore differs entirely from the Mahomedan year, which is purely lunar. The sidereal year exceeds the lunar year by 10 days hours; consequently, by reckoning backwards, it will be found that the dates of Bengalee era and Hegira coincided about the middle of the 16th century. History is silent on the subject; but it seems probable that though the Hegira was partially

adopted in India, the Hindus pertinaciously resisted all attempts to disturb their ancient methods of reckoning the subdivisions of the year."

উক্ত গ্রন্থের ঐ প্রবন্ধেই ফসলী সন সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"The Fuslee era from the near coincidence of its dates with those of Hegira, seems to have been imposed on the natives of India by their Mahomedan conquerors. It is principally used in revenue transactions. There are several eras of the same name but the most common is that which is reckoned from the year 590 A. D." অর্থাৎ ফসলী এবং বঙ্গাব্দ মুসলমান সম্রাটগণ কর্ত্তৃক ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয় এবং যদিও ভারতে হিজরী সন্বৎ আংশিকরূপে গৃহীত হইয়াছিল তথাপি হিন্দুগণ তাঁহাদের পূর্ব্ব প্রথানুসারে বৎসর গণনা পরিত্যাগ করেন নাই। যদিও এ মন্তব্যের শেষাংশের সহিত অর্থাৎ ফসলী সন ৫৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ এরূপ সিদ্ধান্তের সহিত, আমরা একমত নহি, তথাপি এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার এযুক্তি আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূল।

"আইনী আকবরী" নামক মূল পারস্য গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে আকবরসাহ এক নূতন শকের প্রচলন করেন এবং ঐ শক তাঁহার সিংহাসনাধিরোহণ দিন হইতে গণনা হইয়া থাকে। "বসুমতী" কর্ত্তৃক প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ প্রণীত "আইনি আকবরী" অনুবাদ গ্রন্থের ৭৩পৃষ্ঠায় "হিন্দুদিগের সালের বিবরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে এ কথার উল্লেখ আছে। যদি ঐ বিবরণের অর্থ এরূপ হয় যে, আকবর সাহের রাজত্বকাল হইতে ঐ শকের গণনার আরম্ভ, তাহা হইতে আমরা এক্ষণে ইতিহাসে ৩৫৯ আকবর শকের উল্লেখ দেখিতে পাইতাম। কিন্তু কোন ইতিহাসেই এরূপ কোন শকের উল্লেখ নাই এবং ভারতের কুত্রাপি এরূপ শকের প্রচলন কথা—শুনিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, আকবরসাহ, তাঁহার সিংহাসনাধিরোহণ দিন হইতে হিজরী, শক সৌর বৎসর হিসাবে গণনা করাতে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ, তিনি এক নূতন শক প্রচলন করিতেছেন, ঐরূপ মনে করিয়াছিলেন।

প্রবন্ধের শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত "ভারতের ইতিহাসে" বঙ্গাব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। ঐ পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন "বাঙ্গলা, ফসলী ও বিলায়তী সন নামে যে কয়েকটী অব্দ প্রচলিত আছে, আকবরের রাজত্বে তৎসমুদয়ের উৎপত্তি হয়। আকবর আপনার আধিপত্য সময়ে হিজরীর চান্দ্র বৎসরের পরিবর্ত্তে সৌর বৎসর গণনার নিয়ম করেন।"

উপরোল্লিখিত প্রমাণাদি হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, আকবরের সিংহাসনাধিরোহণ কাল হইতে, অর্থাৎ ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ এবং ৯৬৩ হিজরী হইতে, হিজরী শক, চান্দ্র বৎসরের পরিবর্ত্তে সৌর বৎসর হিসাবে গণনা হইয়া, এই বঙ্গাব্দের সৃষ্টি হইয়াছে।

ফস্‌লী সন্‌ও এই সময় হইতে আরম্ভ এবং এ সনের গণনাও সৌর বৎসর হিসাবে করা হইয়া থাকে। ইহা প্রধানতঃ রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যাদি সমূহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসে বঙ্গাব্দের এবং তৎপরবর্ত্তী ভাদ্র মাসে ফস্‌লী সনের গণনা আরম্ভ হয়। মাদ্রাজ প্রদেশে ফস্‌লী বৎসর ১২ই জুলাই তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে।

এক্ষণে "কোলম্" কলিচুরি ও লৌকিক সম্বৎ কি? এ প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

কোলম্ সম্বৎ প্রফেসর কিল্‌হর্ণের মতে (Prof. Keilhorn) ৮২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সে সময়ে পালবংশীয় নরপতিগণের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। সুতরাং পালবংশীয় রাজগণের সময় কোলম্ সম্বৎ আরম্ভ হইয়াছে—এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। (Imperial Gazetteer of India vol. II. page 64.)

"কলিচুরি" বা "কলাচুরি" সম্বৎ হৈহয় বংশীয় চেদীরাজগণের সময় হইতে গণনা করা হয়। এই চেদীবংশীয় রাজগণ আধুনিক মধ্যপ্রদেশের চিফ কমিশনরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদিগের রাজত্ব কালে ২৪৯ বা ২৫০ খৃষ্টাব্দে এই "কলাচুরি" বা "কলিচুরি" সম্বতের উৎপত্তি হয়। ভিনসেণ্ট্ স্মিথ্ প্রণীত প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে, এবং ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার নামক গ্রন্থে (Vincent Smith's Early History of India, Imperial Gazetteer of India) এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে।

স্মিথ্ সাহেবের উক্ত ইতিহাসে "লৌকিক সম্বতের" উল্লেখ আছে; তবে তিনি এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। উক্ত ইতিহাসে পাঠে অনুমান হয় যে "লৌকিক সম্বৎ" খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আরম্ভ হইয়াছিল। লৌকিক সম্বৎ বোধ হয় শালি বাহনের সম্বৎ হইবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই সম্বৎ তাঁহার রাজত্বকালে ৭৮ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামী মহাশয় তাঁহার হিন্দি ডাকের ছড়া দিয়াছেন,—

সম্বৎ কোই এক ভাতিকো জানো।
ডাক কহে সব গুনো সেয়ানো॥
কলি, কোলম্, কলিচুরি সিং।
লৌকিক, বিক্রম্ লছিমন্ সিং॥
বুদ্ধ নির্ব্বাণ, মৌর্য্যশক ভাই।
চালুক, বিক্রম গুপ্ত—গণাই॥
গাঙ্গে হর্ষনিবারহু জানত।
পহর হিজ্জত লছিমন মানত॥

শেষ দুই ছত্রের অর্থ করিয়াছেন যে "গাঙ্গ সম্বৎ হর্ষনিবার লোকদের মধ্যে জানিত অর্থাৎ প্রচলিত" এবং তজ্জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "যদি এ ব্যাখ্যা সমীচীন হয় তবে হর্ষনিবার দেশ কোথা এবং কাহাকে বলে"? আমাদের মতে "গাঙ্গে হর্ষ নিবারহু জানত" এ ছত্রের অর্থ—"গঙ্গাদেশে হর্ষ সম্বৎ প্রচলিত ছিল"। তাহা হইলেই ঐ ছত্রের অর্থ সুস্পষ্ট হয়। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খৃষ্টাব্দে এক সম্বৎ প্রচলন করেন; এই সম্বৎ হর্ষসম্বৎ নামে বিখ্যাত। হর্ষবর্দ্ধন গঙ্গা নদীর মোহনার উভয় পার্শ্বস্থিত প্রদেশ সমূহের অধীশ্বর ছিলেন; তাঁহার রাজ্য হিমালয় হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং গঙ্গাদেশে অর্থাৎ গঙ্গার উভয়

পার্শ্বস্থ প্রদেশ সমূহে, হর্ষসম্বৎ প্রচলিত থাকা একান্ত সম্ভব। হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্য সম্বন্ধে ভিন্সেণ্ট স্মিথের ইতিহাসে—লিখিত আছে —"In the latter years of his reign, the sway of Harsha over the whole of the basin of the Ganges (including Nepal) was undisputed." সুতরাং আশা করি হিন্দি শ্লোকটীর ঐ ছত্রের উক্তরূপ ব্যাখ্যা নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে না। শেষ ছত্রের "পয়ং ত্রিহুত লছিমন মানত" "ত্রিহুত দেশে লক্ষণ সম্বৎ প্রচলিত ছিল এরূপ অর্থ সম্পূর্ণ সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। তাহে উল্লিখিত অপরাপর অঙ্কগুলি অপেক্ষাকৃত সুপরিচিত, সুতরাং সংসমুদয়ের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইল না।

শ্রীতুলসিদাস চক্রবর্ত্তী।

জাপানের ধর্ম্ম।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

জাপানের শিন্তো এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, এবার খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিব।

ভারতের গর্ত্তুগীজ সহর গোয়াতে কান-শিরো হাচোমি নামক জনৈক জাপানী বাস করিতেন। তিনি পর্ত্তুগিজদিগের ভিতর আঞ্জিরো নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশানুযায়ী ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ পাদরী জেভিয়ার এবং কাস্পার জাপানে গিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কিউশিউ দ্বীপের বড় বড় জায়গীরদারগণ এবং তাঁহাদের অনুচরগণ অতি অল্পকালের মধ্যেই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। দেখিতে দেখিতে ৪০ বৎসরের মধ্যে উহাদের প্রযত্নে ২৫০টি গির্জ্জা স্থাপিত হয় এবং তিন লক্ষ লোক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে। নূতন ধর্ম্মে মাতোয়ারা হইয়া উহারা জোরজুলুমে অন্যান্য সকলকে টানিতে থাকে। শান্তিপ্রিয় ব্যক্তির ভিতর উৎপাত আরম্ভ হয় এবং শাসন বিভাগীয় কার্য্যে অযথা হস্তক্ষেপ করায় উহাদের ভিতর কোনরূপ রাজনৈতিক মতলব লুক্কায়িত আছে বলিয়া লোকে মনে সন্দেহ করে। এই সময়ে ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কোন কারণে জাপানের ওলন্দাজ বণিকদের সহিত পর্ত্তুগিজদের মনোমালিন্য ঘটে। ওলন্দাজগণ সুযোগ বুঝিয়া ১৬১১ খৃষ্টাব্দে তাৎকালিক প্রধান শাসনকর্ত্তা তোকুগাওয়া সোগুণকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেয় যে খৃষ্টানগণ কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতা লোপ করিবার জন্য এক বিপ্লব উপস্থিত করিবার যোগাড় করিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ কালবিলম্ব না করিয়া পাদরীগুলিকে জাপান হইতে তাড়াইয়া দেন, এবং প্রতিপত্তিশালী খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী জায়গীর সর্দ্দারদের কাহাকেও নির্ব্বাসনে আবার কাহাকেও বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে কেহ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত

হইলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে বলিয়া আইন প্রচার করা হয়। যেরূপ পরশুরাম একবিংশ বার ভারত নিঃক্ষত্রিয় করিবার সময় অনেক ক্ষত্রিয় ভিন্ন ভিন্ন নাম পরিগ্রহণপূর্ব্বক ভারতের স্থানে স্থানে লুক্কায়িত ছিলেন সেইরূপ জাপানেও এই সময় অনেক খৃষ্টানের অন্তরে অন্তরে খ্রীষ্টধর্ম্মে আস্থা রহিলেও বাহিরে উহারা আপনাদিগকে শিন্তোধর্ম্মাবলম্বী, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিত। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে সমবেত পঞ্চত্রিংশ সহস্র খ্রীষ্টান গোপনে গোপনে মন্ত্রণা করিয়া রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করে। তখন রাজশক্তি শিমাবারা নামক স্থানে উহাদের সম্মুখীন হয়। এবং একে একে সমস্ত খৃষ্টানকে নিহত করে। এইরূপ নির্য্যাতন এবং নিষ্পেষণের পর খৃষ্টধর্ম্ম জাপান ক্ষেত্র হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়। ১৮৭১ খ্রীঃ পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই শত বৎসর কাল খ্রীষ্টধর্ম্মের স্মৃতিতে লোকের মনে ভীতি সঞ্চার হইত।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে দুই জন ক্যাথলিক পাদরী পুনরায় লুচু দ্বীপে পদার্পণ করেন। কিন্তু চারি বৎসর পর তথা হইতে দুঃখের বিতাড়িত হয়েন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত সন্ধি হওয়ার পরে পুনরায় কতিপয় ক্যাথলিক পাদরী লুচু, নাগাসাকি, কোবে এবং ইয়োকোহামায় আসিয়া ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তোকিও সহরের ৫মুকিজি অঞ্চলে উহাদের প্রথম গির্জ্জা স্থাপিত হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে দেশী ও বিদেশী রোমানক্যাথলিক মিশনারি যথাক্রমে ২৬৮ এবং ২০৬ জন ছিলেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কমোডোর পেরি বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন মানসে আমেরিকা হইতে জাপানে আইসেন। রেভারেণ্ড গোহার নামক জনৈক খ্রীষ্টান পাদরী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সাম্বারো নামক জনৈক জাপানী খ্রীষ্টানের সাহায্যে তিনি প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে প্রয়াস পান। আমেরিকানদের ভিতর সাম্বারো সাম্বুয়েল পাটি নামে পরিচিত ছিলেন। উঁহাদের সংস্পর্শে যাহারা আসিত তাহাদেরই ভিতর উঁহারা ধর্ম্মবীজ বপনে প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা এবং জাপানের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হওয়ার পর ব্রাউন, হেপ বারণ, বার্ব্বেক, এবং উইলিয়ামস নামক চারি জন বিখ্যাত পাদরী আমেরিকা হইতে জাপানে প্রেরিত হন। ক্রমে ডাক্তার গ্রিন এবং ডেভিস উহাদের সহিত যোগ দিয়া ওসাকা, কোবে, নাগাসাকি এবং কানাগাওয়ার (ইয়োকোহামা) আড্ডা ফেলেন। ক্রমেই মিশনারি সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা এবং ইংলণ্ড হইতে জাপানে ১৫ জন স্ত্রী ও পুরুষ মিশনারি প্রেরিত হয়। এইরূপে দলে দলে পাদরীগণ আসিয়া যথাসাধ্য প্রয়াস পাইলেও এত কাল পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ বিশেষ কোন ফল দেখা যায় নাই। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ এবং আমেরিকার ১৮টি মিশনবোর্ডের ৬৯ জন পুরুষ এবং ১৩৫জন স্ত্রীলোক মিশনারি জাপানে প্রচার কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রোটেষ্টাণ্ট মিশনারি স্ত্রীপুরুষ মোট ৮৮২ জন ছিলেন; এতদ্ব্যতীত দেশী প্রচারক ৬০২ জন।

১৮৫৫খৃষ্টাব্দে মাহোন্ নামক জনৈক গ্রীক মিশনারি হাকোদাতে সহরস্থ রুষিয়ান কন্সালের বাড়ীতে অবস্থান করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আইভান নামক জনৈক ২৪ বৎসর বয়স্ক যুবক ঐ কার্য্যের ভার লইয়া হাকোদাতেতে আগমন করেন। তিনি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্থানপরিবর্ত্তন করিয়া তোকিও সহরে গমন করেন। তথায় তাঁহার গির্জ্জা রুষিয়ান চার্চ্চ নামে বিদিত। দেশী ও বিদেশী পাদরী যথাক্রমে ১৫১ এবং একজন। এই রুষিয়ান গির্জ্জা জাপানের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গির্জ্জা। ইহার অভ্রভেদী চূড়া বিশাল তোকিও সহরের যে কোন প্রান্ত হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। সুবর্ণ-খচিত অভ্যন্তর প্রদেশ বৈদেশিক পর্য্যটকের মনকেও আকর্ষণ না করিয়া পারে না।

খৃষ্টান মিশনারিগণ কত যে হাসপাতাল অনাথাশ্রম, স্কুল, সমিতি, প্রভৃতি স্থাপন করিয়া সর্ব্বসাধারণের উপকার সাধন করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আজও পর্য্যন্ত শতকরা একজনকেও খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। প্রায় ৪ কোটি লোকের ভিতর মিশনারিগণের চেষ্টাতে যত লোক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহার এক সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নব্য জাপান দিন দিন পুরাতন খোলস পরিবর্ত্তন করিয়া বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্যজাতির অনুবর্ত্তী হইলেও ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন বলিতে হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রে জড়বিজ্ঞানের অনুশীলনে উহারা এতই ব্যতিব্যস্ত যে ধর্ম্মবিষয়ে উহাদের চিন্তা করিবার

	সংখ্যা প্রোটেষ্টাণ্ট	রোমান ক্যাথলিক	রুষিয়ান চার্চ্চ
গির্জ্জা			
মিশনারি (স্ত্রী, পুরুষ)			
জাপানী মিশনারি			
মোট খ্রীষ্টান			
খ্রীষ্টান স্কুল			
শিক্ষক ও ছাত্র		৬০০৬	
ওয়াই. এম্. সি. এ.			
অনাথাশ্রম			—
ডাক্তারখানা	২০		—
চিকিৎসিত রোগী	১২১৮৪		—

অবসর যেন একেবারেই নাই। ধর্ম্মস্রোত নিতান্তই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। দৈনিক জীবনে উহাদের ভিতর প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রক্রিয়াই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কত শত শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, ধর্ম্ম জগতে কত যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে; কখন প্রলোভনে কখন বা শাণিত অসির ভীতি প্রদর্শনে কত দেশের ধর্ম্মস্রোত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইয়াছে কিন্তু এ কর্ম্মযুগে জড় বিজ্ঞান ধর্ম্মের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেও আমাদের ভারতের পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্মই বীরজাতির অধিবাসস্থল জাপান ক্ষেত্রে রাজত্ব করিতেছে। বৌদ্ধধর্ম্মই জাপানীদের জাতীয় শক্তির মূলে। এই সম্বলের উপর নির্ভর করিয়াই আজ তাহারা ধরণীতলে এক প্রথম শ্রেণীর জাতি বলিয়া গণ্য। দেশের গৌরব রক্ষার জন্য কি ভাবেই তাহাদিগকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে দেখিয়াছি! অথচ সেই বিসর্জ্জনে প্রিয় পরিজনের অভাব জনিত ক্লেশে কাহাকে দিনেকের তরেও শোকাভিভূত হইতে দেখি নাই। ইহা কি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রক্রিয়া নহে? আজ আমরা ভারতবাসী মায়ামোহে বিজড়িত হইয়া আমাদের দেশীয় সেই পবিত্র ধর্ম্মভাবকে হৃদয়ক্ষেত্র হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিয়াছি; আত্মবিসর্জ্জন দূরের কথা স্বার্থের লেশমাত্র থাকিলে সেই সামান্য স্বার্থটুকুর বিসর্জ্জনেও যেন মস্তকে বজ্রাঘাত হয়। তা না হইলে একদিকে আমরা কোটি কোটি বুভুক্ষার ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকি আর অপর দিকে অনশনে লক্ষ লক্ষ ভ্রাতা ভগিনীর প্রাণ বিয়োগ হইতে থাকে? তা না হইলে ভ্রাতা ভগিনীর সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে অজ্ঞানান্ধকারে ডুবাইয়া রাখিতে পারি? আর তা না হইলে জাতীয়ত্ব ভুলিয়া সাম্প্রদায়িক অকিঞ্চিৎকর স্বার্থের জন্য হিন্দু মুসলমানে ঠেলাঠেলি হইতে পারে আর একই ভারতমাতার সন্তানকে ঘৃণিত অস্পৃশ্য বলিয়া পায় ঠেলিতে পারি? আমরা জাপানীদিগকে আমাদের ধর্ম্মের জোরে বড় হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি, এখন জাপানীদিগের আদর্শ লইয়া এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের সেই স্বার্থত্যাগ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভারতবাসীকে বড় হইতে হইবে।

আজ জাপানীদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কয়েকটি দেশাচারের উল্লেখ করিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। জাপানে পর্ব্বে পর্ব্বে মন্দিরে মন্দিরে উপাসনা ও উৎসবাদি হইয়া থাকে। লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়; উপাসকের চেয়ে দর্শকের সংখ্যা অনেক বেশী। বৃদ্ধ বৃদ্ধা এবং তাঁহাদের পৌত্রী এবং দৌহিত্রীদিগকেই উপাসনায় যোগ দিতে বেশী দেখা যায়। স্থানে স্থানে কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্ম্মিত ধ্যানে উপবিষ্ট বৌদ্ধদেব মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। জাপানীদের নাসিকা চেপটা, প্রাচীন কাল হইতেই উচ্চ নাসিকার আকাঙ্ক্ষী হইয়া উহারা আপন নাসিকা বুদ্ধদেবের নাসিকার সহিত ঘর্ষণ করিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে নাসিকা উন্নত না হউক, বুদ্ধদেবের জন্ম ও মৃত্যুদিনে মন্দিরে বহুলোক সমাগম হইয়া থাকে।

শ্রাদ্ধাদি মন্দিরেই হইয়া থাকে। বৌদ্ধ, শিন্তো এবং খ্রীষ্টান তিন ধর্ম্মাবলম্বীদের শ্রাদ্ধ দেখিয়াছি। পুষ্প পল্লবে শবসজ্জা, ধূপধুনার

আহুতিদান, এবং বংশীনিনাদ প্রভৃতিতে ইহাদেরই মধ্যে অতি সামান্যই পার্থক্য। মন্দিরে মৃতব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া পিতা-মাতা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব, শিক্ষক ছাত্র প্রভৃতি শ্রাদ্ধ সময়ে সুন্দর কাগজে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত অভিনন্দন পঠনান্তর মৃতের অস্থি, ভস্মাবশেষ অথবা মৃতদেহ কফিনের সম্মুখে রাখিয়া থাকে।

স্ত্রীপুত্র, পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ শ্বেতবেশম বস্ত্র পরিহিত হইয়া মন্দিরে যান। অন্যান্য সকলে কালো পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া থাকে। জাপানে হয় মৃতদেহ নয় চিতাভস্ম গোরস্থানে প্রোথিত করা হয়। প্রত্যেক বংশেরই একটি করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্মৃতি রক্ষার স্থল আছে, সৎকারের পর তথায় বংশের যাবতীয় মৃত ব্যক্তির কিঞ্চিৎ অস্থি কিম্বা ভস্মাবশেষ রাখিয়া দেওয়া হয়। কখনও কখনও পরিবারের কোন বিখ্যাত ব্যক্তির স্মৃতিচিহ্ন পৃথক স্থলেও নির্দ্মিত হইয়া থাকে। শবদেহ অবস্থা এবং পদমর্য্যাদানুযায়ী প্রসেশনের (মিছিলের) সহিত সৎকারের জন্য লইয়া যাওয়া হয় এবং সৎকারস্থল হইতে পুনরায় প্রসেশন সহ কিঞ্চিৎ অস্থি কিম্বা ভস্মাবশেষ লইয়া মন্দিরে এবং স্মৃতিরক্ষণ স্থলে যাওয়া হয়। বন্ধুবান্ধব প্রসেশনের জন্য কেহ পাল্কীর কিম্বা অন্য কোন সুন্দর সুন্দর পক্ষীপূর্ণ পিঞ্জর, কেহ রাংবাদলায় নির্দ্মিত পদ্ম ফুলের গাছ, কেহ পামলায় বিচিত্র ফুলের গাছ পাঠাইয়া থাকে। প্রতি বংশের স্মৃতি চিহ্নের তলদেশে এক ছোট প্রকোষ্ঠ আছে; উহাতে অস্থি কিম্বা ভস্ম সযত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে। স্মৃতিচিহ্ন সাধারণতঃ ইষ্টক কিম্বা প্রস্তর নির্দ্মিত। অতি দরিদ্রবংশের স্মৃতি-স্থলের ভিত্তি ইষ্টকনির্দ্মিত হইলেও কাষ্ঠ ফলকে বংশবিবরণী লিখিত হইয়া থাকে। সহর এবং গ্রামের প্রান্তদেশেই গোরস্থান অবস্থিত। কোন কোন বিশেষ দিনে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ এবং বন্ধুগণ ভক্তি ও প্রীতি জানাইবার জন্য সুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া মৃত ব্যক্তির স্মৃতিস্থলে গিয়া অভিবাদন করিয়া আইসে। জেনারল কাউন্ট কোদামার মৃত্যুসময়ে আমি তোকিওতেই ছিলাম। তাঁহার শবদেহের সহিত যেরূপ মিছিল বাহির হইয়াছিল তৎপূর্ব্বে জাপানে কাহারও জন্য তেমন মিছিল বাহির হয় নাই। জেনারল কোদামার স্মৃতিস্থলে অনেককে নববর্ষদিনে নামের কার্ড রাখিয়া অভিবাদন করিয়া আসিতে দেখিয়াছি।—

প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসে মৃত সৈন্যদের বার্ষিক শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। এই শ্রাদ্ধ ব্যাপারকে হোকোন্সা বলে। স্বয়ং সম্রাট আরম্ভ সময়ে উপস্থিত থাকিয়া শ্রাদ্ধে যোগদান করেন। তিন দিবসে ঐ শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সমাধা হয়। এই উপলক্ষে তোকিও সহরের কুদান পার্কে মহাধুম দেখিতে পাওয়া যায়। কুদানের শিন্তো মন্দিরেই মৃত সৈন্যদের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। কুদানের বিস্তৃত ময়দানে ঐ তিন দিবসের জন্য অতি সমারোহে মেলা বসিয়া থাকে—কোথাও সারি সারি সার্কাসের দল, কোথাও থিয়েটারের দল, কোথাও নৃত্য গীত রংতামাসা, দোকান পসারী—দিন রাত সমভাবে চলিতে থাকে। রাত্রিতে বিজলী ও আতস বাজীর ছড়াছড়ি। আমাদের দেশে শ্রাদ্ধের দিনে মৃত ব্যক্তির স্মৃতিতে

আমরা অবসর হইয়া পড়ি আর উহারা আমোদ উৎসবে মাতোয়ারা হয়। সৈন্যগণ দেশের সেবায় নিয়োজিত থাকিয়া জীবন উৎসর্গ করে,—কাযেই বীরগণের শ্রাদ্ধে বীরজাতি শোকপ্রকাশ করিবে কেন?

সর্ব্বসাধারণ লোকে প্রতি বৎসর জুলাই মাসের ১৪ই ১৫ই এবং ১৬ই তারিখে পূর্ব্ব-পুরুষদের বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, এই পর্ব্বকে ওবোন পর্ব্ব বলে।

অশন, বসন, ভূষণের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। কত ইউরোপ ও আমেরিকার সাহেবমেম জাপানী পোষাক ও জাপানী গেতা, (খড়ম) ব্যবহার করিতেছে আবার পথের কুলি ভিক্ষুকও কোট, পেণ্টুলেন, হাট লাগাইয়া ফিরিতেছে। বিবাহে একধর্ম্ম আবশ্যক নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বামী এক ধর্ম্মাবলম্বী এবং স্ত্রী ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারে। ধর্ম্মগুরুকে সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে যে, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রীতিই উহাদের একমাত্র ধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্ম বজায় রাখিতে উহাদের অকরণীয় কিছুই নাই। শ্রীহেমনাথ সরকার।

ইন্দিরা।

১

আমার এ কবিতাতে নিত্য খোসরোজ;
নিত্য দেখা মহোৎসব, নিত্য হেথা ভোজ।
শুভ্রচিত্তা, প্রফুল্লতা,—রূপময়ী নারী—
এ যজ্ঞশালায় আসি বসে সারি সারি।
হাস, রঙ্গ, কলহাসি,—পুরুষ সুন্দর—
এই প্রেম-হর্ষ্ম্য-মাঝে রাজে নিরন্তর।
হেথায় পোলাও, লুচি, খাজার মচ্ছুরি,
নিত্য এই বাণী মহে বিতরে মাধুরী।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন আর পঞ্চাশ মিষ্টান্ন,
সুপক্ক ফলের রাশি, মেওয়া, পরমান্ন।
তার মধ্যে এক নব, অদ্ভুত সামগ্রী,
সর্ব্ব দ্রব্য হারাইয়া, জিনিয়াছে decree!
এ যেন রে দেবভোগ্য পারিজাত-পাপড়ি;
ক্ষীর-সাগরের যেন রসে ভরা বাটি!
সোণার সোরাহী-মাঝে সতত চঞ্চল,
সুধাতরা, সুধারসে সদা ঢল ঢল।
আঙ্গুর হারিয়া যেতে; হেরে যেতে মিহরি,
মধুরসে টস্ টসে, এ কোন্ সামগ্রী?

২

এমনি মধুর দ্রব্য, রসের ভাণ্ডার,
ভুবনে এমন আছু মাহিলুদ্দি আর।
যে খেয়েছে সে মজেছে;—রসনের সাথ
মিটে যায়, একি এর রসালো আস্বাদ।
আমার মানসী বধূ,—রসিকা রৌপদী,—
তাহারও রসনায় উছলিছে নদী।
আমি যে এমন বুড়া, হৃষ্কেশ ধবল,
আমারো কিন্তায়, হের, জুমাইছে জল।
শোন্ রে বর্দ্ধমানের রসময় খাজা,
শোন্ কৃষ্ণনগরের সরপুরি ভাজা,
তোরা বসি ঘরে যাস্—এ যে নিত্য ভাজা।
একি রে অমৃত দ্রব্য! অয়ি অপরূপে,
তোর কাণে এর নাম বলিব যে চুপে।
শোন্ শোন্, কাছে আয় মধীনা নাতিনী,
আমার প্রিয়তমার মধীনা সতিনী।
স্পর্শে মোর, তুই কেন উঠিস্ ডরাই?
এত মধু তোর এত মহীয়-বড়াই?
এক বর্ষীয়ের অয়ি সুন্দরী ইন্দিরা,
আর কাছে,—তুই কেন হইলি অধীরা?
মলয়-পরশে কেন সঙ্কোচ-আকুল,
লোভনীয়া যোড়শীয়া মাধবিকা-ফুল?
শোন্ বলি,—আঃ তোর জুড়াল জীবন।
রসোল্লাস-সুধাসিন্ধু,
তাহি এযে এক বিন্দু।
কি মধুর।—তুই কেন ফিরাস্ বদন?
এর নাম "ইন্দিরার অতুল চুম্বন"।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন।

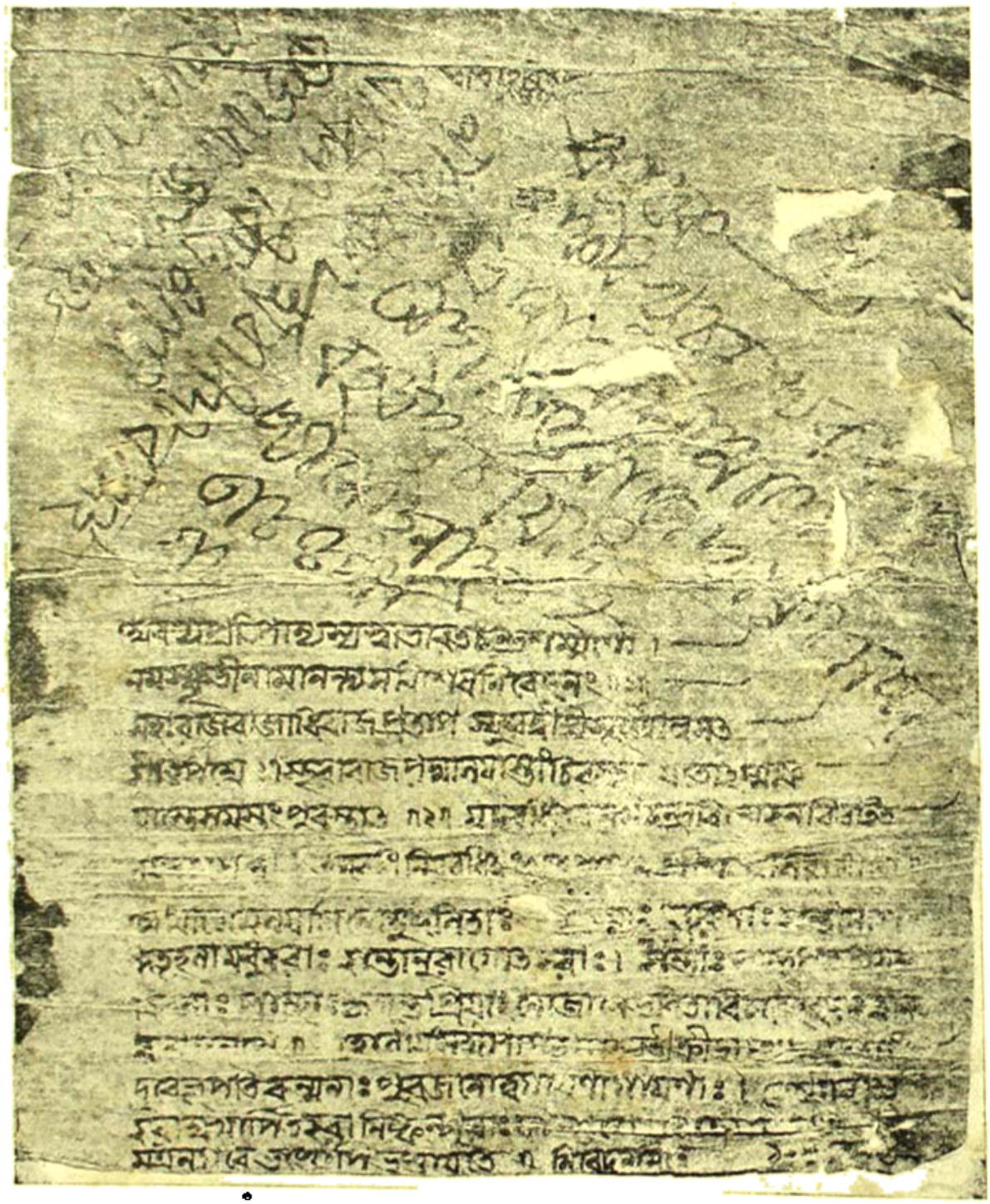

কবিকেশরী ভারতচন্দ্র ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হস্তলিপি

কবিকেশরী ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

[আমরা ১৩১৬ সালের শ্রাবণ মাসের ভারতীতে যে মহাত্মার জীবনী প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে সেই প্রাতঃস্মরণীয় স্বনামধন্য স্বর্গীয় রাখালদাস হালদার মহাশয়ের ইংরাজী ১৮৭৬ সালে (১৭৯৭ শকে) লিখিত দুইটী বিভিন্ন প্রবন্ধ হইতে আমরা কবিকেশরী ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত যতটুকু লাভ করিয়াছি, ভারতীর সহৃদয় পাঠকদিগের প্রীতিবর্দ্ধনার্থে ভারতচন্দ্রের স্বহস্ত লিখিত একখানি দুষ্প্রাপ্য সনদসহ তাহা প্রকাশ করিতেছি। অর্দ্ধ শতাব্দি পূর্ব্বে রাখালদাস হালদারের লিখিত ভারতচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে তাঁহার স্বাধীন মতের উপর আমাদের বলিবার কিছু নাই।]

"যে সকল মনুষ্য ধর্ম্ম-প্রচার বা বিদ্যানুশীলন করেন, তাঁহাদের প্রতি আমার অত্যন্ত ভক্তির উদয় হয়। তাঁহাদের জীবন বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে আমি সাতিশয় সুখী হই। জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহে ইংরাজদের ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির বিশেষ যত্ন আছে; আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অন্যান্য দুই শত ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছি। কালিদাস প্রভৃতি স্বদেশীয় বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনচরিত জানিবার উপায় অতি অল্প। যাঁহারা অনতিদীর্ঘকাল পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের পুত্রপৌত্রাদির সাহায্যে তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত সংগৃহীত হইতে পারে।

আমি শ্রুত হইয়াছিলাম ভারতচন্দ্র রায়ের পৌত্র তারকনাথ রায় মূলাজোড় গ্রামে বাস করেন। ভারতচন্দ্র রায়ের ন্যায় মহদ্ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত জানিবার এমত সহজ উপায় আছে, শুনিয়া আমি আনন্দিত হই; এবং স্বকীয় প্রিয় অভিলাষ পূর্ণ করিবার মানস করিয়া আমি গত ১২ই কার্ত্তিক (১৭৭৬ শকে) তারকনাথ রায় মহাশয়ের বাটীতে গমন করিলাম। আমি পূর্ব্বে জানিতাম না যে, ভারতচন্দ্র যে গ্রামে বাস করিয়াছিলেন তাহার এত নিকটে আমরা বসতি করিয়া থাকি। মূলাজোড় আমাদের জগদ্দল হইতে এক ক্রোশের অধিক দূর নহে। ভারতচন্দ্র মূলাজোড়ে বাস করিয়াছিলেন পূর্ব্বে কাহারও মুখে শুনি নাই। আমি ইহাও জানিতাম না যে, ভারতের পৌত্র রামধন রায়ের সহিত আমার পিতার * সৌহার্দ্য ছিল।—উভয়ে বহুকাল এক স্থানে বাস করিতেন† এবং পরস্পর ভ্রাতৃ সম্বোধন করিতেন। এ সকল অবগত হইয়া যখন ভারতের বাটীতে পদার্পণ করিলাম, তখন একেবারে কৃতার্থম্মন্য হইলাম। নিজ পরিচয় প্রেরণ করাতে তারকনাথ রায় আমাকে অতি আত্মীয়ের ন্যায় গৃহ মধ্যে গ্রহণ করিলেন।

---

* রাধালদাস হালদারের পিতা স্বর্গীয় বেচারাম হালদার বঙ্গের প্রথম একজিকিউটিভ এন্‌জিনিয়ার। ১৮৮০ সালে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত "গঙ্গাধর শর্ম্মা" ওরফে "ছটাবাবী রোজনামচা" গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ আছে।

† ভারতচন্দ্রের স্বহস্ত লিখিত পত্রটী বোধ হয় শ্রীযুক্ত বেচারাম হালদার ভারতচন্দ্রের পৌত্রের সহিত একত্র অবস্থান কালে তাঁর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন।

দেখিলাম, তাঁহার বয়স অশীতিবর্ষের অতীত হইয়াছে। তিনি বহু দিবসাবধি পক্ষাঘাত-গ্রস্ত এবং কিয়দ্দিন পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়াছেন। তাঁহার কথাবার্ত্তার বিজ্ঞতা দর্শনে আমি পরিতুষ্ট হইলাম। আমার আগমন তাৎপর্য্য অবগত করাতে তিনি কহিলেন, কিয়দ্মাস গত হইল জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া সেই সকল বিষয় লিখিয়া লইয়া গিয়াছেন। তৎপর রায় মহাশয়ের সহিত গৃহ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার কথাবার্ত্তাতেই অনেক সময় বিগত হইল। আমিও তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিরক্ত করিবার ইচ্ছা করিলাম না; ভাবিলাম, পূর্ব্বোক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যখন যত্নপূর্ব্বক ভারতচন্দ্র রায় সম্পর্কীয় বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই তাহা প্রকাশ করিবেন। রায় মহাশয়ের পুত্রের (ভারতের প্রপৌত্র) নাম বাবু অমরনাথ।"

(রাখালদাস হালদার মহাশয় স্বর্গীয় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিরচিত ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনবৃত্তান্তের সমালোচনা প্রসঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের বিষয় লিখিয়াছিলেন।)

"এই পুস্তকখানির নিমিত্ত আমরা রচয়িতাকে নমস্কার করি। তাঁহার বিবিধ মতের সহিত আমাদের মতের চিরকালই বিভিন্নতা আছে; কোন কালে তাঁহার আস্বাদন বৃত্তিকে আমরা প্রশংসা বোধ করি নাই। তথাপি স্বীকার করিতে হয় তিনি বিস্তর পরিশ্রমপূর্ব্বক স্বদেশীয় 'কবি কেশরীর" জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন।

ঈশ্বর বাবুর নিজের বিষয়ে কিছু না লিখিয়া আর আমাদের প্রসঙ্গকে উত্তমরূপে আবদ্ধ করা যায় না। তিনি বহুদিবসাবধি বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চা করিতেছেন; তাঁহার পাঠকের সংখ্যা বিস্তর। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত অত্যুৎকৃষ্ট রচনা করেন বটে; কিন্তু, তাঁহাদের পাঠকের সংখ্যা তাদৃশ অধিক নহে; কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহাদের রচনার গৌরব বুঝিয়া থাকেন। প্রত্যুত, অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট লেখক হইয়াও বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আপামরসাধারণ সকল লোকেরই অনুরাগ ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার নিজের আস্বাদনবৃত্তি উৎকৃষ্ট নহে; এ জন্য তিনি পাঠকদিগের আস্বাদনবৃত্তিকে উৎকৃষ্ট পথে চালিত করিতে পারেন নাই। তিনি কতকগুলিন তাম্রখণ্ডকে রৌপ্য সদৃশ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত রৌপ্য করিতে সমর্থ হন নাই; স্পষ্ট কথা, তিনি কতকগুলিন ব্যক্তিকে অপকৃষ্ট লেখক করিয়া তুলিয়াছেন, যাহারা সম্ভবতঃ কদাপি লেখক হইতেন না। ঈশ্বরবাবু গদ্যের অপেক্ষা পদ্যরচনা-প্রযুক্তই বিশেষ বিখ্যাত। তাঁহার পদ্য রচনা প্রায় সুমিষ্ট হইয়া থাকে, তিনি কখন কখন প্রকৃত কবিত্বও প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু, তাঁহার গদ্য রচনা প্রশংসাযোগ্য বোধ হয় না। তিনি শব্দের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে করিতে অর্থকে অবজ্ঞা করিয়া বসেন; তিনি মধ্যে মধ্যে এমত শব্দ সকল ব্যবহার করিয়া থাকেন, যাহা "সাহিত্য দর্পণকার দেখে পেতো ভয়।"

তাঁহার রচনা যদিও নিতান্ত কর্কশ না হউক, কিন্তু যাথবহুল বটে; যদিও রসরাজের ন্যায় অপকৃষ্ট না হউক তথাপি মধ্যে মধ্যে

অশ্লীলতা প্রকাশ করিয়া থাকে। তিনি কদাপি উৎকৃষ্ট লেখকদের মধ্যে গণ্য হইবেন না, আমাদের সম্মানস্পৃহিণী অবশ্য অনতি-কাল মধ্যে তাঁহার সাধারণ গ্রন্থরচনা বিস্মৃত হইবে। কেহ বলিতে পারেন যে আমরা ঈশ্বরবাবুর সহিত অতি তর্কশ ব্যবহার করিতেছি, বস্তুতঃ তাঁহার সহিত আমাদের বিন্দুমাত্র শত্রুতা নাই; তাঁহার খ্যাতি উপার্জ্জনপথে কণ্টকরোপণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, জীবনবৃত্তান্তরূপে তাঁহার বিষয়ে লিখিতে হইলে, আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহার ন্যূনাতিরেক আর কিছুই লিখিতে পারি না।

আমরা সর্ব্বারম্ভে ভারতচন্দ্র রায়ের জীবন বৃত্তান্তের জন্য ঈশ্বর বাবুকে ধন্যবাদ দিয়াছি; পুনর্ব্বার তাহা প্রদান করিতেছি। রায়গুণাকরের সমস্ত অনুরাগী ব্যক্তিই ঈশ্বর বাবুর নিকট ঋণী হইয়াছেন। ভারতের পৌত্র তারকনাথ রায় জীবিত আছেন বলিয়া ঈশ্বর বাবু কৃতকার্য্য হইয়াছেন, একথা যথার্থ বটে, কিন্তু এমত উপায় না থাকিলেই বা কে কোথায় পূর্ব্বপুরুষের সমকালীয় ব্যক্তিদের জীবনবৃত্ত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? তারকনাথ রায়ের সহিত আমাদের আলাপ ছিল; আমরাও ভারতচন্দ্রের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহে চেষ্টা করিয়াছি; কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। অশীতিবর্ষ বৃদ্ধ, অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত তারকনাথ রায়কে বিরক্ত করিতে আমাদের সাহস হয় নাই। ইহা সম্পূর্ণ আহ্লাদের বিষয়, ঈশ্বর বাবু আমাদের ক্ষোভকে অপনয়ন করিয়াছেন। অন্ততঃ তিনি এমত তথ্য সকল সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহা অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে এক উৎকৃষ্টতর পুস্তক প্রস্তুত হইতে পারিবে।

ভারতচন্দ্র রায় আমাদের যেমন পরিচিত, তদ্রূপ প্রীতিভাজন। তাঁহার বিরচিত সুললিত পদাবলী লোকে সর্ব্বদা দৃষ্টান্ত রূপে ব্যবহার করে। তাঁহার প্রণীত অন্নদা-মঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর 'যাত্রা' স্বরূপ হইয়া অদ্যাপি আমাদের দেশের নাটকের স্থানকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার জীবিতাবস্থায় লোকে তাঁহার অসম্মান করে নাই; তাঁহার কবিত্ব প্রকাশাবধি তিনি কদাপি বিজাতীয় কষ্টে পতিত হয়েন নাই। ইহা যথার্থ বটে (যেমন কবি নিজে ব্যক্ত করিয়াছেন)

"ভূরিশ্রেষ্ঠ পুত্রে পুরন্দর সমো যস্যাত
আসীন্নৃপঃ।
রাজ্যাদ্ভ্রষ্টে ইহা গতস্য নৃপতেঃ পার্শ্বে
বসুব্যাশ্রিবঃ॥"

কিন্তু তিনি কবি হইয়া আপনার দুর্ভাগ্য আনয়ন করেন নাই; কবি হইয়াছিলেন বলিয়া বরং তিনি এক প্রকারে সুখে কাল যাপন করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় কত কবি কত প্রকার দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াছেন। টাসো নামক কবি দুই টাকার নিমিত্ত সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিতেন; ফরাসীস দেশীয় বিখ্যাত নাটককর্ত্তা কর্ণীল এমত দরিদ্র ছিলেন যে, তিনি বৃদ্ধাবস্থায় একদিবস চর্ম্মকারের বিপনিতে দণ্ডায়মান থাকিয়া একখান পাদুকার জীর্ণ সংস্কার করাইতেছেন, ইহা কোন ব্যক্তির নেত্র গোচর হয়। অট্রগ্রে নামক কবি ক্ষুধার জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন ও চর্চহিল্ ভিক্ষুকাবস্থায় এবং তাঁহার বন্ধু লইড্ কারা-

গারে জীবন শেষ করেন। ইহাদের দারুণ শোকজনক অবস্থার সহিত ভারতচন্দ্রের অবস্থার তুলনা করিলে তাহা অপেক্ষাকৃত বিস্তর উৎকৃষ্ট বোধ হইতে পারে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সহিত প্রণয় হওয়া অবধি ভারতচন্দ্র ৪০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। পরে বাটী নির্ম্মাণ নিমিত্ত ১০০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে ২৪ পরগণার মূলাযোড় গ্রাম 'ইজারা' দিয়া বার্ষিক ৬০০৲ টাকা করস্বরূপ গ্রহণ করিতেন। ইহাতে ভারতচন্দ্রের ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ না হউক, তৎকালিক রূপ সুখের সহিত দিনপাত করিবার কোন ব্যাঘাত ছিল না। স্মরণ করিয়া নিশ্চয় আহ্লাদিত হইতে হয় যে, বঙ্গদেশের একজন প্রথমকালীয় কবি সসম্ভ্রমে কাল-যাপন করিয়াছিলেন।

বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন যে ভারতচন্দ্র অতি অল্প বয়সে পদ্য রচনা আরম্ভ করেন। ভারতচন্দ্র যৎকালে দেবানন্দপুরনিবাসী রামচন্দ্রমুন্সীর বাটীতে অবস্থিতি করিয়া পারসীক ভাষা অধ্যয়ন করেন, তখন সত্যনারায়ণের ব্রত কথা বলিয়া দুইটী পদ্য রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটীতে 'সনে রুদ্র চৌগুণা' অব্দ নির্দ্দিষ্ট আছে; ঈশ্বর বাবু ইহার দ্বিপ্রকার অর্থ করিয়াছেন; ১১৩৪ এবং ১১৪৪; প্রথম শক গ্রাহ্য করিলে তৎকালে ভারতচন্দ্রের বয়স ১৫ বৎসর হয়, কারণ তিনি ১১১৯ সনে (১৬৩৪ শকে) জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় শকানুযায়ী তখন ভারতচন্দ্র ২৫ বৎসর বয়স্ক হয়েন। ঈশ্বর বাবুকে প্রথম শকের প্রতি অধিকতর অনুকূল বোধ হয়। কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় শকই বিবেচনা সিদ্ধ বোধ হইতেছে। পঞ্চদশ বর্ষে যে ভারতচন্দ্রের সত্য-নারায়ণ ব্রতকথার ন্যায় রচনা অসম্ভব, ইহা আমাদের মত নহে। কারণ, তদপেক্ষা অল্পতর বয়সে উৎকৃষ্টতর রচনার বিস্তর প্রমাণ আছে। কর্ক হোয়াইট্ নামক কবি চতুর্দ্দশ বর্ষে মনোহর পদ্য রচনা করিয়াছিলেন। জর্ম্মণ কবি গেটে আট কিম্বা নয় বৎসর বয়সে বারখানি চিত্রের বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন। স্যর ফ্রান্সিস্ পাল্‌গ্রেব্ অষ্টম বর্ষে সংবাদ পত্রে নানাবিধ রচনা প্রকাশ করেন। ভারতচন্দ্রের বুদ্ধিশক্তিও সামান্য ছিল না। তথাপি একটী বিষয় বিবেচনা করিলে বোধ হইবে যে তিনি পঞ্চবিংশ বর্ষেই সত্য-নারায়ণের ব্রতকথা রচনা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরবাবুর অনুমোদিত মত গ্রাহ্য করিলে স্বীকার করিতে হয় যে ভারতচন্দ্র বিংশতিতম বর্ষে বর্দ্ধমানস্থ রাজবাটীতে আপনাদের বিষয় সম্পত্তির পক্ষে 'মোক্তার' স্বরূপে নিযুক্ত হয়েন। আমরা এ বিষয়ে বিস্তর সন্দেহ করি। তিনি যে পারসীক অধ্যয়ন সমাপনান্তর ত্রিংশ বর্ষে অভিহিত কার্য্যে নিয়োজিত হন, ইহাই আমাদের সঙ্গত বোধ হইতেছে। যিনি আমাদের এই কথায় সম্মত হইবেন তাঁহাকে সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতচন্দ্র পঞ্চবিংশ বর্ষে পদ্য রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহাকে এক অদ্ভুত পদার্থরূপে প্রতিপন্ন করা যদি ঈশ্বরবাবুর অভিপ্রেত না হইত, তবে তিনি ভারতের পঞ্চদশ বর্ষে পদ্য রচনার কথা উল্লেখ করিতেন না।

তিনি যে কালে সংস্কৃত, পারসীক, হিন্দী, ও আরবী ভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন তখন স্বদেশীয় ভাষাভাষিত পুস্তক পাঠে অনুরাগ শূন্য ছিলেন না। সে সময়ে এ দেশে গদ্যগ্রন্থ বিরচিত হয় নাই; কতিপয় পদ্য পুস্তক মাত্র প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণদাসের চৈতন্য চরিতামৃত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ অবশ্য তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে বিরচিত হয়। বোধ হয় কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং কবিকঙ্কণের চণ্ডী তিনি বাল্যাবস্থায় পাঠ করিয়া পাকিবেন। এই সকল পাঠ দ্বারাই সম্ভবতঃ তাঁহার পদ্য রচনায় প্রবৃত্তি হয়।

দেশ পর্য্যটনের দ্বারা তাঁহার জ্ঞানসীমা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি উৎকল দেশে ভ্রমণ করেন; সেই দেশে মহৎভাবোদ্দীপক তাদৃশ কোন পদার্থ নাই বটে; তথাপি পর্য্যবেক্ষণকারী ব্যক্তিরা লোকের রীতি নীতি দেখিয়া বিস্তর জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারেন। এবিষয়ের আবশ্যকতা তাঁহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম ছিল; কারণ তিনি সুন্দরের মুখে বক্ষ্যমাণ বাক্য অর্পণ করিয়াছেন

"দেখিব রাজার সভা সভাসদ্‌গণ।
আচার বিচার রীত চরিত কেমন॥"

ভারতচন্দ্র এইরূপে প্রচুর জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগত হন এবং নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া ১৬৭৪ শকে সুপ্রসিদ্ধ অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন। আর কতিপয় পণ্ডিত এই পুস্তক রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন। ঈশ্বরবাবু লিখিয়াছেন যে কৃষ্ণচন্দ্র রায় নির্দ্দোষ না করিয়া অন্নদামঙ্গলকে প্রকাশিত হইতে দেন নাই। আমরা এই কথার সহিত কোন ক্রমেই একমত হইতে পারি না। অন্নদামঙ্গল নির্দ্দোষ গ্রন্থ নহে। ব্যক্ত অশ্লীলতা তাহার মহৎ দোষ। ঘৃণা ব্যতিরেকে বিদ্যাসুন্দরের এক এক অংশ পাঠ করা যায় না। ইংরাজের মধ্যে জগন্মান্য সেক্‌স্‌পীয়র প্রভৃতি কবিরা অভিহিত অশ্লীলতা দোষে দূষিত ছিলেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহারা নিন্দনীয় ব্যতিরেকে প্রশংসা হয়েন নাই। এতদ্দেশীয় একজন লেখক ইউরোপীয় কবিদের দোষ দেখাইয়া ভারতচন্দ্রের দোষ খণ্ডনে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন, সেই কারণেই আমরা একথা উল্লেখ করিতেছি। সেক্‌সপীয়র ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তিরা কবি ছিলেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাদের দোষকে গুণ বলিয়া প্রচার করা উচিত নহে। অপিচ কথিত হইয়াছে যে ভারতচন্দ্র যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন অশ্লীলতা দোষ মধ্যে গণ্য ছিল না; এখনকার রীত্যনুযায়ী পূর্ব্বকালীন ব্যবহার বিবেচনা করা অনুপযুক্ত। কিন্তু এ কথার দ্বারাও ভারতচন্দ্রের আস্বাদন বৃত্তিকে কলঙ্কহীন রাখা হয়নাই। সে কালেই হউক, আর একালেই হউক, ব্যক্ত অশ্লীলতা কদাপি গুণ মধ্যে গণ্য হইতে পারেনা; সদ্বংশ সাধুব্যক্তিরা তাহা দোষ বলিয়াই বিবেচনা করেন। অশ্লীলতার দ্বারা পৃথিবীর অপকার ভিন্ন কি উপকার হইতে পারে? ভারতচন্দ্র যে প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে উক্ত দোষ বড় গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। আমরা স্বীকার করি তিনি অশ্লীলপ্রিয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে সন্তোষ প্রদানের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু বিদ্যাসুন্দরে আদিরস বর্ণনে যাদৃশ কৌশল দেখা যায় নিজে আদিরস ভক্ত কবি না হইলে তাদৃশ রচনা করা সম্ভবে না।

কবি রায়গুণাকরের রচনার আর কতিপয় দোষ আছে। তিনি প্রচুর পরিমাণে অনুকরণ শব্দ ব্যবহার করেন; ইহাতে কেবল ভাবের অভাব মাত্র প্রতীত হয়; কেবল শব্দের উপর নির্ভর করা মহৎ কবির লক্ষণ নহে। মহতেরা মহৎ বা ভয়ানক রস উদ্দীপন করিতে হইলে কেবল অর্থের উপর মনোযোগ দিয়া থাকেন।

পারসীক ভাষা শিক্ষা তাঁহার কাব্য রচনায় কি উপকারজনক হইয়াছে? আমাদের বোধ হইতেছে, তিনি হিন্দী ও পারসীক ভাষা না শিখিলে মহত্তর কবি হইতেন। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভারতের যে সকল অপ্রকাশিত রচনা সংপ্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতিপয় এককালে তিন চারি ভাষায় রচিত হইয়াছে; তাহা কবির প্রশংসক হওয়া দূরে থাকুক, বরং ভারতের রচনার একটি দোষরূপে গণ্য হইতে পারে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে তিনি যত প্রবৃদ্ধ হইতেছিলেন ততই এইরূপে রচনায় অধিক পরিশ্রম স্বীকার করিতে-ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশেষ অসম্পূর্ণ গ্রন্থ চণ্ডী নাটক এইরূপে রচিত হইতেছিল।

অন্নদামঙ্গলের মূল প্রবন্ধ বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। উহার মূল প্রবন্ধ কোন মতেই উৎকৃষ্ট নহে। যদি তাহা গদ্যরচিত হইত, আমরা কদাপি সাদুরাগে পাঠ করিতাম না। অন্নদা মঙ্গলের অর্দ্ধ-কাব্য অর্দ্ধ পৌত্ত-লিক ভাব প্রীতিকর বোধ হয় না। বস্তুতঃ অন্নপূর্ণার পূজা প্রচার করা যদি উক্ত কাব্যের উদ্দেশ্য না হইত, তবে গ্রন্থকার উৎকৃষ্টতর কাব্য রচিতে পারিতেন।

আমরা তাঁহার কাব্যের আরও দোষ উল্লেখ করিতে পারি। তিনি রতির প্রতি দৈববাণী নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকরূপে রচনা করিয়াছেন, তিনি ভূত প্রেত ডাকিনীদিগকে অনাবশ্যকরূপে একভাবে পুনঃ পুনঃ কাব্য মধ্যে সমাবেশিত করিয়াছেন। তাঁহার অন্নপূর্ণার অপেক্ষা ভবার কেমন বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইয়াছে! তিনি ব্যাসকে এক আশ্চর্য্য জন্তু করিয়াছেন:—

দাঁড়াইলে জটাভার—
চরণে লুটায় তার—
কক্ষলোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু।
পাকা গোঁপ পাকা দাড়ি
পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি
চলনে কতেক আঁটু বাঁটু।

ব্যাস স্নান করিয়া উঠিলে নাজানি তাঁহাকে কেমন অদ্ভুত পদার্থ বোধ হইত! কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণ চিত্র নহে;—ইহার আশ্চর্য্যতর অংশ পশ্চাৎ রহিয়াছে;

কপালে চড়ক কোঁটা
গলে উপবীত মোটা
বাহুমূলে শঙ্খ চক্র রেখা।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত ছাবা
কালমৃগ বাঘ থাবা
সারি সারি হরি নাম লেখা॥
তুলসীর কণ্ঠী গলে
লম্বি মালা করতলে
হাতে কানে থর থর মালা॥

ব্যাসের অতি দুর্ভাগ্যজনক চিত্র! যথার্থতঃ তাঁহার এমত ভাব আমরা কদাপি কল্পনা করি নাই। গুণাকর সহজে ব্যাস-দেবকে বিদায় করেন নাই; তাঁহাকে যৎ-

পরোনাস্তি অবমানিত করিয়া দূর করিয়াছেন।

তাঁহার রচনার দোষ বর্ণন অবশ্য আমরা এই স্থলেই শেষ করিব, এবং তদীয় উজ্জ্বল-ভাগকে অবলোকন করিব। কৃষ্ণ পক্ষের সন্ধ্যাবসানে সুধাংশু সন্দর্শন যেমন তৃপ্তিকর, এবিষয়ও আমাদের পক্ষে সেইরূপ হইয়াছে। কলঙ্ক সত্ত্বেও ভারতচন্দ্র চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল কবি ছিলেন। তিনি স্বীয় রচনার স্থানে স্থানে কবিত্ব শক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। মেনকা কন্যার সহিত শিবের বিবাহ, বিদ্যাসুন্দরের মিলন, রাণীর নিকট বিদ্যার অনুনয় প্রভৃতি বিষয় পাঠ করিয়া কোন্ ব্যক্তি তত্তদ ব্যাপারকে প্রত্যক্ষবৎ অনুভব না করেন?

নিম্নলিখিত তৎপ্রণীত রচনাগুলি আমাদের দেশের প্রবাদবাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে;—

"নীচে যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে।"

"কড়ি দিয়া কিনিলাম দই, বন্ধু নাই কড়ি বই,
কড়িতে বাঘের দুধ মিলে।
"কড়িতে বুড়ায় বিয়ে, কড়ি লোভে মর পিয়ে,
কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে।"

"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।"

"উত্তমে উত্তম মিলে অধমে অধম।
কোথায় মিলন হয় অধমে উত্তম।"

"সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।"

"শিলা জলে ভাসি যায় বানরে সঙ্গীত গায়
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।"

"যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।"

"বমুন শুকোয় শুক চাউলে না পায়।
হায়। বিধি। পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।"

"ভেঙ্গে দুলাইয়া পথে, দুগ্ধ বধূ খায়।"

"লোকে বলে পাপ কাজ করিয়া লুকায়"।

"সাপের বাসায়, ছেলেরা না চায়।"

"রোগী যথা নিম খায় মুদিয়া নয়ন।"

(উকীলের প্রতি)

স্ত্রীলোকের মত পড়ি যারি খেতে পারে।
সব গুণ গত দোষ বিধাতা ক'য়ে সারে।"

"অধনে উত্তম হয় উত্তমের সাথে।
পুষ্প সঙ্গে কীট যেন উঠে সুর মাথে।" ইত্যাদি।

তিনি ইচ্ছামতে এক এক স্থানে এক এক রসকে মূর্ত্তিমান্ করিয়াছেন বলিলে হয়। বস্তুতঃ আদিরস ও হাস্যরস বর্ণনে তাঁহার এক বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তিনি রৌদ্র ও ভয়ানক রস বর্ণনে চেষ্টা করিয়াও, কৃতকার্য্য হয়েন নাই; ভাষার দারিদ্র্য জন্য ইহা ঘটিয়া থাকিবে; বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষার মহদ্ভাব উদ্দীপন বিষয়ে আমরা বিস্তর সংশয় করি; অদ্যাপি এরূপ রচনা প্রত্যক্ষ করা যায় নাই।

রচনার যে অংশ নিতান্ত চিত্তাকর্ষণ সমর্থ, লোকে তাহাতে সহজে বিমোহিত হয়; কিন্তু, যে অংশের দোষগুণ বিচারমার্জ্জিত বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, লোকে তদ্বিষয়ে কিছুই স্থির করিতে পারে না। এই নিমিত্তই কাব্যবিষয় বিচার সময়ে সাধারণ লোকে ভ্রমাবর্ত্তে পতিত হয়; এই নিমিত্তই রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল নির্দ্দোষ কাব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু এখন কবিত্ব বিচারের উপযুক্ত সময় উপস্থিত; এখন

ভারতের রচনায় দোষ প্রকাশিত হইলেও তাঁহার পক্ষে সুখের বিষয় এই যে তিনি রসজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা যথার্থ কবি পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। তিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ মধ্যে কিয়দ্দিন নব্য পদ্যকারকদের মধ্যে গণ্য হইতেছিলেন; যাহাদের মস্তকে কবিত্বের প্রবাহও কদাপি সংস্পর্শ হয় নাই, তাঁহারাও গুণাকরকে অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গালার কবিত্ব প্রস্রবণের মূল বিষাক্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ দেশীয় লোকের দোষগুণ বিচারশক্তি অতি অল্প; এইজন্য অকবিদের দূষণীয় রচনার দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যশাস্ত্র বিকৃত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইহা নিবারণের উপায় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

আমরা যথার্থ কবিত্ব ও পদ্যরচনার ইতর বিশেষ বর্ণন করিতাম; আমরা ভারতচন্দ্রের রচনার সৌন্দর্য্য প্রদর্শনে ব্যাকুলরূপে প্রবৃত্ত হইতাম; কিন্তু অবকাশাভাব প্রযুক্ত আমাদের এ সমুদয় অভিলাষ সম্প্রতি বিফল হইল। আমরা অতি দুঃখের সহিত এই প্রস্তাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছি। আর একটী কথা উল্লেখ না করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করা যায় না। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন যে গুণাকরের পৌত্র তারকনাথ রায় মহাশয়ের অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ নাই; আমরা বলিতেছি তাঁহার অন্ন-বস্ত্রের সুখও নাই। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে আমরা রায় মহাশয়ের বাটীতে গিয়াছিলাম। যদিও গুণাকরের আবাসভূমি বলিয়া আমাদের মন কৃতার্থম্মন্য হইল, কিন্তু রায় মহাশয়ের কষ্ট দেখিয়া আমরা ব্যাকুল হইলাম। ভারতচন্দ্রের অনুরাগী ব্যক্তিদিগকে আমাদের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা প্রিয় কবির উপযুক্ত সম্মান করুন; তাঁহার নিকট যে গুরুতর ঋণে বদ্ধ আছেন তাহা পরিশোধ দিবার চেষ্টা করুন। জীবিতাবস্থায় গুণাকর সচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া থাকিলেও তাঁহার সম্পূর্ণ সমাদর হয় নাই। তাঁহার সম্পূর্ণ সম্মানার্থ মূলাযোড় গ্রামে এক সভা আহ্বান করা উচিত; এক উৎসব ব্যাপার সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। ৯২ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। শতবর্ষের মধ্যেই যেন ইহা সম্পন্ন হয়।

কামনা ও আরাধনা।

একদিন বসন্তের সুন্দর প্রভাতে
পড়েছিনু বড় সুখে তোমাতে আমাতে
মধুর তৃতীয় সর্গ কুমার সম্ভবে;
উমার বাসন্তী সজ্জা বর্ণনা গৌরবে
সাধ গেল সাজিবারে পত্র পুষ্পে যত
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতাটির মত।
তারি তরে নিরেছিনু ঘরেতে খুঁজিয়া
সাজান কুসুম গুলি আঁচল ভরিয়া।
বই-হাতে আনমনে ছিলে একধারে,
"ওকি খেলা হেথে তুমি শুধালে আমারে,
"সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা হতে চাই
তাই ফুল করিতেছি জড়"।—"আছ তাই;
বাসী-ফুল গুলো প'রে কাজ নাই আর।
উমা সাজিলেন যবে সে দিন উমার
মহেশ্বর হন নাই হায় হস্তগত,
তোমার মহেশ যে গো চির পদানত"।
তোমারি আসন তলে ফুল ঢেলে দিয়ে
হাসিয়া পায়ের কাছে বসিলাম গিয়ে।

শান্তি।

ভৃত্য বিহারী বড় বাবুর সংসারে একজন "কেও কেটা" নয়; বড় বাবুর "পেয়ারের" চাকর। এজন্য একটা স্পর্দ্ধিত গৌরব তাহার মুখে সর্ব্বদাই ফুটিয়া থাকিত। সে অন্যান্য ঝি-চাকরের উপর অবাধ প্রভুত্ব করিত এবং তাহাদের কাজ কর্ম্মের খুঁটিনাটি লইয়া অবিরত তীব্র সমালোচনায় তাহার দিনটি বেশ আরামেই কাটিয়া যাইত।

কোমলে কঠিনে গঠিত বিহারীর হৃদয় খানির ভিতর কিন্তু মলিনতা ছিল না—সুচারু দর্পণের ন্যায় তাহা পরিষ্কার ঝরঝরে। সম্প্রতি হৃদয়ের অন্তঃপুরে কে যেন গোপনে উঁকি মারিতে লাগিল। শুনি সূতার জটের মত তাহার হৃদয়ের গুপ্ততম প্রদেশে একটা জটিল জট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল—সূতা ছিঁড়বে তথাপি জট খুলিবে না!

বিহারী যখন দিবাশেষে কার্য্যাবসানে, অবসর বেশে, তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আসিয়া দীন-শয্যায় শয়ন করিত, তখন তাহার শ্রান্ত মুগনয়ন চিরপরিচিত বরগাগুলির প্রতি চাহিয়া থাকিত; এবং যখন তাহাদের সংখ্যা নির্ণয়ের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইত, তখন বিহারীর নিদ্রাতুর চক্ষু দুটী ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিত। তৎপূর্ব্বে তাহার হৃদয় কুঞ্জে পাতার পাশে ফুলের মত কাহার এক খানি কচি মুখের সুন্দর ছবি ফুটিয়া উঠিত। সে মনে ভাবিত, এমন দিন কি হবে, যে দিন সে মথুর মণ্ডলের কন্যা পদ্মমণিকে গৃহলক্ষ্মী করিয়া আনিবে। পনের টাকা তাহার রোজগার হইয়াছে; এখন দুই এক খানি স্বর্ণালঙ্কার হইলেই সে বড়বাবুর নিকট এক মাসের ছুটি লইয়া বিবাহ করিয়া আসে। কিন্তু স্বর্ণালঙ্কার সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে ত সহজসাধ্য নয়। কাজেই মথুর মণ্ডলের কন্যা প্রাপ্তির আশা তাহার চক্ষের সাম্নে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় একবার দপ করিয়া জ্বলিয়া নিমিষে নিভিয়া গেল। একটা জমাট অন্ধকার সেই ক্ষুদ্র কক্ষে নীরবে বিরাজ করিতে লাগিল। বিহারী মনে মনে ভগবানের অবিচার সম্বন্ধে অনেক কঠোর সমালোচনা করিয়া তাঁহার অস্তিত্বের বিষয়ে দারুণ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

এই জমিদার বাবুর সুদীর্ঘ প্রাসাদের নিকটেই হরিহর বাবুর বাটী। তিনি অল্প বয়সে একটী মাত্র পুত্র রাখিয়া ইহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার বিধবা পত্নী সরলা ভগবানের আশীর্ব্বাদের ন্যায় পবিত্র এই স্নেহের ধনটীকে বুকে লইয়া স্বামিশোক ভুলিয়াছিল। প্রত্যহ অপরাহ্ণে সরলা সুধীরকে সাজাইয়া দিত এবং বিহারী আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইত—সে বড় বাবুর ছেলেদের সহিত খেলা করিত ও বেড়াইতে যাইত। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিহারী তাহাকে রাখিয়া যাইত। সুধীর বিহারীকে দাদা বলিত—বিহারী সরলাকে মা বলিয়া সম্বোধিত করিত। সুধীরের হাতে দুগাছি বালা ও গলায় কয়েকটী মাদুলী সমেত এক ছড়া সোনার হার সর্ব্বদাই থাকিত। এত দিন বিহারীর মনে এই সকল অলঙ্কার সম্বন্ধে কোন চিন্তাই মনে জাগে নাই। এখন এই স্বর্ণালঙ্কার ক'খানি দেখিলেই তাহার

হৃদয়ে পদ্মমণির মধুর ছবি ফুটিয়া উঠে। তার আজ যদি এই কখানি গহনা তাহার থাকিত তাহা হইলে পদ্মমণি তাহার গৃহ লক্ষ্মী হইত!

২

সে দিন মাহেশের রথ। চারিদিকে বিষম জনতা। এই ভিড়ের মধ্যে এক স্থানে একটী বালক দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। বহুলোক তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বালকের অঙ্গে কয়েক খানি স্বর্ণালঙ্কার ছিল। লোকে যতই তাহাকে প্রশ্ন করিতেছে—সে ততই কাঁদিতেছে।

বিহারী রথ দেখিতে আসিয়াছিল। সে মধুর মণ্ডলের কন্যার বিরহ-বেদনায় ব্যথিত অলস স্ফূর্তিহীন প্রাণটাকে আঁস্তাকার দিনে একটু সরল ও তাজা করিবার জন্য তাহার এক অপরিচিত সম্পর্কহীন মাতুলের দোকান হইতে স্ফূর্তির ঔষধ সেবন করিয়া বাহির হইয়াছিল। সে হৃৎক্ষণাৎ রোরুদ্যমান সুধীরের হাতধরিয়া কোলের কাছে টানিয়া আনিল এবং স্নেহস্বরে জিজ্ঞাসা করিল" সুধীর, কে তোমাকে এখানে এনেছে?"

সুধীর বিহারীকে দেখিয়া যেন অকূল-সাগরে একটা অবলম্বন পাইল। বিহারী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইতেই, সে বিহারীর বুকের উপর পড়িয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেক সান্ত্বনার পর সুধীর ভগ্নকণ্ঠে শিশুভাষায় বলিল "বাবিদিন কাকা আমাকে এখানে এনেছে, আমাকে এখানে ব'সে থাকতে বলে কোথা চলে গেল আর এল না। আমার বড় ভয় করচে দাদা, তুমি আমার বাড়ী রেখে এস।" বিহারী সুধীরকে কোলে করিয়া বিপিনের অনেক অনুসন্ধান করিল—কিন্তু সেই নরনাগরের তুমুল তরঙ্গের ভিতর তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। বিপিন ১৬।১৭ বৎসরের বালক—হরিহর বাবুর বাটীর পার্শ্বে থাকে—সুধীর তাহাকে বিপিন কাকা বলিয়া ডাকে।

তখন সন্ধ্যার শ্যাম ছায়া ধরণীর উপর নামিয়া আসিয়াছে। বিহারী সুধীরকে কোলে লইয়া জনতা ভেদ করিয়া গঙ্গাতীরের রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিল। এখন তাহার নেশা বেশ জমিয়াছিল—শিশুর অঙ্গের স্বর্ণালঙ্কার কখানি তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। পদ্মমণির মুখশ্রী তাহার হৃদয়াকাশে ফুটিয়া উঠিল। সে ভাবিল "যদি আজ সে এই অলঙ্কার কয়খানি পায় তাহা হইলে কাল সে বিবাহ করিতে পারে। পরের ছেলের উপর এত মমতা কেন? এ'কে যদি আর নাই পাওয়া যায়—লোকে আমাকে দোষী করিতে পারিবে না। সমস্ত দোষ বিপিনের উপর পড়িবে।" নেশার ঝোঁকে তাহার হৃদয়ের এতটা স্নেহ মমতা যেন বায়ুবিতাড়িত মেঘের ন্যায় নিমেষে ভাসিয়া গেল। বাণবিদ্ধ বরাহের ন্যায় সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, তাহার চোখ দুইটা জ্বলিতে লাগিল—চক্ষুলা মস্তকের উপর সোজা হইয়া উঠিল, হৃদয়টা পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হইয়া গেল। সে সজোরে সুধীরকে আঁকড়াইয়া ধরিল। সুধীর তখন তাহার দাদার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া আরামে নিদ্রা যাইতেছে; কি সরল বিশ্বাসপ্রবণ বালকের মন! কি গভীর নির্ভরতা! বিহারী সুধীরকে লইয়া

অনেকটা পথ চলিয়া গেল। তখন জ্যোৎস্নাকুল আকাশে দুই একখানি করিয়া কাল মেঘ জমিতেছিল। একটা জঙ্গলের নিকট বিহারী সুধীরকে নামাইয়া তাহার হাত ধরিতে যাইয়া দুইগাছি সযত্নে টানিয়া লইল—গলা হইতে হার ছড়াটি খুলিয়া লইল। বালক সুধীর "মা গো" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নিষ্ঠুর বিহারী বালকের কুসুমপেলব গণ্ডস্থলে সজোরে চপেটাঘাত করিল, অমনি সুধীর ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল! তাহার ক্রন্দন সহসা নীরব হইয়া গেল! একি! সে কি তবে নাই! তখন গলায় রক্ত স্ফীত হইয়া ফুলে ফুলে উঠিয়াছিল, বিহারী ভীত চকিতচিত্তে তাড়াতাড়ি সুধীরকে নিকটস্থ জোগলা বনের ভিতর ফেলিয়া দিল! জ্যোৎস্নাময়ী তাহাকে আপনার পুত্রবক্ষে ধরিয়া লইল! এ দৃশ্যে যুবতী জ্যোৎস্না যেন শিহরিয়া উঠিল!

৩

"কাকিমা সুধীর বাড়ী এসেছে?

সরলা বিস্মিতভাবে বলিল "সেকি বাবা! তুমি তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে রথ দেখতে নিয়ে গেলে; সে কার সঙ্গে বাড়ী আসবে?"

"সর্ব্বনাশ হয়েছে" বলিয়া বিপিন কাঁদিয়া ফেলিল!

সরলা রুদ্ধশ্বাসে বলিল "ওরে আমার মাণিকের কি হয়েছে বলবে—আমার প্রাণটা যে কেটে যাচ্ছে।"

বিপিন চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল "কাকিমা আমি তাকে এক জায়গায় বসিয়ে রেখে রথ টানতে গেলুম—ফিরে এসে আর দেখতে পেলুম না। ভাবলুম হয়ত সে কারুর সঙ্গে বাড়ী এসেছে।"

"সেকিরে"—বলিয়া সরলা আছাড় খাইয়া পড়িল।

বিপিন সুধীর সুধীর বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে রাস্তায় আসিয়া রজনীর ঘন অন্ধকারে চেয়ে করিয়া মাঠের দিকে ছুটিতে লাগিল—তখন মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছিল—কিন্তু তাহাতে তাহার দৃক্‌পাত নাই, তাহার প্রাণের ভিতর যে আগুন জ্বলিতেছিল, বাদলের শত ধারা কি তাহা নিভাইতে পারে?

৪

এখন বিহারীর বেশ ছুটিয়াছে। তাহার সমস্ত কথা স্মরণ হইল। তাহার প্রাণটা যেন ফাটিয়া শতখান হইয়া গেল। যে শিশু বাবা বলিয়া তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া আসিয়াছিল, নিরাপদ ভাবিয়া বালক যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সমস্ত প্রাণটা ঢালিয়া দিয়া যাহার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া নির্ভয়ে ঘুমাইতেছিল—সে কিনা আর সেই নির্ভরপরায়ণ অসহায় শিশুকে হত্যা করিল—তাহার বিধবা মাতার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিল! বিহারী আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল—আর শত ধিক্কার দিল মধুর মণ্ডলের কন্যার সেই চাঁদপানা মুখখানিকে! সে যখন বাড়ী ফিরিয়া সরলার বাদুল স্বরের করুণ ক্রন্দন শুনিল তখন তাহার বুকের ভিতর কে যেন সজোরে হাতুড়ি পিটিতে লাগিল। সরলার সেই হৃদয় বিদারক বাক্য "ওরে বাবা আমার যে" যেন তাহার হৃদয়টা খান খান করিয়া কাটিয়া হৃৎপিণ্ড ঢালিতে লাগিল। কি ভীষণ সে জ্বালা! সে যাতনায় ছটফট করিতে করিতে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে কিন্তু আকাশে মেঘ তখনও বাঁধিয়া

অন্ধকারকে আরও গাঢ়তর করিয়া তুলিয়াছে। —বিহারী এই ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়া প্রাণ-পণে ছুটিতে লাগিল। কর্দ্দমাক্ত পথে শত আছাড় খাইয়া সে সেই জোগলা বনের ভিতর আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল—সমস্ত জোগলা বন তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল—যদি সে একবার তাহাকে পায়! বটবৃক্ষের শাখায় বসিয়া একটা পেচক বিকট স্বরে ডাকিয়া উঠিল বিহারীর কর্ণে তাহা প্রবেশ করিল না—সে তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য! আত্মহারা!

বিহারী জ্ঞানশূন্য ভাবেই সেই বনের ভিতর আঁতি পাঁতি করিয়া সুধীরকে খুঁজিতে লাগিল! হঠাৎ বিহারীর মনে হইল—সে কি ভুল করিয়াছে—এখানে সে কাহাকে খুঁজিতেছে? তাহাকে যে সে গঙ্গার তরল বক্ষে রাখিয়াছিল! সে উন্মাদের ন্যায় গঙ্গার দিকে ছুটিল—সুধীরকে ফিরাইয়া আনিতে—গঙ্গার কূলে দাঁড়াইয়া সে 'সুধীর' 'সুধীর' বলিয়া আকুলস্বরে ডাকিতে লাগিল—সে শব্দে—শুক্ল নৌন নিশীথ-জ্যোৎস্না যেন কাঁপিয়া উঠিল! উন্মত্ত বিহারী ভাবিল সুধীর হয়ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—তাহাকে জাগাইয়া আনিতে হইবে! সেই সময় গঙ্গার বক্ষে দূরে—কি একটা ভাসিয়া যাইতেছিল—বিহারী মনে করিল—ওই বুঝি সুধীর! বিহারী আর বিলম্ব করিতে পারিল না—সুধীর সুধীর বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া সেই জ্যোৎস্নাপ্লুত স্ফীত গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল!

পরদিন পাগলের মত বেশে বিহারী যখন হরিহর বাবুর বাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল—তখন আর সুধীরের মাতার হৃদয় বিদারক ক্রন্দন-ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। উঠানে পা দিয়াই সে দেখিল সেখানে লোকারণ্য।

একজন জেলে কিছু পূর্ব্বে নদীতীরে শিশুকে পাইয়া তাহাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে। উঠানের মধ্যস্থলে সে শায়িত, মাতা ও চিকিৎসক তাহার সেবা করিতেছেন; লোকজন তাঁহাদের ঘিরিয়া আছে। বিহারী কলকে ঠেলিয়া শিশুর মুখের উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত রাত্রি সন্তরণে তাহার আর্দ্র চুল, আর্দ্র বসন হইতে টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছে,—চক্ষু জবা-ফুলের মত লাল, মুখ অস্বাভাবিক পাণ্ডু বর্ণ—সে বিকট দৃষ্টিতে শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া "হায় হায় কি হইল, পারিলাম না পারিলাম না—মরিয়া গেল—মারিলাম"—সুভীষণ কাতর কণ্ঠে এই কথা বলিয়া কটিবস্ত্রের অলঙ্কার কয়খানি ভূমিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

ভগবানের কৃপায় মুমূর্ষু বালক পুনরায় জীবনলাভ করিল; কিন্তু বিহারী?

নদীতীরে যেখানে মৃতপ্রায় সুধীরকে পাওয়া গিয়াছিল বিহারীর মৃত দেহ দুই দিন পরে ভাসিয়া আসিয়া ঠিক সেই খানেই লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ।

আত্মা বা ব্রহ্মের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? শঙ্কর নিজেই বলিতেছেন "অনুমানমৈতদাবিষয়ত্বাৎ—আত্মা অনুমানের বিষয় নয়। প্রাচ্য দার্শনিক বলিয়াছিলেন "আত্মা সংশয় করে, অতএব আছে" Cogito ergo sum। প্রকৃত পক্ষে যাহা "আত্মা সংশয় করে, অতএব আত্মা আছে" ইত্যাদি বাক্য অনুমানের মতনই দেখায়, বস্তুতঃ তাহাতে ন্যায় যাহাকে অনুমান বলে, অর্থাৎ ধূমলিঙ্গ দর্শনে অগ্নির অনুমানের ন্যায়, কোন লিঙ্গ পরামর্শ জন্য জ্ঞান নাই। "আত্মা সংশয় করে" এই কথার মধ্যেই 'আত্মা আছে,' এই কথাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এইরূপে পাশ্চাত্য দার্শনিকের উক্ত বাক্যেও দেখা যায় আত্মার সত্তা সাক্ষাৎ অনুভূত, বা মাণ্ডুক্যোপনিষদুক্ত "একাত্ম প্রত্যয়সারং" একমাত্র আত্মপ্রত্যয়েরই বিষয়। শঙ্করের মতে আত্মা অনুমানগম্য নয়। শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যে বলিতেছেন :—"ব্রহ্ম সকলের আত্মা, অতএব ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্যক্ সিদ্ধ। সকলেরই আপন অস্তিত্ব জ্ঞান আছে। "আমি নাই" এরূপ কেহ অনুভব করে না। আত্মা নাই এ কথা সত্য হইলে সকলেই অনুভব করিত 'আমি নাই।" (১) শুধু তাহা কেন,—"আমি নাই' এরূপ অনুভব কার," অতএব 'আমি আছি' একথা বলাও অসঙ্গত নয়, কারণ আমি না থাকিলে 'আমি নাই' এরূপ অনুভব করিবে কে? অনেকের সভায় উদ্দালক চাক্রায়ণ যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন :—"লোকে যেরূপ চিহ্নিত করিয়া দেখায় এই গো, এই অশ্ব, এইরূপ করিয়াই দেখাইতে হয়। সর্ব্বান্তর্যামী আত্মা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ব্রহ্মকে এরূপ করিয়া দেখাও।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "আমি ত বলিয়াছি তোমার যে আত্মা তাহাই সকলের আত্মা"। উদ্দালক আবার বলিল "কোন্‌টি সকলের আত্মা? কোন্‌টি সকলের আত্মা আমাকে বিশেষ করিয়া দেখাও"। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন:—"দৃষ্টির কার্য্যের দ্রষ্টাকে দৃষ্টিকার্য্য দ্বারা দর্শন করা যায় না, শ্রবণ কার্য্যের শ্রোতাকে শ্রবণ-কার্য্য দ্বারা শ্রবণ করা যায় না, মননকার্য্যের মন্তাকে মননকার্য্য দ্বারা মনন করা যায় না, বিজ্ঞানকার্য্যের বিজ্ঞাতাকে বিজ্ঞানকার্য্য দ্বারা জানা যায় না। দ্রষ্টা শ্রোতা প্রভৃতি দর্শন-শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্যের ভোক্তা স্বরূপ, নিয়ত পুরোবর্ত্তী, অতএব দর্শন-শ্রবণাদির অতীত বা অবিষয়"। শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন; "যাজ্ঞবল্ক্য যখন বলিলেন ঘটাদি কার্য্যের ন্যায় আত্মাকে আমাদের জ্ঞানের বিষয় করিয়া দেখাও। তাহা করা অসম্ভব জানিয়া যাজ্ঞবল্ক্য তাহা করিলেন না। অসম্ভব কেন? আত্ম-বস্তুর স্বভাবই ঐরূপ। কিরূপ? দৃষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়ার কর্তৃত্ব। দৃষ্টি-ক্রিয়ার দ্রষ্টাই আত্মা। দৃষ্টিই দুই প্রকার; লৌকিকী এবং পারমার্থিকী। তন্মধ্যে লৌকিকী দৃষ্টি চক্ষুঃসংযুক্ত অন্তঃকরণবৃত্তি বিশেষ (mental state)। সে দৃষ্টি করা যায়, তাহার আশ্রয়

(১) অন্যথাত্বন্তাচ্চ ব্রহ্মাত্মত্ব-প্রসিদ্ধিঃ। সর্ব্বাহি আত্মাত্মত্বং প্রত্যেতি, ন নাহমস্মীতি। যদি হি নাত্মাত্মত্বং প্রসিদ্ধ্যেৎ ন্যায় সর্ব্বলোকো নাহমস্মীতি প্রতীয়াৎ। ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য অ১—পা১—সূ১।

এবং শেষ আছে আত্মার যে পারমার্থিকী দৃষ্টি তাহা অবিনশ্বর উজ্জ্বল, এবং প্রকাশস্বরূপের ন্যায়। তাহা দ্রষ্টার স্বরূপভূত, তাহার অবলম্বন নাই, শেষও নাই ক্রিয়ার উপাধিভূত লৌকিকী দৃষ্টির সহিত সেই পারমার্থিকী দৃষ্টির সম্বন্ধ আছে। চক্ষু দ্বারা রূপ বিষয়ে যে লৌকিকী দৃষ্টি-ক্রিয়া করা হয়, তাহা সেই নিত্যা পারমার্থিকী আত্মার দৃষ্টির সহিত সম্বন্ধ, তাহারই ছায়া-স্বরূপ। তাহা দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াই যেন জগৎ বিনষ্ট হয়। দ্রষ্টার স্বরূপভূত পারমার্থিকী নিত্যা দৃষ্টি দ্বারা লৌকিকী দৃষ্টি ব্যাপ্ত। দ্রষ্টার অন্তর্ভূত সেই লৌকিকী দৃষ্টি দ্বারা দ্রষ্টাকে দেখা যায় না। দ্রষ্টার অন্তর্ভূত লৌকিকী দৃষ্টি রূপ-সম্বন্ধী, রূপেরই প্রকাশক। সেই লৌকিকী দৃষ্টির ব্যাপক, মনোবুদ্ধি সকলের ব্যাপক, সর্ব্বগত আত্মাকে লৌকিকী দৃষ্টি ব্যাপন করিতে পারে না, এজন্যই বলা হইয়াছে যে সেই সর্ব্বগত, দৃষ্টি-কার্য্যের দ্রষ্টা-স্বরূপ আত্মাকে দর্শন করা যায় না। আত্ম-বস্তুর স্বভাবই এইরূপ। এই কারণেই গবাদির ন্যায় আত্মা দেখান যায় না।"

আপনার যাজ্ঞবল্ক্য জনককে উপদেশ করিতেছেন: "পুরুষ বা আত্মা স্বয়ং জ্যোতিঃ (২) —অর্থাৎ স্বপ্রকাশ। তিনি বলিতেছেন, "আত্মা সুষুপ্ত কালে (৩, যে দেখে না—তখন দেখিয়াও দেখে না (Subconscious)। দ্রষ্টার দৃষ্টির বিপরিলোপ হয় না, কারণ তাহা অবিনাশী। কিন্তু তাহার দ্বিতীয় কেহ নাই যাহাকে তাহা হইতে ভিন্নরূপে দেখিবে।" ঘ্রাণ, আস্বাদন, শ্রবণ, মনন, স্পর্শন, এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এই কথা। "সুষুপ্তি কালে আত্মা যে জানে না, তখন সে জানিয়াও জানে না (নতুবা সুষুপ্তির স্মৃতি কিরূপে সম্ভব হইবে?) বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাতৃত্ব। বিপরিলোপ হয় না, কারণ তাহা অবিনাশী। তাহার দ্বিতীয় কেহ নাই যাহাকে তাহা হইতে ভিন্নরূপে জানিবে।"(৪) উষস্ত উদ্দালক তাঁহার উদ্দেশে বলিতেছেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, আর এই যে তৈজস আত্মাকেই স্বয়ং। আমরা উক্তরূপ জ্ঞান, তৈজসই যদি আত্মার স্বভাব হয়, তবে সে এক হইয়াও কিরূপে আত্ম-স্বভাব পরিত্যাগে কারণ বা অভিজ্ঞ হয়,—তৈজসাত্মস্বভাবতা এবং অজ্ঞানের কি বিরোধ? থাকার বিরোধ নাই। সুষুপ্তকালেও যে দেখে না তাহা নয়। কিন্তু সুষুপ্তকালে যে দেখে না, তাহা ত আমরা সকলেই জানি, কারণ চক্ষু মনাদি দর্শনের যে সকল করণ (যন্ত্র) তাহারা কোন কার্য্য করে না। দর্শন-শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিলেই আমরা বলি 'দেখে' বা 'শোনে'। অতএব সুষুপ্তিতে দেখে শোনে না। তাহা সত্য, দেখিয়া থাকে। কিরূপে? অগ্নির উষ্ণত্ব যতক্ষণ অগ্নি থাকে ততক্ষণ থাকে, আত্মার দৃষ্টিও সেইরূপ। আত্মা অবিনাশী, অতএব আত্মার দৃষ্টিও অবিনাশী। এ কথার বিরুদ্ধ কারণ দৃষ্টি দ্রষ্টারই ক্রিয়া। দ্রষ্টা দৃষ্টি করে, অতএব

(১) "অয়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি।" ২৪ ব্রাহ্মণ ৩য় অধ্যায় ৯ বৃহদারণ্যক।

(২) "বিজ্ঞানময়ঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ পুরুষঃ"। পূর্ব্বভাষ্য ৯ম পৃ-২ পঙ্ক্তি-১।

(৩) ইহারই পরিভাষা-স্বরূপ-প্রণালী। ইহারই ৩য় ব্রাহ্মণ ৩য় অধ্যায় ৯ বৃহদারণ্যক।

Compare "Substance of the soul unknowable" in Herbert Spencer's "Psychology."

দৃষ্টি কৃতক। সেই (কৃতক) দৃষ্টির বিনাশ হয় না, কিরূপে বলা যায়? সূর্য্যের প্রকাশকত্বের ন্যায়। আদিত্যাদি নিত্য-প্রকাশ স্বভাব হইয়া, যেমন তাহাদের নিজের স্বাভাবিক নিত্য-প্রকাশ দ্বারাই সকল বস্তু প্রকাশিত করে, সেইরূপ এই আত্মারও অবিপরিলুপ্ত-স্বভাব-সিদ্ধ দৃষ্টি আছে বলিয়াই তাহাকে দ্রষ্টা বলা যায়। আদিত্যের যে প্রকাশ-চক্ষু যেমন তাহাদের অক্লিষ্টমান নিত্য স্বাভাবিক প্রকাশ হইতেই উৎপন্ন, সেইরূপই দ্রষ্টার দৃষ্টিও তাঁহার অবিপরিলুপ্ত দৃষ্টি হইতে উৎপন্ন। ইহাতে বিরুদ্ধ কিছুই নাই। স্বপ্নকালে চক্ষু যদি উপরত হইলেও আত্মার দৃষ্টির অবিপরিলোপ দেখা যায়। অবিপরিলুপ্ত দৃষ্টি বা স্বয়ং-জ্যোতিঃ স্বভাব হেতু সুষুপ্তিকালেও আত্মা দেখে। তবে দেখে না বলা হয় কেন? দৃষ্টি ক্রিয়ার বিষয়ীকৃত, দ্রষ্টা হইতে পৃথক্‌রূপে বিভক্ত অন্য দৃষ্টির বিষয় কিছুই নাই, যাহাকে দেখিবে। পারিশেষ্য দ্রষ্টার বিশেষ দর্শনের জন্য পৃথক্‌রূপে করণ সকল স্থাপিত আছে। করণ সকলের অভাবে বিশেষ দর্শন হয় না। বিশেষ-দর্শন করণেরই কার্য্য, কেবল আত্মার কার্য্য নয়। তবে আত্মার কার্য্যের ন্যায়ই দেখায়।"

অনুমানাদি দ্বারা আত্মার সত্তা প্রতিপন্ন করা সম্বন্ধে প্রত্যুদ্যোত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটি উক্তির উল্লেখ করিতেছেন:—"মানং প্রমেয়তন্ত্রং মানং যে মানেন বুভুৎসন্তে। প্রদীপস্যেব করণং ন্যক্ষং বাধ্যন্তে তে মহান্ধবঃ।" "প্রমাণ ক্রিয়াতে বল সঞ্চার করে যে সাক্ষাৎ-জ্ঞান, সেই সাক্ষাৎ-জ্ঞানকে যাঁহারা প্রমাণ দ্বারা আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন,—সেই সকল মহাপণ্ডিতেরা ইচ্ছা করেন কি? না, ইন্ধন কাষ্ঠে দাহিকা শক্তি সঞ্চার করে যে অগ্নি, সেই অগ্নিকে ইন্ধন কাষ্ঠ দ্বারা দগ্ধ করিতে।"

শ্রীবিজয়দাস দত্ত।

ভুল।

সাগর তীরে বালুকা ঘিরে
বাঁধিনু যে ঘর,
কেমনে তবু রাখিবে প্রভু
মানিনু নাহি ডর।
উঠিল রবে ভাঙ্গন রবে
চলিয়া তুলি জল,
নিমেষ পাতে আপন সাথে
লইল মোরে তল।
অতল তলে সাগর জলে
পড়িয়া আজি হায়!
কাহারে স্মরি কেমনে তরি
কেমনে দিন যায়!
সাগর ঘরে শুকাবে তবে
পাইব আমি কূল,
ফিরিব ঘরে হেরিব ঘরে
আনার যত ভুল।
আজি এ আশা, অকূলে ভাসা
তবুও সীমা নাই,
বালুকা পরে কেহ যেন রে
না রচে গৃহ ভাই।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

অমর কবি শেলি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে অনেক বড় বড় কবি জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোল্‌রিজ্‌, সাদে, কীট্‌, বায়রণ্‌, শেলি ও কীট্‌স্‌ এই সাতজনই প্রধান। ইঁহারা সকলেই এক শ্রেণীভুক্ত এবং ইঁহাদের কবিতায় কতকগুলি সমান ধর্ম্ম পরিলক্ষিত হয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় তাঁহাদের উদ্দেশ্য এবং ধারণা (theory) লিখিয়া গিয়াছেন। মোটা-মুটি বলিতে গেলে ইঁহাদের সময়ের কবিতায় মানব এবং প্রকৃতির মধ্যে যে একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে সেইটারই ক্রমবিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

শেলি ১৭৯২ খ্রীঃ অব্দে সাসেক্সের অন্তর্গত ফিল্ড প্লেস্‌ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের উত্তরাধিকারী ছিলেন। শেলি এবং বায়রণের জীবনে অনেক মিল দেখা যায়। এই দুই বালা সুহৃৎ; উভয়েই উচ্চবংশসম্ভূত ছিলেন; উভয়েরই অল্পবয়সে মৃত্যু হয়; কেহই সংসারে সুখী হইতে পারেন নাই; এবং সারাজীবন দুঃখে কাটাইয়া ইতালী দেশে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করেন। দুই জনেই সারাজীবন প্রজার প্রতি রাজকর্ম্মচারীর নিষ্ঠুর অত্যাচার দমনে নিরত ছিলেন, এবং এই কারণে ইঁহারা বিদ্রোহী কবি আখ্যা পাইয়াছিলেন।

বাল্যকালে শেলি অতি কোমল স্বভাব এবং মেধাবী, কিন্তু কিঞ্চিৎ উগ্র মেজাজের বালক ছিলেন। স্কুলের বালকেরা তাঁহাকে "পাগল শেলি" বলিয়া ডাকিত। ইটনে অধ্যয়ন কালে তিনি বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার ভগিনীর সাহায্যে একখানি কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করেন। এখানি কোনো কাজের বইই হয় নাই। অবশ্যি ইহা এখনি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ইহার কোনো সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। এই সময়েই শেলি অতি অদ্ভুত রকম ঘটনা বিন্যাস করিয়া জাস্‌ট্রোজি (Zastrozzi) এবং সেণ্ট আরভাইন্‌ নামে দুই খানি উপন্যাস রচনা করেন। ইহা "মঙ্ক" লিউইস্‌ এবং মিসেস্‌ র‍্যাডক্লিফের ভূতুড়ে গল্পের অনুকরণে লিখিত।

১৮১০ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তথায় টমাস্‌ জগ্‌ নামে তাঁহার এক সহপাঠীর সহিত মিলিত হইয়া "নাস্তিকতার প্রয়োজন" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট প্রেরণ করেন। ইহার ফলে তিনি বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হয়েন। ইহাতে শেলি মনে খুব আঘাত পাইয়াছিলেন।

বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়া শেলি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার অভিপ্রায়ে লণ্ডনে গমন করেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি তাঁহার ভগিনীর সহপাঠী হ্যারিয়েট ওয়েষ্টব্রুক্‌ নামে এক বালিকার ভালবাসায় পতিত হন। হ্যারিয়েট সামান্য এক হোটেল ব্যবসায়ীর কন্যা, সুতরাং তাঁহার পক্ষে শেলির ন্যায় ব্যক্তির সহিত বিবাহ সৌভাগ্যের বিষয়ই ছিল। শুনা যায় হ্যারিয়েট নাকি একখানি পত্রে তাঁহার পিতামাতার নিকট হইতে তিনি

যে দুর্ব্যবহার পাইতেছিলেন তাহা বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শেলিকে অনুরোধ করেন। শেলি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন এবং এডিনবর্গে উভয়ের বিবাহ হয়। এই বিবাহে শেলির পিতা আপনাকে অপমানিত বিবেচনা করেন এবং পুত্রকে গৃহে স্থান দিবেন না এইরূপ বলেন।

বিবাহের পর কিছুদিন উভয়ে বেশ আনন্দেই ছিলেন এবং আয়ারলাণ্ড, ওয়েল্‌স্, ডেভনসায়ার, বার্কসায়ার, হ্রদপ্রদেশ ও অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই সময়ে শেলি রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা অদ্ভুত খেয়াল প্রকাশ করেন। একখানি বিদ্রোহসূচক পত্র ও একটী কবিতা রচনা করার ফলে তিনি ওয়েল্‌সে পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

১৮১৪ খ্রীঃ অব্দে অর্থাৎ বিবাহের পর তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই তিনি হ্যারিয়েটকে ত্যাগ করেন। অনেকে বলেন হ্যারিয়েটের চরিত্রদোষই ইহার কারণ। বাস্তবিক তাঁহার গৃহ অতি নিরানন্দ হইয়া পড়িয়াছিল—তাঁহার সুখের দিকে হ্যারিয়েটের দৃষ্টি ছিল না। হ্যারিয়েট তাঁহার সন্তানকে আদর যত্ন করিতেন না, এবং পত্নীর ব্যবহারের শেলির আর্থিক অবস্থাও নিতান্ত অসচ্ছল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আসল কথাটি এই যে শেলি ইতিমধ্যে মেরী গডউইন্‌কে হৃদয় দান করিতে আরম্ভ করেন।

মেরী গডউইনের পিতা রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে শেলির গুরু। তিনিই তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে স্ত্রীপুরুষ অবাধভাবে সমাজে বিচরণ ও আলাপ করিবে। তাহার

কন্যাকে লইয়া শেলির সুইজারলণ্ডে পলায়ন তাঁহারই শিক্ষার বিষময় ফল। দুই বৎসর পরে হ্যারিয়েট্ জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিলে পর শেলি মেরি গড্‌উইন্‌কে বিবাহ করেন। শেলি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়াই হ্যারিয়েট্ যে আত্মহত্যা করিলেন ইহা নাও হইতে পারে। অন্ততঃ হ্যারিয়েটের ব্যবহারে তাহা প্রকাশ পায় নাই; আর আত্মহত্যার সঙ্কল্প হ্যারিয়েটের মনে বরাবরই ছিল।

এই সময়টিই তাঁহার কবিজীবনের আরম্ভ। মেরি গড্‌উইনের সহিত বিবাহের পর তাঁহারা কিছু কাল স্যাবলোতে বাস করেন। ১৮১৬খৃঃ অব্দে তিনি "অ্যালাষ্টর বা নিভৃতের আত্মা" নামক কবিতায় তাঁহার আশ্চর্য্য কবিত্বের প্রথম পরিচয় প্রদান করেন। "অ্যালাষ্টর" কবিতায় মানব চিত্তের কোনো বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। অকপট ও পবিত্রচিত্ত কোন যুবক জগতে যাহা কিছু সুন্দর এবং মহৎ সেইরূপ কল্পনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রকৃতির ধ্যানে আত্মসমর্পণ করিলে তাহার কিরূপ অবস্থা ঘটে, কবি তাহাই দেখাইতেছেন। যতই সে জ্ঞান অর্জ্জন করে ততই তাহার জ্ঞানপিপাসা বাড়ে। বাহ্যিক জগতের সৌন্দর্য্য তাহার কল্পনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আরও কত প্রকার কল্পনা লইয়া আসে। মরীচিকার ন্যায় এই সকল কল্পনার অন্বেষণে দুঃখে নৈরাশ্যে অকালে তাহার জীবনের অবসান হয়।

তৎপরে প্রিন্স এথেনেস্, রোসালিণ্ড ও হেলেন এবং ইস্‌লামের বিদ্রোহ কবিতা গুলি প্রকাশিত হয়। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে তিনি জন্মের মত ইংলণ্ড ত্যাগ করেন। শেষ জীবনটুকু তিনি ইতালীতেই কাটান। বায়রন্ এবং লিহণ্টের ন্যায় সুহৃদের সহিত ফ্লোরেন্স, পিসা ও ইতালীর নানা নগর পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। এই সময়ে তিনি ছোট বড় অনেক কবিতা লিখিয়া যশোলাভ করেন।

'এডোনাইস্' সম সাময়িক কবি কীটসের মৃত্যুতে কবিবন্ধুর হইতে উত্থিত একটি শোকের উচ্ছ্বাস। শেলি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এডোনাইসের মৃত্যুর সময় কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ কোথায় ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রিয় পুত্রকে রক্ষা করেন নাই কেন?

"All he had loved, and moulded
in to thought,...
Lamented Adonais."

এডোনাইস্ যে সকল বস্তু ভালবাসিতেন, যাহাদের বিষয় কবিতা লিখিতেন, তাহারা সকলেই তাঁহার মৃত্যুতে শোকার্ত্ত। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রভাতের সূর্য্যকিরণে আর সে সৌন্দর্য্য নাই, বনফুলে আর সে সুগন্ধ নাই, মধুর বসন্তকালের আর সে শোভা নাই। বসন্ত যেন শোকে উন্মত্ত হইয়া নব প্রস্ফুটিত কুসুমের কোরকগুলিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। এই সময় কোয়ার্টারলি রিভিউতে কীটসের কবিতার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিল। শোক একটু প্রশমিত হইলে শেলি বলিতেছেন,—

"He is made one with nature."

এডোনেইসের আত্মা প্রকৃতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য আর শোকের

প্রয়োজন নাই। সংসারে যাহাকে আমরা সুখ মনে করি তাহা অশান্তি মাত্র। এডোনেইস্ এ সকল হইতে বহুদূরে শান্তি ধামে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ভোগ করিতেছেন।

শেলি তদানীন্তন ইংরাজ সমাজের যে সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, Ode to the West Wind কবিতাটির শেষে তাহার উল্লেখ আছে।

"If winter comes, can spring be far behind?"

শীতের পরেই বসন্তকাল আসে, এটা জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। অধঃপতিত (অবশ্য শেলির মতে) ইংরাজ সমাজেরও যে এই পাপের কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে নবযুগের সঙ্গে সঙ্গে পুণ্য সময় আসিবে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। ক্ষুদ্র বীজ যেরূপ বৃক্ষে পরিণত হয়, মেঘ বৃষ্টি যেমন ক্ষেত্রকে উর্ব্বর করিয়া তোলে, পবন যেরূপ সমুদ্রসলিলকে আন্দোলিত করে, সেইরূপ শেলির কবিতাও সমগ্র ইংলণ্ডকে সংস্কৃত করিয়া নবযুগের পুণ্য-মন্ত্র প্রচার করিবে—ইহাই সংক্ষেপে কবিতাটির অর্থ।

ইউগেনিয়ন পর্ব্বতে রচিত কবিতাটি ইতালীয় একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোরম বর্ণনা। এই দুঃখঘাতনাপূর্ণ মানবজীবনে সময়ে সময়ে আমরা প্রাকৃতিক শোভা হইতে আনন্দ পাই এবং তদ্দ্বারাই মানুষের নিষ্ঠুরতা অত্যাচার ভুলিয়া থাকি—এই ভাবই কবি বর্ণনা করিয়াছেন।

'Hymn to intellectual beauty' বা মানসিক সৌন্দর্য্যের প্রতি কবিতাটিও শেলির ক্ষুদ্র কবিতাগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ। কবি শৈশব হইতে মানসিক সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন। সৌন্দর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেছেন—

"Thus let thy power....
...to my onward life supply
Its calm."

"তুমি আমার জীবনে শান্তি আনিয়া দাও; আমি অশৈশব তোমারই পূজা করিতেছি, তোমা হইতেই আপনাকে সম্মান করিতে এবং সকল মানবকে স্নেহ করিতে শিখিয়াছি।"

"শেলি এবং প্রমিথিউস্ আনবাউণ্ড"ও বোধ হয় এই সময়ের লেখা। ১৮২২ খৃঃ অব্দে তাঁহার সকল কবিতা একত্র করিয়া মুদ্রিত করা হয়।

বিধাতা কিন্তু তাঁহার প্রিয় সন্তানগণকে অধিকদিন এ দুঃখক্লেশপূর্ণ জগতে রাখেন না। ঐ বৎসরেই জুলাই মাসে শেলি এক বন্ধুর সহিত নৌকায় 'লেগ্‌হর্ণ' যান। হঠাৎ প্রবল বাত্যায় নৌকাটি জলমগ্ন হয় এবং দশ দিন পরে শেলির মৃতদেহ সমুদ্রতীরে পাওয়া যায়। ১৮ই আগষ্ট তারিখে বায়রন্, লি হণ্ট ও, শেলির অন্যান্য বন্ধুগণ তাঁহার দেহ চিতায় ভস্ম করেন।

ইহাই সংক্ষেপে শেলির জীবন। তাহার চরিত্র সম্বন্ধে এ কথা বেশ বলা যায় যে সংসারের অভিজ্ঞতা তিনি কখনও লাভ করেন নাই, এবং সংসারের কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা তাহার হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া দিতে পারে নাই। মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি শিশুই ছিলেন। জীবনের দারিদ্র ও শুষ্কতায় কখনও বুঝিতেন না। দয়ার্দ্র চিত্ত এবং সকলের হিতৈষী হইলেও তিনি সংসারে অনভিজ্ঞতা-

বশতঃ কতকগুলি নিতান্ত নিষ্ঠুর কার্য্যও করিয়া গিয়াছেন। নরযুগের একজন প্রধান কবি, ধনীসন্তান, সুপুরুষ, ভীরু মেষশাবক, মধুর কোমল এবং উদারচিত্ত—এ সকলটি সত্ত্বেও তিনি নিজেই নিজের জীবনকে তাঁর শেলে গ্রথিত একগাছি নিরানন্দের মালায় পরিণত করিয়াছিলেন। জন্মাবধি তিনি কোন্ এক পবিত্র সুখ এবং সৌন্দর্য্যের ছায়া দেখিতেছিলেন তিনি সারা জীবনই সেই স্বপ্ন রাজ্যের অন্বেষণে কাটাইয়া ছিলেন। কল্পনা রাজ্যের এই আদর্শ তাহার বাস্তব জীবনের সহিত যে দ্বন্দ্ব বাধাইয়াছিল তাহাই তাঁহার জীবনের সাফল্যহীনতার কারণ। তিনি স্বয়ং যে সকল অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন সমাজকেও সেইরূপ অত্যাচারে জর্জ্জরিত মনে করিতেন।

"Sceptres, tiaras, swords, and
chains, and tomes
Of reasoned wrong, glozed on by
ignorance."

রাজদণ্ড, রাজমুকুট, সৈন্যসামন্ত, কারাশৃঙ্খল এবং রাজনীতি এ সকল তাঁহার মতে অত্যাচারের কৌশল মাত্র। আইনের দোহাই দিয়া অত্যাচারকে যুক্তিদ্বারা সুবিচার এবং সুশাসন প্রতীয়মান করা হয় ইহাই শেলির বিশ্বাস। কতকগুলি জিনিষ শেলি অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন,—

That common, false, cold, hollow,
talk
Which makes the heart deny the
'yes' it breathes."

আমাদের সভ্যজগতে লোকের আচার ব্যবহার সরল বা অকপট নহে। তাহাদের "মুখে মধু, হৃদে তথু গরল" হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া না চলিলে সভ্য জগতে মেশা যায় না। এই সকল ধারণার ফলে তিনি সমাজকে ব্যাধিগ্রস্ত আকারেই দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, সে ব্যাধির একমাত্র ঔষধ, পৃথিবীকে স্বর্গ —তাঁহার কল্পনার আদর্শলোক—পরিণত করিবার একমাত্র উপায়—প্রচলিত সকল নীতি নীতি উঠাইয়া দেওয়া। তিনি প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী হইয়া ভ্রাতৃভাব, সাধারণ তন্ত্র, সাম্যভাব এবং নাস্তিকতা প্রচার করেন। বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত, পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। নিজের সন্তানের ভার গ্রহণে পর্য্যন্ত অক্ষম বিবেচিত হন। কল্পনার উচ্চ আদর্শের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি এরূপ দৃঢ় নিবদ্ধ ছিল যে সংসারের আর কোনো দিকে তিনি দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই, প্রতি পদেই তাঁহাকে ঠেকিতে হইয়াছে। মানবজীবন সম্বন্ধে যে পরিমাণ জ্ঞান কবিগণের থাকা উচিত তাহা তাঁহার ছিল না। তাঁহার কবিতার চাতকপক্ষীর ন্যায় তাঁহার নিজের চিত্তও সংসারের বাস্তবিকতা হইতে অনেক উচ্চে থাকিত। কাব্যে তিনি যখন চরিত্র বা বাস্তব ঘটনা অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিতেন তখন তাহা অবাস্তব এবং অসম্ভব হইয়া পড়িত, যেন সে চরিত্র এ জগতের নহে অন্য কোনো কল্পনা রাজ্যের। শেলির জগৎ এবং আমাদের এই জগত এক নহে, তাঁহার কল্পনারাজ্য এ জগতের সম্পূর্ণ বাহিরে।

প্রকৃতিদেবীই এরূপ চিত্তের এক মাত্র সান্ত্বনা। সমাজবন্ধনের মধ্যে থাকা অপেক্ষা

অবশ্যে বা সমুদ্রতীরে, কোনো বিশাল প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে শেলি অধিক আনন্দ পাইতেন। পর্ব্বতশোভা, মেঘযুক্ত বা শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রগুলি তাঁহার নিকট যেন সচেতন বলিয়া প্রতীয়মান হইত এবং মানবের সংসর্গ অপেক্ষা এইগুলির সংসর্গে তিনি অধিক সুখী হইতেন। উষার কিরণস্পর্শে জগত পুলকিত হইয়া উঠিলে আমার মনেও পুলকের সঞ্চার করিত। সমুদ্রের ঢেউগুলি আপনমনে কাঁপিতে কাঁপিতে নাচিত এবং কবির প্রাণকেও নাচাইয়া তুলিত। শেলি জীবনের অনেক অংশ নৌকায় নদীবক্ষে কাটাইয়াছিলেন—। টেম্‌স্ নদীর উপর, জেনেভা হ্রদের উপর এবং ইতালীর নদীর উপর তাঁহার দিন কাটিত। নির্জ্জন নিস্তব্ধ স্থান তিনি ভাল-বাসিতেন। তাঁহার কবিতায় যে একটী বিষাদের ছায়া পরিলক্ষিত হয় ইহার সাহত তাহার যোগ আছে। তাঁহার কবিতায় আছে,—"Our sweetest songs are those that tell of saddest thought."

শেলির গীতিকাব্য গুলিই তাঁহার রচনার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। তাঁহার জীবনটীই গীতের উচ্ছ্বাস। কোন এক বিখ্যাত সমালোচক বলিয়াছেন যে মিষ্টতা বা মধুরতাই কবিতার প্রধান গুণ। আমার বোধ-হয় শেলির কবিতার ন্যায় মধুর কবিতা ইংরাজী সাহিত্যে আর কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁহার কবিতায় এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় মাদকতা আছে যাহা আমাদিগকে মোহিত করিয়া ফেলে। এটি কোল্‌রিজ্ এবং ব্লেক্ ভিন্ন অন্য কোনো ইংরাজ কবিতে বড় পরিলক্ষিত হয় না। বস্তুত শেলির কবিতায় ভাব কিম্বা অর্থসম্পদ তত বেশী নাই মধুরতা যত আছে; কোনো কোনো স্থলে অর্থ অনিশ্চিত ও জটিল। এই বিষয়ে "ফেয়ারি কুইন" রচয়িতা স্পেন্সারই শেলির একমাত্র তুলনা। কবিতাপাঠে আনন্দ এবং সান্ত্বনার নিমিত্ত— ইহা উপভোগ করিবার সামগ্রী। শোকতাপময় সংসারের ঝঞ্ঝাঘাতে যখন আমাদের হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠে তখন কবিতাপাঠে আমরা শান্তিলাভ করি। সে সময়ে শেলি ও স্পেন্সারকে আমাদের অন্তরের বন্ধু বলিয়া মনে হয়। এ হিসাবে স্পেন্সারে এবং শেলি যথার্থ কবি। অনেক সমালোচক বলেন যে শিক্ষাদানেই কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু সারগর্ভ নীতি শিক্ষা দিতে গেলে কবিতার সৌন্দর্য্যের প্রতি অর্থাৎ যথার্থ কবিত্বের প্রতি, দৃষ্টি রাখা চলে না। তাহা হইলে নীতিদর্শন এবং কবিত্বে প্রভেদ কি?

কবি সম্বন্ধে শেলির ধারণা তিনি নিজের কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে কবির সৃষ্টি বাস্তব অপেক্ষাও সত্য। কবি যে সকল চরিত্র অঙ্কিত করেন সে গুলিকে শেলি বলিয়াছেন,—

"Forms more real than living man,
Nurslings of immortality."

অর্থাৎ প্রকৃত মানব অপেক্ষাও অধিকতর বাস্তব, কারণ সেগুলি অমর। মানুষ মৃত্যুর অধীন; আজ আছে, কাল নাই। কিন্তু সেক্সপীয়রের নির্ম্মিত হ্যামলেট্ বা ক্লিওপেট্রা অমর; জগতে যতদিন সাহিত্যচর্চ্চা থাকিবে, এ সকল চরিত্রও ততদিন জীবিত থাকিবে।

শেলির কবিতা তাঁহার জীবনের ঘটনার সহিত বিশেষভাবে জড়িত; কাব্যে তাঁহার

নিজের উচ্চ আশা এবং তার সকল বাক্য আছে। কবি শেলি ইংরাজী সাহিত্যে একটি নূতনত্ব আনয়ন করিয়াছিলেন—সেটি আদর্শের ভাব বা কল্পনার ক্ষমতা। কবিতার অঙ্গে সেটি মাখানো থাকে;—যে ধরিতে পারে সেই পায়। অন্তরে শ্রদ্ধা থাকিলে তবেই সেটিকে পাওয়া যায়। সমালোচকেরা সেইজন্য আর সমস্তই দেখেন, কেবল এইটি হইতে বঞ্চিত হন। তাঁহারা একটী পুষ্পকে খণ্ডে খণ্ডে ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ দেখার ন্যায় কবিতাকেও ব্যবচ্ছেদ করিয়া যে সৌন্দর্য্যটুকু তাহার সর্ব্বাঙ্গে মাখানো ছিল তাহা নষ্ট করিয়া ফেলেন।

শেলির কবিতায় এমন একটু সৌন্দর্য্য আছে সেটুকু ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার কবিতা পাঠ করিলে তাহার ভাবটুকু স্মৃতিতে অনেকক্ষণ থাকে।

"Music when soft voices die
Vibrates in the memory"

এই সুন্দর ভাবটি শেলির কবিতায় অনেকবার পাওয়া যায়। শব্দ থামিয়া গেলেও বীণার তন্ত্রীর যেমন স্মৃতি মধ্যে দুলিতে থাকে, শেলির কবিতারও ঠিক সেইরূপ গুণ আছে—যাহাতে কবিতার সৌন্দর্য্যটুকু সহজে নষ্ট হয় না।

আর্ট হিসাবে ধরিতে গেলে শেলির কতকগুলি দোষ পরিলক্ষিত হয়। ভাষার জটিলতা অস্পষ্টতা, বর্ণনাশক্তির অভাব এবং বাস্তবঘটনার প্রতি দৃষ্টিহীনতা—এইগুলিই তন্মধ্যে প্রধান। তাঁহার কল্পনা সুন্দর বটে, কিন্তু উষার স্বপ্নের অপরূপা আভাসমূর্ত্তির ন্যায় তাহা অতি অস্পষ্ট। ক্ষণিক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সময়ে সময়ে অনেক লিখিয়া ফেলিতেন এবং এই অধৈর্য্যতাই তাঁহার কবিতার স্থানে স্থানে এক আধটু অপরিপক্কতা আনিয়া দেলিয়াছে। কবি নিতান্ত যুবা ছিলেন; এবং সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার যুবাহৃদয়ের চিন্তাগুলিও লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহার কবিতা সমালোচন করিবার সময় একথাটিও মনে রাখা আবশ্যক।

শেলির সমসাময়িক কবি কীটসের মৃত্যুতে তিনি "এডোনাইস্" নামে যে শোকগাথা রচনা করেন তাহার শেষ কয়েক পঙ্‌ক্তিকে তিনি নিজের সমুদ্রগর্ভে মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস দিয়া গিয়াছেন,—

"The breath whose might I have
invoked in song
Descends on me; my spirit's
bark is driven
Far from the shore," ইত্যাদি

এইটি একটি অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে তাঁহার কবিতায় অনেক স্থলে তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী দেখা যায়। "নেপ্‌ল্‌সের নিকট বিষণ্ণচিত্তে লিখিত (Written in dejection near Naples) কবিতায় শেলি বলিতেছেন—

"Till death like sleep might steal on me."

তাঁহার মৃত্যু মহানিদ্রার ন্যায় হইবে, কোনো জ্বালা যন্ত্রণা থাকিবে না—এরূপ একটা ধারণা শেলির মনে বরাবরই ছিল। অ্যাডোনাইস কবিতাতেও এইরূপ ভাব ব্যক্ত আছে।

শেলি তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলিতেই নিজের কবিত্বের প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন।

আরিথিউসা, Invitation, Recollection প্রভৃতি কবিতাগুলি অতি মধুর। 'চাতকের প্রতি' কবিতাটি বর্ণনার চাতুর্য্যে, কল্পনার প্রাচুর্য্যে এবং ভাষার মাধুর্য্যে ইংরাজী গীতি-কাব্যের মধ্যে প্রায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। চাতক পক্ষী যখন আকাশে উড়িতে থাকে কবির মনে হয় যেন কোনো অশরীরী আনন্দের উৎস সূর্য্যের দিকে উঠিতেছে। কবির উপমা কয়টি অতি সুন্দর! —"কবি যেরূপ নিজের কল্পনার মধ্যেই ডুবিয়া থাকে এবং আপন মনে গান রচনা করে, গোলাপ যেমন সবুজ পাতার মধ্যে লুকাইয়া চারিদিকে সৌরভ ছড়াইয়া দেয়, সেইরূপ এই পক্ষীও বৃক্ষের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া থাকে কেহ দেখিতে পায় না অথচ মধুর গানে চতুর্দ্দিক মাতাইয়া তুলে।" কবি বলিতেছেন—

"We look before and after
And pine for what is not."

কবির নিজের জীবনেও আমরা এইরূপ একটা অনিবৃত্ত আকাঙ্ক্ষা দেখিয়াছি! এই আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার জীবনের সাফল্যহীনতার কারণ।

"Love's philosophy" নামক মধুর কবিতাটি প্রবন্ধের প্রবাহ বাবু অনুযায়ী করিয়া সুপরিচিত করিয়াছেন।

"প্রমিথিয়াসের মুক্তি" নামক গীতি নাটক প্রকাশের পরই কবি শেলি যশস্বী হইয়া উঠেন। ইহা হইতেই লোকে প্রথম বুঝিতে পারে যে ইংলণ্ডে একজন প্রধান কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। গ্রন্থের নাম এত বড় গ্রন্থখানি প্রকাশ হওয়ার পর তাহার সেরূপ আদর হয় নাই। অনেকে বিদ্রূপচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে "আন্‌বাউণ্ড" নামটি ঠিকই দেওয়া হইয়াছে কারণ এরূপ পুস্তক কে বাঁধাইয়া রাখিবে? এইরূপ বিদ্রূপাত্মক সমালোচনায় শেলি অত্যন্ত ব্যথা পাইয়াছিলেন। গ্রীক নাটক হইতে ইহার বর্ণনীয় বিষয়টী লওয়া হইয়াছিল। 'ঈস্‌কাইলাস্' "প্রমিথিয়াসের বন্ধন" নামক কাব্যের উপসংহারে। ইহাতে অত্যাচারী জুপিটারের সহিত প্রমিথিয়াসের মিলন দেখাইয়া যান। শেলির কাব্যে জুপিটার মানবের উৎপীড়ক, এবং প্রমিথিয়াস্ মানবের সহায় ও উদ্ধারকর্ত্তা। জুপিটারের সকল অত্যাচারই প্রমিথিয়াস্ নীরবে সহ্য করিলেন; কিন্তু অবশেষে এমন এক সময় আসিল যখন অত্যাচারী জুপিটারের রাজত্ব শেষ হইল, মানবের উন্নতির পথে আর কোনো বাধা রহিল না; শান্তি এবং স্বাধীনতার নবযুগ আরম্ভ হইল; শাসকের নিষ্ঠুর দণ্ড কোথায় খসিয়া পড়িল; মানব মানবকে ভ্রাতার চক্ষে দেখিতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে সাম্য এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইল। মানব-জাতির সেই পরিপূর্ণ মুক্ত অবস্থার কথাই এই কাব্যের বর্ণিত বিষয়।

শেলি তাঁহার সময়ের কবিগণের সহিত মিলিয়া নবযুগের নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সেক্সপীয়রের ন্যায় মানবচরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিলনা বা টেনিসনের ন্যায় তিনি কবিতায় দার্শনিক মতও প্রচার করিয়া যান নাই, কিন্তু নবযুগের কবিগণের মধ্যে তাঁর সাহিত্যকে যে একটি নূতনভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তাহার গতি একটি বিশেষ দিকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। (শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্, এ।)

চরণ।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

কপিলবস্তু।

এই প্রদেশ প্রায় ৯০০০ লি। এর দশটী জনস্থান খুব, পরিত্যক্ত নগরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজধানীও জনশূন্য; কেবল ভগ্নাবশেষ মাত্র রহিয়াছে। রাজধানীর পরিধি নির্দ্ধারণ করা যায় না। নগরপ্রাচীরযুক্ত রাজপ্রাসাদ প্রায় ১৪।১৫ লি। রাজপ্রাসাদ ইষ্টকনির্ম্মিত দেখা। প্রাচীরের ভিত্তি সকল বর্ত্তমানের দৃঢ় ও উচ্চ। অনেককাল হইতে রাজপ্রাসাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। অধিবাসী-পূর্ণ নগরের সংখ্যা অত্যল্প।

এদেশে কোন প্রধান শাসনকর্ত্তা নাই; প্রত্যেক নগর নিজ নিজ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করে। ভূমি চর্ষিত ও আবাদের যোগ্য। শস্যবীজ যা কর্ষণ করা হয়। জলবায়ু সকলই একরূপ, অধিবাসী কোমল প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং ধর্ম্মানুরাগী। আজ সহস্রাধিক সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে, রাজপ্রাসাদের সন্নিকটস্থ সঙ্ঘারামে এখনও হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত তিন শতের অধিক যতি বাস করেন।

কয়েকটী দেব মন্দিরে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ পূজা করে। রাজপ্রাসাদের মধ্যে কয়েকটী প্রাচীরের ভিন্ন ভিন্ন ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এই সকল স্থান তথাগতের ভ্রমণের স্মরণের চিহ্ন। ইহাদের উত্তরপশ্চিম বিভাগে রাজার মূর্ত্তি আছে। অনতিদূরে আর একটী ভগ্নাবশেষ দেখা যায়—এই স্থানে রাজা মহামায়ার শয়নাগার ছিল। এই ভগ্নাবশেষের চতুষ্পার্শ্বে একটী বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজার মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। নিকটেই একটী বিহার; এই স্থানে বোধিসত্ত্ব মহা মায়ার গর্ভে অপরাহ্ণ অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিহারে এই দৃশ্যের একটী চিত্র আছে। অবলোকিতেশ্বর সম্প্রদায়ের মতে বোধিসত্ত্ব উত্তরোত্তর দেবের রূপে অবতরণ করিয়াছিলেন। আমাদের মতে ইহা পঞ্চম মাসের পঞ্চদশদিবস। অন্যান্য সম্প্রদায় এখানের ত্রয়োবিংশ দিবসে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছে বলেন। তাহা হইলে আমাদের মতানুসারে পঞ্চম মাসের অষ্টমদিবসে বোধিসত্ত্ব অবতরণ করিয়াছিলেন বলিতে হইবে।

প্রাসাদের যে স্থানে এই দৈব গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল তাহার উত্তর পূর্ব্বদিকে একটী স্তূপ রহিয়াছে। এই স্থানে অসিত ঋষি রাজপুত্রের কোষ্ঠি বিচার করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব যে দিবস অবতরণ করেন, সেই দিবস অনেকগুলি শুভ ঘটনা ঘটিয়াছিল। রাজা শুদ্ধোদন সকল ব্রাহ্মণকে একত্রিত করিয়া তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আজি নিশুত শুভাশুভ আমাকে পরিষ্কার করিয়া নির্দ্দেশ করুন।" তাঁহারা উত্তর করিলেন "পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতিষের নির্দ্ধারণ অনুসারে এই বালকের চিহ্ন সকল অত্যন্ত শুভ সূচনা করিতেছে। যদি এই শিশু সংসারে থাকেন, তবে ইনি চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন; যদি ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তবে ইনি বুদ্ধ হইবেন।"

এই সময়ে ঋষি অসিত অদূর হইতে আগমন করিয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশের প্রার্থনা করিলেন। রাজা সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে সত্বর হইলেন এবং তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া সুখাসনে উপবেশন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; পরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেবতা কারণে অবশ্যই মহা ঋষি এই স্থানে উপস্থিত হন নাই।" ঋষি উত্তর করিলেন "আমি দেবতা বিশেষ আদেশে বিশ্রাম করিতেছিলাম; এমন সময় দেখিতে পাইলাম যে অবলোকিতেশ্বর আকাশে নৃত্য করিতেছেন। এইপ্রকার অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা উত্তর করিলেন" মহারাজ, অদ্য শুদ্ধোদনের সাক্ষাৎপত্নীর রাজা শুদ্ধোদনের প্রথমা মহিষী মায়ার গর্ভে যে রাজপুত্র অবতরণ করিয়াছেন তিনি সত্য

বিদায় পাইবেন।" এই কথা শুনিয়া আমি রাজপুত্রকে দর্শন করিবার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমার দুর্ভাগ্য এই যে, আমার বৃদ্ধাবস্থার জন্য আমি ইহাকে দেখিতে পাইব না।"

নগরের দক্ষিণ দ্বারদেশে একটী স্তূপ আছে। এইস্থানে রাজপুত্র অন্যান্য শাক্যকুমারগণের সহিত প্রতিযোগিতায় হস্তীকে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সুকুমার ও যাদোমতিমার রাজকুমারের কেহই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। এই সময়ে মহারাজ শুদ্ধোদন সমবেত জনমণ্ডলীর অভিনন্দন গ্রহণ করিয়া নগরে প্রত্যাবর্ত্তনকালে, সারথী ঐ হস্তীকে লইয়া নগর বহির্গত হইতেছিল। দেবদত্তও সেই সময়ে নগর প্রবেশ করিতেছিলেন; তিনি সারথীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে কে আরোহণ করিবে?" সারথী উত্তর করিল "রাজপুত্র এখনই প্রত্যাগমন করিবেন এবং তাঁহার জন্যই আমি এই হস্তী লইয়া যাইতেছি। দেবদত্ত উত্তেজিত হইয়া তাহার কপোলদেশে আঘাত ও তাহার উদরে পদাঘাত করিয়া হস্তীকে ভূপাতিত করিয়া রাজপথে গতায়াত বন্ধ করিলেন। হস্তীকে অপসারণে অক্ষম হইয়া পথিকগণ সেইস্থানে দণ্ডায়মান রহিল। পরে নন্দ ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া হস্তীর হত্যাকারীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পথিকগণ উত্তর করিল "ইহা দেবদত্ত কর্ত্তৃক হইয়াছে।" নন্দ হস্তীকে পথের এক পার্শ্বে স্থানান্তরিত করিলেন। পরে রাজপুত্র তথায় উপস্থিত হইয়া কে এই গর্হিত কার্য্য করিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা উত্তর করিল "দেবদত্ত ইহাকে হত্যা করিয়া ইহা দ্বারা নিরয়দ্বার রোধ করিলেন এবং নন্দ ইহাকে পথিপার্শ্বে স্থাপন করিয়াছেন।" রাজপুত্র হস্তীকে উত্তোলন করিয়া নগর প্রাকারের অপর পার্শ্বে নিক্ষেপ করিলেন। হস্তীর পতনস্থানে গভীর ও প্রশস্ত খাল হওয়াতে ঐ স্থানের নাম "হস্তীগহ্বর" হইয়াছে।

নিকটস্থ বিহারে রাজপুত্রের মূর্ত্তি আছে। ইহার নিকটেই অন্য একটী বিহার; ইহাই রাজপুত্র ও তাঁহার পত্নীর শয়নাগার ছিল। ইহার অভ্যন্তরে স্বর্ণোজ্জ্বল ও রাগরঞ্জিত প্রতিকৃতি আছে। রাজ্ঞীর কক্ষের নিকটস্থ বিহারে শিশুর শিক্ষাগুরুদের চিত্র আছে। এই স্থানেই রাজপুত্রের পাঠশালা ছিল।

নগরের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে একটী বিহারে রাজপুত্রের শেত ও তেজস্বী অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি আছে। এই স্থানেই তিনি নগর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। নগরের চারি সিংহদ্বারের প্রত্যেকের বহির্ভাগস্থিত বিহারে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত, মৃত ও শ্রমণের মূর্ত্তি আছে। এই সকল স্থানে রাজপুত্র ভ্রমণ কালে, নানারূপ চিহ্ন দেখিয়া পৃথিবীর প্রতি বিরক্ত হইয়া গৃহ প্রত্যাগমনের জন্য নিজ সারথীকে আদেশ দিয়াছিলেন।

নগর হইতে প্রায় পঞ্চাশ লি দক্ষিণে যাইয়া আমরা একটী প্রাচীন নগরস্থ স্তূপে পৌঁছি এই স্থানে কাশ্যপবুদ্ধ তত্রত্যলোকে অমৃতপ্রদান করিয়াছিলেন। নগরের দক্ষিণ দিকে অল্প একটী স্তূপ আছে; এই স্থানেই, তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। নগরের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে একটী স্তূপে বুদ্ধদেবের শরীর চিহ্ন আছে; ইহারই সন্নিধানে ৩০ ফুট উচ্চ একটী প্রস্তরস্তম্ভের উর্দ্ধদেশে একটি সিংহমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। নিকটেই তাঁহার নির্ব্বাণের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। ইহা রাজা অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কাশ্যপবুদ্ধ যে নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তথা হইতে ২০লি উত্তরপূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া আমরা একটী প্রাচীন নগরে উপস্থিত হই, এই স্থানে একটী স্তূপ আছে। তত্রত্যলোকে যখন অনুযোন পরমায়ু ৪০ সহস্র বৎসর তখন কনকমুনি বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন; এই জন্মস্থান চির স্মরণীয় করিবার জন্য স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। নগরের উত্তরপূর্ব্বদিকে আর একটী স্তূপ আছে। এই স্থানেই তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। উত্তর দিকে কিঞ্চিৎ দূরস্থ একটী স্তূপে তাঁহার শরীরের অবশিষ্ট রক্ষিত আছে, ইহার সম্মুখে প্রস্তরস্তম্ভের

উপর একটী সিংহমূর্ত্তি আছে; ইহা প্রায় ২০ ফুট উচ্চ। এই স্তম্ভে তাঁহার নির্ব্বাণ সংক্রান্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ইহা রাজা অশোক নির্ম্মিত।

নগরের প্রায় ৪০ লি উত্তর পূর্ব্বে একটী স্তূপ আছে। রাজপুত্র এই স্থানে উপবেশন করিয়া কপিলাবস্তুর দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়াছিলেন। রাজা শুদ্ধোদন ধ্যানমগ্ন উপবিষ্ট রাজপুত্রকে দেখিতে পাইয়া লক্ষ্য করিলেন যে যদিও সূর্য্যরশ্মি তাঁহার চতুর্দ্দিকে কিরণ বিস্তার করিতেছে, তথাপি বৃক্ষের ছায়া স্থির রহিয়াছে; রাজপুত্রের ঐশ্বরিক ক্ষমতা দেখে, তিনি তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইলেন।

রাজধানীর উত্তরপশ্চিমাংশে শাক্যবংশীয় ব্যক্তিগণের হত্যার নিদর্শন শত সহস্র স্তূপ। বিরুদ্ধকরাজ শাক্যগণকে পরাজিত করিয়া ঐ বংশীয় ৯৯০০ অযুত ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া, তাহাদের হত্যার আদেশ দিলেন। তাহাদের দেহগুলি স্তূপাকার করা হইয়াছিল এবং হ্রদসমূহে তাহাদের রক্ত সংগৃহীত হইয়াছিল। দেবতাগণ মনুষ্যের করুণায় উদ্রেক করিয়া তাহাদের অস্থি সংগ্রহ করিয়া সমাধি দিয়াছিলেন।

নগরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ৪টী স্তূপ। এই স্থানে চারি জন শাক্য একদল সৈন্যকে পরাভূত করিয়াছিলেন। যখন প্রসেনজিৎ সিংহাসোহণ করিলেন, তখন তিনি শাক্যবংশের সহিত বিবাহ বন্ধনে ইচ্ছুক হইলেন। শাক্যগণ তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া ভৃত্যকন্যার সহিত বিবাহ দিয়া ও তাহাকে প্রচুর পরিমাণে যৌতুক দিয়া প্রসেনজিৎকে প্রতারণা করিলেন। প্রসেনজিৎ তাঁহাকে পাটরাণী বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং এই রাণীর গর্ভেই বিরুদ্ধকরাজ জন্মগ্রহণ করেন। বিরুদ্ধকরাজ তাঁহার মাতুলগণের উপদেশানুযায়ী পাঠাভ্যাস করিতে তথায় গমন করেন নগরের দক্ষিণাংশে উপস্থিত হইয়া, তিনি তথায় উপাসনা গৃহ দেখিয়া রথের গতি নিবারণ করেন। শাক্যগণ এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে দূরীভূত করিয়া বলে "কি প্রকারে নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তুই শাক্যগণের নির্ম্মিত বুদ্ধের আবাস স্থল অধিকারে সাহসী হইয়াছিস্।"

বিরুদ্ধক সিংহাসনারোহণ করিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছুক হইলেন এই উদ্দেশ্যে তিনি সৈন্যসংগ্রহ করিয়া নিজ সৈন্য দ্বারা এই সকল স্থান অধিকার করিলেন। চারি জন শাক্য জল নিষ্কাষণ প্রণালীর মধ্যস্থ স্থানে কর্দ্দমে নিমুক্ত ছিল; তাহারা তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণের গতিরোধ করিল এবং তাহাদের দূরীভূত করিয়া নগর প্রবেশ করিল। অন্যান্য শাক্যবংশীয়গণ নিজেদের পূর্ব্ব পুরুষোচিত ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া উহারা যে আক্রমণকারীগণকে প্রতিরোধ করিয়াছে, এই অপরাধে উপরোক্ত চারি জন শাক্যকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিল। এই চারিজন শাক্য তুষার পর্ব্বতে গমন করে। একজন বারিয়ান, দ্বিতীয় উজ্জয়ন, তৃতীয় দ্বিরদাল চতুর্থ কৌশম্বীর অধিপতি হইয়াছিলেন। ইঁহাদেরই বংশধরগণ বংশপরম্পরায় এই সকল স্থানে রাজত্ব করিতেছেন।

নগরের ১.৫ লি দক্ষিণে ন্যগ্রোধবৃক্ষের মূলে রাজা অশোক নির্ম্মিত একটী স্তূপ আছে। শাক্য তথাগত শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া নিজদেশে প্রত্যাগমন করিয়া এই স্থানে পিতার সহিত মিলিত হইয়া নিজধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তথাগত মায়াকে পরাজিত করিয়াছেন এবং ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে নিজধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছেন এই সংবাদ অবগত হইয়া শুদ্ধোদন তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন; এই উদ্দেশ্যে তিনি তথাগতের নিকট দূতমুখে সংবাদ প্রেরণ করেন যে "পূর্ব্বে তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবে। কিন্তু এইক্ষণও তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর নাই। এইক্ষণ আমাকে দর্শন দেওয়া তোমার উচিত।" বুদ্ধদেব এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া উত্তর করিলেন যে, সাত দিবস পরে তিনি প্রত্যাগমন করিবেন। দূত রাজার নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, শুদ্ধোদন প্রজাগণকে রাজপথ সুসজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। পরে নিজ অমাত্যবর্গ সহ, নগর হইতে ৪০ লি অগ্রসর হইয়া রথ

হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বৃক্ষের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তথাগত বহুসংখ্যক লোকসহ তথায় উপস্থিত হইলেন। ৮ জন মহাপাপি তাঁহার শরীর রক্ষকস্বরূপ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল; স্বর্গের চারি জন রাজা তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিলেন। ইন্দ্ররাজ বহুসংখ্যক কামলোকের দেবতাসহ তাঁহার বামপার্শ্বে এবং ব্রহ্মরাজ বহুসংখ্যক রূপলোকের দেবতাসহ তাঁহার দক্ষিণে গমন করিতেছিলেন। তারাগণ মধ্যে যেরূপ চন্দ্র শোভা পান, সেইরূপ ভিক্ষুগণমধ্যে বুদ্ধদেব একাকী অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার অনৈসর্গিক ঐশ্বরিক ক্ষমতা ত্রিভুবন কম্পিত করিতেছিল; তাঁহার শারীরিক জ্যোতি সূর্য্য, চন্দ্র ও পঞ্চগ্রহের কিরণকে পরাজিত করিতেছিল। এই প্রকারে তিনি আকাশে বিচরণ করিতে করিতে যথেথে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও অমাত্যবর্গ তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তাঁহারা এই ন্যাগ্রোধকুঞ্জে বাস করিতে লাগিলেন।

সঙ্ঘারামের পার্শ্বেই একটী স্তূপ; এইস্থানে তথাগত এক বৃক্ষমূলে পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশনাবস্থায় নিজ পিতৃব্যের নিকট হইতে সুবর্ণখচিত কষায় বেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একটু দূরেই আর একটি স্তূপ; তথাগত এই স্থানে রাজার আট পুত্র ও পাঁচশত শাক্যকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। নগরের পূর্ব্ব দ্বারের মধ্যে, রাজপথের বামপার্শ্বে একটী স্তূপ আছে; এই স্থানে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ ব্যায়ামশিক্ষা করিতেন।

বহির্ভাগে ঈশ্বরদেবের মন্দির। মন্দির মধ্যে প্রস্তর নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি। সদ্যোজাত রাজপুত্রকে এই মন্দিরেই আনয়ন করা হইয়াছিল। রাজা শুদ্ধোদন রাজপুত্রকে ধর্ম্মাভিলাষে লুম্বিনী উদ্যান হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। রাজা এই মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন "এই মন্দিরে অনেক অত্যাশ্চর্য্য ঐশ্বরিক ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। শাক্যবংশীয় শিশুগণ যাহারাই আশ্রয় প্রার্থনা করেন, তাঁহারাই এখানে আশ্রয় পাইয়া থাকেন। সুতরাং আমরা রাজপুত্রকে মন্দির মধ্যে লইয়া দেবপূজা করিব।" এই সময়ে ধাত্রী শিশুসহ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলে মন্দিরস্থ দেবতা উত্থান করিয়া রাজপুত্রকে প্রণাম করিলেন। রাজপুত্রকে স্বস্থানস্থিত করিলে, দেবতা পুনরায় উপবেশন করিলেন।

নগরের দক্ষিণ দ্বারের বহির্ভাগে রাজপথের বাম পার্শ্বে একটী স্তূপ। রাজপুত্র এইস্থানে শাক্যগণকে ব্যায়ামক্রীড়ায় পরাস্ত ও লৌহনির্ম্মিত ঢালে তীর বিদ্ধ করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে ৩০ লি দক্ষিণপূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র স্তূপ আছে। এই স্থানে একটী উৎসের জল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। রাজপুত্রের তীর ঢালনে করিয়া এই স্থানে পর্ব্বত ও মৃত্তিকা ভেদ করিয়া জলের উৎস সৃষ্টি করিয়াছিল। লোকপরম্পরা ইহাকে শরকূপ বলে। পীড়িত ব্যক্তিগণ এই জল পান করিয়া আরোগ্য লাভ করে। এবং সেইজন্য দূর দেশাগত ব্যক্তিগণ এই উৎসের কর্দ্দম লেপন করিয়া ব্যাধিমুক্ত হয়। শরকূপের ৮০।৯০ লি উত্তরপূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া আমরা লুম্বিনী উদ্যানে পৌঁছি। শাক্যগণের গ্রামের পুষ্করিণী এই উদ্যানে অবস্থিত। ইহার জল দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ এবং পুষ্করিণীর উপরিভাগ নানাপ্রকার পুষ্পদ্বারা আচ্ছাদিত।

ইহার ২৩।২৪ পদ দূরে একটী মৃত অশোক বৃক্ষ। এইস্থানে বোধিসত্ত্ব বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় পক্ষের অষ্টম দিবসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থবির সম্প্রদায় বলেন যে বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় পক্ষের পঞ্চদশ দিবসে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন। এই স্থান হইতে পূর্ব্ব দিকে যে স্থানে দৈত্যগণ রাজপুত্রের শরীর ধৌত করিয়াছিলেন, তথায় রাজা অশোক নির্ম্মিত স্তূপ আছে। বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিয়া বিনাসাহায্যে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকেই সপ্তপদ করিয়া অগ্রসর হইয়া বলিয়াছিলেন স্বর্গ ও পৃথিবীর আমিই একমাত্র প্রভু। আমি আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিব না।" যে যে স্থানে তাঁহার পদদ্বয় ভূমি স্পর্শ করিয়াছিল, সেই সকল স্থানেই পদ্ম পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। অধিকন্তু দুই জন দৈত্য আকাশে থাকিয়া একজন উষ্ণ ও অন্য জন শীতল জলে রাজপুত্রকে ধৌত করিয়াছিল।

এই স্তূপের দক্ষিণে দুইটী উৎসের নিকট দুইটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্থানেই দুই জন দৈত্য ভূগর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল। বোধিসত্ত্বের জন্মগ্রহণের পরক্ষণেই পরিচারকগণ শিশুর যাবতীয় কার্য্যের জন্য ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়াছিল। ঠিক এই সময়েই রাণীর সম্মুখেই ভূগর্ভ হইতে উষ্ণ ও শীতল বারি পরিপূর্ণ দুইটী উৎস প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং এই জলদ্বারা রাজপুত্রকে স্নান করান হইল।

ইহারই দক্ষিণে অন্য একটি স্তূপ। এই স্থানে দেবাধিপতি শক্র বোধিসত্ত্বকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বের জন্মগ্রহণের পরেই, দেবাধিপতি শক্র তাঁহাকে সুন্দর ও স্বর্গীয় বস্ত্রে আবৃত করিয়াছিলেন। যে স্থানে স্বর্গীয় নৃপতি চতুষ্টয় বোধিসত্ত্বকে ক্রোড়ে করিয়াছিলেন, সেই স্থানচতুষ্টয় নির্দ্দেশের জন্য চারিটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। বোধিসত্ত্ব যখন মাতার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে জন্মগ্রহণ করেন তখন স্বর্গীয় দেবতুষ্টয় তাঁহাকে সুবর্ণনির্ম্মিত জালে আবৃত করিয়া সুবর্ণসিংহাসনোপরি স্থাপন করিয়া, তাঁহার মাতার নিকট আনয়ন করিয়া বলিলেন "এই প্রকার সর্ব্বগুণান্বিত পুত্রের জন্যে রাণী অবশ্যই আহ্লাদিত হইতে পারেন।"

এই সকল স্তূপের নিকটেই রাজা অশোক নির্ম্মিত প্রস্তর স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ অদ্যের দৃষ্টি হইয়াছে। পরে, দুই দৈত্য কর্ত্তৃক উহার ভগ্নাবশেষ ভগ্ন হইয়া ভূবিলীন হইয়াছে। নিকটে দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখী একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী আছে। অধিবাসীরা ইহাকে তৈল-নদী বলে। বুদ্ধের জন্মের পর রাজার স্নানের জন্য দেবতাগণ এই স্রোতস্বতী প্রবাহিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ইহা পরিবর্ত্তিত হইয়া জলপূর্ণ নদী হইলেও, ইহার জল এইক্ষণেও তৈলসৃক্ষ।

এই স্থান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ৫০০ শত লি যাইয়া আমরা রামগ্রামে পৌঁছি। (ক্রমশঃ)

মা।

১

মিসেস ম্যাকোহেন তাঁহার এক মাত্র সন্তানটিকে জন্ম দিয়া যখনই রোগশয্যা গ্রহণ করিলেন, তখন হইতেই তাহার পিতৃ-স্নেহবঞ্চিত শিশুটির ভবিষ্যৎ চিন্তায় তাঁহার দুশ্চিন্তাপীড়িত চিত্ত ভাবনার ঘনজালে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

গুলজান্ শিশুর ধাত্রী। সে তাহার উল্লুক্ষিত ভ্রমর কৃষ্ণ অনাবৃত বাহুর উপরে তাঁহার ক্ষুদ্র মল্লিকা ফুলের মত সুন্দর শিশুটিকে দোলাইয়া ঘুমপাড়ানি ছড়া বলিতে বলিতে সম্মুখের বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল।

'না রাজা কা পলটন না রাজাকা ঘোড়া,
—মুলুকমে বাবুয়াকা কোই নেই জোড়া।
আগে যায় রোসনাইয়া, পিছে যায় হাতী,
মেরি পদিপর চলে বাবুয়া, মাথে লাল ছাতি।"

মিসেস ম্যাকোহেন জ্বরতপ্ত ললাটে উত্তপ্ত হস্ত ঘর্ষণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কত সাধের ধন তাঁহার—তিনি তাহাকে একটি দিনের জন্যও অমনি করিয়া কোলে লইয়া আদর করিতে পারিলেন না। এ দুঃখ যে মরিলেও যাইবে না।

শিশু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, গুলজান্ তাহাকে তাহার দোলার বিছানায় শোয়াইয়া সাবধানে নেটের ছোট মসারিটি তাহার উপরে টানিয়া দিয়া রোগীর গৃহে প্রবেশ করিল।

মিসেস ম্যাকোহেন তাঁহার বিবাহিত

তিনটি বৎসর এই বিদেশী সঙ্গিনী গুলজানের সেবা যত্ন ও আন্তরিক ভদ্রতায় তাহার সহিত প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া তাহাকে যেন তাঁহার এ সংসারের একমাত্র সহায়রূপেই দেখিতেছিলেন। রোগ যতই বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতেছিল বিদায়ের কাল নিকটতর হইতেছে বুঝিতে পারিয়া স্নেহপ্রেমে বঞ্চিতা দুর্ভাগিনী তাঁহার হতভাগ্য সন্তানের জন্য চন্দাকেই তত নির্ভর করিয়া ধরিতেছিলেন। ছেলেটি যেন গুলজানের প্রাণ। তাহারি বয়সী তাহার নিজের ছেলে ইয়াসিনের চেয়েও সে যেন তাহাকেই অধিকতর ভালবাসে।

গুলজান ঝুঁকে বসিয়া তাঁহার উত্তপ্ত ললাটে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল; নিষন্ন চক্ষু তাঁহার জ্যোতিহীন উৎসুক নেত্রের সহিত মিলিত করিয়া কহিল "মেমসাহেব!"

"প্রতিজ্ঞা করো গুলজান যে আমি মরে গেলে তুমি আমার যাদুকে আমার জেসুনকে ছেড়ে যাবে না? যতদিন বেঁচে থাকবে তাকে ইয়াসিনের মতন ভালবাসবে?" দুর্বল হস্ত গুলজানের পরিপুষ্ট সুন্দর বাহুর উপরে স্থাপন করিয়া স্নেহকাতরা জননী ধাত্রীর মুখের দিকে ব্যাকুলনেত্রে চাহিয়া এই কথা বলিলেন। যেন এই অনুরোধটি রক্ষিত হইলে তিনি যতটুকু সম্ভব শান্তভাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করিতে পারেন। গুলজান তাহার 'ছোট্ট বাবা'কে তাহার ইয়াসিনের মত ভালবাসা দিতে হৃদয়ের সঙ্গেই প্রস্তুত আছে, তাহার জন্য তাহাকে আর নূতন করিয়া চেষ্টা করিতে হইবে না! কিছু না ভাবিয়া না চিন্তিয়া কাতর চিত্তে দৃঢ়কণ্ঠে গুলজান বলিয়া গেল, "আল্লার নামে শপথ, আমার প্রাণ থাকতে আমি আপনার ছেলেকে ছেড়ে যাব না। নিজের ছেলের চেয়েও বেশী যত্নে তাকে পালন করব।"

মিসেস ম্যাকেঞ্জির প্রদীপের শেষরশ্মিটুকুর মত হইয়া উঠিল।

২

মেম সাহেবের মৃত্যুর পর ক্যাপ্টেন সাহেব গুলজানকে ডাকাইয়া বলিলেন "তুমি ছেলেটাকে বড়ই ভালবাসো দেখতে পাই ওটাকে আমি তোমাকে দিলাম। দশ টাকা করে তুমি বেশি পাবে, ওর সব ভার তোমার। আমায় কোন রকম বিরক্ত করো না – ও কি! কেঁদে যে অস্থির হলে! যাও যাও, আমি কান্নাকাটি দেখতে পারিনে যাও—"

কে জানে কেন ছেলেটার জন্মদিন হইতেই ক্যাপ্টেন সাহেবের তাহার প্রতি কেমন একটা অহেতুকী বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। একটা আস্তার কুড়নো ছেলের উপর লোকের যেটুকু মায়া জন্মায় নিজের সন্তানের উপর সেটুকুও মমতা ছিল না। পত্নীর প্রতি ভালবাসার অভাবই বোধ এ ভাবের মূলগত কারণ।

গুলজান বেতনবৃদ্ধির জন্য আহ্লাদ প্রকাশ করিল না। যাদুকে সে নিজের কাছে পাইয়াছে ইহাই তাহার যথেষ্ট পুরস্কার।

বৎসর ঘুরিয়া গেল। জেসুন ও ইয়াসিন্ দুইটি বিভিন্ন জাতীয় শিশু একখানি স্নেহতপ্ত

অঙ্ক জুড়িয়া এক সঙ্গেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। একটি সবল শাখা দুইটি কোমল লতাকে যেমন সমান স্নেহে বক্ষে ধরিয়া থাকে গুলজানের চিত্তও সেইরূপ তাহার দেহসম্ভূত ও প্রতিপালিত শিশু দুটির মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য বোধ করিত না।

মেজর লরির স্ত্রীর সহিত ছেলে দুটিকে লইয়া গুলজানকে কাপ্তেনসাহেব পাহাড়ে পাঠাইলেন।

পাহাড় হইতে ফিরিবার দিন মিসেস লরি তাহাকে তাহার নূতন প্রভুপত্নীর সংবাদ জানাইয়া কহিলেন "কাপ্তেন সাহেব তোমায় পূর্ব্বে জানাতে নিষেধ করেছিলেন তাই এতদিন বলিনি।"

গুলজানের বর্ণ সাধারণ নিম্নশ্রেণীর ভারতীয় স্ত্রীলোকের মত কালো ছিল না। তাহার শ্যামবর্ণ মুখ সহসা পাংশু হইয়া গেল, গৃহে বিমাতা আসিয়াছে! যদি সে তাহাকে তাহার কোল হইতে ছিনাইয়া লয়?

ট্রেণ হইতে নামিবার সময় তাহার পা কাঁপিতেছিল শিশুকে সে দৃঢ় হস্তে চাপিয়া ধরিয়া অনিচ্ছুক ভাবেই নামিল!

ষ্টেশনে প্রভু বা প্রভুপত্নীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল না, বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলে বারান্দায় সে কাপ্তেন সাহেবের সহিত তাঁহার নূতন স্ত্রীকে দেখিল। নূতন গৃহিণী সুন্দরী ও সুস্বাস্থ্যসম্পন্না। প্রথম দর্শনেই তাঁহার বেশভূষা ও ধরণধারণে গুলজানের চিত্ত তাঁহার প্রতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। হায়! তাহার মেম সাহেব সেই নম্রশান্তকরুণ-হৃদয়া নারী তিনি কখনও এমন দামী পোষাক এমন উজ্জ্বল হীরার আংটি পরিতে পান নাই। নূতন মিসেস মাকেহেন ঈষৎ হাসিয়া শিশুর দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। গুলজানের বুকটা অমনি একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। শিশু কিন্তু বিমাতার কোলে গেল না, সে দুই হাতে ধাত্রীর কুর্ত্তাটা মুঠা করিয়া চাপিয়া ধরিল। কাপ্তেন সাহেব স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিলেন,

"কোনও দরকার নেই ক্লেরা! ওটাকে আমি আয়ার হাতেই দিয়েছি ছেলের হাঙ্গাম তোমায় বইতে হবে না, চলো আমরা বেড়িয়ে আসি"—

তাহার বুকের দুলালকে পাছে কাড়িয়া লয় এই ভয়ে গুলজানের নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল—মনিবের কথা শুনিয়া সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। শিশুকে সে চুম্বনের পর চুম্বনে বিব্রত করিয়া তুলিল।

কিন্তু এ আনন্দ স্থায়ী হইল না। গুলজান শীঘ্রই বুঝিতে পারিল পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত তাহার অধিকার এখানে প্রতি মুহূর্ত্তেই অস্থায়ী হইয়া উঠিতেছে। নূতন গৃহিণী তাহাকে দেখিতে পারেন না।

সপত্নীসন্তান সাধারণতঃ বিমাতার স্নেহভাজন হইতে পারে না, বিশেষ আবার যেখানে স্বয়ং শিশুর পিতাই তাহার প্রতি স্নেহলেশহীন। সেখানে তাহার দৌরাত্ম্য বিমাতার চক্ষুশূল হইতেছিল।

একদিন গুলজান নিজের ঘর হইতে উচ্চ ক্রন্দনের শব্দ পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, মিসেস মাকেহেন তাঁহার মেহগ্নি ব্রাস্ দিয়া শিশুকে প্রহার করিতেছেন। ক্রোধে তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, জ্ঞানশূন্য হইয়া সে প্রভুপত্নীর হস্ত হইতে

ক্রসখানি টানিয়া লইয়া সবেগে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তীব্র ভর্ৎসনা সূচক স্বরে উচ্চারণ করিল—"মেম সাহেব!"

তারপর আহতপৃষ্ঠ রোদনকম্পিত শিশুকে কোলে উঠাইয়া লইয়া দ্রুতপদে সে ঘর হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। মিসেস ম্যাকোহন গম্ভীর স্বরে কহিলেন "পাজি ছেলেটাকে তুমি যে রকম নষ্ট করচ তাতে শীঘ্রই সে ডাকাতের দলে ঢুকবে দেখচি! আর না!—আমাকে শোধরাবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

গুলজান সব কথা দাঁড়াইয়া না শুনিয়াই চলিয়া গেল কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনের ভিতরে নিজের ব্যবহারের ফল, আসন্ন বিপদের একটা ছায়া উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। শিশুকে পুরাতন ভৃত্য ফৈজুর কাছে রাখিয়া একটু মিছরি হাতে দিয়া সে সশঙ্কচিত্তে প্রভুপত্নীর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া চোখের জলে ভাসিয়া বলিল "মেম সাহেব! নিজের ব্যবহারের জন্য আমি নিতান্ত দুঃখিত হচ্ছি, দয়া করে এবার মাপ করুন, আর কখনও আমি এ রকম করবো না। ছেলেটা আমার প্রাণ তাই হঠাৎ বড় রাগ হয়ে গেছলো।"

মিসেস ম্যাকোহন হিন্দি ভাঁষা ভাল বুঝিতেন না, তথাপি যেটুকু বুঝিলেন তাহাতে তাঁহার সংকল্প শিথিল হইল না। স্থির কণ্ঠে কহিলেন "তোমার মাহিনা বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তুমি এখনি যাও, ছেলে তোমার নয়, আমি ওকে সোজা করার ব্যবস্থা করচি।"

গুলজান মুহূর্তে চারিদিক দেখিল। আর্তভাবে সে প্রভুপত্নীর পদতলে বসিয়া দুই হাত যুক্ত করিয়া কাঁদিয়া কহিল "মেম সাহেব আমায় তাড়িয়ে দিবেন না। মৃত মেম সাহেবের কাছে আমি সত্য করেছি কখনও তাঁর ছেলেকে ছেড়ে যাব না। হয় দয়া করে আমাকে রাখুন, না হয় আমার বাচ্চাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে দিন?"

"এ মাগীর তো স্পর্দ্ধাও কম না!" ঘৃণার সহিত গৃহিণী হাসিয়া ফেলিলেন। কাপ্তেন সাহেব গুলজানের কণ্ঠ শুনিয়া গৃহের মধ্যে উঁকি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি ক্লেরা?"

ক্লেরা কহিল "আমি ওকে মাইনে চুকিয়ে দিয়ে চলে যেতে বলচি, কিন্তু উনি বলছেন কিছুতেই যাবেন না।"

কাপ্তেন সাহেব ভ্রূভঙ্গী করিয়া ঘরের উপরে মুষ্টাঘাত ও ভূমে পদাঘাত করিয়া কহিয়া উঠিলেন "তুমি যখন যেতে বলছো তখন নিশ্চয়ই যেতে হবে, যাবে না কি!"

মুহূর্তে গুলজানের অশ্রু শুকাইয়া গিয়া দুই চক্ষু আগুনের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, স্থির কণ্ঠে কহিল,—

"হাঁ সাহেব, আমি যাচ্ছি!" তার পর সে দৃঢ় পদক্ষেপে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

শিশু তখনও অস্ফুট স্বরে কাঁদিতেছিল, পৃষ্ঠের কোমল চামড়া রাঙা হইয়া রহিয়াছে মিছরি সে স্পর্শও করে নাই। ফৈজু শিশুকে প্রত্যর্পণ করিবার সময় ধাত্রীর মুখের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া রহিল।

কাপ্তেন সাহেব অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার নূতন সঙ্গিনীর সহিত ক্লাবে চলিয়া গেলেন। চার ঘণ্টার পূর্ব্বে তাঁহারা ঘরে ফিরিবেন না। গুলজান মনিবপুত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া নিজের ঘরে আসিল। একবার সে শিশুকে ভূমে নামাইয়া নিজের ছোট সিন্দুকটি খুলিয়া তাহার সঞ্চিত টাকা পয়সাগুলি বস্ত্রের মধ্যে পুরিয়া কোমরের ঘুন্সিতে বাঁধিয়া লইল, তারপর দুই শিশুকে দুই কোলে লইয়া ধীর পদক্ষেপে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। উর্দ্ধে চাহিয়া মনে মনে কহিল "মেম সাহেব। তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি—সেই সত্য রাখার জন্য আজ গুলজান এই পাপ করতে বাধ্য হলো। তুমি স্বর্গে থেকে সাহায্য কর। আমি বেঁচে থাকতে তোমার ছেলেকে নিষ্ঠুর বিমাতার হাতে দিতে পারব না।"

শিশুর সহিত গুলজানের অদৃশ্য হওয়ার সংবাদ প্রচার হইলে কাপ্তেন সাহেব কোন রকম চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়াই স্ত্রীকে কহিলেন "আঃ যেতে দাও না ক্লেরা, কি হবে সেটাকে নিয়ে? তোমার আমার চেয়ে সে স্ত্রীলোকটা বরং ছেলেটাকে পেয়ে ঢের বেশি খুসী থাকবে।"

কথাটা সত্য। তথাপি লোকে কি বলিবে? এই ভাবিয়া মিসেস ম্যাকোহেনের নিবেক এই নিষ্ঠুর যুক্তির বিপক্ষে জাগিয়া উঠিল, হইয়া উঠিল।

একটা আয়া দুই কাঁধে দুইটা সমবয়স্ক শিশু—তাহার একটি সাদা ইউরোপীয় এবং অপরটি পশ্চিমী মুসলমান শিশু—লইয়া পলাতক, ইহাদের ধরিয়া দিতে পারিলে পুরস্কার দেওয়া হইবে এইরূপ একটা বিজ্ঞাপন কাগজে দেওয়া হইল। কিন্তু চেষ্টা সফল হইল না। গৌরবর্ণ শুভ্র এবং কৃষ্ণবর্ণ একটি দুটি তিনটি ছেলে কোলে কাঁখে করা স্ত্রীলোক পথে ঘাটে অনেক দেখা গেল। শুভ্র শিশু সংযুক্ত নারী কোথাও মিলিল না।

৩

গুলজান গোধূলিপুর হইতে পলাইয়া হাঁটা পথে পশ্চিমমুখ উত্তীর্ণ হইয়া পাঞ্জাবে নিজের দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতার কাছে আশ্রয় লওয়ার পর ষোল বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ইয়াসিন এখন সুশ্রীসবল যুবা-পুরুষ। এখন সে মাতুলের গাড়িঘোড়ার ব্যবসায়ের অংশীদার। গুলজান তাহার জন্য কঠিনতর পরিশ্রম করিতে এখনও ক্লান্তি বোধ করিত না। সে মায়ের চেয়ে দাসীর মতই তাহার সেবা করিত। ছেলেও মা ছিন্ন কাহাকেও চিনে না, এখনও সে মায়ের কোলের শিশু, আদরের দুলাল।

শরীরের শক্তিতে মনের তেজে ইয়াসিন্ নিজের কার্য্যে বেশ একটু উন্নতি করিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কি ছিল তাহা সে নিজেই জানিত না কিন্তু এইটুকু সে লক্ষ্য করিয়াছে যে তাহার মুখে চাহিয়া দেখিলেই তাহার ইংরাজ আরোহীর চোখে একটা বিস্ময়-পূর্ণ স্নেহ-করুণার ভাব ব্যক্ত হইয়া উঠিত এবং সে ভাড়াটা বেশ ভাল রকমই লাভ করিয়া আনিত। আর ইহাও এক বিচিত্র ব্যাপার যে, ঐ সকল সুপরিচ্ছদধারী সুন্দরমূর্ত্তি নর-নারীদের দেখিলে তাহারও প্রাণের মধ্যে কি যেন একটা আকুলতা উদ্দাম হইয়া উঠিতে চাহিত; তাহাদের সান্নিধ্য সে যেন পাথরেরচু

আকর্ষণের মত কিছুতেই যেন ছাড়াইয়া লইতে পারিত না।

একদিন ওসমান দেখিল, ইয়াসিন নিজের অঙ্গ হইতে দড়ি বাঁধা মিরজাই খুলিয়া রাখিয়া বিস্ময় ব্যাকুলনেত্রে নিজের অঙ্গের প্রতি চাহিয়া আছে। ওসমানকে দেখিয়া সে ইঙ্গিতে কাছে আসিতে বলিল, কম্পিতপদে ওসমান নিকটে আসিলে সহসা যুবক জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল "মা এর মানে কি আমায় বলো, কেন আমার গা এত সাদা? আমি শুনেছি আজই শুনেছি—লোকে বলে—ওঃ আমি বলতে পারিনে—সে কী ভয়ানক কথা—বলে আমি তোমার ভাইজ! আমি সাহেবের ছেলে?"

সর্পাহতের মত ওসমান আড়ষ্ট হইয়া রহিল, তাহার মুখে বাক্য সরিল না। সুদীর্ঘ দিনে যে স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল সহসা তাহা মেঘোদ্ভিন্ন সূর্যকিরণের মত ফুটিয়া উঠিল। নিষ্ঠুর সন্দেহে ইয়াসিন্ উন্মাদের মত লাফাইয়া মায়ের হাত চাপিয়া ধরিল।

"সত্যি, তবে সত্যি! আমি তবে সাহেবের ছেলে?"

যন্ত্র চালিতের মত ওসমান উত্তর করিল "হাঁ"।

"রাক্ষসি!" ইয়াসিন বাঘের মত গর্জ্জিয়া উঠিল "কেন আমায় নুন খাইয়ে মারিসনি?"

ওসমানের সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছিল। আত্মপরিচয় জানিয়া লইয়াছে এইখান হইতেই সে তবে নিজের জন্য পথ নির্ব্বাচন করিয়া লউক! সে যে কোন্ পথ বাছিয়া লইবে ইহাও সে জানিত। কম্পিতস্বরে কহিল "বাছা, আমার সব কথা না শুনে তুমি রাগ করো না, আগে সবটা স্থির হয়ে শুনে যাও"—এই বলিয়া সে সমস্ত কাহিনীটা এক নিশ্বাসে বলিয়া গেল। সে বলিল "তুমি সাহেবের ছেলে এ কথা সত্য কিন্তু আমার গর্ভে তোমার জন্ম হয়নি! আমার গর্ভজাত সন্তান ইয়াসিনের ষোলবৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু হয়েছে; তুমি মেম-সাহেবের পুত্র। তোমার বাপ তোমার মাকে চক্ষে দেখতে পারতেন না, তোমার প্রতিও তাঁর এতটুকু স্নেহ ছিলনা, তোমার মা মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বক্ষণেই আমাকে সত্য করিয়ে নিয়েছিলেন যে জীবন থাকতে আমি তোমায় ছেড়ে যাবনা।"

তারপর সে অত্যন্ত মৃদু ও স্বরভেদী স্বরে তাহাদের পলায়নের কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিল, শুনিয়া ইয়াসিন্ কিছুই বলিল না। সে যেন অকস্মাৎ একটা প্রস্তর মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছিল।

ওসমান্ কহিতে লাগিল—"শুনলুম আমাদের ধরবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। ধরা পড়লে যে কি হবে আমার জানাই ছিল, মাথায় বজ্রাঘাত পড়ল। গোরখ পুরের শালের জঙ্গলে একজন সন্ন্যাসী থাকতেন তাঁহারই কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লুম। তিনি বল্লেন,—দুজন সঙ্গে থাকলে ধরা পড়বে একজনকে ত্যাগ করে যাও। পরামর্শ উচিত মতই কিন্তু করা বড় কঠিন! কাকে ত্যাগ করব? কোথায় রাখব? বিশ্বাস করবার কে আছে যে পুরস্কারের লোভে আমাদের ধরিয়ে দেবেনা? আমি তোমার মাকে স্মরণ করলুম। বল্লুম—"আমার সমস্যা দূর করে দাও, নিজের ছেলের

আমার আমি যেন তোমার ছেলেকে ফেলে না যাই। তার বিমাতা বড়ই নিষ্ঠুর!" বোধহয় তোমার মা সে কথা স্বর্গে থেকে শুনেও ছিলেন। সেই রাত্রেই ফকিরের আশ্রমে আমার নিজের ছেলেকে ফেলে তোমাকে তার কাপড় পরিয়ে ও এক রকম রং মাখিয়ে নিয়ে আবার পথে বার হলুম। ইয়াসিনের ক্ষীণ ক্রন্দন ক্রোশের পর ক্রোশ ধরে আমার কানে বাজতে লাগল, ভয়ে সে যেন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সত্য যে সবার চেয়ে বড়! ঈশ্বর যে সকলেরই উপরে বাপ! আমি যে তোমার মাকে কথা দিয়েছিলুম! এখানে আসবার পর চিঠি লিখে খপর নিয়েছিলুম, সেই রাত্রেই সে মারা গ্যাছে। আমি মনে করি তুমিই আমার ইয়াসিন।

এখন তুমি বড় হয়েছ তোমার পথ তুমি ঠিক করে নাও,—তবে আমার প্রতি এই টুকু দয়া করো যেখানে থাকো আমাকে তোমার বাড়ির দাসী করে রেখো।"

ইয়াসিন্ অনেকক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে একদিকে চাহিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ সে স্বপ্নমুগ্ধের মত এক পা এক পা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। একটিও কথা কহিল না। গুলজানও তাহাকে তাহাতে বাধা দিল না। নিজে সে নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল।

৪

সমস্ত দিন পথে পথে ঘুরিয়া রাত্রে আবার ইয়াসিন্ গৃহে ফিরিয়া আসিল। গুলজানও জানিত যে সে আর একবার আসিবে। সে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। ইংরাজটোলায় আজ ইয়াসিন অনেক খণ্টা কাটাইয়াছে। খোলা জানালার নেটের পর্দা বাতাসে কাঁপিয়া সরিয়া যাইতেছিল; ভিতরে শুভ্র আস্তরণবিস্তৃত টেবিল ঘেরিয়া চৌকি-গুলি সাজান, হাস্যকৌতুকোজ্জ্বল শুপরিচ্ছদধারীগণ সেই চৌকি দখল করিয়া রহিয়াছে। রৌপ্য চামচের টুন্ টান্ শব্দে এবং খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের সুপ্রচুর সদ্‌গন্ধে বায়ু পূর্ণকরিয়া মধ্যাহ্নভোজন চলিতেছে। সন্ধ্যায় কোন গৃহে মধুরস্বরে পিয়ানো বাজিয়া উঠিল, কোনও উদ্যানপথে শ্রান্ত প্রণয়ী দুইখানি বাহুহস্তে বাঁধা পড়িলেন। কোথাও বা ঠেলা গাড়িতে শিশুকে বসাইয়া পার্শ্বে জনক-জননী স্নেহহাস্যে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। ইয়াসিনের প্রাণের ভিতরে ব্যাকুলতা অসহনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। সে এই দীনহীন অশ্বপালক—ছিটের মেরজাই গায়ে নাগারা-জুতা-পরা নগণ্য ঘৃণিত ইয়াসিন্; সে কিন্তু উহাদেরই মত ইংরেজসন্তান, ইহারা তাহার আপনার লোক! সেও এইরূপ সুখস্বাচ্ছন্দ্য এই মুহূর্ত্ত হইতেই ক্রয় করিতে সক্ষম! শুধু একবার ছুটিয়া গিয়া ওই যে—ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলার আদালত হইতে শতপ্রাণীর মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করিয়া টমটম চড়িয়া ফিরিতেছেন তাঁহাকে সব কথা বলিবার মাত্র অপেক্ষা!

কিন্তু—না না একি সে ভাবিতেছে! সে পাগল হইয়া যাইবে না কি? সে তো গুলজানের কথা ভাবিতেছে না? ম্যাজিষ্ট্রেট যখন তাহার কাহিনীর সত্যাসত্য বিচার করিবার জন্য তাহাকে ডাকাইয়া আনিবেন? এবং তারপর, পরের ছেলে—ইংরাজের

সন্তানকে তাহার পিতৃগৃহ হইতে চুরি করিয়া আনার জন্য তাহাকে যখন চালান দিবেন? উঃ না! ঈশ্বর তাহাকে এই দুরন্ত লোভ হইতে রক্ষা করুন!

গভীর অন্ধকারে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছিল। দরিদ্র পল্লীতে কচিৎ কোন ক্ষুদ্র জানালার ভগ্ন কবাটের ফাঁক দিয়া কেরোসিনের প্রচুর ধূমের সহিত ক্ষীণালোক রেখা প্রকাশিত হইতেছে। ইহার ভিতরে সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। তীব্রস্বরে ঝিঁঝি ডাকিতেছিল। অস্ফুট নক্ষত্রালোকে গুলজান দাওয়ার চারপায়ার উপরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ইয়াসিন্ আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। সে বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছে, গুলজানকে ফাঁসাইয়া সে নিজেকে কাপ্তেন ম্যাকোহনের পুত্র বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবে না—কিছুতেই না! পথে দুইজন ইংরাজের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহারা চলিতে চলিতে হঠাৎ তাহার দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেও কৌতূহলী হইয়া চলিয়া না গিয়া দাঁড়াইয়া দুই চোখ তুলিয়া তাহাদের চোখের দিকে চাহিয়া দেখিল। একজন ইংরাজ অপরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "বাই জোভ! নিশ্চয়ই এ ছেলেটি একজন ছদ্মবেশী ইউরোপিয়ান্!" বাঘের মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া সে তাহাদের উপর লাফাইয়া পড়িল, গর্জ্জন স্বরে কহিয়া উঠিল "চুপ রও।"

ইংরাজ দুজন উচ্চহাস্য করিয়া চলিয়া গেল।

অন্ধকারে কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইতেছিল না। রাত্রের বাতাস কেবলি বিলাপের নিশ্বাসের মত ঘরে ও বাহিরে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। দূর একটা নিশাচর প্রাণীর ক্ষীণ কণ্ঠশব্দ আর্ত্ত হৃদয়ের যন্ত্রণাধ্বনির মত শূন্যে চকিত হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে। মৃদুস্বরে গুলজান ডাকিল—"ইয়াসিন্।—জেসুন বাবা!"

জেসুন তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া বলিল—"মা!"

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

মাতৃঋণ।

নবম পরিচ্ছেদ।

বন্ধু-লাভ।

সেদিন অপরাহ্নে আর্ভেন্ট ও ইনা, অলস অবসর যাপনের অন্য উপায় না দেখিয়া কবিল বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। আকাশে তখন অল্প মেঘ জমিতেছিল। ক্রমে সেই মেঘ সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। ঝড় আসন্ন দেখিয়া জ্যাক বনের দিকে যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া আর্কার নিকট আসিয়া বসিল, বলিল, "একটা গল্প বল না, আর্কা।" আর্কা গল্প বলিতে আরম্ভ করিল। গল্প বলিতে বলিতে জ্যাকের কৌতূহল-প্রশ্নে আর্কার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিলে নিষ্কৃতিলাভের উদ্দেশ্যে আর্কা বলিল, "ওহো, তাইত জ্যাক, এখনো বৃষ্টি নামতে দেরী আছে—তুমি দৌড়ে দোকান থেকে

খরগোশগুলার জন্ত কিছু খাবার কিনে আন ত—আমার মনেই ছিল না—আহা, কাল সকালে বেচারারা কি খাবে তার ঠিক নেই—আমি বুড়ো মানুষ, অত তাড়াতাড়ি আনতে পারব না—পথেই বৃষ্টি এসে পড়বে হয়ত—তুমি যাও, লক্ষ্মীটি!"

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ছোট একটি ঝুড়ি লইয়া জ্যাক দোকানে ছুটিল।

ঘন পাতার ছায়ার ঢাকা শ্যামল পথে তখন আঁধার নামিয়াছে—পথে লোক চলাচল একেবারে থামিয়া গিয়াছে। আসন্ন ঝড়ের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত গ্রাম্য কৃষকের দল পূর্ব্বাহ্ণেই বাসায় ফিরিয়াছে। জনকোলাহলহীন নির্জ্জন পথ বহিয়া জ্যাক দোকান হইতে গৃহের দিকে চলিয়াছিল। তাহার প্রাণের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ ফুটিয়া উঠিতেছিল,—এমন সময় দূরে সে শুনিল, ফিরিওয়ালা হাঁকিতেছে, "টুপি—ভাল টুপি চাই!"

পশ্চাতে ফিরিয়া জ্যাক দেখিল, অসংখ্য টুপির বোঝা পৃষ্ঠে ফেলিয়া এক ফিরিওয়ালা ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেদিকে আসিতেছে। শ্রান্তিতে বেচারার স্বর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! ললাট হইতে ঘর্ম্মবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে—মুখ শুখাইয়া গিয়াছে—দারিদ্র্যের ঘনরেখাপাত তাহার মুখে চোখে সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে! জ্যাক থমকিয়া দাঁড়াইল—ফিরিওয়ালা তাহার নিকটে আসিয়া হাঁকিল, "টুপি—ভাল টুপি চাই?"

জ্যাক ভাবিল, সে কোথায় চলিয়াছে! এই দুর্য্যোগের রাত্রে কোথায় তাহার আশ্রয় মিলিবে—কোথায় একটু ঘুমাইয়া বেচারা দিনের ক্লান্তি ঘুচাইবে! এই বোঝা বহিয়া কত পথই না সে ঘুরিয়াছে—কাহার জন্ত সে এ নির্জ্জন পথে চীৎকার করিতেছে! কে তাহার টুপি কিনিবে? শুধু গতিহীন প্রাণহীন দূরত্ব-নির্দ্দেশক পাষাণ স্তূপগুলা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—আর বৃক্ষশাখায় পাখীগুলা নিতান্ত নির্জ্জীবের মত ঝড়ের ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে! এখানে কে তাহার টুপি কিনিবে?

টুপিওয়ালা একটা বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। জ্যাক নিকটে আসিয়া কৌতূহল দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইল। টুপি-ওয়ালা মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কতদূরে গেলে গাঁ মিলবে?"

আকাশের বুক চিরিয়া সশব্দে লোহিত বিদ্যুৎশিখা ছুটিয়া গেল। পথের ধূলি উড়াইয়া একটা কম্পন বহিয়া গেল—গাছগুলা সে শব্দে যেন শিহরিয়া উঠিল।

জ্যাক কহিল, "পনেরো মিনিট লাগবে।"

"পনেরো মিনিট! তবে ত মুস্কিল! বৃষ্টির আগে তবে গাঁয় পৌঁছুতে পারব না—টুপিগুলা সব ভিজে যাবে—এতগুলা টুপি!" একটা করুণ সহানুভূতিতে জ্যাকের চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে কহিল, "আমাদের বাড়ী এই কাছেই! সেখানে তুমি থাকতে পার।"

হতভাগ্য টুপিওয়ালা অকূলে কূল পাইল। কৃতজ্ঞতায় সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

উভয়ে দ্রুত চলিল। টুপিওয়ালা কষ্টে পথ চলিতেছিল। জ্যাক কহিল, "তোমার খুব কষ্ট হচ্চে, না?"

"হাঁ—আমার পা বড়—জুতা যা কিনি,

পায়ে একটু কম হয়—পয়সা ত এমন নেই যে বায়না দিয়ে পায়ের মাপে জুতা তৈয়ার করাব।"

গৃহে পৌঁছিয়া জ্যাক টুপিওয়ালাকে ভোজনকক্ষে বসাইল। কহিল, "বস—একটু কিছু খাও। আরাম পাবে।"

টুপিওয়ালা অসম্মত হইল—কহিল, "না, না—আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না।"

কিন্তু জ্যাক ছাড়িবার পাত্র নহে। আর্কা এই অসভ্য লোকটাকে দেখিয়া চটিয়া গিয়াছিল—তথাপি কিছু বলিল না। জ্যাকের আদেশে মদ্য ও কিছু আহার সে লইয়া আসিল।

জ্যাক বলিল, "খানিকটা মাংস দাও, আর্কা।"

আর্কা কহিল, "কিন্তু জান, জ্যাক, মনিব এ সব পছন্দ করেন না—তিনি খুব বকবেন!"

"আচ্ছা, সে যখন বকবেন, তখন বকবেন —এখন ত তুমি দাও।"

নিতান্ত বিরক্তির সহিত আর্কা এক টুকরা মাংস লইয়া আসিল জ্যাক কহিল, "কেমন পাচ্ছ?"

টুপিওয়ালা কহিল, "চমৎকার।"

চারিদিক কাঁপাইয়া বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিল। ভীষণ শব্দে ঝড় আসিল —সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামিল।

জ্যাক কহিল, "তোমাকে অনেক দূর যেতে হয়।"

"হাঁ! আমি নাস্তিতে থাকি—আমার বোনের বাড়ী সেখানে—সেইখানেই থাকি। মঁতারগি, অর্লিন, তুর্স, আঁজু সব যেতে হয়। বাড়ীতে অনেকগুলি লোক—আমার বুড়ো বাপ, বিধবা বোন, চার পাঁচটি ভাই—সকলের আহার যোগানো

জ্যাক কহিল "তোমার এইরকম বেরুনো হয় না; কেন?"

"তোমার বড় কষ্ট, না?"

"হাঁ—ঐ জুতার জন্য! জুতাজোড়া খুলে

ফেললে তবে আরাম পাই! কিন্তু তবু আরাম কৈ? রাত্রে শুয়ে যখন ভাবি, আবার সকালে জুতা পায় দিয়ে বেরুতে হবে, তখন প্রাণটা অস্থির হয়ে ওঠে।"

জ্যাক কহিল "তোমার ভায়েরা বেরোয় না, কেন?"

"তাঁরা যে ছেলেমানুষ! এত ঘুরতে পারবে কেন? আর কিছু কষ্ট না—শুধু যদি মাসের মাসে একজোড়া জুতা পেতাম?"

এমন সময় বহির্দ্বারে গাড়ী আসিয়া থামিল। জ্যাক ত্রস্তভাবে দাঁড়াইয়া উঠিল। টুপিওয়ালা কহিল, "কি হল?"

"তারা এসেছে।"

বাহিরে আর্জেন্ট'র গলা শুনা গেল। আর্জেন্ট কহিল, "এস লোলি, খাবার ঘরে—আর্কা খাবার দাও।"

আর্জেন্ট ভিতরে প্রবেশ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "এ কি সব? কি হচ্ছে?"

জ্যাকের মনে হইল, এই মুহূর্ত্তে যদি তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হয় ত সে কি সুখ! বালক ভয়ে জড়িত অস্পষ্ট স্বরে কি কহিল, আর্জেন্ট তাহা শুনিয়াও শুনিল না!

আর্জেন্ট কহিল, "লোলি, দেখে যাও! জ্যাক বাহাদুর এখানে আমার জমকে দিয়েছেন। বন্ধুবান্ধবকে মজলিস দিচ্ছেন!"

ইদা আসিয়া তিরস্কারপূর্ণ স্বরে কহিল, "জ্যাক—জ্যাক—এ কি!"

টুপিওয়ালা কহিল, "এঁকে কিছু বলবেন না, ঠাকরুণ—আমি নিজে—"

ক্রোধে আর্জেন্ট কাঁপিতেছিল—সশব্দে দ্বার খুলিয়া তীব্র স্বরে কহিল "চুপ করে থাক—বেয়াদব, অসভ্য কোথাকার—লোকের গাড়ী এসে চড়াও হবার মজা টের পাওয়াচ্ছি—বেরোও এখনি এখানথেকে।"

টুপিওয়ালা একটিও কথা না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এমন ব্যবহার—তাহার নিকট নূতন নহে। আপনার টুপির সোণা পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া সে জ্যাকের পানে কৃতজ্ঞভাবে একবার চাহিয়া দেখিল—জ্যাক নতমস্তকে বসিয়াছিল—ভয়ে সে সাদা হইয়া গিয়াছিল—তাহার পর বৃষ্টি ঝঞ্ঝাঘাতের মধ্যে টুপিওয়ালা বাহির হইয়া গেল।

জ্যাকের চৈতন্যলোপ হইয়া গিয়াছিল—সহসা সে শুনিল, বাহিরে বৃষ্টির শব্দের মধ্যে কে দূরে হাঁকিতেছে, "টুপি—ভাল টুপি চাই।"

আর্জেন্ট কহিল—"ওঃ—আমি দেখিনি—হাম—হাম খাওয়ান হচ্ছিল বন্ধুকে—"

ইদা কহিল, "কিন্তু ওটা খায়নি বোধ হয়।"

আর্কা কহিল, "আমি তখনি বারণ করেছিলাম—কিন্তু শুনলে না—বললুম মনিব রাগ করবেন—যাই হোক, ছেলেমানুষ না বুঝে—"

"থাম তুমি"—আর্জেন্ট গর্জ্জিয়া উঠিল!

জ্যাক এতক্ষণে বুঝিল, সে কি দুঃসাহসের কার্য্য করিয়াছে। সে উঠিয়া গাঢ় স্বরে কহিল, "এবারটি মাপ করুন—আর কখনো করব না—"

"মাপ? বটে!" বলিয়া আর্জেন্ট জ্যাকের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া এমনভাবে তাহাকে নাড়া দিল, "এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমার! তুমি জান ও জিনিষে তোমার কোন অধিকার নেই! যে বিছানায় তুমি শোও, যে খাবার তুমি খাও, সে সমস্ত তোমাকে অনুগ্রহ করে দেওয়া হয়েছে শুধু। তোমাকে দয়া করা

অন্যায় হয়েছে আমার! কে তুমি আমার? কেউ নও—কোথাকার নোঙরা পথের কুকুর—তোমার ব্যবহার দেখে আমি ক্রমে অবাক হয়ে যাচ্ছি! ছোটলোক, পাজী—"

ইদার করুণ দৃষ্টির কাতর অনুনয়ে আর্জেণ্ট সেদিন জ্যাককে ছাড়িয়া দিল।

পরদিন আর্জেণ্ট জ্বরে পড়িল। কঠিন পীড়া দেখিয়া ইদা অস্থির হইয়া উঠিল। ডাক্তার রিভালের আরাম কুঞ্জে ডাক পড়িল। প্রত্যহ দুইবেলা ডাক্তার রিভাল আসিয়া রোগী দেখিতে লাগিলেন। ইদা কহিল, "ডাক্তার, তুমি কবিকে শীঘ্র আরাম করে দাও—কবির লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে—জগতের কত ক্ষতি হচ্ছে এতে, ভাব দেখি।"

"কোন ভয় নেই—মিসেস আর্জেণ্ট—দুদিন সময় লাগবে—ওর মন ভালো রাখ—জ্যাক কোথায়? তাকে ডেকে দাও দেখি!"

"না, না—সে গোল করবে।"

"করুক একটু গোল! ছেলেমানুষ—তাদের গোলমালে ত বিরক্তি ধরে না, বরং ভালই লাগে। সে বেচারা মুখখানি শুকিয়ে বেড়াচ্ছে—বাপের অসুখ হলে ছেলেপুলের মন ভাল থাকে না ত! তুমি তাকে ডেকে দাও দেখি—বেশ ছেলেটি—আমার সঙ্গে সে সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে। আমাকে সে দাদা-মশায় বলে ডাকে—কে তাকে শিখিয়ে দিলে, বল? সে জানে, পাকা চুল, পাকা দাড়ী আছে যখন আমার, তখন আমি আর দাদামশায় না হয়ে, যাই কোথা, বল!"

রিভাল তখন আপনার দৌহিত্রী সিসিলের কথা বলিল—জ্যাকের চেয়ে দুই বৎসরের ছোট সে। তাহার দৌরাত্ম্যে বৃদ্ধের মুহূর্ত বিশ্রাম লইবার অবসর ঘটে না—এ দৌরাত্ম্য বৃদ্ধের এমনি অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, তাহা কোন দিন বাদ পড়িলে, বৃদ্ধের মনে একটা প্রবল অস্বস্তি ঘটে! তাহার মন ভিজাইয়া মান ভাঙ্গাইয়া দৌরাত্ম্যের আহ্বান করিতে হয়!

ইদা কহিল, "তাকে একদিন এনো না, ডাক্তার, জ্যাকের সঙ্গে খেলা করবে বেশ।"

"না—সেটি হবার জো নেই! তার দিদিমা তাকে চোখের আড় করতে চায় না। একদণ্ড কাছছাড়া হলে তার দিদিমা অস্থির হয়ে ওঠে। সে দুর্ঘটনার পর থেকে—বুড়ী ওকে নিয়েই কোনমতে আপনাকে খাড়া রেখেছে।"

বালবিধবা কন্যার মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বৃদ্ধ দুর্ঘটনার উল্লেখ করিলেন। একমাত্র কন্যা যেদিন শিশু সিসিলকে রাখিয়া পৃথিবী ত্যাগ করিল, সেদিন বৃদ্ধের জীবন কি ভীষণ অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল, সে অন্ধকারে আলোকের কণাটুকু পাইবার আশা ছিল না—সিসিল আবার নূতন করিয়া সে অন্ধকারে একটি ছোট দীপ জ্বালিয়াছে! সিসিলকে পাইয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সে দুঃখ আবার ভুলিতে বসিয়াছে। সে দুঃখের কথা শুধু আর্কা জানে, আর কেহ জানে না।

আর্জেণ্টকে আনন্দ দিবার জন্য, আর্জেণ্টের সম্মতি লইয়া ইদা এক সাম্মিলনীর আয়োজন করিল। আর্জেণ্টের পুরাতন বন্ধু লাবাসাঁদ্র, ডাক্তার হায়ন্ প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হইল।

একদিন প্রভাতে, শয্যা ত্যাগ করিয়া জ্যাক দেখিল, বাড়ী সাজাইবার ধুম পড়িয়া

গিয়াছে! চীনা লণ্ঠন, ফুলের রাশি, কাগজের নিশান আসিয়া পড়িয়াছে। ব্যাপার কি?

ইদার নিকট আসিয়া সে কহিল, "মা, কি হবে, মা?"

ইদা তখন গৃহসজ্জার আয়োজনে ব্যস্ত। ইদা কহিল, "চুপ, লক্ষ্মী হয়ে থাকো। দুরন্তপনা করো না—আর বাড়ীতে অনেক বড় বড় লোক আসবে, ভোজ আছে।"

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্ব হইতে দুই একজন করিয়া অতিথি আসিতে লাগিল। নিজের শয়ন কক্ষের দ্বার ভেজাইয়া তাহার ফাঁক দিয়া জ্যাক দেখিল, মরোভাঁ ও ডাক্তার হায়রজের দল আসিয়াছে! ভয়ে তাহার শরীর কাঁপিয়া উঠিল। শত্রুগুলা যদি তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়! কি হইবে? তাহা হইলে, সে কি করিবে?

ক্রমে সন্ধ্যার সময় সখের থিয়েটারের ম্যানেজার, নাট্যকার, অভিনেতা, গ্রন্থ-প্রকাশক, সব দল বাঁধিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোট বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিল। রন্ধন-শালা হইতে বিবিধ ভোজ্যের বিচিত্র সুরভি উত্থিত হইয়া ক্ষুধাতুর নিমন্ত্রিতগণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে লাগিল। জ্যাক মাতার পার্শ্বে থাকিয়া, কফি, চা, প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছিল—মাঝে মাঝে লাগার্ডাদ্‌ং, হায়রজের বীভৎস চীৎকার ও হাস্যের শব্দে কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

অবশেষে ডাক্তার রিভাল আসিলেন। রোগীর উৎপাদিত মূর্ত্তি দেখিয়া রিভাল ইদাকে কহিল, "দেখছ মা, আমোদ আহ্লাদে আর্জেন্ট'র চেহারা অবধি ফিরে গেছে।"

ডাক্তার হায়রজ্ কহিল, "আপনি ডাক্তার, মশায়?"

আর্জেন্ট উভয়ের পরিচয় করিয়া দিল।

নানা গল্পে, হাস্যকৌতুকে সে রাত্রি আনন্দে কাটিল। ইদার প্রফুল্লতার সীমা ছিল না। আর্জেন্ট'র আনন্দের মধ্যে একটু তীব্রাবেশ মিশানো ছিল—আপনার ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্য এই দরিদ্র হতভাগ্য প্রতিভাশালীর দলের যে সে বিভ্রম জাগাইয়া তুলিয়াছে, ইদা সে স্পষ্ট বুঝিল। মরোভাঁ-হায়রজের দল একটু ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। আহার্য্যের বৈচিত্র্য ও ঘটা দেখিয়া তাহারা ভাবিতেছিল, "আর্জেন্ট ত তোফা আছে। অবস্থা একে-বারে ফিরিয়ে ফেলেছে!"

গভীর রাত্রে মজলিস ভাঙ্গিলে অভ্যাগতের দল গৃহে ফিরিতে আরম্ভ করিলে, মরোভাঁ হায়রজের দল একটু অস্থিরতা অনুভব করিল। এমন পরিপাটি আরাম ছাড়িয়া কোথায় এ হিম-শীতল পথে বাহির হইবে! তাহার পর জিমনেজের ছিন্ন শয্যায় অপ্রচুর গরম বস্ত্রে কাঁপিতে কাঁপিতে রাত্রি পোহাইতে হইবে, ভাবিয়া যখন তাহাদের রক্ত জমিবার উপক্রম করিল, তখন আর্জেন্ট কহিল, "এত রাত্রে কোথায় সব ফিরবে, আজ! দুদিন এখানে থেকে যাও।" কি অভয়প্রদ নিশ্চিন্ত আশ্বাস! হায়রজের দল তখন সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ভূতত্ত্বের এক পৃষ্ঠা।

আমাদের এই ভূমণ্ডল প্রথমে একটা জলন্ত অগ্নিপিণ্ডরূপে সৃষ্ট হইয়া শীতল আকাশে ভীষণ বেগে প্রক্ষিপ্ত হয়। সেই আদিম গতি এবং সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহগণের আকর্ষণ এই দুই শক্তির বশে পৃথিবী আজিও সেই একভাবে চলিতেছে, অনন্তকাল ধরিয়া চলিবেও। কিন্তু উহার গঠন এবং আকৃতির বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই হইতেছে। সূর্য্য এবং তন্নিকটবর্ত্তী দুই একটি গ্রহ আজিও অগ্নিময় রহিয়াছে, কিন্তু ক্রমশঃ সকল উত্তপ্ত বস্তুরই তাপ বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। চন্দ্রমণ্ডল যতদূর সম্ভব শীতল হইয়া গিয়াছে; পৃথিবী এখনও ততদূর শীতল হয় নাই, কিন্তু প্রত্যেক মুহূর্ত্তে উহার তাপ কমিতেছে। জলন্ত ভূপিণ্ডে অনেক বস্তু বাষ্পাকারে মিশ্রিত ছিল। সমগ্র ধাতু, গন্ধক, লবণ, বালুকা, প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থই মিশ্রিত হইয়া অনিলাকারে অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল। এত উত্তপ্ত ছিল যে সূর্য্যের ন্যায় উহা স্বতঃ দীপ্তিশালী ছিল। সূর্য্য এবং তারকারাজির আলোক এখন যেরূপ উহাদের নিজস্ব, পৃথিবীরও সেইরূপ ছিল। বলা বাহুল্য, আমরা এখন যেরূপ জীবের অস্তিত্ব জানি সেরূপ জীব ঐ উত্তাপে বাঁচিতে পারে না; সুতরাং ঐ জলন্ত পিণ্ড জীবশূন্যই ছিল।

ক্রমশঃ শীতলতর আকাশে ধরার তাপ বিকীর্ণ হইতে থাকে, এবং ঐ দীপ্তিমান ভূপিণ্ড ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকে। অবশেষে যখন উহার উজ্জ্বল শ্বেত দীপ্তি একটা রক্তিম আভা মাত্রে পরিণত হয় তখন উহা তরল হইয়া পড়ে ও সেই সময়ে স্থানে স্থানে উনাতে কঠিন আবরণ পড়িতে থাকে। প্রায় দেখা যায় যে উত্তপ্ত মিশ্র তরল বস্তু শীতল হইলে উহাতে একটা সর পড়ে। এইরূপে আমাদের এই ভূপৃষ্ঠের সূত্রপাত হয়। ঐ আবরণ যে একবারে দৃঢ় ও কঠিন হইয়া উঠে তাহা নহে। আদিম অবস্থায় উহা অত্যন্ত উষ্ণ ছিল; তলতলে ও চট্‌চটে—না তরল না কঠিন।

এই নাতিকঠিন আবরণ ভেদ করিয়া নানারূপ বস্তু বাষ্পাকারে বুদ্বুদের ন্যায় উঠিয়া একটা বহুদূর বিস্তৃত ঘন বায়ুবর্ত্তের সৃজন করে। ঐ বায়ুবর্ত্তে বহু যুগযুগান্তর ধরিয়া ভূমধ্য হইতে উত্তপ্ত বাষ্প উঠিতে থাকে। ক্রমশঃ যখন উত্তাপ যথেষ্ট কমিয়া যায়, তখন তরল বস্তুকণা আমাদের জলকণার ন্যায় ঐ বায়ুমণ্ডলে ঘন মেঘের সৃষ্টি করে। ঐ সকল মেঘের প্রধান উপাদান লবণ, গন্ধক ও মৃত্তিকা! দিগন্ত বিস্তৃত ঐ উত্তপ্ত গাঢ় মেঘ ভীষণবেগে ইতস্ততঃ পরিচালিত হইত। যেরূপ বায়ুতে লবণকণা, মৃত্তিকাকণা প্রভৃতি মেঘরূপে ভাসে, সেরূপ বায়ু আমাদের কল্পনার অতীত। জলকণা অপেক্ষা ঐ সকল মেঘকণা বহুগুণ ভারি। বাষ্পাকারে ভাসিতে থাকে তাহার কারণ উহাদের উত্তাপ। ক্রমশঃ তাপের হ্রাস হইতে থাকিলে ঐ বাষ্প সকল জমিয়া তরল হয় ও বৃষ্টিধারার ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পড়িতে থাকে এবং তথায় জমিয়া কঠিন হইয়া যায়। লবণ বাষ্পাকার হইতে তরল অবস্থায় আসিলে উহা যে কত উত্তপ্ত হয় তাহার ধারণা সহজে হয় না। সীসক সে উত্তাপে ফুটিতে থাকে; প্রকাণ্ড

হস্তিদেহ এক-সেকেণ্ডের মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া, সেই ভস্ম গলিয়া চলচলে হইয়া ফুটিতে ফুটিতে অদৃশ্য বাষ্পময় হইয়া যায়! এই অবস্থান্তর ঘটিবার সময় ভীষণ গর্জ্জন ও প্রচণ্ড অশনিপাত মুহুর্মুহুঃ হইতে থাকে—প্রলয়ের ঝড় অনবরত বহিতে থাকে। আমাদের জল লইয়া এখন যদি বায়ুর মধ্যে এত প্রাকৃতিক বিপ্লব সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত ঘন লবণ, গন্ধক, মৃত্তিকা প্রভৃতি লইয়া সেই বায়ুতে যে কি ভীষণ উৎপাত হইত তাহা কল্পনাতেও আনা দুষ্কর! এখন মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, আমরা পাই জল; সে সময়ের মেঘ ছিল অনিলীভূত লবণ, গন্ধকবাষ্প ও মৃত্তিকাবাষ্প প্রভৃতির সমষ্টি। বৃষ্টি হইত গলিত মৃত্তিকা, গলিত লবণ, তরল গন্ধক ও বালুকা। তাহার উপর আবার তেমনই ভীষণ উত্তাপ! এইরূপ প্রাকৃতিক বিপ্লবের মধ্যে আমাদের সর্ব্বংসহা ধরিত্রী ঠাকুরাণীর জন্ম হয়।

যে সকল বাষ্প সহজে তরল হয়, ক্রমশঃ বায়ুমণ্ডল হইতে সেই সমস্ত পদার্থ একে একে দলে দলে, কখনও মুষলধারে কখনও ঘোর আবর্ত্তে কখনও বা প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের সহিত ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে। জল ইহাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে ছিল। সেই সময় জলে লবণ প্রভৃতি দ্রবণীয় বস্তু গুলিয়া যায় এবং ভূপৃষ্ঠে সমুদ্রের সৃষ্টি করে। সাগরের জল তাই এত লোণা।

উত্তাপ যত কম হইতে থাকে, ধরাবরণ ততই পুরু ও শক্ত হইতে থাকে। জড়ের সাধারণ ধর্ম্ম—এই যে, উত্তপ্ত অবস্থা হইতে শীতল হইলে আয়তনের সঙ্কোচ হয়। উপরিস্থিত আবরণের এই সঙ্কোচের ফলে ভিতরের তরল বস্তুতে একটা বিষম চাপ পড়ে। ধরার এই চাপ সময়ে সময়ে এত বেশী হয় যে আভ্যন্তরীণ তরল পদার্থের প্রতিক্রিয়ারূপ বিপরীত চাপে ঐ আবরণে ফাট ধরে। ভিতরের গলিত পদার্থ ঐ চাপের দারুণ কাট দিয়া ভীষণ বেগে বাহির হইয়া পড়ে ও জমিয়া যায়। এইরূপে আমাদের মহাদেশ ও পর্ব্বত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। আবরণ যত পুরু হয় চাপও ততই বাড়ে এবং ভিতরের বস্তু ততই বেগে বাহির হইয়া অতি উচ্চ পর্ব্বতের সৃজন করে।

এই সময় উদ্ভিদ্ পদার্থের প্রথম উদ্ভব হয়। অচিরে ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ স্থলই ঘন বৃক্ষ পাদপে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ইহার কারণ তখন বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে অঙ্গারাম্ল অনিল (Carbonic acid gas) ছিল। ঐ বিষাক্ত বাষ্পে কোন জন্তুর বা পোকের বাঁচিতে পারে না, কিন্তু উহা উদ্ভিদের প্রাণকরী খাদ্য। তাই সেই প্রাথমিক নিবিড় অরণ্যানীতে একটিও পক্ষীর কাকলী শুনা যাইত না, কোন রাত্রিচর শ্বাপদ আহার অন্বেষণে ঘুরিত না। বৃক্ষগুলি নবীন ধরার ভূমিতে উচ্চতা, স্থূলতা ও বিশাল পল্লবশালিতায় অনুপমেয় রূপ ধারণ করিয়াছিল। নানা আকৃতির পত্র, নানা বিচিত্র চিত্র সমন্বিত বৃক্ষত্বক্ ও পল্লব সেই প্রাণীশূন্য বনের তিলার্দ্ধ স্থানও অনাবৃত রাখিত না। এই সকল তথ্যের প্রমাণ আমরা গভীর কয়লার খনিতে দেখিতে পাই। ঐ প্রকাণ্ড বৃক্ষাদি কালে ভূগর্ভে প্রোথিত হইলে, তাপ ও চাপ সহকারে বহু যুগ পরে কয়লার পরিণত হয়। খনি হইতে উত্তোলিত কয়লার চাপড়ার গাত্রে বৃক্ষপত্রের আকৃতি স্পষ্ট দেখা

যায়, কিন্তু একটি অস্থিরও দেহাবশেষ চিহ্ন বা কঙ্কালাদি পাওয়া যায় না। কয়লাতে বৃক্ষ কাণ্ডের আকৃতিও দেখা যায়।

ক্রমে ধীরে ধীরে যখন অঙ্গারাম্ল বাষ্প কমিতে থাকে, দুই একটি করিয়া প্রাণীর উদ্ভব দেখা যায়। যেন প্রকৃতি দেবী অতি সন্তর্পণে প্রাণময় জগতের অবতারণা করিতেছেন—মনে ভাবনা পাছে নূতন জগৎ সেই প্রাণে সহ্য না হয়। ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন দেহবিশিষ্ট প্রাণীর বাসের উপযুক্ত হইলে তখন এমন বৃহৎকায় ও অতিকায় রাক্ষস সৃষ্ট হয়, যে সেগুলি, যুগধর্ম্ম সহকারে একেবারে বিলুপ্ত না হইলে মানবের অস্তিত্বই হইবার নহে। প্রকৃতির খেলায় সেই সব প্রাণীদেরও লোপসাধন ঘটে। জলপ্লাবন তাহার একটি খেলা।

উপরে উক্ত হইয়াছে যে ভূমধ্যস্থ তরল বস্তুর প্রতিচাপে ভূপৃষ্ঠে ফাট ধরে। কয়েক বার এমন হইয়াছে যে, যে স্থানে ঐরূপ ফাট ধরিয়া একটা পর্ব্বত শ্রেণীর বা মহাদেশের উৎপত্তি আরম্ভ হইল, সেই স্থানের উপর গভীর সমুদ্র রহিয়াছে। এরূপ স্থলে আভ্যন্তরীণ তরল বস্তু নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রজল ভীষণ বেগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এক স্থানের অপরিমিত জলরাশি বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। যখন এইরূপ ঘটনা একটু বেশী পরিমাণে হয়, তখন এক স্থানের জল পৃথিবীর বাকী সকল স্থানকেই জলমগ্ন করিয়া ফেলে,—তখনই জলপ্লাবন ঘটে। প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই এইরূপ জলপ্লাবন ও "প্রলয়-পয়োধি"র কথা পাওয়া যায়। উহা অসম্ভব বা অনৈসর্গিক ব্যাপার নহে।

বাইবেল গ্রন্থে যে জলপ্লাবনের কথা আছে তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ ও কারণ ভূতত্ত্ববিদেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ সময়ে পৃথিবীর এক পার্শ্বে ইয়ুরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের কিয়দংশ ছিল এবং অবশিষ্ট অংশ গভীর সমুদ্রে আবৃত ছিল। ঐ সমুদ্রের তলদেশে উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত একটা প্রকাণ্ড ফাট ধরে এবং ভিতরের গলিত প্রস্তর, মৃত্তিকা, প্রভৃতি সেই বিস্তৃত ফাট দিয়া নির্গত হইতে থাকে। উপরের জলও ক্রমাগত সরিয়া পৃথিবীর সকল অংশের উপর ছড়াইয়া পড়ে। ঐ ঊর্দ্ধ প্রক্ষিপ্ত প্রস্তর ও মৃত্তিকারাশি জমিয়া উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রসৃত জলরাশি, এসিয়া, ইয়ুরোপ, আফ্রিকার সমগ্র অংশ সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ফেলে। এইরূপেই ঐ জলপ্লাবন ঘটে।

ঐ প্লাবনের এই কারণ নির্দ্দেশ বহু গবেষণার ফল। প্রধানতঃ আমেরিকাখণ্ডের ভূমধ্যমৃত্তিকার স্তর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে আগাগোড়া গলিত বস্তু জমিয়া উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাতে জলময়তার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। অন্যান্য মহাপ্রদেশেও ঐরূপ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে সর্ব্বনিম্ন মৃত্তিকা স্তর ঐরূপ গলিত বস্তু জমিয়া প্রস্তর হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ঊর্দ্ধ স্তর অপর রূপ মৃত্তিকার দ্বারা গঠিত। এই উপরিতন মৃত্তিকা স্তরে বহু জলজন্তুর দেহাবশিষ্ট কঙ্কাল প্রোথিত দেখা যায়। সামুদ্রিক শম্বুক প্রভৃতির খোলা প্রচুর পাওয়া যায়। অপিচ উহার গঠন দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে উহা জল হইতে অধঃপতিত বস্তুর সমষ্টি মাত্র।

প্লাবনের জলরাশি সমস্ত স্থান ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিলে তথাকার সমস্ত জীবই বিনষ্ট হইয়া যায়। ক্রমশঃ যেমন জল শুখাইতে থাকে, অনেক বস্তু সেই জল হইতে স্থলের উপর "পলি"রূপে পড়ে। জলচর জীবের দেহ ঐ পলিতে সমাহিত হইয়া যায় এবং কালক্রমে শরীর ও কঙ্কাল প্রস্তরীভূত হইয়া ঐ প্রলয়ের পরিচায়করূপে থাকিয়া যায়। আমেরিকায় যে ঐরূপে প্লাবিত হয় নাই তাহাও বেশ বুঝা যায়। গলিত বস্তু জমাট বাঁধিয়া যে কঠিন দ্রব্য হয় তাহার কোনরূপ আভ্যন্তরিক স্তর-বিন্যাস লক্ষিত হয় না। পলিপড়া মাটির বা পাথরের চাপড়া ভাঙ্গিলেই উহার ভিতরে স্তরবিন্যাস ও জলজীবের দেহাবশেষ দেখা যায়।

সুতরাং দেখা গেল যে জলপ্লাবন পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনের বাহ্য উচ্ছ্বাস মাত্র। সমুদ্রের নিম্নস্থ প্রদেশ হইতে উত্থানশীল গলিত প্রস্তর ও মৃত্তিকা রাশিই উহার অভ্যন্তর কারণ। জলপ্লাবনে এককালে সমগ্র পৃথিবী যে জলমগ্ন হয় তাহা সত্য নহে। একদিকে যেমন একটা মহাদেশ সমুদ্রগর্ভ হইতে মাথা তুলে, সেই স্থানের জলরাশি সরিয়া গিয়া অপর স্থানসমূহ প্লাবিত করিয়া ফেলে। ইহাতে অস্বাভাবিক বা অনৈসর্গিক কিছুই নাই।

ভূপিণ্ডের অন্তস্তাপের ফলে যে বহিরাবরণের স্থানে স্থানে ফাট ধরিয়া থাকে, তাহা যেখানে সেখানে বা যেমন তেমন ভাবে হয় না। ঐ ফাট ধরার একটা সুনিয়ম দেখা যায়। হয় এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্য্যন্ত লম্বা-ভাবে কিম্বা নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরে ঐ মেরুদ্বয় দুই পার্শ্বে রাখিয়া ফাট ধরিয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় পর্ব্বতশ্রেণী ও মহাপ্রদেশের প্রস্থতি ভাল করিয়া দেখিলেই উক্ত তথ্য স্পষ্টই বুঝা যাইবে। ইউরাল্ প্রভৃতি পর্ব্বতপুঞ্জ, আফ্রিকা ও আমেরিকার, এই প্রথম শ্রেণীর ফাটের ফল। হিমালয়, এসিয়া ও ইয়ুরোপ প্রভৃতির উদ্ভব দ্বিতীয় শ্রেণীর ফাটের দরুণ হইয়াছে।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে ১৫টি জলপ্লাবনের চিহ্ন ভূপৃষ্ঠে পরিলক্ষিত হয়। এক এক বারে কোন না কোন উচ্চ পর্ব্বত বা মহাদেশ সৃষ্ট হইয়াছে ও বাকি ধরা জলমগ্ন হইয়াছে। প্রথম প্রথম এই ঘটনা মুহুর্মুহুঃ হইত। পিঞ্জরাবদ্ধ কেশরী প্রথম প্রথম যতই না চাঞ্চল্য দেখায়। ক্রমে যেমন তাহার তেজ ক্ষয় হইতে থাকে, খাঁচায় এক কোণে 'গোঁজ' হইয়া পড়িয়া গর্জ্জায়! আমাদের ধরণীদেবীর সেই অবসাদের অবস্থা এখন আসিয়া পড়িয়াছে। তবে তেজ যে এখনও লুপ্ত হয় নাই তাহা প্রতি দীর্ঘশ্বাসেই বুঝা যায়। আগ্নেয়গিরির প্রত্যেক অগ্ন্যুৎপাতে আমরা বুঝিতে পারি যে এখনও ভিতরে আগুন নিভে নাই। তবে এক্ষণে উপরের আবরণ এত পুরু হইয়া পড়িয়াছে যে সহজে ওরূপ ফাট ধরিবার সম্ভাবনা নাই। বরং চাপের আধিক্য আগ্নেয়গিরি প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা উপশমিত হইবার সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে। আর তেজও তত নাই। সুতরাং ভূতত্ত্ববিদেরা সন্দেহ করেন আর জলপ্লাবন হইবে কি না। অপর-দিকে এখনও ভূপৃষ্ঠে স্থল অপেক্ষা জলের অংশ বহুগুণ বেশী। সুতরাং প্রশান্ত বা আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের নিম্নে ফাট ধরিলে দুই চারিবার যে জলপ্লাবন না হইতে পারে এমন নহে। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্লাবন অপেক্ষা

জলের গভীরতা অল্পই হইবে, কারণ স্থলাংশের পরিমাণ বাড়িয়াছে। ভারতে বিন্ধ্যগিরির চূড়া ডুবে কিনা সন্দেহ। শেষ প্রাবনে (Mosaic deluge) হিমালয়শৃঙ্গও বহু ক্রোশ জলের নিম্নে ছিল!

(শঃ ভঃ)

ব্রহ্মদেশের রমণী।

ব্রহ্মদেশের স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা এবং স্বাবলম্বনশীলতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সে দেশের স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা এবং অধিকার আমাদের দেশের পুরুষের চেয়ে কোনও বিষয়ে কম নহে। ব্রহ্মমহিলারা আপনাদের ইচ্ছানুসারে যখন তখন যেখানে সেখানে যাইতে পারেন এবং স্বদেশীয় বা বিদেশীয়, আত্মীয় বা নিঃসম্পর্ক পুরুষের সহিত স্বাধীনভাবে বাক্যালাপ করিতে পারেন। ইহাতে সে দেশের স্ত্রীলোকের কোনরূপ অসম্মান অথবা লজ্জাভয় নাই। দেশীয় প্রথানুসারে তাঁহারা অনেকটা পুরুষেরই মত পোষাক পরিচ্ছদ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বেণী বিনাইয়া কবরীবন্ধন করেন না। ঘনকৃষ্ণ দীর্ঘ কেশরাশি কুণ্ডলাকারে মস্তকের মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র পিরামিডের ন্যায় করিয়া জড়াইয়া রাখেন। তাঁহাদের মস্তকে কোনরূপ আবরণ থাকে না এবং অবগুণ্ঠন কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা জানেন না। সাধারণ পুরুষের সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে ইচ্ছামুক্ত-বদন দেখাইতে তাঁহাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ কিংবা সরম বোধ হয় না; বরং ইহার বিপরীতভাব, অবগুণ্ঠনবতী বাঙ্গালী মহিলাকে দেখিয়া অনেক ব্রহ্মরমণী ব্যঙ্গ ও হাস্য করিয়াছেন, দেখিয়াছি। বাঙ্গালাদেশের মধ্যবর্ত্তী অবস্থাপন্ন গৃহস্থ মহিলাদিগের যেরূপ অবরোধ আছে, ব্রহ্মদেশের রাজ-মহিষীরও সেরূপ অবরোধ নাই।

ব্রহ্মদেশের মহিলারা হাট বাজারের দোকানে গিয়া সকল প্রকার দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় করেন। কেবল যে দরিদ্রাবস্থার স্ত্রীলোকেরা হাটে বাজারে গিয়া ক্রয় বিক্রয় করেন তাহা নহে। ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরাও অবাধে হাটেবাজারে দোকান করিয়া থাকেন। সে দেশের "মিউক" আমাদের দেশের ডেপুটী বাবুর সমপদবীর রাজকর্ম্মচারী। জনৈক মিউকের পঁচিশ বৎসর বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যাকে বাজারে মুদির দোকান করিতে দেখিয়াছি। তথাকার সাধারণ স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রবয়ন, চুরুট প্রস্তুত, জামা সেলাই, কৃষিকার্য্য, সারথ্য এবং নৌকা-চালন প্রভৃতি কার্য্য করেন। ইহা ছাড়া রন্ধনাদি গৃহকার্য্য ত তাঁহাদিগকে করিতেই হয়। নানাবিধ কারুকার্য্যে ব্রহ্ম-মহিলাদের বিশেষ নৈপুণ্য আছে। লেখাপড়াতেও ব্রহ্মনারীদের অনধিকার নাই। নগরবাসী বড়লোকের মেয়েরা ত লেখাপড়া জানেনই, পল্লীগ্রামের কৃষক কন্যারাও লিখিতে পড়িতে এবং দ্রব্যাদির মূল্য হিসাব করিয়া লইতে পারেন।

স্বামী কিংবা পিতাপুত্রকে সঙ্গে না লইয়াও ব্রহ্মবাসিনীগণ ষ্টীমার বা রেলগাড়ীতে

চড়িয়া যথনইচ্ছা যাতায়াত করেন। অন্যায় দেখিয়া যদি কোনও পুরুষ অভিভাবকহীন অবস্থায় গ্রামান্তর গমন করিতে তাঁহাদের একটুও আপত্তি হয় না। তবে তিনি তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে তাহার প্রতিফল তথাকার কোনও স্ত্রীলোককে বোকিনী দান করেন।

ব্রহ্মদেশের রমণী।

একদিন পেগু হইতে রেলগাড়ীতে গমন-কালে, আমি দেখিয়াছি, একজন বিদেশীয় পুরুষ জনৈক ব্রহ্মমহিলার গা-ঘেঁসিয়া বসিয়া তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া কি একটি বিদ্রূপ করিয়াছিল। ইহাতে বিলক্ষণ উত্তেজিত হইয়া সেই মহিলা পায়ের চটিজুতা খুলিয়া সেই

লোকটিকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের এইরূপ পুরুষোচিত অসীম সাহসের পরিচয় পাইয়া আমরা একেবারে অবাক্ হইয়া রহিলাম। এই অযথা অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য যখন সেই ব্যক্তি একটু উত্তেজিত হইল, অমনি গাড়ীর সমুদয় দেশীয় নরনারী উক্ত মহিলার পক্ষ লইলেন। ইহাতে সেই অপমানিত লোকটি নিজ কর্ম্মের ফল পাইয়া নিরস্ত হইতে বাধ্য হইল। শুনিলাম, সে দেশের সকলেই স্ত্রীলোকের অধিকার ও মর্য্যাদা রক্ষার্থে যথাসাধ্য যত্নবান। সমাজ মধ্যে এ প্রকার অবাধ অধিকারলাভ করাতেই ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীলোকেরা এরূপ সাহস, স্বাধীনতা স্বাবলম্বন ও আত্মরক্ষার ভাব দেখাইতে সক্ষম।

শ্রীকালাচাঁদ দাশাল

ভারতে নাট্যের উৎপত্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পুতুল-নাচ।

যে সকল মূল-উপাদান নাট্যের সংগঠনে সাহায্য করিয়াছে, তন্মধ্যে এক জাতীয় নাট্যের উল্লেখ করা আবশ্যক—যদিও সে শ্রেণীর নাট্যকলাকে সাহিত্যিক ইতিহাস একেবারেই আমলে আনে নাই:—তাহা পুত্তলী-নাট্য। বাঙ্গালাদেশীয় পুতুল-নাচের খ্যাতি বিশ্বব্যাপ্ত, কিন্তু বস্তুতঃ উহার উৎপত্তিস্থান নহে। ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম ও মহাকাব্যগুলির সহিত পুতুল-নাচ যবদ্বীপে ভারতবর্ষ হইতেই আসিয়াছে। বহুকাল হইতে পুতুল-নাচ ভারতবর্ষের নিকট সুপরিচিত। মানবীয় কার্য্যের সহিত তুলনা করিয়া, মহাভারত অনেকস্থলে এই পুত্তলী-নাট্যের উল্লেখ করিয়াছে। "এই সকল কাষ্ঠ পুত্তলী যাহা সূত্রের দ্বারা চালিত হয়।" (সূত্রপ্রোত) (১)

বৃহৎকথা-গ্রন্থে (২) অসুরমায়ার দুহিতা সোমপ্রভা, পিতৃহস্ত গঠিত কতকগুলি পুত্তলীর দ্বারা, স্বকীয় সখী কলিঙ্গসেনার চিত্তবিনোদন করিয়াছিল। "তন্মধ্যে একটী পুত্তলী উড়িয়া গেল এবং একটা ফুলের মালা কুড়াইয়া কলিঙ্গসেনার নিকট আবার আনিয়া দিল; একটি পুত্তলী জল আনিল। একটী নৃত্য করিতে লাগিল, আর একটি বাক্যালাপ করিতে লাগিল।" এই কথনশীল পুত্তলী, বাল-রামায়ণের একটি গর্ভাঙ্কেও পরিলক্ষিত হয়। (পঞ্চমাঙ্ক, গর্ভাঙ্ক)।

---

(১) V 2nd, 1886, 88-9 ; III, 1104।

(২) কথা সরিৎ সাগর—তরঙ্গ ৫৮।

সীতার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য রাবণ বারংবার যাচ্ঞা করিয়াও যখন ব্যর্থমনোরথ হইল, তখন তাহার গর্ব ও প্রেমলালসা উভয়ই ক্ষুণ্ণ হইল; তাহার চিত্ত কিছুতেই সান্ত্বনা মানিল না। তখন তাঁহার মন্ত্রী তাঁহার চিত্ত-বিনোদনের জন্য, একটা উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন; তিনি বিশারদ নামক একজন শিল্পীকে সূত্রের দ্বারা চালিত হইতে পারে এইরূপ দুইটি কাষ্ঠপুত্তলী নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন; আর বলিলেন, একটি ঠিক সীতার মত দেখিতে হইবে, আর একটি সীতার ধাত্রীর কন্যা এবং সেই সম্পর্কে সীতার ভগিনী নিস্থরিকার মত দেখিতে হইবে। এই পুত্তলী দুটি রাবণের সম্মুখে আনীত হইল। রাবণ মদনোন্মত্ত হইয়া কাষ্ঠময়ী সীতার উপর ঝাঁপিয়া পড়িল, তাহাকে চুম্বন করিতে লাগিল, সাধ্যসাধনা করিতে লাগিল। একটি শুকপক্ষী পুতুলের মুখে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাকে আবৃত্তি করিতে শেখান হইয়াছিল, সেই শুকপক্ষী রাবণের প্রার্থনার উত্তর করিতে লাগিল। যে শিল্পী সূত্র ধরিয়া থাকে তাহাকে সূত্রধার বলে। (V, V, ৬) মারাঠা ও তামিল দেশে আজও পর্য্যটনকারী পুত্তলী-নাট্যসম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়; (মারাঠি ভাষায় কলাসূত্রী-বাহুল্যা) তাহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পর্য্যটন করে। কৃষকেরা এই পুত্তলী-নাট্য ছাড়া আর কোন নাট্যের কথা জানে না। পুতুলগুলি কাঠের কিংবা কাগজের এবং উহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেশ নিপুণ ভাবে গঠিত। উহারা নৃত্য করে, যুদ্ধ করে, দাঁড়াইয়া থাকে, নিদ্রা যায়, নাট্যাভিনয়ের সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন করে। পরিচালক ও তাহার সহকারী সূত্র ধরিয়া থাকে এবং নাট্যোল্লিখিত পাত্রদিগের উক্তি-গুলি আবৃত্তি করে। (৩)

সম্ভবতঃ পঞ্চাল দেশ হইতে (আধুনিক তিহুত) এই পুত্তলীনাট্যকলা সমস্ত ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছে। কেননা, এখনও উহা পাঞ্চালী বা পাঞ্চালিকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্কিম-যুগের কথা।

(৩)

"সাহিত্য" পত্রে, "বঙ্কিম-প্রসঙ্গে" দেখিলাম, লেখক বলিতেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিকটে বলিয়াছিলেন, যে "কমলা-কান্ত"ই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা।

এই উক্তিতে যদি ভ্রম না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের উপন্যাসের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ঠিক মতপ্রকাশ করিতে পারিতেন না; যে সময়ে যে বইখানি তাঁহার নিকটে অধিক প্রিয় বলিয়া মনে হইত, সেই সময়ে সেই বইখানিকেই, তিনি ভাল বলিতেন। আমাদের এবংবিধ ধারণার কারণ বলিতেছি।

দীনবন্ধু পুত্র শ্রীযুত ললিতচন্দ্র মিত্র মহা-

(৩) নন্দর পণ্ডিত, বিক্রমোর্ব্বশী: টীকা—পৃ ৪।

শর, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে, তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। কথা প্রসঙ্গে ললিত বাবু জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার কোন্ উপন্যাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ? উত্তরে বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন, "কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ এবং রাজসিংহ।" আনন্দমঠের নাম না করাতে, ললিতবাবু কিছু বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, as a patriotic work আনন্দমঠ অতুলনীয়।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "ও 'সেন্সে' খুব ভাল বটে, কিন্তু ইহাতে আর্ট কম।"

কবিবর শ্রীযুত অক্ষয়কুমার বড়ালের মুখে শুনিয়াছি, তিনি একবার বঙ্কিম বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইয়াছিলেন, "দেবী চৌধুরাণীই আমার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।"

এখন কাহার কথা ঠিক ?

অতঃপর, "বন্দেমাতরং" সঙ্গীত সম্বন্ধে পূর্ণবাবুর মুখে শুনিয়াছি, বঙ্কিম বাবু, "বন্দে মাতরং" সঙ্গীতটী যখন "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন তাহার কার্য্যাধ্যক্ষ রামবাবু বলেন, "একটা ছোট গানে বঙ্গদর্শনের পেট ভরিবে না, আপনি একখানি উপন্যাস ধরুন।"

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিলেন "এ গানের মহিমা তোমরা এখন বুঝিবে না। যদি পঁচিশ বছর বাঁচিয়া থাক, তখন দেখিবে এক দিন এই গানে সারা বঙ্গ মাতিয়া উঠিবে।' ললিত বাবু, এই কথাগুলির সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ১৩১৩ সালের ১৭ই আষাঢ়ে, কাঁটালপাড়ায়, তাঁহার সহিত পূর্ব্ব কথিত রামবাবুর সাক্ষাৎ হয়। রামবাবুও ঠিক পূর্ণবাবুর কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই অসাধারণী দৃষ্টি ও প্রতিভা-প্রসাদাৎ আজ "বন্দেমাতরং" মন্ত্রের নামে শুধু বাঙ্গালীর কেন——ভারতবাসীর ——ত্রিংশাধিক কোটী মানবের নৃত্যতি মানস শিখী ! এবং তাহার ছন্দ আর কবিত্ব আর গাম্ভীর্য্যের ভিতর দিয়া সকলেই যেন স্বদেশ-লক্ষ্মীর শরীরিণী মূর্ত্তি দেখিতে পায়।

বঙ্কিমচন্দ্র, রৌদ্রতাপ মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্র, যখন হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট,—সেই সময়ে স্বর্গীয় ভূদেব-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্রও ঐ স্থানের ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কাছারি বন্ধ হইয়া গেলে, বঙ্কিমবাবু ও আর একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ৺ গৌরদাস বাবু দুইখানি গাড়ী ভাড়া করিলেন। ভূদেববাবুর পুত্রও সঙ্গে ছিলেন,—তিনিও একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। সেদিন, তাঁহাকে কোন কার্য্য-বশতঃ রেভিনিউ বোর্ডে যাইতে হইয়াছিল।

পিতার নিকট হইতে পুত্র যখন গাড়ীর ভাড়া চাহিলেন,—পিতা তখন আপত্তি করিলেন।

পুত্র বলিলেন 'অন্যদিনের মত আমি হাঁটিয়া হাওড়ার পুল পার হইয়া, ট্রামে করিয়া রেভিনিউ বোর্ডে যাইতাম, কিন্তু আজ দু' জন ডেপুটী গাড়ী ডাকাতে আমাকেও বাধ্য হইয়া গাড়ী ভাড়া করিতে হইয়াছিল।

ভূদেব বাবু তখন আর কিছু বলিলেন না। তাহার পর তাঁহাকে একদিন ব্যবস্থাপক সভায় যাইতে হয়। ফিরিয়া আসিয়া, তিনি পুত্রকে ডাকিলেন। বলিলেন, "দেখ, আমি বুড়া হইয়াছি,—কিন্তু তবু হাঁটিয়াই পুল পার

হইয়া ট্রামে চাপিয়া কাজে গিয়াছি; গাড়ী

ডাকিয়া বাজে খরচ করি নাই। বাস্; অপব্যয়টা ভাল নয়।"

এইরূপে ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া, উক্ত মহাপুরুষ মৃত্যুকালে স্বজাতির উন্নতিবিধানের নিমিত্ত একলক্ষ ষাট্ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন!

বঙ্কিমচন্দ্র, রৌদ্র সহ্য করিতে পারিতেন না বটে—কিন্তু শীতের বেলায় তাঁহার ভিন্ন ব্যবস্থা। 'হাড়ভাঙ্গা' শীতের রজনীতেও, তিনি শয়নকক্ষের দুটি জানালা, সমস্ত রাত্রি খুলিয়া রাখিতেন। সে জন্য, তাঁহার দেহ অসুস্থ হইত না। তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ যে খুব বিচিত্র ছিল,—তা' নয়। বাড়ীতে তাঁহার গায়ে একটী হাত কাটা পাঞ্জাবী থাকিত; কোন কোনদিন গেঞ্জি পরিধান করিতেন। কেবল কাপড়ের বেলায় তিনি একটু সৌখীন ছিলেন। মোটা কাপড় ভালবাসিতেন না,—খুব মিহি দেশী কাপড় পরিতেন।

ললিত বাবুর মুখে একটি হাসির গল্প শুনিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বারুইপুরে থাকিতেন। একদিন জগদীশ বাবু হঠাৎ সেখানে গিয়া উপস্থিত।

জগদীশচন্দ্র, বঙ্কিমকে আপনার আগমন-সংবাদ দিলেন না। তাঁহার বাসার সম্মুখে গিয়া গান ধরিলেন "আমি বাগবাজারের মেথরাণী!"

ভিতর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র; চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন "নিকাল্ দেও—নিকাল দেও!"

বলা বাহুল্য, গান শুনিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র, এই অপূর্ব্ব "মেথরাণীকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

এইবারে, "নীলদর্পণ" ও দীনবন্ধুর সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্। দীনবন্ধু, নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে, একটী ক্ষুদ্র কুটীরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের কুটীরের অনতিদূরেই একটী নীলের আড়ৎ ছিল। এবং দীনবন্ধুর জন্মভূমিই নীল-বিপ্লবের কেন্দ্রস্থান। সেইজন্যই, নীলদর্পণ প্রণয়ন-কালে, গ্রন্থকারের বহুদর্শিতা অনেকটা সুবিধা করিয়া দিয়াছিল।

দীনবন্ধু, যখন পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের অধীনে সুপারিণ্টেনডেণ্ট,—সেই সময়ে ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, নীলদর্পণ, ঢাকার একটী ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

নীলকরগণের অত্যাচারে তখন বঙ্গদেশ জর্জ্জরিত। সে অত্যাচারের বিবরণ, এখন সুপরিচিত ঐতিহাসিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং সে সম্বন্ধে আমরা বেশী কিছু বলিব না। "নীলদর্পণ" যখন প্রকাশিত হয়, সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তাঁহার "হিন্দু পেট্রিয়টে" নীলকরগণের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লেখনীচালনা করিতেছিলেন। একেই ত' তাঁহার শক্তিশালিনী রচনায় সকলের হৃদয়ে অগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল,—তাহার উপরে "নীলদর্পণ" প্রকাশিত হইয়া "অনলে ঘৃতাহুতি" প্রদান করিল। সামান্য উত্তেজনা সহসা প্রবল এবং সার্ব্বত্রিক হইয়া দাঁড়াইল। জন-সাধারণ, "নীলদর্পণ"কে সাগ্রহে গ্রহণ করিল।

১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে নীলদর্পণ, ঢাকায় মহাসমারোহে অভিনীত হইল। ঐ বৎসরেই বোম্বের গ্রাণ্ট রোড থিয়েটারে, "নীলদর্পণ" অভিনয়ের উদ্যোগ চলিতে থাকে। সুতরাং, বুঝিতেই পারা যাইতেছে, এই প্রসিদ্ধ উত্তেজনার স্রোত, কেবল বঙ্গদেশে আবদ্ধ থাকে নাই; পরন্তু সমগ্র ভারতে ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া গিয়াছিল।

১৮৭২ খৃঃ অব্দের ৭ই ডিসেম্বর, কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে নীলদর্পণ অভিনীত হয়। সেই অভিনয়ে, জনসাধারণের মন যে কিরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিত, তাহা ভাষায় প্রকাশ্য নয়। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, একদিন "নীলদর্পণে"র অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। অভিনয়ের স্বাভাবিকতায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়, সহসা এমনি আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন, যে অত্যাচারোদ্যত সাহেবের ভূমিকায় নট-সম্রাট ৺অমৃতলাল মিত্রের মস্তক লক্ষ্য করিয়া, আপনার সুপ্রসিদ্ধ "তালতলা"র বৃহৎ চটিজুতা ছুঁড়িয়া বসিলেন। অভিনেতার আহত ললাট হইতে রক্তধারা বহিল। এবং সেই শোণিত, তাঁহারই জন্মভিলকে পরিণত হইল!

অবিলম্বে "নীলদর্পণ" ইংরাজীতে অনূদিত হইল। অনুবাদ করিয়াছিলেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত,—কিন্তু লং সাহেবের নামেই

তাহা প্রকাশিত এবং প্রচারিত হয়। বিলাতেও, সিম্‌প্‌কিন্ মার্শেল কোম্পানী,—ইংরেজী নীলদর্পণ বাহির করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, ইয়োরোপের আরও অনেক ভাষাতে "নীলদর্পণে"র একাধিক অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছিল।

লং সাহেব, ইংরাজী "নীলদর্পণে"র

একটী ভূমিকাও লিখিয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে, সি, এইচ্, মাস্থুয়েলের, "Calcutta Printing and Publishing Press" নামক ছাপাখানায় ১০নং ওয়েষ্টেনর্স লেন হইতে "নীলদর্পণ" মুদ্রিত হইল। উপরে লেখা ছিল :—"Nildarpan or The Indigo Planting Mirror, a drama translated from the Bengalee, by a Native।" ৫০০ শত সংখ্যায় পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। মুদ্রণব্যয় দিয়াছিলেন,—লং সাহেব নিজে।

অনুবাদ, প্রকাশিত হইলে, ইংরাজ সমাজে লং সাহেবকে যে কত দূর অপদস্থ হইতে হইয়াছিল, তাহা আর বলিবার নয়। বাস্তবিক, উক্ত অনুবাদ বাহির করিয়া, মহানুভব লং যথেষ্ট সৎসাহস ও দয়াশীলতা দেখাইয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, পতিতের দুঃখে এবং দীনের ক্রন্দনে, তিনি নিজের প্রাণ দিয়া কাঁদিতে জানেন। এ দৃশ্য দুর্লভ।

লং সাহেবের উপস্থিত বিপদে, রাজা রাধাকান্ত দেবপ্রমুখ কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, তাঁহার নিকটে সহমর্ম্মিতাসূচক পত্র প্রেরণ করিলেন।

অবশেষে, ১৮৬১ খৃঃ অব্দের ১২শে জুলাই, শুক্রবার, জেম্‌স লংএর নামে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। অপরাধ, ইংলিশম্যানের সম্পাদক এবং নিম্নবঙ্গের নীলকরগণের মানহানি করা। চারদিন ধরিয়া বিচার চলিল।

বিচারকালে আদালতগৃহ খেতাঙ্গ এবং শ্যামাঙ্গ উভয় শ্রেণীর জনতাতেই পূর্ণ হইয়া যাইত। একেবারে তিলধারণের স্থান থাকিত না। এই জনতার ভিতরে, "নীলদর্পণ"কার দীনবন্ধুও উপযুপরি প্রত্যহ উপস্থিত থাকিতেন। মিঃ জেম্‌স্ কট্‌লেণ্ড্, তাঁহার English Rule and Native Opinion in India নামক পুস্তকে এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন "that he was present in Court and ready to exchange places with Mr. Long if that had been possible."

২৪শে জুলাই, বিচারপতি রায় দিলেন। ফলে, লং সাহেবের একমাস কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা জরিমানা হইল। জরিমানার টাকা, জোড়াসাঁকোর, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ প্রদত্ত হইল। বিচারফল শ্রবণ করিয়া, মহানুভব লং অবিচলিত হৃদয়ে বলিলেন "আমি এখন যাহা করিয়াছি, ভবিষ্যতে আবার তাহা করিব।" ("What I have done now, I will do again.")

বিচারপতি ছিলেন Sir Mordaunt Wells। বিচারকালে—যেখানে পক্ষপাতিত্ব বা জাতিবিদ্বেষ নাই—সেই আসনে বসিয়া, তিনি দেশীয়গণের উপরে এবং লং সাহেব ও রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির প্রতি অনেক প্রলাপ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অবিলম্বে, ১৮৬১ খৃঃ অব্দের ২৮শে আগষ্ট, স্যর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নাটমন্দিরে, বিচারপতির ঐ সকল উক্তির প্রতিবাদের জন্য এক সভা আহূত হইল। সভাক্ষেত্রে, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা কালিকৃষ্ণ ঠাকুর,

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা কালিপ্রসন্ন সিংহ, শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (তখনও মহারাজা হন নাই) ও শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। সভার অধিবেশনে, পরে গণেই ফল হইয়াছিল।

এই সভার দুইদিন পরে, লং সাহেব কারাগার হইতে বাহির হইলেন। তৎকালে, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রায় দুই তিনশত ভদ্রলোক কারাগারের নিকটে উপস্থিত ছিলেন।

লং সাহেব স্বাধীন হইয়াই উক্ত বিষয় সম্বন্ধেই, আবার এক-খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা বাহির করিলেন।

স্বর্গীয় স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর।

এই "নীলদর্পণে"র সংস্রবে আসিয়া মাননীয় মিঃ সিটনকারও কিছু কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নীলদর্পণে'র অনুবাদ করিয়া, একেবারে পরিত্রাণলাভ করেন নাই। গোপনে, তিনিও তিক্তমধুরগোছের কিছু কিছু পাইয়াছিলেন।*

বাস্তবিক, দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" তৎকালে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে, এক উত্তেজক মন্ত্র ধারা ঢালিয়া দিয়াছিল। বাঙ্গালীর চিরবিখ্যাত অত্যাচারসহ হৃদয়ে, তাহা এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব নবভাবের

* নীলদর্পণ সংক্রান্ত বিষয় বর্ণনায়, আমি শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র মিত্রের Indigo Disturbance নামক পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

প্রেরণা আনয়ন করিয়াছিল। নীলদর্পণের প্রকাশে, বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যে মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়। বঙ্গের দীন আর্ত্তগণের কাতর ক্রন্দন নিবারিত হয়। এবং অত্যাচারী নীলকরগণ, আপনাদের মৃত্যুবান পরহস্তগত দেখিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। এক 'নীলদর্পণ', এই তিনদিক্ রক্ষা করিয়াছিল।

উপকারিতা হিসাবে যদি নাটকের আসন নির্দ্ধারণ করা হয়, তাহা হইলে, কিছু মাত্র অত্যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, অনায়াসে বলা যায়, "যে নীলদর্পণের সহিত সমপদগর্ব্বী নাটক, অদ্যাবধি বঙ্গসাহিত্যে একখানিও প্রণীত হয় নাই। কারণ, আর কাহারও নাটক, "নীলদর্পণে"র মত বাঙ্গালীর অভাব মোচনার্থ এতদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

"নীলদর্পণ" যে ভাষায় রচিত হইয়াছিল, এখন তাহা অচল। বিদ্যমান যুগের রচনাদর্শ ভিন্ন প্রকার। হয়ত আর অর্দ্ধ শতাব্দী পরে "নীলদর্পণে"র দীর্ঘ সমাস কণ্টকিত কৃত্রোপকথনের ভাষা, ধৈর্য্যহীন পাঠকের নিকটে অপঠিত থাকিবে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়! অমরত্বের পথায় "নীলদর্পণে"র পরিপন্থী কিছু নাই। কারণ, ভাষা-রীতি চিরকালই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, —পরিবর্ত্তিত হইবে। ইংলণ্ডীয় কবি চসারের ভাষা, এখন কেহ পড়িতে পারে না। শেক্‌স্‌পিয়ারের রচনাদর্শের সহিত, ইংরাজি সাহিত্যের বিদ্যমান রচনাদর্শ মিলাইতে গেলে যথেষ্ট বিভেদ দেখা যায়। তবে কি চসার এবং শেক্‌স্‌পীয়ার মরিবেন? অসম্ভব।

অতঃপর, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের কথা বলিয়া উপস্থিত অধ্যায় সমাপ্ত করিব।

যে মহাত্মাগণ, বঙ্গসাহিত্যের বেদী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,—কালীপ্রসন্ন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ভগবান, তাঁহাকে অল্প কালের জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু এই স্বল্প পরমায়ু লইয়া, কালীপ্রসন্ন বঙ্গবাসীকে যেরূপ বিরাট উপহার দান করিয়া গিয়াছেন,—কয় জন তাহা পারেন? তিনি ধনীর সন্তান। প্রবাদ বলে, কমলার সঙ্গে বাক্‌দেবীর চির-বিবাদ। কিন্তু এখানে ঝগড়া কাঁটি মোটেই ছিল না,—মাখামাখি ছিল খুব বেশী রকম।

বাঙ্গালীকে শিক্ষা দিবার জন্য,—তাহাদের নৈতিক জীবনকে পুর্ণ-গঠন করিবার জন্য তিনি অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত, বঙ্গভাষা সাহিত্যভাণ্ডারে দান করেন। এ 'দান' মহৎ দান এবং ইহাই তাঁহার অমরত্বের সোপান। এই মহাভারতের অনুবাদ কার্য্য সমাপ্ত হইবার পরে, তিনি অল্পদিন মাত্র পৃথিবীতে ছিলেন। এই কাজ করিবার জন্যই যেন তাঁহার পৃথিবীতে আগমন।

মহাভারত ছাড়া, আর একটী জিনিষ তিনি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। তাহা "হুতোম্ প্যাঁচার নক্‌সা।" টেকচাঁদ ঠাকুরের পদানুসরণে তিনি বই খানি লিখিয়া ছিলেন বটে,—কিন্তু তাহাতে তাঁহার নিজস্ব মৌলিকতার অভাব নাই। তাঁহার স্বাভাবিক ব্যঙ্গ ও পরিহাসপটুতার রসধারায় অভিষিক্ত হওয়াতে, বইখানি সেকালের অনেকের প্রাণরক্ষক ছিল। হুতোমের

চাবুক যাহারপৃষ্ঠে পড়িয়াছে, সে জ্বালায় অস্থির হইয়াছে। কেহ কেহ কিছু শিক্ষা-লাভও করিয়াছিল, কিন্তু অনেকেই সে বিষম জ্বালা ভুলিতে না পারিয়া, তাঁহার পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু তিনি কাহারও দিকে দৃক্‌পাত করেন নাই। ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ, (যতদূর জানি) সর্ব্বপ্রথমে তৎকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

দুর্নীতিদুষ্ট সমাজের প্রতি প্রচ্ছন্নব্যঙ্গ, কেবল তাঁহার পুস্তকেই যে পাওয়া যায় এমন নহে,—তাঁহার দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ভিতরেও তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

লেখকের পূজনীয় পিতামহ মহাশয়, একবার কোন কার্য্যবশতঃ কালীপ্রসন্ন বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। তখন প্রভাতকাল,—কালী প্রসন্ন তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই। কাজেই তাঁহাকে বৈঠকখানায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে হয়।

ইতিমধ্যে ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই বাবু?"

"কি আর চাইব বাপু, তোমার বাবুকে চাই।"

"আজ্ঞে না, বাবুর হুকুম, কোন ভদ্রলোক বাড়ীতে এলে তাঁকে জিজ্ঞেস কর্ত্তে বলে, তিনি তামাক চান কি মদ চান?"

পিতামহ মহাশয়, ভৃত্যের কথা শুনিয়া একেবারে অবাক্!

তাহার পর, কালী-প্রসন্ন বাবুর সঙ্গে দেখা হইলে, সকল রহস্য জানা গেল। কালীপ্রসন্ন বলিলেন "মহাশয়, সেকাল আর নাই, তখন বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগত এলে এক বরাদ্দ ছিল,

তামাক; এখনকার বাবুসাহেবদের সুধু তামাকে আর মন ওঠে না, মদ না হলে আনন্দ জমে না। কাজেই আমাকে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা কর্ত্তে হয়েছে;—আমি তামাক আর মদ দুই বাড়ীতে মজুত রেখেছি,—যিনি যা ইচ্ছে করেন।"

কালীপ্রসন্ন দীনের বন্ধু, কিন্তু ভক্তের যম ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে একটি আলমারি ছিল,—তাহার ভিতরে এক একজন ভণ্ড বামুনের মাথা হইতে কাঁচি দিয়া কাটা নম্বর দেওয়া বহুসংখ্যক টিকি ঝুলানো থাকিত। ঐ সকল "কর্ত্তিত-টিকি" ব্রাহ্মণের ভিতরে, কেহ ছিলেন তর্কনিধি, কেহ ছিলেন চূড়ামণি, কেহ ছিলেন বিদ্যানিধি বা বিদ্যাবাগীশ বা শিরোমণি। কাহারও অপরাধ, নারীহরণ, কাহারও অপরাধ যবনীসহবাস, কাহারও অপরাধ মুসলমানের সহিত আহার। নম্বর দেওয়া টিকিগুলির তলায় ঠাকুরদের নাম আর উপাধি আর লীলাখেলার ইতিহাস প্রাঞ্জলভাষায় লেখা থাকিত। এইরূপে কালী প্রসন্ন রাজ্যের টিকি আলমারির ভিতরে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ে ব্রাহ্মণেরা প্রাণান্তেও তাঁহার বাড়ীর পথের ত্রিসীমায় পা ফেলিতেন না। যাহারা নিতান্ত দায়ে পড়িয়া যাইতেন, তাঁহারা সযত্নে পরিপাটিরূপে আপনাদের তৈলপক্ক টিকিগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিতেন,—কি জানি, যদি কালীপ্রসন্ন একবার হঠাৎ টিকি দেখিয়া ফেলেন, তাহা হইলে আর আস্ত রাখিবেন না,—একেবারেই ধারাল কাঁচি চালাইয়া দিবেন,—তাঁহার দেবতাব্রাহ্মণ জ্ঞান নাই! টিকি উপাড় করিয়া কালীপ্রসন্ন অবশেষে "টিকি-কাটা জমিদার" নাম পাইয়াছিলেন।

এখন, কি ঘটনার জন্য টিকি-কাটার সূত্রপাত, তাহাই বলিব।

কালীপ্রসন্নের বাড়ীতে একটী গাভী ছিল। মাতার অনুরোধে, কালীপ্রসন্ন গাভীটিকে আপনাদের গুরুদেবকে দান করেন। এবং গুরুদেব, যাহাতে গাভীটিকে যত্নের সহিত পালন করেন, তাহার জন্য কিছু "মাসোহারা"র বন্দোবস্তও করিয়া দিলেন। গুরুদেব, মহাধার্ম্মিক ব্যক্তি,—মুখে সদাই দেবতার নাম,—সন্ধ্যাহ্নিক, ধ্যানধারণা, দশ্বরে পইতা আর দীর্ঘ টিকি প্রভৃতি যেগুলি থাকিলে গুরুদেব হইয়া পড়া যায়,—তাঁহার সে সকলের কিছুই অভাব ছিল না। দেবদুর্লভ ব্যক্তি!

যাহা হৌক, গুরুদেব অতঃপর কিছু ঘন ঘন শিষ্যের বাড়ী, পদধূলিতে পবিত্র করিতে লাগিলেন। বাবুকে কিছু বলিতে সাহস হয় না, সুতরাং কালীপ্রসন্নের মাতার কাছে গিয়া, কোনবার ঘাসের দাম বাড়িয়াছে বলিয়া, কোনবার অন্য কিছু বলিয়া, মিথ্যাকথায় ভুলাইয়া লুকাইয়া টাকা আদায় করিয়া লইয়া যাইতেন। গাভীর জন্য, কালীপ্রসন্ন যে "মাসোহারা" দিতেন, ভক্তিভাজন গুরুদেব তাহার কিরূপ সদ্ব্যয় করিতেন সে কথা জানি না। তবে, সমস্ত টাকাগুলিই যে গাভীর জন্য অপব্যয় করিতেন না,—তাহা নিশ্চয়!

এমনি কিছুদিন যায়। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, গাভীটি, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া কালীপ্রসন্নের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত!

তাহার পিছনে পিছনে আর এক মূর্ত্তি,—যমদূতের মত এক কশাই!

বিস্মিত কালীপ্রসন্ন কশাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই এখানে কেন?"

কশাই বলিল "বাবু, আমার গরু আপনার বাড়ীতে ঢুকেছে—তার পেছনে আমি এসেছি।"

"বটে, এ গরু তুই কোথায় পেলি"?

কশাই বলিল "হুজুর, এক বামুন আমাকে গরুটি বিক্রী করেছে। আমি কশাই।"

কালীপ্রসন্ন, তাহাকে আর কিছু বলিলেন না,—গাভীর দাম দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা যে কি, তাহা বুঝিতে তাঁহার আর বিলম্ব হইল না।

তাহার পর স্বয়ং গুরুদেব আসিয়া হাজির। কালীপ্রসন্ন, তাঁহাকে আর বেশি কিছু না বলিয়া, তাঁহার মাথার লম্বা টিকিটি চমৎকাররূপে সাফ্ কাটিয়া লইয়া ঠাকুরকে বিদায় করিয়া দিলেন। ইহার পর হইতে টিকিকাটা আরম্ভ হয়।

কালীপ্রসন্নের অনেক গুণ ছিল। আমরা সকল কথা, স্বল্পস্থানে বলিতে পারিব না। তিনি সাতিশয় সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। সঙ্গীতচর্চ্চার সুবিধার জন্য, তিনি আপনার বাড়ীতে একটী সঙ্গীত-সভা স্থাপন করেন।

কালীপ্রসন্ন, গতানুগতিক ছিলেন না। তিনি যে কাজে হাত দিতেন, বেশ একটু নূতনত্বের সহিত কাজটিকে সফল করিতেন। কাঠের বা অন্যান্য তানপুরার কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন, তানপুরার কাগজের তুম্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আদরে অনেক প্রসিদ্ধ গায়কের সম্মুখে তাহার গুণাগুণের পরীক্ষা হয়। তাহাতে জানা গিয়াছিল, কাগজের তুম্বে তানপুরা দিব্য বাজে,—তাহার স্বাভাবিক স্বরতরঙ্গের মধ্যে বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য বুঝিতে পারা যায় না।

(ক্রমশ)

জাঁদরেল কালু।

বাঙ্গালীও একদিন বীরজাতি ছিল। পৌরাণিক ও বৌদ্ধযুগে বাঙ্গালী বাহুবলে উত্তরে কাশ্মীর ও দক্ষিণে লঙ্কা হেলায় জয় করিয়াছিল এবং তাহার অর্ণবপোত ভারত সাগরময় ভ্রমণ করিয়া সবদ্বীপ বলিদ্বীপ ও সুমাত্রার উপকূল পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর জয়ঘোষণা করিত। সে দূরাতীতের কথা ছাড়িয়া দিলে,—মুসলমান যুগেও প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, ওড়াতি বীরগণ তাঁহাদের বীরত্ব কাহিনীতে ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু যে যুগে বাঙ্গালীর, সৌর্য্যবীর্য্য অতীতকাহিনী মাত্র—সেই আধুনিক যুগে ইংরাজের আমলেও অবসর প্রাপ্ত হইলে বাঙ্গালী তাহার বীরগৌরব দেখাইতে ত্রুটি করে নাই তাহারও একাধিক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া গেল।

অধিক দিনের কথা নয়—কিঞ্চিদধিক ৫০ বৎসর পূর্ব্বে—ভীষণ সিপাহীবিপ্লবের সময়ে উত্তর পশ্চিমপ্রদেশের (বর্ত্তমান যুক্ত প্রদেশ) দেওয়ানী আদালতের বাঙ্গালী-

বিচারপতি প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে বীরজনোচিত কৃতিত্ব দেখাইয়া রাজা প্রজা উভয়ের নিকট হইতে যে উপযুক্ত সম্মানলাভ করিয়াছিলেন সে বিষয় প্রমাণ করিবার লোক এখনও বোধহয় অনেকে বাঁচিয়া আছেন।*

আজ আমরা আর একজন বাঙ্গালীর বীরত্ব কাহিনী প্রকাশ করিতেছি যিনি এই ইংরাজ আমলেই—ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের মান সম্ভ্রম ও প্রেস্‌টিজ রাখিবার জন্যই যুদ্ধক্ষেত্রে অশেষ শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সম্মানিত "জেনারেল" উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই বাঙ্গালী জেনারেলের নাম কালিচরণ ঘোষ। ইনি জাতিতে কায়স্থ। পূর্ব্বে ইঁহার বাসস্থান হুগলী জেলার আকনা গ্রামে ছিল। পরে ইনি কলিকাতায় সুকীয়া ষ্ট্রীটে আসিয়া বাস করেন। তখন দেশে স্কুল কলেজ ছিল না। ছেলেদের মোটামুটি শিক্ষার জন্য তখন পল্লীতে পল্লীতে পাঠশালা, মকতব ইত্যাদি ছিল। কালিচরণ কিছুদিন পাঠশালায় বাঙ্গলা ও মকতবে পারসী শিক্ষা করেন এবং পরে একজন সাহেবের নিকট একটু কাজ-চালান গোছের ইংরাজি শিখিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কোনও সওদাগর আফিসে কার্য্য গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কর্ম্মবীর কালিচরণের সওদাগরী আফিসের সেই 'থোড়বড়িখাড়া—খাড়া বড়ি থোড়' গোছের একঘেয়ে চাকরী ভাল লাগিল না। তিনি কার্গো ইস্তফা দিয়া সরকারী পল্‌টনের রসদ বিভাগে প্রবেশ করিলেন এবং কার্য্যদক্ষতা গুণে ক্রমে রসদ বিভাগ হইতে পল্‌টনের খাস কেরাণীপদে নিযুক্ত হইলেন।

এই সময় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত মাহরাট্টাপ্রধান হোলকারের সহিত এক যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। ভারতেতিহাসে ইহাই 'দ্বিতীয় মাহরাট্টা যুদ্ধ' নামে প্রসিদ্ধ। ভরতপুরের জাঠরাজ এই যুদ্ধে হোলকারের সহিত যোগদান করিয়া তাহার ব্যবহারের জন্য ডিগ্‌ নামক দুর্গ ছাড়িয়া দেন। কিন্তু ইংরাজ জেনারেল লেক অল্পদিনের মধ্যেই ঐ দুর্গ দখল করিয়া লয়েন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত ভরতপুর রাজের পূর্ব্বে কোন শত্রুতাই ছিল না কিন্তু তিনি হোলকারের পক্ষাবলম্বন করায় ভারতের তদানীন্তন বড়লাট তাঁহাকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে এক বিপুলবাহিনী প্রেরণ করিলেন। কালিচরণ এই সৈন্যদলের কেরাণী ছিলেন। কাজেই তাঁহাকেও এই সঙ্গে যাইতে হইল। ইংরাজবাহিনী, ভীমপরাক্রমে বিপুল আয়োজনে ভরতপুর দুর্গ অবরোধ করিয়া তাহার ধ্বংসসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু ভগবান এবার ইংরাজের বাদী, দুর্গ রক্ষাকারিগণের ভীষণ আক্রমণে ইংরাজ সৈন্যদল পদে পদে হটিয়া আসিতে লাগিল। একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার নয়, চারি চারিবার তাঁহারা পশ্চাৎপদ হইয়া আসিল। তাহাদের তিন সহস্র সৈন্য হত, বহুসংখ্যক আহত ও স্বয়ং প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ রণক্ষেত্রে শয়ন করিলেন। অবশিষ্ট রহিল কেবল দুইটি মাত্র

* প্যারিমোহনের বীরত্বকাহিনী আমাদের লিখিত, ঐ ১৩১৪ সালের আশ্বিন সংখ্যা "ঐতিহাসিক চিত্রে" প্রকাশিত 'সিপাহী বিদ্রোহে ভেতো বাঙ্গালী' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। লেখক

পল্টন। সৈন্যাধ্যক্ষের মৃত্যুতে এ পল্টনও বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। হতাবশিষ্ট পল্টনের সুবেদার, হাবিলদারগণও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কালিচরণ এই পল্টনে ছিলেন। সর্ব্বদা যুদ্ধক্ষেত্রে সেনানীগণের সহিত একত্র থাকায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি কালিচরণ রণকৌশল অনেকটা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই অভিজ্ঞতার ফলেই ইনি হাবিলদার, সুবেদার হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চপদস্থ লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ও কাপ্তেনবর্গকে সময় সময় যুদ্ধ কৌশল, সৈন্যপরিচালনা, স্কন্ধাবারস্থাপন ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তি বা পরামর্শ দিতেন তাহাতে অনেক সেনানী অনেক সময় প্রকৃতই সুফল পাইতেন বলিয়া অনেকে ইঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতে বিধা বোধ করিতেন না। সাধারণ সৈন্যদলের মধ্যেও যুদ্ধ বিষয়ে তাঁহার এই অভিজ্ঞতার কথা—এই কৃতিত্বের বিষয় অপ্রকাশ ছিল না। সুতরাং এই বিষম বিপদের সময় হতাবশিষ্ট হাবিলদার, সুবেদার ও সাধারণ সৈন্যগণ মিলিত হইয়া কালিচরণকে ধরিয়া বলিলেন "কেরাণীবাবু! আর দেখিতেছেন কি, সব গেল—মান সম্ভ্রম, পদমর্য্যাদা, ধনপ্রাণ সব গেল। কাপ্তেন লেপ্টেনাণ্ট, কর্ণেল কেহই বাঁচিয়া নাই—কে সৈন্য পরিচালনা করিবেন, কে যুদ্ধের হুকুম দিবেন? আপনি ভিন্ন গতি নাই। আপনি আজ জেনারেলের পোষাক পরিয়া জেনারেল হইয়া আমাদিগকে যুদ্ধ করিবার হুকুম দিন। মৃত্যু ত আজ অনিবার্য্য, তবুও আপনি আমাদিগকে লইয়া শেষ চেষ্টা করিয়া দেখুন।"

সৈন্যসামন্তের আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখিয়া কালিচরণ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কি করা কর্ত্তব্য প্রথমে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে কিছুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন "ভাইগণ! যে গতিক দেখিতেছি তাহাতে আজ কেহ প্রাণে বাঁচিবে এরূপ আশা দুরাশা। কিন্তু যদি মরিতেই হয়, তবে কাপুরুষের ন্যায় একস্থানে দাঁড়াইয়া মরিব কেন? এস, আজ সকলে জীবন পণ করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হই। আমরা ত মরিবই কিন্তু তবুও শত্রুরা জানুক—শত্রুরা বুঝুক আমরা ভীরু নই; আমরা কাপুরুষ নই—আমরা বীর।" এই বলিয়া কালিচরণ তাঁবুর ভিতর হইতে জেনারেলের পোষাক পরিধান করিয়া হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া ভীম বেগে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন। বিপক্ষ পক্ষ বিষম বিপদ গণিল। তাহারা দেখিল যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ কাপ্তান, কর্ণেল, লেপ্টেনাণ্ট প্রভৃতি অগণন সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া যাহা করিতে পারেন নাই এমন একজন অপব্যবসায়ী দুর্ব্বল বাঙ্গালী প্রাণভয়ে ভীত মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া তাহা করিয়া ফেলিলেন। তাহাদিগের পক্ষে দুর্গ রক্ষা করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। ভরতপুররাজ আর মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিবার সময় পাইলেন না। তিনি যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ বিশ লক্ষ টাকা নগদ দিবার অঙ্গীকার করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ইংরাজপক্ষ রাজার এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া দুর্গাবরোধ উঠাইয়া লইলেন। ইংরাজ রাজাকে তাঁহার ডিগ্ দুর্গ প্রত্যর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রাজাও হোলকারের পক্ষত্যাগ করিয়া গেলেন।

এখন বিচারের পালা—প্রথম বিচার হইল কালিচরণের অপরাধের। অপরাধ—তিনি সরকারের বিনানুমতিতে জেনারেলের পোষাক পরিধান করিয়াছেন এবং জেনারেল হইয়া সৈন্য পরিচালনা করিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। কোর্ট মার্শালের বিচারে কালিচরণের অপরাধ প্রমাণিত হইয়া ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইল। পুনরায় বিচার হইল—এবার বিচারে কালিচরণ তাঁহার কৃতকার্য্যের পুরস্কার পাইলেন। ইংরাজ এবার দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষ বাঙ্গালীকে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার অসীম সাহস তাঁহার অসামান্য বীরত্বের জন্য মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ দিয়া—বীর বলিয়া অভিনন্দিত করিয়া ৩০০০০ হাজার টাকা উপহার সহ সম্মানিত 'জেনারেল' উপাধি প্রদান করিলেন।

এই জেনারেল শব্দ ইংরাজি অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকে জাঁদরেল বলিয়া উচ্চারণ করিত বলিয়াই কালিচরণ সাধারণতঃ 'জাঁদরেল কালু' নামেই পরিচিত ছিলেন।

অর্থসম্পদ ও মানযশ লাভ করিয়া শেষ-জীবন শান্তিতে অতিবাহিত করিবার আশায় কার্য্যে ইস্তফা দিয়া কালিচরণ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া তিনি এক অভিনব বিড়ম্বনায় পড়িলেন। তিনি ইংরাজ জেনারেলের পোষাক পরিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া 'পিরালী' বলিয়া গণ্য হন। স্বজাতীয় লোক ইঁহার সহিত সামাজিক সংস্রব ত্যাগ করেন। এই আকস্মিক বিপদে কালিচরণ বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন এবং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এই মুস্কিলের আসান জন্য অবশেষে তিনি গভর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইলেন। গভর্ণমেণ্ট দেখিলেন, তাঁহাদের জন্যই কালিচরণের এই অন্যায় নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইতেছে। সুতরাং তাঁহারা কালিচরণের উদ্ধারের জন্য তাঁহাদের উপকারক বন্ধু শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা নবকৃষ্ণের পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণকে ধরিয়া বসিলেন। রাজকৃষ্ণ তখন কলিকাতা কায়স্থসমাজের গোষ্ঠিপতি ছিলেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে কালিচরণকে সমাজে উঠাইবার জন্য কায়স্থ সমাজের এক 'একজাই' করিয়া কালীচরণকে তাহাতে নিমন্ত্রণ করিলেন। এই নিমন্ত্রণেই কালিচরণের অপবাদ দূর হইয়া গেল।

জাঁদরেল কালুর কোন বংশধর এদেশে নাই। শুনিয়াছি কাশীতে একজন ছিলেন—তিনিও বর্ত্তমানে জীবিত কি মৃত জানিতে পারি নাই।

বাঙ্গালী প্যারিমোহন, বাঙ্গালী কালিচরণ উভয়েই অন্য বিভাগের কর্ম্মচারী হইয়াও বিপদের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে যে নির্ভীকতা, যে তেজস্বিতা ও বীরত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ প্রবীণ ও বিচক্ষণ ইংরাজ সেনানায়কগণের পক্ষেও তাহা অতীব প্রশংসার বিষয় হইতে সন্দেহ নাই।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

প্রীতি।*

প্রীতি রচয়িত্রী রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রথমা কন্যা। "প্রীতি"ই ইঁহার একমাত্র রচনা নহে, কণিকা এবং শোকগাথা নামে ইৎপ্রণীত আর দুইখানি গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বেই আমরা পাঠ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার শোকগাথার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"ত্রিপুরার রাজপরিবারে সরস্বতীর বিশেষ কৃপা। সঙ্গীতে, চিত্রে, কাব্যে রাজপরিবারের সুখ্যাতি বঙ্গদেশব্যাপী। রাজপরিবারের মহিলাগণও যে, উহাতে অনুরাগিণী এবং কবিত্ব প্রতিভায় দীপ্তিমতী রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবীর কবিতায় তাহা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।"

রাজকুমার নরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা কৃত নিম্নলিখিত সমালোচনায় প্রীতি হইতে যে সকল কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা পাঠে পাঠক উপরি উক্ত কথার নিদর্শন দেখিতে পাইবেন।

রাজকুমারীর সকল রচনাই যে উচ্চ কবিত্বপ্রতিভায় মণ্ডিত এমন কথা আমরা বলি না, একটি করুণ প্রীতিস্নিগ্ধ ভাবই তাঁহার রচনার প্রধান মাধুর্য্য। এই উদার সহৃদয়তার মধ্য দিয়া আমরা যে উচ্চহৃদয়া মহিমাময়ী নারীমূর্ত্তি দেখিতেছি, তাঁহাকে আজি সাহিত্যের যোগ্যাসনে বসাইয়া ভগিনীরূপে বরণ করিয়া লইলাম। ভারতী সম্পাদিকা।

শ্রীহরির করুণা কোন্ সূত্রে, কি বিচিত্র মধুময়রূপে জীবের উপরে বর্ষিত হয়, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট পন্থা নাই। যিনি করুণা লাভ করিয়াছেন তিনিই সেই বিচিত্রতার মধ্যে মঙ্গলময়ের মঙ্গলময়ত্ব, আনন্দময়ের আনন্দ সম্যক্ উপলব্ধি করেন—অন্যের তাহা অনুভব করিবার সামর্থ্য আদৌ থাকে না।

নিদারুণ শোকের মধ্য হইতে পূজনীয়া "প্রীতি" রচয়িত্রী "সুখের" আস্বাদ পাইয়াছেন! করুণাময় ভগবানের কৃপায় তিনি ধ্রুব সত্যে উপনীত হইয়েছেন। তিনি সুখের অমৃতে ও দুঃখের হলাহলে, মিলনের আকাঙ্ক্ষায় ও বিরহের যন্ত্রণায় আর অভিভূত নহেন! সুখ-দুঃখ ও মিলন বিরহ এক্ষণে তাঁহার নিকট এক হইয়া যাইতেছে! সচ্চিদানন্দ তাঁহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার সাধনা সাফল্য লাভ করিয়াছে। তিনি স্নিগ্ধ, শান্ত অথচ অবিচলিত স্বরে বলিতেছেন,—

চলে গেছে সুখ?—স্বার্থের যৌবনে
ফিরাইতে তাই সাধিব না।
আসিয়াছে দুঃখ—ব্যর্থ এ রোদনে
বুকে টেনে তায় বাঁধিব না।

* * *

"বিরহ" এক্ষণে তাঁহার নিকট "ক্ষিপ্ত পিয়াস"রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে—তাহাতে রক্ত-মাংসের সম্ভব আছে!—

ক্ষিপ্ত পিয়াস যাহার জীবনে
যবে সে বিরহে আপনায়;
অধীর বিলাপ, বাসনা-দীপনে
জেগে উঠে ঘোর যাতনায়।

* *

---

* রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী প্রণীত নূতন কাব্যগ্রন্থ।

দুই বৈপরীত্যের মধ্যে তিনি ঐক্য স্থাপন করিতে চাহেন। দ্বন্দ্বের অলীকতা হইতে নির্দ্বন্দ্বের প্রীতিসরসতা উপভোগ করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় উন্মুক্ত ও আগ্রহান্বিত হইয়া আছে,—তিনি বলিতেছেন,

ভগবৎ চরণে প্রীতির জন্য সম্মানীয়া কবির সনির্ব্বন্ধ সকরুণ প্রার্থনাটি বড়ই মনোরম ;

কি প্রীতি লভিতে আমি আমি
দাঁড়ায়েছি দুয়ারে তোমার,
তুমি দাও, হে জগত-স্বামী,
নাহি যাচি তৃপ্তি বাসনার।
প্রীতি সহে সুখ-রস পান
আঁখি মুখে আনন্দেতে ফুটে ;
প্রীতি-রসে তাজা মৃত প্রাণ,
প্রীতি-দীপ্ত-বিশ্ব চলে ছুটে।
যে প্রীতির স্রোত নিরবধি
শুষ্ক চিত্ত রস সিক্ত করে,—
সেই প্রীতি অমৃতের নদী—
প্রবাহিত কর এ অন্তরে।

শ্রীহরি কবির এই আন্তরিক প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন। করুণাময়ের কৃপায় তাঁহার হৃদয় স্বার্থ-দুষ্ট ক্ষুদ্র প্রীতিকে হারাইয়া, বৃহৎ প্রীতির জন্য জাগরিত হইয়াছে, তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন—

"নারীর ধর্ম্ম নহেক শুদ্ধ মর্ম্মবেদনে ময়া ;
প্রীতির ধর্ম্ম নহেক ক্ষুদ্র কারাগারে পড়া ময়া।"
"নারীর ধর্ম্ম নহেত কেবল আপনা লইয়ে থাকা ;
এ নহে পুণ্য, প্রীতির হলেতে ক্ষুদ্র স্বার্থ ঢাকা।"
নারীর জীবন বিধাতার দান, তাঁহার আদেশ পালি ;
প্রীতির প্রসার অনন্ত অসীম, পর-তরে তাই ঢালি।"

কবির সত্য-উদ্ভাসিত হৃদয় সত্য প্রচারের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সমশ্রেণীর শুষ্ক হৃদয়কে ত্যাগের কামনা, ও ধৈর্য্যের প্রশান্ত তৃপ্তির দ্বারা অভিষিক্ত করিতে চাহেন ; —

পুণ্যের নামে যেই অভাগিনী
পুষি দুখ, প্রাণে তার,
গৃহ-কোণে যদি কাঁদে অভাগিনী,
যাব আমি কাছে তার।

মুক্তাঘ—প্রীতির লক্ষ্য বিকাশ, স্বর্গে জগৎ ধরা ;
নারীর মোক্ষ নহেক কেবল দুঃখে দহিয়া মরা।

প্রীতির কবি ক্ষতির দ্বারা কিরূপ অক্ষয় লাভ করিয়াছেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমি না পাই দেখিতে নয়নে তোমায়,—
পাবনা দেখিতে কভু ও,
নয়ন দুটির কোণায় কোণায়—
ফুটিয়া উঠিছ তবুও।
স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে আসিয়া,
তোমারি পরশ লাগিছে ;
অরুণ কিরণ নয়নে ভাসিয়া—
তোমারি বরণ জাগিছে ?
কোন্ সুদূর হইতে শ্রবণ রসিয়া
আসে তব প্রেম গীতি গো।
মম হৃদয় হাসিয়া উথলে অমিয়া,—
এই কি তরল প্রীতি গো ?
একি মিশ্রিত সুখ ? অমৃতে গরল ?
কাঁদি কেন সুখে ভাসিয়া ?—
এসে দাহন করিয়া করিতে শীতল ;
করিতে মুক্ত বাঁধিয়া !

দুঃখ, বৈরাগ্য, যাতনার মধ্যে শান্তি আপনার সত্তাকে বৈপরীত্যে সুমহানরূপে প্রকটিত করিয়াছে। প্রীতির কবিতাগুলি তাই এত মনোহারী।

শ্রীনরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা।

প্রতিবাদ।

মাননীয়া ভারতীসম্পাদিকা মহাশয়া সমীপেষু।

শ্রাবণ মাসের ভারতীতে আমার লিখিত "উদীয়মান ও বিলীয়মান যুগ," শীর্ষক প্রবন্ধের যে সমালোচনা প্রবাসীতে দেখিলাম, তাহাতে জাতি-ভেদের আমি সমর্থন করিয়াছি বলিয়া লিখিত হইয়াছে। যদি কেহ একটা বিষয় প্রতিপন্ন করিতে গিয়া প্রাসঙ্গিকতার সূত্রে আরেকটা বিষয় অবতারণা করিয়া ফেলে এবং তাহার চরম মীমাংসা না করিয়াই বিষয়ান্তরে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে যে একটা ভুল করা হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি সম্মুখে অগ্রসর হইবার সময় আমি যখন পিছনের পূর্বচিহ্ন দিয়া যাই নাই, তখন ত্রুটি আমারই। তাই স্পষ্ট করিয়া আমি বলিতেছি জাতিভেদ এখার স্বপক্ষীয় হেতু বর্ণনা সত্ত্বেও জাতিভেদপ্রথার সমর্থন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। যুগ অনুসারে শাস্ত্র পরিবর্ত্তিত হয়, বিধি রচিত হয়, শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষের সচেতনত্ব মানুষকে একটা স্থির অপরিবর্ত্তনীয় অনুশাসনের ভিতর বদ্ধ হইয়া থাকিতে দেয় না, বেষ্টনের ভিতর তাহা তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তোলে, বন্ধনের ভিতর চঞ্চল করিয়া তোলে, চারিদিক দিয়া নিপুণভাবে তাহার সীমা রচনা করিয়া দিলেও তাহাকে সে লঙ্ঘন করিয়া চলে। নদী যেমন আপন প্রবাহবেগে তট সৃষ্টি করিয়া লয়; লোকসমাজ তেমনি উন্নতি ও অবনতির বেগে আপনার আত্মরক্ষার বিধানের গতিপথ রচনা করিয়া চলে। জাতিভেদ প্রথা প্রাচীন ভারতের সমাজ-বন্ধন ও সমাজ-রচনার সঙ্গে সে ভাবে খাপ খাইয়াছিল, আজি যদি সে সামঞ্জস্যের কোথাও অভাব ঘটে, প্রাচীন ভারতের ঘরে বাহিরে, আচারে ব্যবহারে যে পরিবর্ত্তনের স্রোত চলিয়াছে যদি সে স্রোত তাহার সমাজক্ষেত্রের এই উঁচু আলগুলির কাছে গিয়া পঁহুছায়, তবে তাহাকে রুদ্ধ করিবার কল্পনা কে করিতে পারে।

পরিবর্ত্তন বিশ্বসৃষ্টির অঙ্গীভূত ধারা। ভাল হোক্ আর মন্দ হোক, সুফল হোক আর কুফল হোক, উন্নতি হোক্ আর অবনতি হোক,—একটা বিশেষ ধারা, বিশেষ পদ্ধতি আবহমান কাল স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। একটা চিরন্তন গতির তরঙ্গোচ্ছ্বাসের প্রবলতায় স্পন্দিত হইয়া বিশ্বজগত ঘূর্ণীবায়ে নাচিতেছে, সূর্য্য তাই বেগে ঢাকিতেছে, লোকালয়ের উপর বন্যা বহিতেছে, জাতির আবির্ভাব ও বিলোপ হইতেছে, সমাজ উন্নত ও অবনত হইতেছে, জগতের বিরাট চক্রনেমির সঙ্গে চরাচর বদ্ধ হইয়া অরের মত ঘুরিতেছে. সুতরাং আমাদের এই প্রাচীন ভারতবর্ষ যদি বার্দ্ধক্যের অক্ষমতা বশতঃ তাহার রূপ দুর্ব্বল হইতে তাহার যৌবনের রচিত সমাজ-বন্ধনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া না রাখিতে পারে, জীর্ণতার অপরিহার্য্য শক্তিহীনতার বশে যদি আজ তাহা খসিয়া যায়—তবে বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখিকা তাহার কাছে দায়ী হইতে কুণ্ঠিত নহে। ইতি

বিনয়াবনতা শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

কুচবিহারের নবীন মহারাজার রাজ্যাভিষেক।

পুরাতন বৎসরের তিরোধান এবং নবীন বর্ষের আবির্ভাব আমাদের মনে একত্রে যে হর্ষবিষাদ, আশা ও আশ্বাসের সৃষ্টি করে, এক রাজার মৃত্যু অপরের রাজ্যাভিষেকে মনে সেই একই ভাবের উদয় হয়—যাহা যায় তাহা স্মৃতিতে মনোহর ছায়াময় অতীত কৃতকর্ম্মে পরিপূর্ণ, যাহা আসে তাহা আশার আলোকে উজ্জ্বল এবং নবীন উদ্যমের আয়োজনে

পরিশোভিত।* অতীত আমাদিগের নিকট নবীন মহারাজার রাজ্যাভিষেক উৎসবদিনে ভবিষ্যতের সূচনা। আজ আমরা কুচবিহারের যিনি গিয়াছেন তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আশা

মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ।

করিতেছি যিনি রাজ্যাধিকার করিলেন তিনিও সৌজন্যে সকলের প্রিয় হইবেন এবং পিতার ন্যায় দয়াদাক্ষিণ্য, সৌষ্ঠব এবং প্রজানুরঞ্জন করিয়া মহারাজ নাম সার্থক

করিবেন। আমাদের শাস্ত্রে নৃপতি কেবল মাত্র নরপতি নহেন তিনি সৃষ্টিরক্ষাকর্ত্তা নারায়ণ বিষ্ণুর অংশ, অবতারস্বরূপ। প্রার্থনা করি নূতন কুচবিহারাধিরাজের শাসন এবং বিধান দেবতার অনুশাসনের ন্যায় ধর্ম্মানুমোদিত এবং মঙ্গলজনক হউক। নবীন মহারাজা দীর্ঘায়ু হইয়া শান্তিসংযত জীবনে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন দীন অনাথের দুঃখ মোচন করিয়া আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব আশ্রিত প্রজাবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করুন এবং স্বনামধন্য নিত্য প্রশংসিত হইয়া বিদেশের সম্মানভাজন এবং স্বদেশের গৌরব রক্ষা করুন।

সমালোচনা।

প্রকৃতি-পরিচয়। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বানন্দ রায় প্রণীত। ঢাকা, অতুল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র। বঙ্গসাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের যথেষ্ট অভাব আছে—দুই একখানি যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিশেষজ্ঞের চিত্তবিনোদন করিতে সমর্থ হইলেও কঠিনতার ভারে সাধারণ পাঠকের চিত্তে কোন রেখাপাত করিতে পারে নাই। বিজ্ঞানের নব নব তত্ত্ব নিত্য প্রচারিত হইতেছে—এদেশবাসী সাধারণ পাঠক তাহার কতটির পরিচয় পাইয়াছেন? বর্ত্তমান গ্রন্থে গ্রন্থকার আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতের বহু তত্ত্বের সন্ধান লইয়া আসিয়াছেন। মাসিক সাহিত্যের পাঠকের নিকট গ্রন্থকার সুলেখক বলিয়া পরিচিত। জটিল ও দুরূহ বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ সহজ ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা গ্রন্থকারের অপরিসীম। এই গ্রন্থে পাঠক তাহার সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। অবৈজ্ঞানিক ও অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন। গ্রন্থের ভূমিকা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই মুদ্রাঙ্কণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট।

পাট ও পালিতা। শ্রীযুক্ত বিনয়দাস বসু, এম, এ, এ, আর, এ, সি প্রণীত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।০ আট আনা মাত্র। গ্রন্থকার শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কৃষি-অধ্যাপক ছিলেন—গ্রন্থখানি তাঁহার গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ফল। আজকাল পাটের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া অনেকেই যথেষ্ট লাভবান হইতেছেন। গ্রন্থখানিতে পাটের চাষ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পাটের মাটি, পাটের শত্রু, পাট কাটা ও পাট ধোয়া সম্বন্ধে সমস্তগুলি যেমন উপযোগী তেমনই প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থ পাঠে পাট সম্বন্ধে বেশ জ্ঞানলাভ করা যায়। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি ব্যবসায় সাহিত্য-বিভাগে বাঙ্গালা ভাষার একটি গুরুতর অভাব মোচন করিয়াছে।

হেমলতা। শ্রীযুক্তা মনোরমা দেবী প্রণীত। কাস্টিক প্রেসে মুদ্রিত। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র। হেমলতা একখানি উপন্যাস। লেখিকার ভাষা সরল, কোথাও অনাবশ্যক আড়ম্বর নাই। উপাখ্যানটি সুন্দর, পড়িতে বেশ ভাল লাগে। তবে চরিত্রগুলি তেমন বিকশিত হইতে পারে নাই। আখ্যিপত্রের ভাবে যত স্থলই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুধার চরিত্রটি নিখুঁত হইয়াছে। বোধ হয় ইহাই লেখিকার প্রথম রচনা। চেষ্টা রাখিলে ভবিষ্যতে লেখিকা উপন্যাস-রচনায় সফলতা লাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

গ্রহের ফের। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীনরেন্দ্র-মোহন চৌধুরী, তমলুকপুর। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। এখানি কৌতুক-নাট্য। সুপ্রসিদ্ধ গল্পলেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "বলবান্ জামাতা" শীর্ষক গল্প অবলম্বনে রচিত। প্রভাতকুমারের গল্পে কতকগুলি চরিত্রের নামোল্লেখ ছিল মাত্র—সৌরীন্দ্র-বাবু সেগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কুঞ্জবালা, মলিনীকান্তের স্ত্রী সরোজিনী-প্রভৃতি সুন্দর হইয়াছে। সরোজিনী সরমসঙ্কুচিতা মধুরা বাঙ্গালীর মেয়ে—সৌরীন্দ্রবাবুর চরিত্রাঙ্কণ নিখুঁত হইয়াছে। কুঞ্জবালার

রহস্যটুকু যেমন নয়ন তেমনই সুকচিপূর্ণ। ক্ষুদ্র নাটিকার চরিত্রচিত্রণে লৌকীন্দ্রবাবু বিপুল নাট্যকারের সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। কৌতুক নাট্যখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। হাসির গানটি সুন্দর হইয়াছে; ছাপা কাগজ ভাল।

চিত্র ব্যাখ্যা।

আলেকজাণ্ডারের জন্ম —হাকিম মহম্মদ খাঁ অঙ্কিত।

এখান যে ভুবনবিখ্যাত আলেকজাণ্ডারের জননী ওলিম্পিয়াস পেলা (pellah) নামক নগরের উপকণ্ঠে বনে রাত্রিকালে হঠাৎ প্রসূতা হন। সদ্যঃ প্রসূত সন্তান আলেকজাণ্ডারকে বক্ষে ধারণ করিয়া ওলিম্পিয়াসের মৃত্যু হয়। বনের পশুপক্ষিগণ মাংস ভক্ষণের ইচ্ছায় একএকবার শবের সমীপস্থ হইতেছে কিন্তু মৃতমাতৃবক্ষলগ্ন শিশুকে দেখিয়া আবার ভয়ে পশ্চাৎপদ হইতেছে।

এই এখান বাকোর উপর উক্ত চিত্রকর ঐ চিত্রখানি আঁকিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের পত্র।

অবন্ত প্রতিপালোত্ত শ্রীভারতচন্দ্র শর্ম্মণো।
নমস্কৃতীনামানন্দ্য সবিশেষনিবেদনং ॥ ১ ॥
মহারাজ রাজাধিরাজ প্রতাপ কুরবীর্য্য সূর্য্যোদয়েষু
কীর্ত্তিপদ্মে। স্থিরা রাজপদ্মালয়াস্তাং চিরন্তা
যতোঽস্মাকমাস্তে সমস্তঃ পুরস্তাৎ ॥ ২ ॥
যদবধি তব মুখচন্দ্র-বিলোকন-বিরহিত নয়ন-চকোরৌ।
তদবধি নিরবধি দুঃখহুতাশনপ্রাশন বাসব ঘোরৌ।
আয়াতো মলয়ানিলো মুকুলিতাঃ চূতদ্রুমা কোকিলাঃ
কাকালাপকুতূহলা মধুকরাঃ কান্তানুরাগোৎকরাঃ।
নার্য্যঃ পাদপতিপ্রসঙ্গবিকলাঃ সাধ্বঃ কৃতাস্তপ্রিয়া
নোজানে ভবিতা বিচার ইহ কঃ শ্রীমল্লসন্তে নৃপে ॥
হোলীয়ং সমুপাগতা গতবতী ক্রীড়াকথা মাদৃশাং
দূরে ভূপতিরুন্মনাঃ পুরজনো দুর্গাহনা গায়নাঃ।
বেশ্যা বাস্তকরা মুখার্পিতকরা নিস্পন্দরাঃ কাস্তনে ॥
নোজানে ভবিতা কিমত্র নগরে ভক্তোঽপি ভণ্ডায়তে ॥

নিবেদনমিতি ১০ ফাল্গুনস্য

ইহার উপরে মোটা অক্ষরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র লিখিত প্রত্যুত্তর। অত্যন্ত পুরাতন হওয়ায় অক্ষরগুলি পড়া যায় না।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কাস্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ভক্ত বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

শিকারী

(হাকিম মহম্মদ খাঁ অঙ্কিত চিত্র হইতে)

ভারতী

৩৫শ বর্ষ] পৌষ, ১৩১৮ [৯ম সংখ্যা

অন্নপূর্ণার মন্দির।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বনাশের পর যেমন একটা তীব্র নিশ্চিন্ত ভাব আসে, মৃত্যুর পর যেমন যন্ত্রণা-কাতর মুখে শান্তির পাণ্ডুবর্ণ জাগিয়া উঠে সহসা বিবাহ দিয়া রামশঙ্কর সেইরূপ একটা তীব্র মুক্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। নবগ্রাম-বাসী স্বনামখ্যাত তিনকড়ি লাহিড়ী নগদ তিনশত টাকা পণ লইয়া তিলকাঞ্চনে শুদ্ধ করিয়া সতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। গ্রহণ করিলেন বলা ঠিক হয়না—পত্নীরূপে আখ্যা দিলেন। কেননা বিবাহের পরে সতীর স্বামীর গৃহে যাইবার কোন প্রয়োজন হয় নাই। ব্রহ্মণ কেবল নিঃস্বার্থে পরোপকারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন এবং রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের জাতিকুল রক্ষার্থ এবম্বিধ কার্য্য করিয়াছেন। যখনই তাঁহার সংসারে অভাবের মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে তখনই কোনও কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির আশীর্ব্বাদ সংগ্রহ করিয়া নিজের অভাব নাশ করেন। সম্প্রতি তাঁহার আশঙ্কা জন্মিয়াছে যে এভাবে বেশীদিন বোধহয় আর তাঁহার ব্যবসা কার্য্য চলিবেনা, সম্প্রতি চিত্রগুপ্ত তাঁহার হিসাব নিকাশ গুবলেট করিয়া তুলিতেছে, এই কয়টা দিনের মধ্যে তিনি যতদূর পরোপকার করিয়া লইতে পারেন।

তাঁহার কথা যাউক; রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এখন নিশ্চিন্ত। কন্যাদায়ে ভাগিনেয়ের ভাবনাও নিশ্চিন্ত, এবং সঙ্গতির মধ্যে বাটী খানিও কুষ্ঠিরালদিগের নিকট সাড়ে তিনশত টাকায় বন্ধক দিয়া নিশ্চিন্ত, কেননা জানেন যে এজন্মে তাঁহার আর সে বাটী উদ্ধার করিবার সাধ্য নাই। অবশিষ্ট কেবল দশটি টাকা, এবং তাঁহার অকালবৃদ্ধ জীর্ণ হৃদ্‌পিণ্ড। সে দিকেও তিনি পাড়ি জমাইয়া আসিতেছেন বুঝিতেছিলেন। যে কয়টা দিন থাকিতে হইতেছে সেই কয়টা দিনও যেন অসহ্য হইতেছে, সতী সম্মুখে আসিলে গালি দিয়া তাড়াইয়া দেন। কচিৎ কোনও দিন পুত্র বাটী আসিলে গালি দিয়া, অভিসম্পাত দিয়া তাহাকেও বাটী হইতে চলিয়া যাইতে বলেন, কনিষ্ঠ পুত্রকে প্রহার করেন, সান্ত্রিকে দেখিলে মুখ ঢাকেন; জাহ্নবী ও ভ্রাতৃজায়ার সহিত বাক্যালাপও করেন না। পুত্রকন্যারা কখনও কাঁদে কখনও রাগ করে, কোঠাইমা চীৎকারে বাড়ী মাথায় করেন, জাহ্নবী কেবল নিষ্কাকভাবে গোপনে অশ্রু মুছেন। এক একদিন তাঁহার বুকের বেদনা হাপানি এমন বাড়িয়া উঠে যে সমস্ত দিনরাত্রি যন্ত্রণায় কাটিয়া যায়। সে সময়ে তাহার শুশ্রূষা করে রামশঙ্কর তাঁহাদের বটুক করেন। নীরবে যে সব তাহারা

সহ্য করে। এইরূপে সতীর বিবাহের পরে ছয় মাস কাটিয়া গেল। ক্রমশঃ তিনি নির্জীব হইয়া পড়িতেছিলেন তথাপি কুঠীর কার্য্যে কামাই করিতেন না।

সেদিন বৈকাল হইতে ঘনঘটা করিয়া মেঘ আসিয়াছিল। সতী ও সাবিত্রী ত্বরান্বিত হইয়া সংসারের কার্য্য সারিয়া লইতেছিল, জাহ্নবী হস্তের কার্য্য স্থগিত রাখিয়া পুনঃ পুনঃ উন্মনা ভাবে দ্বারের প্রতি চাহিতে ছিলেন এই দুর্য্যোগ উপস্থিত হইতেছে, স্বামী অদ্য বাটী আসিবেন। জোঠাইমা হরিনামের মালা হাতে লইয়া তাড়াতাড়ি একবার পাড়াটা প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন, কেননা যেরূপ মেঘ লাগিতেছে তাহাতে বস্ত্রাদের নিন্দার সমালোচনা করিতে হয়ত তাঁহাকে পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।

হু হু শব্দে ঝড় আসিল। চালের খড় উড়িয়া দিকদিগন্তরে ধাবিত হইতে লাগিল, জীর্ণ গৃহ যেন থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। প্রাঙ্গণ ঘনকৃষ্ণ মেঘছায়ায় অন্ধকার। কলাগাছগুলা মাটিতে শুইয়া শুইয়া পড়িতে লাগিল। উঠানের গাছ হইতে শুম দাম করিয়া আম পড়িতেছে দেখিয়া জোঠাইমা ধামা মাথায় দিয়া আম কুড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন ও পবনকে যথেষ্ট গালি দিতে লাগিলেন। কালীপদ আম কুড়াইবার জন্য বড় ধুম ধরায় সতী তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া গৃহের মধ্যে গিয়া ভুলাইতে লাগিল, তাহাতেও জোঠাইমা শ্লেষ দিতেছিলেন কিন্তু তাঁহার তীব্রস্বরও বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া গেল।

দুয়ারে হেলান দিয়া জাহ্নবী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, আগ্রহ ব্যাকুল দৃষ্টি মেঘান্ধকার ভেদ করিয়া বহুদূরে ধাবিত হইয়াছে, সাবিত্রীর ভীত ব্যাকুল নেত্র মাতার মুখের দিকে স্থাপিত; তাহার রুক্ষ চুলগুলা বাতাসে উড়িতেছে, শীর্ণ শুভ্র মুখে বিপদের ভয়ার্ত্তভাব। একবার অস্ফুট স্বরে সে কেবল বলিল, 'মা'? মা উত্তর দিলেন না। ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি আসিল। দৌড়িয়া আসিতে জোঠাইমা আবার ধামা লইয়া এক আছাড় খাইলেন। সাবিত্রী ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিল, জোঠাইমা শোকে দুঃখে চুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। জাহ্নবী অচল প্রতিমার মত দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ঘরে আলো জ্বালিয়া সতী আসিয়া মাকে একটু ঝাঁকানি দিয়া বলিল "মা ভিজে কি করবে ঘরে চল বড় ঝাপ্টা আস্‌ছে"। জাহ্নবী নড়িলেন না, তিনজনেই তখন স্তম্ভিত তিমিত নেত্রে দ্বারের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রকৃতির তুমুল আন্দোলন। নীচের দ্রব্য উপরে তুলিয়া উপরের বস্তু নীচে ফেলিয়া দুর্দ্দান্ত বালকের মহোল্লাস। সেই শব্দের মধ্যেও জাহ্নবী যেন বহির্দ্বারে কিসের একটা পতন শব্দ ও অস্ফুট গোঁ গোঁ শব্দ শুনিতে পাইলেন। জাহ্নবী তৎক্ষণাৎ দোরাক হইতে নামিয়া দৌড়াইলেন, সঙ্গে সঙ্গে সতী ও সাবিত্রী। মুহুর্মুহুঃ তাহাদের পদস্খলন হইতে লাগিল। তথাপি তাহারা প্রাণপণে বহির্দ্বারাভিমুখে ছুটিল।

বহির্দ্বারের বাহিরে রামশঙ্কর উপুড় হইয়া পড়িয়া গিয়াছেন। জাহ্নবী গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। সতী ও সাবিত্রী আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—"বাবা বাবা"।

"চুপ্ কর—চুপ্ কর্—ধর্ ধর্ আমি সাম্‌লাতে পাচ্ছিনা।" জাহ্নবী তখন বেতস্ পত্রের ন্যায় কাঁপিতেছিলেন, প্রকৃতির ন্যায় তাঁহারও চোখের সমুখে যেন অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইল; সামলাইয়া অতি কষ্টে তিন জনে সংজ্ঞাশূন্য দেহ লইয়া গৃহে তুলিলেন। জোঠাইমা তাঁহার বেদনাপ্রাপ্ত পা লইয়া তখন বিকট গর্জ্জন করিতেছিলেন, এইবারে থামিয়া গেলেন। সতী ডাকিয়া বলিল "জোঠাইমা একটু আগুন কর—শীগ্‌গির।" খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া জোঠাইমা খুঁটে জ্বালিয়া কড়ায় আগুন করিতে লাগিলেন।

সিক্ত বস্ত্রাদি ছাড়াইয়া সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে মুছাইয়া রামশঙ্করকে শয্যায় শোয়ান হইল। তখনও তিনি হতজ্ঞান। সতী একটা ভাঙা দিন্দুক হইতে একটা ছেঁড়া ফ্লানেলের জামা বাহির করিয়া পিতার হস্তপদ তদ্দ্বারা ঘর্ষণ করিতে লাগিল! এদিকে অগ্নিও প্রস্তুত হইল, হস্ত ও বস্ত্রের পুঁটুলি গরম করিয়া সেঁক দেওয়া হইতে লাগিল। জাহ্নবী ও সতী নীরব নির্ব্বাক, সাবিত্রী একবার রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল 'বাবা, বাবা।" কালীপদ স্তম্ভিতভাবে একধারে দাঁড়াইয়াছিল, সাবিত্রীর স্বরে সাহস পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সতী বলিল "কালী, চুপ্ কর কাঁদিস্‌নে ভয়কি, বাবা ভাল আছে।" মাতাকে বলিল "মা একটু দুধ গরম করে দাও।" জাহ্নবী ক্ষীণস্বরে বলিলেন" তুই আন্ আমি উঠ্‌তে পাচ্ছিনা।" সতী দুধ গরম করিল, ঝিনুকে করিয়া পিতার মুখে অল্প অল্প দিতে লাগিল, ক্রমে তিনি একটু নড়িলেন, দুধ খাইলেন, জোরে কয়েকটা নিশ্বাস ফেলিলেন। সকলে একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল, এতক্ষণ যেন অঙ্গ সঞ্চালনেও কাহারো সাহস হইতেছিলনা। ক্রমে রামশঙ্কর চক্ষু মেলিলেন, একটু যেন পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলেন। সতী ডাকিল "বাবা!"

রামশঙ্কর কন্যার দিকে চাহিলেন, ক্ষীণস্বরে বলিলেন "কে?" বাবা "আমি সতী।" মুমূর্ষু রামশঙ্কর সহসা যেন কি এক শক্তিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সবলে কন্যাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন "সরে যা, দূর হয়ে যা সর্ব্বনাশি, আমার আর কি করবি! খাবি? দূর হ!" সতী সরিয়া বসিল। জাহ্নবী মুখ নত করিয়া নীরবে স্বামীর অঙ্গে উত্তাপ দিতে লাগিলেন, সাবিত্রী চোখ নীচু করিল। জোঠাইমা অস্ফুট গুঞ্জনে বলিলেন "মর্ মিন্‌সে—স্বভাব যায়না মলে।"

জাহ্নবী বলিলেন "এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে কি! কেমন?"

"আর কেমন আছি, পাকাথাকির আজ শেষ। আর দেখ্‌ছ কি জাহ্নবি, আর পার্‌ছ না।" জাহ্নবী নীরবে রহিলেন। সাবিত্রী কাঁদিয়া উঠিল "অমন কথা বল্‌না বাবা।"

রামশঙ্কর তীব্রদৃষ্টিতে কন্যার পানে চাহিয়া বলিলেন "কেন? কিসের কষ্ট? আমি তোমাদের কখনও বাপের উপযুক্ত কাজ করেছি যে তাই তোমাদের কষ্ট হবে? চিরদিন আবদেটা খেয়ে, খেটে, বকুনি খেয়ে মানুষ হচ্ছ, আমি অবর্ত্তমানেও তাই হবে. কিসের কষ্ট? আমি থাকলে তোমাকেও হয়ত একটা গঙ্গাযাত্রী বরে বিয়ে দেব! আমি তোমাদের বাপ? না?" উত্তেজনার

আদরে রামশঙ্কর আবার প্রায় অর্দ্ধমূর্চ্ছিত হইলেন। ক্ষণপরে একটু প্রকৃতস্থ হইয়া সহসা বলিলেন "ওরে এসেছে বুঝি? দূর ক'রে দাও—ওটাকে দূর ক'রে দাও।" সাবিত্রী বলিল "কই দাদা ত' আসেনি।"

"আসেনি? থাক্ ওটার হাতে আমি জলপিণ্ডও নেব না—কালী দেবে—ওটা অন্যপাতে থাক্।" জাহ্নবী স্বামীর মুখে হস্ত বুলাইয়া বলিলেন "একটু ঘুমুতে চেষ্টা কর দেখি, কই কম্‌ল, ঘুমাও।"

"ঘুম আর কোথেকে—একেবারে কম্‌বে!"

সতী দ্বারের নিকটে সরিয়া বসিয়াছিল। দ্বার ঈষৎ খোলা ছিল, তখনো অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে, অবিশ্রান্ত ঝেকেরু কলরব, আর সুচীভেদ্য অন্ধকার। আর্দ্র বায়ু এক একবার দ্বারের নিকটে আসিয়া হু হু করিয়া হুঙ্কার ছাড়িতেছে। সতী একদৃষ্টে সেই অন্ধকার দেখিতেছিল। বোধ হয় ভাবিতেছিল "এই অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা করিলে কি কখনো উষার আলোক চোখে পড়ে না?"

রামশঙ্কর একবার একটু অস্বস্তিবোধ করিলেন, আবার তখনি জাগিয়া বলিলেন "জাহ্নবি," জাহ্নবী উত্তর দিলেন। "কালী কই?"

"ওই যে তোমার পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।"

অতি কষ্টে রামশঙ্কর তাহার মস্তকে হস্ত রাখিলেন। জাহ্নবী বলিলেন "ও কি ক'চ্ছ?"

"আশীর্ব্বাদ কচ্ছি। সাবিত্রী ঘুমুচ্ছে?"

'নাঃ,' বলিয়া সাবিত্রী পিতার মুখের নিকটে আসিল। পিতা বলিলেন "এস, আশীর্ব্বাদ করি।" "বাবা, বাবা অমন কথা বলোনা, বড় কষ্ট হয়।" বলিয়া সাবিত্রী কাঁদিয়া উঠিল। জাহ্নবী বলিলেন "সাবিত্রী চুপ্ কর কাঁদলে ওঁর আরও কষ্ট পাবেন।" "না না কষ্ট কিসের—কষ্ট কিসের মা, আশীর্ব্বাদ কচ্ছি,—হরে—হরেটা নেই, না? তা তাকেও আশীর্ব্বাদ কচ্ছি—হাজার হ'লেও ছেলে ত।"

"বাবা তবে দিদিকে আশীর্ব্বাদ কচ্ছেন না কেন? দিদিকে করুন।"

একটু একটু করিয়া থামিয়া থামিয়া রামশঙ্কর বলিলেন "তোমার দিদিকে? সতীকে? আশীর্ব্বাদ? না উপহাস? বাপ,—বাপ হয়ে মেয়েকে কি মর্‌বার সময় উপহাস করে যাব?"

জাহ্নবী ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন "তুমি হতেছ দেখো তোমার সতী ঘোরের কাছে বসে আছে—একবার ডাক।"

রামশঙ্কর সেই দিকে দৃষ্টি করিলেন, ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—"সতী মা এস।"—

সতী যথাসম্ভব মুখ নীচু করিয়া রামশঙ্কর চক্ষু ঢাকিয়া পিতার পদতলে আসিয়া বসিল। পিতা বলিলেন "ওখানে না, কাছে এস—তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে। অনেক বকেছি।" সতী মুখ ফিরাইয়া পিতার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। রামশঙ্কর তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন "তোমাকে আশীর্ব্বাদ? আশীর্ব্বাদের ত' কোন দরকার নেই! থাকুক,—যদি—যদি তোমার বিয়েহয়—নাঃ সে কথায়—সে কথায় কাজ নেই। কি করব? আশীর্ব্বাদ? শোন মা, বাপের পাপেও ছেলেমেয়ে কষ্ট পায়; তাই তোমরা কষ্ট পাচ্ছ—পাবে। কি করব

বল? হাত নেই। জানত ত' এমন পাপ কিছু করিনি—তবে—তবে পূর্ব্ব জন্মের ফল। তোমার আশীর্ব্বাদ করবার মুখোচ্ছেদ ত' আমি করে দিয়েছি,—আর কি মুখে আশীর্ব্বাদ করব মা? তবে—তবে যেন'—অনেক কষ্টে! নিতান্ত নিরুপায় হয়ে আমি তোমাকে, সন্তানকে হত্যা করেছি,—আমার হাত নেই।"

সতী কাঠের মত বসিয়া রহিল। জাহ্নবী বলিলেন "এখন ওসব কথা থাক্ একটু ঘুমোও।"

"ঘুম? আর একটু পরেই বেশ ঘুমোবো, গভীর নিদ্রা, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ, আঃ সে কি তৃপ্তি! তার আগে দুটি কথা কই। সতী কই মা? উঠে গেলে? নঃ এই যে, শোন। কি বলব? মনে আসছে না। হাঁ—তোমার আশীর্ব্বাদ? কি বলে আশীর্ব্বাদ করি বল দেখি মা? আমিত' যাচ্ছি; তোমার"—ক্ষিপ্ত অবিকৃত কণ্ঠে সতী বলিল "আপনি যাচ্ছেন? আপনার জ্ঞান হ'বে সেবা করা আমার ঘটে উঠল না, আশীর্ব্বাদ করুন আপনার কাছে গিয়ে আপনার সেবা করি।"

"আমার কাছে গিয়ে? হাঁ! শুভক্ষণ স্থান বটে! বিশ্রাম! বিশ্রাম! যাবে সতি? বড় কি পরিশ্রান্ত হয়েছ মা! এই অল্প বয়সে এই নতুন জীবনে এত শ্রান্ত হয়েছ? তবে এস, তবে এস! আমার কোলে এস—এস মা তোমার কোলে মিছে, সেই ছোটটির মত, এস মা আমরা যাই।"

জাহ্নবী স্বামীকে শান্ত করিবার জন্য মস্তকে মুখে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। রামশঙ্কর বলিলেন—"দোষী? হাঁ! আমি দোষী বই কি! কি দোষ জান মা? অশক্ত হয়েও কেন আমি সংসার করেছি, বিয়ে করেছি, সন্তানসন্ততি হয়েছে—দোষী বই কি! বিয়ে? আমি করেছি বটে কিন্তু সে দোষে দোষী আমার বাপ মা। তাঁদের পাপে আমি কষ্ট পেলাম, আমার পাপে তোমরা কষ্ট পেলে—দোষী বই কি মা—তবে হাঁ আশীর্ব্বাদ? করব—আর একটু পরে একটু পরে—তেবে দেখি—তার পরে।" শ্রান্ত রোগী ক্রমশঃ ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। সাবিত্রী মাতার পুনঃ পুনঃ প্রয়োজনায় পার্শ্বপার্শ্বে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। সতীর মধ্যে মধ্যে তুল আসিতেছিল, তথাপি সে দেওয়ালের গাত্রে হেলান দিয়া বসিয়াছিল। জাহ্নবী কেবল অপলক নেত্রে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া বসিয়াছিলেন। সহসা সতীর গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া ডাকিলেন, সতী চক্ষু মেলিল, বলিল "কি মা?"

"ওমা, গলায় কি একটা শব্দ হচ্ছে, মুখটা এক একবার যেন কি রকম কচ্ছেন—কি করব সতি?"

সতী কিছুক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিল "মা ডাক্তার ডাকলে হয় না?"

"এখন রাত রয়েছে—কে যাবে?"

সাবিত্রী মাতা ও ভগ্নীর সাবধানতাসূচক কথাতেও জাগিয়া উঠিয়াছিল—দাঁড়াইয়া বলিল "আমি যাই।"

তুই ছেলেমানুষ একলা কি করে যাবি? আমি চল্লেম—মা তুমি একটু আগুন কর। আমি এখনি আসব—হারাণ ডাক্তারের বাড়ী

বেশী

গেল

জাহ্নবী আগুন করিয়া স্বামীর হাত পা সেঁকিতে লাগিলেন আর ঘরপানে চাহিয়া রহিলেন প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ডাক্তার ও সতী আসিল, তখন সকলে জাগিয়া উঠিল। ডাক্তার অবস্থা দেখিয়া কিছু বলিল না, ভিজিটও লইল না, ছুই পুরিয়া ঔষধ দিয়া চলিয়া গেল।

রামশঙ্করের প্রণষ্ট জ্ঞান আর ফিরিল না। ক্রমশঃ অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। তখন জ্যেঠাইমা উচ্চ রোদনে পাড়ার ছ চার জন লোক ছুটাইয়া মুমূর্ষুকে তুলসীতলায় আনিলেন। জাহ্নবী ছুইহস্তে স্বামীর পদ জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মধ্যে মুখ লুকাইয়া নীরবে পড়িয়া রহিলেন, লজ্জাবতী তখন উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে পারিলেন না। সাবিত্রী 'বাবা বাবা' করিয়া গলা ভাঙিয়া ফেলিল, কালীও তদ্রূপ। সতী নীরবে অশ্রুধারার সহিত গঙ্গাজল লইয়া পিতার মুখে দিতে লাগিল। জ্যেঠাইমা "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তখন অস্ত দিনের মতই চারিদিকে উষার জ্যোতি বিকিরণ হইতেছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যেমন সর্ব্বস্থানে হইতেছে, সংসারের যাহা নিত্যকার—নিত্যকার কেন প্রত্যেক নিমেষের ঘটনা ভট্টাচার্য্য পরিবারের হাহাকার আর্ত্ত রোদনের মধ্যেও সেই সকল ঘটনা লইয়া দিন কাটিয়া গেল। পাড়ার পরোপকারী যুবাবৃদ্ধ রামশঙ্করের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার সাহায্য করিল। জাহ্নবীর ধারাই মুখাগ্নি করান হইল, কেননা সুপুত্র হরি তখন চাঁদপুরের বাবুদের সঙ্গে কলিকাতায়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় সহসা জাহ্নবী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া ছিলেন, সেজন্ত সকলে তাঁহাকে স্নান করাইয়া যথোচিত বেশ পরিবর্ত্তন করাইয়া বাটীতে কন্যাদের নিকটে রাখিয়া গিয়া যথাকর্ত্তব্য সমাপন করিল।

শোকাচ্ছন্ন দীর্ঘ দিনগুলা কাটিতে চলিল, তাহারা ত কাহারও মুখাপেক্ষী নয়; মানুষ কেবল জোর করিয়া তাহার মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লয় মাত্র। নির্ব্বাক নিস্পন্দা মাতার পানে চাহিয়া চাহিয়াই সতী ও সাবিত্রীর দিন কাটিয়া যায়, কালীপদ মধ্যে মধ্যে কাঁদে তাহারা সান্ত্বনা করে। শ্রাদ্ধের আর ছুই দিন মাত্র দেরী। কুষ্ঠিয়ালরা ধর্ম্মজ্ঞানে রামশঙ্করের প্রাপ্য মাহিনার দশটি টাকার মধ্যে দিন হিসাবে পাঁচ আনা এক পয়সা দেড় কড়া এক ক্রান্তি কাটিয়া লইয়া বাকী ৯ টাকা পৌনে এগার আনা তিন কড়া ছুই ক্রান্তি পাঠাইয়া দিয়াছে। সতী তাহা রাখিয়া দিয়াছে, কেননা শ্রাদ্ধে ইহার প্রয়োজন। খাইতে না পাইলেও পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করা চাই। প্রত্যহ আশার পথ পানে চাহে, বুঝি ভ্রাতা আসিতেছে, ভ্রাতা আসিল না। চাঁদপুরে একজন লোকও পাঠান হইয়াছিল, বাবুরা বলিলেন "হরি এখানে নাই সে কলিকাতায়।" লোকটি সতীর কথিত মত তাহাকে সংবাদ দিতে অনুরোধ করিয়া আসে। কিন্তু সতী বুঝিল ভ্রাতা সংবাদ পায় নাই। ক্রমে শ্রাদ্ধের দিন সমাগত হইল। সকলে জাহ্নবীকে লইয়া

কার্য্যস্থানে বসাইতে গেলে তখন জাহ্নবী একটু যেন সচেতন হইলেন; এ কয়দিন যেন তিনি জড়ের ন্যায় ছিলেন, কন্যারা যাহা বলিয়াছে করিয়া গিয়াছেন, এই মাত্র। অন্য বলিলেন "আমি কেন একাজ করব সতি? আমার হরি?" সতী মুখ নামাইয়া বলিল "দাদা ত' বাড়ী নেই মা।" "বাড়ী নেই! খবর পাঠাসনি?"

"পাঠিয়েছি। দাদা তা বোধ হচ্চে পায়নি। দাদা কল্‌কাতায়।"

জাহ্নবী চিন্তা করিয়া বলিলেন "তবে কালীকে দিয়ে করাও, সে যা পারবে তাতেই তাঁর তৃপ্তি হবে।" ষষ্ঠ বর্ষীয় বালক সমস্ত দিন উপবাসান্তে পিতৃকৃত্য সমাপন করিল। প্রায় নির্জ্জীব বালককে মাতার ক্রোড়ে দিয়া সতী বলিল" মা এখন এর পানে একটু চাও নইলে আর বাঁচাতে পারবনা, একটু সুস্থ হও মা নইলে আমরা কার মুখ চেয়ে দাঁড়াব?" জাহ্নবী তখন উঠিয়া বসিলেন। স্বহস্তে বালককে হবিষ্যান্ন আহার করাইয়া ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। গ্রামের কয়েকটি ধনীলোক স্বতঃ উপযাচক হইয়া কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। কয়েকটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া রামশঙ্করের দারিদ্র্যজীর্ণ আত্মার বুভুক্ষার কথঞ্চিৎ শমতা করিয়া দিলেন বোধ হয়।

হরিশঙ্করকে লইয়া বাবুরা কলিকাতায় "দুর্গেশনন্দিনী" দেখতে গিয়াছিলেন কেননা তাঁহাদের ক্লাবে সম্প্রতি এই নাটকখানির অভিনয় হইবে। আয়েষার অভিনয় দুরস্ত করিয়া লইবার জন্য হরিকে লইয়া যাওয়া। ফিরিয়া আসিয়া যে দিন তাঁহাদের অভিনয়, সেই দিন হরির বাপের শ্রাদ্ধ, পাছে অভিনয় পণ্ড হয় বলিয়া হরিকে তাঁহারা কোন কথা জানান নাই। চাঁদপুর মজুমপুর হইতে ক্রোশ তিনেক ব্যবধান। এ ঘটনা মৃত্যু সেখানে তেমন প্রচারিতও হয় নাই। যাহা হউক অভিনয় হইয়া গেল, আয়েষার খ্যাতিতে গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিল। অত্যন্ত সুখী হইয়া কি জানি কেন সহসা হরি ভাবিলেন একবার বাটী যাওয়া যাউক। বাবুরা কিছু বলিলনা, হরি মহৎসুখ অভিমুখ যাত্রা করিল। রামশঙ্করের মৃত্যুর পর তখন পঞ্চদশ দিবস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ভট্টাচার্য্য পরিবারের এই কয় দিনের মধ্যেই শোকোচ্ছ্বাসকে কমাইয়া আনিতে হইয়াছে। তাহাদের শোক করিবার অবসর কোথা। শ্রাদ্ধের অবশিষ্ট যাহা কিছু আছে তাহাতে এ কয়দিন সংসার এক রকমে চলিতেছে কিন্তু অন্ধকার ভবিষ্যতের করাল ছায়া সতী সাবিত্রীর আননে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহারা ধীরে ধীরে মাতার শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া বাপের 'পাতা' হইতে পাট টানিয়া লইয়া জলে ভিজাইবার উদ্যোগ করিতেছে। কার্পাস হইতে সূতা তুলিবার জন্য চরকা প্রভৃতি চৌকীর নিম্ন হইতে বাহির করিয়াছে। সকলে আহারান্তে জাহ্নবীকে যাওয়ায় একখানা মাদুরের উপরে শোয়াইয়া দিয়া নিদ্রিত কালাকে নিকটে আনিয়া দিয়াছিল। জাহ্নবী পুত্রের মস্তকে হস্ত রাখিয়া শূন্য নয়নে কড়ির পানে চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার বহু দিনের গ্রথিত জীবন আজ গ্রন্থিহীন, সঙ্গীহীন, বিপর্য্যস্ত। পৃথিবী তেমনি হাসিতেছে, দিন তেমনি গত হইতেছে,

সূর্য্য তেমনি উজ্জ্বল, চন্দ্র তেমনি অংশুমালী, রজনী তেমনি তারার ভরা, চারিদিকেই নির্দ্দয়তা! ইহারা একদিনও কাহার জন্য শোক করে না! কিন্তু তাহার চিত্ত কি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন নয়?

হরি সহসা বাড়ী ঢুকিতে পারিল না। মনে হইল কি যেন একটা বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। বাড়ী যেন শ্রীহীন, বিষাদমলিন, তমসাচ্ছন্ন। মনে হইল দ্বার পিতার আগমনে রুদ্ধ হইয়া থাকিবে। অকস্মাৎ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল 'বাবা!' সতী ও সাবিত্রীর হস্ত হইতে অস্ত্র কর্ম্ম পড়িয়া গেল, জাহ্নবী শিহরিয়া প্রাঙ্গণের প্রতি চাহিলেন, মনে হইল,— তিনি কি ফিরিয়া হরির সঙ্গে আসিয়াছেন! দেখিলেন একা হরি। জাহ্নবী চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

হরি আবার ডাকিল "বাবা। নিস্তা ভাঙ্গিয়া ধড় মড় করিয়া উঠিয়া জ্যেঠাইমা প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িলেন," ওরে হরিরে বাবা! তোর বাবা আর নেই রে বাবা! আজ ১৬ দিন সে চলে গিয়েছেরে বাবা! এলে আজন পিণ্ডিটাও দিলিনে রে বাবা—এমন কুপুত্রও তুই হয়েছিলি রে বাবা – "ইত্যাদি।

হরি সহসা বসিয়া পড়িল। এও কি সম্ভব? সম্মুখে সাবিত্রীকে দেখিয়া বিকলকণ্ঠে বলিল, "সাবি কি হয়েছে বল? বাবা নেই? একি সত্যি সাবি? না না তাও কি হয়।"

সাবিত্রী দুই হাতে মুখ ঢাকিল। দাওয়ার অত্যুচ্চস্থ মাতার পানে হরির দৃষ্টি পড়িল, শ্বেত বস্ত্র! রুক্ষকেশ, শীর্ণ শাখার দীন দুঃখী এই কি তাহার লক্ষ্মীস্বরূপা হাস্যময়ী মা। হরির পাষাণ চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। দুই হাতে মুখ লুকাইয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে সাবিত্রী ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল "একবার মার কাছে চল দাদা।" "মার কাছে—না না এখন যেতে পারবনা এখন আমি যাই।"

সতী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। কঠিন মুখে বলিল "যা করেছ তার ত প্রায়শ্চিত্ত নেই, এখন মাকে একটু ভাল করতে চেষ্টা কর, ছোট ভাইটিকে বাঁচাও। পালিয়ে আর কি করবে, যাও মার কাছে গিয়ে বসো গে।" হরির সে কথা লঙ্ঘন করিতে আর সাহস হইল না, উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাত্র জ্যেঠাই মা চীৎকার করিয়া বলিলেন "ছুঁসনে কাকেও ছুঁসনে, আগে স্নান কর।"

সতী ভাবিয়া বলিল "এবে খিড়কীর পুকুরে চল, ঘাটে এখন আর যেতে হবেনা।" ঘাটে হইতে বাহির হইলে হরিত ভ্রাতা পলাইবে ভাবিয়া নিজে সঙ্গে গিয়া খিড়কীর নিকটস্থ পুকুর হইতে স্নান করাইয়া আনিল। তখন হরি গিয়া মাতার নিকটে বসিয়া নীরবে অনেকক্ষণ কাঁদিল।

জাহ্নবী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন "কেঁদে আর কি করবে, তিনি তোমার ওপর রাগ ত্যাগ ক'রে গেছেন, তোমায় আশীর্ব্বাদ করেই গেছেন, ভাল হও, সুখী হবে।"

হরি বাবুদের উদ্দেশে অনেক গালি দিল। শপথ করিল আর তাঁহাদের সংসর্গে যাইবেনা। কয়েক দিন বাটিতেও রহিল, সতী তাহাকে সহসা যদি হাতে পড়িয়া সে সুধরাইল। কিন্তু দুই দিনেই বুঝিল যে সে ভাল বুঝা।

হরি তুই একদিন ইতস্তত করিয়া সতীকে বলিল "দেখ সতি, বসে থাকলে ত' চলবে না—একটু কাজকর্ম্মের চেষ্টায় বেরুই। মধ্যে মধ্যে আসব এই দশটা টাকা আমার কাছে আছে, এই ক'টা নিয়ে আর যে রকম করে চালাচ্ছ সেই রকমে সংসার চালাও, আমি শীগ্‌গিরই সব ভার নেব—তোমার কোন ভয় নেই। যদি এর মধ্যে বিশেষ দরকার পড়ে ত চাঁদপুরের বাবুদের বাড়ীর ঠিকানায় আমায় পত্র বা লোক পাঠিও, আমি আসব, বুঝেছ? এখন চল্‌লাম—বসে থাকলে ত চলবে না।"

সতী বুঝিয়া নীরবে কেবল টাকা কয়টি লইল। সাবিত্রী করুণস্বরে বলিল" আর দুদিন থাকনা দাদা, মা তোমায় দেখে একটু ভাল আছেন, এর পরে যেও।"

"পাগল আর কি! বসে থাকলে কি চলে। দ্যাখ্ এখন মাকে বলিসনে, কি জানি কাঁদেন কাটেন, আমি যাই তার পরে বলিস।"

সন্ধ্যার পরে জাহ্নবী সাবিত্রীকে নিকটে ডাকিয়া তাহার অর্দ্ধ জটাযুক্ত রুক্ষ ধূলিময় কেশরাশি লইয়া একটু পরিষ্কার করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন; সাবিত্রীর চক্ষু হইতে কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিল, মার অজ্ঞাতে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "আজ থাক মা, এর পরে একদিন দিও।" জাহ্নবীর ক্ষীণ হস্ত দুটীও যেন ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল, তথাপি বলিলেন "বড় জটা পড়েচে, এর পরে আর ছাড়ান যাবে না।"

রাত্রির কার্য্য সমাপনান্তে রান্নাঘরে তালা দিয়া কালীর দুধের বাটী হস্তে সতী কক্ষে প্রবেশ করিল। দুগ্ধ টুকু শিকায় রাখিয়া দাঁড়াইতেই মাতা বলিলেন "রান্না ঘরে তালা দিয়ে এলি? হরি খাবে না? তোরা খাবি না?"

"হরি খেয়েছে—রান্না ঘরের আর কাজ নেই।"

"তুই খাবি না? হরি—হরি কোথায়?"

সতী নতমুখে বলিল "চাকরীর চেষ্টায় চাঁদপুরে গিয়েছে।"

"কই আমায় ত বলে গেল না!"

"তুমি কাঁদবে বলে বলেনি। বল্লে দুচার দিনের মধ্যে আসবে, চাকরি না করলে ত চলবে না। খরচের জন্যে দশটা টাকাও দিয়ে গিয়েছে।"

জাহ্নবী ক্ষণেক নীরবে রহিলেন, পরে একটু নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "কাঁদব কেন—সে যাতে সুখী থাকে থাকুক।" সাবিত্রীর চুলের জটা ছাড়াইতে ক্ষণেক চেষ্টা করিয়া ক্লান্ত স্বরে বলিলেন "সতি—সাবির মাথাটা পরিষ্কার করে দেত মা, আমি পারলাম না।"

সতী সাবিত্রীর মাথা লইয়া বসিল, সাবিত্রী আপত্তি করিল, সতী তাহাকে একটু তিরস্কার করিয়া দ্রুত হস্তে মস্তক পরিষ্কার করিয়া দিল। জাহ্নবী শয্যায় শুইয়া পরিলেন। সাবিত্রী তাঁহার বক্ষের নিকটে মস্তক রাখিয়া দক্ষিণ হস্তটি তাহার গাত্রে দিয়া শয়ন করিল। সতী বলিল "মা একটু জল খাও।"

"না মা, আমায় বিরক্ত করনা, আমার একটু ঘুম আসছে।"

সতী বুঝিত মাতার এই নিস্পন্দ নিব্বাক চিন্তা ঠিক ঘুমের মতই তন্ময়তা পূর্ণ। মাতা

সে সময়ে কাহারও কথা সহিতে পারেন না। অগত্যা সে উঠিয়া নিদ্রিত ভ্রাতাকে তুলিয়া দুগ্ধ পান করাইয়া অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া ঘুম পাড়াইল। গাভীর এই দুগ্ধটুকুই বালকের জীবন—সে জন্য গাভীর যত্নের সে ত্রুটী করিত না।

রাত্রি বাড়িয়া চলিল। সেদিন অত্যন্ত গরম, দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া সতী জানালার নিকটে অঞ্চল পাতিয়া শুইয়া পড়িল। দীর্ঘ জটাসঙ্কুল চুলগুলা শৈবালের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বাহিরে আষাঢ়ের ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ, একটিও তারা নাই—কোথাও একটু আলো নাই। স্তম্ভিত পৃথিবী যেন তাহারি মত মলিন অঞ্চল পাতিয়া একধারে পড়িয়া আছে, অবসাদময়, বিষাদগ্রস্ত প্রভাতে আর যেন সে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। সতী বুঝিতে পারিতেছিল না বুকের উপর কেন এ পাষাণের মত ভার চাপিয়া বসিয়া আছে। যখন কার্য্যের মধ্যে সে আপনাকে মগ্ন রাখে তখন বেশ থাকে। একটু অবসর পাইলেই এ ভার তাহাকে চাপিয়া ধরে। কতকাল আর তার এ ভাবে যাইবে! এ ভার কি কখনও নামিবে না? যেন কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে, অথচ কান্না আসে না। পৃথিবীর পানে চাহিয়া ভাবিল, উঃ এ কি অন্ধকার! এ অন্ধকারের কি বিরাম নাই। আকাশের প্রতি চাহিয়া দেখিল একটা তারা মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, ভাবিল, ঐ কি আমার বাবা, তিনি যে আমায় ডাকিয়া গিয়াছেন। আমায় কি এখনও ডাকিতেছেন?—ভাবিতে ভাবিতে সহসা দেখিল তারাটা যেন ক্রমশঃ উজ্জ্বল বিকট চক্ষে তাহার পানে চাহিল, সতী সভয়ে জানালা রুদ্ধ করিয়া দিয়া মাতার পার্শ্বে আসিয়া শুইয়া পড়িল। একবার নিদ্রিত ভ্রাতা ভগিনী ও মাতাকে স্পর্শ করিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিল "না আমি যেতে চাই না।"

মাস তিনেক কাটিয়া গেল। হরি ইহার মধ্যে আর একবার আসিয়া কয়েকটা টাকা দিয়া গিয়াছিল। তাহাতে এবং তিনজনার পরিশ্রমে একপ্রকারে সংসার চলিতেছিল। প্রভাতে সতী পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়াছে, এখন আর সে বড় নদীর ঘাটে যায় না। সাবিত্রী গরুকে জাব দিতেছিল। দ্বার প্রান্তে পিয়ন আসিয়া বলিল 'চিঠি'। কালী পত্রখানা আনিয়া মাতার হস্তে দিল। মাতা তুলসীতলা নিকাইতে নিকাইতে বাম হস্তে কার্ডখানা পড়িলেন। পড়িয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সেই সিক্ত কর্দ্দমময় স্থানের মধ্যেই বসিয়া পড়িলেন।

সতী স্নান করিয়া আসিল। কলসী রান্নাঘরে রাখিয়া মাতার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "মা কি হয়েছে? কাঁদছ কেন?" মাতা নির্ব্বাক্।

কার্ডখানা পড়িয়া রহিয়াছে। সতী তুলিয়া লইয়া পড়িল, নবগ্রামবাসী তিনকড়ি লাহিড়ী সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র তাঁহার বিমাতাকে ইহা জ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখিয়াছেন এবং সবান্ধবে তাহার ভবনে গিয়া শুভকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

সতীও অনেকক্ষণ নীরবে রহিল। পত্রখানা হাতে করিয়া দিদি দাঁড়াইয়া রহিল

দেখিয়া সাবিত্রী বিস্মিত ভাবে নিকটে আসিল। দিদির হস্ত হইতে পত্রখানা টানিয়া লইয়া পড়িয়া দেখিল। একবার দিদির মুখপানে চাহিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল "মা ওমা মাগো", জ্যেঠাই মা ছুটিয়া আসিলেন ও রোদননিরতা সাবিত্রীর নিকট হইতে বহু কষ্টে অর্থ জানিয়া লইয়া উচ্চৈস্বরে চীৎকার ধরিলেন। পাড়ার লোক আসিয়া জুটিল, সকলে হায় হায় করিতে লাগিল, বেশ একটু সোরগোল পড়িয়া গেল। জাহ্নবী কেবল দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া রহিলেন। এ রোদন যেন উপহাস মাত্র! যে দিন সতীর বিবাহ হইয়াছে সেইদিনই ত এ রোদন সারিয়া রাখা হইয়াছে, আর কেন!

বেলা অনেক হইল। জ্যেঠাইমা বলিলেন "যা হবার তা হ'ল, সতী আয় মা ডুবটা দিয়ে আসি।" সতী স্থিরকণ্ঠে বলিল "পুকুরে নাইলে হবে?" সকলে বলিল "তাকি হয় নদীতে যেতে হবে।" সতীর ভাব দেখিয়া সকলে মনে মনে নিন্দা করিতেছিল, একি মেয়ে বাপু! নাহয় বরই না করেছিস্—স্বামী ত, বিয়ে ত' করেছে। তা কাঁদলে না মা!" জ্যেঠাইমা সতীর হস্তের শাঁখের চুড়ি ও লোহা ভাঙ্গিতে গিয়া সত্য সত্যই কাঁদিয়া উঠিলেন। সতী নিজেই একটা ইটের বাড়ীতে সেগুলা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। স্নানান্তে শুভ্র থান পরিয়া, সিঁদুর ও হস্তের লোহা ও চুড়ি কয়গাছা বিসর্জ্জন দিয়া সতী অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া সহজ ভাবেই বাটী চলিল। কেবল সকলে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া একটা অব্যক্ত ক্ষোভে তাহার হৃদয় অবসন্ন হইতেছিল। ঘাটের বাহিরে আসিয়া জ্যেঠাইমা ডাকিলেন "কালী নিমপাতা দিয়ে যা, সতী, এখন বাড়ীর মধ্যে ঢুকিস্ না; নিমপাতা দাঁতে কাট্, আগুন ছোঁ, তবে যাবি।" সতিক্ষু ভাবে সতী যথা কর্ত্তব্য পালন করিল। সাবিত্রী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, কে বলিল "সাবি তুই এখন সরে যা—দিদির মুখ দেখিস্ না"—সতী তাড়াতাড়ি মুখ ঢাকিল। সাবিত্রী ছুটিয়া আসিয়া "ওগো দিদি তোমায় এমন সাজে কে সাজালে" বলিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। সকলে যুগপৎ তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল, সতী তখন সেইখানে বসিয়া পড়িল, তাহার স্কন্ধে মাথা দিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া সাবিত্রী কাঁদিতেছিল, তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া মৃদু স্বরে প্রবোধ দিতে লাগিল।

জ্যেঠাইমা আসিয়া জাহ্নবীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "এখন ওঠো, যা কপালে ছিল হল। মেয়েটাকে একটু জল খাওয়াও। ভেবে আর কি করবে।" জাহ্নবী উঠিলেন, সতীর নিকটে যাইতেই সতী উঠিয়া দাঁড়াইল। কন্যার বৈধব্যমূর্ত্তি দেখিয়া আর যেন তাঁহার সহ্যগুণ তাঁহাকে আশ্রয় দিল না। আর্ত্তস্বরে একবার চীৎকার করিতে গেলেন, শব্দ বাহির হইল না, কেবল কন্যাকে দুই বাহুর মধ্যে টানিয়া লইলেন।

অনেক ক্ষণ পরে বলিলেন "সতি! চল মা একটু সবসৎ খাবি।" সতী নত মুখে বলিল "না, আমার ত' তেষ্টা পায়নি। তুমি একটু খাও, আমি রান্না চড়াইগে।" "রান্না তোমার জ্যেঠাইমা চড়িয়েছেন তুমি আজ রাঁধ্‌বেনা।" "ওঃ!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দেবীর তীর্থ ভ্রমণ শেষ করিতে প্রায় এক বৎসর লাগিল।

সেবারে বিশ্বেশ্বর পশ্চিমে যাইব বলিয়াছিল, কিন্তু কার্য্য গতিকে যাওয়া হয় নাই। উভয়ে এবার বহু তীর্থ ঘুরিলেন। সাবিত্রী, গায়ত্রী পুষ্কর, ওঙ্কার, কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ, হরিদ্বার প্রভৃতি কষ্টসাধ্য তীর্থ গুলিও এবারে সারা হইল। মাসিমার এসব তীর্থে এত দিন পর্য্যটন হয় নাই, এবারে বাহির হইয়াছেন ও' সব সারিয়া যাইবেন ভাবিয়াছিলেন। যাবজ্জীবন গৃহ কোটরে নিবদ্ধ বিশ্বেশ্বর যেন এক নূতন জগতের জীব হইয়া পড়িয়াছিল, আজ এখানে, কাল সেখানে, কখনও স্নান কখনও দেবদর্শন কখনও পর্ব্বতারোহণের আনন্দে সে এক প্রকার আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল। চন্দ্রনাথ গিয়া বলিল-"মাসিমা আর কোথাও গিয়ে কাজ নাই, এস এইখানে একটা ঘর বেঁধে আমরা থাকি।" মাসিমা একটু হাসিলেন মাত্র। সমস্ত পশ্চিম ভ্রমণ করিয়া সে সুখীও যতদূর হইল, দুঃখিতও তদূর হইল। সেবারে দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি পশ্চিমকে গ্রাস করিয়াছিল। একদিন মাসীকে বলিল "মাসিমা আমাদের দেশে বাস না করে এই সব দেশে বাস করলে ত হয়।" মাসিমা বলিলেন "কেন?"

"দেখদিখি কি গরীব দেশ! হা অন্ন হা অন্ন করে সাধারণ লোকগুলো কি করে বেড়াচ্ছে। কার কি করতে পারি বলে কাজ খুঁজে বেড়াতে হয়না, দরিদ্রতা যে কি তা পশ্চিমে দুর্ভিক্ষের সময় এলে বোঝা যায়।"

মাসিমা একটু দুঃখসূচক হাস্য করিয়া বলিলেন "আমাদের দেশে কি গরীব নেই ক্ষেপা?"

"কোথায়! যারাও আছে, এদের সঙ্গে তাদের তুলনাই হয় না। আমাদের দেশ শস্যশ্যামলা সুজলা সুফলা, কিছু না থাকলে অনাহারে মরতে হয় না।"

"তা সত্য কিন্তু একবার রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যদের কথা মনে করে তাখ দেখি।"

"তা দেখেছি। কিন্তু এসব দেশ হলে কোন্ দিন তারা মরে যেত, বাঙ্গলার গ্রাম বলেই এখনো ভদ্রতা রেখে দিন কাটাচ্ছে। তাখ মাসীমা, যে দেশে অভাব নেই সে দেশে কিছু করা যায়না, করতেও লজ্জা হয়। যারা গ্রহণ করবে তারাও লজ্জা পায়, কেননা, তারাত কায়ক্লেশে এক রকমে দিন কাটাচ্ছে, সাধারণের চোখে একবারে ভিক্ষুকের বেশ তারা সহজে ধরতে চায় না। যে দেশে সে সঙ্কোচ মাত্র নাই, সাহায্য অভাবে যারা দিন রাত্রি মরে যাচ্ছে সেই দেশে এসে বাস করা উচিত। বিনা আয়াসে অনেক কাজ করতে পারা যায়।"

মাসী হাসিয়া বলিলেন "কি কাজ করতে পারা যায়? কি করতে চাস্?"

বিশ্বেশ্বর অধোবদন হইল, লজ্জার আভাসে তাহার আপাদকর্ণমূল ঈষৎ রাঙা হইয়া উঠিল। মুখে বড় বড় কথা বলা তাহার সাধ্যের অতীত। ভাবের আধিক্যে যেখানে হৃদয় অত্যন্ত আলোড়িত, সেখানে সে একবারে বাকাহীন হইয়া পড়ে। এইজন্যই দেশে একটা অতিথিশালা প্রস্তুত করাইতে করাইতে সহসা সে কার্য্য সে স্থগিত রাখিয়াছে। প্রথমতঃ নিজে কি করিয়া লোকের কাছে প্রচার করিবে যে আমি একটা মস্ত দয়ালু ধনবান লোক, যে কেহ সাহায্য চাও আমার আশ্রয়ে আইস, আমি তোমাদের দুঃখ দূর

করিব! একথা ভাবিতে তাহার অন্তরাত্মা সঙ্কুচিত হইয়া গেল। ভাবের উত্তেজনায় কার্য্যটা আরম্ভ করিয়া ফেলিয়াছিল, সহসা সেটা বন্ধ করিয়া দিল। দেশের লোকে ভাবিল রেশমের দর কমিয়া যাওয়াতে বিশ্বেশ্বর তাহার কুঠী নির্ব্বাণকার্য্যে মনোযোগ রাখিল। দ্বিতীয়তঃ সে ভাবিয়াছিল যে এদেশে এমন লোকের সংখ্যা খুব কম যারা নিঃসঙ্কোচে সাধারণের চক্ষে ভিক্ষুক বলিয়া পরিচিত হইয়া লোকের সাহায্য গ্রহণ করে। যাহারা সে সঙ্কোচহীন, তাহারা ভেকধারী বৈষ্ণব। ধর্ম্মশীল বঙ্গের গৃহস্থদিগের কল্যাণে তাহাদের অভাব নাই। অনেক ভাবিয়া বিশ্বেশ্বর সে ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছিল।

পশ্চিমে আসিয়া তথাকার সাধারণ অধিবাসীর দুর্দ্দশা দেখিয়া সে অশ্রু সামলাইতে পারিল না। তাহার নিতান্ত ইচ্ছা হইল যে পশ্চিমে আসিয়া বাস করিয়া তাহার বহু-দিনের সেই ইচ্ছা পূরণ করে। মাসিমা কিন্তু একটু ক্ষোভের হাসির সহিত তাহার সে ইচ্ছায় বাধা দিতে লাগিলেন। তিনি স্থির বুদ্ধিতে বুঝিয়াছিলেন যে কুবেরের ভাণ্ডার নহিলে সেদেশের অভাব নিবারিত হয়না। বিশ্বেশ্বরের অজস্র দানে তিনি বাধা দিতেন না কিন্তু বাটী ফিরিবার জন্য তাড়া দিতে লাগিলেন। বুঝিলেন যে তাঁহার বিচলিতমস্তিষ্ক পুত্রটি অধিক দিন সে দেশে থাকিলে আরও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিবে। তাহাকে রিক্তসর্ব্বস্ব দেখিতে তিনি একেবারে ইচ্ছুক নন! মাসীর ব্যস্ততায় বিশ্বেশ্বর অগত্যা দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। মাসিমা জাঁত লইয়া বসিয়া আছেন, বেলা দুইটা বাজিয়া গেল, তিনটা বাজে, বিশৃঙ্খল কক্ষ মস্তকে, শ্রান্ত, ঘর্ম্মাক্তদেহে, সূর্য্যাকিরণদগ্ধ মলিন মুখে বিশ্বেশ্বর ফিরিয়া আসিল। সরবৎ খাওয়াইয়া, বাতাস করিয়া অনেক কষ্টে মাসিমা তাঁহাকে সুস্থ করিলেন। সে যে এতক্ষণ কি করিতেছিল বেশ বুঝিতে পারিলেন। পঁচিশজন লোক খাইবে বলিয়া সে যখন মাসিমাকে রাঁধিতে অনুরোধ করিত, মাসিমা তখন বুদ্ধি খাটাইয়া একশত জনের উদ্যোগ করিতেন, বিশ্বেশ্বর সে রন্ধনে আসিয়া যোগ দিত। জোল কাটিয়া বড় বড় ভাতের ডোল চাপাইয়া গামছা কোমরে বিশ্বেশ্বর মহানন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, মাসিমা তরকারির ভার লইতেন। শেষে একশত জনের স্থলে দুই শতে মারামারি বাধিয়া যাইত। ভাণ্ডারের চাল বিলাইয়া তখন ভিক্ষুকদলকে শান্ত করিতে হইত।

অত্যধিক পরিশ্রমে বিশ্বেশ্বরের শরীর কৃশ ও মলিন হইয়াছিল। দুই একবার জ্বরও হইল। মাসিমা তখন জোর করিয়া পোটলা পুঁটলি বাঁধিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। এক বৎসর পরে তাঁহারা দেশে ফিরিয়া চলিলেন। ট্রেণের মধ্যেই মাসিমা একবার বিশ্বেশ্বরকে জানাইলেন "দেশে গিয়ে একমাসের মধ্যেই তোমার বিয়ে দেব, মনে থাকে যেন।" বিশ্বেশ্বর একটু হাসিল।

বিবাহের নামে সত্যই তাহার যেন একটা ভয় জন্মিয়া গিয়াছিল। প্রথমে কি মনে করিয়া সে যে বিবাহ করিবে না সংকল্প করিয়াছিল তাহা বলা কঠিন, কিন্তু এখন সে সংকল্প যেন বৃহৎকায় অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় বহু শাখা

প্রশাখা বিস্তার করিয়া অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঝড়ঝাপ্টাবৃষ্টি এখন সে সকলি উপেক্ষা করিতে পারে। সামান্য কল্পনার অঙ্কুর এখন সুদৃঢ় পাষাণভেদী মূলে পরিণত হইয়াছে। প্রথমে যখন সে বিবাহ করিবনা বলিয়াছিল সে সময়ের সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে অবিরত শুষ্ক জ্ঞানচর্চ্চাই তাহার কারণ। যদি তাহার মাতা ভগিনী বা স্নেহভালবাসার সম্পর্কীয় কেহ সে সময়ে থাকিত ত বোধ হয় এভাব জন্মিতে পারিত না। মাসিমা তখন নূতন সংসারে আসিয়া কেবল কর্ত্তব্যই পালন করিয়া যাইতেন, পরের ছেলেকে অত বেশী ঘনিষ্ঠ করিতে চাহিতেন না। কিন্তু এখন বৃদ্ধ বয়সে সে দর্প তাঁহার চূর্ণ হইয়াছে; কেবল বিশ্বেশ্বরই নারীসঙ্গ অসহিষ্ণু হইয়া গঠিত হইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞান-চর্চ্চার অবসরে সে যখন কাব্য ও সাহিত্য আলোচনা করিত তখন তাহার মধ্যে নারী জাতির প্রাধান্য দেখিয়া আরও ভীত হইয়া পড়িত। একজন সামান্য বালিকা বা নারী কিরূপে পুরুষের বিস্তৃত জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ-সার্থকতার কেন্দ্র স্বরূপে প্রতিষ্ঠিতা হয় তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না; অথচ দেখিত ইহাই কাব্য সাহিত্যের প্রাণ; অতএব জগতেরও প্রাণ। কিরূপে এই মোহময় আত্মবিস্মৃতি হইতে রক্ষা পাইবে সেই চেষ্টায় সে সমস্ত প্রাণপন প্রয়োগ করিত। আপনাকে বিবাহিত কল্পনা করিয়া এক একবার মানস-চক্ষে আপনার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিত। সমস্ত সুখ কল্পনা একটি বালিকার সুখে দুঃখে পর্য্যবসিত! চিন্তার শেষ, কাব্যের শেষ, সেই একটী বালিকায়। সমস্ত আগ্রহ সমস্ত স্নেহ ভালবাসা, সৌন্দর্য্য সব সেই ক্ষুদ্র মূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত। এই কি মানুষের আকাঙ্ক্ষিত জীবন? এই যদি সুখ শান্তি তৃপ্তি তবে ধর্ম্ম কাহাকে বলে!

যখন সে গ্রামের নিকটে পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দূরে গ্রামের জ্ঞাবল রেখা ম্লান চন্দ্রকিরণে চিত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। মাঠের চিরপরিচিত বায়ু সাদরে যেন তাহার চুলগুলা লইয়া নাড়িতে লাগিল, চিবুক ধরিয়া সস্নেহে যেন কুশল প্রশ্ন করিল। সহসা বিশ্বেশ্বরের চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, মনে হইতেছিল যেন তাহার শৈশবে অন্তর্হিতা জননী ঐ গ্রামের আম্রবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইয়া স্নেহসজলচক্ষে প্রবাস হইতে আগত পুত্রকে সম্ভাষণ করিতেছেন। বিশ্বেশ্বর ক্ষণেক দাঁড়াইল, যেন তীব্র আনন্দের প্রতিঘাত একটু সম্বরণ করিয়া লইতেছে; সহসা পথের উপর নত হইয়া মাটীতে ললাট স্পর্শ করিয়া সে কাহাকে প্রণাম করিল। মাসিমা গোপকটে ছিলেন, নহিলে হয়ত পুত্রের কাণ্ড দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন।

বাটী পৌঁছিয়া মাসিমা আগে গরুগুলি দেখিতে গেলেন। পুরাতন ভৃত্য ঘোষ এবং নিজের মা বাড়ী ঘর যথা সম্ভব পরিষ্কারই রাখিয়াছিল। তথাপি যে সব ঘর তালা দেওয়া ছিল সে ঘরের মূর্ত্তি দেখিয়া মাসিমা প্রবাসে যাওয়ার বিরুদ্ধে অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। তীর্থ হইতে যে সব তৈজস, বস্ত্র, ও প্রসাদ আদি আনিয়া ছিলেন তাহা প্রতিবেশী বর্গকে বণ্টন করিবার ব্যগ্রতা সম্প্রতি সম্বরণ করিয়া "উপোসী" ছেলের জন্য রন্ধন চাপাইয়া দিলেন। ছেলে কিন্তু তখন পাড়াময় ঘুরিয়া

বেড়াইতেছিল। কাহারও বাড়ীতে যাওয়া তাহার স্বভাববিরুদ্ধ কিন্তু অদ্য এক একবার সে ইচ্ছাও হইতেছিল। পাছে কেহ কিছু মনে করে বলিয়া ইচ্ছাটা প্রশমিত করিয়া একবার তাহার কলাবাগানটা দেখিতে গেল, ক্ষীণচন্দ্র তখন অস্তে যাইতেছে, কলা বাগানের সবই অন্ধকার; সস্পৃহনয়নে একবার বৃক্ষগুলার পানে চাহিয়া ফিরিয়া চলিল। গ্রামের প্রত্যেক বৃক্ষ প্রত্যেক গৃহ যেন কতই সুন্দর বোধ হইতেছিল। রাস্তায় নাপু মণ্ডল, পরাণ কলু, বিপিন সেনে প্রভৃতি তাহার নিতান্ত অপরিচিত লোকগুলা যখন দাদাঠাকুর কবে এলে গো? বলিয়া তাহাকে নমস্কার করিল তখন সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাহাদের সহিত আলাপ জুড়িয়া দিল। আজ যেন এ গ্রামের সামান্য লোকটাও সকলে স্পৃহনীয় বোধ হইতেছে।

দক্ষিণ পার্শ্বে ভট্টাচার্য্যের বাটী, অন্ধকারে কয়েকটা স্তূপের মত দেখাইতেছে, বিশ্বেশ্বর একটু থমকিয়া দাঁড়াইল, ইচ্ছা হইল একবার ভট্চায মশায় বলিয়া ডাকে, কিন্তু সহসা সেই বিবাহের প্রস্তাব মনে পড়ায় আর ডাকা হইল না। একটু ভাবিতে ভাবিতে বিশ্বেশ্বর চলিতে আরম্ভ করিল। কিয়দ্দূরে উমেশ মুখোপাধ্যায়ের বৈঠক ঘর। রোয়াকে গৃহস্বামী স্বয়ং বসিয়া তামাকু টানিতেছেন, বিশ্বেশ্বর একেবারে গিয়া সেখানে উঠিল। গৃহস্বামী বলিলেন "কে?" "আমি বিশ্বেশ্বর।"

"বিশ্বেশ্বর? এসো বাবা, ব'সো; পশ্চিম থেকে কবে ফিরলে? ভাল আছ ত?"

বহুক্ষণ সেখানে গল্প করিয়া, গ্রামের অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া অনেক রাত্রে বিশ্বেশ্বর বাটী ফিরিল। পাকে করিয়া ভাত বাড়িয়া ঢাকা দিয়া মাসিমা বসিয়া ঢুলিতেছিলেন, বিশ্বেশ্বর কথা না কহিয়া একেবারে আসনের উপর গিয়া বসিল। সচকিত হইয়া তিনি বকিতে লাগিলেন "আখদেখি, ভাত কটি জুড়িয়ে জল হয়ে গেল, আজ দুদিন খাওয়া নেই—কোথায় দুটি খেয়ে একটু গিয়ে শোবে—না এখানে এসেও সেই স্বভাব! ভোরে একটা যোগ আছে, নদীতে ডুবটা দিতে যাব, তা কখন বা শোব, কখন বা সকালে উঠব—তোর যদি কোন কালেও"—মাসিমা আরও বলিতেন কিন্তু পুত্রের বিষণ্ণ নতমুখ দেখিয়া থামিয়া গেলেন। সোৎসুকে বলিলেন "এতক্ষণ কোথায় ছিলি?"

"উমেশ মুখুয্যের বৈঠকখানায়।"

"তারা সব ভাল আছে ত? পাড়ার সব ভাল? গাঁয়ের সবাই ভাল আছে?"

"সবারি খবর কি করে বল্‌ব। আমাদের রামশঙ্কর ভট্‌চায মারা গেছেন।"

মনস্তাপ পাইয়া মাসিমা নীরব হইলেন। একবার মৃদুস্বরে বলিলেন "আহা বৌটা!" তারপরে অনেকগুলা 'আহা' মনে আসিতে লাগিল, তাই নীরব হইলেন। আবার একবার বলিলেন "যে মরে সেত' জুড়োয়, কিন্তু সে কি জুড়িয়েছে, আর সংসারের ভাবনা ভাবতে হবে না" বিশ্বেশ্বর নীরবেই রহিল।

রাত্রে মাসিমা ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিলেন না, জাহ্নবীর শান্ত সহিষ্ণু মূর্ত্তিখানি কেবলি তাঁহার চক্ষের উপর আসিতেছিল। প্রত্যূষে উঠিয়া বস্ত্র ও গামছা লইয়া নদীতে স্নানার্থ গমন করিলেন। নদীতে অনেকেই স্নান করিতেছিল, মাসিমাতাকে দেখিয়া

সকলেই কুশলপ্রশ্নে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিল। ভট্টাচার্য্যদের বড়বৌও নাইতেছিলেন তিনি কাংস্যকণ্ঠে বলিলেন "আমরা বলি বা আর দেশেই ফিরবেনা।"

"দেশে ফিরবনা কেন দিদি' বলিতে বলিতে তাঁহার পার্শ্বে অবগুণ্ঠিতা শ্বেতবস্ত্রা জাহ্নবীকে দেখিয়া মাসিমাতা মুখ ফিরাইলেন। দক্ষিণে চাহিয়া দেখিলেন,—সাবিত্রী ডুব দিতেছে, তাঁহার ইচ্ছা হইল তাহার ম্লানমুখখানি ধরিয়া আদর করেন, কিছু জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু কোন্ লজ্জায় আর তাহাদের সহিত তিনি কথা কহিবেন! তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া ফিরিতে গিয়া দেখেন, সাবিত্রীর পার্শ্বে শ্বেতবস্ত্রা আলুলায়িতকুন্তলকেশা ওকি মূর্ত্তি? ওকে? ওই কি সতী? অন্নপূর্ণা নীরব নিশ্চল কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। (ক্রমশঃ)

বিধবা।

প্রজ্বলিত চিতা-তলে সর্ব্ব সুখ করি বিসর্জ্জন,
যবে তুমি এলে ফিরি মুক্তকেশ সিক্ত দুনয়ন,
তখনি দেখিনু তোমা—নহ তুমি আর আপনার,
আপনার ক্ষুদ্র সীমা চরাচরে করিয়া বিস্তার—
মহীয়সী দেবী সম দাঁড়ায়েছ অনন্তের তলে,
বাড়াইয়া দুটি কর, স্নেহ-কণ্ঠে, অমৃত মিশিলে—
ডাকিতেছ 'আয়' বলি, খুলে দিয়ে অলঙ্কার ধন—
বিসর্জ্জিয়া জীবনের আজীবন বাঞ্ছিত সম্বল।—
আজি তুমি মহাধন্যা, রুদ্রপ্রেম আজি শত পথে,
সসীমের বন্ধন টুটিয়া, অসীমের অতলস স্রোতে
পড়িয়াছে স্তব্ধ রবে, অপগত আকাঙ্ক্ষা নিচয়,
প্রভাতের পদ্ম সম প্রস্ফুটিত কৈশোর হৃদয়—
করুণা শিশির সিক্ত, সকলেরে বলে নয় টানি,
নাহি তৃষা আত্মপর, নাহি স্বার্থ, নাহি তোম প্রাণি-
আপনার সুখ দুঃখ দুই পথে করিয়া দলন,
পরহিতব্রতে দেবি করিয়াছ আত্ম নিবেদন।
তবু তুমি নম্রচিতা, ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে
নিজেরে ঢাকিতে চাহ সংসারের বাহ্য আবরণে
নিষ্ফল বিষাদে সুধা; নাহি প্রাণে আশার ঝঙ্কার
বাঞ্ছাহীন দীর্ঘ প্রাণে শুচিস্মিতা তুমি মা আমার।
কি অমৃত ধৈর্য্য ভরে সহিতেছ অনন্ত বেদন,
হৃদয়ে কি তীব্রানল—কি নিষ্ঠুর বৃশ্চিক দংশন
জর্জ্জরিয়ে নিত্য তোমা, ধৈর্য্যবতী ধরিত্রীর প্রায়,
তুমি কিন্তু অচঞ্চল জগতের স্তুতি বা নিন্দায়।
রাজরাজেশ্বরী বেশে মানবের বহু উর্দ্ধে এবে,
হে কল্যাণি, আজ যদি স্ফুট কান্তি বিপুল গৌরবে—
পবিত্রিয়া সর্ব্ব জীবে, পবিত্রিয়া অখণ্ড অবনী;
নমো নমো অনিন্দিতা হে বরেণ্যা বিশ্বের জননি।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন।

ক্ষুদ্র ও মহৎ।

সিন্ধু কহিল, 'সিন্ধু তোমার
চিত্ত মহান্—পরিধি নাই,
তুচ্ছ আমি—এ ক্ষুদ্র পরাণ
তোমারি হৃদয়ে মিশাতে চাই'।

সিন্ধু কহিল, 'আরে ও অবোধ
আয় বুকে আয় রাখিয়ে ঢেকে,
তোদেরি পরশে আমিরে মহান্
বিশ্ব আমারে মহান্ দেখে।

শ্রীরমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

পণরক্ষা।

(১)

বংশিবদন তাহার ভাই রসিককে যেমন ভাল বাসিত এমন করিয়া সচরাচর মাও ছেলেকে ভালবাসিতে পারে না। পাঠশালা হইতে রসিকের আসিতে যদি কিছু বিলম্ব হইত তবে সকল কাজ ফেলিয়া সে তাহার সন্ধানে ছুটিত। তাহাকে না খাওয়াইয়া সে নিজে খাইতে পারিত না। রসিকের অল্প কিছু অসুখবিসুখ হইলেই বংশীর দুই চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিতে থাকিত।

রসিক বংশীর চেয়ে ষোলো বছরের ছোট। মাঝে যে কয়টি ভাই বোন জন্মিয়াছিল সবগুলিই মারা গিয়াছে। কেবল এই সব-শেষেরটিকে রাখিয়া, যখন রসিকের এক বছর বয়স, তখন তাহার মা মারা গেল এবং রসিক যখন তিন বছরের ছেলে তখন সে পিতৃহীন হইল। এখন রসিককে মানুষ করিবার ভার একা এই বংশীর উপর।

তাঁতে কাপড় বোনাই বংশীর পৈতৃক ব্যবসায়। এই ব্যবসা করিয়াই বংশীর বৃদ্ধ প্রপিতামহ অভিরাম বসাক গ্রামে যে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে আজও সেখানে রাধানাথের বিগ্রহ স্থাপিত আছে। কিন্তু সমুদ্রপার হইতে এক কল-দৈত্য আসিয়া বেচারা তাঁতের উপর অভিশাপ হানিল এবং তাঁতীর ঘরে ক্ষুধাসুরকে বসাইয়া দিয়া বাষ্প-হুংকারে মুহুর্মুহু জয়শঙ্খ বাজাইতে লাগিল।

তবু তাঁতের কঠিন প্রাণ মরিতে চায় না —ঠুক্‌ঠাক্ ঠুক্‌ঠাক্ করিয়া মাকু এখনো চলাচল করিতেছে—কিন্তু তাহার সাবেক চালচলন চকল লক্ষ্মীর মনঃপূত হইতেছে না, লোহার দৈত্যটা কলেবলেকৌশলে তাঁতীকে একেবারে বশ করিয়া লইয়াছে।

বংশীর একটু সুবিধা ছিল। থানাগড়ের বাবুরা তাহার মুরুব্বি ছিলেন। তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারের সমুদয় মৌসীন কাপড় বংশীই বুনিয়া দিত। একলা সব পারিয়া উঠিত না, সে জন্য তাহাকে লোক রাখিতে হইয়াছিল।

যদিচ তাহাদের সমাজে মেয়ের দর বড় বেশি তবু চেষ্টা করিলে বংশী এতদিনে যেমন-তেমন একটা বউ ঘরে আনিতে পারিত। রসিকের জন্যই সে আর ঘটিয়া উঠিল না। পূজার সময় কলিকাতা হইতে রসিকের যে সাজ আমদানি হইত তাহা বাজার ঘরের রাজপুত্রকেও লজ্জা দিতে পারিত। এইরূপ আর আর সকল বিষয়েই রসিকের যাহা কিছু প্রয়োজন ছিল না তাহা জোগাইতে গিয়া বংশীকে নিজের সকল প্রয়োজনই খর্ব করিতে হইল।

তবু বংশরক্ষা করিতে ত হইবে। তাহাদের বিবাহযোগ্য ঘরের একটি মেয়েকে মনে মনে ঠিক করিয়া বংশী টাকা জমাইতে লাগিল। তিনশো টাকা পণ এবং অলঙ্কার-বাবদ আর একশো টাকা হইলেই মেয়েটিকে পাওয়া যাইবে স্থির করিয়া অন্ন-অন্ন কিছু-কিছু সে খরচ বাঁচাইয়া চলিল। হাতে যথেষ্ট টাকা ছিল না বটে কিন্তু যথেষ্ট সময় ছিল। কারণ মেয়েটির বয়স সবে চার—এখনো অন্তত চার পাঁচ বছর মেয়াদ পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু কোষ্ঠিতে তাহার

দৃষ্টি ছিল রসিকের। সে দৃষ্টি শুভগ্রহের দৃষ্টি নহে।

রসিক ছিল তাহাদের পাড়ার ছোট ছেলে এবং সমবয়সীদের দলের সর্দার। যে লোক সুখে মানুষ হয় এবং যাহা চায় তাহাই পাইয়া থাকে ভাগ্যদেবতাকর্তৃকবঞ্চিত হতভাগাদের পক্ষে তাহার তারি একটা আকর্ষণ আছে। তাহার কাছে ঘেঁষিতে পাওয়াই যেন কতকটা পরিমাণে প্রার্থিত বস্তুকে পাওয়ার সামিল। যাহার অনেক আছে সে যে অনেক দেয় বলিয়াই লোকে তাহার কাছে আনাগোনা করে তাহা নহে—সে কিছু না দিলেও মানুষের লুব্ধ কল্পনাকে তৃপ্ত করে।

শুধু যে রসিকের সৌখিনতাই পাড়ার ছেলেদের মন মুগ্ধ করিয়াছে এ কথা বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। সকল বিষয়েই রসিকের এমন একটি আশ্চর্য্য নৈপুণ্য ছিল যে তাহার চেয়ে উচ্চজাতের ছেলেরাও তাহাকে খাতির না করিয়া থাকিতে পারিত না। সে যাহাতে হাত দেয় তাহাই অতি সুকৌশলে করিতে পারে। তাহার মনের উপর যেন কোনো পূর্ব্ব-সংস্কারের মূঢ়তা চাপিয়া নাই সেইজন্য সে যাহা দেখে তাহাই গ্রহণ করিতে পারে।

রসিকের এই কারুনৈপুণ্যের জন্য তাহার কাছে ছেলেমেয়েরা, এমন কি, তাহাদের অভিভাবকেরা পর্য্যন্ত উমেদারি করিত। কিন্তু তাহার দোষ ছিল কি, কোনো একটা কিছুতে সে বেশি দিন মন দিতে পারিত না। একটা কোনো বিদ্যা আয়ত্ত করিলেই আর সেটা তাহার ভাল লাগিত না—তখন তাহাকে সে বিষয়ে সাধ্য সাধনা করিতে গেলে সে বিরক্ত হইয়া উঠিত। বাবুদের বাড়িতে দেয়ালির উৎসবে কলিকাতা হইতে আতসবাজিওয়ালা আসিয়াছিল—তাহাদের কাছ হইতে সে বারি তৈরি শিখিয়া কেবল দুটোবৎসর পাড়ার কালীপূজার উৎসবকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিয়াছিল; তৃতীয় বৎসরে কিছুতেই আর তুবড়ির ফোয়ারা ছুটিল না—রসিক তখন, চাপকানবোতামপরা মেডেল-কোলানো এক সখা যাত্রাওয়ালার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া বাম হার্ম্মোনিয়ম লইয়া লক্ষ্ণৌ ঠুংরি সাধিতে-ছিল।

তাহার ক্ষমতার এই খামখেয়ালী লীলায় কখনো সুলভ কখনো দুর্লভ হইয়া সে লোককে আরো বেশি মুগ্ধ করিত, তাহার নিজের দাদার ত কথাই নাই। দাদা কেবলি ভাবিত, এমন আশ্চর্য্য ছেলে আমাদের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এখন কোনোমতে বাঁচিয়া থাকিলে হয়—এই ভাবিয়া নিতান্ত অকারণেই তাহার চোখে জল আসিত এবং মনে মনে রাধানাথের কাছে ইহাই প্রার্থনা করিত যে আমি যেন উহার আগে মরিতে পারি।

এমনতর ক্ষণভাঙ্গুর ভাইয়ের নিত্য-নূতন পথ মিটাইতে গেলে ভাবীবধূ কেবলি সুদূরতর ভবিষ্যতে অন্তর্ধান করিতে থাকে অথচ বয়স চলিয়া যায় অতীতের দিকেই। বংশীর বয়স যখন ত্রিশ পার হইল, টাকা যখন একশতও পূরিল না এবং সেই মেয়েটি অক্ষয় শ্বশুরঘর করিতে গেল তখন বংশী মনে মনে কহিল, আমার আর বড় আশা দেখি না, এখন বংশরক্ষার ভার রসিককেই লইতে হইবে।

পাড়ায় যদি শ্বশুরঘরপ্রথা চলিত থাকিত

তবে রসিকের বিবাহের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইত না। বিধু, তারা, নবী, শশী, সুধা—এমন কত নাম করিব—সবাই রসিককে ভালবাসিত। রসিক যখন কাদা লইয়া মাটির মূর্ত্তি গড়িবার মেজাজে থাকিত তখন তাহার তৈরি পুতুলের অধিকার লইয়া মেয়েদের মধ্যে বন্ধুবিচ্ছেদের উপক্রম হইত। ইহাদের মধ্যে একটি মেয়ে ছিল, সৌরভী, সে বড় শান্ত—সে চুপ করিয়া বসিয়া পুতুল-গড়া দেখিতে ভালবাসিত এবং প্রয়োজনমত রসিককে কাদাকাঠি প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া দিত। তাহার ভারি ইচ্ছা রসিক তাহাকে একটা কিছু ফরমাস করে। কাজ করিতে করিতে রসিক পান চাহিবে জানিয়া সৌরভী তাহা জোগাইয়া দিবার জন্য প্রতিদিন প্রস্তুত হইয়া আসিত। রসিক স্বহস্তের কীর্ত্তি-গুলি তাহার সাম্‌নে সাজাইয়া ধরিয়া যখন বলিত, সৈরী, তুই এর কোন্‌টা নিবি বল্—তখন সে ইচ্ছা করিলে যেটা খুসি লইতে পারিত কিন্তু সঙ্কোচে কোনোটাই লইত না; রসিক নিজের পছন্দমত জিনিষটি তাহাকে তুলিয়া দিত। পুতুল গড়ার পর্ব্ব শেষ হইলে যখন হার্ম্মোনিয়ম বাজাইবার দিন আসিল তখন পাড়ার ছেলে মেয়েরা সকলেই এই যন্ত্রটা টেপাটুপি করিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িত—রসিক তাহাদের সকলকেই হুঙ্কার দিয়া খেদাইয়া রাখিত; সৌরভী কোনো উৎপাত করিত না—সে তাহার ডুরে শাড়ি পরিয়া বড় বড় চোখ মেলিয়া বামহাতের উপর শরীরটার ভর দিয়া হেলিয়া বসিয়া চুপ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিত। রসিক ডাকিত, আয় সৈরি, একবার টিপিয়া দেখ্। সে মৃদু মৃদু হাসিত, অগ্রসর হইতে চাহিত না। রসিক অনুমতিসত্ত্বেও নিজের হাতে তাহার আঙুল ধরিয়া তাহাকে দিয়া বাজাইয়া লইত।

সৌরভীর দাদা গোপালও রসিকের ভক্ত-বৃন্দের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ছিল। সৌরভীর সঙ্গে তাহার প্রভেদ এই যে, ভাল জিনিষ লইবার জন্য তাহাকে কোনদিন সাধিতে হইত না। সে আপনি ফরমাস করিত এবং না পাইলে অস্থির করিয়া তুলিত। নূতন-গোছের যাহা কিছু দেখিত তাহাই সে সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত। রসিক কাহারো আবদার বড় সহিতে পারিত না, তবু গোপাল যেন অন্য ছেলেদের চেয়ে রসিকের কাছে কিছু বেশি প্রশ্রয় পাইত।

বংশী মনে মনে ঠিক করিল এই সৌরভীর সঙ্গেই রসিকের বিবাহ দিতে হইবে। কিন্তু সৌরভীর ঘর তাহাদের চেয়ে বড়—পাঁচশো টাকার কমে কাজ হইবার আশা নাই।

(২)

এতদিন বংশী কখনো রসিককে তাহার তাঁতবোনায় সাহায্য করিতে অনুরোধ করে নাই। খাটুনি সমস্তই সে নিজের ঘাড়ে লইয়াছিল। রসিক নানাপ্রকার বাজে কাজ লইয়া লোকের মনোরঞ্জন করিত ইহা তাহার দেখিতে ভালই লাগিত। রসিক ভাবিত, দাদা কেমন করিয়া যে রোজই এই এক তাঁতের কাজ লইয়া পড়িয়া থাকে কে জানে! আমি হইলে ত মরিয়া গেলেও পারি না। তাহার দাদা নিজের সম্বন্ধে নিতান্তই টানাটানি করিয়া চালাইত ইহাতে সে দাদাকে কৃপণ বলিয়া জানিত।

তাহার দাদার সম্বন্ধে রসিকের মনে যথেষ্ট একটা লজ্জা ছিল। শিশুকাল হইতেই সে নিজেকে তাহার দাদা হইতে সকল বিষয়ে ভিন্ন শ্রেণীর লোক বলিয়াই জানিত। তাহার দাদাই তাহার এই ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে।

এমন সময় বংশী নিজের বিবাহের আশা বিসর্জ্জন দিয়া রসিকেরই বধূ আনিবার জন্য যখন উৎসুক হইল তখন বংশীর মন আর ধৈর্য্য মানিতে চাহিল না। প্রত্যেক মাসের বিলম্ব তাহার কাছে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। বাজনা বাজিতেছে, আলো জ্বালা হইয়াছে, বরসজ্জা করিয়া রসিকের বিবাহ হইতেছে, এই আনন্দের ছবি বংশীর মনে তৃষ্ণার্ত্তের সম্মুখে মৃগতৃষ্ণিকার মত কেবলি জাগিয়া আছে।

তবু যথেষ্ট দ্রুতবেগে টাকা জমিতে চায় না। যত বেশি চেষ্টা করে ততই যেন সফলতাকে আরো বেশি দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। বিশেষত মনের ইচ্ছার সঙ্গে শরীরটা সমান বেগে চলিতে চায় না। বারবার ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। পরিশ্রমের মাত্রা দেহের শক্তিকে ছাড়াইয়া যাইবার জো করিয়াছে।

যখন সমস্ত গ্রাম নিষুপ্ত, কেবল নিশা-নিশাচরীর চৌকিদারের মত প্রহরে প্রহরে শৃগালের দল হাঁক দিয়া যাইতেছে তখনো মিট্‌মিটে প্রদীপে বংশী কাজ করিতেছে এমন কত রাত ঘটিয়াছে। বাড়িতে তাহার এমন কেহই ছিল না যে তাহাকে নিষেধ করে। এদিকে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর আহার হইতেও বংশী নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে। গায়ের শীতবস্ত্রখানা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নানা ছিদ্রের খিড়কির পথ দিয়া গোপনে শীতকে ডাকিয়া-ডাকিয়াই আনে। গত দুই বৎসর হইতে প্রত্যেক শীতের সময়ই বংশী মনে করে এইবারটা একরকম করিয়া চালাইয়া দিই, আর একটু হাতে টাকা জমুক, আস্‌চে বছরে যখন কাবুলিওয়ালা তাহার শীতবস্ত্রের বোঝা লইয়া গ্রামে আসিবে তখন একটা কাপড় ধারে কিনিয়া তাহার পরের বৎসরে শোধ করিব, ততদিনে তহবিল ভরিয়া উঠিবে। সুবিধামত বৎসর আসিল না। ইতিমধ্যে তাহার শরীর টেঁকে না এমন হইয়া আসিল।

একদিন পরে বংশী তাহার ভাইকে বলিল তাঁতের কাজ আমি একলা চালাইয়া উঠিতে পারি না তুমি আমার কাজে যোগ দাও। রসিক কোনো জবাব না করিয়া মুখ বাঁকাইল। শরীরের অসুখে বংশীর মেজাজ খারাপ ছিল, সে রসিককে ভর্ৎসনা করিল, কহিল, বাপপিতামহের ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া তুমি যদি দিনরাত হো হো করিয়া বেড়াইবে তবে তোমার দশা হইবে কি?

কথাটা অসঙ্গত নহে এবং ইহাকে কটূক্তিও বলা যায় না। কিন্তু রসিকের মনে হইল এত বড় অন্যায় তাহার জীবনে সে কোনোদিন সহ্য করে নাই। সেদিন বাড়িতে সে বড় একটা কিছু খাইল না, ছিপ হাতে করিয়া চন্দনীবহে মাছ ধরিতে বসিল। শীতের মধ্যাহ্ন নিস্তব্ধ, ডাঙা উঁচু পাড়ির উপর খালিক মাচিতেছে, পশ্চাতের আমবাগানে ঘুঘু ডাকিতেছে এবং জলের কিনারায় শৈবালের উপর একটি

পতঙ্গ তাহার স্বচ্ছ দীর্ঘ দুই পাখা মেলিয়া দিয়া স্থিরভাবে রৌদ্র পোহাইতেছে। কথা ছিল রসিক আজ গোপালকে লাঠি-খেলা শিখাইবে—গোপাল তাহার আর কোনো সম্ভাবনা না দেখিয়া রসিকের ভাঁড়ের মধ্যেকার মাছ ধরিবার কেঁচোগুলাকে লইয়া অস্থিরভাবে ধাঁটাধাঁটি করিতে লাগিল—রসিক তাহার গালে ঠাস করিয়া এক চড় বসাইয়া দিল। কখন্ তাহার কাছে রসিক পান চাহিবে বলিয়া সৌরভী কখন ঘাটের পাশে ঘাসের উপর দুই পা মেলিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল তখন রসিক হঠাৎ তাহাকে বলিল—"দৈরী, বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু খাবার আনিয়া দিতে পারিস্?" সৌরভী খুসি হইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া বাড়ি হইতে আঁচল ভরিয়া মুড়িমুড়কি আনিয়া উপস্থিত করিল। রসিক সেদিন তাহার দাদার কাছেও ঘেঁষিল না।

বংশীর শরীর মন খারাপ ছিল, রাত্রে সে তাহার বাপকে স্বপ্নে দেখিল। স্বপ্ন হইতে উঠিয়া তাহার মন আরও বিকল হইয়া উঠিল। তাহার নিশ্চয় মনে হইল বংশলোপের আশঙ্কায় তাহার বাপের পরলোকেও ঘুম হইতেছে না।

পরদিন বংশী কিছু জোর করিয়াই রসিককে কাজে বসাইয়া দিল। কেননা ইহা ত ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা নহে, এ যে বংশের প্রতি কর্ত্তব্য। রসিক কাজে বসিল বটে কিন্তু তাহাতে কাজের সুবিধা হইল না; তাহার হাত আর চলেই না, পদে পদে সুতা ছিঁড়িয়া যায়, সুতা সারিয়া তুলিতে তাহার বেলা কাটিতে থাকে। বংশী মনে করিল তালরূপ অভ্যাস নাই বলিয়াই এমনটা ঘটিতেছে, কিছুদিন গেলেই হাত দুরস্ত হইয়া যাইবে।

কিন্তু স্বভাবপটু রসিকের হাতদুরস্ত হইবার দরকার ছিলনা বলিয়াই তাহার হাত দুরস্ত হইতে চাহিল না। বিশেষত তাহার অনুগত-বর্গ তাহার সন্ধানে আসিয়া যখন দেখিত সে নিতান্ত ভাল মানুষটির মত তাহাদের বাপ পিতামহের চিরকালীন ব্যবসায়ে লাগিয়া গেছে তখন রসিকের মনে ভারি লজ্জা এবং ত্রাস হইতে লাগিল।

দাদা তাহাকে তাহার এক বন্ধুর মুখ দিয়া খবর দিল যে, সৌরভীর সঙ্গেই রসিকের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা যাইতেছে। বংশী মনে করিয়াছিল এই সুখবরটায় নিশ্চয়ই রসিকের মন নরম হইবে। কিন্তু সেরূপ ফলত দেখা গেল না। "দাদা মনে করিয়াছেন্ সৌরভীর সঙ্গে বিবাহ হইলেই আমার মোক্ষলাভ হইবে!" সৌরভীর প্রতি হঠাৎ তাহার ব্যবহারের এমনি পরিবর্ত্তন হইল যে সে বেচারা আঁচলের প্রান্তে পান বাঁধিয়া তাহার কাছে আসিতে আর সাহসই করিত না—সমস্ত রকমসকম দেখিয়া কি জানি এই ছোট শান্ত মেয়েটির ভারি কান্না পাইতে লাগিল। হার্ম্মোনিয়ম বাজনা সম্বন্ধে অন্য মেয়েদের চেয়ে তাহার যে একটু বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছিল, সে ত ঘুচিয়াই গেল—তার পর সর্ব্বদাই রসিকের যে ফাইফরমাস খাটিবার ভার তাহার উপর ছিল সেটাও রহিল না। হঠাৎ জীবনটা ফাঁকা এবং সংসারটা নিতান্তই ফাঁকি বলিয়া তাহার কাছে মনে হইতে লাগিল।

এতদিন রসিক এই গ্রামের বনবাদাড়, রথতলা, রাধানাথের মন্দির, নদী, খেয়াঘাট, বিল, দীঘি, কামারেপাড়া, ছুতারপাড়া, হাট, বাজার সমস্তই আপনার আনন্দে ও প্রয়োজনে বিচিত্রভাবে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। সব জায়গাতেই তাহার একটা একটা আড্ডা ছিল, যেদিন যেখানে খুশি কখনো বা একলা কখনো বা দলবলে কিছু না কিছু লইয়া থাকিত। এই গ্রাম এবং খানাগড়ের বাবুদের বাড়ি ছাড়া জগতের আর যে কোনো অংশ তাহার জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় তাহা সে কোনোদিন মনেও করে নাই। আজ এই গ্রামে তাহার মন আর কুলাইল না। দূর দূর বহুদূরের জন্য তাহার চিত্ত ছটফট করিতে লাগিল। তাহার অবসর যথেষ্ট ছিল,—বংশী তাহাকে খুব বেশীক্ষণ কাজ করাইত না। কিন্তু ঐ একটুক্ষণ কাজ করিয়াই তাহার সমস্ত অবসর পর্য্যন্ত যেন বিস্বাদ হইয়া গেল;—এরূপ খণ্ডিত অবসরকে কোনো ব্যবহারে লাগাইতে তাহার ভাল লাগিল না।

(৩)

এই সময়ে খানাগড়ের বাবুদের এক ছেলে এক বাইসিকল্ কিনিয়া আনিয়া চড়া অভ্যাস করিতেছিল। রসিক সেটাকে লইয়া অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন আয়ত্ত করিয়া লইল যেন সে তাহার নিজেরই পায়ের তলাকার একটা ডানা। কি চমৎকার, কি স্বাধীনতা, কি আনন্দ! দুরন্তের সমস্ত বাধাকে এই বাহনটা যেন তীক্ষ্ণ সুদর্শন চক্রের মত অতি অনায়াসেই কাটিয়া দিয়া চলিয়া যায়। ঝড়ের বাতাস যেন চাকার আকার ধারণ করিয়া উন্মত্তের মত মানুষকে পিঠে করিয়া লইয়া ছোটে। রামায়ণ মহাভারতের সময় মানুষে কখনো কখনো দেবতার অস্ত্র লইয়া যেমন ব্যবহার করিতে পাইত—এ যেন সেই রকম।

রসিকের মনে হইল এই বাইসিকল্ নহিলে তাহার জীবন বৃথা। দাম এমনই কি বেশি? একশো পঁচিশ টাকা মাত্র! এই একশো পঁচিশ টাকা দিয়া মানুষ একটা নূতন শক্তি লাভ করিতে পারে—ইহা ত সস্তা! বিষ্ণুর গরুড়বাহন এবং সূর্য্যের অরুণসারথি ত সৃষ্টিকর্ত্তাকে কম ভোগ ভোগায় নাই আর ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবার জন্য সমুদ্রমন্থন করিতে হইয়াছিল—কিন্তু এই বাইসিকল্‌টি তাহার পৃথিবীজয়ী গতিবেগ শুদ্ধ করিয়া কেবল একশো পঁচিশ টাকার জন্যে দোকানের এক কোণে দেয়াল চেস্ দিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

দাদার কাছে রসিক আর কিছু চাহিবে না পণ করিয়াছিল কিন্তু সে পণ রক্ষা হইল না। তবে, চাওয়াটার কিছু বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। কহিল—আমাকে একশো পঁচিশ টাকা ধার দিতে হইবে।

বংশীর কাছে রসিক কিছুদিন হইতে কোনো আবদার করে নাই ইহাতে শরীরের অসুখের উপর আর একটা গভীরতর বেদনা বংশীকে দিনরাত্রি পীড়া দিতেছিল। তাই রসিক তাহার কাছে দরবার উপস্থিত করিবা-মাত্রই মুহূর্ত্তের জন্য বংশীর মন নাচিয়া উঠিল; মনে হইল, দূর হোক গে ছাই, এমন করিয়া আর টানাটানি করা যায় না—দিয়া ফেলি। কিন্তু বংশ! সে যে একেবারেই

ডোবে। একশো পঁচিশ টাকা দিলে আর বাকী থাকে কি! ধার! রসিক একশো পঁচিশ টাকা ধার শুধিবে! তাই যদি সম্ভব হইত তবে ত বংশী নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিত।

বংশী মনটাকে একেবারে পাথরের মত শক্ত করিয়া বলিল, সে কি হয়, একশো পঁচিশ টাকা আমি কোথায় পাইব! রসিক বন্ধুদের কাছে বলিল, এ টাকা যদি না পাই তবে আমি বিবাহ করিবই না। বংশীর কানে যখন সে কথা গেল তখন সে বলিল, এও ত মন্দ নয়। পাত্রীকে টাকা দিতে হইবে আবার পাত্রকে না দিলেও চলিবে না! এমন ধার ত আমাদের সাত পুরুষের মধ্যে কখনো ঘটে নাই।

রসিক সুস্পষ্ট বিদ্রোহ করিয়া তাঁতের কাজ হইতে অবসর লইল। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমার অসুখ করিয়াছে। তাঁতের কাজ না করা ছাড়া তাহার আহারে বিহারে অসুখের অন্য কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। বংশী মনে মনে একটু অভিমান করিয়া বলিল, থাক্, উহাকে আমি আর কখনো কাজ করিতে বলিব না—বলিয়া রাগ করিয়া নিজেকে আরো বেশি কষ্ট দিতে লাগিল। বিশেষত সেই বছরেই বস্ত্রকষ্টের কল্যাণে হঠাৎ তাঁতের কাপড়ের দর এবং আদর অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তাঁতীদের মধ্যে যাহারা অন্য কাজে ছিল তাহারাও প্রায় সকলে তাঁতে ফিরিল। নিয়তচঞ্চল মাকুগুলা ইঁদুর বাহনের মত সিদ্ধিদাতা গণনায়ককে বাংলাদেশের তাঁতীর ঘরে দিনরাত কাঁধে করিয়া দৌড়াইতে লাগিল। এখন এক মুহূর্ত্ত তাঁত কামাই পড়িলে বংশীর মন অস্থির হইয়া উঠে;—এই সময়ে রসিক যদি তাহাকে সাহায্য করে তবে দুই বৎসরের কাজ ছয় মাসে আদায় হইতে পারে কিন্তু সে আর ঘটিল না। কাজেই তাঁত শরীর লইয়া বংশী একেবারে সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে লাগিল।

রসিক প্রায় বাড়ির বাহিরে বাহিরেই কাটায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন যখন সন্ধ্যার সময় বংশীর হাত আর চলে না, পিঠের দাঁড়া যেন কাটিয়া পড়িতেছে, কেবলি কাজের গোলমাল হইয়া যাইতেছে এবং তাহা সারিয়া লইতে বৃথা সময় কাটিতেছে এমন সময় শুনিতে পাইল সেই কিছুকালের উপেক্ষিত হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রে আবার লক্ষ্ণৌ ঠুংরি বাজিতেছে। এমন দিন ছিল যখন কাজ করিতে করিতে রসিকের এই হার্ম্মোনিয়ম বাজনা শুনিলে গর্ব্বে ও আনন্দে বংশীর মন পুলকিত হইয়া উঠিত আজ একেবারেই সেরূপ হইল না। সে তাঁত ফেলিয়া ঘরের আঙিনার কাছে আসিয়া দেখিল একজন কোথাকার অপরিচিত লোককে রসিক বাজনা শুনাইতেছে। ইহাতে তাহার অন্তপ্ত ক্লান্তদেহ আরো জ্বলিয়া উঠিল। মুখে তাহার যাহা আসিল তাহাই বলিল। রসিক উদ্ধত হইয়া জবাব করিল—তোমার অন্নে যদি আমি ভাগ বসাই তবে আমি ইত্যাদি ইত্যাদি। বংশী কহিল, আর মিথ্যা বড়াই করিয়া কাজ নাই তোমার সামর্থ্য যতদূর চের দেখিয়াছি। শুধু বাবুদের নকলে বাজনা বাজাইয়া নবাবী করিলেই ত হয় না! বলিয়া সে চলিয়া গেল—আর তাঁতে বসিতে পারিল না; ঘরে মাদুরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

রসিক যে হার্মোনিয়ম বাজাইয়া চিত্ত-বিনোদন করিবার জন্য সঙ্গী জুটাইয়া আনিয়াছিল তাহা নহে। খানাগড়ে যে সার্কাসের দল আসিয়াছিল রসিক সেই দলে চাকরির উমেদারি করিতে গিয়াছিল। সেই দলেরই একজনের কাছে নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিবার জন্য তাহাকে, যতগুলি গৎ জানে একে একে শুনাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল—এমন সময় সঙ্গীতের মাঝখানে নিতান্ত অন্যরকম সুর আসিয়া পৌঁছিল।

আজ পর্য্যন্ত বংশীর মুখ দিয়া এমন কঠিন কথা কখনো বাহির হয় নাই। নিজের বাক্যে সে নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহার মনে হইল যেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া আর একজন কে এই নিষ্ঠুর কথাগুলো বলিয়া গেল। এমনতর মর্ম্মান্তিক ভৎর্সনার পরে বংশীর পক্ষে আর তাহার সেই সঞ্চয়ের টাকা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। যে টাকার জন্য হঠাৎ এমন অভাবনীয় কাণ্ডটা ঘটিতে পারিল সেই টাকার উপর বংশীর ভারি একটা রাগ চলিল—তাহাতে আর তাহার কোনো সুখ রহিল না। রসিক যে তাহার কত আদরের সামগ্রী এই কথা কেবলি তাহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। যখন সে দাদা বলিয়া পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে পারিত না, যখন তাহার দুরন্ত হস্ত হইতে তাহার সুতাগুলোকে রক্ষা করা এক বিষম ব্যাপার ছিল, যখন তাহার দাদা হাত বাড়াইবামাত্র সে জন্তু সকলের কোল হইতেই ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সবেগে তাহার বুকের উপর আসিয়া পড়িত, এবং তাহার ঝাঁকড়া চুল ধরিয়া টানাটানি করিত, তাহার নাক ধরিয়া দন্তহীন মুখের মধ্যে পুরিবার চেষ্টা করিত সে সমস্তই সুস্পষ্ট মনে পড়িয়া বংশীর প্রাণের ভিতরটাতে হাহা করিতে লাগিল। সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। রসিকের নাম ধরিয়া বারকয়েক করুণকণ্ঠে ডাকিল। সাড়া না পাইয়া তাহার ঘর লইয়াই সে উঠিল। গিয়া দেখিল, সেই হার্মোনিয়মটা পাশে পড়িয়া আছে, অন্ধকারে দাওয়ায় রসিক চুপ করিয়া একলা বসিয়া। তখন বংশী কোমর হইতে সাপের মত সরু লম্বা এক থলি খুলিয়া ফেলিল রুদ্ধপ্রায়কণ্ঠে কহিল, এই নে ভাই—আমার এ টাকা সমস্ত তোরই জন্য। তোরই বৌ ঘরে আনিব বলিয়া আমি এ জমাইতেছিলাম। কিন্তু তোকে কাঁদাইয়া আমি জমাইতে পারিব না ভাই আমার,গোপাল আমার,—আমার সে শক্তি নাই—দুই চাকার গাড়ি কিনিস তোর যা খুসি তাই করিস্। রসিক দাঁড়াইয়া উঠিয়া শপথ করিয়া কঠোরস্বরে কহিল, চাকার গাড়ি কিনিতে হয়, বৌ আনিতে হয় আমার নিজের টাকায় করিব, তোমার ও টাকা আমি ছুঁইব না। বলিয়া বংশীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। উত্তরের মধ্যে আর এই টাকার কথা বলার পথ রহিল না—কোনো কথা বলাই অসম্ভব হইয়া উঠিল।

(৪)

রসিকের ভক্ত শ্রেষ্ঠ গোপাল আজকাল অভিমান করিয়া ঘুরে ঘুরে থাকে। রসিকের সাম্‌নে দিয়া তাহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া একাই বাহু ধরিতে যায় আগেকার মত তাহাকে ডাকাডাকি করে না. আর সৌরভীর ত কথাই নাই। রসিকদাদার সঙ্গে তাহার আড়ি, একেবারে জন্মের মত আড়ি—অথচ সে যে এত বড় একটা ভয়ঙ্কর আড়ি করিয়াছে

সেটা রসিককে স্পষ্ট করিয়া জানাইবার সুযোগ না পাইয়া আপন মনে ঘরের কোণে অভিমানে ক্ষণে ক্ষণে কেবলি তাহার দুই চোখ ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন রসিক মধ্যাহ্নে গোপালদের বাড়িতে গিয়া তাহাকে ডাক দিল। আদর করিয়া তাহার কান মলিয়া দিল, তাহাকে কাতুকুতু দিতে লাগিল। গোপাল প্রথমটা প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিয়া লড়াইয়ের ভাব দেখাইল কিন্তু বেশিক্ষণ সেটা রাখিতে পারিল না; দুইজনে বেশ হাস্যালাপ জমিয়া উঠিল। রসিক কহিল, "গোপাল, আমার হার্মোনিয়মটি নিবি!"

হার্মোনিয়ম! এত বড় দান! কলির সংসারে এও কি কখনো সম্ভব! কিন্তু যে জিনিষটা তাহার ভাল লাগে বাধা না পাইলে সেটা অসঙ্কোচে গ্রহণ করিবার শক্তি গোপালের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল অতএব হার্মোনিয়মটি সে অবিলম্বে অধিকার করিয়া লইল, বলিয়া রাখিল ফিরিয়া চাহিলে আর কিছু পাইবে না।

গোপালকে যখন রসিক ডাক দিয়াছিল তখন নিশ্চয় জানিয়াছিল সে ডাক অন্তত আরো একজনের কানে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু বাহিরে আজ তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। তখন রসিক গোপালকে বলিল—সৈরি কোথায় আছে একবার ডাকিয়া আন ত।

গোপাল ফিরিয়া আসিয়া কহিল, সৈরি বলিল তাহাকে এখন বড়ি শুকাইতে দিতে হইবে তাহার সময় নাই।—রসিক মনে মনে হাসিয়া কহিল, চল্ দেখি সে কোথায় বড়ি শুকাইতেছে। রসিক বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল কোথাও বড়ির নাম গন্ধ নাই। সৌরভী তাহাদের পায়ের শব্দ পাইয়া আর কোথাও লুকাইবার উপায় না দেখিয়া তাহাদের দিকে পিঠ করিয়া বাটির প্রাচীরের কোণ ঠেসিয়া দাঁড়াইল। রসিক তাহার কাছে গিয়া তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, রাগ করেছিস্ সৈরি?—সে আঁকিয়া বাঁকিয়া রসিকের চেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দেয়ালের দিকেই মুখ করিয়া রহিল।

একদা রসিক আপন খেয়ালে নানা রঙের সুতা মিলাইয়া নানা চিত্র বিচিত্র করিয়া একটা কাঁথা সেলাই করিতেছিল। মেয়েরা যে কাঁথা সেলাই করিত তাহার কতকগুলা বাঁধা নক্সা ছিল—কিন্তু রসিকের সমস্তই নিজের মনের রচনা। যখন এই সেলাইয়ের ব্যাপার চলিতেছিল তখন সৌরভী আশ্চর্য্য হইয়া একমনে তাহা দেখিত—সে মনে করিত জগতে কোথাও এমন আশ্চর্য্য কাঁথা আজ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই। প্রায় যখন কাঁথা শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে রসিকের বিরক্তি বোধ হইল, সে আর শেষ করিল না। ইহাতে সৌরভী মনে ভারি পীড়া বোধ করিয়াছিল—এইটে শেষ করিয়া ফেলিবার জন্য সে রসিককে কতবার যে কত সাধ্যসাধনা অনুরোধ করিয়াছে তাহার ঠিক নাই। আর ঘণ্টা দুই তিন বসিলেই শেষ হইয়া যায় কিন্তু রসিকের যাহাতে গা লাগে না তাহাতে তাহাকে প্রবৃত্ত করাইতে কে পারে। হঠাৎ এতদিন পরে রসিক কাল রাত্রি জাগিয়া সেই কাঁথাটি শেষ করিয়াছে।

রসিক বলিল, সৌরি, সেই কাঁথাটা শেষ করিয়াছি একবার দেখবি না?

অনেক কষ্টে সৌরভীর মুখ ফিরাইতেই সে আঁচল দিয়া মুখ ঝাঁপিয়া ফেলিল। তখন যে তাহার দুই কপোল বাহিয়া জল পড়িতেছিল, সে জল সে দেখাইবে কেমন করিয়া?

সৌরভীর সঙ্গে তাহার পূর্ব্বের সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে রসিকের যথেষ্ট সময় লাগিল। অবশেষে উভয়পক্ষে সন্ধি যখন এতদূর অগ্রসর হইল যে সৌরভী রসিককে পান আনিয়া দিল তখন রসিক সেই কাঁথার আবরণ খুলিয়া সেটা আঙিনার উপর মেলিয়া দিল—সৌরভীর মুখটি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। অবশেষে যখন রসিক বলিল, সৌরি, এ কাঁথা তোর জন্যেই তৈরি করিয়াছি, এটা আমি তোকেই দিলাম—তখন এত বড় অভাবনীয় দান কোনোমতেই সৌরভী স্বীকার করিয়া লইতে পারিল না। পৃথিবীতে সৌরভী কোনো দুর্লভ জিনিষ দাবী করিতে শেখে নাই। গোপাল তাহাকে খুব ধমক দিল। মানুষের মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে তাহার কোনো বোধ ছিল না;—সে মনে করিল, লোভনীয় জিনিষ লইতে লজ্জা একটা নিরবচ্ছিন্ন কপটতামাত্র। গোপাল ব্যর্থ-কালব্যয় নিবারণের জন্য নিজেই কাঁথাটা ভাঁজ করিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া আসিল। বিচ্ছেদ মিটমাট হইয়া গেল এখন হইতে আবার পূর্ব্বতন প্রণালীতে তাহাদের বন্ধুত্বের ইতিহাসের দৈনিক অনুবৃত্তি চলিতে থাকিবে দুটি বালকবালিকার মন এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সেদিন পাড়ায় তাহার দলের সকল ছেলে মেয়ের সঙ্গেই রসিক আগেকার মতই ভাব করিয়া লইল—কেবল তাহার দাদার ঘরে একবারও প্রবেশ করিল না। যে প্রৌঢ়া বিধবা তাহাদের বাড়িতে আসিয়া রাঁধিয়া দিয়া যায় সে আসিয়া যখন সকালে বংশীকে জিজ্ঞাসা করিল, আজ কি রান্না হইবে—বংশী তখন বিছানায় শুইয়া। সে বলিল আমার শরীর ভাল নাই, আজ আমি কিছু খাইবনা—রসিককে ডাকিয়া তুমি খাওয়াইয়া দিয়ো। —স্ত্রীলোকটি বলিল রসিক তাহাকে বলিয়াছে, সে আজ বাড়িতে খাইবে না—অন্যত্র বোধ করি তাহার নিমন্ত্রণ আছে।—শুনিয়া বংশী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গায়ের কাপড়টার মাথা পর্য্যন্ত মুড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

রসিক যেদিন সন্ধ্যার পর গ্রাম ছাড়িয়া সার্কাসের দলের সঙ্গে চলিয়া গেল সেদিন এমনি করিয়াই কাটিল। শীতের রাত্রি; আকাশে আধখানি চাঁদ উঠিয়াছে। সেদিন হাট ছিল। হাট সারিয়া সকলেই চলিয়া গিয়াছে—কেবল যাহাদের দূর পাড়ায় বাড়ি এখনো তাহারা মাঠের পথে কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছে। একখানি বোঝাইশূন্য গোরুর গাড়িতে গাড়োয়ান র‍্যাপার মুড়ি দিয়া নিদ্রামগ্ন, গরু দুটি আপন মনে ধীরে ধীরে বিশ্রামশালার দিকে গাড়ি টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। গ্রামের গোয়ালঘর হইতে খড়-জ্বালানো ধোঁয়া বায়ুহীন শীতরাত্রে হিমভারাক্রান্ত হইয়া স্তরে স্তরে বাঁশঝাড়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে।—রসিক যখন প্রান্তরের প্রান্তে গিয়া পৌঁছিল, যখন অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে তাহাদের গ্রামের ঘন গাছগুলির নীলিমাও আর দেখা যায় না তখন রসিকের মনটা

কেমন করিয়া উঠিল। তখনো ফিরিয়া আসার পথ কঠিন ছিল না কিন্তু তখনো তাহার হৃদয়ের কঠিনতা যায় নাই। উপার্জ্জন করি না অথচ দাদার অন্ন খাই, যেমন করিয়া হোক এ লাঞ্ছনা না ঘুচিয়া নিজের টাকায় কেনা বাইসিকলে না চড়িয়া আজন্মকালের এই গ্রামে আর ফিরিয়া আসা চলিবে না।—রহিল এখানকার চন্দনীবহের ঘাট; এখানকার সুখসাগর দীঘি; এখানকার ফাল্গুন মাসে শর্ষে ক্ষেতের গন্ধ, চৈত্র মাসে আমবাগানে মৌমাছির গুঞ্জনধ্বনি; রহিল এখানকার বন্ধুত্ব এখানকার আমোদ উৎসব,—এখন সম্মুখে অপরিচিত পৃথিবী, অনাত্মীয় সংসার, এবং ললাটে অদৃষ্টের লিখন।

(৫)

রসিক একমাত্র তাঁতের কাজেই যত অসুবিধা দেখিয়াছিল। তাহার মনে হইত আর সকল কাজই ইহার চেয়ে ভাল। সে মনে করিয়াছিল একবার তাহার সঙ্কীর্ণ ঘরের বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির হইতে পারিলেই তাহার কোনো ভাবনা নাই। তাই সে ভারি আনন্দে পথে বাহির হইয়াছিল। মাঝখানে যে কোনো বাধা, কোনো কষ্ট, কোনো দীর্ঘকালযাপ্য আছে তাহা তাহার মনেও হইল না। বাহিরে দাঁড়াইয়া দূরের পাহাড়কেও যেমন মনে হয় অনতিদূরে—যেমন মনে হয় আধঘণ্টার পথ পার হইলেই বুঝি তাহার শিখরে গিয়া পৌঁছিতে পারা যায়—তাহার গ্রামের বেষ্টন হইতে বাহির হইবার সময় নিজের ইচ্ছার দুর্লভ সার্থকতাকে রসিকের তেমনি সহজসাধ্য এবং অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইল। কোথায় যাইতেছে রসিক কাহাকেও তাহার কোনো খবর দিল না। একদিন স্বয়ং সে খবর বহন করিয়া আসিবে এই তাহার পণ রহিল।

কাজ করিতে গিয়া দেখিল, বেগারের কাজে আদর পাওয়া যায় এবং সেই আদর সে বরাবর পাইয়াছে কিন্তু যেখানে গরজের কাজ সেখানে দয়ামায়া নাই। বেগারের কাজে নিজের ইচ্ছা নামক পদার্থটাকে খুব করিয়া মৌড় করানো যায়, সেই ইচ্ছার জোরেই সে কাজে এমন অভাবনীয় নৈপুণ্য জাগিয়া উঠিয়া মনকে এত উৎসাহিত করিয়া তোলে; কিন্তু বেতনের কাজে এই ইচ্ছা একটা বাধা; এই কাজের তরণীতে অনিচ্ছিত ইচ্ছার হাওয়া লাগাইবার জন্য পালের কোনো বন্দোবস্ত নাই, দিনরাত কেবল মজুরের মত দাঁড় টানা এবং লগি ঠেলা। যখন দর্শকের মত দেখিয়াছিল তখন রসিক মনে করিয়াছিল সার্কাসে ভারি মজা। কিন্তু ভিতরে যখন প্রবেশ করিল মজা তখন সম্পূর্ণ বাহির হইয়া গিয়াছে। যাহা আমোদের জিনিষ যখন তাহা আমোদ দেয় না, যখন তাহার প্রতিদিনের পুনরাবৃত্তি বন্ধ হইলে প্রাণ বাঁচে অথচ তাহা কিছুতেই বন্ধ হইতে চায় না, তখন তাহার মত অরুচিকর জিনিষ আর কিছুই হইতে পারে না। এই সার্কাসের দলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রসিকের প্রত্যেক দিনই তাহার পক্ষে একান্ত বিস্বাদ হইয়া উঠিল। সে প্রায়ই বাড়ীর স্বপ্ন দেখে। রাত্রে ঘুম হইতে জাগিয়া অন্ধকারে প্রথমটা রসিক মনে করে সে তাহার দাদার বিছানার কাছে শুইয়া আছে, মুহূর্ত্তকাল পরেই চমক ভাঙিয়া দেখে দাদা কাছে নাই।

বাড়িতে থাকিতে একএকদিন শীতের রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে অনুভব করিত, দাদা তাহার শীত করিতেছে মনে করিয়া তাহার গাত্র-বস্ত্রের উপরে নিজের কাপড়খানা ধীরে ধীরে চাপাইয়া দিতেছে; এখানে পৌষের রাত্রে যখন ঘুমের ঘোরে তাহার শীতশীত করে তখন দাদা তাহার গায়ে ঢাকা দিতে আসিবে মনে করিয়া সে যেন অপেক্ষা করিতে থাকে,—দেরি হইতেছে দেখিয়া রাগ হয়। এমন সময় জাগিয়া উঠিয়া মনে পড়ে দাদা কাছে নাই এবং সেই সঙ্গে ইহাও মনে হয় যে এই শীতের সময় তাহার গায়ে আপন কাপড়টি টানিয়া দিতে না পারিয়া আজ রাত্রে শূন্যশয্যার প্রান্তে তাহার দাদার মনে শান্তি নাই। তখনই সেই অর্দ্ধরাত্রে সে মনে করে কাল সকালে উঠিয়াই আমি ঘরে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু ভাল করিয়া জাগিয়া উঠিয়া আবার সে শক্ত করিয়া প্রতিজ্ঞা করে, মনে মনে আপনাকে বারবার করিয়া জপাইতে থাকে যে, আমি পণের টাকা ভর্ত্তি করিয়া বাইসিকিলে চড়িয়া বাড়ি ফিরিব তবে আমি পুরুষ মানুষ, তবে আমার নাম রসিক।

একদিন দলের কর্ত্তা তাহাকে তাঁতী বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া গালি দিল। সেই দিন রসিক তাহার সামান্য কয়েকটি কাপড়, ঘটি ও থালা বাটি, নিজের যে কিছু ধন ছিল তাহার পরিবর্ত্তে ফেলিয়া রাখিয়া সম্পূর্ণ রিক্ত হস্তে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। সমস্ত দিন কিছু খাওয়া হয় নাই। সন্ধ্যার সময় যখন নদীর ধারে দেখিল গোরুগুলা আরামে চরিয়া খাইতেছে তখন একপ্রকার ঈর্ষার সহিত তাহার মনে হইতে লাগিল পৃথিবী যথার্থ এই পশুপক্ষীদের মা—নিজের হাতে তাহাদের মুখে আহারের গ্রাস তুলিয়া দেন—আর মানুষ বুঝি তাঁর কোন্ সতীনের ছেলে, তাই চারিদিকে এত বড় মাঠ ধূ ধূ করিতেছে কোথাও রসিকের জন্য এক মুষ্টি অন্ন নাই। নদীর কিনারায় গিয়া রসিক অঞ্জলি ভরিয়া খুব খানিকটা জল খাইল। এই নদীটির ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, কোনো ভাবনা নাই, কোনো চেষ্টা নাই, ঘর নাই তবু ঘরের অভাব নাই, সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি আসিতেছে তবু সে নিরুদ্বেগে নিরুদ্দেশের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে এই কথা ভাবিতে ভাবিতে রসিক একদৃষ্টে জলের স্রোতের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল—বোধ করি তাহার মনে হইতেছিল দুর্ব্বহ মানবজন্মটাকে এই বন্ধনহীন নিশ্চিন্ত জলধারার সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিতে পারিলেই একমাত্র শান্তি।

এমন সময় একজন তরুণ যুবক মাথা হইতে একটা বস্তা নামাইয়া তাহার পাশে বসিয়া কোঁচার প্রান্ত হইতে চিঁড়া খুলিয়া লইয়া ভিজাইয়া খাইবার উদ্যোগ করিল। এই লোকটিকে দেখিয়া রসিকের কিছু নূতন রকমের ঠেকিল। পায়ে জুতা নাই, ধুতির উপর একটা জামা, মাথায় পাগড়ি পরা—দেখিবামাত্র স্পষ্ট মনে হয় ভদ্রলোকের ছেলে—কিন্তু মুটে মজুরের মত কেন যে সে এমন করিয়া বস্তা বহিয়া বেড়াইতেছে ইহা সে বুঝিতে পারিল না। দুই জনের আলাপ হইতে দেরি হইল না এবং রসিক ভিজা চিঁড়ার যথোচিত পরিমাণে ভাগ লইল। এ ছেলেটি কলিকাতার কলেজের ছাত্র। ছাত্রেরা যে স্বদেশী কাপড়ের দোকান খুলিয়াছে তাহারই

জন্য দেশী কাপড় সংগ্রহ করিতে সে এই গ্রামের হাটে আসিয়াছে। নাম সুবোধ, জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাহার কোনো সঙ্কোচ নাই, বাধা নাই—সমস্ত দিন হাটে ঘুরিয়া সন্ধ্যাবেলায় চিড়া ভিজাইয়া খাইতেছে।

দেখিয়া নিজের সম্বন্ধে রসিকের ভারি একটা লজ্জা বোধ হইল। শুধু তাই নয়, তাহার মনে হইল যেন মুক্তি পাইলাম। এমন করিয়া খালি পায়ে মজুরের মত যে মাথায় মোট বহিতে পারা যায় ইহা উপলব্ধি করিয়া জীবনযাত্রার ক্ষেত্র এক মুহূর্তে তাহার সম্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল আজ ত আমার উপবাস করিবার কোনো দরকারই ছিল না—আমি ত ইচ্ছা করিলেই মোট বহিতে পারিতাম।

সুবোধ যখন মোট মাথায় লইতে গেল রসিক বাধা দিয়া বলিল, মোট আমি বহিব। সুবোধ তাহাতে নারাজ হইলে রসিক কহিল, আমি তাঁতীর ছেলে, আমি আপনার মোট বহিব, আমাকে কলিকাতায় লইয়া যান। "আমি তাঁতী" আগে হইলে রসিক একথা কখনই মুখে উচ্চারণ করিতে পারিত না—তাহার বাধা কাটিয়া গেছে।

সুবোধ ত লাফাইয়া উঠিল—বলিল, তুমি তাঁতী! আমি ত তাঁতী খুঁজিতেই বাহির হইয়াছি। আজকাল তাহাদের ঘর এত বাড়িয়াছে যে কেহই আমাদের তাঁতের স্কুলে শিক্ষকতা করিতে যাইতে রাজি হয় না।

রসিক তাঁতের স্কুলের শিক্ষক হইয়া কলিকাতায় আসিল। এতদিন পরে বাধা-খরচ বাদে সে সামান্য কিছু জমাইতে পারিল কিন্তু বাইসিকল্ চক্রের লক্ষ্য ভেদ করিতে এখনো অনেক বিলম্ব আছে। আর বধূর বরমাল্যের ত কথাই নাই। ইতিমধ্যে তাঁতের স্কুলটা গোড়ায় যেমন হঠাৎ জমিয়া উঠিয়াছিল তেমনি হঠাৎ নিবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কমিটির বাবুরা যতক্ষণ কমিটি করিতে থাকেন অতি চমৎকার হয় কিন্তু কাজ করিতে নামিলেই গণ্ডগোল বাধে; তাঁহারা নানা দিগ্‌দেশ হইতে নানাপ্রকারের তাঁত আনাইয়া শেষকালে এমন একটা অপরূপ জঞ্জাল বুনিয়া তুলিলেন যে, সমস্ত ব্যাপারটা লইয়া যে কোন্ আবর্জ্জনাস্তূপে ফেলা যাইতে পারে তাহা কমিটির পর কমিটি করিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না।

রসিকের আর সহ্য হয় না। ঘরে ফিরিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। চোখের সাম্‌নে সে কেবলি আপনার গ্রামের নানা ছবি দেখিতেছে। অতি ক্ষুদ্র খুঁটি-নাটিও উজ্জ্বল হইয়া তাহার মনের সামনে দেখা দিয়া যাইতেছে। পুরোহিতের আধ-পাগলা ছেলেটা; তাহাদের প্রতিবেশীর কপিল বর্ণের বাছুরটা; নদীর পথে যাইতে রাস্তার দক্ষিণ ধারে একটা তালগাছকে শিকড় দিয়া আঁটিয়া জড়াইয়া একটা অশথ গাছ দুই কুস্তিগির পালোয়ানের মত পাঁচ কষিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই তলায় একটা অনেকদিনের পরিত্যক্ত ভিটা; তাহাদের বিলের তিনদিকে আমন ধান, একপাশে গভীর জলের প্রান্তে মাছধরা জাল বাঁধিবার জন্য বাঁশের খোঁটা পোঁতা, তাহারি উপরে একটি মাছরাঙা চুপ করিয়া বসিয়া; কৈবর্ত্তপাড়া হইতে সন্ধ্যার পরে

মাঠ পার হইয়া কীর্ত্তনের শব্দ আসিতেছে; ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানাপ্রকার মিশ্রিত গন্ধে গ্রামের ছায়াময় পথে স্তব্ধ হাওয়া ভরিয়া রহিয়াছে; আর তারই সঙ্গে মিলিয়া তাহার সেই শুক্লবস্ত্রের দল, সেই চঞ্চল গোপাল, সেই আঁচলের পুঁটে পান বাঁধা বড় বড় স্নিগ্ধ চোখমেলা সৌরভী; এই সমস্ত স্মৃতি ছবিতে গন্ধে শব্দে স্নেহে প্রীতিতে বেদনায় তাহার মনকে প্রতিদিন গভীরতর আবিষ্ট করিয়া ধরিতে লাগিল। গ্রামে থাকিতে রসিকের যে নানাপ্রকার কারুনৈপুণ্য প্রকাশ পাইত এখানে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেছে, এখানে তাহার কোনো মূল্য নাই; এখানকার দোকান বাজারের কলের তৈরি জিনিষ হাতের চেটাকে লজ্জা দিয়া নিরস্ত করে। তাঁতের ইস্কুলের কাজে কাজের বিড়ম্বনা মাত্র, তাহাতে মন ভরে না। থিয়েটারের ধূপশিখা তাহার চিত্তকে পতঙ্গের মত মরণের পথে টানিয়াছিল—কেবল টাকা জমাইবার কঠোর নিষ্ঠা তাহাকে বাঁচোইয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র তাহার গ্রামটিতে যাইবার পথই তাহার কাছে একেবারে রুদ্ধ। এই জন্যই গ্রামে যাইবার টান প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাকে এমন করিয়া পীড়া দিতেছে। তাঁতের ইস্কুলে সে প্রথমটা ভারি ভরসা পাইয়াছিল, কিন্তু আজ যখন সে আশা আর টেঁকে না, যখন তাহার দুই মাসের বেতনই সে আদায় করিতে পারিল না তখন সে আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারে না এমন হইল। সমস্ত লজ্জা স্বীকার করিয়া মাথা হেঁট করিয়া, এই এক বৎসর প্রবাসবাসের বৃহৎ ব্যর্থতা বহিয়া তাহার আশ্রয়ে যাইবার জন্য তাহার মনের মধ্যে কেবলি তাগিদ আসিতে লাগিল।

যখন মনটা অত্যন্ত যাই-যাই করিতেছে এমন সময় তাহার বাসার কাছে খুব ধুম করিয়া একটা বিবাহ হইল। সন্ধ্যাবেলায় বাজনা বাজাইয়া বর আসিল। সেই দিন রাত্রে রসিক স্বপ্ন দেখিল, তাহার মাথায় টোপর, গায়ে লাল চেলি, কিন্তু সে গ্রামের বাঁশঝাড়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে। পাড়ার ছেলে মেয়েরা, চোর বর আসিয়াছে বলিয়া সৌরভীকে ক্ষ্যাপাইতেছে, সৌরভী বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছে—রসিক তাহাদিগকে শাসন করিতে ছুটিয়া আসিতে চায়, কিন্তু কেমন করিয়া কেবলি বাঁশের কঞ্চিতে তাহার কাপড় জড়াইয়া যায়, ডালে তাহার টোপর আটকায়, কোনোমতেই পথ করিয়া বাহির হইতে পারে না। জাগিয়া উঠিয়া রসিকের মনের মধ্যে ভারি লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। বধূ তাহার জন্য ঠিক করা আছে অথচ সেই বধূকে ঘরে আনিবার যোগ্যতা তাহার নাই এইটেই তাহার কাপুরুষতার সব চেয়ে চূড়ান্ত পরিচয় বলিয়া মনে হইল। না—এতবড় দীনতা স্বীকার করিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাওয়া কোনোমতেই হইতে পারে না।

(৬)

অনাবৃষ্টি যখন চলিতে থাকে তখন দিনের পর দিন কাটিয়া যায় মেঘের আর দেখা নাই, যদি বা মেঘ দেখা দেয় বৃষ্টি পড়ে না, যদি বা বৃষ্টি পড়ে তাহাতে মাটি ভেজে না;—কিন্তু বৃষ্টি যখন নামে তখন দিগন্তের এক কোণে যেমনি মেঘ দেখা দেয় অমনি দেখিতে

দেখিতে আকাশ ছাইয়া ফেলে এবং অবিরল বর্ষণে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতে থাকে। রসিকের ভাগ্যে হঠাৎ সেই রকমটা ঘটিল।

জানকী নন্দী মস্ত ধনী লোক। সে এক দিন কাহার কাছ হইতে কি একটা খবর পাইল; তাতের ইস্কুলের সামনে তাহার জুড়ি আসিয়া থামিল, তাতের ইস্কুলের মাষ্টারের সঙ্গে তাহার দুই চারটে কথা হইল এবং তাহার পরদিনেই রসিক আপনার মেসের বাসা পরিত্যাগ করিয়া নন্দী বাবুদের মস্ত তেতালা বাড়ির এক ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

নন্দীবাবুদের বিলাতের সঙ্গে কমিসন এজেন্সির মস্ত কারবার—সেই কারবারে কেন যে জানকী বাবু অযাচিতভাবে রসিককে একটা নিতান্ত সামান্য কাজে নিযুক্ত করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে বেতন দিতে লাগিলেন তাহা রসিক বুঝিতেই পারিল না। সে রকম কাজের জন্য লোক সন্ধান করিবারই দরকারই হয় না, এবং যদি বা লোক জোটে তাহার ত এত আদর নহে। বাজারে নিজের মূল্য কত এতদিনে রসিক তাহা বুঝিয়া লইয়াছে অতএব জানকী বাবু যখন তাহাকে ঘরে বসিয়া বসিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন তখন রসিক তাহার এত আদরের মূল কারণ সুদূর আকাশের গ্রহনক্ষত্র ছাড়া আর কোথাও খুঁজিয়া পাইল না।

কিন্তু তাহার গুরুগ্রহটি অত্যন্ত দূরে ছিল না। তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলা আবশ্যক।

একদিন জানকী বাবুর অবস্থা এমন ছিল না। তিনি যখন কষ্ট করিয়া কলেজে পড়িতেন তখন তাঁহার সতীর্থ হরমোহন বসু ছিলেন তাঁহার পরম বন্ধু। হরমোহন ব্রাহ্মসমাজের লোক। এই কমিসন এজেন্সি হরমোহনদেরই পৈতৃক ব্যাপার—তাঁহাদের একজন মুরুব্বি ইংরেজ সওদাগর তাঁহার পিতাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন তিনি তাঁহাকে এই কাজে জুড়িয়া দিয়াছিলেন। হরমোহন তাঁহার নিঃস্ব বন্ধু জানকীকে এই কাজে টানিয়া লইয়াছিলেন।

সেই দরিদ্র অবস্থায় নূতন যৌবনে সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে জানকীর উৎসাহ হরমোহনের চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। তাই তিনি পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে বড় বয়স পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহাদের তত্ত্ববায় সমাজে যখন তাঁহার ভগিনীর বিবাহ অসম্ভব হইয়া উঠিল তখন কায়েই হরমোহন নিজে তাঁহাকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া এই মেয়েটিকে বিবাহ করিলেন।

তাহার পরে অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। হরমোহনেরও মৃত্যু হইয়াছে তাঁহার ভগিনীও মারা গেছে। ব্যবসাটিও প্রায় সম্পূর্ণ জানকীর হাতে আসিয়াছে। ক্রমে বাসাবাড়ি হইতে তাঁহার তেতালা বাড়ি হইল, চির-কালের নিকেলের ঘড়িটিকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়া সোনার ঘড়ি সুযোধনীর মত তাঁহার বক্ষের পার্শ্বে টিক্‌টিক্ করিতে লাগিল।

এইরূপে তাঁহার তহবীল যতই স্ফীত হইয়া উঠিল—বন্ধ বয়সের আকস্মিক অবস্থার সমস্ত উৎসাহ ততই তাঁহার কাছে নিতান্ত ছেলে-

মানুষী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কোনো-মতে পারিবারিক পূর্ব্ব ইতিহাসের এই অধ্যায়টাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া সমাজে উঠিবার জন্ত তাঁহার লোভ চাপিয়া উঠিল। নিজের মেয়েটিকে সমাজে বিবাহ দিবেন এই তাঁহার মেদ। টাকার লোভ দেখাইয়া দুই একটি পাত্রকে রাজি করিয়াছিলেন কিন্তু যখনি তাহাদের আত্মী-য়েরা খবর পাইল তখনি তাহারা গোলমাল করিয়া বিবাহ ভাঙিয়া দিল। শিক্ষিত সৎপাত্র না হইলেও তাঁহার চলে—কন্যার চিরজীবনের সুখ বলিদান দিয়াও তিনি সমাজদেবতার প্রসাদলাভের জন্ত উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

এমন সময়ে তিনি তাঁতের ইস্কুলের মাষ্টারের খবর পাইলেন। সে খানাগড়ের বসাক বংশের ছেলে—তাহার পূর্ব্বপুরুষ অভিরাম বসাকের নাম সকলেই জানে—এখন তাহাদের অবস্থা হীন কিন্তু কুলে তাহারা তাঁহাদের চেয়ে বড়।

দূর হইতে দেখিয়া গৃহিণীর ছেলেটিকে পছন্দ হইল—স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ছেলেটির পড়াশুনা কি রকম?—জানকী বাবু বলিলেন, সে বালাই নাই। আজকাল যাহার পড়াশুনা বেশি তাহাকে হিসুয়ানিতে আঁটিয়া ওঠা শক্ত। গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন—টাকাকড়ি? জানকী বাবু বলিলেন, যথেষ্ট অভাব আছে। আমার পক্ষে সেইটেই লাভ।—গৃহিণী কহিলেন, আত্মীয় স্বজনদের ত ডাকিতে হইবে। জানকীবাবু কহিলেন, পূর্ব্বে অনেক-বার সে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; তাহাতে আত্মীয়স্বজনেরা দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিয়াছে কিন্তু বিবাহ হয় নাই। এবারে স্থির করিয়াছি আগে বিবাহ দিব, আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে মিষ্টালাপ পরে সময়মত করা যাইবে।

রসিক যখন দিনে রাত্রে তাহার গ্রামে ফিরিবার কথা চিন্তা করিতেছে—এবং হঠাৎ অভাবনীয়রূপে অতি সত্বর টাকা জমাইবার কি উপায় হইতে পারে তাহা ভাবিয়া কোনো কূল কিনারা পাইতেছে না, এমন সময় আহার ঔষধ দুইই তাহার মুখের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাঁ করিতে সে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিতে চাহিল না।

জানকী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার দাদাকে খবর দিতে চাও?

রসিক কহিল, না, তাহার কোনো দরকার নাই।—সমস্ত কাজে নিঃশেষে সারিয়া তাহার পরে সে দাদাকে চমৎকৃত করিয়া দিবে, অকর্ম্মণ্য রসিকের যে সামর্থ্য কি রকম তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণে কোনো ত্রুটি থাকিবে না।

শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। অন্যান্য সকল প্রকার দানসামগ্রীর আগে রসিক একটা বাইসিকল্ দাবী করিল।

(৭)

তখন মাঘের শেষ। শর্ষে এবং তিসির ফুলে ক্ষেত ভরিয়া আছে। আখের গুড় জাল দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই গন্ধে বাতাস যেন ঘন হইয়া উঠিয়াছে। ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান এবং কলাই, গোয়ালের প্রাঙ্গণে খড়ের গাদা স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। ওপারে নদীর চরে বাথানে রাখালেরা গোরুমহিষের দল লইয়া কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতেছে। খেয়াঘাটের কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে—নদীর জল

ফিরিয়া গিয়া লোকেরা কাপড় গুটাইয়া হাঁটিয়া পার হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

রসিক কলার-পরানো শার্টের উপর মালকোঁচা মারিয়া ঢাকাই ধুতি পরিয়াছে; শার্টের উপরে মোটা কালো বনাতের কোট, পায়ে রঙীন মুলমোজা ও চক্‌চকে কালো চামড়ার সৌখীন বিলাতীজুতা। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের পাকা রাস্তা বাহিয়া দ্রুতবেগে সে বাইসিক্‌ল্ চালাইয়া আসিল; গ্রামের কাঁচা রাস্তায় আসিয়া তাহাকে বেগ কমাইতে হইল। গ্রামের লোকে হঠাৎ তাহার বেশভূষা দেখিয়া তাহাকে চিনিতেই পারিল না। সেও কাহাকেও কোনো সম্ভাষণ করিল না; তাহার ইচ্ছা অন্যলোকে তাহাকে চিনিবার আগেই সর্ব্বাগ্রে সে তাহার দাদার সঙ্গে দেখা করিবে। বাড়ির কাছাকাছি যখন সে আসিয়াছে তখন ছেলেদের চোখ সে এড়াইতে পারিল না। তাহারা এক মুহূর্ত্তেই তাহাকে চিনিতে পারিল। সৌরভীদের বাড়ি কাছেই ছিল,—ছেলেরা সেইদিকে ছুটিয়া চেঁচাইতে লাগিল, "সৈরিদিদির বর এসেছে, সৈরিদিদির বর।" গোপাল বাড়িতেই ছিল, সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিবার পূর্ব্বেই বাইসিক্‌ল্ রসিকদের বাড়ির সাম্‌নে আসিয়া থামিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, ঘর অন্ধকার, বাহিরে তালা লাগানো। জনহীন পরিত্যক্ত বাড়ির যেন নীরব একটা কান্না উঠিতেছে—কেহ নাই—কেহ নাই! এক নিমেষেই রসিকের বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিয়া চোখের সাম্‌নে সমস্ত অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার পা কাঁপিতে লাগিল; বন্ধ দরজা ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার গলা শুকাইয়া গেল, কাহাকেও ডাক দিতে সাহস হইল না। দূরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির যে কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছিল, তাহা যেন কোন্ একটি গতজীবনের পরপ্রান্ত হইতে সুগভীর একটা বিষাদের বার্ত্তা বাহিয়া তাহার কানের কাছে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সাম্‌নে যাহা কিছু দেখিতেছে, এই মাটির প্রাচীর, এই চালাঘর, এই রুদ্ধ কপাট, এই শিশের গাছের বেড়া, এই হেলিয়া পড়া খেজুর গাছ—সমস্তই যেন একটা হারানো সংসারের ছবিমাত্র, কিছুই যেন সত্য নহে।

গোপাল আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। রসিক পাংশু মুখে গোপালের মুখের দিকে চাহিল, গোপাল কিছু না বলিয়া চোখ মীচু করিল। রসিক বলিয়া উঠিল—বুঝেছি, বুঝেছি—দাদা নাই! অমনি সেইখানেই দরজার কাছে সে বসিয়া পড়িল। গোপাল তাহার পাশে বসিয়া কহিল, ভাই রসিক দাদা, চল আমাদের বাড়ি চল। রসিক তাহার দুই হাত ছড়াইয়া দিয়া সেই দরজার সাম্‌নে উপুড় হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। দাদা! দাদা! দাদা! যে দাদা তাহার পায়ের শব্দটি পাইলে আপনিই ছুটিয়া আসিত কোথাও তাহার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

গোপালের বাপ আসিয়া অনেক বলিয়া-কহিয়া রসিককে বাড়িতে লইয়া আসিল। রসিক দেখানে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, রোয়াকের উপর দেয়ালে ঠেসান দেওয়া এক নূতন বাইসিক্‌ল্—তাহার ঢাকাগুলি ব্রাউন্ কাগজে মোড়া। দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার অর্থ বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না। একটা বুক-ফাটা কান্না বক্ষ ঠেলিয়া তাহার কণ্ঠের কাছে

পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে লাগিল এবং চোখের জলের সমস্ত রাস্তা যেন ঠাসিয়া বন্ধ করিয়া ধরিল।

রসিক চলিয়া গেলে বংশী দিনরাত্রি অবিশ্রাম খাটিয়া সৌরভীর পণ এবং এই বাইসিক্‌ল্ কিনিবার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল। তাহারি একমুহূর্ত্ত আর কোনো চিন্তা ছিল না। ক্লান্ত ঘোড়া যেমন প্রাণপণে ছুটিয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াই পড়িয়া মরিয়া যায় তেমনিই যেদিন পণের টাকা পূর্ণ করিয়া বংশী বাইসিক্‌ল্‌টি ভি, পি, ডাকে পাইল সেই দিনই আর তাহার হাত চলিল না, তাহার তাঁত বন্ধ হইয়া গেল;—গোপালের পিতাকে ডাকিয়া তাহার হাতে ধরিয়া সে বলিল, আর একটি বছর রসিকের জন্য অপেক্ষা করিও—এই তোমার হাতে পণের টাকা দিয়া গেলাম, আর যেদিন রসিক আসিবে তাহাকে এই চাকার গাড়িটি দিয়া বলিয়ো, দাদার কাছে চাহিয়াছিল, তখন হতভাগা দাদা দিতে পারে নাই কিন্তু তাই বলিয়া মনে যেন সে রাগ না রাখে!

দাদার টাকার উপহার গ্রহণ করিবে না, একদিন এই শপথ করিয়া রসিক চলিয়া গিয়াছিল—বিধাতা তাহার সেই কঠোর শপথ শুনিয়াছিলেন। আজ যখন রসিক ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল দাদার উপহার তাহার জন্য এতদিন পথ চাহিয়া বসিয়া আছে—কিন্তু তাহা গ্রহণ করিবার দ্বার একেবারে রুদ্ধ। তাহার দাদা যে তাঁতে আপনার জীবনটি বুনিয়া আপনার ভাইকে দান করিয়াছে রসিকের ভারি ইচ্ছা করিল সব ছাড়িয়া সেই তাঁতের কাছেই আপনার জীবন উৎসর্গ করে, কিন্তু হায়, কলিকাতা সহরে টাকার হাড়কাটে চিরকালের মত সে আপনার জীবন বলি দিয়া আসিয়াছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পথহারা।

দিবসের কাজ শেষ হয়ে গেল
ঘনাইয়া এলো রাত্রি,
তাড়াতাড়ি তাই গৃহপানে ধাই
অজানা পথের যাত্রী।
জ্যোৎস্না বিরল বহুদূর পথ
মানুষ না যায় চেনা,
ফিরিবার কথা মনে রাখে নাই
দিবসের বেচাকেনা।
শ্রান্ত চরণ চলিতে চাহেনা
ক্ষীণ হয়ে আসে দৃষ্টি,
প্রলয় বজ্র ধ্বনিছে গগনে
মাথায় ঝরিছে বৃষ্টি।

ঘাটে বাঁধা আছে খেয়া তরীখান্
মাঝি চলে গেছে ঘর,
ঘন গর্জ্জনে নদী কল্লোল
আছাড়ে শ্রবণপর।
সাথের কেবল নয়নের জল
সাথে নাই কানা কড়ি,
বাজারের মাঝে অকূল খুলি
সকল গেছে পড়ি।
"পথ কোথা" ওগো "পথ কোথা" এর
সীমা কোথা এর আছে,
শ্রান্ত চরণ ক্লান্ত হৃদয়
শুধাব কাহার কাছে!

শ্রীইন্দিরা দেবী।

রাজা রামমোহন রায়।*

মহৎ লোকের অভাবের সহিত আমরা মানুষ বুঝিবার মাপ কাটিটি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিতেছি, তাই আমাদের মধ্যে যাঁহাদের মহত্ত্ব সন্দেহের বহির্ভূত এমন সব মহাপুরুষকে লইয়াও আমরা একদল অপর দলের সহিত অকারণ বিরোধ বাধাইয়া তুলিতেছি।

তাহার কারণ আমাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, আমরা অখণ্ড সম্পূর্ণ মনুষ্যটিকে দেখিবার চেষ্টা করি না। সমুদ্রকে ছোট ছোট খালে পরিণত করিয়া সমুদ্রের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবার চেষ্টা যেমন নিষ্ফল বাতুলতা মাত্র, তেমনি একজন সহজ সম্পূর্ণ বিরাট মহাপুরুষকে খণ্ডিত করিয়া উপলব্ধি করার প্রয়াস শুধু ব্যর্থ নহে তাহা হানিকর।

এমনি করিয়া আমরা নানা সম্প্রদায় মিলিয়া যিনি সকল সম্প্রদায়ের বহির্ভূত, তাঁহাকে পর্য্যন্ত আমাদের ছোট গণ্ডীর ভিতর পুরিয়া, আমাদের গজ-কাটিতে তাঁহাকে মাপিবার চেষ্টা করিয়া, নিজেদের খর্ব্ব করি। নিজেদের খর্ব্ব করি, কেননা তাহাতে মহাপুরুষের কোন ক্ষতি হয় না, কারণ তিনি সকল গণ্ডীর সকল সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণতার বাহিরে, বড়কে ছোট করিয়া মহৎকে-খণ্ডিত করিয়া আমরাই শুধু সঙ্কীর্ণতার মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া মরি।

তাই বাংলাদেশে—যে বাংলাদেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়া রামমোহন রায় দেশকে ধন্য করিয়াছেন—আমি অপর দেশের কথা ছাড়িয়া দিই, সেই বাংলাদেশেই রামমোহনকে লইয়া কত না তর্ক, কত না বিবাদ! তাহার কারণ বাংলাদেশ স্বার্থের মধ্য দিয়াই রামমোহনকে দেখিয়াছে, এবং যেখানে তাঁহার বজ্রকঠিন অমোঘ হস্ত পুরাতনের দীর্ণতাকে নূতনের সম্পূর্ণতার মধ্যে সার্থক করিতে গিয়া তাহার দৃঢ়-বদ্ধ সংস্কারকে আঘাত করিয়াছে, সেইখানেই বাংলাদেশ অভিনব বেদনায় চীৎকার করিয়াছে!

কিন্তু এমন করিয়া তাঁহাকে দেখা দেখাই নয়। সম্প্রদায় বিশেষের লাভের ভিতর দিয়া তাঁহার মহত্ত্ব উপলব্ধি করা দোকানদারীর যাচাই করা মাত্র, এবং সম্প্রদায় বিশেষের ক্ষতির মধ্য দিয়া তাঁহার নিষ্ফলতার নিরূপণ করিতে যাওয়াও বাতুলতা।

তাঁহাকে সত্যের মাপকাটির দ্বারা মাপিয়া দেখিতে হইবে, লাভালাভ ক্ষতি অক্ষতির দ্বারা অথবা সম্প্রদায়বিশেষের প্রশংসাবাদ কিংবা অপ্রশংসা দ্বারা তাঁহাকে বুঝিতে যাওয়া চলে না। তাঁহার সমস্ত কর্ম্মের দ্বারাও তাঁহাকে বুঝা যাইবে না, কারণ কর্ম্ম তাঁহাকে ব্যাপ্ত করে নাই, কর্ম্মকে ব্যাপ্ত করিয়া তাঁহার অসাধারণ মনুষ্যত্ব বহু উর্দ্ধে আপনার গর্ব্বিত সমুন্নত শির তুলিয়াছে। সকল কর্ম্মের উর্দ্ধে সকল সম্প্রদায়ের শীর্ষে আপন মহত্ত্বগৌরবে সমুজ্জ্বল প্রকৃত মানুষটিকে যদি আমরা চিনিতে পারি ত সেই চেনাই সার্থক।

রামমোহনের একটা চিঠির মধ্যে এমন একটা সত্যের বিকাশ পাই, যে সত্যটা আমার বিশ্বাস তাঁহার সর্ব্ব-কর্ম্মের মধ্যেই প্রকাশ

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ ভাগলপুর শাখায় পঠিত।

লাভের চেষ্টা পাইয়াছিল, এবং যাহা তাঁহার জীবনের মধ্যে প্রধানতম সত্য ছিল। যখন নেপল্‌স্‌বাসীগণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে-ছিলেন তখন কলিকাতায় সংবাদ আসিল যে স্বাধীনতাপক্ষাবলম্বী পরাজিত হইতেছেন। রামমোহন রায়ের চিত্ত শুধু বাংলাদেশের

রাজা রামমোহন রায়।

ছিলনা, তাই সুদূর নেপল্‌স্‌বাসীগণের পরাজয়েও তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন,—সে ক্ষোভ মানুষের জয় পরাজয়ের জন্য নহে তাহা ন্যায়ের পরাভবে। বকলাণ্ড সাহেবের বাড়ী সেদিন তাঁহার নিমন্ত্রণ ছিল, কিন্তু চিত্ত এতদূর ক্ষুব্ধ হইয়াছিল যে তিনি সেদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা

করিতে যাইতে পারিলেন না—সেই মর্ম্মে বকলাণ্ড সাহেবকে যে পত্র লিখিলেন তাহাতে দেখিতে পাই :—

Enemies to liberty and friends of despotism have never been, and never will be ultimately succesful.

রামমোহন রায়ের সমগ্র জীবনই এই Enemies to liberty and friends of despotism-এর বিপক্ষে যোরতর যুদ্ধ! তাঁহার সমস্ত কর্ম্মের—মধ্যে, সমস্ত তর্কের মধ্যে সমস্ত চেষ্টার মধ্যে এই সত্যের জন্য যুদ্ধ, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধই একমাত্র লক্ষ্যরূপে ফুটিয়া উঠে! যিনি সকল-বন্ধনের উর্দ্ধে, সকল নিয়ম সকল শাস্ত্র সকল অনুশাসনের বাহিরে সেই সর্ব্বময় বিশ্বদেবতার জ্যোতি রামমোহনের মধ্যে প্রচুর-মাত্রায় সঞ্চিত ছিল। তাই তাহা যেখানে প্রকাশ পাইয়াছে, সেখানে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মতই প্রকাশ পাইয়া অন্ধকারকে, নীচতাকে, বন্ধনকে দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে!

এই প্রাচীনতম এবং উদারতম সত্যটাই তাঁহার বুকের মধ্যে সঞ্চিত থাকিয়া তাঁহাকে চঞ্চল কর্ম্মময় করিয়া তুলিয়াছিল। আগুন যেমন এঞ্জিনের বুকের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া জলকে বাষ্প করিয়া, সমস্ত বাধা বিপত্তিকে দূর করিয়া উদ্ধাবেগে এঞ্জিনকে ছুটাইয়া চলে, তেমনি এই মহত্তম সত্য রামমোহনকে ষোল-বৎসর বয়সে দুর্গারোহণ গিরি উল্লঙ্ঘন করাইয়া তিব্বতে লইয়া গিয়াছিল।—অবাধে প্রধানতম রাজকর্ম্মচারীর সম্মুখে আলামরীতাধা লইয়া তাঁহাকে দাঁড় করাইয়াছিল—এবং সাত সমুদ্র তের নদীর পারে তাঁহাকে উত্তীর্ণ করাইয়া দিয়াছিল। রামমোহনের সকল-কার্য্যই যদি একান্ত তাঁহারই নিজস্ব বলিয়া ধরি, তাহা হইলে তাহাদের খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হইতে পারে, কিন্তু যখনই দেখি তাহাদের পশ্চাতে তাঁহার অন্তরতম প্রদেশে বিশ্বদেবতা বসিয়া তাঁহার আগুনকে নিয়তই জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন, তখনই তাঁহার অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপের অর্থ আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

মস্তকগঠনবিদ্যাবিদ্‌গণ কহেন তাঁহার মত এত বড় মাথা অল্পই দেখা যায়, এবং ইহাই তাঁহার প্রতিভার কারণ! মনস্তত্ত্ববিদ্‌দিগের অভিমত আমার বিরোধার্থী। —কিন্তু যদি কেহ চিত্তবিদ্যাবিৎ থাকিতেন তিনি নিশ্চয়ই কহিতেন এত বড় অদ্ভুত; বিরাট এবং উদার চিত্তও কম দেখা যায়—এমনধারা চিত্ত যাহাতে চিত্ত-দেবতার আসন পর্য্যন্ত আঁটিয়া যায়।

ভগবান যেন তাঁহাকে অদ্ভুতকর্ম্মশক্তি দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যেখানে দেখিবে অন্ধকার গভীর হইয়া উঠিয়াছে, অন্যায় ন্যায়কে দমন করিয়া আছে, অন্ধ সংস্কার সত্যকে মলিন করিয়া দিতেছে, সেইখানে হে আমার বরপুত্র! সেইখানে তোমার কর্ম্ম-ক্ষেত্র। সেইখানে তোমার বিষাণ বাজিবে, সেইখানে তুমি তোমার অপূর্ব্ব বলশালী হস্তের দ্বারা নূতনকে পুরাতনের মধ্য দিয়া সৃজন করিয়া তুলিবে, ঝড় যদি উঠে, ঝঞ্ঝার যদি চতুর্দ্দিক ধূলিময় হইয়া যায়, তবুও!

তাই রামমোহনের প্রতিভা এমনি বিশ্ব-বিস্তৃত, এমনি বেগশীল! রাজারই মত তাহা উদ্দাম, অবাধ! ১৭৯০ সালে—১২০ বৎসর

পূর্ব্বে, একজন ষোল বৎসরের ছেলে ধর্ম্মের তৃষ্ণায় ভারতবর্ষ পার হইয়া তুষার-মণ্ডিত উচ্চতম পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া তিব্বতে গিয়াছিল —এ কথা এই রেলের দিনেও আমাদের বিশ্বাস হয় না, এটা এমনি অসম্ভব—কিন্তু রামমোহনের পক্ষে ইহাও সম্ভব হইয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন ধর্ম্ম অসত্য হইয়া পড়িতেছে,—তাই কোনও দিক লক্ষ্য না করিয়া তাহারই সংস্কারে ধাবমান্ হইলেন,—চিত্তের মধ্যে আগুন তখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তিনি কিছুতেই আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না! এমন করিয়া উন্মত্ত না হইতে পারিলে পৃথিবীতে কোন চিরস্থায়ী কাজ হয় না। সমাজের বাধা, তাঁহার পক্ষে তুষার-মণ্ডিত হিমগিরি অপেক্ষা অল্প দুর্লঙ্ঘ্য ছিল না, কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বার হৃদয়কে তাহাও কিছুতেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই।

এই দুর্ব্বার হৃদয়ের অপ্রতিহত শক্তির বলে তিনি সহমরণ-প্রথা নিবারণের উপায় হইয়াছিলেন, দেশে যখন অবিদ্যার বিস্তৃতি তখন হিন্দুস্কুল স্থাপনের কারণ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের-সংস্কারের জন্য বেদোপনিষৎ প্রভৃতি হিন্দুর সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া ফেলিতে হইয়াছিল।—কিন্তু তাহা শুদ্ধ উপায়-মাত্র; তাহাতেই তাঁহার জীবনের কর্ম্মের অবসান না হইয়া তাঁহার কর্ম্মের পথমাত্র হইয়াছিল। সমাজেও তাঁহার সংস্কার অল্প নহে,এমন কি তিনি হিন্দুর চিরাগত আইনের পরিবর্ত্তনের বিপক্ষে সুপ্রীমকোর্টের বিরুদ্ধে বিলাতে প্রিভিকাউন্সিল পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। বইয়ের পর বই লিখিয়া হিন্দুর বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন—আবার যখন পাদরী আসিয়া উপনিষদের ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছে তখন তিনি তাঁহার জ্বালাময়ী ভাষায় তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার উপর সকলের অসীম বিশ্বাস ছিল,—মুসলমান বাদশাহের পক্ষ হইতে তিনি প্রিভি-কাউন্সিলে তাঁহার অধিকার-চ্যুতির বিপক্ষে আবেদন করিতে যান। আবার ইংরাজ গবর্ণর জেনারেল তাঁহাকে সাক্ষাতের জন্য ডাকিলে তিনি না যাওয়ায় গবর্ণর জেনারেল বলিয়া পাঠান "বলগে লর্ড বেন্টিঙ্ক গবর্ণর-জেনারেল নহে—মিষ্টার বেন্টিঙ্ক তাঁহাকে ডাকিতেছেন।"

তাঁহার বাঙ্গালা-ভাষার কৃতিত্বের ইতিহাসও এইরূপ! বাঙ্গালা সাহিত্য অথবা ভাষাকে বড় করিব বলিয়া তিনি কোন-দিন চেষ্টা করেন নাই, অন্তরের ভাব-বহ্নি যখন প্রকাশোন্মুখ হইল, তখন ভাষা তাঁহার হাতে গড়িয়া উঠিল। ভাষা যদি সকলে না বোঝে, তাই ব্যাকরণ লেখা হইয়া গেল! চিত্তের মধ্যে যে অনির্ব্বাণ আগুন সঞ্চিত ছিল, তাহা এই ভাষার পথে ব্যাকরণের মধ্য দিয়া ছুটিয়া বাহির হইল। বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র "সংবাদ কৌমুদী" ও উর্দ্দু সংবাদ-পত্র এবং তাঁহার লিখিত ভূগোল ও জ্যামিতির প্রকাশেরও ইতিহাস এইরূপই। তাহাদের প্রয়োজন হইয়াছিল—তাই তাহারা ছুটিয়া বাহির হইল। উদ্দেশ্য সেই সঞ্চিত আগুনকে অন্ধকারের স্তূপের উপর জীর্ণতার সমষ্টির উপর জ্বালাইয়া তোলা,—ভাষা এবং ভাব, অধ্যয়ন ও বিদ্যা, তর্ক ও বিতর্ক তাহার উপায় মাত্র।

অথচ সংযমের অভাব ছিল না। লোকে যখন তাঁহাকে কুবাক্য বলিত, তিনি শান্ত সংযত হইয়া থাকিতেন, কেননা নিজের জয়কে

কোন দিন তিনি বড় করিয়া দেখেন নাই,—সত্যের জন্যই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তাঁহার একটা মন-গড়া নূতন-ধর্ম্ম নহে। তাহা উপনিষদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্ম্ম। হিন্দুকলেজ সংস্থাপন বিষয়ে তাঁহার মতন অগ্রণী আর কেহ ছিলনা, কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন কমিটিতে তিনি থাকিলে ক্ষতির সম্ভাবনা, তখন স্বেচ্ছায় কমিটি ত্যাগ করেন। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধেও তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল মত ছিল না, তিনি কহিতেন এ বিষয়ে নিজের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিলে সহজেই উদ্দাম হওয়ার সম্ভাবনা—সুতরাং কোন একটা ধর্ম্মের অনুযায়ী হওয়া উচিত। এবং তাঁহার মৃত্যুতেও এই বিশ্বজনীনতাই পরিস্ফুট হইয়াছে। বাংলা দেশে জন্মিয়াও যে তিনি শুধু বাঙ্গালার নহেন, তিনি যে বিশ্বের তাহা মৃত্যুর দ্বারা দেখাইয়াছেন। ব্রিষ্টল নগর তাঁহার শব বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি শুধু ব্রিষ্টল নগরের নহেন, তাই ব্রিষ্টলের মত জার্ম্মনীও ধন্য, ফ্রান্সও ধন্য এবং নিরিচ্ছিন্ন ধন্য আমাদের বাংলা দেশ! বাংলা তাহার জল মাটির আবহাওয়ার মধ্যে লালিত পালিত করিয়া যে এমনি একটি উদার উন্নত মহাপুরুষকে বিশ্বের মাঝখানে অপূর্ব্ব বাণী ও অদ্ভুত বীরত্বের সহিত পাঠাইতে পারিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আনন্দ ও গর্ব্বের বিষয় আর কি হইতে পারে?

আজ এই মহাপুরুষের সাম্বৎসরিক মৃত্যুদিনে সমবেত আমরা সম্ভ্রমের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত বিনয়ের সহিত তাঁহাকে স্মরণ করি, এবং এই সভার অলক্ষ্যে সমাগত তাঁহার প্রেমময় মঙ্গলময় আত্মাকে প্রণাম করি।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

রাজা রামমোহন রায় ও ধর্ম্মের আদর্শ।

বলা বাহুল্য, ধর্ম্মের ইতিবৃত্তে ভারতই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এ বিষয়ে একই মত শুনা যাইতেছে। আমাদের এই ধনরত্নপূর্ণ ভারতে অনেক ধর্ম্মান্ধ, ধর্ম্মসংস্কারক ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পক্ষদের উপকূলে আর্য্যদিগের আগমন অবধি আজ পর্য্যন্ত অনেক ধর্ম্মবীর, এদেশে আপনাদিগের অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মযাজকেরা ধর্ম্মকে এক বিকট আকারে মানবসমাজে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মকে ত্যাগস্বীকারের কারণ বলিয়া কৃচ্ছ্রসাধনে শরীরকে নষ্ট করা, ইত্যাদি বিষয়সকল ধর্ম্মসাধনের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্ম্মশিক্ষা এ বিষয়ে একই প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ভারতের বৈদিক যুগের কথা স্বতন্ত্র। বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, আমাদের আর্য্যগুরুরা প্রকৃতিকে আনন্দের চক্ষে দর্শন করিতেন। সূর্য্যের নবজ্যোতি, বিকশিত কুসুমরাজি, মেঘমালার দর্শনে ময়ূরের নৃত্য, বর্ষাকালে

ভেকের ডাক, সকলই তাঁহাদিগের নিকট আনন্দকর বলিয়া বোধ হইত।

দার্শনিক যুগে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক, এই ত্রিতাপ জ্বালা হইতে মানব কিরূপে নিষ্কৃতি পাইবে, পণ্ডিতেরা তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন।

পূর্ণাঙ্কিত জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আসিয়া যেমন চন্দ্রের জ্যোতিকে সময়ে সময়ে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, বৈদিক সময়ের পর যখন বৌদ্ধযুগের আরম্ভ হইল, তখন হইতেই ধর্ম্ম যেন বিষাদময়ী হইয়া, ভারতের হৃদয় অধিকার করিতে লাগিলেন। দুঃখবাদের বার্ত্তা ভারতে প্রচারিত হইতে লাগিল। ধর্ম্ম বিষাদের ঘন আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া আমাদের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইলেন। ত্যাগই ধর্ম্মের কষ্টি-পাথর,—কৃচ্ছ্রসাধনই ধর্ম্মের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল।

হায়! আবার কি কুক্ষণেই বেদান্তের মায়াবাদ ঘোষিত হইল,—আমরা এখনও পর্য্যন্ত সে প্রহেলিকা ভেদ করিতে সমর্থ হইলাম না,—সে যাদুমন্ত্রের মোহিনী শক্তি এড়াইতে পারিলাম না। শঙ্করের বেদান্তমত রামরূপে মানবকে সংসারের সুখ সম্ভোগের বস্তু হইতে ঠেলিয়া দিয়াছেন, এবং "কা তব কান্তা কস্তে পুত্র সংসারোঽয়ং অতীব বিচিত্র।" এই বৈদান্তিক বচনে বহু লোকের কোমল প্রাণকেও পাষাণ নির্ম্মিত করিয়া ফেলিয়াছে। বৌদ্ধ ও শঙ্কর-মতের ধুয়া ধরিয়া, নানক, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্কারকেরা ধর্ম্মকে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেই প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

বহুকালাবধি ভারতে মায়াবাদ ও ধর্ম্মের কুসংস্কার চলিয়া আসিতেছিল এমন সময়ে এক মহান্ পুরুষ এই ভারতক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ইনি যে আদর্শ ভারতবাসীর সম্মুখে ধরিলেন, তাহা অতি উচ্চ। উহার অনুকরণে জীবনের সকল দিকই বিকশিত হইয়া উঠে। অগাধ পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া রামমোহন রায় বেশ বুঝিয়াছিলেন যে মানব জীবনের সকল দিক যথাযথরূপে উৎকর্ষ লাভ না করিলে, প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে মানুষ দূরেই বাস করিয়া থাকে।

রামমোহন রায়ের ন্যায় এত বড় ধর্ম্ম সংস্কারককেও আমরা অবতার বলিয়া স্বীকার করি না। কারণ আমরা প্রচলিত অবতার বাদের পক্ষপাতী নহি। কিন্তু তাই বলিয়া, যাঁহারা এদেশে অবতাররূপে পূজিত হইয়াছেন আমরা রামমোহন রায়কে তাঁহাদের অপেক্ষা সামান্য মনে করি না।

পূর্ব্ববর্ত্তী সাধারণ ধর্ম্মযাজকদিগের সহিত রামমোহনের মতের মূলগত পার্থক্য এই যে, রামমোহন রায় আদৌ সন্ন্যাস ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন না। শরীর উপেক্ষার বস্তু নয়, উহা যে জ্ঞান ও ধর্ম্মলাভের ভিত্তি-স্বরূপ, তাহা রামমোহন রায়ই আমাদিগকে এ যুগে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

সন্ন্যাসধর্ম্ম শরীর মনের পক্ষে কল্যাণ-কর নহে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশে ধর্ম্মসমাজে এই অস্বাভাবিক প্রথার প্রচলনে যে কতদূর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, ভগবান প্রদত্ত স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে বলপূর্ব্বক চাপিয়া রাখিতে যাওয়া কি নির্ব্বুদ্ধিতার

কার্য্য! পাশ্চাত্যদেশে রোমানক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ নরনারী সাধারণ লোক অপেক্ষা উচ্চতর ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া, ভগবানের সেবায় দেহমন নিয়োগ করিবেন বলিয়া, কৌমার কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই ব্রতের বিষময় ফল সতত দর্শন করিয়া, কোন সুপণ্ডিত চিকিৎসক লিখিয়াছেন "The superhuman is sure to become inhuman sooner or later" অর্থাৎ এই অস্বাভাবিক দেবত্ব বিলম্বে বা অবিলম্বেই হউক সাধারণ মানবের নিম্নতর স্তরেই নিক্ষিপ্ত হইবে।

রামমোহন রায় দেখিলেন, ভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মাচার্য্যেরা সন্ন্যাসধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহা ধর্ম্ম সাধনের অনুকূল নয় জানিয়া তিনি আমাদিগকে এই সুখদুঃখময় সংসারকাননে বাস করিয়া পরমেশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিতে শিক্ষা দিয়াছেন। কাননের প্রস্ফুটিত গোলাপে ও শিশুর মিষ্ট হাসিতে পরমেশ্বরের আনন্দজ্যোতি দর্শন করিতে বলিয়াছেন। সংসারে বাস করিয়া যে ব্রহ্মসাধন সম্ভবপর, তাহা রামমোহন রায়ই এ যুগে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

ভগবান তাঁহাকে যেমন তীক্ষ্ণ ও প্রখর বুদ্ধি দান করিয়াছিলেন, তেমনি তিনি তাঁহাকে সবল ও সুস্থদেহও প্রদান করিয়াছিলেন, রামমোহনও ভগবানের এই দান কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিয়া শরীররক্ষাকেও ধর্ম্ম বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। ভারতে একেশ্বরবাদ ঘোষণার জন্য, যখন তাঁহার শত্রুরা তাঁহার প্রাণবিনাশের ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তখন তিনি তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন, "কলিকাতার লোকে কি খায় যে আমায় মারিবে?"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রাজার বিষয়ে যে সকল সুন্দর সুন্দর গল্প করিতেন, তাহার একটি এখানে প্রকাশিত হইল। মহর্ষি বলিতেছেন,—

"একদিন প্রাতঃকালে তাঁহার আহারের সময় মধু দিয়া রুটি খাইতে খাইতে তিনি আমাকে বলিলেন, 'বেহারার আমি মধু ও রুটি খাইতেছি, কিন্তু লোকে বলে আমি গোমাংস ভোজন করিয়া থাকি।'—কোন কোন দিন আমি রাজার স্নানের সময় তাঁহার বাটীতে যাইতাম। তাঁহার স্নান বড় চমৎকার ছিল। কিন্তু স্নানের পূর্ব্বে সমস্ত শরীরে অধিক পরিমাণে সর্ষপ তৈল মর্দ্দন করিতেন। তাঁহার শরীরে তৈল গড়াইয়া পড়িত। তিনি বলবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁহার মাংসপেশী সকল শক্ত ছিল। তৈলমর্দ্দিত অনাবৃত দেহে, কটিদেশের চতুঃপার্শ্বে একখণ্ড বস্ত্রমাত্র; এই প্রকার মূর্ত্তি দেখিয়া বালক বলিয়া আমার ভীতির সঞ্চার হইত। এই প্রকার বস্ত্র পরিধান করিয়া বলপূর্ব্বক পদ নিক্ষেপ করিতে করিতে তিনি উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিতেন। সংস্কৃত, পার্শী ও আরবী ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে একটি প্রকাণ্ড জলপূর্ণ টবে স্নানপ্রদান করিতেন। এই টবে তিনি এক ঘণ্টারও অধিককাল থাকিতেন। এই সময়ে তিনি ক্রমাগত তাঁহার প্রিয় কবিতা সকল আবৃত্তি করিতেন। স্পষ্ট বোধ হইত, তিনি এই সকল কবিতার ভাবে মত্ত হইয়া যাইতেন। তিনি অতিশয় ভাবের সহিত যে সকল কবিতা

উচ্চারণ করিলেন আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। আমার তখন বোধ হইত যে উহাই তাঁহার উপাসনা ছিল।"

মস্তিষ্ক উত্তমাঙ্গ বলিয়াই ঋষিরা বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ ঐ স্থান হইতেই মানবের চিন্তা প্রসূত হয়। দুর্ব্বল মস্তিষ্ক উচ্চচিন্তার অধিকারী হইতে পারে না। মানসিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে শরীর যে তাহার প্রধান ভিত্তি, তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। সমাজের অধিকাংশ দুর্নীতির কার্য্য দুর্ব্বল মস্তিষ্ক হইতেই প্রসূত হয়। যাঁহারা লোককে সকল তত্ত্বের সারতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দিবার প্রয়াসী হন, তাঁহারা অনেকে মনে করেন যে, অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা শরীরকে নির্য্যাতন না করিলে, মানব ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু ঐরূপ দুর্ব্বল মস্তিষ্ক হইতে যে সকল ধর্ম্মচিন্তা প্রসূত হইয়াছে, তাহা অনেক স্থলেই সারবত্তাবিহীন।

শাক্যমুনি বুদ্ধগয়ায় ছয় বৎসরকাল কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন, এবং এ অবস্থায় অনশনে, কখন বা যৎসামান্য কিছু আহার করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেন। অবশেষে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, শরীরকে অনর্থক কষ্ট দিয়া কোন ফল হয় নাই।

ভারতের পূর্ব্বতন ঋষিদিগের কথা বাদ দিলে আমাদের দেশের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা প্রায় কেহই উচ্চজ্ঞানের পক্ষপাতী ছিলেন না। ঋষিরা জ্ঞানের পক্ষপাতী হইলেও, তাঁহারা পরা ও অপরা বিদ্যা, এই দুইটি পৃথক করিয়া, ব্রহ্মবিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। অন্য বিদ্যা যে ব্রহ্ম বিদ্যার সহায়ক সে বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ আস্থা প্রদান করেন নাই। তৎপরে যে সকল ধর্ম্মসংস্কারকদিগের বাক্য ও জীবনের প্রভাবে ভারতের অসংখ্য নরনারীর জীবনের গতি পরিচালিত হইয়াছে, তাঁহারা কেহই সাহিত্য বা বিজ্ঞানের পক্ষপাতী হইয়া তদ্বিষয়ের অনুশীলনে আমাদিগকে প্রোৎসাহিত করেন নাই। চৈতন্য নিজে ন্যায়শাস্ত্রে, তাৎকালিক নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেও, পরে ভক্তির উচ্ছ্বাসে সে বিষয়ের অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানকে ভক্তি অপেক্ষা নিম্নতর স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে একবার গৌরাঙ্গ অদ্বৈতাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করেন "জ্ঞান বড়, কি ভক্তি বড়?" অদ্বৈতাচার্য্য ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ বলায়, গৌর ক্রুদ্ধ হইয়া অদ্বৈতের পৃষ্ঠে এক মুষ্টাঘাত করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় পরা ও অপরা এই দুয়েরই উৎকর্ষ সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নানা ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, যেমন ব্রহ্ম-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তেমনি বিজ্ঞান চর্চ্চার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তদ্বিষয়ে লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে ভারতের শাসনকর্ত্তা লর্ড আমহার্ষ্টকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা চিরদিনই ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত থাকিবে। তিনি ভারতের সেই তিমিরাচ্ছন্ন সময়ে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এত উচ্চ আদর্শ কিরূপে হৃদয়ে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

সেই বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর কেবল মানবের আত্মার রাজা নহেন, তিনি জড়রাজ্যেরও রাজা, জড়বিজ্ঞান ও আত্মার জ্ঞান লাভেই আমরা ক্রমে উচ্চতর ব্রহ্মজ্ঞান লাভে উপনীত হইতে পারি। একটি বাদ দিলে অপরটি প্রকৃতরূপে আমাদের আত্মাকে উন্নত করিতে সমর্থ হয় না।

অকূল সাগরপথে যাইবার সময় কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, যে এই বাষ্পীয়যানের দিক্‌নির্ণয় যন্ত্রটি অথবা হিম অধিক প্রয়োজনীয়? এ প্রশ্নের উত্তরে জাহাজের অধ্যক্ষ অবশ্য দুইটিরই আবশ্যকতা স্বীকার করিবেন। কেন না, হিম না থাকিলে জাহাজ চলিবে না, কম্পাস না থাকিলে, জাহাজ গন্তব্যস্থানে না যাইয়া হয়ত বিপথগামী হইয়া পড়িবে। সংসার সাগরে জীবনতরী চালাইতে হইলে, জ্ঞান ও ভক্তি দুইয়েরই প্রয়োজন। সকল জ্ঞানই আমাদিগকে সত্য ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করে, ইহাই রামমোহন রায়ের কথা।

রামমোহন রায় স্বদেশের কল্যাণ সাধনের পক্ষে রাজনীতির চর্চ্চাও বিশেষ কল্যাণকর বলিয়াই মনে করিতেন। তিনি ইংরাজ জাতির জ্ঞানানুরাগ কার্য্যশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সমাদর করিতেন এবং ঐ সকল সদ্‌গুণ যাহাতে এ দেশের লোক অবলম্বন করিয়া, জাতীয় চরিত্রের উন্নতি সাধন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। তিনি অন্য জাতির সদ্‌গুণ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সকল জাতিই যাহাতে আপনাপন স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাহাই ইচ্ছা করিতেন।

যখন স্পেনে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তিনি কলিকাতা টাউনহলে ভোজ দিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যাইবার সময় ফরাসী জাহাজের স্বাধীনতার নিশান উড়িতেছে—দেখিয়া,উহাকে অভিবাদন করিবার জন্য আগ্রহের সহিত ডেকে উঠিবার সময় পড়িয়া গিয়া একখানি পা ভাঙ্গিয়া ফেলেন, সে যন্ত্রণা তাঁহাকে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহন করিতে হইয়াছিল। যখন ফ্রান্সে স্বাধীনতা লাভের জন্য ঘোরতর অনল শিখা জ্বলিয়া উঠিল, যখন সাম্য, ভ্রাতৃভাব ও স্বাধীনতার (Equality Fraternity and Liberty) রবে ফ্রান্সের আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, তখন রামমোহন রায় এই সংবাদে আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন। ফরাসীর ধারায় জমি অধুরঞ্জিত হয় সে জন্য নয়, কিন্তু নরনারী যাহাতে স্বাধীনতার সুখভোগ করে তিনি তাহাই দেখিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন।

তিনি ভারতের প্রধান দার্শনিক ছিলেন। তিনি বেদান্তের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া অদ্বৈতবাদের প্রচলিত মতের খণ্ডন করেন, এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে উপাস্য ও উপাসকের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া, ব্রহ্মোপাসনার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। পরব্রহ্ম মানবের উপাস্য এবং তাঁহার উপাসনায় মানব অন্তরে আনন্দের উৎস উৎসারিত হয়, তিনি বাক্য ও কার্য্যের দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

সত্য কোন দেশে, কোন ব্যক্তিতে বা শাস্ত্রে যে আবদ্ধ নহে, এই মহাসত্য তিনিই ভারতে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। চিকাগোতে যে প্রথম ধর্ম্ম সম্মিলন হয়, তাহাতে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা

ইহাই প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যেই সত্য আছে। রামমোহন রায় যে বহুদিন পূর্ব্বে এই মহাসত্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, ভারতের কোন প্রসিদ্ধ বক্তা উক্ত সভায় তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল শাস্ত্র মন্থন করিয়াছিলেন, তাহা বোধহয়, এখন আর কাহারো অবিদিত নাই। এইজন্য পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে তাঁহাকে Comparative Theology'র জন্মদাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল ভারতের ধর্ম্ম নয়, উহা জগতের ধর্ম্ম। উহা সার্ব্বভৌমিক। তিনি একবার অশ্রুসিক্ত নয়নে কোন লোককে বলিয়াছিলেন, "Brother, my religion is universal. ভ্রাত, আমার ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক!" তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজে কত আঘাত পড়িয়াছে, এখনও পড়িতেছে, এবং ভবিষ্যতে কতই না পড়িবে কে জানে? তবে যে ধর্ম্মের প্রাণ সেই জগতের আদিকারণ পরমেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত, যে ধর্ম্ম কোন দেশে কোন শাস্ত্রে বা কোন ব্যক্তিতে আবদ্ধ নহে তাহার বিনাশ অসম্ভব। যে ধর্ম্ম উচ্চতর জ্ঞানকে সদাই আপনার সাথী করিয়া আপনার উদারতা রক্ষা করিতে প্রস্তুত সে ধর্ম্ম চিরদিনই আপনার পরিত্রাণের বার্ত্তা জগতে ঘোষণা করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম মানব মনের উচ্চতম চিন্তার ফল স্বরূপ। "It is the science of manhood."

ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে আমরা চিরদিনই রাজা রামমোহন রায়ের হস্ত দেখিতে পাইব। তিনি যে কেবল ভারতের নানাবিধ কল্যাণসাধনে রত ছিলেন তাহা নহে, তিনি মানব জাতির সম্মুখে এক বিশাল আদর্শ ধরিয়া গিয়াছেন। মোক্ষমূলারের কথানুসারে তিনি "Prince, Real Raja, First man and the man of the helm. অর্থাৎ, তিনি রাজা, প্রধান পুরুষ ও সমাজের কর্ণধারস্বরূপ।" স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বর্ত্তমান সময়কে রামমোহন রায় যুগ বলিয়াই অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

রাজার জীবনী রচয়িত্রী ইংলণ্ডের কুমারী কলেট, রামমোহন রায়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, একস্থানে লিখিয়াছেন,—

"There can be little doubt that whatever future the destinies may have in store for India, that future will be largely shaped by life & work of Ram Mohan Roy."

"অর্থাৎ, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই যে ভারতের ভবিষ্যৎ বহুলরূপে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের আদর্শেই গঠিত হইবে।"

উপসংহারে, বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের লেখনী হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম। অক্ষয়বাবু, তাঁহার সুবিখ্যাত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক গ্রন্থে রাজার কীর্ত্তিকাহিনী অবলম্বনে যে লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে চিরদিনই অক্ষয়কুমারের অক্ষয়কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবে। তিনি বলিতেছেন, "তোমার উপাধি রাজা, জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটি সুবিস্তার

মনোরাজ্য অধিকার করিয়াছ। তোমার সহকালীন ও বিশেষতঃ উত্তরকালীন সুমার্জ্জিত-বুদ্ধি শিক্ষিতসম্প্রদায় তোমাকে রাজমুকুট প্রদান করিয়া তোমার জয়ধ্বনি করিয়া আসিতেছে। যাঁহারা আবহমানকাল হিন্দুজাতির মনোরাজ্যে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ, অতএব তুমি রাজার রাজা। তোমার জয়পতাকা তাঁহাদেরই স্বাধিকার মধ্যে সেই যে উত্তোলিত হইয়াছে, তাহা পতিত হইল না; নিয়ত একভাবেই উড্ডীয়মান রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষীয়েরা তোমাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিতেন, তদীয় সন্তানেরা অনেকেই এখন তোমাকে পরম বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন সন্দেহ নাই। কেবল ভারতবর্ষীয়দিগের বন্ধু কেন, তুমি জগতের বন্ধু।"

শ্রীশশিভূষণ বসু।

শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

(গ)। ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে শ্রুতি স্মৃতি, প্রত্যক্ষ এবং অনুমানাদির প্রামাণ্য বিচার।

অপরদিকে আত্মা বা ব্রহ্ম যদি স্বপ্রকাশই হয়, এবং আত্ম-প্রত্যয় দ্বারাই যদি আত্মা বা ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, তবে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য শাস্ত্রাদির আলোচনার প্রয়োজন কি? শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যের প্রথম সূত্রেই বলিতেছেন:—"ব্রহ্ম যদি আত্মারূপে লোক-প্রসিদ্ধই হন, তবে তাহাতে সকলেরই জানা আছে। অতএব ব্রহ্ম লোকের জিজ্ঞাসার অযোগ্য। কিন্তু তাহা নয়, তাহার বিশেষত্ব সম্বন্ধে লোকের মধ্যে অসংখ্য বিরুদ্ধ মত রহিয়াছে। যথা, অশাস্ত্রজ্ঞ লোক এবং লোকায়তিকেরা (চার্ব্বাক্) বলে যে 'চৈতন্যযুক্ত দেহমাত্রই আত্মা।' বেদ-বিরোধীরা কেহ বলে 'চেতনাযুক্ত ইন্দ্রিয়-সমষ্টিই আত্মা'। কেহ বলে, 'মনই আত্মা'। কেহ বলে, 'ক্ষণিক-বিজ্ঞান-মাত্রই আত্মা।' কেহ বলে, 'শূন্যই আত্মা'। কেহ (নৈয়ায়িকাদি) বলে, 'আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন, সংসারী, কর্ত্তা, এবং 'ভোক্তা'। কেহ (সাঙ্খ্য) বলে, 'আত্মা কেবল ভোক্তাই, কর্ত্তা নয়'। কেহ (যোগমত) বলে, 'আত্মা হইতে ভিন্ন, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ব-শক্তিমান্ ঈশ্বর আছেন।' কেহ কেহ (বেদান্তী) বলে, 'ভোক্তার আত্মাই ঈশ্বর।' এইরূপে নানা প্রকার ভ্রম-সঙ্কুল যুক্তি এবং শাস্ত্রবাক্য আশ্রয় করিয়া লোকে আত্মা সম্বন্ধে অসংখ্য বিরুদ্ধ মত পোষণ করিতেছে। বিনা বিচারে এসকল বিরুদ্ধ মতের যে কোন একটা আশ্রয় করিলে পরমার্থ-হানি এবং অনর্থ-প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী।"

শঙ্করের মতে শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা বিশেষতঃ বেদান্ত-বাক্যের আলোচনা দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়:—"শাস্ত্রাদেব প্রমাণাৎ জগতো জন্মাদিকারণং ব্রহ্মাধিগম্যতে।" তিনি এতৎ সম্বন্ধে শ্রুতি-প্রমাণ উল্লেখ করিতেছেন:—"নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং"—"অবেদবিৎ ব্রহ্ম মননে অসমর্থ"—(ব্রহ্মভাষ্য-অ-২-পা-১-সূ-৩)। তাঁহার মতে বেদ অপৌরুষেয়—

অতএব স্ববিষয়ে তাহার প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ। তিনি বলিয়াছেন :—"নিজের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে বেদের প্রামাণ্য প্রমাণান্তর নিরপেক্ষ, যেমন রূপ-প্রকাশ বিষয়ে সূর্য্যালোক আলোকান্তর-নিরপেক্ষ। স্মৃতি-প্রভৃতি পুরুষ-বচন শ্রুতি-প্রভৃতি মূলান্তরের অপেক্ষা করে। স্বীয় প্রতিপাদ্য বিষয়ে তাহাদের প্রামাণ্য বক্তার স্মৃতি সাপেক্ষ। এজন্যই স্মৃতি-প্রমাণের দুর্ব্বলতা। বেদবিরুদ্ধ বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণের কোন স্থান নাই একথা বলাতে কোন দোষ —হয় না।" (ব্রহ্মসূত্র-অ-২। পা ১.সূ১)। তিনি পুনরায় বলিতেছেন :—প্রতিপাদ্য বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ, অতএব প্রত্যক্ষ। প্রতিপাদ্য বিষয়ে স্মৃতি আপ্রয় প্রমাণান্তরের সাপেক্ষ, অতএব অনুমান মাত্র।' তবে "জন-সাধারণের জ্ঞান পরের অধীন। তাহারা স্বাধীনভাবে শ্রুতির অর্থ অবধারণে অক্ষম। এজন্য তাহারা বিখ্যাত প্রণেতাদি-কৃত স্মৃতিকে আশ্রয় করে, এবং তদ্বলেই শ্রুতির অর্থ নির্ণয় করে। আমরা নিজে যদি শ্রুতির কোন ব্যাখ্যা করি, তাহা বিশ্বাস করিবে না,—কারণ স্মৃতি-প্রণেতাদিগের প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। এজন্য স্মৃতি অনুসারেই বেদের ব্যাখ্যা করিতে হয়।" কিন্তু স্মৃতিসকলের মধ্যে পরস্পর বিরোধ রহিয়াছে :—যথা, কপিল ঈশ্বর-কারণ-বাদে আপত্তি করিতেছেন, এবং ভগবদ্গীতা প্রভৃতি অনেক স্মৃতি ঈশ্বরকেই জগতের কারণ এবং উপাদান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অন্য দিকে দেখা যায়, ঈশ্বর-কারণ-বাদই শ্রুতির তাৎপর্য্য। স্মৃতি সকলের মধ্যে যখন এবিষয়ে পরস্পর বিরোধ, তখন আমরা স্মৃতি বিশেষের মত পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্মৃতি-বিশেষের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য। এরূপ বিরোধ স্থলে শ্রুতির অনুসারী স্মৃতি-সকলই প্রমাণ, এবং অন্য গুলি অগ্রাহ্য। এজন্য প্রমাণ লক্ষণে জৈমিনি বলিতেছেন :—"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানমিতি।" (সূত্র-ভাষ্য-অ-১,সূত্র ১।) ইহার অর্থ এই :—"শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটে হইলে স্মৃতির প্রামাণ্য আদর যোগ্য নয়। কিন্তু শ্রুতির সহিত বিরোধ না থাকিলে, মূল শ্রুতির তাৎপর্য্যের অনুমাপকরূপে স্মৃতিও প্রমাণরূপে গণ্য।"

অনুমানাদি অন্যান্য প্রমাণ সম্বন্ধে শঙ্কর তাহার সূত্র-ভাষ্যে বলিতেছেন :—"ব্রহ্ম-সূত্রের উদ্দেশ্য বেদান্ত-বাক্যরূপ কুসুম সকল একত্র গ্রথিত করা। এজন্যই বেদান্ত-সূত্রে বেদান্তবাক্য সকলের উল্লেখ করিয়া তাহার তাৎপর্য্য বিচার করা হইয়াছে। অর্থ-বিচারণা পূর্ব্বক নিশ্চিতরূপে বেদান্ত-বাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় দ্বারা ব্রহ্মাবগতি সাধিত হয়। অনুমানাদি প্রমাণান্তর দ্বারা ব্রহ্মাবগতি সাধিত হয় না। তবে জগতের জন্মাদির কারণবাদী বেদান্ত-বাক্য সকল রহিয়াছে। সেই সকল শ্রুতি-বাক্যকে ভিত্তি করিয়া তাহার অর্থ সম্বন্ধে সংশয়-নিবৃত্তি, এবং নিশ্চয়তা সাধন দ্বারা বেদান্ত-বাক্যের অর্থজ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য অনুমানও বেদান্ত-বাক্যের অবিরোধী প্রমাণ, অতএব অনুমান নিষিদ্ধ নয়। শ্রুতি স্বয়ংই তর্ক করিতে উপদেশ দিতেছে; যথা, "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ।" "আর্চাধ্যবান্ পুরুষো বেদ" ইত্যাদি। পুরুষ-বুদ্ধি যে আত্মজ্ঞানের সহায় তাহা শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন

হইতেছে। ধর্ম্ম বা বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির জ্ঞানলাভ বিষয়ে যেমন শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ বিষয়ে সে রূপ নয়। ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে শ্রুতি এবং অনুভবাদি যেখানে যাহা সম্ভব, উভয়ই প্রমাণ। যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞান ভূতবস্তু বিষয়, এবং অনুভবই তাহার একমাত্র লক্ষ্য"। তিনি আবার বলিতেছেন:— "কোন বস্তু সম্বন্ধে, "ইহা এইরূপ" এবং "এইরূপ নয়" অথবা ইহা 'আছে' এবং 'ইহা নাই' যুগপৎ এইরূপ বিকল্পনা বা বিরুদ্ধ কল্পনা সম্ভব নয় (Law of contradiction)। কোন বস্তু-বিষয়ক ঈদৃশ বিকল্পনা লোক-বুদ্ধি সাপেক্ষ, কিন্তু সেই বস্তু বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান লোকবুদ্ধি সাপেক্ষ নয়। তবে কি? তাহা বস্তু-তন্ত্র, অর্থাৎ বস্তুর উপরেই নির্ভর করে। একটা খোঁটা (স্থাণু) দৃষ্টে, যদি একজন মনে করে "ইহা হয় একটি খোঁটা না হয় একজন মানুষ, না হয় অন্য কিছু" তবে এরূপ সংশয়-যুক্ত জ্ঞান লোক-বুদ্ধি সাপেক্ষ। তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলা যায় না। খোঁটা দেখিয়া তাহাকে মানুষ অথবা অন্য কিছু জ্ঞান করা মিথ্যা জ্ঞান। "ইহা একটি খোঁটাই" এই জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, এবং তাহা বস্তু-তন্ত্র। এইরূপে ভূতবস্তু-বিষয়ক জ্ঞান প্রামাণ্য বস্তুর অধীন। অপরাপর সকল বস্তু সম্বন্ধেই এরূপ। ব্রহ্মজ্ঞানও ভূত-বস্তু-বিষয়ক-জ্ঞান, অতএব ব্রহ্মজ্ঞানও বস্তু-তন্ত্র।" এখন এরূপ কেহ আপত্তি করিতে পারেন:— ব্রহ্মজ্ঞান যদি বস্তুতন্ত্র ভূতবস্তু-বিষয়ক জ্ঞান হয়, তবে তাহা প্রত্যক্ষানুমানাদি প্রমাণান্তরেরই বিষয়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য বেদান্ত-বাক্যের তাৎপর্য্য বিচার নিষ্প্রয়োজন।" "তাহা নয়। ব্রহ্ম-ইন্দ্রিয়ের জন্য জ্ঞানের বিষয় নয়, অতএব ইন্দ্রিয় দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। স্বভাবতঃই ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে ব্রহ্ম, সম্বন্ধে নয়। ব্রহ্ম যদি ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় হইত, তবে একটি কার্য্য দেখিলেই উপলব্ধি হইত "এই কার্য্য ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ।" কিন্তু ইন্দ্রিয় সকল স্থূল কার্য্য মাত্র-গ্রহণেই সক্ষম। সেই কার্য্যের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ কি অন্য কাহারও সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহা নির্ণয় করা যায় না। এজন্যই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্র কোন অনুমানকে লক্ষ্য করে না, কিন্তু "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যকেই লক্ষ্য করে।" *

যদিও শঙ্কর অনুমান অথবা তর্ককে ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করেন না, তথাপি তিনি অনুমান বা তর্ককে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বিশেষ সহায় বলিয়া স্বীকার করেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের ন্যায় তিনিও বিশ্ব-রচনার কৌশল দৃষ্টে, স্রষ্টার জ্ঞানময় চৈতন্য-স্বরূপের অনুমান করিতেছেন (Teleology)। "রচনানুপপত্তেশ্চানুমানং" (ব্রহ্মসূত্র-অ-২।পা-১।সূ-১)। এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন:—"সাংখ্যেরা তর্ক করিয়া থাকেন, সংসারে ঘট এবং শরাবাদির মৃদাত্মকতার আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে তাহাদের রূপাদি-ভেদের নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী সাধারণ বস্তু মৃত্তিকা। সেইরূপে সংসারে বাহ্য এবং আধ্যাত্মিক যত প্রকার বস্তু-ভেদ আছে—তাহাদের সকলের সাধারণ ধর্ম্ম—সুখ, দুঃখ, এবং মোহাত্মকতার আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাদেরও নিয়ত-পূর্ব্ব-

বস্তুই সাধারণ ভক্ত সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক ত্রিগুণ 'প্রধান'। মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্তেই অনুমিত হয় যে তাহা স্বয়ং অচেতন হইয়া, চেতন জীবের পুরুষার্থ সাধনে প্রবৃত্ত।" সাংখ্যদিগের এই কথার উত্তরে শঙ্কর বলিতেছেন, দৃষ্টান্ত-বলে স্থির করিতে হইলে দেখা যায়—কুলাল বা কুম্ভকারাদি চেতন পুরুষ দ্বারা অধিষ্ঠিত না হইলে, অচেতন মৃত্তিকাদি পুরুষার্থ-সাধন-যোগ্য কোন পৃথক্ বস্তু-বিশেষ (বিকার) রচনা করে না। সংসারে দেখা যায়—গৃহ, প্রাসাদ, শয্যা, আসন, এবং বিহার-ভূমি প্রভৃতি সকলই প্রজ্ঞাবান্ শিল্পী দ্বারা সময়োচিত সুখ-প্রাপ্তি, এবং দুঃখ-পরিহারের উপযোগিতানুসারে রচিত হয়। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও দেখা যায় নানাকর্ম্মফল ভোগের উপযোগী। এই পৃথিব্যাদি বাহ্য এবং আধ্যাত্মিক পদার্থ সকল, এবং নানা-জাতীয় শরীরাদি, সকলই যথাস্থানে সন্নিবেশিত বিবিধ অবয়বযুক্ত,—নানাবিধ কর্ম্মফল ভোগের উপযোগী। এই দৃশ্য জগৎ-রচনা যাহা অতি বিখ্যাত প্রজ্ঞাবান্ শিল্পীরও কল্পনার অগোচর, অচেতন 'প্রধান' দ্বারা কিরূপে ভোগের উপযোগী। এই দৃশ্য জগৎ-রচনা যাহা অতি বিখ্যাত-প্রজ্ঞাবান্ শিল্পীরও কল্পনার অগোচর, অচেতন 'প্রধান' দ্বারা কিরূপে তাহা সম্ভব হইবে? অচেতন লোষ্ট্র-পাষাণাদিতে কখনও এরূপ রচনা-কৌশল দৃষ্ট হয় না। কুম্ভকারাদি প্রজ্ঞাবান্ শিল্পীদ্বারা অধিষ্ঠিত হইলেই মাত্র মৃত্তিকাদিতে বিশিষ্ট-আকার-যুক্ত রচনা দৃষ্ট হয়। অতএব সাঙ্খ্যোক্ত দৃষ্টান্ত অনুসারেই অচেতন 'প্রধানের' উপরে চেতন অধিষ্ঠাতা বা ঈশ্বরের প্রয়োজন হয়। এইরূপ বিচার শ্রুতির বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, বরং শ্রুতির অনুকূল। কারণ এইরূপ বিচার দ্বারা (Argument form design and adaptation) জগতের কারণ চৈতন্যময় পুরুষ বা ঈশ্বর বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। এইজন্যই সূত্র করা হইয়াছে:—"জগৎরচনা অনুপপত্তি অতএব জগৎকারণ অচেতন 'প্রধান', এরূপ অনুমান করা যায় না।"

শ্রীবিজয়দাস দত্ত।

রূপ ও গুণ।

১

গোধূলি সিন্দূর-মেঘ সুন্দর কেমন।
নাই কিন্তু গুণ লেশ তার;—
আঁখি ভুলি' মুহূর্ত্তে মিলায়,—
তা'র পর(ই) নিবিড় আঁধার!

২

প্রাবৃটের গাঢ়কৃষ্ণ অভ্র রূপহীন;
হৃদে, কিন্তু, কিবা গুণ ধরে!
বরষিয়া সুশীতল সলিল,
নিখিলের দাহ-তৃষা হরে!

আজ।

নয়নের দৃষ্টিমাঝে আছিলে যখন,
সশরীরী মূর্ত্তি তব পূজেছিনু তবে;
দৃষ্টির বাহিরে তুমি গিয়াছ এখন,
অশরীরী তোমা', অয়ি, পূজিতেছি এবে।
দেহের সম্বন্ধ আজ গিয়াছে ঘুচিয়া;
নিষ্কাম পূজি, গো, তোমা মৌনে অশ্রু দিয়া।

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

ঝুসি।

অনেক বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ছয়মাসকাল আমরা এলাহাবাদে বাস করিয়াছিলাম;—সেই সময়ই ঝুসি দেখিতে যাই।

ঝুসি পুরাতন প্রতিষ্ঠানপুরের ভগ্নাবশেষ বলিয়া কথিত। এক সময়ে এই খানেই চন্দ্রবংশীয় রাজাগণের রাজধানী ছিল,—পুরাণ-

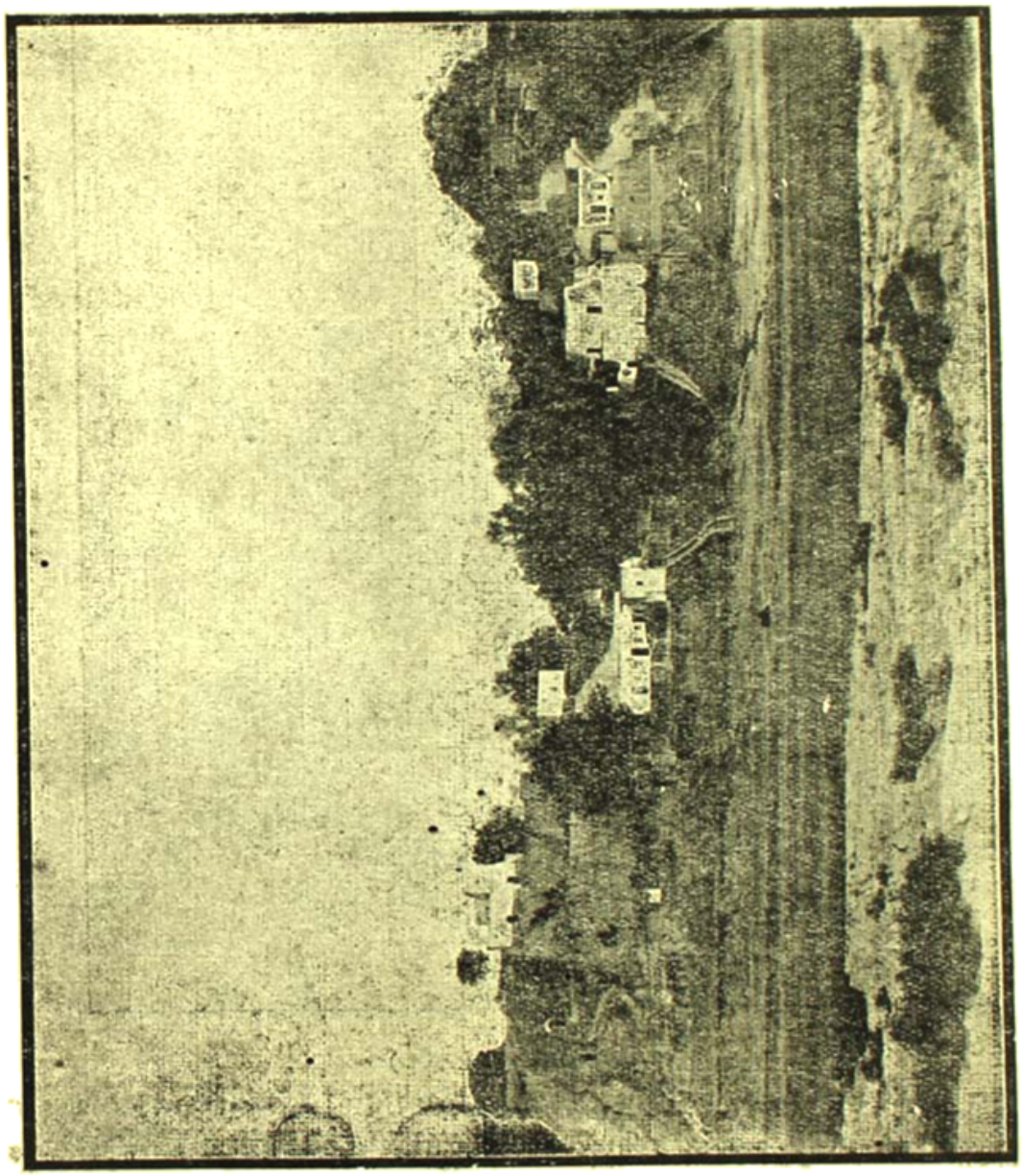

ঝুসির নবাব ও এলাহাবাদের কেল্লা।

প্রসিদ্ধ পুরূরবা রাজা নাকি এইখানেই বাস করিতেন। কালিদাস তাঁহার মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে সম্ভবতঃ এই প্রতিষ্ঠানপুরেরই উল্লেখ করিয়াছেন। অধিকদিন নহে মাত্র ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে রাজা কুমার গুপ্তের সময়ের ৪০টি মুদ্রা এখানে পাওয়া গিয়াছিল। কিম্বদন্তি এইরূপ

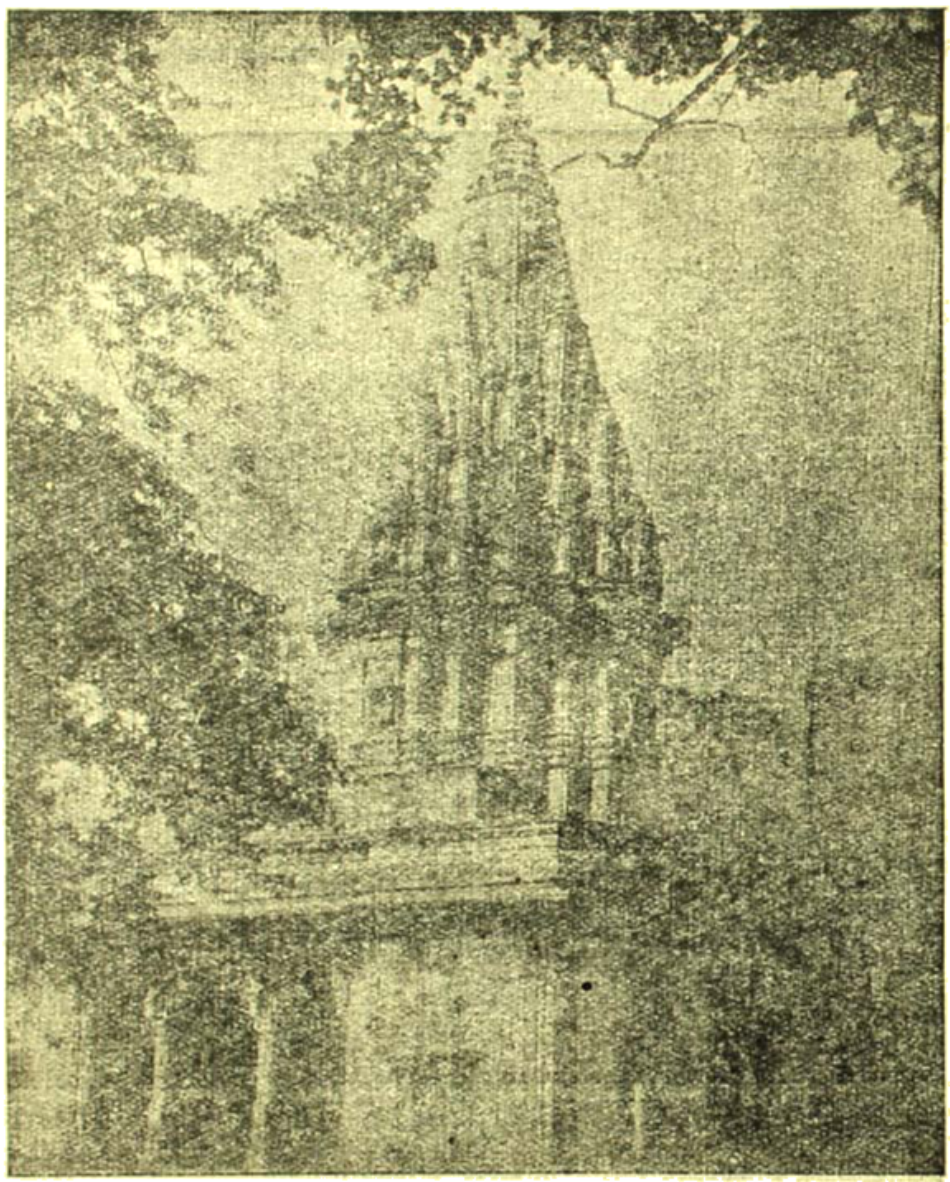

তেওয়ারিকা মন্দির (ঝুসি)

যে, হরঘোষ নামক একজন যুথ রাজার সময়ে এই প্রতিষ্ঠানপুরের অবনতি আরম্ভ হয়। তাঁহার রাজত্ব কালে নাকি মুড়িমিছরির আমল হইতে প্রতিষ্ঠানপুরের অবনতি আরম্ভ হয়। তাঁহার রাজত্ব কালে নাকি মুড়িমিছরির আমাদের হরচন্দ্রেরই একটেটিয়া, ক্রিন্তু এ দেশীয় প্রবাদ দেখিতেছি সেকথা মানিতে

চীন না। সুখের বিষয় এই, এ প্রবাদের বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছুই নাই। এ সম্বন্ধে ইতিহাস শুধু বলে—প্রতিষ্ঠান-পুরের অবনতিই প্রয়াগের উন্নতির কারণ। একদিকে ভাঙ্গন অন্যদিকে চর—প্রকৃতির নিয়মই এই।

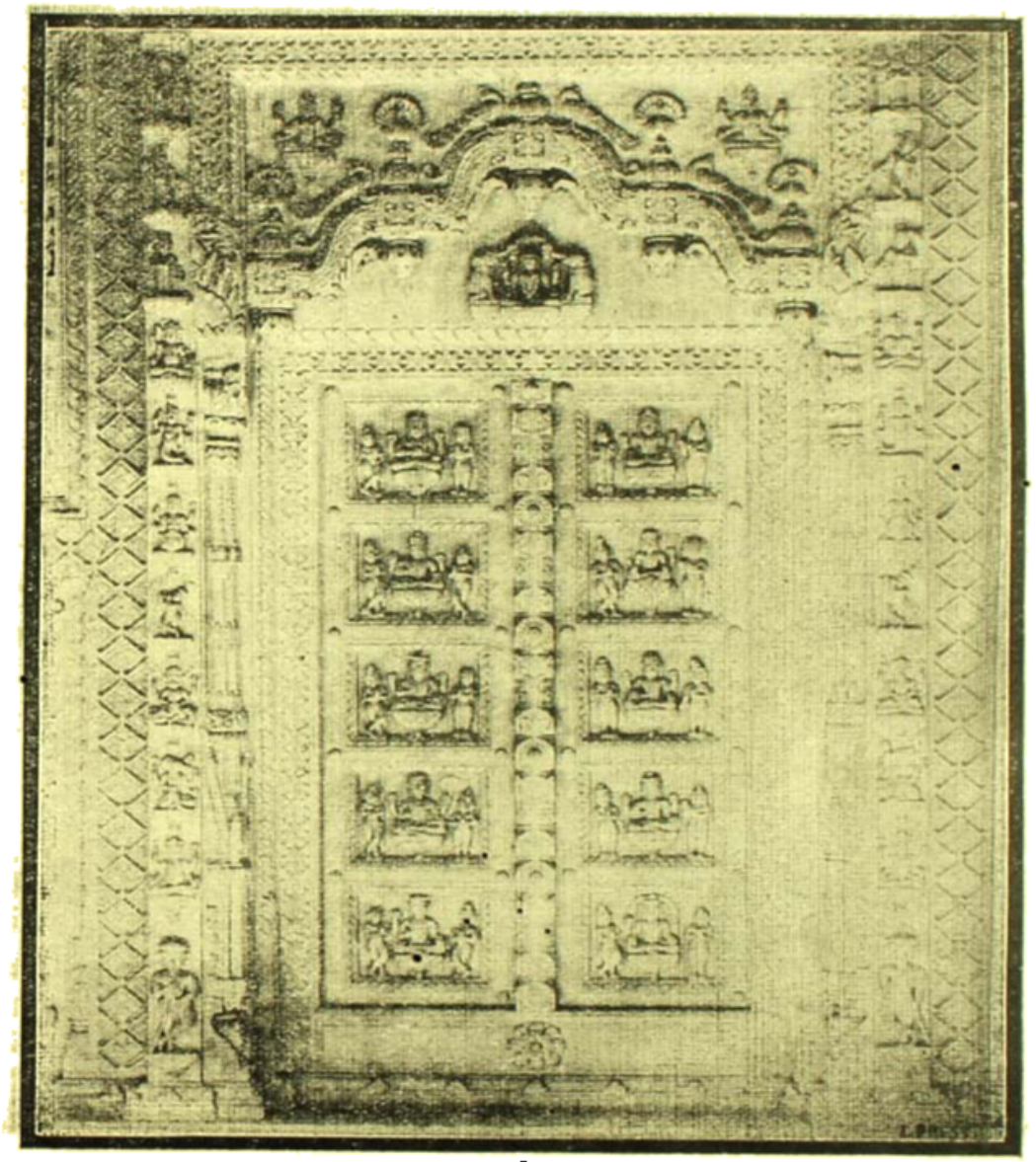

ভেণ্ডারিকা মন্দিরের দ্বার।

ঝুসি এলাহাবাদ হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। এলাহাবাদ হইতে নৌকায় ঝুসি গঙ্গার পর পারে—ফোর্টের ঠিক সম্মুখভাগে যাইতে হয়। নৌকা হইতে ইহার দৃশ্য কিরূপ

সুন্দর পাঠক, কুসির চিত্রে তাহার পরিচয় পাইবেন। কোন স্থানে ঐতিহাসিকপূর্ণ পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ, কোথাও কয়েকখানি কুটীরের ক্ষুদ্র গ্রাম পল্লী, কোথাও বা গাছপালার মধ্যে একটি সমুচ্চ মন্দির আর পাহাড়ের শিখর দেশে তীরোপিত সিঁড়ি-

কেওয়ারিকা মন্দিরে ভীমের মূর্ত্তি।

সংলগ্ন একটি দোতালা ক্ষুদ্র ইমারত অতি দূর হইতে নজরে পড়ে। এখানে একজন পরমহংস বাস করিতেন। আমরা তাঁহারই দর্শনে দুই তিন দিন কুসিতে গিয়াছিলাম। পরমহংসের বাসস্থানের অনতিদূরে

ভৈরবারিকা মন্দির। দেখিলাম বহু যতি করিতেছেন। পুরাতন বৈদিকগুলা সম্মুখে যেন সন্ন্যাসী দালানপূর্ণ করিয়া বসিয়া পুঁথি পাঠ মূর্ত্তিমন্ত বলিয়া বোধ হইল।

ভৈরবারিকা মন্দিরে অর্জ্জুনের মূর্ত্তি।

ঝুসির সমুদ্র গুপ্ত ও হংসগুপ্তের তাঁহাদের নামীয় দুইটি কূপ এখনো এখানে দুর্গ এখন ভগ্নাবশেষে পরিণত, কিন্তু বর্ত্তমান। সমুদ্রকূপের ছবি পূর্ব্বেই ভারতীতে

প্রকাশিত হইয়াছে; হংসকুপের উৎকীর্ণ লিপি এখানে প্রদত্ত হইল।

খুলি দর্শন করিয়া আমরা সদলবলে আবার নৌকায় আসিয়া উঠিলাম। নৌকা হইতে

কেওয়ারিকা মন্দিরে যুধিষ্ঠিরের মূর্ত্তি।

গলায় দুই পাশের দৃশ্য সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। একদিকে খুসির পাহাড় ক্রমশঃ অল্পে অল্পে অবনত হইয়া কিয়দ্দূরের সমতল হরিৎক্ষেত্রে শেষ হইয়াছে, অন্যদিকে সুদূর পর্ব্বতের এই সমতৈল

তীর আবার কিছু দূরে আসিয়া যমুনার তীরের সহিত মিলিয়াছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যপূর্ণ এই তীরদেশ দেখিলে সুখে দুঃখে উদাসীন

নিষ্কাম সন্ন্যাসীর গম্ভীর মূর্ত্তি মনে পড়ে। আর ঝুলির পরপারে গঙ্গার বেণীঘাটের প্রতি চাহিলে তাহাতে লোভ কলহময় একটি সংসার

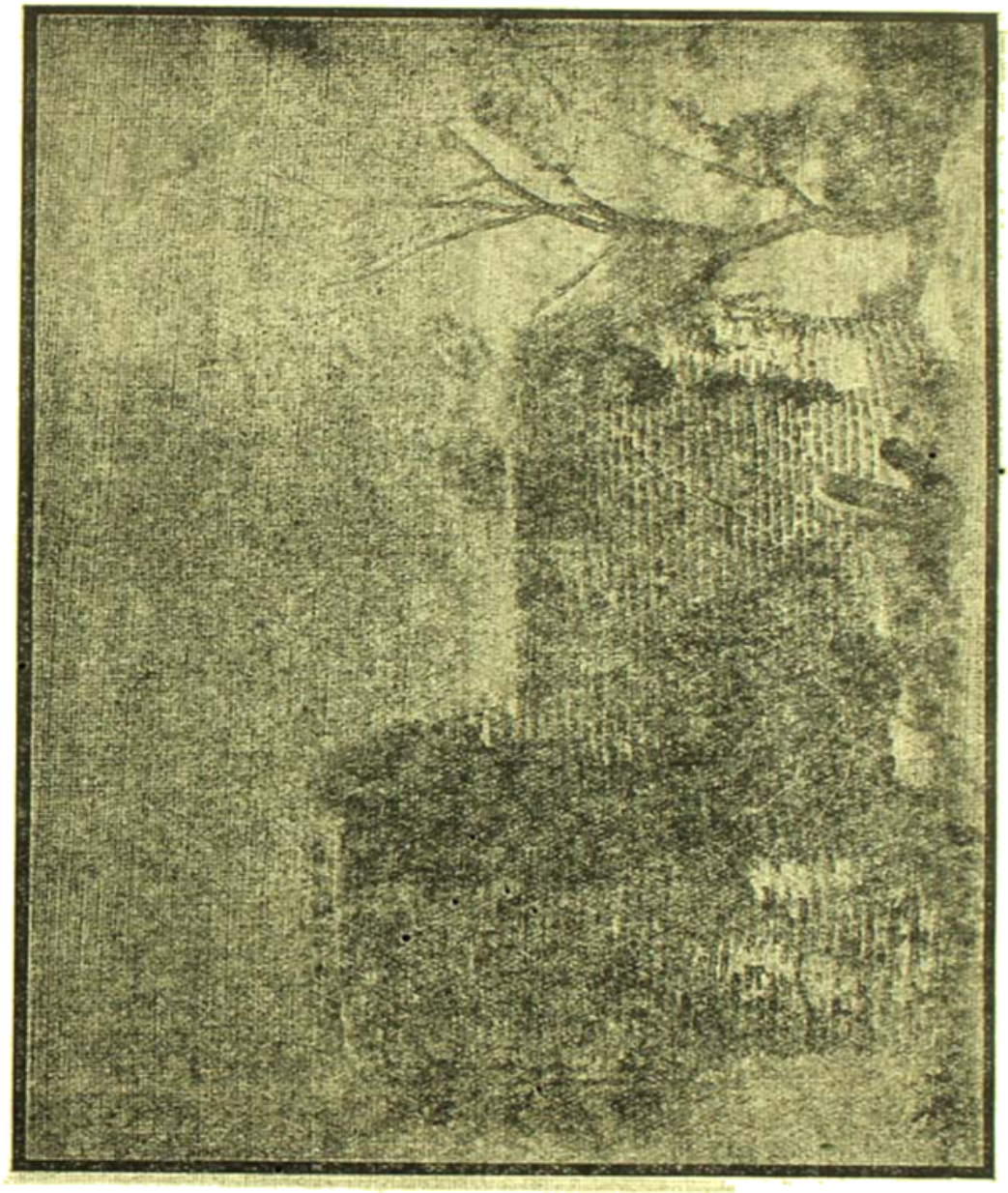

মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৃহৎ ঘাটটীর লোকে লোকে নিশানে নিশানে একাকার।

ভিন্ন ভিন্ন নিশান দেখিয়া লোকে নিজের নিজের পাণ্ডা ঠিক করিয়া লয়। সেই

মিশানের মাঝে মাঝে ও গঙ্গার জলময় কূলে কূলে সারি সারি শুষ্ক পাতা। গঙ্গাস্নান করিয়া কেহবা শুষ্কার উপর বসিয়া কোঁটা কাটিতেছে, কেহ কাপড় ছাড়িতেছে, কেহ পূজাআহ্নিক করিতেছে, কেহবা শুষ্কাতে বসিয়া নীচের জল তুলিয়া তুলিয়া স্নান করিতেছে।

হংসকূলে উৎকীর্ণ প্রস্তর ফলক।

আর গঙ্গারজলে ত সারবন্দী লোকের কথাই নাই।

গঙ্গার ঠিক ধারে—এমন কি জলের উপরেও মাঝে মাঝে এক একখানা

অন্যান্য বস্ত্রালয়ের আটচালা দেখিলাম, শুনিলাম তাহার একখানিতে সেরাজপুরের রাণী মকদ্দমা করিতে আসিয়া কয়দিন কি ভোগিয়াছিলেন।

তীরে নানারকমের দোকান। নিশানের মাঝে মাঝে এক একটা বড় বড় তালপাতার ছাতির নীচে পাণ্ডারা এক একটা মাটীর ঢিবি ও পাথরের ঢিবিকে রংচঙে কাপড়ে ঠাকুর সাজাইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়াছে। যাত্রীদের এই সমস্ত মূর্ত্তিকেই দক্ষিণা দিয়া যাইতে হয়। ইহা ছাড়া সভাকার দোকানঘর ও দেবদেবীর মূর্ত্তি ত অসংখ্য। যখন বর্ষাকালে এই তীর জলে ডুবিয়া যায় তখন পাণ্ডারা উপরে কোটে যাইবার উচ্চ রাস্তার ধারে দোকান তুলিয়া আনে। বর্ষাকালে ঠিক এই রাস্তার নীচে পর্য্যন্ত জল আসে। এখন গঙ্গা রাস্তা হইতে অনেক দূরে।

নৌকা হইতে নামিয়া এই রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, সম্মুখে নীচে সুদূর প্রসারিত বালির চড়া ধূ ধূ করিতেছে, আর সেই বিশালচড়ার একপাশে অতি দূরে একটি সূক্ষ্ম রেখার মত গঙ্গা বাঁকিয়া বাঁকিয়া যমুনার সহিত মিশিয়াছে। এই সঙ্গমগঙ্গা দেখিলে তাহাকে গঙ্গা মনে হয় না:—সে যেন গঙ্গার একখানি ছায়া আর তার চারিদিকে সন্ধ্যার হেমাভপূসর বর্ণোজ্জ্বল দিক্‌বিদিক্ যেন একটা কাল্পনিক চিত্রার্পিত দৃশ্য বলিয়া বিভ্রম ঘটে।

চয়ন।

ভারতে নাট্যের উৎপত্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নাটকের প্রথম উল্লেখ।

ললিতবিস্তার ও অবদান-শতকের যে অংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে নাটকের যে উল্লেখ আছে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। চীনদেশীয় তালিকা-অনুসারে, ললিতবিস্তার চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধভাগে, এবং অবদান-শতক খৃষ্টীয়যুগের ২২৩ ও ২৫৩ অব্দের মধ্যে চীনীয় ভাষায় অনূদিত হয়। (১) চীনীয় ঐতিহ্যের প্রামাণিকতা ও মূল্য সম্বন্ধের বিষয় হইলেও ইহা নিশ্চিত যে উক্ত দুই গ্রন্থ বিক্রমাদিত্য-যুগের ও সংস্কৃত প্রাচীন নাটকগুলির পূর্ব্ববর্ত্তী। যদি M. Weber ও M. Senart-এর নির্দ্ধারিত (২) কাল স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে "হালের" সাক্ষ্য অনুসারেও আমরা তৃতীয় শতাব্দীতে উপনীত হই। "প্রাকৃতের সঙ্কলন" যাহা হাল-প্রণীত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, সেই সঙ্কলন-গ্রন্থের ৩৪৩ শ্লোকে (৩) একটা নাটকে, নাটকীয় পূর্ব্বরঙ্গের সহিত (৪)

Bunyin Nanjio চীনীয় ত্রিপিটক।

Das Saptacakam des Hala. ed. Weber. p. XXIII. Senart. II, 527.

Ed. Weber—293 of Bhubanpala.

Bal-Nadan—Pubbaramgassa; মল্লপক II ৩১ দ্রষ্টব্য।

প্রেমের তুলনা করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী আর এক গ্রন্থ আমাদিগকে প্রাচীন যুগের প্রবেশ দ্বারে লইয়া যায়। ইহা মহাভারতের অন্তর্গত খিল হরিবংশ। হরিবংশে সুবন্ধু কর্ত্তৃক (ষষ্ঠ শতাব্দী) উল্লিখিত হইয়াছে। যাহাতে দার্থবাক্যের ছড়াছড়ি,—তাঁহার সেই বাসবদত্তা-গ্রন্থে উক্ত কাব্যের নাম লইয়া একটা দার্থবাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণের অদ্ভুত কীর্ত্তি-কলাপই এই হরিবংশের বিষয়। গ্রন্থকার উহাতে, বিবিধজাতীয় নাট্যাভিনয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন। নাট্যকলার ঐতিহাসিকগণকে তজ্জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে।

অরিষ্টের মৃত্যুর পর, কৃষ্ণের প্রজাবৃন্দ সমুদ্রযাত্রা উপলক্ষে উৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়; এবং এই উৎসব উপলক্ষে বিবিধ নাট্যাভিনয় (৫) অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্য গীতে নিপুণা নাগরীগণ যাদবদিগের চিত্ত হরণ করিল। সুললিত ভাবভঙ্গী ও আতোদ্য সহকৃত উহাদের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া উহারা প্রমত্ত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণ ইতিপূর্ব্বে সুবের ও ইন্দ্রের প্রাসাদ হইতে, পঞ্চচূড়ায় ভগিনীদিগকে আনাইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "তোমরা যথাসাধ্য নিপুণতার সহিত দর্শকদিগের নিকট নৃত্যগীত বাদ্য ও অভিনয় প্রদর্শন করিবে....." এবং হ্রদের জলরাশি একটি সমগ্র ভূখণ্ডের ন্যায় যাহাদিগকে ধারণ করিয়াছিল, সেই অপ্সরাগণ গীতবাদ্য করিতে লাগিল, এবং তাহারা স্বর্গে যেরূপ অভিনয় করিত সেই রূপ নাট্যাভিনয় প্রদর্শন করিল। এই নাট্যাভিনয়ের পর আবার অন্যান্য বিনোদ-ব্যাপার সম্পন্ন হইল। তাহার পর বলরামের উদ্দেশে অপ্সরাগণ দ্বিতীয়বার উৎসব আমোদ করিবার জন্য আগমন করিল:—"কেহ কেহ বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল, কেহ বা গান করিতে লাগিল এবং তাহাদের ভাবভঙ্গী দর্শন করিয়া, দর্শকেরা মুগ্ধ হইল.....; পরে সেই দেশের ভাষা, ভাবভঙ্গী ও পরিচ্ছদ অবলম্বন করিয়া, রাস-মণ্ডলের ধরণে (কৃষ্ণের উদ্ভাবিত মণ্ডলাকার নৃত্য) নৃত্য করিতে লাগিল...; পরে নৃত্য করিতে করিতে উহারা কংস ও প্রলম্বের মৃত্যু ও চাণুরার পতন—এই সমস্ত রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতে লাগিল... (মূল গ্রন্থে এই স্থলে কৃষ্ণের অদ্ভুত কার্য্যপরম্পরা বর্ণিত হইয়াছে।) শ্রোতৃমণ্ডলীকে আমোদ দিবার ভার নারদমুনি গ্রহণ করিলেন; জটাজাল চূড়াকারে বন্ধন করিয়া, ব্রাহ্মণ একলম্ফে দর্শকদিগের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন; এবং সং-এর মত ভাবভঙ্গী করিয়া, উদ্ভট ধরণে ব্যক্তি বিশেষের নকল করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে খুব হাসাইতে লাগিলেন; তিনি সত্যভামার, কৈশবের, অর্জ্জুনের, বলদেবের, রেবত-নন্দিনী রাজকুমারীর নকল করিতে লাগিলেন, তাহাদিগকে লইয়া উপহাস করিতে লাগিলেন; তাহাদের ভাবভঙ্গী, তাহাদের সাজসজ্জা বর্ণনা করিয়া দর্শকবৃন্দের হাস্যোৎপাদন করিলেন।" পরে, যাদবেরা ভোজন-শালায় গিয়া ভোজনে ব্যাপৃত হইলেন; ভোজনান্তে অপ্সরাগণ আবার নৃত্যগীত আরম্ভ করিল।

কিন্তু এই সকল অভিনয় গীতমিশ্র নৃত্য

(৫) ৮৮ ed. Bombay.

নাট্যের লক্ষণাক্রান্ত। আর একটি উপাখ্যানে —বজ্রনাভের মৃত্যু সম্বন্ধীয় উপাখ্যানে, আমরা প্রকৃত নাটকাভিনয়ের পরিচয় পাই। তপস্যার পুরস্কারস্বরূপ দানব বজ্রনাভ ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করিয়া প্রায় অজেয় হইয়াছেন। স্বকীয় পরাক্রমের গর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া তিনি ইন্দ্রকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। ইন্দ্র কৃষ্ণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। "এই সময়ে কৃষ্ণের পিতা বসুদেব একটা যজ্ঞ করিতেছিলেন, এই যজ্ঞোৎসবে ভদ্র নামক একজন নট সভাস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে সুনাট্যের ("সুনাট্যেন") দ্বারা মুগ্ধ করিলেন। মুনিগণ পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমি কী বর চাও? ইন্দ্র সদৃশ ভদ্র তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া বলিল; আমি এই বর চাই সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলী আমার অভিনয়ের রসাস্বাদন করেন এবং আমি সপ্তদ্বীপ ভ্রমণ করিতে সমর্থ হই। আরও আমি ইচ্ছা করি, মৃত কি জীবিত যে কোন ব্যক্তি হউক না কেন, যথাযোগ্য বেশ ধারণ করিয়া আমি ঠিক তাহার অনুরূপ হইতে পারি।" ব্রাহ্মণগণ উত্তর করিলেন,—"তথাস্তু।" তখন ইন্দ্র স্বর্গের একটি হংসীকে বজ্রনাভের প্রাসাদে প্রেরণ করিলেন। দানব এই অপূর্ব্ব হংসীকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। হংসী, নটরাজ ভদ্রের গুণ কীর্ত্তন করিল। বলিল, ত্রিলোক তাহার গুণে মুগ্ধ। বজ্রনাভ দলবল সমেত ভদ্রকে লইয়া আসিবার জন্য হংসীকে অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন, দানবের রাজধানীতে প্রবেশ লাভ করিবার উদ্দেশে, ভদ্রবেশে সবান্ধবে যাত্রা করিলেন। প্রদ্যুম্ন নায়ক সাজিলেন; সাম্ব বিদূষক সাজিলেন; গদ পারিপার্শ্বিক সাজিলেন; এবং অন্যান্য ব্যক্তি অন্যান্য ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। নৃত্যগীতবাদ্যে নিপুণা রূপসী বারাঙ্গনাগণ নটী হইলেন। "নটগণের আগমনে, নগরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। উহারা প্রভূত সম্মান ও উপহার প্রাপ্ত হইল।" উহারা ("নাটকীকৃত") মহাকাব্য রামায়ণের উপাখ্যান অভিনয় করিল। রাবণের বধের জন্য ধরাতলে বিষ্ণুর জন্ম এবং যেরূপ লোমপাদ ও দশরথ শান্তার নিমিত্ত গণিকাগণ দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়ন করিয়াছিলেন সেই বিষয়টি অভিনীত হইল। সেই অভিনয়ে নটেরা রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তার এরূপ অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়াছিল যে, তৎকালের বৃদ্ধ দানবগণও বিস্মিত হইয়াছিল এবং রূপ তুল্যতার বিষয় বারংবার বলিয়াছিল। তাহাদের বেশধারণ, অভিনয় প্রস্তাবনা এবং প্রবেশাদি দেখিয়া দানবগণ সকলেই বিস্মিত হইল। সেই অসুরেরা নাট্যের বিশেষ বিশেষ অভিনয় স্থলে পরম প্রীত হইয়া বিস্ময়সহকারে বারংবার উত্থিত হওত হর্ষসূচক শব্দ করিতে লাগিল……এই অভিনয়ের পর নটেরা শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রস্তাবিত অন্যান্য নাটকের অভিনয় করিয়া অসুর ও মুনিগণের মনোরঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। আবার বজ্রনাভও উহাদের অভিনয় দর্শন করিবার জন্য অভিলাষী হইলেন। সেই সময়ে মহাকালের উৎসব হইতেছিল। বজ্রনাভ একটা নাট্যশালা নির্ম্মাণ করাইয়া, সেইখানে ঐ নট-সম্প্রদায়কে অভিনয় করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তখন নটবেশধারী যাদবগণ সজ্জিত হইয়া অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইল। তাঁহারা প্রথমত কাংস্যতাল বেণু মুরজ প্রভৃতি আতোদ্য বাদন

করিলেন। তৎপরে যাদবগণআনীত নারীরা বসন্তাদি রাগসহযোগে রাগান্তরমিশ্র শুভ গঙ্গাবতরণ সুস্বরে গান করিল। রুক্মিণীনন্দন নাস্তে শোভন অভিনয়ান্বিত গঙ্গাবতরণাশ্রিত শ্লোক সম্যক্ গান করিলেন। তৎপরে রম্ভাভিসার নামক কৌবের নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল। শূর রাবণের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন; এবং প্রদ্যুম্ন নলকুবর ও শাম্ব তাঁহার বিদূষক হইলেন। যদুনন্দনগণ মায়ার দ্বারা কৈলাস নির্ম্মাণ করিলেন। ক্রুদ্ধ নলকুবর কর্ত্তৃক দুরাত্মা রাবণ যেরূপ প্রতিশপ্ত ও রম্ভা যেরূপ সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল তাহা অভিনীত হইল। যদুনন্দনগণ নারদ প্রণীত এই প্রকরণ অভিনয় করিলে দানবেরা যাদবদিগের নৃত্য ও অভিনয়ে পরম পরিতুষ্ট হইল।

মহাভারত ও রামায়ণের যে দুই স্থলে নাটক শব্দের উল্লেখ আছে সেই দুই স্থলের শ্লোক কোন্ সময়ে রচিত তাহা অনিশ্চিত এবং তাহার ভাবার্থও অতীব অস্পষ্ট—সুতরাং নাট্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে উহার দ্বারা সবিশেষ কোন জ্ঞান লাভ হয় না।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

লানমো (রামগ্রাম)

লানমো রাজ্য অনেক দিন হইতেই পরিত্যক্ত ও জনশূন্য অবস্থায় রহিয়াছে। ইহার সীমা নির্ণয় করা যায় না। নগরগুলির ধ্বংসাবস্থা এবং অল্পলোকই তথায় বাস করে।

প্রাচীন রাজধানীর দক্ষিণ পশ্চিমে একশত ফুটের কিছু কম উচ্চতাবিশিষ্ট একটী ইষ্টক স্তূপ আছে। পুরাকালে, তথাগতের নির্ব্বাণের পর, এই দেশীয় এক রাজা তথাগতের শরীরের অংশবিশেষ প্রাপ্ত হন ও দেশে প্রত্যাগমন করিয়া এই স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। এই স্থানে অত্যাশ্চর্য্য চিহ্ন দেখা যায় এবং মধ্যে মধ্যে ঐশ্বরিক আলো জ্বলিতে থাকে।

স্তূপের নিকটেই বৃক্ষ বারিপূর্ণ একটি হ্রদ। কখনও কখনও একটী সর্প হ্রদ হইতে বহির্গত হইয়া এই স্থানে ভ্রমণ করে এবং সর্প দেহ পরিবর্ত্তন করিয়া স্তূপ প্রদক্ষিণ করে। বহু হস্তীযূথ এই স্থানে সমাগত হইয়া পুষ্প সংগ্রহ করিয়া এই স্থানে বিকীর্ণ করে। অনৈসর্গিক ক্ষমতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহারা প্রথম হইতেই এইরূপ করিতেছে। পুরাকালে যখন রাজা অশোক পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ নির্ম্মিত স্তূপ সকল হইতে বুদ্ধদেবের শরীর চিহ্ন লইয়া নূতন স্তূপ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন তখন তিনি এই দেশে আগমন করিয়া এই স্তূপের অভ্যন্তরস্থ চিহ্ন লইবার জন্য প্রস্তুত হন। ইহাতে মন্দির অপবিত্র হইবে মনে করিয়া, সর্প ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া; রাজহস্তীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ও রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল, মহারাজ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আপনার যথেষ্ট আসক্তি দেখা যায় এবং আপনি যথেষ্ট ধর্ম্মার্জ্জনও করিয়াছেন। আপনি কিছুক্ষণের জন্য শকটের গতি প্রতিরুদ্ধ করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার আবাসে আগমন করুন।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার আবাস কোথায়? ইহা কি নিকটে?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "আমি এই হ্রদের নাগরাজ। আমি শুনিয়াছি মহারাজ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া আরও ধর্ম্মার্জ্জন করিতে ইচ্ছুক, সেই জন্য আমি আমার আবাসস্থল দর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করিতে সাহসী হইয়াছি।" রাজা নিমন্ত্রিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নৈত্যাবাসে প্রবেশ করিলেন এবং কিছুক্ষণ তথায় উপবেশন করিলে পর,

নাগ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিল "আমার অপকর্ম্মের জন্য আমি নাগদেহ প্রাপ্ত হইয়াছি; বুদ্ধের এই শরীর চিহ্ন পূজা করিয়া আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দোষ ক্ষালন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। রাজা যেন নিজেই অনুগ্রহ করিয়া শরীর-চিহ্নগুলি দর্শন করিয়া পূজা করেন।" রাজা অশোক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভীত হইয়া বলিলেন, "মনুষ্যের মধ্যে আমি এরূপ পূজোপকরণ কোন দিনও দেখি নাই।" নাগ উত্তর করিলেন "যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে রাজা যেন স্তূপ বিনষ্ট করিতে না ইচ্ছা করেন।" রাজা যখন দেখিলেন যে তিনি নাগের সমকক্ষ হইতে পারিবেন না, তখন তিনি স্তূপ উন্মোচনে বিরত হইলেন। সেস্থানে নাগ হ্রদ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তথায় উপরোক্ত বর্ণে এক খোদিত লিপি আছে।

এই স্তূপের অনতিদূরেই একটী সঙ্ঘারামে কয়েকজন যতি বাস করেন। তাঁহারা বিনয়ী ও অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু। একজন প্রবীণ সঙ্ঘের সকল কার্য্য সম্পাদন করেন। দূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে কোন ব্যক্তি আগমন করিলে তাঁহারা বিশেষ ভদ্রতা ও মধুরতার সহিত তাঁহাকে পরিচর্য্যা করেন; তিন দিবস তাঁহাকে নিকটে রাখেন ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রদান করেন।

প্রাচীন কিম্বদন্তি এইরূপ। পুরাকালে কয়েকজন ভিক্ষু দূরদেশ হইতে এই স্তূপ পূজার্থে এইস্থানে আগমন করিতে অভিলাষী হন। এইস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা এক হস্তীমুখ দেখিতে পান। তাহাদের কোনটী মস্তে করিয়া লতাপাতা ও বিভিন্ন প্রকারের ফুল আনিয়াছিল কেহ শুণ্ডদ্বারা জল বিকীর্ণ করিতেছিল; এবং সকলেই স্তূপকে পূজা করিতেছিল। ভিক্ষুরা এই দৃশ্যে অত্যন্ত প্রীত ও মোহিত হইলেন। তাহাদিগের একজন এই স্থানে জীবন অতিবাহিত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া অপর ভিক্ষুকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "এইস্থানে যে সকল জিনিষ প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহার তুলনায় আমার বহুবৎসরের পরিশ্রম অতি সামান্য। এই স্তূপে বুদ্ধদেবের শরীর চিহ্ন থাকা প্রযুক্ত ইহার অত্যাশ্চর্য্য ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলে হস্তীমুখ আকৃষ্ট হইয়া এই স্থানে জল বিকীর্ণ করে। এইস্থানে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিয়া হস্তিগণ যে মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, সেই মোক্ষলাভ করিতে পারিলে প্রভূত আধ্যাত্মলাভ করিতে পারিব।" তাহারা উত্তর করিল এই প্রস্তাব অত্যন্ত সমীচীন; তবে, আমাদিগের পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে; সুতরাং এইস্থানে থাকিয়া তুমি মঙ্গলজনক কার্য্য করিতে থাক এবং সদ্ধর্ম্মের সাধন ব্যতীত কিছুতেই বিরত হইও না।"

তখন তিনি অন্যান্য ভিক্ষুগণের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া, জীবনের অবশিষ্টাংশ নির্জ্জন বাসে অতিবাহিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন এবং সময়োপযোগী মূল সংগ্রহ করিয়া ও সেই স্থানের আবর্জ্জনা দূরীভূত করিয়া মন্দির সুশোভিত করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে তিনি অনেক দিন ধরিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন।

নিকটবর্ত্তী রাজন্যবর্গ তাঁহার ইতিহাস শুনিয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতে লাগিলেন; নিজেদের ধন ও মণিমুক্তা দ্বারা একত্রে ঐ সঙ্ঘারাম স্থাপন করিলেন। পরে, তাঁহারা ঐ ভিক্ষুকে এই সঙ্ঘারামের ভারার্পণ করিলেন। সেই সময় হইতে বিনয়প্রতিষ্ঠকে একজন প্রবর এই মঠের অধ্যক্ষতা করিতেছেন।

এই মঠ হইতে পূর্ব্বদিকে ২০০ শত লি যাইয়া এক বৃহৎ বন মধ্যে আমরা রাজা অশোক নির্ম্মিত এক বৃহৎ স্তূপে উপস্থিত হই। এই স্থানেই রাজপুত্র সপত্ন পরিত্যাগ করিয়া নিজ মূল্যবান বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া ও কণ্ঠহার দূরীভূত করিয়া সারথিকে গৃহে প্রত্যাগমনের আদেশ প্রদান করেন। যখন রাত্রিতে সপত্ন পার হইয়া রাজপুত্র উষাকালে এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক স্বকার্য্যসাধনে কায়মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কাষায় পরিত্যাগ করিয়া আমি এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এই স্থূপে আমি আমার পৃথল উন্মোচন করিয়াছি;" এই স্থানেই তিনি তাঁহার

রথত্যাগ করিয়া, ও মুকুটের মণি উন্মোচন করিয়া সারথিকে আদেশ করিলেন "এই মণি আমার পিতার নিকট লইয়া যাইয়া তাঁহাকে বল যে, আমি তাঁহার অবাধ্য হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিতেছি না কিন্তু আমি তাঁর রিপু বিসর্জন দিতে ও অনিত্যের কবল বিমুক্ত করিতে সংসার পরিত্যাগ করিতেছি।

তখন ছন্নক উত্তর করিলেন "আলোকীভূত অবনীতে আমি কি প্রকারে প্রত্যাবর্তন করিব?" রাজপুত্র সারথিকে প্রবোধ দিলে, সারথি সকল বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়া দুঃখে প্রত্যাগমন করিল।

স্তূপের পূর্ব্বদিকে যে স্থান হইতে ছন্নক প্রত্যাগমন করিয়াছিল তথায় একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষ আছে। উহার শাখা প্রশাখা নাই, কেবলমাত্র কাণ্ডই রহিয়াছে। ইহার পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র স্তূপ। এই স্থানেই রাজপুত্র নিজ কেশ কর্ত্তন পূর্ব্বক মূল্যবান পরিচ্ছদ ও প্রসাধনাদি, সমর্পিত মূল্যবান অঙ্গরাগ ত্যাগ করিয়া দুগচর্ম্ম পরিধান করিয়াছিলেন। তত্রাপি তাঁহার পরিধানে একটী মূল্যবান ঐশ্বরিক পরিচ্ছদ ছিল। তিনি ভাবিলেন এই পরিচ্ছদেও আমার আবশ্যক নাই, ইহা কি প্রকারে পরিবর্ত্তন করিব।" এই সময়ে এক শুদ্ধবাস দেব মৃগচর্ম্মপরিবৃত ব্যাধের আকারে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিজ ভীর ও ধনু উত্তোলন করিলেন। রাজপুত্র নিজ পরিচ্ছদ উত্তোলন করিয়া বলিলেন "আমি তোমার সহিত পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে চাই। তুমি পরিবর্ত্তনে সম্মত হইলে বিশেষ সুখী হইব। ব্যাধ এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল। রাজপুত্র নিজ পরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া উহা ব্যাধকে দান করিলেন। ব্যাধ ইহা গ্রহণ করিয়া পুনরায় দেবদেব ধারণ পূর্ব্বক পরিচ্ছদ সহ আকাশমার্গে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই স্মারক স্তূপের পার্শ্বেই, রাজা অশোক নির্ম্মিত একটী স্তূপ আছে। এই স্থানে রাজপুত্র নিজ মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন। রাজপুত্র ছন্নকের হস্ত হইতে ছুরিকা লইয়া স্বয়ং চুল কর্ত্তন করিয়াছিলেন। দেবতাধিপতি শক্র পূজার্থ এই কেশ নিজ স্বর্গীয় প্রাসাদে লইয়া গিয়াছিলেন। এই সময়ে এক শুদ্ধবাস দেব ক্ষৌরকারের বেশ ধারণ করিয়া ও রত্নে ক্ষুর লইয়া রাজপুত্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজপুত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি মস্তক মুণ্ডন করিতে পার? তুমি কি অনুগ্রহ করিয়া আমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিবে?" আদিষ্ট হইয়া ক্ষৌর-কারবেশী দেব রাজপুত্রের মস্তক মুণ্ডন করিলেন।

রাজপুত্র কত বয়সে নগর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ও সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কেহ কেহ বলেন যে সে সময়ে যোবিনত্ব উপবিংশ বর্ষীয় ছিলেন; কেহ বলেন যে তখন তাঁহার বয়স একত্রিংশ বৎসর ছিল এবং বৈশাখ মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধের অষ্টম দিবসে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

মস্তকমুণ্ডনের স্মারকস্তূপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে এক মরুভূমির মধ্যস্থলে আমরা একটী ভাগ্রোধ বৃক্ষে উপস্থিত হই। তথায় ৩০ ফুট উচ্চ একটী স্তূপ আছে। পুরাকালে তথাগতের মৃত্যুর পর যখন তাঁহার শরীরচিহ্ন বিভক্ত হইয়াছিল তখন ব্রাহ্মণগণ কোন অংশ না পাইয়া শ্মশানে উপস্থিত হইয়া কয়লা ও ভস্ম নিজ দেশে লইয়া যায় এবং তাহাদেরই উপরে এই স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে। সেই সময় হইতে এই স্থানে অনেক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে; ভক্তব্যক্তিগণ এই স্থানে আসিয়া প্রার্থনা ও পূজা করিয়া আরোগ্য লাভ করে।

চিকিৎসক স্তূপের নিকটেই একটী প্রাচীন সঙ্ঘারাম আছে; এই স্থানে পূর্ব্ববর্ত্তী চারি জন বুদ্ধের ভ্রমণ ও উপবেশনের চিহ্ন আছে। এই মঠের উত্তর পার্শ্বেই অনেক গুলি স্তূপ আছে; তন্মধ্যে রাজা অশোক নির্ম্মিত স্তূপটীই বৃহৎ। যদিও এইক্ষণ ভগ্ন হইয়াছে, তত্রাপি ইহা উচ্চে প্রায় ১০০ শত ফুট।

এই স্থান হইতে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া, বৃহৎ বন পার হইয়া বজ্রবতী, হস্তীযূথ ও মহাযানে পূর্ণ রাস্তা দিয়া আমরা কুশীনগরে উপস্থিত হই।

কুশীনগর।

এই দেশের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে; নগর ও গ্রাম জনশূন্য ও পরিত্যক্ত। প্রাচীন রাজধানীর

ইষ্টকনির্ম্মিত ভিত্তি প্রায় ১০ ফি থাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। জনসংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং নগরের রাজপথ জনশূন্য। রাজধানীর উত্তর-পূর্ব্ব কোণের সিংহদ্বারে রাজা অশোক নির্ম্মিত একটী স্তূপ আছে। এই স্থানেই জনকের গৃহ ছিল। মধ্যস্থলে বুদ্ধদেবকে পূজা করিবার জন্য যে স্তূপ খনন করা হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমানেও রহিয়াছে। যদিও বহু বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, তত্রাপি ইহার জল মিষ্ট ও পবিত্র।

নগরের ৩।৪ লি উত্তর পশ্চিমে, হিরণ্যবতী নদীর পশ্চিম পার্শ্বে আমরা শালবনে উপস্থিত হই। এই বনে অদ্যাপি ৪টী শাল বৃক্ষ আছে; বুদ্ধদেব এই স্থানেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এই স্থানে ইষ্টক নির্ম্মিত একটী বৃহৎ বিহার আছে; তথায় বুদ্ধের নির্ব্বাণের একটী চিত্র আছে। মস্তক উত্তর দিকে করিয়া তিনি শায়িত আছেন; দেখিলে বোধ হয় তিনি নিদ্রিত। এই বিহারের নিকটেই রাজা অশোক নির্ম্মিত একটী স্তূপ; যদিও ভগ্নদশায় তত্রাপি ইহা এইক্ষণও প্রায় ২০০ ফুট উচ্চ। ইহার সম্মুখে একটী প্রস্তর স্তম্ভে তথাগতের নির্ব্বাণের কথা উল্লিখিত আছে; যদিও ইহার উপর খোদিত লিপি আছে, তথাপি ইহাতে কোন সাল বা তারিখ লেখা নাই।

প্রচলিত প্রবাদানুযায়ী তথাগত অশীতিবর্ষ বয়সে বৈশাখ মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধের পঞ্চদশ দিবসে নির্ব্বাণ লাভ করেন। আমাদের হিসাবানুযায়ী ইহা ফাল্গুন মাসের পঞ্চদশ দিবসে পড়ে। কিন্তু সর্ব্বস্তিবাদিগণ বলেন যে তিনি কার্ত্তিক মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধের অষ্টম দিবসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহা আমাদের নবম মাসের অষ্টম দিনে পড়ে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পর হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গণনা করে। কেহ বলেন যে ইহা ষাদশশত বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, কেহ ১৩০০, কেহ ১৫০০; কেহ বলেন যে নির্ব্বাণের পর নবশত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে কিন্তু সহস্র বৎসর অতিবাহিত হয় নাই।

বিহারের নিকটেই একটী স্তূপ। এইস্থানে যোবিদত্ত বর্ষাচেরণকালীন পক্ষীদের দলাধিপতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়াছিলেন। পুরাকালে এইস্থানে এক বন ঘন ছিল এবং ঐ বনে অনেক জন্তু ও পক্ষী নিজ নিজ কুলায় বা গহ্বরে বাস করিত। অকস্মাৎ চতুর্দ্দিক হইতে এক প্রবল ধূমরাশি বহিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এই সময়ে একটী পক্ষী করুণাপরবশ হইয়া জলে অবগাহন পূর্ব্বক ও পরে ঊর্দ্ধদেশে উড্ডীয়মান হইয়া নিজ পালকের জল অগ্নির উপর ছিটাইতে লাগিল। ইহাতে দেবাধিপতি শক্র আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক বলিলেন "তুমি এরূপ নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিতেছ কেন? ভীষণ অগ্নিতে বনজাত বৃক্ষাদি দগ্ধ হইতেছে; তোমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীব এ অগ্নির তেজ কি প্রকারে নির্ব্বাণ করিবে?" পক্ষী জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?" তিনি উত্তর করিলেন "আমি দেবাধিপতি শক্র"। পক্ষী উত্তর করিল "দেবতাধিপতি শক্র পুণ্যবান ব্যক্তি এবং তিনি তাঁহার প্রত্যেক ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন। নিজ ব্রত মুক্ত ও রক্ষা করিতে যে সময় আবশ্যক, সেই সময়ে তিনি এই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু অগ্নি ক্রমেই ভীষণতর হইতেছে; সুতরাং এইক্ষণ বাক্যব্যয়ের সময় নাই।" এই বলিয়া পক্ষী পুনরায় নিজ পক্ষে করিয়া জল আনয়ন পূর্ব্বক অগ্নির উপর জলবর্ষণ করিতে লাগিল। এই দৃশ্যে মোহিত হইয়া দেবতাধিপতি নিজ হস্তের তালুতে জল গ্রহণ করিয়া ঐ জল অগ্নির উপর বর্ষণ করিলেন এবং তাহাতেই অগ্নি নির্ব্বাপিত ও ধূমরাশি দূরীভূত হইল এবং সকল জন্তু রক্ষা পাইল। সেই সময় হইতে এই স্তূপকে অগ্নিনির্ব্বাপক স্তূপ বলে।

ইহার নিকটেই অন্য একটী স্তূপ। এইস্থানে যোবিদত্ত মৃগাকারে বর্ষাচেরণকালীন অনেক জন্তুকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীনকালে এইস্থানে এক গভীর বন ছিল; সেই সময় স্তূপে অগ্নি লাগিয়া এই বনে দাবানল হয়। বনস্থ পশু পক্ষী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে। সম্মুখে বেগবতী নদী, পশ্চাতে

ভীষণ অগ্নি। এই নদীতে লম্ফ প্রদান করিয়া মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন পথই ছিল না। মুমূর্ষুপ্রাণী যোদ্ধিগণ নিজ শরীর এই বেগবতী নদীর উপর স্থাপন করিলেন; নদীর প্রবল স্রোতাঘাতে তাঁহার অস্থি ভগ্ন হইতে লাগিল; কিন্তু তথাপি তিনি অন্যের পার হইবার সুবিধা করিয়া দিতে লাগিলেন। অবশেষে এক ক্লান্ত যাত্রীদল তথায় উপস্থিত হইলে মৃপ অতিকষ্টে তাহাকে পার করিয়া দিল কিন্তু নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া নিজে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। দেবতাগণ মৃপের অস্থি সংগ্রহ করিয়া এইস্থানে এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

এই স্থানের পশ্চিমে, নিকটেই একটী স্তূপ। এইস্থানে সুভদ্র নির্ব্বাণলাভ করিয়াছিলেন। সুভদ্র পূর্ব্বে ব্রাহ্মণশিক্ষক ছিলেন। তিনি একশত বিশ বৎসর বয়স্ক ছিলেন। বৃদ্ধ হওয়াতে তিনি যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ মহাপ্রস্থানোন্মুখ হইয়াছেন জানিতে পারিয়া, শালবৃক্ষদ্বয়ের নিকট আসিয়া আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু মহাপ্রস্থানোন্মুখ হইয়াছেন, আমার এখনও কিছু সন্দেহ আছে; অনুমতি করুন, আমি তাঁহাকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি।" আনন্দ উত্তর করিলেন "প্রভুর শেষ দশা, তাঁহাকে আর বিরক্ত করিবেন না। সুভদ্র বলিলেন পৃথিবীতে বুদ্ধের দর্শনলাভ এবং প্রকৃত ধর্ম্মবৃত্তান্ত অবগত হওয়াও সুকঠিন। আমার কয়েকটী বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে; আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই।" অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সুভদ্র ভিক্ষুদ্বয়ে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অনেক ব্যক্তি নিজেদের প্রভু বলিয়া জ্ঞাপন করে। প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন মত এবং প্রত্যেকেই জনসাধারণকে উপদেশ দিয়া পথপ্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক। গৌতম কি তাহাদের ধর্ম্মের বিষয় অবগত আছেন?" বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "আমি এ সকল বিষয় জ্ঞাত আছি।" পরে সুভদ্রের হিতার্থে তিনি পুনরায় প্রকৃত ধর্ম্মপথের করিলেন।

সুভদ্র ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া নিম্নরূপে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। তথাগত তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কি এরূপ ভাবে ধর্ম্মগ্রহণে সক্ষম হইবে? অন্যধর্ম্মী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত লোক যাহারা ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণে অভিলাষী হয়,তাহারা চারি বৎসর শিক্ষানবিসী করিয়া পরীক্ষা দেয়, যদি ইহাদের চরিত্র ও ব্যবহারে আপত্তিজনক কিছু না দেখা যায় তবে, তাহারা আমার ধর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু তুমি মনুষ্য সহবাসে থাকিয়াও, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছ। সুতরাং তোমাকে ব্রতিরূপে গ্রহণ করিতে কোনই আপত্তি হইতে পারে না।

সুভদ্র উত্তর করিলেন "প্রভু অত্যন্ত দয়ালু এবং নিরপেক্ষ। তিনি কি আমাকে চার বৎসরের শিক্ষানবিসী হইতে অব্যাহতি দিবেন?" বুদ্ধ বলিলেন "আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি; মনুষ্যসহবাসে থাকিয়াও তুমি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছ।" সুভদ্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। পরে বিশেষ যত্নসহকারে তিনি নিজ শরীর ও মনকে সংযম শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং ঐ প্রকারে সকল সন্দেহযুক্ত হইয়া শীঘ্রই অর্হদ্ভাব প্রাপ্ত হইলেন। এই প্রকারে শুভিলাভ করিয়া, তিনি বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলেন না কিন্তু সঙ্ঘের মধ্যবর্ত্তী হইয়া এবং নিজ ঐশ্বরিক ক্ষমতা দেখাইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। তিনিই তথাগতের শেষ শিষ্য এবং শিষ্যগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাগ্রে নির্ব্বাণ লাভ করেন। পূর্ব্বোক্ত গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তিগণই সুভদ্র।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

মাতৃঋণ।

দশম পরিচ্ছেদ।

সিসিল।

পরদিন গির্জ্জা হইতে জ্যাক যখন মাতার সহিত গৃহে ফিরিতেছিল, তখন গির্জ্জা-ঘরের ফটকের নিকট ডাক্তার রিভালের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ডাক্তার রিভালের পার্শ্বে একটি ছোট মেয়ে দাঁড়াইয়াছিল, মেয়েটির বর্ণ যেমন গোলাপের মত উজ্জ্বল, চক্ষেও তেমনি একটি করুণ শ্রী ফুটিয়া রহিয়াছে! ললাটের উপর প্রভাতের সূর্য্য কিরণ আসিয়া পড়িয়াছে, বায়ু-স্পর্শে কুঞ্চিত অলকের কয়েকটি গুচ্ছ সেই সূর্য্য কিরণে কখনো লুটাইয়া পড়িতেছে কখনো বা আবার সরিয়া যাইতেছে! মেয়েটিকে দেখিলেই কেমন ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়।

ইদা কহিল, "ডাক্তার, এটি বুঝি তোমার নাত্‌নী?" ডাক্তার রিভাল মেয়েটিকে কোলের কাছে টানিয়া বলিল, "হাঁ—এই হচ্ছে সিসিল! জ্যাক, এদিকে এস, সিসিলের সঙ্গে ভাব কর।" তারপর কয়জনে মিলিয়া পথটুকু হাঁটিয়াই চলিল। গৃহও বেশী দূরে নহে। রিভাল কহিল, "সিসিল আর কোথাও যায় না—বাড়ীতেই থাকে। শুধু এই গির্জ্জায় তার দিদিমার সঙ্গে রবিবার সকালে একবার করে আসে। আজ ওর দিদিমা আসতে পারেন নি কাজেই আমাকে আসতে হয়েছে।"

জ্যাক এখানে আসিয়া অবধি সমবয়সী সাথী না পাইয়া কেমন একটা নিঃসঙ্গ বিজনতা অনুভব করিত। আর্ব্বার সঙ্গে গল্প করিয়া বনে কাঠুরিয়া বা কৃষকদিগের সহিত আলাপ করিয়াও তাহার অন্তরের ক্ষুধা মিটিত না, নিতান্ত তৃষিত চিত্তে সে এমন একজন সঙ্গীর অভাব অনুভব করিত, যাহার সহিত দুই দণ্ড প্রাণ খুলিয়া সুখ-দুঃখের কথা কহিয়া বাঁচে! কিন্তু এমন সঙ্গী মিলিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কাজেই তাহার মনের দুঃখ মনেই রহিয়া যাইত।

সিসিলও গৃহের মধ্যে বৃদ্ধ মাতামহ মাতামহী ও বৃদ্ধা দাসী ভিন্ন কাহারও সহিত মিশিতে পাইত না। রবিবার প্রভাতে একবার গির্জ্জায় আসিয়া সে বাহিরে বালকবালিকাগণের হাস্য-কৌতুক দেখিয়া এক অজানা স্বপ্নরাজ্যের পরিচয়-লাভে ব্যাকুল হইয়া উঠিত! উহারা কি কথা কহে, কেন হাসে, জানিবার জন্য অনভিজ্ঞা বালিকার মনে যে কৌতূহল জাগিত, তাহার তৃপ্তির কোন আশা না দেখিয়া সে কেমন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। তাই আজ জ্যাক ও সিসিল প্রথম যখন মিশিতে পাইল তখন জ্যাকের মনে হইল সে বনে যে পক্ষিশাবক ধরিয়া সানন্দে মুঠি ভরিত—এ হৃদয়ের স্পর্শেও যেন ঠিক তেমনই উষ্ণতা!

ইহার পর হইতে জ্যাককে যখনই বাড়ীতে পাওয়া যাইত না, তখন বনের দিকে আর কেহ তাহার সন্ধান লইতে ছুটিত না; সকলেই জানিত, সে নিঃসন্দেহ ডাক্তার রিভালের গৃহে হয় সিসিলের সহিত বসিয়া ডাক্তার-গৃহিণীর নিকট গল্প শুনিতেছে, নয় সিসিলের জন্য কাগজের ফুল নৌকা প্রভৃতি তৈয়ার করিতে লাগিয়া গিয়াছে।

গ্রামের প্রান্তে ঝোপের পার্শ্বে ডাক্তারের গৃহ। গৃহখানি একতালা, আড়ম্বরহীন ছোট! বাহিরে একটা পিতলের পাতে ডাক্তারের নাম লেখা, লেখাগুলা কতক অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে, সেই পিতলের পাতের পার্শ্বেই 'রাত্রি ঘণ্টা' ঝুলানো! গৃহটি পুরাতন, স্থানে স্থানে নূতন কাদায় গড়িয়া তুলিবার যে এক-কালে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান! দ্বারের সম্মুখেই একটা গাড়ীবারাণ্ডার থাম খাড়া রহিয়াছে, উপরে ছাদ বসিলেই কাজটুকু সম্পন্ন হইয়া যাইত কিন্তু ছাদ হয় নাই! ফটক হইতে গৃহের প্রবেশদ্বার অবধি পথটায় একসময় কাঁকর ফেলা হইয়াছিল, কিন্তু গৃহস্বামীর অমনোযোগে কাঁকর ফেলা পথের মধ্যে মধ্যে এখন প্রচুর ঘাস জন্মিয়া উঠিয়াছে, তাহা আর তুলিয়া ফেলা হয় নাই স্থানে স্থানে আগাছায় পথের কাঁকর ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। দুই একটা ধেওয়ালে প্রকাণ্ড গহ্বর,—নূতন সার্শি খড়খড়ি বসাইবার আয়োজন হইতেছিল পরে তাহা আর বসান হয় নাই! যদি কেহ বলিত কাজটুকু শেষ হইয়া থাক্ ত বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিত, দরকার কি?"

গ্রামের লোক গৃহস্বামীর ঔদাসীন্যের কারণ জানিত। বৃদ্ধ ডাক্তার বড় সাধে জীর্ণ বাটির সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিল—বাড়ীখানিও বেশ ছবির মত সজ্জিত সুন্দর হইয়া উঠিত, যদি না সেই দুর্ঘটনা বৃদ্ধের জীবনটাকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দিত। একমাত্র কন্যার মৃত্যুতে বৃদ্ধের সংসারে সকল সাধ মিটিয়া গেল! ডাক্তার গৃহিণী এ শোক জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। সেই দুর্ঘটনার পর হইতে গৃহিণী বাহিরের পৃথিবীর সহিত সকল সম্পর্ক ঘুচাইয়া বসিলেন—সকলে ভাবিল, বৃদ্ধা এ শোকের বেগ সামলাইতে পারিবেন না! তাহাই ঘটিত, যদি সিসিল এ সংসারটিকে নব আশ্বাসের বাণীতে মুখরিত করিয়া না রাখিত!

ডাক্তার বাহিরের কর্ম্ম কোলাহলের সংস্রবে আসিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন বটে—কিন্তু পূর্ব্বের সে সহজ প্রফুল্লতাটুকু বৃদ্ধের হৃদয় হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। সারাদিন রোগী দেখিয়া পীড়িতের ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থাদি করিয়া গৃহে ফিরিয়া বৃদ্ধ আপনাকে সিসিলের হস্তে সম্পূর্ণভাবে সঁপিয়া দিতেন! সে যাহা করিয়া যেমন করিয়া সুখ পায়, বৃদ্ধ তাহাই করেন! এইরূপে সিসিলের সহিত খেলাধূলা করিয়া কন্যার শোক ভুলিতে বৃদ্ধ চেষ্টা করিলেন।

এই শোকের গৃহে শোকের মধ্যে থাকিয়া সিসিল যেন কি এক দারুণ বিজনতা অনুভব করিত। কবরের মত যেন রুদ্ধ তাহাদের ছোট গৃহখানি—বাহিরের কোন কোলাহল এখানে পৌঁছিতে পারে না—বাহিরের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই—ঐ আকাশ, এই, বাতাস, ঐ পাখী, এই ফুল—ইহারাই যেন সর্ব্বস্ব—ইহাদের লইয়াই যেন তাহার সমস্ত পৃথিবী! বাহিরের লোক-জন—? যেন কোন্ স্বপ্নের দেশে তাহারা থাকে তাহাদের সহিত সিসিলের কোন সম্পর্ক নাই! এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে অহর্নিশি বাস করায় সিসিলের মুখে এমন একটা রেখাপাত হইয়া গিয়াছিল যে তাহা সহজেই চোখ পড়ে।

জ্যাক ও সিসিলকে লইয়া নিকোল যখন

গৃহে পৌঁছিল, তখন জ্যাককে দেখিয়া গৃহিণী কহিল, "এ ছেলেটি কে ?"

রিভাল কহিল, "আর্জেণ্টদের ছেলে! বেশ ছেলেটি! সিসিল বেচারী একলাটি থাকে—ও ও একলা থাকে, দুজনে একসঙ্গে খেলা করবে, তাই আমি নিয়ে এলাম!"

গৃহিণী গম্ভীরস্বরে কহিল, "কিন্তু, ওরা—ঐ আর্জেণ্টরা কেমন লোক তা কে জানে! কোথায় বাড়ী, কেউ জানে না।"

"ওরা বেশ লোক। আমি নিজে জানি যে! কর্ত্তাটি খামখেয়ালি—একটু বদমেজাজী—তা সে লোকটা কবি—কবিটবি হলে মেজাজ অমন হয়! এর মা কিন্তু বড় ভাল মানুষ, নেহাৎ বেচারী। তবে ওরা যে বেশ ভদ্রলোক তার আর পরিচয় নেবার দরকার করে না—ওদের ব্যবহারেই বোঝা যায়।"

গৃহিণী মাথা নাড়িল। স্বামীর নিশ্চিন্ততায় তাহার কেমন বিশ্বাস ছিল না। গৃহিণী কহিল, "কিন্তু তুমি জান ত—"

নিতান্ত অপরাধীর মত রিভাল সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল—পরে গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, "আহা, কোন ভাবনা নেই, তোমার, জ্যাক ছেলে মানুষ, তোমার সিসিলও তাই, কোন ভয়ের কারণ নেই।"

অবশেষে গৃহিণী নিরাপত্তিতে জ্যাককে দৌহিত্রীর ক্রীড়া-সঙ্গিত্বে গ্রহণ করিল। জ্যাক সিসিলের সঙ্গে খেলিবার অধিকার পাইল!

জীবনে জ্যাকের কি এক পরিবর্ত্তন আসিল! প্রথমটা এই পরিবারে খাপ খাইয়া যাইতে জ্যাকের কেমন সঙ্কোচ হইতেছিল—পরে আর সে সঙ্কোচ রহিল না। জ্যাক নিত্য এখানে আসিতে লাগিল, ক্রমে এমন হইল, রাত্রে শয়ন ও আহারের সময়, ভিন্ন জ্যাক সর্ব্বক্ষণই রিভাল-গৃহে থাকিয়া সিসিলের সঙ্গে খেলা করে, গল্প করে!

একদিন রিভাল-গৃহিণী কহিল, "জ্যাক, তুমি স্কুলে যাও না?"

"না।"

পরে বালক আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, "আমি,—আমি রাত্রে মার কাছে পড়ি।"

বেচারী সালটি! ছেলেকে শেখানো কি তাহার কাজ!

রিভালগৃহিণী স্বামীকে কহিল, "ওরা ছেলেটাকে আদপে দেখে না—সারাদিন ও এখানে খেলা করে বেড়ায়!"

ডাক্তার কহিল, "উপায় নেই! পারে না, তারা ছেলেকে এঁটে রাখতে! তা ছাড়া জ্যাকের মাথা নেই তেমন।"

"বুঝেছি—ছেলেটির বুদ্ধিশুদ্ধি তেমন ধারালো নয়—আর নিজের বাপ নয় ত! আহা, মার প্রথম পক্ষের ছেলে—এমন আদরের, ছেলেদের প্রায়ই কোন যত্ন হয় না!

রিভাল কহিল, "দেখ, আমার একটা কথা মনে হচ্ছে।"

"কি?"

"আমার ইচ্ছে হচ্ছে, তোমার কাছে ওরা দুজনেই একটু-আধটু পড়ে!"

"বেশ ত।" ডাক্তার-গৃহিণী সম্মত হইল।

পরদিন জ্যাকও সিসিলের পাঠের ব্যবস্থা হইল। রিভাল-গৃহিণীর কাছে উভয়েই পড়িতে আরম্ভ করিল। এমন আদর এমন যত্ন করিয়া জ্যাককে কেহ কখনো পড়ায় নাই! পড়িতে বসিলে সে কেমন অন্য-

মনস্ক হইয়া থাকিত—পঠিতবিষয় মনে থাকিত না—পূর্ব্বে এ দোষের জন্য তিরস্কার ও প্রহারের অন্ত থাকিত না—প্রহার খাইয়া সে আরো অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত—ভয়ে তাহার স্বর ফুটিত না! তিরস্কারের তীব্রতায় তাহার সব গোল হইয়া যাইত—সহজ কথাও মনে থাকিত না! এখানে রিভালগৃহিণীর সস্নেহ অধ্যাপনার গুণে জ্যাকের পড়াশুনা শুধু যে একটু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহা নহে, পড়াশুনার দিকে তাহার মনটা ক্রমে আকৃষ্ট হইল।

রিভালের সহানুভূতি-পূর্ণ মিষ্ট ব্যবহারে সমস্ত গ্রামের লোক তাহার বশীভূত ছিল। জ্যাক, জ্ঞান হওয়া অবধি কখনও জীবনে বাহিরের লোকের মুখে মিষ্ট কথা শুনে নাই, সুতরাং সে যে রিভালের একান্ত বশীভূত হইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

বৃদ্ধ ডাক্তার যখন আপনার ছোট ট্যাণ্ডেমখানি ছুটিয়া রোগী-পরিদর্শনে বাহির হইত, তখন, জ্যাক ও সিসিল তাহার সঙ্গী হইত। পথে পাখী দেখিয়া সিসিল কহিত, "ওটা কি পাখী বল ত, জ্যাক!—" জ্যাক সঠিক উত্তর দিতে না পারিলে সিসিল তাহার ভ্রমসংশোধন করিয়া দিত। পথের পার্শ্বে সুদূর বিস্তীর্ণক্ষেত্রে সবুজ শস্যের যেন কে শয্যা পাতিয়া রাখিয়াছে,—বায়ুস্পর্শে শস্যশীর্ষ আন্দোলিত হইলে মনে হয় যেন একটা সবুজ ঢেউ ছুটিয়াছে—তাহা দেখিয়া সিসিল জিজ্ঞাসা করিত, "কি গাছ বল দেখি, জ্যাক,—ধান, না যব, না গম?" জ্যাক আবার ভুল করিয়া বলিত,—সিসিল হাসিয়া জ্যাকের সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিত। এইরূপ নিত্য সাহচর্য্যে, শৈশবের সরল হাসিখেলার মধ্য দিয়া বালকবালিকা পরস্পরে পরস্পরকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতেছিল। শৈশবের সে ভালবাসা যেমন অনাবিল তেমনই নিত্য সুন্দর!

বৃদ্ধ রোগীর বাড়ী রোগী দেখিতে যান্—বালকবালিকা গাড়ীতে বসিয়া থাকে। পল্লীর দুই চারিজন বৃদ্ধেরই অনুগত ব্যক্তি তাহাদিগকে ফুলফল দিয়া যাইত—বৃদ্ধ তাহা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। বৃদ্ধের গাড়ী কোন পল্লীতে আসিলে সহজে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিত না। রাজ্যের লোক আসিয়া সেখানে জমায়েৎ হইত—বুঝি কোন সম্রাট আসিলে তাঁহাকে দেখিবার জন্য এত লোক ছুটিয়া ঘরের বাহির হয় না! ইহাদিগের অনেকেই নানা অনুযোগ আব্দার লইয়া আসিত, কেহ বলিত, "আমার মেয়েটি আর কতদিনে সেরে উঠবে, ডাক্তার?" কেহ বলিত, "আমার ছেলেটি আজ একটু ভাল আছে—সেই ঔষধই কি আবার দেওয়া হবে? তাহা হইলে বিকালে গিয়া নিয়ে আসিব।" আবার কেহ বা বলিত, "যে গুঁড়োটা দিয়েছেন সেটা খাওয়াতে হবে—না সেটা গায় ঘসতে হবে?"

ডাক্তার সকলেরই কথা আগ্রহের সহিত শুনিতেন, সকলেরই ঔষধপথ্যাদির ব্যবস্থা করিতেন, সকলকেই হাসিমুখে আশ্বাস দিতেন,—কেহ কখনও নিরাশ হইত না। পরে ডাক্তার গাড়ী হাঁকাইয়া দিলে গ্রামের লোক দুই হাত তুলিয়া কহিত, "বেঁচে থাক, বাবা তুমি। দীন দুঃখীর মা বাপ তুমি—ভগবান তোমার ভাল করবেন, বাবা।"

এই সব দেখিয়া শুনিয়া জ্যাকের রুদ্ধ মনের কপাট খুলিয়া গিয়াছিল, কাজেই লেখাপড়ায় তাহার অনুরাগ ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। গৃহে মাতার নিকট সে বহির পাতা খুলিত না—রিভালের গৃহে পাঠের কথাও মাতাকে সে কোন দিন জানিতে দেয় নাই! সে আপন ইচ্ছামত গৃহে আসিত, আর্কার নিকট চাহিয়া লইয়া আহার করিত,—আবার কখন্ চলিয়া যাইত কেহ তাহার সন্ধান রাখিত না।

ইতিমধ্যে আবার একদিন আরামকুঞ্জে ভোজের ধুম লাগিল। বাড়ী সাজানো দেখিয়া আশপাশের লোকের মনে কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। "তারা আবার আসছে?"

সালটি আসিয়া আর্কাকে কহিল, "শীঘ্র আর্কা, অনেক ভদ্রলোক আসছেন রাত্রে—একটা খরগোস আরো মার—একটা, না, দুটো— কতকগুলো অমলেট তৈরি কর।"

বৈকালে আবার লাবার্স্যাদের হারজের দল আসিয়া দেখা দিল। আর্জেন্ট বিজয় গর্ব্বে মাতিয়া উঠিল। রীতিমত বড়মানুষি কায়দায় সে সকলকে অভ্যর্থনা করিল। হারজের দল মুগ্ধ হইয়া গেল।

তার পর প্রতি সপ্তাহেই এমন ভোজ চলিতে লাগিল। প্রতি সপ্তাহে নূতন মুখ—নূতন লোক, তবে, লাবার্স্যাদর ও হারজ প্রতি ভোজেই থাকিত।

ডাক্তার রিভাল প্রথমটা এই ব্যয়বাহুল্যে ভাবিত, "এত কেন?" পরে তাহার বিরক্তি ধরিল—ভাবিল, "ছেলেটাকে দেখবার একটুকু অবসর হয় না, দিবারাত্রি জমোদ আর মজলিস্।"

একদিন বন্ধুর দল জ্যাককে দেখিয়া কহিল, "ছেলেটির পড়াশুনা কেমন হচ্ছে?" একজন সালটির একটু মন পাইবার আশায় জ্যাককে দুই চারিটা বানান ও গণিতের সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে জ্যাক যখন নির্ভুল উত্তর প্রদান করিল, তখন আর্জেন্ট বিস্মিত হইয়া গেল। ডাক্তার রিভাল কহিল, "দেখ, আমি কেমন শিখিয়েছি এই কদিনে।" বলিয়া —ডাক্তার ইহার মুখের পানে একবার চাহিল—ইহার মুখে কৃতজ্ঞতা ও প্রফুল্লতার একটা ছায়া পড়িল, ডাক্তার তাহা স্পষ্ট লক্ষ্য করিল।

দুই চারিজন তারিফ্ দিয়া কহিল, "বেশ ছেলেটিত! বুদ্ধি শুদ্ধি চমৎকার!"

লাবার্স্যাদর্ কহিল, "বাগানে দেখলাম ঐ আঁবগাছটার একটা কি কল খাটানো, ওটা কি?"

জ্যাক তাড়াতাড়ি বলিল, "কাঠ-বিড়াল ধরবার জন্য?"

লাবার্স্যাদর্ কহিল, কে তৈরি করলে ওটা?"

"আমি।" বিরাট উল্লাসে জ্যাকের চক্ষু দুটি জ্বলিয়া উঠিল।

সকলে বলিয়া উঠিল, "এ্যাঁ তুমি? চমৎকার হয়েছে, খাসা মাথা ত।"

লাবার্স্যাদর্ কহিল, "ওকে কলকারখানার কাজ শেখাও কারিগরীতে ওর বেশ মাথা খেলে!"

ডাক্তার রিভাল উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, তারপর ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

আর্জেন্ট কহিল, "ঠিক আমিও আজ এক বছর ওর ভাবগতিক লক্ষ্য কচ্ছিলাম—

পড়াশুনায় মোটে বাধা করিনি—ভাবছিলাম ওর কোন্‌দিকে ঝোঁক আছে! তা, ঠিক বলেছ তুমি লাবাস্যাঁদর, কলকব্জা তৈরিতে ওর মাথা চমৎকার খেলে বটে!"

তখন কারখানার মিস্ত্রীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আলোচনায় লাবাস্যাঁদরের দল অনেকখানি সময় কাটাইয়া দিল। সমস্ত পৃথিবী যে আর পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যেই মিস্ত্রীদিগের হস্তগ্রহের উপর আপনার অস্তিত্ব ও উন্নতির জন্য নির্ভর করিবে, তাহার সূচনা দেখা গিয়াছে! যদি সমগ্র পৃথিবীর উন্নতি হয় ত সে উন্নতি সাহিত্য, বিজ্ঞান, কাব্য বা ধর্ম্মের দ্বারা সম্পাদিত হইবে না, সে উন্নতির মূলে কারখানার মিস্ত্রীসমূহের অদ্ভুত কৌশল ও অপূর্ব্ব মস্তিষ্কবল! আর্জেন্ত কহিল, "আমি ওকে কারখানায় কাজ শেখাতে পাঠাব বলেই স্থির করে রেখেছি। তবে তেমন ভাল কারখানার সন্ধান পাইনি, এইজন্যই পাঠাতে পারছি না।"

লাবাস্যাঁদর্ কহিল, "তাহলে ছেলেটির উন্নতি আর দেখতে হয় না—ওর এদিকে বেশ প্রতিভা আছে।"

আর্জেন্ত কহিল, "এই! প্রতিভা আছে!" প্রতিভা কি সকলের একদিকে থাকে? কারো সাহিত্যে প্রতিভা, কারো বিজ্ঞানে, কারো বা এই সবে!"

লাবাস্যাঁদর্ কহিল, "তবে ওকে কারখানাতেই পাঠাও। আমার জানা ভাল কারখানা আছে—আমি সন্ধান নিতে পারি।"

"বেশ"—আর্জেন্ত কহিল, "তুমি আজই সেখানে চিঠি লিখে সন্ধান নাও। আর দেরী করা নয়—যত শীঘ্র কাজে লাগে সেই লাভ!"

সার্লট কহিল, "কিন্তু ওর শরীর মজবুত নয় তেমন, ভারী রোগা ছেলে—আর এই বয়স! সেখানকার কষ্ট পরিশ্রম সহ্য হবে কেন?"

হারড্ কহিল, "খুব সহ্য হবে। কেন? ওর শরীর ত মন্দ নয়!"

আর্জেন্ত কহিল, "ঐ ত মেয়েদের দোষ! ভারী অবুঝ! কিসে ভাল হয় তা বুঝবে না—তোমার চেয়ে ডাক্তার হারড্ শরীর সম্বন্ধে বেশী বুঝতে পারেন। তোমরাই ত মানুষের উন্নতির পথে বাধা দাও!"

অপ্রতিভ হইয়া সার্লট জ্যাকের পানে চাহিয়া রহিল! এই বালক এত গুরু পরিশ্রম সহ্য করিবে কি করিয়া? তাহার চোখে জল আসিয়াছিল। জ্যাক মাতার সকাতর নয়নের দৃষ্টি সহিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল।

কি এক অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় জ্যাকের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। মনটাকে সুস্থির করিবার আশায় সে ডাক্তার রিভালের বাড়ীর দিকে চলিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

'এ জীবন নহেক স্বপন!'

কয়েকদিন পরে এক সন্ধ্যায় কবি জ্যাককে আপনার নিকট ডাকিল। সার্লট পার্শ্বে বসিয়া একটা কাগজে কি লিখিতেছিল। আর্জেন্ত বলিল, "জ্যাক, তোমায় অনেকবারই আমি বলেছি, এ জীবনটা খেলাধেলা নয়। কবিও বলেছেন, 'এ জীবন নহেক স্বপন!'

জীবনটা শুধু সংগ্রাম, শুধু যুদ্ধ! দেখছ ত আমার, কি রকম যুদ্ধ করছি। কখনো কাবু করতে পারছে না—জয়ের সম্ভাবনা দেখা গেছে, এবার! এখন তোমার পালা—তুমি এখন আর ছেলেমানুষ নও—বড় হয়েছ!"

জ্যাকের বয়স বারো বৎসর মাত্র—হতভাগ্য বালক!

আর্জেন্ট বলিতে লাগিল, "এখন তুমি মানুষ হয়েছ। শুধু মাথায় আর চেহারায় বেড়েছ তা নয়, তোমার ভিতরটাও বেড়েছে—এটা তোমায় এখন কাজে দেখাতে হবে। এতদিন তোমার মনটাকে স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠবার জন্য আমি যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছি। প্রকৃতির মুক্ত বিশাল ক্ষেত্রে তুমি শিক্ষা পাবে বলেই আমি পড়াশুনার খাঁটাখাঁটি করিনি। রুটিন মেনে চললে মানুষের মন স্বাভাবিক স্ফূর্তি পায় না, কাজেই তার তেমন গড়ে ওঠবার অবকাশ মেলে না। বুঝতে পাচ্ছ, এইজন্যই তোমাকে ছেড়ে দিয়েছিলুম আমি—কোন কথা কইনি, তোমায় কোন বাধা দিইনি! তুমি এখন বেশ হয়ে উঠেছ—ঠিক আমার মনের মত হয়েছ! কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবার তোমার এই সময়!"

ডাক্তার চায়ল্ ও লাবার্স্যাদর্ এই সময় কক্ষে প্রবেশ করিল। লাবার্স্যাদর কহিল, "আমার সেই বন্ধু রুডিক চিঠি লিখেছে—যে জ্যাককে তার কারখানার কাজ শেখাবার জন্যে নিতে পারে শুধু আমার অনুরোধে! ওরা কি শেখাতে চায়, বাইরের লোককে! শুধু আমার খাতিরে জ্যাককে নেবে। জ্যাককে কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই তাহলে ইংল্যেণ্ডে যেতে হবে! ইংল্যেণ্ডেই রুডিকের কারখানা।"

জ্যাকের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল! এ সকলের অর্থ কি? তাহার মনে পড়িল, সে একবার শৈশবে তাহাদের পুরাতন ভৃত্যের ঘরের সম্মুখে দেখিয়াছিল, তাহার একটি পালিত মেষশাবককে কসাইয়ে কিনিয়া লইয়া যাইবার জন্য যখন আসিয়াছিল, তখন সে অসহায় মেষশাবক আপনার মাতার পানে কি করুণ-দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল—নিষ্ঠুর কসাই সে দৃষ্টি গ্রাহ্য না করিয়া অকাতরচিত্তে মেষ শাবকের মধ্যে একটা বিশাল বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিল—জ্যাকের মনে হইল সে আজ সেই মেষ-শাবকের মতই একান্ত অসহায়, একান্ত নিরুপায়!

মার বুক হইতে টানিয়া কাড়িয়া ইহারা তাহাকে কোথায় লইয়া যাইবে! জ্যাক মার দিকে চাহিল, সার্লটি লেখা বন্ধ রাখিয়া কখন জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে দেখে নাই! মার দৃষ্টিটুকু বাহিরের দিকে নিবদ্ধ,—যেন একান্ত আগ্রহে কি মহাদর্শনীয় পদার্থ লক্ষ্য করিতেছে! জ্যাক বুঝিল, এ চাহিয়া থাকার আর কোন অর্থ নাই, শুধু অন্তরের বিপুল বেদনা কোনমতে চাপিয়া রাখিবার জন্য এ একটা ছলমাত্র! আহা, জগতে কেহ যদি আপনার জন থাকে ত সে মা, কোথাও যদি নিরাপদ স্থান থাকে ত সে মার কোল! সেই মার কাছ হইতে সে কোথা চলিয়া যাইবে। সে কি তাহা হইলে আর একদণ্ড বাঁচিবে? না, না, সে যাইবে না! যাইতে পারিবে না!

আর্জেন্ট কহিল, "শুনছ জ্যাক তোমার ভাগ্য ভাল, তাই রুডিকের কারখানায় ঢুকতে

পাচ্ছে! চার বৎসর পরে তুমি দেখবে এক মস্ত কারিগর হয়ে উঠেছ! কি মহান উচ্চ পদে তুমি প্রতিষ্ঠিত! এই দাসত্ব আর পরনির্ভরতার যুগে স্বাধীন আত্মবলে বলীয়ান এক মহিমাময় মানুষ!"

কারিগর! কারখানা! বন্ধের শব্দেও বালক বুঝি এতটা কম্পিত হইত না! সে পারিতে কারিগর দেখিয়াছে,—কুৎসিত কালি ঝুল মাখা লোকগুলা বৈচিত্র্যহীন ছিন্ন জামা পরিয়া দল বাঁধিয়া পথে চলিয়াছে, তাহাদের সুরাপান-জনিত জড়িত কর্কশ চীৎকারে চারিধার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে কি কদর্য্য! জ্যাক সেই কারিগর হইবে! কি ভয়ঙ্কর!

লাবার্স্যাদের কহিল, "সাতদিনের মধ্যেই সেখানে যেতে হবে। সব গোছগাছ কর, আমিই গিয়ে রেখে আসব। বলে কয়ে আসব অমনি, একটু যত্ন করে সেখায় যেন!"

"আমায় যেতে হবে?" বালক সভয়ে প্রশ্ন করিল।

আর্জেন্ত কহিল, "হাঁ! সাত দিনের মধ্যেই!" জ্যাকের চক্ষে সমস্ত আলো যেন নিভিয়া গেল। সে আর মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াইল না—একেবারে ছুটিয়া ডাক্তার রিভালের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল।

রিভাল কহিলেন,"কি? ব্যাপার কি জ্যাক? এমন করেও ছুটে আসে? হাঁপাচ্ছ যে, বসো। ছি, যদি পড়ে যেতে, কি হত বল দেখি!"

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া জ্যাক রিভালের নিকট সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। আর্জেন্তের উপদেশ, লাবার্স্যাদরের অনুগ্রহ, কোন কথাই সে গোপন করিল না।

শুনিয়া রিভাল কহিলেন, "কারিগর হবে! তোমায় কারখানায় পাঠাবে? সেদিন শুনেছিলাম বটে, আমি ভেবেছিলাম, তারা! তোমার সমস্ত ভবিষ্যৎটা এমনভাবে মাটি করে দেবে ক'জনে মিলে! কখনো না! আমি এখনি গিয়ে এ বিষয়ে কথা কচ্ছি, জ্যাক! কারিগর হবে তুমি? কখনো না।"

ডাক্তার মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া আবার কুঞ্জের দিকে ছুটিলেন। ডাক্তারের গতির ক্ষিপ্রতা দেখিয়া পথের পথিকেরা ভাবিল, বুঝি কাহারো কোন কঠিন পীড়ার কথা শুনিয়া ডাক্তার ছুটিয়া চলিয়াছেন, পথে কোন দিকে চাহিয়া দেখিবার অবসরটুকু অবধি নাই!

রিভাল আসিয়া আর্জেন্তের কক্ষে যখন দাঁড়াইলেন, তখনও মজলিস ভাঙ্গে নাই। রিভাল কহিলেন, "মস্থ আর্জেন্ত, একটা কথা আমি জানতে চাই—"

আর্জেন্ত কহিল, "বসো, বসো, ডাক্তার, হাঁপাচ্ছ যে, একটু চা খাবে?"

"কিছু খাব না। শোন, তোমরা নাকি ঐ দুধের ছেলেটাকে কারখানায় ছোটলোকগুলোর সঙ্গে কাজ শেখাবার জন্য পাঠাচ্ছ। ভদ্রলোকের ছেলের জন্যে কি সে সব কাজ, সে সব স্থান? যত কুৎসিত সঙ্গ, লক্ষ্মীছাড়া কাজ! এমন বুদ্ধি শুদ্ধি ওর, সে সব এমন করে নষ্ট করে দিতে হয়!"

আর্জেন্ত কহিল, "এমন কিছু অভদ্র কাজ নয়। এঁরা জানেন সব —"

সার্লটি এবার কথা কহিল।

"কিন্তু আর্জেন্ত, জ্যাক—"

"সার্লটি!" আর্জেন্তের মুখে তীব্র স্বর শুনিয়া সার্লটি চুপ করিল—

"বল, ডাক্তার, কি বলতে চাও, বল।"

"জ্যাক আমায় বলছিল, তোমরা ওকে কারখানায় পাঠাতে চাও, কামারের কাজ, ছোট লোকের কাজ, এই সব শেখবার জন্য! এ কি সত্য?"

"হাঁ!"

"সত্য! কি বলছ, আর্জেন্ট! ওর বংশ, ওর শিক্ষা কি ওকে কামারের কাজের জন্য গড়ে তুলেছে? এমন বুদ্ধি—আরো বিশেষতঃ ওর স্বাস্থ্য! শরীরে সহ্য হবে কেন ও সব?"

ডাক্তার হারল্ড কহিল, "শরীর ত বেশ ওর বেশ শক্ত!"

রিভাল তখন ইদার দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি জান, মা, তোমার ছেলের শরীর তেমন নয়। এ কষ্ট ওর সহ্য হবে না। ও মারা যাবে—এ আমি বলে রাখছি! শরীরের কষ্ট ছেড়ে দিলেও মনের কষ্ট—ভদ্রলোকের ছেলে সেই সব ছোট লোকের সঙ্গে বেড়াতে হবে, কাজ করতে হবে—এতে ওর মন একেবারে ভেঙ্গে যাবে। তারপর সেই সংসর্গে তুমি মা তোমার এ জ্যাককে আর ফিরে পাবে না। কিছুদিন তাদের মধ্যে থাকলে জ্যাক যা হবে, তা দেখে, তুমি মা হয়ে, লজ্জায়, ঘৃণায় তুমি ছেলের দিকে চাইতে পারবে না। হাত শক্ত, কালো, মুখের কথা নিতান্ত অভদ্র, মনের গতি সে কি নীচ, সে তার মার কাছে এসে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে না!"

আর্জেন্ট ক্রোধে ফুলিতেছিল। সে কহিল, "ডাক্তার, তোমার এ অনধিকার-চর্চ্চার কোন দরকার দেখি না—আমার যা খুসী হয়, তাই করব। তোমার পরামর্শ আমি চাইতে যাইনি, তোমার তবে এ মাথাব্যথা কেন?"

রিভাল তীব্রস্বরে কহিল, "তোমায় আমি কোন কথা বলতে আসিনি, আর্জেন্ট! জ্যাক তোমার কে? কেউ নয়! তার ভালমন্দে তোমার কি এসে যায়? কিছু না? আমি জ্যাকের মাকে সোয়াতে এসেছি, এমনভাবে ছেলেকে হত্যা করো না—সে মা, মাকে আমি ছেলে হারাতে দোব না—তাই তার কাছে আমি এ কথা বলতে এসেছি—"

আর্জেন্ট কহিল, "বটে! এত স্পর্দ্ধা! আমার বাড়ীতে এসে আমার দিকে চেয়ে চোখ রাঙ্গাও তুমি! ডাক্তার, এ আমি সহ্য করব না। তুমি এই দণ্ডে আমার বাড়ী থেকে চলে যাও।"

"চলে যাব।" ডাক্তার স্থির দৃষ্টিতে একবার আর্জেন্টের পানে চাহিল, পরে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "হাঁ যাচ্ছি—তবে যাবার আগে মাকে আবার বলে যাচ্ছি, সাবধান, এমনভাবে ছেলেটার সর্ব্বনাশ করোনা! ওর এই বুদ্ধি, এমন করে নষ্ট করে দিও না।" রিভাল গম্ভীরভাবে চলিয়া গেলেন।

কোন ফল হইল না। জিনিষপত্র গুছানো হইতে লাগিল। জ্যাককে যাইতেই হইবে! যেদিন যাইবার দিন স্থির হইল, তাহার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় জ্যাক আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল, করুণ-স্বরে কহিল, "আমি কারখানায় যাব না, মা, কারিগর হতে পারব না আমি।"

"জ্যাক!" ইদার স্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া গেল—আর কোন কথা বাহির হইল না। "মা" বলিয়া জ্যাক কাঁদিয়া ফেলিল।

ইদা কহিল, "ছি, জ্যাক, কথার অবাধ্য হয়োনা। আমি কি সাধ করে তোমায় পাঠাচ্ছি? দেখ, তুমি মানুষ না হলে আমার সোয়াস্তি নেই, কারিগরের কাজ মন্দ কি, জ্যাক?"

"তবে তুমিও আমায় দূর করে দিচ্ছ মা?"

"ও কি কথা, জ্যাক? আমি তোমায় দূর করে দোব, কেন? এ কি সম্ভব! আমি না মা? তুমি কাজ শিখে মানুষ হবে, তোমার ভাল হবে, জ্যাক, তুমি জানো না—এখনও জানবার সময় হয়নি—ছেলেমানুষ তুমি! পরে এক দিন বুঝতে পারবে সব! তোমার জন্মবৃত্তান্ত সে এক রহস্যময় ব্যাপার! বড় হলে জানতে পারবে! আমার কি দুঃখ, সেই দিন তুমি বুঝবে! কেন, তোমায় প্রাণ ধরে আমার কাছ থেকে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছি আর প্রাণ কি রকম কাঁদছে—সেই দিন জানতে পারবে, জ্যাক! আজ আর কিছু বলবনা—শুধু এই-টুকু জেনো, যত দিন না তুমি মানুষ হতে পারবে, যত দিন না তুমি আপনার পায় ভর করে দাঁড়াতে পারবে—ততদিন আমার কষ্ট যাবে না। আমার সুখের জন্য কি এ কষ্ট তুমি করবে না, জ্যাক? তুমি মানুষ হলেই আমার দুঃখ ঘুচবে—কারখানায় গেলে চার বৎসরে তুমি মানুষ হতে পারবে, কিন্তু লেখা পড়া শিখলে মানুষ হতে অনেক দেরী। এই চার বৎসর আমার মুখ চেয়ে—তোমার মার দুঃখ মোচাবে—এই ভেবে তুমি কাটিয়ে দিতে পারবে না?" ইদার চোখে জল আসিয়াছিল।

জ্যাক মার মুখে মুখ রাখিয়া বলিল, "মা—কেঁদোনা তুমি। তোমার কষ্ট যাবে? কিন্তু বল মা, এর পর আমায় দেখে তুমি ঘৃণা করবে না—এমনি আদর করে আমায় বুকে টেনে নেবে—এমনি ভালবাসবে?"

"জ্যাক—জ্যাক—তোকে ভালবাসব না?—তুই ছাড়া পৃথিবীতে আমার আর কে আছে, জ্যাক?" ইদা জ্যাককে দুই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল!

অবশেষে যাইবার দিন

আসিল। যাইবার পূর্ব্বে জ্যাক রিভালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। এ কয়দিন সে সেদিকে যায় নাই। মা বারণ করিয়া দিয়াছিল।

জ্যাক বলিল, "দাদা, আমি যাচ্ছি।"

রিভাল কহিলেন,"যাচ্ছ,দাদা—ওরা শুনলে না! তবে এস ভাই—কিন্তু একটা জিনিস আমি দিচ্ছি—যত্নে রেখো! তোমার পড়বার জন্ত একবাক্স বই আমি বেছে রেখেছি, জ্যাক! জেনো, এমন বন্ধু জগতে আর কেউ নেই! দুঃখে শোকে আশ্চর্য্য সান্ত্বনা পাবে, তুমি, এই বইয়ের মধ্যে! এমন সান্ত্বনা মানুষ দিতে পারে না জ্যাক! এ বইগুলি যত্নে রেখো, আর পড়ো। নীচ লোকগুলোর সঙ্গে মিশোনা—তাদের কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে যোগ দিয়ো না—অবসর যা পাবে, তাতে এই বই পড়ো, যদি বুঝতে না পারো সব, ক্ষতি নাই—তবু পড়ো—পড়তে পড়তে একদিন সব বুঝতে পারবে! বল, পড়বে?"

"পড়ব, দাদা!"

"ঐ যে বাক্স—একেবারে ভরা আছে। এগুলি তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। জ্যাক—সিসিলের সঙ্গে যাবার আগে দেখা হল না। সে তার দিদিমার সঙ্গে পাহাড় দেখতে গেছে, আমি তাকে বলব!"

"তবে আসি, দাদা—সিসিলকে বলো, দেখা হল না বলে, সে যেন না রাগ করে!"

রিভাল বালককে সাগ্রহে আলিঙ্গন করিল। বৃদ্ধের অন্তরের মধ্য হইতে একটা সহানুভূতিমিশ্রিত হাহাকার ঠিকরিয়া বাহির হইল, "আহা, বেচারা জ্যাক!"

জ্যাক চলিয়া গেল। আরামকুঞ্জের সম্মুখে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জিনিষপত্র বোঝাই হইতেছে। জ্যাক মার কাছে গেল—ইদা জ্যাককে বুকে চাপিয়া ধরিল—এমন সময় বাহির হইতে ডাক পড়িল, "এসো, জ্যাক।"

জ্যাক বাহিরে আসিল। ইদা লাবাসাঁদরকে কহিল, "তাদের বলে দেবেন, জ্যাককে যেন তারা খুব যত্ন করে!"

"নিশ্চয়—সে কথা আর বলতে হবে না।"

"জ্যাক!"

"মা!"

সার্লটি কোনমতে অশ্রু চাপিয়া রাখিতে পারিল না। জ্যাকের চক্ষে অশ্রু ছিল না—সে আপনাকে সুদৃঢ় করিয়া ফেলিয়াছিল। মার দুঃখ ঘুচাইতে চলিয়াছে সে, ইহাতে কি গৌরব, কি সুখ! এ বিচ্ছেদের কষ্ট ক্ষণিক। তারপর? সে মানুষ হইয়া ফিরিলে মার আর কোন কষ্ট থাকিবে না, ইহাতে কি ক্রন্দন শোভা পায়! জ্যাকের মনে একটা গর্ব্ব হইতেছিল—সে মার জন্ত আজ কি ভাবে আপনাকে বলি দিতে চলিয়াছে! ধন্ত সে!

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ইদা কহিল, "জ্যাক চিঠি লিখো আমাকে।" তারপর যখন পথ বাঁকিয়া গাড়ী অন্ত পথে পড়িল, তখন জ্যাক পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে, দূরে লতাগুল্মের মধ্যে তাহাদের বাটীর জানালার পাশে দাঁড়াইয়া, এক নারী। জ্যাক নিমেষে চিনিল—সে মা!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

দেহ-দ্যুতি।

দেহ-দ্যুতি—বিষয়টা আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নূতন নহে। বহুদিন হইতে রূপবর্ণনায় ও চিত্রের পরিকল্পনায় দেবদেবীমূর্ত্তি অপূর্ব্ব-জ্যোতিমণ্ডিত হইয়া আসিতেছে। চিত্রশিল্পীর প্রসাদে ঋষিদিগের জটাজূটবিলম্বিত মস্তকেও তপশ্চর্য্যা বিচ্ছুরিত হইতে দেখিতে পাই এবং সাধুমহাত্মাদিগের চিত্রেও শিরোভূষণস্বরূপ জ্যোতির্মুকুট প্রকটিত দেখি। চিত্রের কথাই বা বলি কেন? আজও ত আমাদের দেশে রূপলাবণ্যময়ী কুলবালাগণ "বর আলো" করিয়া থাকেন। এই অন্তঃপুরাবদ্ধ অসূর্য্য-ম্পশ্যা রূপসীদিগের রূপপ্রভায় বুঝি অন্তঃপুর আলোকোদ্ভাসিত হইয়া থাকে, নচেৎ বোধ হয় অন্তঃপুর চিরতমিস্রাচ্ছন্ন থাকিত। কারণ সেখানে যে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশের আদৌ হুকুম নাই! কিন্তু এই জ্যোতি রূপসীদিগের বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত লোচনের দীপ্তি, না সর্ব্বদেহ নিঃসৃত রূপের ছটা? নয়নের জ্যোতি সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা আবশ্যক বোধ করি না, কারণ অনেকেই ইহার অস্তিত্বে সন্দেহ করেন না। স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই এই জ্যোতিঃসম্পদের অধিকারী। পুরুষের নয়নের দীপ্তি মধ্যাহ্ন তপনের প্রখর রশ্মির ন্যায় তীব্র ও মর্ম্মভেদী, এবং ইহার যে দাহিকা শক্তি নাই তাহাই বা কেমন করিয়া বলি, কারণ শুনিতে পাই পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের রোষকষায়িত লোচননিঃসৃত তীব্র রশ্মি কাহারও উপর নিপতিত হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ ভস্মস্তূপে পরিণত হইতে হয়। আর রমণীর? এই শশিমুখীদিগের নয়নচ্ছটা সাগর হৃদয়ে নৃত্যশীল চন্দ্রকিরণ লেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল হইলেও সময় বিশেষে ইঁহাদের কটাক্ষক্ষেপণে অনেকেই "চন্দ্রাবিষ্ট" হন। প্রবীণার কথায় বলি,—

"ভেবে দেখ, বীর; যে বিদ্যুৎ ছটা
ঝলে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে।"

এ সম্বন্ধে আমাদের যতই জ্ঞান থাকুক, ইহা কখনও জানা ছিল না যে দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি একরূপ আভার দ্বারা সর্ব্বদা সমাচ্ছন্ন এবং এই আভা ইচ্ছা করিলে প্রত্যক্ষ করা যায়।

সম্প্রতি Dr. Walter J. Kilner (ডাক্তার কিলনার) নামক জনৈক পাশ্চাত্য চিকিৎসক এই দেহনিঃসৃত আভা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং লণ্ডনের Ladbroke grove তাঁহার নিজ ভবনের পরীক্ষাগারে এক অভিনব উপায়ে দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণকে এই মানবদেহ নিঃসৃত আভা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার অবলম্বিত উপায়ের কিঞ্চিৎ আভাষ নিম্নে দিলাম।

একটী ক্ষীণালোক বিশিষ্ট ঘরের একটি জানালা হইতে ৮ ফুট দূরে রোগীকে (অর্থাৎ যাহার দেহের আভা পরীক্ষা করা হয়) নগ্ন-দেহে দাঁড় করান হয়। জানালাটী একখানি কালো পর্দ্দার দ্বারা আবৃত করা হয় এবং রোগীর পশ্চাতেও আর একখানি কালো পর্দ্দা স্থাপিত হয়। ঘরে এত সামান্য পরিমাণে আলোক রাখা হয় যে পরীক্ষক সেই ক্ষীণালোকে কিছুক্ষণ পরে দেখিতে অভ্যস্ত হইবামাত্র সেই রোগীর দেহটী দেখিতে পান। রোগীকে

যথাস্থানে দাঁড় করাইয়া পরীক্ষক গাঢ় নীল-বর্ণের তরল পদার্থ পরিপূর্ণ একটি অভিনব ক্ষুদ্র কাচপাত্রের ভিতর দিয়া অর্দ্ধমিনিট কাল একটি নাতি-উজ্জ্বল আলোকের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করেন, ইহার ফলে তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়ে অবশ্য কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে। ঠিক সেই সময়, অর্থাৎ অর্দ্ধ মিনিটকাল পরেই রোগীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঐরূপ আর একটি অভিনব ক্ষুদ্র কাচ পাত্রের ভিতর দিয়া পরীক্ষক রোগীর দিকে দৃষ্টি নিবেশ করেন। শেষোক্ত কাচ পাত্রটীও নীলবর্ণের তরলপদার্থ পরিপূর্ণ, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা রংটা কিছু ফিকে, কয়েক সেকেণ্ড পরেই তিনি রোগীর দেহনিঃসৃত আভা দেখিতে পান।

যাঁহারা এই আভা দেখিতে অভ্যস্ত তাঁহারা বলেন যে এই আভা বা ছায়া নীলাভ, এই আভা সর্ব্বদা সমস্ত মানবদেহ আবৃত করিয়া থাকে এবং ইহার বিস্তৃতি মানবের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। মৃত্যুর পর এই আভা অন্তর্হিত হয়, আর দেখা যায় না।

ডাক্তার কিল্‌নার বলেন যে, পুরুষরমণী নির্ব্বিশেষে সকলের দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি কি জাগরিতাবস্থায় কি নিদ্রিতাবস্থায় সকল সময়ই এই আভার দ্বারা আবৃত থাকে। এই আভা কল্পনাপ্রসূত নহে, বাস্তবিকই ইহার অস্তিত্ব আছে, কারণ সময়ে সময়ে এরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি জন্ম পরিগ্রহ করেন যাঁহারা সহজ চক্ষুতেই এই দেহের আভা দেখিতে পান।

ডাক্তার কিল্‌নার আরও দেখাইয়াছেন যে দেহের আভা রোগ নির্ণয়েও যথেষ্ট সহায়তা করে। এই আভা স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। সুস্থাবস্থায় আভার যেরূপ বিস্তৃতি দেখা যায়, দেহ রোগাক্রান্ত হইলে আভা সেরূপ বিস্তৃত থাকে না। দেহের কোন অঙ্গ রোগাক্রান্ত হইলে ঠিক সেই অঙ্গনিঃসৃত আভা অনেক সঙ্কুচিত হয়। মূর্চ্ছা (Hysteria) রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের দেহের আভার পরিবর্ত্তন ঘটে। দেহের একাংশের আভা অপরাংশ হইতে বেশী বিস্তৃত দেখা যায়। ডাক্তার কিলনারের মত এইরূপ, চিকিৎসকেরা দেহের আভা দেখিয়া রোগ নির্ণয়ে সমর্থ হইলে, চিকিৎসা শাস্ত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হইবে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র সিংহ।

উল্কাপিণ্ড।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে নির্ম্মল আকাশপটে একটি সুতীব্র উজ্জ্বল আলোক-রেখা অঙ্কিত করিয়া উল্কাপাত হইতেছে। আমাদের দেশে উল্কাপাত বিরল হইলেও অন্যান্য দেশে একবারে এত উল্কাবৃষ্টি হয় যে, আকাশ উল্কালোকে একেবারে আলোকিত হইয়া পড়ে। ইহারা কোথা হইতে আসে, উহাদের গঠনোপাদানই বা কি, এ প্রশ্ন লইয়া পণ্ডিতসমাজে অনেকদিন হইতে আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। ইহাদের

আকার নানারকমের দেখা যায় এবং বিভিন্ন উল্কার বিভিন্ন গতিও আছে। নক্ষত্রাকার উল্কাপিণ্ডই সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। চিরনির্দ্দিষ্ট সৌরজগতের নিয়ম ব্যতিক্রম করিয়া, অনির্দ্দিষ্ট এবং সতত ভ্রাম্যমান্ আগ্নেয়পিণ্ডের অপ্রত্যাশিত উদয়, মানুষ চিরকালই একটা দুর্ঘটনা ও দুঃসময়ের সূচনা বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছে। ইহার সত্যাসত্য বিচার করিবার ক্ষমতা আমার নাই, তবে বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া যতটা বোঝা যায় তাহাতে নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, এইরূপ ভীতির কোনোই কারণ নাই।

বৎসরের পর বৎসর রাত্রির পর রাত্রি নিরবচ্ছিন্ন পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আকাশের কোনো একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে সাধারণতঃ উল্কাবর্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ ইহাকে Radiant point অর্থাৎ বিকিরণকেন্দ্র নাম দিয়াছেন। আগষ্ট ও নভেম্বর মাসই উল্কাবর্ষণের প্রকৃষ্ট সময়। সে সময় প্রত্যেক জ্যোতিষীই নিজ নিজ দূরবীণ আঁটিয়া আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে একজন জ্যোতিষী প্রচুর উল্কাবর্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে, আবার ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নভেম্বরের প্রারম্ভে পুনর্ব্বার ঐ একই স্থান হইতে উল্কাপাত লক্ষিত হইয়াছিল। ক্রমাগত এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, যে, Leo নামক নক্ষত্রটির নিকটস্থ স্থান হইতেই এইরূপ উল্কাবর্ষণ হয়।

এ পর্য্যন্ত কত যে উল্কাবর্ষণ লক্ষিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সকল ছোটোবড় উল্কাবর্ষণের তালিকা লিখিতে গেলে শতাধিক পৃষ্ঠা ভরিয়া যায়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে হেস্ সাহেব এই উল্কাপিণ্ড-তত্ত্ব লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন। কিছুদিন পর তিনি বলেন যে, উল্কাবর্ষণ প্রকৃতির একটি সাধারণ ব্যাপার,—ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবার কোনো কারণ নাই। তিনি বলেন যে উহা ফস্ফরাস্‌জাতীয় (Phosphoric) এক প্রকার তরল পদার্থ দ্বারা গঠিত। উক্ত গ্যাস্ পৃথিবী হইতে ক্রমাগতই ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া বিভিন্ন আকারে ঊর্দ্ধাকাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। অতঃপর সেই বিক্ষিপ্ত বাষ্পরাশি একত্রিত হইলে, পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণহেতু তাহা ধরাভিমুখে ছুটিতে থাকে। প্রচণ্ডবেগে আসিবার সময় বাতাসে ঘর্ষণ লাগিয়া উক্ত বাষ্পরাশি যখন উত্তপ্ত হইয়া অবশেষে জ্বলিয়া উঠে, তখনই আমরা তাহাকে উল্কাপিণ্ডরূপে দেখিতে পাই।

হেস্ সাহেবের উক্ত সিদ্ধান্ত ব্যতীত আরও অনেকের অনেক সিদ্ধান্ত আছে। বিজ্ঞানপাঠক মাত্রেই জানেন যে, "এককালে চন্দ্রপৃষ্ঠে শত শত সতেজ আগ্নেয়-গিরিতে" পূর্ণ ছিল। এখন সেগুলি নিস্তেজ হইলেও তাহার গহ্বরগুলি এখনও চন্দ্রপৃষ্ঠে, ভূপতিত জলবিন্দুর ন্যায় দেখা যায়। চন্দ্রস্থ আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের সময় প্রচণ্ডবেগে ঊর্দ্ধোত্থিত গলিত ধাতুভস্মাদি চন্দ্রমণ্ডলে ছড়াইয়া গিয়াছিল। সেই সকল ধাতুপিণ্ড কোনোক্রমে পৃথিবীর আকর্ষণের ভিতর আসিয়া পড়ায় আমরা তাহাদিগকে

উল্কারূপে প্রবলবেগে ধেয়া অভিমুখে পতিত হইতে দেখি। বৈজ্ঞানিকসমাজে এই সিদ্ধান্তেরও সমর্থনকারী একটি দল আছে। অন্য একজন জ্যোতিষী বলেন যে উল্কাপিণ্ড-গুলিও গ্রহতারকার ন্যায় সতত সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে,—তাহারা যখন ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর কক্ষাকে স্পর্শ করে তখন তাহারা এই ধরাচ্ছাদনকারী বিশাল বায়ুমণ্ডলের ভিতর আসিয়া পড়ে। তাহারা এমন কতকগুলি পদার্থ দ্বারা গঠিত যাহা বায়ুস্পর্শে জ্বলিয়া উঠে। সুতরাং আমরা তখন তাহাদিগকে উল্কারূপে দেখিতে পাই। জ্বলিয়া উঠিবার পর তাহারা ভস্ম হইয়া পৃথিবীতে বা অন্য কোনো নক্ষত্র বা গ্রহের আকর্ষণের মধ্যে আসিয়া পড়ে।

একদল বৈজ্ঞানিক বলেন, উল্কাপিণ্ডগুলি ধূমকেতুর পুচ্ছস্থিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাষ্পকণা দ্বারা গঠিত। তাঁহাদের মতে, ধূমকেতুর পুচ্ছ অতিশয় লঘু ছোট ছোট ধাতুকণাদ্বারা গঠিত। কোনো ধূমকেতু পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইলে পুচ্ছস্থিত উক্ত ধাতুকণাগুলি পৃথিবীর আকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভিতর আসিয়া পড়ে।

উল্কাপিণ্ডের জন্ম সম্বন্ধে আমরা যতগুলি মত শুনিলাম তন্মধ্যে শেষ মতটিই আমাদের যুক্তিপূর্ণ ও সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। কারণ জ্যোতিষীগণের নিকট উল্কাপাতের হিসাব চাহিলে তাঁহারা উল্কাপাতের যে সকল তালিকা দাখিল করেন, তাহাদের অধিকাংশই কোনো না কোনো ধূমকেতুর উদয়ের পরবর্ত্তী কালের।

যেসকল ধূমকেতুর পুচ্ছের ধাতুকণাগুলি অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট, সেই সকল পুচ্ছ হইতে পৃথিবী একবারে অধিক পরিমাণে উল্কাসংগ্রহ করিতে পারে। সেইজন্যই সাধারণতঃ দেখা যায় যে ধূমকেতুর উদয়ের পরে আকাশে উল্কাবর্ষণের মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক। প্রমাণ-স্বরূপ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, যথাক্রমে ২৭২৪, ১৮৩৮ ও ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বিয়ালাসাহেবের আবিষ্কৃত ধূমকেতুর উদয়ের পরেই আকাশে প্রচুর উল্কাবর্ষণ দেখা গিয়াছিল। বৃহস্পতি গ্রহটি আমাদের সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জ্যোতিষীগণ বলেন বৃহদাকার বলিয়া বৃহস্পতি পৃথিবী অপেক্ষা ধূমকেতু-পুচ্ছ হইতে অনেক বেশী উল্কাপিণ্ড বা ধাতুকণা আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে।

পৃথিবীকে, ধূমকেতু-পুচ্ছের অতি নিকটবর্ত্তী হওয়ায় অদ্য, একবারও ধাক্কা খাইতে হয় নাই। অনেকবার অনেক পরীক্ষা আসিয়াছিল, কিন্তু পৃথিবী তাহা নির্ব্বিঘ্নে খওাইয়া আসিয়াছে। ধূমকেতুর সহিত পৃথিবীর কেমন করিয়া ধাক্কা লাগে তাহা বোধহয় পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন। ধূমকেতুও সূর্য্যের চারিদিকে নিজের কক্ষার উপর ঘুরিতেছে কিন্তু তাহার কক্ষা, পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহের কক্ষা হইতে অনেক বড় বলিয়া পৃথিবী যেমন একবৎসরে সূর্য্যের চারিদিকে আপনার আবর্ত্তন শেষ করে তদ্রূপ কোনো ধূমকেতু ৩৬ বা ৭৫ অথবা ততোধিক বৎসরে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আপনার আবর্ত্তনটি শেষ করে। পৃথিবী ও ধূমকেতুর কক্ষা যেস্থানে পরস্পর কর্ত্তিত হয়, ধাক্কা লাগিবার সম্ভাবনা হইলে সেই দুইটি সঙ্গম স্থলের একটিতে সম্ভব। অনেক ধূমকেতুর এইরূপ স্থানে

পৃথিবীর সহিত ধাক্কা লাগিবার অনেক সুযোগ চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের ধরিত্রী দেবী তাঁহার সন্তানদিগকে ক্রোড়ে লইয়া অতি অল্পের জন্যই পাশ কাটাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে যখন বেয়ালাসাহেবের ধূমকেতুটির সহিত পৃথিবীর ধাক্কা লাগিবার সম্ভাবনা ছিল তখন সমগ্র বৈজ্ঞানিক সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু জ্যোতিষীগণ হিসাব করিয়া দেখিলেন, এক মাস কালের জন্য পৃথিবী সেবার ধূমকেতুটির পাশ্ এড়াইয়া যাইবে। অর্থাৎ ধূমকেতু ও পৃথিবীর কক্ষার সন্ধিস্থলটি, পৃথিবী অতিক্রম করিয়া যাইবার একমাস পরে ধূমকেতুটি ছুটিতে ছুটিতে সেই সন্ধিস্থানটি পার হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং এক মাসের ব্যতিক্রমে পৃথিবী যে সেবার চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত তাহাতে সন্দেহ মাত্র ছিল না। সেবারও আমাদের পৃথিবী উক্ত ধূমকেতুর পুচ্ছাকর্ষণ দ্বারা প্রচুর উল্কাপিণ্ড টানিয়া আনিয়াছিল। তাহার পর, সেদিন হ্যালির ধূমকেতুটির সহিত আমাদের পৃথিবীর ঠিক পূর্ব্বোক্ত প্রকার শুভ সম্মিলনের আশঙ্কা ছিল। এই কেতু-ক্ষত্রমিলনের ভয়ে ধরণীবাসী একান্ত ব্যগ্র এবং উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু জ্যোতিষীগণ যখন "মা ভৈঃ" বলিয়া পৃথিবী নামের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন তখন সকলে হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। সেবার আর একমাস নয়, কয়েক ঘণ্টার জন্য ধরণী দেবী ধূমকেতুর আলিঙ্গন এড়াইয়াছিলেন। এই দুইটি ঘটনা ব্যতীত ধূমকেতু হইতে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবী ধ্বংসের জন্য কোনো কারণ ঘটিয়া উঠে নাই। পরবর্ত্তীকালে ঘটিবে কি না জানি না।

হ্যালির ধূমকেতুর উদয়ের পরও জ্যোতিষী-গণ আকাশে প্রচুর উল্কাবর্ষণ দৃষ্টি গোচর করিয়াছিলেন। ধূমকেতুর পুচ্ছ যে সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধাতুকণাদ্বারা গঠিত, সে গুলি এত লঘু যে যোজনব্যাপী ধূমকেতুপুচ্ছের ওজন সের দুই-এর অধিক হইবে না। কয়েক বৎসর ব্যাপী উল্কাবর্ষণ ও তাহাদের ধরাপতিত সামান্য চিহ্ন দ্বারা জ্যোতিষীগণ স্থির করিয়াছেন যে, তাহাদের ওজন ৩০ গ্রেণ হইতে ৭½ পাউণ্ডের অধিক হইতে পারে না।

এখন পাঠক পাঠিকাগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "আমাদের পৃথিবী ছাড়াইয়া কত মাইল দূরে উল্কাপিণ্ডগুলি অনন্তভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং কত মাইলের ভিতরই বা আমরা তাহাদের নির্ব্বাণ দেখিয়া থাকি।" এ পর্য্যন্ত কোনো জ্যোতির্বীই এ প্রশ্নের একটা সঠিক উত্তর দিতে পারেন নাই। নানা স্থান হইতে পর্য্যবেক্ষণ তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। উল্কাপিণ্ডের জ্বলন ও নির্ব্বাণ সম্বন্ধে মোটামুটী যে একটা নিয়ম ঠিক করিয়াছেন তাহা এইরূপ। ধরাতল হইতে শতাধিক মাইলের উপর পর্য্যন্ত বায়ু-মণ্ডল বর্ত্তমান আছে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে প্রায় দুই শত উল্কাপিণ্ডের বর্ষণ দেখা গিয়াছিল। তন্মধ্যে প্রত্যেক উল্কাটিই ধরাতল হইতে ২৪ হইতে ৭০ মাইলের ভিতর জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ইহার পর ১৮৬৩ ও ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে যে উল্কা-বর্ষণ দেখা গিয়াছিল তাহাতেও প্রত্যেক উল্কার জ্বলন পূর্ব্বোক্ত দূরত্ব অনুসারে দেখা

গিয়াছিল। পৃথিবী ও উহার ভিতর ৩৪ মাইল ব্যবধান থাকিতে থাকিতে মোটামুটী প্রত্যেক উল্কারই নির্ব্বাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

উল্কাপিণ্ডগুলি যে কি ভীষণবেগে পৃথিবীর দিকে ছুটিয়া আসে তাহা আমাদের কল্পনারও অতীত। একটি অনন্ত পিণ্ড এত জোরে ছুটিয়া আসে যে তাহার আসল আকারটি আমাদের চোখে না পড়িয়া আকাশ-পথে একটি তীব্রোজ্জ্বল আলোক রেখা দেখিয়া থাকি। বলাবাহুল্য এটি আমাদের দৃষ্টিভ্রম। সকলেরই জানা আছে যে আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা প্রথমে আমাদের চক্ষুতে পড়িয়া চক্ষুর মধ্য দিয়া রেটিনা নামক পর্দ্দার উপর পতিত হয়। অতঃপর চক্ষুস্নায়ু (optical nerves) দ্বারা তাহার অস্তিত্বের অনুভূতি মস্তিষ্কে চালিত হওয়ায় আমরা সেই ছবি দেখিতে পাই। এই কাজটি এত দ্রুত হয় যে এ জন্য আমাদের কোনো প্রয়াস পাইতে হয় না, নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় ইহা অতি সহজে সম্পন্ন হইয়া যায়। কিন্তু স্বীকার করিতে হইবেই হইবে যে এই কার্য্যটি সমাধান হইতে কিছু না কিছু সময়ক্ষেপ হয়ই হয়। উল্কাপাতের সময় উল্কাপিণ্ডের আকারটি আমাদের চক্ষুতে মুদ্রিত হইতে না হইতেই তাহা আপনার ভীষণ গতিতে চলিতে থাকে। আমাদের চক্ষু স্থায়ী রূপে উল্কার কোনো ছবি লাভ করিতে পারে না। ইহার সহজ দৃষ্টান্ত,—একখানি কাষ্ঠখণ্ডের অগ্রভাগে অগ্নি সংযোগ করিয়া তাহা অনবরত যদি ঘুরানো যায় তো কাষ্ঠখণ্ডটির অনন্ত অগ্রভাগ আমাদের চোখে একটি আলোক রেখা বলিয়াই প্রত্যক্ষ হয়। উল্কাপিণ্ড কত বেগে ধরাভিমুখে পতিত হয় তাহা শুনিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। মোটামুটি হিসাব দ্বারা বলা যাইতে পারে যে উল্কাপিণ্ডগুলি সাধারণত এক সেকেণ্ডে ৩৪½ মাইল বেগে ধরাভিমুখে ছুটিয়া থাকে। এইরূপ প্রবলবেগে আকাশ পথে আসিতে আসিতে প্রথমে উত্তপ্ত অবশেষে দগ্ধ ও ভস্মসাৎ হইয়া আকাশ পথেই তাহারা বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। কখনো কখনো মাত্র পৃথিবীর উপর উক্ত দগ্ধীভূত উল্কাপিণ্ড পতিত হইতে দেখা যায়। অনেক সময় পণ্ডিতগণ এই পতিত ভস্মরাশি পরীক্ষা করিয়া উল্কাপিণ্ডগুলির উপাদান স্থির করেন। এতদ্ব্যতীত উল্কাপিণ্ডের উপাদান জানিবার অন্য কোনো উপায় নাই।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

মিলন।

শীতের অকাল সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে; এমনি সময় সে জীর্ণ ভগ্ন পান্থশালায় এসে দাঁড়াল'।

কেউ বল্‌ত ভাগ্যহীনা সে, তা' না হ'লে কি সে রাজার অন্তরের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে। কেউ বল্‌ত দেবী সে, নইলে নারী হয়ে কি কেউ প্রেমের ডাক অগ্রাহ্য করতে পারে!

ঘরের মধ্যে ঢুকে সে দেখলে;—বৃদ্ধ পান্থশালার মালিক চারিদিকের জানালা বন্ধ করে চোখ বুজে আগুনের ধারে উপর

হাত বাড়িয়ে বসে আছে। বাহির থেকে অন্য কোন শব্দ আসছিল না, কেবল মধ্যে মধ্যে বিরহী বাতাসের আর্ত্তনাদ কাচের জানালার উপর আছাড় খেয়ে পড়ছিল।

হিমে ঠাণ্ডায় তার মুখ বরফের মত সাদা দেখাচ্ছিল, শীতের হাওয়ায় শরীরের হাড় কটা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল; অবসন্ন পা কিছুতেই যেন বশ মানছিল না। আস্তে আস্তে সে আগুনের সরায় কাছে বৃদ্ধের পাশে এসে বসে, ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের ভিতর থেকে হাত বার করে আগুনের উপর ধরলে। তার সাদা মুখের উপর আগুনের ম্লান লাল আভা প'ড়ে অস্তে গমনোন্মুখ সূর্য্যের সোনালি রঙের মত আর তার কোঁকড়ান লম্বা চুল গুলো ঠিক সোনালি সুতোর মত দেখাচ্ছিল।

চোখ খুলে, সম্মুখে নারীমূর্ত্তি দেখে বৃদ্ধ একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল, কিন্তু কোন কথা না বলে ঘরের কোণ হতে একটা কাঠের পিঁড়ি এনে তাকে বসতে দিলে। আজ ২৪ বৎসর এই ঘরে বসে তার চুল সাদা হয়ে গেল কিন্তু এ পর্য্যন্ত এরূপ নারী কখনও এখানে বিশ্রাম করতে আসেনি। তার মুখের শ্রী, চোখের কমনীয়তা দেখে সে অবাক হয়ে গেল। চেহারা দেখে মনে হয় কোন কারণে তার শ্রীর উপর ছাইচাপা পড়ে গেছে। কিন্তু মাটীচাপা হীরকের মত কোন দিন সে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে!

বৃদ্ধ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে "তুমি কোন পথে আসচ্ আর কোন্ পথে যাবে?"

নারী উত্তর দিলে—"অনেক দূরদেশে তোমাদের রাজার নূতন প্রাসাদ দেখতে এসেছি।"

বিস্ময়ে চক্ষু কুঞ্চিত করে সে জিজ্ঞাসা করলে "এই অন্ধকার হাড়ভাঙ্গা শীতের রাত্রে কেবল প্রাসাদ দেখবার জন্য এসেছ? তোমার মত নারীর সহিত কেউ নাই কেন"?

নিরাশার স্বরে একটু পরে নারী বল্লে, "আকাশের তারা ছাড়া আমার দিকে চাইবার আর কেউ নেই। শোন বৃদ্ধ, মুক্ত বায়ুর মত আমি স্বাধীন।"

একথা বৃদ্ধের হৃদয়ে কাঁটার মত যেন বিঁধে গেল। সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'রে বল্লে—"আমারই মতন!" আপনার নিরাশ্রয়তার কথা মনে করে এতদিন সে নারী নিজেকে নিতান্ত দুঃখিনী মনে করত। আজ বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় বিহীন এই বৃদ্ধকে দেখে একটু যেন আনন্দ অনুভব করতে লাগল। বৃদ্ধের নিরাশ মুখের দিকে চেয়ে তার জীবনের কাহিনী বায়স্কোপের ছবির মত সাম্নে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মনের আবেগে সে বল্লে "তবে শোন বৃদ্ধ,—আমার জীবনের দুটি কথা শোন।"

রাত্রি তখন গভীর হয়ে এসেছে—বাহির থেকে বাতাসের এবং ঝিল্লির শব্দ আসছিল। অন্য কোন অতিথি আসবার সম্ভাবনা ছিল না। কেবল অন্ধকারে ঢাকা ঘরের এক কোণে এক লক্ষ্মীছাড়া পথিক আপাদমস্তক এক ছেঁড়া কম্বল দিয়ে ঢেকে অকাতরে ঘুমুচ্ছিল, তার নাকডাকার শব্দে ঘর যেন কেঁপে উঠছিল।

নারী বল্লে "তোমাদের রাজা একবার দেশের চিত্রকরদের জড়ো করলেন—

উদ্দেশ্য—কে সব চেয়ে ভাল চিত্রকর বিচার করা। অনেক দূর দেশ হতে বড় বড় চিত্রকর একত্রিত হয়েছিল। কেউ রাজার চেহারা, কেউ রাজার প্রাসাদ আবার কেউ রাজার ফুলের বাগান কিম্বা পুষ্করিণীর ছবি এঁকেছিল। এ ছবিগুলি রাজার পছন্দ হলনা, কিন্তু যখন আমার আঁকা ছবিটী তাঁর সম্মুখে ধরা হল, তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে সভা স্তব্ধ হয়ে গেল। রাজা আর অন্যদিকে চোখ ফেরাতে পারলেন না; সভাশুদ্ধ নামজাদা চিত্রকরদের মাথা আমার পায়ের কাছে নত হয়ে গেল।

সভা যখন শেষ হ'ল, তখন অন্যান্য চিত্রকরেরা হিংসায় অপমানে সভাগৃহ ত্যাগ করে চলে গেল। সভায় রইলেন কেবল সিংহাসনে বসে একা রাজা! তিনি সিংহাসন থেকে উঠে এসে আমার গলায় বিবাহ মাল্য পরাতে এলেন! কিন্তু আমার মত বন্ধনমুক্ত নারী কি প্রেমের শৃঙ্খল পরতে পারে? হোক্‌না সে রাজা? পৃথিবীর সুদৃঢ় মিলন দৃশ্যকে ভেঙ্গে বিচ্ছেদের দৃশ্য স্থাপন করবার জন্য আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলাম। তাই বিবাহমাল্য রাজার হাতে রইল আমি ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলাম।

সহর ত্যাগ করে অন্যদেশে নদীর ধারে এক কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় নিলাম। সেখানে ছবি এঁকে নিজের করুণ সৌন্দর্য্যমণ্ডিত চেহারা আর জ্যোৎস্নার মত শুভ্র হাত দুখানি দেখে দিন কেটে যেত। কিন্তু সেখানে এক গাছ আর এক গাছের উপর ঠেকে, একলতা আর এক গাছকে জড়িয়ে, এক বৃন্তে দুটী ফুল ফুটে আমার বিচ্ছেদকে যেন উপহাস করত।"

এমনি সময় সেই নিদ্রিত, লক্ষ্মীছাড়া অতিথিটা এ পাশ ওপাশ করতে লাগল'।

নারী আবার আরম্ভ করলে, "তার পর এমনি করে ছবি এঁকে এঁকে আমার দিন কাটত। কিন্তু সেই স্যাঁতসেতে কুঁড়ে ঘর আমার সহ্য হলনা, ক্রমে ক্রমে শরীর ভেঙ্গে পড়ল। তবুও এক দিনের জন্যে দুঃখ করিনি। কিন্তু ভয়ঙ্কর ভয় হল; ভয় থেকে উঠে দেখি গোলাপ ফুলের পাপড়ির মত যে কেবল সৌন্দর্য্য ঝরে পড়েছে—তা নয়, আর ছবিও আঁকতে পারিনে, আমার যে ছবি দেখে রাজা মুগ্ধ হয়েছিলেন সেরূপ ছবি আঁকবার সামর্থ্য একেবারেই চলে গেছে!

তার পর থেকে থেকে আমার প্রাণের মধ্যে কেমন এক বিচ্ছেদের হাহাকার উঠত; সেই হাহাকার আমাকে নিরাশার হিম সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ে আমার প্রতিজ্ঞাকে হাল্‌কা করে দিলে। সেই কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আমি ভিখারিণী বেশে নানা দেশ ঘুরে আজ এই শীতের অকাল সন্ধ্যায় তোমার এখানে উপস্থিত হয়েছি,—কেন জান? যে ছবি দেখে নামজাদা চিত্রকরদের মাথা নত হয়েছিল, দর্প চূর্ণ হয়েছিল সেই ছবি একবার দেখব,—আর একদিন যিনি সেই ছবি দেখে আমাকে বিবাহমাল্য পরাতে গিয়েছিলেন তাঁকেও।

সে এক নিশ্বাসে কথাগুলি ব'লে উঠে দাঁড়াল; আর বৃদ্ধ নির্ব্বাণোন্মুখ আগুন উস্কে দিতে দিতে আত্মমনেই যেন ব'লে উঠলো, "তাই বুঝি আমাদের রাজা গৃহত্যাগী!" এমনি সময় সেই লক্ষ্মীছাড়া অতিথি উঠে নারীর সামনে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু একি? সেদিনকার রাত্রের রাজার সহিত এই অতিথির কি আশ্চর্য্য মিল!

দুজনের আর কোন কথা হইল না। আকাশের তামমান মেঘের মত দুটী প্রাণী এক ঠাঁই আসিয়া মিলিল।

* * *

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার।

শ্রীক্ষেত্র।

কার্ত্তিক সংখ্যায় শ্রীক্ষেত্রের ঐতিহাসিক বিবরণ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এবারে এখানকার বিদেশী ভ্রমণকারী প্রভৃতির বিষয় বলিব। কিন্তু তার আগে, আর দু' একটী কথা বলিতে চাই।

দুঃখের বিষয়, আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিকের কর্ত্তব্য অপক্ষপাতিতা;—কিন্তু গোঁড়ামী নয়। তাহা সর্ব্বত্র ধ্রুবের পরিপন্থী। গোঁড়ামী, বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। পরিশেষে, তাহা ঐতিহাসিকের সত্যপূত পন্থায় প্রবেশলাভ করিল? হায় গোঁড়ামী!

কি পাশ্চাত্য এবং কি ভারতীয় পণ্ডিত,—যিনিই উৎকলের প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন,—তাঁহাকেই বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে, যে বুদ্ধদন্তের উপরেই জগন্নাথের প্রতিষ্ঠা। এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের আচার আর বিধি আর নিয়ম আত্মসাৎ করিয়াই উৎকলের বৈষ্ণবধর্ম্ম আজ মহিমময়। অনেকদিন আগে, এই মত প্রচারিত হইয়াছিল। সংপ্রতি, নবাবিষ্কৃত বহু শিলালিপি ও তাম্রফলক প্রভৃতির দ্বারা আরও অনেক নূতন তথ্য জানা গিয়াছে। নূতন তথ্য, পুরাতনেরই পথাকর হইয়াছে। পরন্তু, তাহাতে শ্রীক্ষেত্রের হিন্দুধর্ম্মের উপর হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচ্ছাদনী সরিয়া যায় নাই। কেহ কেহ সে চেষ্টা, করিয়াছিলেন বটে,—চেষ্টা মাত্র! তাহা বিফল হইয়াছে।

এই সকল চেষ্টাকারীর মধ্যে, বিশ্বকোষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু অন্যতম। তিনি শ্রীক্ষেত্রে বৌদ্ধপ্রভাবের কথা অস্বীকার করেন। (১) কিন্তু ঐতিহাসিকের পক্ষে কেবল "অস্বীকার"ই প্রচুর নয়,—প্রমাণ চাই। সুতরাং নগেন্দ্র বাবু কতকগুলি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে যে কিছু সপ্রমাণ হইয়াছে,—এমন মনে হয় না। তাঁহার প্রতিবাদ করিবার সাহস রাখি না। তবে স্বল্পবুদ্ধিতে আজ যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই বলিব।

নগেন্দ্র বাবু, বলিতে চান, উৎকলে বৌদ্ধপ্রভাবের পূর্ব্বে পুরাণাদিতে জগন্নাথের মহিমার কথা পাওয়া যায়। রথযাত্রাও আগে ছিল, ইত্যাদি। এ কথা, আমরাও মানি।

তথাপি, রজনী তাহার আঁধারভূঙ্গার হইতে তমিস্রধারা ঢালিয়া, যেমন দিবার ধবলিমা বিভা ঢাকিয়া রাখিতে পারে না, তেমন, বিদ্যমান জগন্নাথ যে বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়ায়

---

(১) বিশ্বকোষ।

আত্মভরণ করিতেছেন, সে কথা সহস্রচেষ্টায় চাপিয়া রাখা যায় না। ঐতিহাসিকগণ বলেন, বুদ্ধের দন্তযাত্রার অনুকরণে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। নগেন্দ্র বাবু বলেন, বৌদ্ধপ্রভাবের পূর্ব্বে রথযাত্রা,—ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। বেশ কথা। এখন, আমরা জানিতে চাই, যে বৌদ্ধপ্রভাবের পূর্ব্বে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা প্রচলিত ছিল কি না? আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, যে কোন প্রাচীন ও প্রামাণিক পুস্তকে একথার উল্লেখ নাই। নগেন্দ্র বাবুও, তাহা দেখাইতে পারেন নাই। সুতরাং নগেন্দ্র বাবুর প্রতিবাদের পরেও আমরা ধরিয়া লইতে বাধ্য হইলাম, যে শ্রীক্ষেত্রের রথযাত্রা, বৌদ্ধগণের দন্তযাত্রার অনুকরণ।

দ্বিতীয় কথা। শ্রীক্ষেত্রে সকল জাতিই নির্ব্বিচারে একত্রে পানভোজন করে। এতাদৃশ নিয়ম, আর কোন হিন্দুতীর্থে বা হিন্দুশাস্ত্রে দর্শন বা পাঠ করা যায় না। এবং নগেন্দ্র বাবুও দেখাইতে পারিবেন না, যে কোন প্রাচীন পুস্তকে (যাহা শ্রীক্ষেত্রে বৌদ্ধ প্রভাবের পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল) শ্রীক্ষেত্রে এরূপ একত্রভোজনের প্রথার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

"কিন্তু শুধু জগন্নাথ বলিয়া নহে—উৎকলখণ্ডের সর্ব্বত্র মতবিরোধের মধ্যে একটা নির্ব্বিবাদ ঐক্যস্থাপনচেষ্টা দেখা যায়। বৈষ্ণবের পক্ষে শিবের মন্দিরনির্ম্মাণ উড়িষ্যায় একটা মহাপুণ্যকার্য্য বলিয়া গণ্য। অথচ ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশে বৈষ্ণবে শৈবে অনেক সময় মুখ দেখাদেখি নাই। * * * উড়িষ্যায় জগন্নাথের মন্দিরে, শৈবদেবতা, শিবের মন্দিরে বৈষ্ণব নৃসিংহ। ভুবনেশ্বরে দোলযাত্রা সম্পাদিত হয়। * * * এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই সন্দেহ হয় যে, উড়িষ্যায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের * * ফলে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌরদিগের মধ্যে বিরোধ অন্তর্হিত হইয়া ক্রমক্রমে অনেকটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে।" (২)

এই উক্তিতে ভ্রম দেখাইবার আগে, ভরসা করি, নগেন্দ্র বাবু, ভারতবর্ষের অন্যান্য তীর্থে, এইরূপ বিক্ষিপ্তকে একীকরণের চিহ্ন দেখাইবেন। তবে, তিনি যদি বলিয়া বসেন, যে আমাদের কবিগণ, দুর্গা, কালী ও কৃষ্ণকে অভিন্ন বলিয়াছেন, শাস্ত্রে হরিহর মূর্ত্তি আছে এবং বৃন্দাবনে কালীর মন্দির আছে,—তাহা হইলে অবশ্য আমরা নাচার!

তৃতীয় কথা। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ, বৌদ্ধগণের উপাস্য। বৌদ্ধমতে, সংঘের স্ত্রীরূপ। আশ্চর্য্য এই, যে শ্রীক্ষেত্রেও বৈষ্ণবগণের উপাস্য মূর্ত্তি তিনটীর বেশী নয়,—এবং তাহার মধ্যেও একটী স্ত্রীমূর্ত্তি। রাজেন্দ্র বাবু, তাঁহার পুস্তকে বৌদ্ধত্রিমূর্ত্তির যে ছবি দিয়াছেন, তাহার সহিত শ্রীক্ষেত্রের ত্রিমূর্ত্তির অনেকটা সারূপ্য আছে। এ কথা উড়াইয়া দিলে চলিবে না।

চতুর্থ কথা। বৌদ্ধ মন্দিরের দ্বার, সর্ব্বস্থলেই পূর্ব্বদিকে। ভারতের কোন হিন্দু দেবালয়ের দ্বার পূর্ব্বদিকে নয়,—কেবল উৎকল ছাড়া।

পঞ্চম কথা। শ্রীক্ষেত্রে, মন্দিরের ভিতরে বুদ্ধদেবের এক প্রকাণ্ড প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি আছে। পাণ্ডারা সেই ঘরের দরজা সাবধানে

(২) রাজেন্দ্রনাথের প্রস্তাবনী। ৩৩১—৩৩।

বন্ধ করিয়া রাখে,—পাছে যাত্রিগণের চোখে সেই মূর্ত্তি পড়িয়া যায়—পাছে ঠাকুর জগন্নাথের পূর্ব্বজন্মের রহস্য বাহির হইয়া পড়ে,—পাছে পাণ্ডাদের উপার্জ্জনে হাত পড়ে। চালাক্ পাণ্ডারা, নগেন্দ্র বাবুর মত লোককেও ফাঁকি দিতে বাকি রাখে নাই দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। এ প্রমাণও কি প্রচুর নয়?

হিন্দুরা, সর্ব্বস্থলেই বৌদ্ধধর্ম্মকে হিন্দু ধর্ম্মের ভিতরে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমাদের দশমাবতারের ভিতরে তাই বুদ্ধদেবও অন্যতম। উৎকলের প্রধান ধর্ম্ম, তখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম। বহুদিন, বহুবৎসর বৌদ্ধমতবাদের ভিতরে আত্মগোপন করিয়া, উৎকলীয়গণ তখন মনেপ্রাণে বৌদ্ধাচারপ্রধান হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহারাজ যযাতিকেশরী, উৎকলের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া বুঝিলেন, যে বৌদ্ধধর্ম্ম মৃত হইয়াছে বটে এবং তাহার ভিতরে নবজীবনের ধারা আর বহিবে না বটে,—কিন্তু মৃতদেহটা এখনও আছে! রোপিতমূল অশ্বত্থকে যেমন মন্দির-ভিত্তি হইতে বিযুক্ত করা কঠিন, তেমনি উৎকলবাসিগণের অন্তর কন্দরের গভীরতম প্রদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মকে টানিয়া বাহির করা বড় কঠিন—বড় কঠিন! তিনি তখন হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যবর্ত্তী যবনিকা তুলিয়া দিলেন।

সমাজে আমরা দেখিতে পাই, সাধারণ মানুষের ভিতরে আচারই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। তুমি ভিতরে যাহাই হওনা কেন, যতদিন না তুমি হিন্দুআচারভ্রষ্ট হইবে, ততদিন তোমাকে অহিন্দু বলিব না।

এই সকল কথা বুঝিতে পারেন, তখন উৎকলে এমন একজন চতুর ব্যক্তির দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। যযাতিকেশরী, সেই অভাব দূর করিলেন। তাঁহার যত্নে মন্দির-বেদীতে পুনর্ব্বার হিন্দুদেবতার প্রতিষ্ঠা হইল বটে,—কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠাকার্য্যে যতটা সম্ভব বৌদ্ধ আচার বজায় রাখা হইল। বৌদ্ধেরা, ভিতরের কথা বুঝিলেন না। তাঁহারা দেখিলেন, একদিকে বুদ্ধ, সংঘ ও ধর্ম্ম এবং অন্যদিকে জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরাম। একদিকে দন্তযাত্রা এবং অন্যদিকে রথযাত্রা! এদিকে অহিংসা,—আর ও'দিকেও তাই। জাতিভেদ বড় ঘৃণার কথা! এখানেও ততটা না হোক্—অনেকটা তেমনি! অন্ততঃ, একসঙ্গে পানভোজনটাও ত চলিবে! তবে, আর এ দুটীতে বিশেষ পার্থক্য কোথায়? আগে "জয় বুদ্ধ" বলিতাম, এখন না হয় "জয় জগন্নাথ"টাই বলা যাক্—বুদ্ধের বদলে জগন্নাথ! মন্দ কি?

সুতরাং নবধর্ম্ম কাহারও কাছে বিশেষ কষ্টকর বলিয়া মনে হইল না। তাঁহারা জগন্নাথের পায়ে পূজার ফুল দিলেন; এবং দিনে দিনে ধীরে ধীরে হিন্দুধর্ম্মের ভিতরে মিশিয়া গেলেন।

উৎকলে, তখন এবংবিধ পরিবর্ত্তনই স্বাভাবিক। হইয়াওছিল তাই। সুতরাং সেজন্য কষ্টকল্পনার আবশ্যক নাই।

উৎকলে বিদেশীয় ভ্রমণকারিগণ।

অতঃপর, উৎকলের ভ্রমণকারিগণের কথা বলা যাক্।

আজ দুইহাজার বৎসর হইতে উৎকল, ভারতবাসীর বিস্ময়চকিতা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। পূর্ব্বে তাহা বৌদ্ধগণের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র ছিল। সুতরাং বৌদ্ধ ভ্রমণকারিগণ বিদেশ হইতে ভারতে আসিলে

উড়িষ্যাটা একবার না দেখিয়া ফিরিতেন না। তাহার পর হিন্দুতীর্থে পরিণতা হইয়া, উৎকল ভূমি বহুকোটী নরনারীর চক্ষুতে বরণীয়া হইয়া উঠিয়াছেন। শিল্পের প্রাণরঞ্জক সৌন্দর্য্যে পরিমণ্ডিতা হইয়া, উৎকলভূমি প্রত্যেক শিল্পরসজ্ঞের নিকটে আদরণীয়া হইয়াছে। বহুবিধ প্রাচীন ধ্বংসচূর্ণ গৌরবাবশেষে পরিপূর্ণা হইয়া এই গভীরদর্শী ভূমি প্রত্নতাত্ত্বিক গণকেও বড় অল্প আলোচনার বিষয় দান করে নাই। এবংবিধ বিবিধ বৈচিত্র্যের বিচিত্র সমাহার, অন্যত্র দুর্লভ। সুতরাং নানাদিক হইতে নানাভাবে, বহুরূপিনী উৎকলভূমি নিখিলকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। আমরা ক্রমে ক্রমে কয়েকজন ভ্রমণকারীর বিবরণ প্রদান করিতেছি। তবে এ বিষয়ের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। সে জন্য আমরা অক্ষমতা নিবেদন করিতেছি। কিন্তু তাহার আগে শ্রীক্ষেত্রের সাধারণ যাত্রিগণের বিষয়ে দু'একটী কথা বলিয়া লওয়া দরকার মনে করি।

জগন্নাথে এখন রেল হইয়াছে,—সুতরাং বিদ্যমান যুগে তথায় যাত্রীর প্রাচুর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু সেই সেকালের দিনে,—যখন পথকষ্টের অভাব ছিল না—যখন প্রতিপদক্ষেপে দস্যুতস্করের ভয়—যখন দস্যু ছাড়িলে সাংঘাতিক পীড়া আসিয়া যাত্রিগণের ভবযন্ত্রণা নিবারণ করিত,—যখনকার কথা স্মরণ করিলেও এখন আমাদের প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া ওঠে,—তখনও এ পথে যাত্রীর অভাব ছিল না। আমরা এখানে কয়েক বৎসরের তালিকা দিলাম।

বৎসর	যাত্রীসংখ্যা
১৮১৭—১৮	৭৫, ৩৪১
১৮১৮—১৯	৪১, ১১১
১৮১৯—২০	১৩১, ৮৭৪
১৮২০—২১	৩৩, ৪৪৬
১৮২১—২২	৫২, ১৬০

দেখা যাইতেছে, এক বৎসর—১৮১৯—২০ খৃষ্টাব্দে একলক্ষ একত্রিশ হাজার যাত্রী শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিল। ইহা কি সামান্য কথা!

স্মিথসাহেব লিখিয়াছেন:—"রথযাত্রার সময়ে জগন্নাথে যে সকল যাত্রী আসে, তাহাদের ভিতরে বেশীরভাগই বাঙ্গালী এবং তাহার মধ্যে আবার স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক!... আমি জনতার ভিতরে কয়েকজন পাঞ্জাবীকে দেখিয়া, তাহাদের দেশের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে জানিলাম, তাহারা আসিয়াছে হাজারা হইতে! সে স্থান এখান হইতে ২০০০ সহস্র মাইল!! এই দু'হাজার মাইল পথ, তাহারা অনায়াসে পায়ে হাঁটিয়া অতিক্রম করিয়াছে!!! আরও শুনিলাম, তাহারা এখানে একদিন কি দু'দিন থাকিয়া আবার আপনাদের জন্মভূমির দিকে ফিরিয়া যাইবে।" (৩) এই বিবরণের উপরে, টীকা অনাবশ্যক।

য়ুয়ন-চুয়াঙ্।—চৈনিক ভ্রমণকারী য়ুয়নচুয়াঙ্ সপ্তম খৃঃ অব্দে ভারতভ্রমণে আগমন করেন। তিনি পুরীকে চরিত্রপুর নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—ইহার পরিধি ২০ লি। এখানে আসিয়া সমুদ্রযাত্রী দূরদেশবাসী যাত্রী এবং ভ্রমণকারিগণ

(৩) Report on Pilgrimage to Jagannath. By David B. Smith. M. O. p. 10.

বিশ্রাম উপভোগ করেন। এখানে বহুবিধ দুর্লভ বাণিজ্য-দ্রব্য পাওয়া যায়। ইহার অবস্থান, স্বভাবতঃ সুদৃঢ়। ইহার বাহিরে পাঁচটী সংঘারাম আছে। তাহাদের ভিতরে অনেক শিল্পসুন্দর মূর্ত্তি। (৪)

কানিংহামের মতে, য়ুয়ন-চুয়াঙ্ চরিত্র-পুরে যে পাঁচটী সংঘারাম দেখিয়াছিলেন, তাহার একটী জগন্নাথের মন্দির। তিনি আরও বলেন, যে চরিত্রপুরই বিদ্যমান পুরী। কিন্তু ফার্গুসান সাহেব বলেন, যে বর্ত্তমান তমলুকই প্রাচীন চরিত্রপুর। (৫)

টলেমী, উড্ডিয়ার অনেক স্থানের নাম করিয়াছেন। তন্মধ্যে, ননিগইনা অন্যতম। স্থির হইয়াছে ঐ ননিগইনা, বিদ্যমান পুরী। (৬)

ডাঃ ওয়াটেল সাহেব বলেন, "এখনকার যাজপুরই আগেকার পুরী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।" কিন্তু তাঁহার সন্দেহ না থাকুক,—আমাদের আছে। নানা মুনির নানা মত। আমাদের অত গোলমালের দরকার কি? কানিংহামের কথাই সঙ্গত বলিয়া বোঝা যায়। আমরা তাহাই ঠিক বলিয়া ধরিয়া লইলাম।

আবুল ফাজল্।—আবুল ফাজলও উৎকলে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকে কণারকের কথাই বেশী পাওয়া যায় —জগন্নাথের কথা অল্প। তিনি লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন জগন্নাথের মূর্ত্তিকে ছয়বার ধৌত ও মার্জ্জিত করে। প্রতিবারেই মূর্ত্তির দেহে, তাহারা অমল বসন পরাইয়া দেয়। বেশভূষাদি সমাপ্ত হইলে ছাপ্পান্নজন ব্রাহ্মণ মূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া বিবিধ খাদ্য নিবেদন করে। খাদ্যরাশির পরিমাণ এত, যে অনায়াসে বিশ হাজার লোকের উদরপূর্ত্তি হইতে পারে!" (৭)

আবুল ফাজলের বর্ণনা হইতে জানা যায়, কয়েকশত বর্ষ পূর্ব্বেও জগন্নাথের নিমিত্ত যেরূপ বিরাট খাদ্যসম্ভারের আয়োজন করা হইত, তাহা বিদ্যমানকাল অপেক্ষা বড় অল্প নয়।

টাভারনিয়ে।—টাভারনিয়ে জগন্নাথ দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন:—"জগন্নাথ মন্দির গঙ্গার মোহনার উপরে অবস্থিত। (!) • • মন্দিরস্থিত বেদীর উপরে যে প্রসিদ্ধ মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার চক্ষুতারকায় দুটী হীরক-খণ্ড বসান আছে। • • এই সুপ্রসিদ্ধ দেব-মূর্ত্তির নাম "রেসোরা" (Resora!) এই দেবতার উদ্দেশে যে সকল ভূসম্পত্তি উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, তাহার আয় হইতে প্রত্যহ ১৫।২০ হাজার তীর্থযাত্রীর আহার নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। • • ভারতের মধ্যে এই মন্দিরের মাহাত্ম্য এত অধিক হওয়ার কারণ, ইহা গঙ্গাতীরে অবস্থিত। • প্রধান পুরোহিত প্রত্যহ যাত্রিগণের মধ্যে অন্ন, ঘৃত, দুগ্ধ, রুটি প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন। ইত্যাদি, ইত্যাদি।" (৮)

সম্ভবতঃ, টাভারনিয়ে যখন গঙ্গাতীরে

(৪) On Yuan Chuangs Travels in India. By T. Watters M. R. S. S. P. 194.
(৫) Ancient Geography of India. P. 5. 10.
(৬) Ptolemy's Geography of India (Mc Krindle.)
(৭) Ayeen Akbery. Translated by Francis Gladwin. P. 309.
(৮) প্রবাসী—৯ম ভাগ, ২য় সংখ্যা "বৈদেশিকের চক্ষে দেবীর চিত্র" প্রবন্ধে দেখ।

পথ-শ্রমে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রাবিষ্ট ছিলেন, তখন আরোপক্তাদের আলাধীনের দৈত্য আসিয়া তাঁহাকে ঘাড়ে করিয়া এক রাত্রিতেই উৎকলে লইয়া গিয়া হাজির করিয়াছিল। টাভারনিয়ে জাগ্রৎ হইয়া বোধ হয় বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি সমুদ্রের ধারে না গঙ্গার ঘাটে আছেন! এই সকল বাজির ভ্রমণকাহিনী পাঠ করিয়া পাশ্চাত্যগণ আমাদের দেশসম্বন্ধে পণ্ডিত বনিয়া যান! হায়রে!

বার্নিয়ার। বার্নিয়ারও টাভারনিয়ের সমসাময়িক ভ্রমণকারী। তিনি লিখিয়াছেন :—"এখানকার দেবমূর্ত্তি, প্রথম যেদিন রাস্তায় বাহির করা হয়, জনতা তখন ভয়ানক হইয়া ওঠে। অনেকে রথচক্রের তলায় পড়িয়া আত্মদান করে! এদেশী লোকের চোখে সে দৃশ্য এমনি সহিয়া গিয়াছে, যে কেহই সেই চক্রতলে নিষ্পেষিত লোকটীকে দেখিয়া বিস্ময়প্রকাশ করে না। তাহাদের ভাবখানা এমনি, যেন কিছুই হয় নাই! * * * জুগাচোর পুরোহিতেরা একটী কুমারীকে নির্ব্বাচন করিয়া লয়। তাহাকে তাহারা 'জগন্নাথের স্ত্রী' (bride of Jagannath) বলিয়া ডাকে। রজনীকালে সেই কুমারী একাকিনী মন্দিরের ভিতরে শয়ন করে। তাহার বিশ্বাস, রাত্রিতে জগন্নাথ নিজে আসিয়া তাহার পাশে শয়ন করিবেন!* * * রজনীতে, একটি ছোট পশ্চাৎ দ্বার দিয়া একজন পুরোহিত মন্দিরের ভিতরে আসে!* * রথের সম্মুখে, এমন কি মন্দিরের ভিতরেও উৎসবদিবসে কতকগুলা বারবনিতা কুৎসিত ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গীসহকারে নৃত্য করে।"(৯)

বার্নিয়ার যে নৃত্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। এবং উক্ত অনাচার কাণ্ড অদ্যাবধি দেবালয়ের পবিত্রতা কলঙ্কিত করে। কিন্তু তাঁহার প্রথম কাহিনীর কথা আমরা কখনও শুনি নাই; পরন্তু বার্নিয়ারের তথাকথিত কাহিনীতে সত্যের ছায়াপাতও নাই বলিয়া আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

গুরুনানক।—অতঃপর দুইজন ভক্ত ভ্রমণকারীর কথা বলিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। শিখ-সম্প্রদায়ের বরেণ্য গুরু নানক, ভারত-ভ্রমণকালে, শ্রীক্ষেত্রে আগমন করেন। তিনি ও তাঁহার মুসলমান শিষ্য মর্দ্দানা শ্রীক্ষেত্রে গিয়া, শ্রীমন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু পাণ্ডারা তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। কারণ, তাঁহার সঙ্গে মুসলমান শিষ্য ছিল। "তাহাতে বাবা নানক মর্দ্দানাকে বলিলেন—"চল ভাই মর্দ্দানা, আমরা বাহিরে গিয়া বসি। যদি জগন্নাথ স্বয়ং ডাকেন ত যাইব।" বাবা নানক জগন্নাথের বহির্দ্দেশে আসিয়া পরমানন্দে সমুদ্রসৈকতে গিয়া বসিয়া রহিলেন। * * যখন শ্রীজগন্নাথজীউর ভোগ লাগিবার সময় হইল, তখন পাণ্ডারা স্বর্ণথালিতে করিয়া জগন্নাথের ভোগ রাখিয়া আসিল। সেইদিন কিন্তু জগন্নাথের ভোগ লাগিল না।* * পাণ্ডারা ঠাকুরের ভোগ লাগে নাই দেখিয়া, কত প্রার্থনা, কত মানত করিতে লাগিল।* * তখন জগন্নাথের আদেশ হইল যে *

(৯) Berneer's "Travels in the Mogul Empire." Constable's Oriental Miscellany Vol. I. p.p. 304-306.

আমার পরমপ্রিয় নানককে এখানে লইয়া আইস, তবে ভোগ লাগিবে।" (১০) নানক আসিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। সমুদ্রের একদিকে বৃদ্ধ রবি মরণমলিন,—অপরদিকে শিশু চাঁদ সবে আকাশে উঠিতেছে। নানকের প্রেমাঙ্কিত হৃদয়ের ভক্তিবল্লরী, সঙ্গীত-পুষ্পিত হইয়া চিত্তরঞ্জন মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় ধান-শ্রীরাগে ফুটিয়া উঠিল :—

"গগনমে থালরবি চন্দ্রদীপক বনে।
তারকা মণ্ডল জনক মোতি।
• • •
কেয়সি আরতি হোয় ভবখণ্ডন তেরি আরতি!"

সেইদিন হইতে শ্রীক্ষেত্র, শিখগণেরও তীর্থ।

চৈতন্য।—প্রতাপরুদ্র যখন উৎকলের রাজা, সেই সময়ে চৈতন্যদেব উৎকলে গমন করিয়াছিলেন। সাধারণ ভ্রমণকারীর মত, তিনি শ্রীক্ষেত্রে যান নাই,—জীবনের শেষ কয়বৎসর তিনি সেখানেই বাস করিয়াছিলেন। চৈতন্য, "শ্রীমন্দিরে পৌঁছিয়া যাই সেই সুন্দর বিগ্রহমূর্ত্তি দেখিলেন, অমনি অনুরাগের আবেগে উন্মত্ত হইয়া ঠাকুরকে কোলে করিবার জন্য সেই দিকে ধাবিত হইলেন। ঠাকুরের নিকট পর্য্যন্ত আর যাইতে হইল না, মন্দিরমধ্যে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন।" (১১)

শুনিয়াছি, চৈতন্যদেব কখনও মূলমন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করেন নাই। এখন যেখানে বটগাছ আছে, তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া, হাতদুটী যোড় করিয়া প্রতিদিন সেই দয়াল ঠাকুরকে দেখিতেন। দেখিতে দেখিতে, তাঁহার আয়ত ভক্তিকোমল কমল নয়ন দিয়া মহাপূজার অর্ঘ্যের মত তরল অশ্রুধারা বুক বহিয়া গড়াইয়া পড়িত,—সেই প্রেমাশ্রু-স্তম্ভিতনেত্রে আর পলক পড়িত না—সেই ভাবগদ্গদ পেলবকণ্ঠে আর স্বর ফুটিত না—সেই দিব্য গৌরাঙ্গে আর চেতনার লক্ষণ থাকিত না! সে কি দৃশ্য!

১৪৪৯ শকে শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু হয়। সে রাত্রি পূর্ণিমা,—চন্দ্রের রৌপ্যধারায় মেদিনী ভাসিয়া যাইতেছিল। চৈতন্য, ভাবভোলা প্রেমিকের মত সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়াছিলেন। সম্মুখে, একখানি খোলা কাব্যের মত, স্তনন-মুখর সাগরের আকাশ-নীল স-নীল সলিলরাশি অনিল রাগিণীর সহিত বহিয়া বহিয়া, তালে তালে বিচিত্রছন্দে শঙ্খ-গৌর সিকতা-বিতানে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল এবং সেই সঙ্গে তাহার উৎসঙ্গে প্রতি তরঙ্গ-ভঙ্গে রঙ্গ-চপলা জ্যোৎস্না মৌনহাস্যে নর্ত্তকীর মত নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল। সমুদ্রের বুকে চাঁদের ছায়া কাঁপিতেছে,—সে দৃশ্যে চৈতন্য ভাব-সমাধিতে আত্ম-বিস্মৃত হইলেন।

"ওগো! ঐ আমার কৃষ্ণ গো, ঐ আমার প্রেমের দুলাল!" বলিতে বলিতে সেই পূর্ণচন্দ্রবিম্বকে হৃদয়ে ধরিবার জন্য তিনি সমুদ্রের বুকে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। রত্নাকর, এ রত্নকে অবহেলা করিল না, পরমযত্নে আপনার স্নেহ-শীতল কোলে টানিয়া লইল।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

(১০) পুণ্য। ১৩০৭। ৩য় সংখ্যা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র ঠাকুরের "জগন্নাথ তীর্থে গুরুনানক ও জগন্নাথের আরতি" নামক প্রবন্ধ দেখ।

(১১) চিরঞ্জীব শর্ম্মা প্রণীত "ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা"। ২য় খণ্ড। ৩ পৃষ্ঠা দেখ।

বঙ্কিমযুগের কথা।

(৪)

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটা কথা শুনিতে পাই, যে তিনি প্রেতিনী দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনী-লেখকও উপন্যাসের মত তরলা ভাষায় এই ভৌতিক-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। এমন কি লেখক মহাশয়, ইহাও লিখিয়াছেন সেই প্রেতিনী "শুভ্র বসনে সমাচ্ছাদিত ছিল।" আমরা অনুসন্ধান লইয়া জানিলাম, যে বঙ্কিমচন্দ্র জীবনে কখনও প্রেতিনী-দর্শন করেন নাই। তবে নাতি নাতিনীরা যখন গল্প শুনিবার জন্য তাঁহাকে ধরিয়া বসিত, তখন দুই একটী কাল্পনিক ভূতের গল্প বলিতেন। এবং তাহার নায়ক হইতেন নিজে! নাতিরা এখন বড় হইয়া সেই গল্প সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন নাকি!

কার্ত্তিক মাসের "সাহিত্যে" দেখিলাম, বরেণ্য আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন, বঙ্কিম-চন্দ্র সাহসী ছিলেন না—বরং "নার্ভাস" ছিলেন। কথাটা অনেকটা ঠিক্। বঙ্কিমচন্দ্র যখন মালদহে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সেই সময়ে অকস্মাৎ তিনি মস্তিষ্ক-সংক্রান্ত পীড়ায় কাতর হন। সেই হইতেই এইরূপ দুর্ব্বলতার সূত্রপাত।

এমন কি, কেহ মই দিয়া উপরে উঠিতে গেলেও তিনি ভয় পাইতেন। কুকুর কি গরু দেখিলেও তিনি তাড়াতাড়ি শঙ্কিতভাবে লক্ষকে সাবধান করিতেন। হয় ত কোনদিন তিনি গাড়ীতে বসিয়া যাইতেছেন—গাড়ী যেমন মোড় ফিরিতে উদ্যত হইল, তিনি ভয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। মালদহ হইতে ফিরিয়া, এমনি সামান্য সামান্য কারণে তাঁহাকে বড়ই বিচলিত হইতে দেখা যাইত।

কিন্তু আগে তিনি এরূপ ছিলেন না। পূর্ণবাবুর মুখে তাঁহার সাহসিকতার যে সকল কাহিনী শুনিয়াছি, এখানে তাহার দু একটী বলিলাম।

সুন্দরবনে "পসর্" নামে এক নদী আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং স্বর্গীয় ইঞ্জিনীয়ার রামতারণ চট্টোপাধ্যায় একদা নৌকারোহণে উক্ত নদীবক্ষে বিচরণ করিতেছিলেন। হঠাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের কি মনে হইল,—তিনি সেই নদী সাঁতার দিয়া পার হইতে গেলেন। নদীর মোহনার নিকটে এরূপ ইচ্ছা বড়ই ভয়ানক সুতরাং রামতারণবাবু তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, সে নিষেধ কাণে তুলিলেন না। কেবল মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কোন ভয়ের কারণ আছে?" মাঝি চিরকাল জলের উপরে কাল কাটায়—এরূপ দৃশ্যে সে অভ্যস্ত। সুতরাং সে বলিল "না বাবু, ভয় আর কি?" বিনা বাক্যব্যয়ে বঙ্কিমচন্দ্র জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। এবং সন্তরণ দিয়া অপর তটে গিয়া উঠিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যদি চিরকালই দুর্ব্বলচিত্ত হইতেন, তাহা হইলে অপরিচিত নদীবক্ষে এরূপ কার্য্যে কখনও সাহস প্রকাশ করিতেন না।

দ্বিতীয় ঘটনা। হুগলীতে কাছারী বন্ধ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যোড়ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আকাশ তখন অন্ধকার এবং

সেই অন্ধকার গাঢ়তর করিয়া মেঘের পরে মেঘ,—এমনি অনন্ত মেঘ-শ্রেণী ক্রুদ্ধ তুরগবৎ ছুটিয়া চলিয়াছে। সহসা ঝড় উঠিল,—তুফান জাগিল,—এবং দুকূলঘাতিনী গঙ্গা ক্ষিপ্তা সর্পীবৎ রুদ্ধ আক্রোশে ফুলিয়া ফুলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে পার হইবার জন্য নদীতটে বঙ্কিমচন্দ্র! কিন্তু কেহই তাঁহাকে লইয়া ওপারে যাইতে চাহিল না। অনেক কষ্টে তিনি একখানা তিন দাঁড় ভাউলে ঠিক্ করিলেন। এবং ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ৺শ্যামাধব রায়ের আবাসের নিকটে গিয়া, নিঃশঙ্কহৃদয়ে সেই ঝটিকাচঞ্চলা মৃত্যু-ভীষণা গঙ্গাবক্ষে তরী ভাসাইলেন। নৌকা অনেক কষ্টে ওপারে গিয়া লাগিল।

এই সুযোগে আর একটা ঘটনা বলি। বঙ্কিমচন্দ্র, যখন হুগলীকলেজে পড়িতেন, সেই সময়ে, তাঁহার একখানি ছোট ডিঙ্গি ছিল। যখন কলেজে থাকিতেন, ডিঙ্গি তখন তট-রোপিত একটী দণ্ডে বাঁধা থাকিত। ডিঙ্গি-খানি তাঁহার বড় আদরের ছিল।

একদিন নদীবক্ষঃ চঞ্চল। স্রোত বড় প্রখর,—তুফান জাগিয়াছে। হঠাৎ এক দুষ্ট বালক, ডিঙ্গির বন্ধনরজ্জু কাটিয়া দিল। এই বালকের সহিত বঙ্কিমের ততটা হৃদ্যতা ছিল না। অতএব, সে সুযোগ বুঝিয়া শত্রুতা সাধন করিল। সে ভাবিয়াছিল, এই প্রকার স্রোতে ডিঙ্গি একবার ভাসিলে আর তাহাকে ফেরানো যাইবে না। হইলও তাই। স্রোতের মুখে ডিঙ্গি কার্ম্মুকমুক্ত শরের মত ছুটিয়া চলিল। এমন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। বঙ্কিমও তখন বালক—বয়স ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ। এত সাধের ডিঙ্গি ভাসিয়া যায় দেখিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র তখনই জলে লাফাইয়া পড়িলেন। চারিদিক হইতে সকলে হা হা কর কি কর কি বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু কার কথা বা কে শোনে! বঙ্কিমচন্দ্র, ফিরিলেন না। ডিঙ্গিও ভাসিল, তিনিও ভাসিলেন। তটস্থ ভীতি-ব্যাকুল জনসংঘ ভাবিল, ডিঙ্গিও গেল—বঙ্কিমও গেলেন! কিন্তু না,—জলে ডুবিবার জন্য বঙ্কিম পৃথিবীতে আসেন নাই। সেই গর্জ্জন-মুখর তরঙ্গদলের অনাহূত আলিঙ্গন ছাড়াইয়া বঙ্কিমচন্দ্র ডিঙ্গি ধরিলেন এবং নিরাপদে অল্প এক স্থলে গিয়া তীরে উঠিলেন।

এই সকল ঘটনা, বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ সাহসিকতার প্রমাণ,—তাঁহার দুর্ব্বলতার প্রমাণ নয়। দুর্ব্বলতা আসিয়াছিল, যৌবনের পরে। কিরূপে আসিয়াছিল, আগেই বলিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র, যখন ব্যাধিপ্রসাদাৎ দুর্ব্বলচিত্ত,—তখন বরেণ্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয়। যুবক বঙ্কিমকে অক্ষয় বাবু দেখেন নাই। অন্ততঃ আমরা এইরূপ শুনিয়াছি। সাক্ষাৎ-কালনির্ণয়ে আমাদের ধারণা ভ্রমাত্মিকা হইতে পারে,—কিন্তু তিনি যে যৌবনে অসমসাহসী ছিলেন, সে বিষয়ে আমরা ভ্রমশূন্য। এখানে, বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহসী বলিয়া শচীবাবু অত্যুক্তি করেন নাই।

পরন্তু, মনের বলই প্রকৃত বল। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন "বাঙ্গালী শারীরিক বলে দুর্ব্বল—তাহাদের বাহুবল হইবারও সম্ভাবনা নাই—তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদিগের উত্তর

এই যে শারীরিক বল বাহুবল নহে। মনুষ্যের শারীরিক বল অতি তুচ্ছ। * * * শারীরিক বলে, শিপেরা ইংরেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তথাপি শিখ, ইংরেজের পদানত। শারীরিক বল বাহুবল নহে। * * যে জাতির উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় আছে—তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে।" প্রবন্ধপুস্তক। ১২ পৃঃ বাঙ্গালীর বাহুবল।

ছোট কথা হইতে বড় কথা আসিয়া পড়িল। তা আসুক,—এমন আসিয়া থাকে। আসত কথা,—মানসিক বল, শ্রেষ্ঠ বল,—তাহার কাছে সকল বল তুচ্ছ। সেই মানসিক বল, বঙ্কিমচন্দ্রের যথেষ্ট ছিল। আনন্দমঠ যাঁহার দান,—"বন্দে মাতরং" মন্ত্রে যাঁহার আত্মপ্রকাশ,—তাঁহার সাহস এবং তাঁহার মানসিক বলের অন্য প্রমাণ কি আবশ্যক। বঙ্কিম দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন না।

একটা কথা উঠিয়াছে। যে বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁহার পাণ্ডুলিপি কাহাকেও দেখাইতেন না,—ভ্রাতাকেও না! কিন্তু পূর্ণবাবুর নিকট শুনিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অনেক পাণ্ডুলিপি পূর্ণবাবুকে শুনাইয়াছেন।

এখন, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের একটী স্মরণীয় পরিবর্ত্তনের কথা বলিব। এই পরিবর্ত্তন, তাঁহার আদর্শ ফিরাইয়াছিল। ভবিষ্যতে, যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হইবেন—এই পরিবর্ত্তনে লক্ষ্য করিলে, তিনি উপকৃত হইবেন মনে করি।

বঙ্কিমের "দেবী চৌধুরাণী" নূতন আদর্শের উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তিনী রচনায় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ছিল, আদর্শ চরিত্র ছিল,—কিন্তু তাহার সহিত একটা উচ্চতর উদ্দেশ্য ছিল কি? সত্য বটে, অনেক পাশ্চাত্য সমালোচকের মতে উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস, ললিতকলাহিসাবে তেমন প্রশংসনীয় নয়। বঙ্কিমচন্দ্রেরও বোধহয় এইমত ছিল। গতবারের প্রবন্ধে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু যিনি প্রকৃত কলাবিৎ,—তাঁহার কার্য্যে কোন একটা উদ্দেশ্য তেমন প্রখরভাবে প্রকট হইয়া উঠে না,—তাঁহার কার্য্য যেন ইন্দ্রজাল—যেন মোহ! এবং সেই ইন্দ্রজাল,—সেই মোহের ভিতরে পড়িয়া আমরা কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ঠাহর করিতে পারি না—কিন্তু ভিতরে ভিতরে তথাকথিত উদ্দেশ্য, নীরবে আমাদের মানস-পটের উপরে একটা স্থায়ী রেখাপাত করিয়া যায়! প্রতিভার বিকাশ এইখানে,—তাঁহাদের কার্য্যের গুরুত্ব এইখানে!

যাঁহার নিকটে নিষ্কামধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁহার নামে "দেবী চৌধুরাণী"কে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই পরমমান্য শিক্ষাদাতা কে? তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেব ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঋষিকল্প যাদবচন্দ্রের ধর্ম্মপরায়ণতা বিখ্যাত। এই মহাপুরুষ মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে পুত্রকে নিষ্কামধর্ম্মসম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া, তিনি একটী ঘরের ভিতরে গিয়া বসিতেন। ঘরের দরজা, ভিতর হইতে বন্ধ থাকিত,—সেখানে আর কাহারও যাইবার আদেশ ছিল না। সেই রুদ্ধদ্বারকক্ষে বসিয়া পিতা নিষ্কামধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেন, পুত্র তাহা অবনতশিরে ভক্তিপ্লুতচিত্তে

শ্রবণ করিতেন। যাঁহারা কৌতূহলী হইয়া ঘরের কাছে গিয়া দাঁড়াইতেন,—তাঁহারা বিশেষ কিছু শুনিতে পাইতেন না—কেবল পিতাপুত্রের অস্ফুট কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিতেন,—উভয়ে কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন। কিছুদিন পরে যাদবচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিলেন। কিন্তু মৃত্যুপূর্ব্বে পুত্রের হৃদয়ে তিনি যে অমৃতময় বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন,—তাহা অবিলম্বে বিশালস্কন্ধে পরিণত হইয়া যে ফলপ্রসব করিল,—তাহাই 'দেবী চৌধুরাণী'। এই মহাফল যখন পক্ক হইয়া উঠিয়াছিল,—তখন তাহার আস্বাদ কিরূপ মধুমধুর হইয়াছিল, সাহিত্যরসজ্ঞ পাঠকগণের নিকটে তাহার আর বিস্তৃত পরিচয় দিবার দরকার নাই। তবে, যাদবচন্দ্র, অপাত্রে বিদ্যাসঞ্চার করেন নাই। তাঁহার বীজ উষর ক্ষেত্রে পড়ে নাই।

সমালোচনা।

পৃথিবীর ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ড। ভারতবর্ষ। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, পৃথিবীর ইতিহাস, কার্য্যালয়, হাওড়া। গত বৎসর এই গ্রন্থের প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে প্রাচীন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব জাতিতত্ত্ব, প্রভৃতির বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্যম ও উৎসাহ অসীম। এরূপ গ্রন্থ-প্রণয়নে কিরূপ শ্রম স্বীকার করিতে হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়—গ্রন্থকারের সে শ্রম সফল হইলে অল্প লাভ নহে। পৃথিবীর ইতিহাস প্রণেতার সে শ্রম যে সার্থক হইতেছে, ইহা প্রকৃত পক্ষে আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। বিষয়-সমাবেশ পদ্ধতি সুন্দর হইয়াছে। তথ্য-সংগ্রহ-শক্তিও অসাধারণ। বর্ত্তমান খণ্ডে কোশল, বিদেহ, কাশী, প্রয়াগ, মগধ প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্যসমূহের পরিচয় যেরূপ বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার কোথাও নিজের মত ব্যক্ত করেন নাই। ভারতের ভাষা, বর্ণমালা প্রভৃতি অধ্যায়গুলি পাঠ করিলে লেখকের অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের শ্রম সার্থক হউক—বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকামী ব্যক্তি মাত্রেরই ইহা ঐকান্তিক প্রার্থনা। গ্রন্থের বাঁধাই উৎকৃষ্ট। ছাপাও ভাল। প্রতি খণ্ডের মূল্য কত, কোথাও লিখিত দেখিলাম না। বর্ত্তমান খণ্ড প্রকাশের সময় ব্যয়বহুল বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর গ্রন্থ করিয়া আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

কর্ম্মবীর সুরেন্দ্রনাথ। শ্রীযুক্ত দুর্গাকুমার ঘোষাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত। লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র। অনাবশ্যক বহুপুরুষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাল্যজীবন ও পর জীবনের কয়েকটি প্রধান ঘটনা লইয়া এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। কবিবর রবীন্দ্রনাথ যাঁহার সম্বন্ধে এক সময় বলিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণের ধৈর্য্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজঃ—যাঁহাতে একত্র মিলিত, যিনি সরস্বতীর নিকট হইতে বাণী পাইয়াছেন, এবং যাঁহার অক্লান্ত কর্ম্মপটুতা স্বয়ং বিশ্বলক্ষ্মীর দান" সেই সুরেন্দ্রনাথের কাহিনী শুনিতে কাহার না আগ্রহ হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনের একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। এই মহাপুরুষের কাহিনী পাঠ করিলে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়—আদর্শের সন্ধান মিলে। গ্রন্থখানি সুলিখিত।

লেখক যেরূপ শ্রমসহকারে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ভাষা সরল ও স্বচ্ছ। গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথের পিতা, মাতা, পত্নী ও পুত্রের চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

জীবন শিক্ষা। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ প্রণীত। কাশী, শ্রীযুক্ত বটুকদেব মুখোপাধ্যায় এম, দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। কি করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়—প্রাচীন শাস্ত্রাদি অনুশীলন করিয়া এই বিষয়ে গ্রন্থকার সংস্কৃত ভাষায় একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন—সেই প্রবন্ধই পরিবর্দ্ধিত করিয়া বাঙ্গালাভাষায় বর্ত্তমান গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থে আয়ুর লক্ষণ, ধর্ম্ম কি, বিবাহ, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুষ্কর দৈনিক কৃত্য প্রভৃতির সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনায় যুক্তি তর্কের সুনিপুণ সমাবেশ আছে। আধুনিক কালে গ্রন্থকারের সহিত সর্ব্বত্র একমত হওয়া সম্ভব নহে। তথাপি এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বর্ত্তমান গ্রন্থ পাঠ করিলে আয়ুষ্কটাকে একটা নির্দ্দিষ্ট সুন্দর নিয়মে পরিচালিত করা যায়। সে নিয়ম-পালনে শরীরের নিতান্ত প্রয়োজনীয় নিয়মগুলিও যথারীতি পালিত হইবে—সুতরাং পীড়া প্রভৃতির কষ্টও সম্ভবিক পরিমাণে কমিবার সম্ভাবনা। গ্রন্থখানি সকলেরই পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। গ্রন্থের ভাষা সহজ, কোথাও জটিলতা নাই।

প্রথম শিক্ষা। শরীর ক্রিয়া ও স্বাস্থ্য বিধি। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, এল, এম, এস প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রকাশক, শ্রীজ্ঞানেন্দ্র-নাথ গোস্বামী, ২৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। "গ্রন্থের ভাষা সরল ও সহজ—শরীর বিজ্ঞান সম্বন্ধে মোটামুটি কথাগুলি ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে। মূল্যও সুলভ। ছাপা কাগজ ভালো।

কণা। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বরিশাল জ্ঞানদায়িনী এজেন্সি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। এখানি কয়েকটী ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি। প্রত্যেক কবিতাই চারি ছত্রের গণ্ডীর মধ্যে আপন বক্তব্যটুকু সমাপ্ত করিয়াছে। লেখক নবীন—ইহাই তাঁহার প্রথম উদ্যম। রচনায় প্রাণ আছে ছন্দে সুর আছে ভাবও সুন্দর। আমরা নবীন কবির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

সরল ও সংক্ষিপ্ত রামায়ণ। শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৸৹ বারো আনা মাত্র। গ্রন্থকার মূল রামায়ণ সরল পয়ার ছন্দে রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের জন্য রচিত। ছন্দোবন্ধে লেখকের কোন ত্রুটি নাই—বর্ণনার সরলতারও অভাব। গ্রন্থে বহুবর্ণে রঞ্জিত অনেকগুলি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ছাপা কাগজ মন্দ নহে।

অবকাশ। শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ প্রণীত। কাঁঠালপাড়া সাহিত্যসম্মিলনী হইতে প্রকাশিত। চুঁচুড়া বহুমায়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ।৹ আট আনা মাত্র। এখানি কতিপয় ধার্ম্মিক ও সাহিত্যিক সন্দর্ভের সমষ্টি। সন্দর্ভগুলি, এমনই জটিল ও দুরূহ যে সহজে বুঝা যায় না। লেখক অনেক বড় বড় কথা অনর্গল বকিয়া গিয়াছেন—কোন প্রবন্ধই ভাল করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই, কেবল জটিল ভাষা ও তর্কের জাল বুনিয়াছেন, বক্তব্য কোন স্থলেই ফুটে নাই। ভূমিকায় 'বঙ্গবাণী'-সম্পাদক শ্রীব্রজসুন্দর রায় কাব্যকণ্ঠ বিদ্যারত্ন এক মোটা সার্টিফিকেট আঁটিয়া দিয়াছেন—সার্টিফিকেটে তিনি বলিয়াছেন, গ্রন্থ লিখিয়া যিনি যশের প্রত্যাশী, যা অর্থের প্রয়াসী তিনি হতভাগ্য। সমালোচকের দোদুল্যমান বক্ষঃস্থলে দোদুল্যগতিতে বিস্মিত নয়নে তাঁহাকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে।" আমরাও বলি, এরূপ গ্রন্থকারের বন্ধু সত্যই হতভাগ্য।

তর্কবিজ্ঞান। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহ, বি, এ প্রণীত। গৌহাটী সাহিত্যানুশীলনী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র। এখানি বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী লজিক গ্রন্থ। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার বহু পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি করিয়া ইংরাজী তর্কশাস্ত্রের বঙ্গসংস্করণ প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের

একটি অনুবাদের করিলেন। পাশ্চাত্য তর্ক বিজ্ঞানের ঘুস ইঁহাতে যেন সরল ও সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গবাসী গ্রন্থকারের সঙ্গেই কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়াছি। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ সমধিক বৃদ্ধি করিবে, এ কথা আমরা সর্ব্বত্রই বলিতে পারি। গ্রন্থের ছাপা কাগজ প্রভৃতিও সুন্দর হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃত কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

ধর্ম্ম, সমাজ ও স্বাধীন চিন্তা। (২য় সংস্করণ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ এম, এ প্রণীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আট আনা মাত্র। গ্রন্থকার সুপণ্ডিত। তিনি বহু শাস্ত্রাদির আলোচনা করিয়া যুক্তির সহিত যে সকল সামাজিক মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা যেমন যুক্তিপূর্ণ তেমনই সমীচীন। স্ত্রীজাতির অবস্থা প্রভৃতির সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সকলেরই চিন্তার সামগ্রী—সময়ে পাঠ করা কর্ত্তব্য। কুসংস্কারপূর্ণ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে কোন সমাজ কখনও উন্নতিলাভ করিতে পারে না—জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—সমাজকে তাহা টানিয়া রেখিলে চলিবে না—বিধিব্যবস্থাদির সময়োচিত পরিবর্ত্তনাদি করিয়া কালোপযোগী হইতে হইবে, নচেৎ অবশ্যই সমাজদেহ শীর্ণ ও বলহীন হইবে, এ কথা শুধু শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বুঝাইতে হয় না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের সত্য। সামাজিক সমস্যার দিনে এ গ্রন্থ সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

চিত্রকাব্যম্। ৺ শ্রীপতিসুন্দর ঠাকুর বিরচিতম্। শক্তিপুর মুর্শিদাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত যতেন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা-ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ।৵০ আট আনা মাত্র। কাব্যখানিতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কয়েকটি খণ্ড কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবিতাগুলি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। বেশ কবিত্ব ও ভাবুকতা আছে। কবির অনুধ্যান-বিষয়ক কবিতাগুলি বেশ সরল ও অলঙ্কারে ও ঝঙ্কারে বিশ্ব পরিপাটী আছে।

সতীলক্ষ্মী। শ্রীযুক্ত অর্জ্জুনচন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য ৸৹ বারো আনা মাত্র। এখানি উপন্যাস। নিতান্ত অকর্ম্ম হয় না। উপাখ্যানে নূতনত্ব নাই, সেই মামুলি ব্যাপার—অবিবাহের অত্যাচারী বাপের, ও চরিত্রহীন অবিবাহ-পুত্র। শ্রীশ, চারুলীলা ও মজলিস বিবি—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রণীত "তরুবালা" নাটকের অখিল, তরুবালা ও পাকল। এমন নির্লজ্জভাবে চুরি করিয়া উপন্যাস না লিখিলেই নহে কি?

পঞ্চকমালা। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত। দেব ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কয়েকটি খণ্ড কবিতায় সমষ্টি। কবিতাগুলি করুণ, মধুর, হাস্য প্রভৃতি বিচিত্র রসের। অধিকাংশ কবিতাই ছন্দের ঝঙ্কারে, ভাবের অভিনবত্বে ও ভাষার লালিত্যে উপভোগ্য। কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গির ছাপ থাকিলেও কবির মৌলিকত্ব স্থানে স্থানে সুন্দর ফুটিয়াছে। কেবল 'মুগত পঞ্চকে' জটিলতা দোষ হইয়া গিয়াছে—বক্তব্য তেমন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, অন্যগুলি সে দোষ হইতে মুক্ত। গ্রন্থের ছাপা কাগজ প্রভৃতি সুন্দর হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু প্রণীত। হুকিয়া ষ্ট্রীট, বসিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। গ্রন্থকার বর্ত্তমান গ্রন্থে রামমোহনের বংশ, বাল্যকাল, শিক্ষা, নারী-জাতির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা, জীবনের আদর্শ প্রভৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা মার্জ্জিত ও সরল। গ্রন্থখানি বিদ্যালয়-সমূহে পাঠ্য পুস্তক হইবার যোগ্য।

শান্তি। নির্ম্মাণ-রচয়িত্রী প্রণীত। ঢাকা, শ্রীনাথ প্রেসে মুদ্রিত। অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র সহকার এম, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। এখানি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক। রচনায় বিশেষ ভাবুকতা বা লিপিকুশলতার পরিচয় না থাকিলেও ছন্দে মধুরতা আছে। কবিতাগুলি মিষ্ট।

পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব। সৃষ্টি-বিধি-প্রলয়-তত্ত্ব। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় প্রণীত ও প্রকাশিত। ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১৷৷০ বাঁধা, ১৷৷০ আধা মাত্র। গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের চতুর্দশ বৎসরের কঠোর পরিশ্রমের ফল, বঙ্গসাহিত্যে এক অপূর্ব্ব সামগ্রী হইয়াছে। জ্যোতিষ ও বেদের সাহায্যে পৃথিবীর বয়স স্থির করিয়া কুরআন, বেদ, জ্যোতিষ, পুরাণ, অবস্তা, বাইবেল, ও কোরাণ প্রভৃতির সাহায্যে পৃথিবীর এই পুরাতত্ত্ব সংগৃহীত। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, ইহাতে কোন অসামঞ্জস্য বা অসঙ্গত অথবা অমীমাংসিত ঘটনা লিখিত হয় নাই। প্রত্যেক বিষয় তিনি প্রমাণসহ লিপিয়াছেন, কল্পনা ত্যজিয়া প্রকৃত ইতিহাস বাহির করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সবিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক,—প্রত্নতত্ত্বের নিতান্ত নীরস আলোচনা নহে—অভিনব বিষয়সমূহ যুক্তি-তর্কের সুনিপুণ সমাবেশে ও প্রমাণাদির সংযোগে উপন্যাসের মত উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকার নানা গবেষণা ও আলোচনান্তে পৃথিবীর বয়স নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে পৃথিবীর বয়স এখন ৭৬৩০৫ বৎসর। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা গ্রন্থকারের অদ্ভুত গবেষণা ও অনুশীলন-শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। গ্রন্থকার ভূমিকায় আপনার ভাষা সম্বন্ধে একটু সসঙ্কোচ হইয়াছেন, কিন্তু এ সঙ্কোচের কোন কারণ নাই—তাঁহার ভাষা বেশ সরল ও সরস হইয়াছে। গ্রন্থখানি প্রাগ্-ঐতিহাসিক কালের সুযুক্তিপূর্ণ ও সুদক্ষ আলোচনা। বিশেষজ্ঞগণ ইহা পাঠ করিয়া এক বিরাট অজ্ঞাত সত্যের আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন।

বীরকুমার বধ কাব্য। শ্রী মানকুমারী প্রণীত। শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন প্রকাশিত। পটল-ডাঙ্গা বসুশ্রী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা। অভিমন্যুবধ এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্যে মহিলা কবি মানকুমারীর স্থান উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান কাব্যে তাঁহার সে যশ অম্লান রহিয়াছে। রচনায় কবিত্ব ও ওজস্বিতা আছে, তাহা প্রাণহীন নহে। চরিত্রচিত্রণও সুন্দর। অধর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে, অধর্ম্ম করিয়া কেহ নিষ্কৃতি পায় না, গ্রন্থের উপসংহারে কবি ইহার সুস্পষ্ট আভাস দিয়াছেন। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই ভালো।

মার্কাস অরিলিয়াসের আত্মচিন্তা। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। শ্রীলালবিহারী ঘড়াল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ঘড়ালপাড়া, হুগলী। এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। মার্কাস অরিলিয়স প্রাচীন রোমের বেদপুরুষদিগের মধ্যে একটি অদ্ভুত রত্ন। তিনি গুরুর নিকট উপদেশলাভে করিয়া এই নিয়মগুলি আজীবন পালন করিয়াছিলেন,—কঠিন পরিশ্রম, ভোগবিলাসবর্জ্জন, নিন্দাবাদে ঘৃণা, বিপত্তিতে ধৈর্য্যাবলম্বন, সঙ্কল্পে দৃঢ়তা স্থাপন, অকপট বাগ্মীতা, কোমলভাবে অন্যের দোষ সংশোধন, স্বকীয় অসদ্ভাবাভাব অথবা বিশেষ কার্য্যনিবন্ধন সময়াভাবের আপত্তি প্রচার না করা। মার্কাস অরিলিয়সের এই অমূল্য উপদেশবাণীসমূহ বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রবাবু সাহিত্যে অপূর্ব্ব উপহার প্রদান করিলেন। বিদেশীয় সাহিত্যের বহু অমূল্য সামগ্রী তিনি অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে চয়ন করিয়া বঙ্গভাষার সমধিক পুষ্টি সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার এ বাণীপূজার আদর্শসাধনা, সকলের অনুকরণের যোগ্য। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান গ্রন্থখানির অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে। ছাপা কাগজ ও বাঁধাই প্রভৃতিও উৎকৃষ্ট। বিষয় হিসাবে যেন সোনায় সোহাগা মিশিয়াছে।

সতীর পতিভক্তি। বদরুন্নেসা খাতুন প্রণীত। পাবনা, মুন্সীবাড়ী, সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা। গ্রন্থের নাম হইতেই বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখিকা মুসলমান মহিলা। তিনি এক বালিকাবিদ্যালয়ে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীর প্রতি নারীজাতির ঐকান্তিক ভক্তি,—স্বামীর মঙ্গলের জন্য আপনার সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন ও স্বামীর সুখেই আত্মসুখ—প্রাচ্য নারীচরিত্রের এক অপূর্ব্ব সৌরভ। লেখিকা সেই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

করিয়াছেন এবং কয়েকটি আদর্শ মুসলমানমহিলার আখ্যায়িকার সাহায্যে আপনার বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন। তাহা ভাল। লেখিকার এ সাধু উদ্যমের জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ভবিষ্যতে এইরূপ আরও অনেক আখ্যায়িকা সঙ্কলিত করিয়া তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিবিধান করিবেন বলিয়া আমাদিগের যথেষ্ট আশা আছে।

সোহংগীতা। হিমালয়বাসী সোহংস্বামী প্রণীত। ঢাকা হইতে শ্রীসূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা। 'নিবেদনে' প্রকাশক মহাশয় বলিয়াছেন, 'বঙ্গবাসী-গণের দুই ও মুসলমান ধর্ম্মসংঘর্ষণজনিত "বিষাদ" ও পৌরাণিক আখ্যায়িকা প্রণোদিত সংস্কার সকল দূরীকরণ এবং কৈবল্যপ্রদ আর্য্যধর্ম্মরসপিপাসুর জন্য' সোহংগীতা রচিত। রচয়িতা সোহংস্বামী বঙ্গবাসী মাত্রেরই সুপরিচিত, শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়—সুবিখ্যাত সার্কাস দলের দুর্দ্ধান্ত বাঘের সহিত মল্লযুদ্ধে জয়ী অধিকন্তু যাঁর সার্থত্যা জীবন পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়া হিমালয় প্রদেশে তপশ্চর্য্যাসাধনায় রত আছেন। এই সুবৃহৎ গ্রন্থ-খানি ছন্দে গ্রথিত। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়, একাত্ম-বিজ্ঞান বা অদ্বৈতবাদ। গ্রন্থকার স্বয়ং, বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ প্রতিপাদক সর্ব্বধর্ম্মমত, এমন কি, সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের (Personal God) অস্তিত্ব অবধি খণ্ডন করিয়াছেন। মূর্ত্তিপূজা, অবতারবাদ, স্মৃতিশাস্ত্রানুমোদিত বর্ত্তমান সামাজিক মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি শুধু আত্মযুক্তি প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁর যুক্তি সমর্থনকল্পে বেদ,বেদান্ত,দর্শন পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থের সূত্রাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি বিশেষজ্ঞগণের আলোচনার যোগ্য হইয়াছে। গ্রন্থে গ্রন্থকারের শ্যামাকান্তের ও হিমালয়ে আসীন সোহং স্বামীর আধুনিক চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সিন্ধুসংবাদ।

(১)

দিগ্বিজয়ী হে বীরেন্দ্র হে সিন্ধু মহান্,
সহস উদ্যোগ নিত্য মহা অভিযান্
সাজাইয়া লক্ষ তরঙ্গের অক্ষৌহিণী
অহরহ অবিশ্রাম বিপুল বাহিনী
সংগ্রাম সঙ্গীত মত্ত, পড়িয়া আছাড়ি
নিরুপায় তটবক্ষে ; নিগড় প্রদারি
অনন্ত আয়ত তব যাত্র আয়োজন
ব্যর্থ হেন, কোথা প্রতিপক্ষ যোধগণ,
কোথা যুদ্ধ কোথা সন্ধি কোথা পরিণাম
কোথায় অন্যায় শান্তি, একান্ত বিশ্রাম
যুদ্ধ শেষে, ছুটিয়াছে রণ দুরন্তর
ফেনমুখ ক্লেষাবেশে, অয় সপ্তসম
একাগ্র গম্ভীর, কোথা বিজয় সংঘাত
কোথা পরাজয় ক্ষত প্রশান্ত বিষাদ ?

(২)

ওগো নাথ বারীশ ঈষাণ প্রেমিক
আন্দোলিয়া উর্ম্মিকেশ, প্রসারি দিগন্ত
বক্ষ তরঙ্গের বাহু আসিছ ছুটিয়া
রাত্রি দিন, চাহিতেছ লইতে লুটিয়া
প্রণত আবেশভরে বিলম্বিত মুখ
বহুবার আলিঙ্গন, সুপ্রশান্ত বুক
বক্ষ ভরি, এ মস্তকা ধূত ধূলিময়
এ অশান্তি এ ব্যগ্রতা ক্ষুব্ধ লালসায়
নিয়ত আন্দোলন, অহে অভিনব
সুগম প্রশান্ত পথে প্রচণ্ড ভৈরব
এই মত আক্রমণে আগ্রহে উচ্ছ্বাসে
আসিছ ছুটিয়া, বহুধরা ভীত ত্রাসে
পলায় সুদূরে, তাই মাঝে দোঁহাকার
বিস্তীর্ণ মরুর বক্ষ বালুকার।

নমস্কার মহাসিন্ধু রুদ্র ভয়ঙ্কর
প্রলয় অধীর তীব্র দুরন্ত প্রখর,
বিহ্বল উল্লোল তব ঘূর্ণ উদ্দীপনা
নিশিদিন বিরন্তর সংগ্রাম ঘোষণা
শ্রান্তিহীন অশান্ত আবেগে শান্ত আমি,
হে বিপুল হে বিরাট হে অনন্ত স্বামী,
আশা ছিল অবারিত প্রমুক্ত প্রসার
বিশাল হৃদয়ে তব হৃদয় আমার
বিলয় করিয়া রাত্রিদিন ভরি সব
চিরন্তন সমুদার নাথা মনে তব,
কবির সকল অন্তহীন সাধনার
পূর্ণ পরিতোষ : শান্তি কোথা বেদনার।
সৌম আনন্দের গান হৃদয় নিভৃতে,
ভয়ার্ত ব্যাকুল বক্ষ বিলয় সঙ্গীতে।

---

(৪)

সিন্ধু তুমি সৃজনের কারণ সাগর
অন্তহীন জীবনের জনক জঠর
ভয়ন্ত বিক্ষোভ তব অনন্ত মন্থনে
জীব পুঞ্জ, শৈলমালা সুন্দর গঠনে
উঠিছে আসিয়া দিকে দিকে অবিরাম,
তাই শান্তি নাহি তব নাহিক বিশ্রাম।
আন্দোলন, আস্ফালন, বিচ্ছা আয়োজন
চলিয়াছে অহরহ, সঙ্গীত গর্জন।
সমিছে বিরত, ওগো তুমি সে আবার
সৃজনের পরিশোষ শুদ্ধ পারাবার
প্রলয়ের, চিরশান্তি ঘোটে রাত্রি দিন
ঘুম ঘুরান্তর ব্রতে তাই সংখ্যাহীন
নদনদী তোমাপানে, আসন্ন সকল
তালি ও বিরাট বক্ষে লভিছে আশ্রয়।

বহুদিন যে হৃদয় জড় অচেতন
তার কাছে সিন্ধু তব উত্থান পতন
উদ্দাম উদ্যোগ, বিচ্ছা অধির উৎসাহ
বিহ্বল আন্দোলিত, এ উর্ম্মি প্রবাহ
বিরত কল্লোল মন্ত্র সঙ্গীত ভৈরব
শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন অনন্ত বিলয়
আনে চেষ্টা আনে শক্তি আনে জাগরণ,
বিস্মৃতি বিলোপ ভয়ে, করে প্রসারণ
মুক্ত দৃষ্টি অনন্তের পানে। কিন্তু হায়
আপন আবেগে বিচ্ছা উল্লাসের প্রায়
যে হৃদয় আশ্রয় অধীর নিশি দিন
তারে শান্ত কর তুমি সুষুপ্তি বিলীন
একেবারে, আবেগের ক্লান্ত সঙ্গীতে
বিশ্বের বিলাপ শুধু যেমন চকিতে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

নিবেদন।

জানিব না যবে আমি কি দিনু তোমায়—
ফুলের মতন যবে চরণ-তলায়,
ঝরিয়া পড়িবে মোর এ জীবন মম,
নিয়ো প্রভু, নিয়ো তবে, এই নিবেদন।

জানিব না যবে আমি কোথা হ'তে যায়—
স্রোতের মতন যবে ঝরিয়া ধারায়
ভক্তিরসে ভাসাইবে এ জীবন মম,
নিয়ো প্রভু, নিয়ো তবে, এই নিবেদন।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমিত্বের প্রসার।

আমিত্বের প্রসার, যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল, সুপণ্ডিত রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার, বাহাদুর, এম, এ, বি, এল প্রণীত একখানি সুলিখিত ধার্ম্মিক গ্রন্থ। লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় সহজ কথায় জটিল ধার্ম্মিক সমস্যা সমূহের এমন সরল সমাধান করিয়াছেন যে সকল পাঠকেরই তাহা মনোরঞ্জন করে। গ্রন্থ খানি দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ।

আমিত্বের প্রসারে অহঙ্কারের প্রসার। অহঙ্কার বিনাশ করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রোপদেশ। আমিত্বের প্রসার ও সংহার একই কথা। আমিত্বের সংহারের প্রণালীই আমিত্বের প্রসার। এ তত্ত্বটি ভারতের পুরাতন সম্পত্তি। যদুনাথ অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত এই তত্ত্বের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে মুক্তির বিভিন্ন উপায়ের আলোচনাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পঞ্চদশ, চতুরাশ্রম, চতুর্ব্বর্ণ বিষয়ক বিবাদে আমিত্বের প্রসার যে সন্নিহিত হইয়াছে, এ গ্রন্থে তাহাই দেখান হইয়াছে।

কেবল এই একখানি গ্রন্থ নহে ইংরাজী ও বাঙ্গালা বহু সৎগ্রন্থ রচনা করিয়াও যদুনাথ প্রভূত যশোলাভ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি পূর্ব্বে কিছুকাল, সাহেবের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। এক্ষণে 'ব্রহ্মচারী' ইংরাজী পত্রিকা ও বাঙ্গালা হিন্দু-পত্রিকা আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া সম্পাদন করিতেছেন।

রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর।

কি সাহিত্যে, কি রাজনীতিক্ষেত্রে, কি বঙ্গের কার্য্যে—সর্ব্বত্রই যদুনাথ আপনার অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাঁহার কার্য্যে আড়ম্বর নাই, তিনি কাহারও করতালির প্রত্যাশী নহেন,—যাহাভাল বলিয়া মনে করেন, তাহা পরম নির্ভীকতার সহিত, ঐকান্তিক চিত্তে সাধন করেন—কোন বাধা পড়িলে সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ থাকে না।

এই অবসরে তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের পরিচয় প্রদান করিলে বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

যদুনাথ একজন প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলেন। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ

উপাধিলাভ করিয়া তিনি দেশদের সরকারে Minister of Education এবং সরকার স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। পরে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিছুকাল ওকালতী করিয়া তিনি সে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত সে কার্য্য সম্পাদন করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য সে কার্য্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়—এবং পরে আবার তিনি ওকালতী ব্যবসায় অবলম্বন করেন। এক্ষণে তিনি যশোহরের একজন সুপ্রতিষ্ঠ উকিল।

ওকালতি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত থাকিলেও দেশের কার্য্য করিতে তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যোগ অপরিসীম। কথায় বলে Law is a jealous mistress. যদুনাথ এ প্রবচনের খণ্ডন করিয়াছেন। যশোহরের উন্নতির মূলে যদুনাথের অকৃত্রিম দেশানুরাগ। যশোহরের ম্যালেরিয়া রোগ নিবারণার্থে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন।

তাঁহার "A Noteon the Sanitary Condition of Jessore" গ্রন্থে নদীর মুখে চড়া কাটিয়া অল্পব্যয়ে কিরূপে 'মরাগাঙে' জল যাইতে পারে তাহা আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য একটি Sanitary Act প্রচলন করাইয়া প্রতিগ্রামে Sanitary Taxএর সৃষ্টি, পথ ও পয়োনালামির্ম্মাণ, পুষ্করিণী সংস্কার ও নূতন পুষ্করিণী খনন, বাদপূরণ, ও অন্যান্য পূর্ত্ত কার্য্য সম্পাদনের প্রস্তাব করিয়াছেন। শুধু মশক মারিলে ও কুপ খনন করিলেই চলিবে না। নদীগুলির সংস্কার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, তাহা হইলে দেশের স্বাস্থ্য ও শ্রী আবার আপনা হইতেই ফিরিবে,—যদুনাথের এ মত গভর্ণমেণ্টের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে এবং বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট এ প্রস্তাব আদরে গৃহীত হইবে বলিয়া আমাদিগের আশা আছে।

কলিকাতার একখানি সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক পত্রে যদুনাথের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হয়। He (Jadunath) has indeed been a public benefactor in the true sense of the expression, having published healthy literature, established schools for the education of the poor and a charitable dispensary for the relief of suffering, encouraged agriculture and industry and laboured for sanitary improvement. Moral, social, religious, civic and sanitary reform has equally been the subject of his untiring activity. * * He enjoys in a pre-eminent degree, the confidence of both the Government and the people. বস্তুতঃ এ উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। যশোহরে জনের কল যে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা যদুনাথেরই ঐকান্তিক চেষ্টার ফল। মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানরূপে কার্য্য করিয়া তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ সুখ্যাতিলাভ করেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। দীনবিদ্রোহের সময় তিনি প্রজাবিদের পক্ষসমর্থন করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে তাহাদিগের কার্য্য করিয়া দিয়াছেন। ভারতবন্ধু ব্রাড্‌লি বাবা বিলাতের পার্লামেণ্টে এ বিষয়ে তিনি move করেন। ইহারই চেষ্টায় যশোহর ও ঝিনাইদহের নীলের চাষ উঠিয়া যায়। যশোহরের ব্রহ্মচারী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া সংস্কৃতসাহিত্যচর্চ্চার সুবিধা করিয়া দেওয়া, যশোহরের সদরে একটি এবং অভয়নগর লোহাগড়ায় একটি—এই দুইটী এণ্ট্রান্স স্কুল ও অভয়নগরে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি সৎকার্য্যের সুবিধা করিয়া দিয়া তিনি দেশের যে মহত্বপকার সাধন করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে অনুকরণীয়। যদুনাথ পরোপকারী, হিতৈষী ও কার্য্যশীল। আশা তাঁহার যশ হইতে কখনও নিরাশ হইয়া ফিরে না। স্বজাতির উন্নতিসাধনকল্পে তিনি সম্প্রতি 'বৈদ্যব্যবস্থায়ী সভা' স্থাপন করিয়াছেন। রাজনীতি ক্ষেত্রেও যদুনাথ সুপ্রতিষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছেন। কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহেও তাঁহার উদ্যোগের সীমা নাই। ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন।

পুণ্যাহ।

শুভাগমন।

আজ প্রায় বৎসরকাল পূর্ব্বে সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ স্বদেশের সিংহাসন-অধিরোহণ করিবার পর ভারতবর্ষে আগমন ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। প্রথমে তাঁহার এ প্রস্তাবে ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভার অভিজাত সদস্যবর্গ নানারূপ আপত্তি উত্থাপিত করিয়া ছিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার এ শুভ অভিপ্রায় বিচলিত হইলনা। যে রাজার রাজ্যে সূর্য্যদেব কখনও অস্তগামী হয়েন না তাঁহাকে বিদায় দিবার সময় তাঁহার স্বদেশীয় প্রজাবর্গের হৃদয় হইতে তাঁহার নিরাপদ যাত্রার জন্য যে একান্ত আগ্রহ পূর্ণ প্রার্থনা বিশ্বরাজার চরণোদ্দেশে উত্থিত হইয়াছিল—এবং এই সুদূর ভারতবর্ষের কোটী কোটী প্রজা তাঁহার নির্ব্বিঘ্ন আগমনের মঙ্গল কামনায় আজ কয়েক মাস ধরিয়া মন্দির মসজিদ এবং ভজনালয়ে ঐকান্তিক ভক্তিভরে যে পূজা নিবেদন করিয়া আসিয়াছে সে ভক্তিপূর্ণ আগ্রহ ব্যর্থ হয় নাই। শুভযাত্রা অনুকূল পবনে মঙ্গল-আগমনে পরিণত হইয়া সার্ব্বজনিক আনন্দ বিধান করিয়াছে। ভারতবাসী সহজেই ধর্ম্মভীরু এবং রাজভক্ত জাতি। এতদিন রাজা তাহাদের পূজ্য হইলেও তাঁহার ধারণা স্বপ্নকল্পনার ন্যায় অস্পষ্ট ছিল। আজ তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিয়া হৃদয়ের প্রীতি নিবেদন করিবার জন্য যে তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা এবং সাধ্যাতীত আয়োজন করিবে তাহা আর বিচিত্র কি? বোম্বাই বন্দরে অবতরণ দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত সম্রাট সম্রাজ্ঞীর প্রীতির জন্য তাঁহার ভক্ত প্রজাগণ উৎসবআয়োজনের দ্বারা যে শুভ স্বাগত জ্ঞাপন করিয়াছে তাহাতেই তাহাদিগের ভক্তির পরিচয় পাইয়া রাজদম্পতি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। উৎসারিত উৎসধারার ন্যায় এই প্রীতি সহজ, নির্ম্মল এবং সুন্দর; ইহার মধ্যে কোথাও কৃত্রিমতা কিম্বা কষ্টচেষ্টার কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই।

রাজাপ্রজার জীবনে একটি দিন আসে যেদিন দাবীদেনার কথা ভুলিয়া প্রীতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উভয়ের মিলন হয়, সেদিন উভয় জীবনের পুণ্যাহ। সেদিন প্রজা রাজ দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের প্রীতি নিবেদন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে—এবং রাজাও প্রজাবর্গের ভক্তি-প্রীতির সাক্ষাৎলাভ করিয়া আপনাকে অধিক-তর গৌরবান্বিত বোধ করেন। আজ ভারতের সেই শুভ পুণ্যাহ। রাজাপ্রজার প্রীতিসম্মিলনের দিন। ইতি পূর্ব্বে দুইবার প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থে আধুনিক দিল্লী নগরীতে রাজসূয় যজ্ঞের ন্যায় আয়োজন করিয়া দরবার হইয়াছিল—প্রথম বারের দরবারে রাজপ্রতিনিধি লর্ডলিটন স্বর্গগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্ঞী-পদগ্রহণ ও তাঁহার জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে ভারতীয় সমগ্র প্রজাবর্গের প্রতি অভয়বাণীর ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় বার লর্ড কর্জ্জন স্বর্গগত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসন অধিরোহণ সংবাদ

ঘোষণা করিয়াছিলেন। দুই বারই রাজ-প্রতিনিধিগণ এই বিরাট ব্যাপার সমাধা করিয়াছিলেন কিন্তু এবার যথার্থই রাজসূয় যজ্ঞ সার্থক। এবার আর রাজপ্রতিনিধি নহেন, স্বয়ং সম্রাট সম্রাজ্ঞী ভক্তপ্রজাগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্বীয় রাজচক্রবর্ত্তীত্ব ঘোষণা করিলেন। ব্রিটিশ রাজত্বাধীনে ভারতবর্ষে এ এক অভাবনীয় অশ্রুত্যাশিত ঘটনা। প্রজার প্রতি রাজপ্রীতির এই অপূর্ব্ব সাক্ষ্য ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল থাকিবে। মহাভারতে প্রকাশ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির দ্বাপর যুগে ইন্দ্রপ্রস্থে স্বীয় রাজচক্রবর্ত্তীত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মঙ্গলরাজ্যে "ভাগণ সন্তাপ নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়া অথণ্ড শান্তিতে বাস করিত। আমাদের বর্ত্তমান সম্রাটের রাজত্বেও সেই মত মঙ্গলের অনুশাসনে গুণীর আদর, কৃতির সম্মান এবং বীরের গৌরব রক্ষা করিয়া পরিপূর্ণ শান্তি স্থাপন করিয়াছে। তিনি নিজ মুখে দুই বঙ্গ এক হইল—এই ঘোষণা দ্বারা ভারতীয় প্রজাবর্গের প্রতি আন্তরিক প্রীতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমরা লক্ষ লক্ষ নরনারী এই বরাভয়প্রদ ঘোষণায় আনন্দোচ্ছলিত হৃদয়ে তাঁহার জয় গান করিতেছি।

রাজবর।

(১)

সম্রাট ভারতবর্ষে আসিয়া এদেশবাসীদিগকে কি রাজনৈতিক বর দিবেন এই বিষয় লইয়া আজ এক বৎসরকাল ধরিয়া অনেক আলোচনা চলিয়াছে। ভারতবর্ষের নানা দেশের নানা লোক রাজ অনুগ্রহের উপর নানা রূপ দাবী করিতেছিলেন এবং প্রার্থিত বরের ফর্দ্দ ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছিল। কেবল বাঙ্গালী শুদ্ধ একমাত্র বরের প্রার্থনা করিয়াছিল—রাজার নিকট একটি মাত্র প্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছিল—বঙ্গ-ভঙ্গের খণ্ডন।—আজ রাজার অনুগ্রহে বাঙ্গালীর সে প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মনের সাধ পূর্ণ হইয়াছে। স্বয়ং রাজা নিজমুখে বাঙ্গালী যাহা চাহিয়াছিল—সেই বর দান করিয়াছেন। এই ছয় বৎসর ধরিয়া কায়-মনোবাক্যে বাঙ্গালী জাতি যে সাধনা করিয়াছে, আজ রাজার প্রসাদে তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিয়া বাঙ্গালীর জীবন সার্থক হইল। তাই আজ নগরে নগরে সংকীর্ত্তন, ঘরে ঘরে আনন্দধ্বনি। বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয় তাই আজ অকৃত্রিম রাজভক্তিতে স্বতঃ উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে।

(২)

রাজা নিজমুখে ঐ একটি মাত্র বর দান করিয়াছেন,—কারণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—যে বর্ত্তমান ভারতবর্ষে যতরূপ রাজনৈতিক সমস্যা আছে—তাহার মধ্যে এই পার্টিশানই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর এবং "পার্টিশান" খণ্ডনের ফল সমগ্র ভারতবর্ষের লোকের রাজনৈতিক জীবনে সুদূরব্যাপী। আজিকার এ আনন্দের দিনে—এ সম্বন্ধে তর্ক বিচার করিবার সময় নহে। তা ছাড়া—এ কথা যিনি নিজে না বুঝিতে পারেন—যাঁহাকে তর্ক করিয়া ইহা বুঝাইতে হয়,—তাঁহার রাজনীতির জ্ঞান এতই স্বল্প যে তাঁহার সহিত তর্ক-করাও বৃথা।—এই বিষয় লইয়া

ভারত গবর্ণমেণ্ট যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, মন দিয়া তাহা পাঠ করিলে—পার্টিসানের গুরুত্ব সকলে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।—রাজা এই পার্টিসান খণ্ডন করিয়া যে কেবলমাত্র বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন তাহা নহে সমস্ত ভারতবর্ষের লোকেরও সমান কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সেইজন্যই যাহারা ভারতবাসীর রাজনৈতিক উন্নতির বিরোধী, তাহারা এই ব্যাপারে ভীত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবাসীদিগের রাজনৈতিক অধিকারের প্রসারতা বৃদ্ধি যাহাদের অভিপ্রেত নয়,—তাঁহারা এই রাজ-ঘোষণায় যে কতদূর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন তাহার প্রমাণ—লর্ড ল্যান্সডাউন এবং লর্ড কর্জ্জনের বক্তৃতা।

(৩)

লর্ড কর্জ্জন বলিয়াছেন যে এই সংবাদ শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। রাজা যে নিজমুখে ঐ ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন, তাহাই লর্ড কর্জ্জনের বিশেষ আপত্তি এবং বিশেষ আপশোষের কারণ। কেন? লর্ড ল্যান্সডাউনের মুখে তাহার উত্তর শোনা গিয়াছে। তিনি বলেন—"সম্রাটের মুখের কথার আর পরিবর্ত্তন হইতে পারে না"। যাহাতে এই পার্টিসান খণ্ডন লইয়া ভবিষ্যতে আবার নূতন করিয়া বাক্‌বিতণ্ডা না উত্থাপিত হয়,—সেই কারণেই মর্লি হার্ডিংএর পরামর্শ অনুসারে রাজা নিজমুখে এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং লর্ড কর্জ্জন ভবিষ্যতে এই বিষয় লইয়া যে কঠিন সমালোচনা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ইহা নিশ্চিত যে রাজার অনুগ্রহে আমরা যে বরলাভ করিয়াছি তাহা আমাদের চিরদিনের সৌভাগ্যের জন্য হইয়াছে।

(৪)

আর একটি কথা। কলিকাতার পরিবর্ত্তে দিল্লি যে রাজধানী হইল, তাহাতে আমাদের লাভ লোকসান খতাইয়া দেখিবার এ উপযুক্ত সময় নহে। ইহা নিঃসন্দেহ যে বাঙ্গালীর ইচ্ছামত পার্টিসান রহিত করিয়া যুক্তবঙ্গের গবর্ণর নিয়োগ করা এবং কলিকাতা রাজধানী রাখা একত্রে সম্ভব নয়। "গাছের পাড়ব তলারও কুড়োব"—বালকের মত এই আবদার বাঙ্গালীর মুখে শোভা পায় না।

পুলাহ।

এত দিন ধরে আমীর ওমরা এল কত গেল আর,
সুলতান শাহ গোলাম করিলে আসিয়া একটিবার।
প্রতিদিন ধরে পথের উপরে কেনা বেচা কত কাজ,
শাহানশাহার নকীবের হাঁকে সকলি থামিল আজ।
রাজার মিছিলে পথ ছেড়ে দিলে আমীর ফকীর আর,
একটি নজরে লক্ষ মোহর, নজর চরণে তাঁর।
খাজনা আদায়, নহে আজ তাই শুভ পুলাহ আজি,
প্রজার কুটীরে আসিছেন রাজা বরের মতন সাজি।
ওরে শাঁখ বাজা, কর হুলু রব; বল সবে জয় জয়!
প্রেমের সলিলে নিখিল রাজার অভিষেক আজি হয়!

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কাত্যিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩৩, শুদ্ধ বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

কমলাসনা

ভারতী

৩৫শ বর্ষ] মাঘ, ১৩১৮ [১০ম সংখ্যা

অন্নপূর্ণার মন্দির।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিশ্বেশ্বর আবার তাহার নিভৃত গৃহ কোটরে পুস্তক রাশির মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু এবারে আর ইচ্ছায় ও মনে সামঞ্জস্য নাই। পশ্চিমে গিয়া জীবনের যে আস্বাদ সে পাইয়া আসিয়াছে, সে স্মৃতি আর মন হইতে কিছুতেই উঠিতে চাহেনা। পুস্তকরাশিসজ্জিত কাষ্ঠের তাকগুলাকে যেন ভারবাহী গর্দ্দভের মত মনে হইতে লাগিল; কক্ষের সে উন্মাদনা শক্তি যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কুঠীর মহাজনদিগের নিকটে গিয়া কারবার নিজে দেখিয়া চালাইতে চেষ্টা করিল, ভাল লাগিলনা; মতলবের তাকিয়া তাগে দেওয়া জমীজমার চাষ আবাদ প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণের চেষ্টা দেখিল, দুই দিনে বিরক্তি ধরিয়া গেল। অগত্যা নিষ্কর্ম্মা বিশ্বেশ্বর গ্রামের নদীর তীরে, আম্রকাননে, কদলীবনে, মাঠের শস্য ক্ষেত্রের আগে আগে উদাসী পথিকের ন্যায় বেড়াইয়া বেড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল।

সময়ে সময়ে মাসিমার নিকটে আসিয়া বসিত। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীও কেমন যেন মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছেন। সকল সময়ে আর তেমন হাসিয়া সস্নেহে গল্প করেন না। তাঁহার মনে সর্ব্বদা কি কষ্ট যে জাগিতেছে তাহা বিশ্বেশ্বর বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই সেও মাসিমার কাছে সঙ্কুচিত হইয়া বসিত। একদিন মাসিমা স্পষ্টই বলিলেন, "তুই নিশ্চিন্দি থাক্; আমার এতদিন যদি এমনি কেটে গিয়ে থাকে ত' এ কটা দিনও যাবে। যদি কখন' তোর নিজে বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছে হয় করিস্ আমি তোকে কখন' আর সে কথা বল্‌ব না।"

বিশ্বেশ্বর নীরবেই রহিল কিন্তু দেখিল,—যে কথাটা সে কয়েক দিন হইতে তাঁহাকে বলি বলি করিতেছে তাহার এই সুযোগ উপস্থিত। আশা করিল অন্নপূর্ণা আরও কিছু বলিবেন, কিন্তু সে আশা তাহার সফল হইল না। তিনি নীরবে বসিয়া পূজার জন্য তুলায় সলিতা পাকাইতে লাগিলেন।

অগত্যা বিশ্বেশ্বর বলিল "মাসিমা, তুমি ওদের কোন' খবর পাও?"

মাসিমা সলিতা পাকান স্থগিত রাখিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিলেন "কি খবর?"

"এই এখন ওদের কি ক'রে চল্‌ছে।"

"আমিত আর ফেলিনি, যে যাদের সঙ্গে অতি নীচের মত ব্যবহার করেছি, তাদের দুরবস্থায় আমোদ করে তাদের বাড়ী গিয়ে তাদের অবস্থা জেনে আস্‌ব!"

বিশ্বেশ্বর এ তিরস্কার কাণে না করিয়া

বলিল "তাদের বাড়ী না যাও, অন্য লোকের মুখেও ত' শোন।"

"তারা কি রকম লোক এক সঙ্গে এতদিন থেকেও তুমি জাননা, কিন্তু আমি খুব জানি তারা মরে গেলেও লোকের সাহায্য নিতে ভিক্ষুকের মত হাত পাতবেনা, বা আপনাদের অবস্থা কাহকে জানাবে না। শুনেছি এখন মধ্যে মধ্যে হরি বাড়ী আসে, সে হয়ত এখন দেখে শোনে।" বিশ্বেশ্বর ভারাক্রান্ত চিত্তে বলিল "হরিটা? ওটাত' জাহান্নমে গিয়েছে। সেদিন দেখি সে আর জমিদার নয়েন—ডিপুটী বাবুদের যে জামাই, সেই দুজনে খুব বাহার করে ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। হরির সে বাবুগিরীর পোষাক অনেক লোকেরই চোখে পড়েছিল। ছিছি তার লজ্জাও নেই!"

"কি জানি বাছা! তার বাহার দেখেই হয়ত লোকে মনে করে ওদের আর কষ্ট নেই।"

"মামিমা তুমি ওদের বাড়ী এক এক দিন গেলেই ত পার।"

অন্নপূর্ণা ক্ষণেক ভাবিয়া সবেগে বলিলেন "না, সে আমার দ্বারা হবে না। সতীর যার কাছে আমি মুখ দেখাতে পারবনা, তুমি পারত' কোন সন্ধান নিও।"

বিশ্বেশ্বর কিন্তু সহজে কোন' উপায় খুঁজিয়া পাইল না। তাহারা যে কষ্টে আছে তাহাতে কোন' সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কিরূপে তাহাদের সাহায্য করিতে পারে ভাবিয়া পাইল না। কালীপদ বালক, তাহার দ্বারা কোন কার্য্য করিলে হয়ত জানাজানি হইয়া পড়িবে। সে তাহাতে নিতান্ত নারাজ। বিশ্বেশ্বর ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল যে রূপেই হোক্, সতী বা সাবিত্রীর নিকটে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে এবং কোন' রূপে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করাইতেই হইবে।

স্থির করা সহজ, কিন্তু কার্য্যে করা বড় কঠিন। একেত' তাহার নিজের সঙ্কোচ এক প্রধান বাধা তাহাতে সতী বা সাবিত্রীর দর্শন তেমন সুলভ নয়। গরীবের মেয়ে এবং ভাগ্যদোষে মন্দভাগিনী বলিয়া তাহারা কোথাও বাহির হয় না। কচিৎ কখন' সাবিত্রীকে নদীর ঘাটে জল আনিবার সময় কাহার' চক্ষে পড়ে, কিন্তু সতী তাহাদের বাড়ীর পশ্চাতের ডোবা বা পুকুর ভিন্ন আর কোথাও যায় না। পাড়াগ্রামে যদিও ভদ্র কুলাঙ্গনাদের ঘাটে পথে বাহির হওয়ার কোন বাধা নাই কিন্তু এস্থলে তাহাদের নিজের অবস্থা-জ্ঞানই সর্ব্বপ্রধান বাধা। বালিকা সাবিত্রীও এখন ক্রমে ক্রমে লোকের আলোচনীয়া হইয়া উঠিতেছে; "ওমা এমেয়েও ত' মস্ত হয়ে উঠেছে, বছর চোদ্দ বয়স হতে চলল কি করেই বা বিয়ে হবে, কেবা নেবে।" কোন' সহৃদয়া বলিতেন "আহা ওর দিদির যে রকম বিয়ে হয়েছিল, সে রকম বিয়ের চাইতে ও অমনি থাক, তবুত মনের সুখে থাকবে।" অমনি ছারবুদ্ধিশালিনী সমাজসংরক্ষণীয়া শিহরিয়া বলিতেন "ওমা তাও কি হয়! ওসব কপালের কথা, কপালে যা আছে হবে, তা বলে কি বিয়ে বন্ধ হয়! জাত থাকা চাইত।" ঘাটে পথে বাহির হইলেই এই সব কথা উঠে বলিয়া সাবিত্রীও অতি সাবধানে চলিত। জল আনিবার নিতান্ত প্রয়োজন হইলে এমন সময়ে ঘাটে যাইত যে তখন

গ্রামের অধিকাংশ লোকই মাধ্যাহ্নিক বিশ্রামে নিমগ্ন।

বিশ্বেশ্বর একদিন ইহা লক্ষ্য করিল। ভাবিল এই বা সুযোগ হইতেছে। ইহাতেও যে কিছু অন্যায় হয় তাহাও যে সে না বুঝিয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু ইহা ভিন্ন উপায় কি! ছোট হইতে অদ্ভুত স্বভাববিশিষ্ট মুখচোরা গোবেচারা, ভাল মানুষ বিশ্বেশ্বর পাড়ার ছেলে হইলেও একটু বড় হওয়ার পর আর কাহারও' বাড়ীর মধ্যে কখন' যায় নাই। এখন কিরূপে সতীদের বাড়ীতে তাহাদের মাতাপ্রভৃতির নিকটে গিয়া উপস্থিত হইতে পারে! তাঁহারাই বা সহসা তাহার এরূপ কার্য্যে মনে কি করিবেন? বিশেষ তাঁহাদের নিকটে সঙ্কোচেরও যথেষ্ট কারণ আছে, তাহাদের অপমান এখনও হয়ত তাঁহারা মনে করিয়া আছেন।

শুক্ল দ্বিপ্রহরে বিশ্বেশ্বর "ঘণ্টিতলায়" নিকট পদচারণা করিতে লাগিল। অন্যমনস্কতা বশতঃ এক এক বার সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নগা ঝুরি ধরিয়া টানিতেছিল। শীতের প্রথম সঞ্চারে প্রকৃতির গাত্রে অল্প অল্প কাঁটা দিয়া উঠিতেছিল, বক্সীদের "বেড়ের" পার্শ্ব দিয়া অগ্রহায়ণের ধান্যক্ষেত্র কমলার স্বর্ণাঞ্চলের ন্যায় শোভা পাইতেছে দেখা যাইতেছিল। বেড়ের মধ্যে সরল উচ্চ নারিকেল তরুশ্রেণী যেন ফল ভারে অবনত। কদলীকুঞ্জে ফললোভী পক্ষীদের মহাকোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। দক্ষিণে বাঁশঝাড় বহ্নির গ্রাম্যপথের মস্তকের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, দ্বিপ্রহরের উদাস বায়ু তাহার ইতস্ততঃ প্রবেশ করিয়া এক একবার মর্ম্মর ধ্বনি সহ করুণ বাঁশী বাজাইতেছে। বিশ্বেশ্বর চাহিয়া দেখিল শ্রীসৌন্দর্য্য আশা আনন্দে স্থানটি চিত্রকরের আদর্শবৎ শোভা পাইতেছে। চারিদিকেই কমলার স্নিগ্ধ দৃষ্টি, কেবল দূরে রুক্ষকেশা মলিনবসনা দরিদ্র-বালিকা বৃহৎ কলসীর ভারে হেলিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে চলিতেছে। বিশ্বেশ্বরের চোখে জল আসিল!

বালিকা নিকটস্থা হইল, বিশ্বেশ্বর মূঢ়ের ন্যায় নীরবে রহিল, এমন সাহস নাই যে তাহাকে ডাকে; ডাকা দূরে থাক্ সে এমনি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল যে মনে হইল সাবিত্রী তাহাকে দেখিতে না পায় ত ভাল হয়! সাবিত্রী এ অবস্থায় তাহার সম্মুখে পড়িলে হয়ত লজ্জিত হইবে মনে হওয়ায় সে তাহার দুর্বুদ্ধিতায় লজ্জায় মরিয়া গেল। কিন্তু তাহার সে লজ্জা ঈশ্বর সম্বরণ করিলেন না, বাম পার্শ্বে ঘণ্টী-তলায় দৃষ্টি পড়িতেই সাবিত্রী তাহাকে দেখিতে পাইল। লজ্জিতা, সঙ্কুচিতা, কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়া হইয়া সে একবার থামিবে মনে করিল, আবার তখনি লজ্জা সম্বরণ করিয়া আরও অবনত মুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বিশ্বেশ্বর তখন নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। বুঝিল এখন সঙ্কোচকে না সরাইলে পরে এরূপ সুযোগ লাভ কঠিন হইবে। অনেক কষ্টে একটু অগ্রসর হইয়া ডাকিল, "সাবিত্রী!"

বিস্মিতা সাবিত্রী দাঁড়াইল, কিন্তু ফিরিল না। বিশ্বেশ্বর আবার ডাকিলেন "সাবিত্রী আমার একটা কথা আছে, তোমায় শুনতে হবে—একটু দাঁড়াও।"

সাবিত্রী দাঁড়াইয়াছিল, এবারে একটু

ফিরিয়া একবার তাহার পানে চাহিয়া নতনেত্রে মৃদুস্বরে বলিল "বলুন।"

বিশ্বেশ্বর দ্বিগুণ বিপদে পড়িল। কি বলিয়া প্রথমে সে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে। সাবিত্রী ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া একটু ত্বরিতকণ্ঠে বলিল "কি বল্‌বেন বলুন।"

বিশ্বেশ্বর অপ্রস্তুত হইয়া নতমুখে বলিল "বলি।" তার পরে আর একটু অগ্রসর হইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল "তোমার দাদা হরি সে এখন বাড়ীতে আসে?"

"মধ্যে মধ্যে আসেন।"

"সে এখন কিছু করে?

সাবিত্রী তাহার পানে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি করিয়া বলিল "কি করে?"

"এই কোন কাজকর্ম্ম চাকরী টাকরি।"

"করেন বোধহয়।"

"ঠিক জান না?"

সাবিত্রী নতনেত্রে বলিল "না।"

বিশ্বেশ্বর অনেক কষ্টে আরও মৃদুস্বরে বলিল "তোমাদের সংসার সেই ত চালায়?"

সাবিত্রী নীরবে রহিল। বিশ্বেশ্বর বুঝিল সে অসন্তুষ্ট হইতেছে, তখন আর তাহার সঙ্কোচ রহিল না, তাড়াতাড়ি বলিল "তুমি মনে কিছু ক'রনা,—পাড়াপ্রতিবেশীর খবর সবাই জান্‌তে চায়, তাই একথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। এতে কি তুমি অসন্তুষ্ট হবে?"

সাবিত্রী অগত্যা মৃদুকণ্ঠে বলিল "না।"

"তোমার দাদা টাকা দেন্ কি? টাকা না হলে ত সংসার চলে না তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।"

"দেন কখন কখন।"

"তাতে সব খরচ চলে? কোন কষ্ট হয় না?"

সাবিত্রী ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। বলিল "না। আমি এইবার যাই।"

"আর একটু দাঁড়াও। তুমি আমায় নিশ্চয় বল্‌ছ না! কেন সঙ্কোচ কর্‌ছ, আমি তোমাদের ভাইয়ের মতন আমায় বল্‌বে না?"

সাবিত্রী এবারে একটু মুখ তুলিয়া ঈষৎ ক্রোধসূচককণ্ঠে স্থির বিশালনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বলিল "আপনি কি সকলের কাছে আপনাদের ঘরের কথা সব বলে বেড়ান তাই আমাকে বলতে বল্‌ছেন! আপনি ত বোঝেন এ সব কথা কাকেও বল্‌তে নেই!"

বিশ্বেশ্বর অপ্রতিভ হইল কিন্তু নীরব হইল না, বলিল "সবারি কাছে বলা উচিত নয় কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তাকে বল্‌লে ত দোষ হয় না।"

হয় বই কি! আর বলেই বা লাভ কি! আমি এইবারে যাই!"

শোন সাবিত্রি! যদিও আমি পর, কিন্তু সত্যই আমি তোমাদের বোনের মত দেখি। আমি তোমায় লজ্জা দিতে বা ঠাট্টা কর্‌বার মতলবে এ কথা জিজ্ঞাসা করিনি। আপনার লোকে যেমন ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করে আমি তেমনি ভাবেই জিজ্ঞাসা করেছি, এতে কি এত দোষ হয় সাবিত্রি? যদিও—যদিও আমি পর— কিন্তু—"

সাবিত্রী এতক্ষণ ঈষৎ বিরক্ত ও বিস্মিত হইয়াছিল এখন বিশ্বেশ্বরের বেদনাযুক্ত কথা শুনিয়া সে বিরক্তি আর হৃদয়ে স্থান পাইল না। তাহার এমনও বোধ হইল যেন বিশ্বেশ্বরের

বৃহৎ চক্ষু জলে ভরিয়া চক্ চক্ করিতেছে। লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া সাবিত্রী অধোমুখে ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন "আমায় মাপ করুন। আপনি জিজ্ঞাসা করছিলেন আমাদের কিছু কষ্ট আছে কিনা! সত্যই বলছি আমাদের তেমন কোন কষ্ট নেই। দিন ত বসে থাকে না, কেটে যায়।"

বিশ্বেশ্বর একটু ক্ষোভের হাসি হাসিয়া বলিল "তা জানি, দিন সকলেরই কাটে তবে সুখে, নয় দুঃখে।"

"আমি, দিদি আমরা অনেকটা কাজ করি, মা এখন বড় পারেন না তাঁর অসুখ। দাদাও কিছু কিছু আনেন, কষ্ট খুব বেশী এমন আমরা পাই না।"

বিশ্বেশ্বর বুঝিল আজন্ম দুঃখে লালিতা বালিকার দুঃখ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কোন বিচার শক্তি নাই। অগ্রসর হইয়া বলিল "তোমার দাদা দিলে তোমরা তা নাও আর আমি যদি তোমার মাকে প্রণামী বলে বা তোমাদের ছোট বোন্ বলে কিছু দি তা হলে কি পর বলে ফিরিয়ে দাও?"

সাবিত্রী অধিকতর বিস্মিত হইল, ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "তা আমি বলতে পারি না, দিদি জানে মা জানেন।"

"তা হলে এই কাগজখানা তোমার মার পায়ে আমার প্রণামী বলে দিও।" বলিতে বলিতে বিশ্বেশ্বর আসিয়া সাবিত্রীর ছিন্ন অঞ্চলে কি একটা কাগজ বাঁধিয়া দিল। সাবিত্রী উদ্বেলিত কণ্ঠে বলিল "না না, আপনি মার কাছে দেবেন তা হলে; আমায় কেন মুস্কিলে ফেলছেন, আমি পারব না, আপনি নিজে গিয়ে যা বলতে হয় বলবেন"—

বিশ্বেশ্বর ততক্ষণ নিজ কার্য্য সারিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে—বলিল "তুমি যাও, তার পরে তিনি আমায় ডাকলে আমি গিয়ে সব বলব। তুমি আমার নাম করে বলো। বাড়ী যাও, অত বড় কলসী নিয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছ আর দাঁড়িও না—যাও।" বলিতে বলিতে বিশ্বেশ্বর অদৃশ্য হইল। কয়েক লম্ফে সে বাটী গিয়া উপস্থিত হইল,—ভিতরে গিয়া ডাকিল "মাসিমা।"

মাসিমা তখন আহারান্তে একখানা কম্বল বিছাইয়া শীতের নিস্তেজ রৌদ্রটুকু উপভোগ করিতে করিতে কাশীদাসের মহাভারত পড়িতেছিলেন—

"সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী
পরম লজ্জিত হইয়া কহে মৃত্যুপতি
এ তিন ভুবনে তুমি সতী পতিব্রতা
পবিত্র হইবে লোক তুমি এই কথা।"

বিশ্বেশ্বর গিয়া তাঁহার শয্যার একপার্শ্বে শুইয়া পড়িল "কি পড়ছ মাসিমা?"

মাসিমা একটি অঙ্গুলি পুস্তক মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া অন্য হস্তে বইখানা বন্ধ করিয়া বলিলেন "সাবিত্রীর উপাখ্যান পড়ছি,—তুই কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িস নি!"

বিশ্বেশ্বর একটু হাসিয়া বলিল "পড়েছি বই কি, খুব ছোটবেলায়; এখন কিন্তু মহাভারতের কিছু মনে নেই কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের কিছু মনে আছে শুনবে—

"রাবণ বলে বানরা শোন তোরে বলি
কোথা হতে মরিবারে লঙ্কাপুরে এলি,
কে তোরে পাঠায়ে দিল মরিবার তরে,
বনের বানর তুই রাক্ষসের ঘরে!"

আরও বলছি শোন, অস্ত্রের নাম শোন,
"সুতীক্ষ্ণ শালিমুখী ঘোর দরশন,
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত, বাণ বিষোচন,
কৃতান্ত ঐবিক বনে, বাণ সপ্তশির—"

মাসিমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন "এই সব মনে আছে, আর ভাল জায়গা কোথাও মনে নেই?"

"বাঃ ওসব জায়গা বুঝি কম ভাল? তখন ত ঐ জায়গাই বেশী ভাল লাগত। যাক্ মাসিমা তোমার সাবিত্রীর উপাখ্যানটা বেশ লাগল, পড়না একটু শুনি।"

পুত্রকে একটু প্রকৃতস্থ দেখিয়া মাসিমা খুসী হইয়া সাবিত্রীর উপাখ্যানের প্রথম হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বিশ্বেশ্বর নিবিষ্ট মনে শুনিল, যখন উঠিয়া যায় মাসিমা বলিলেন কেমন লাগল রে?" "বেশ।"

পরদিন প্রভাতে কি একটা প্রয়োজনে মাসিমাতার নিকটে আসিয়া দেখিল, সাবিত্রী এক সাজি লিউলি ফুল লইয়া মাসিমাকে দিতে আসিয়াছে, মাসিমা সস্নেহবাক্যে তাহাকে অভিনন্দিত করিতেছেন। বিশ্বেশ্বরের কেমন মনে হইল সাবিত্রী হয়ত তাঁহাকে কিছু বলিতে আসিয়াছে। কি কথা? হয়ত কোন বিষয়ের অভাবই বা জানাইতে আসিয়াছে। নহিলে আর কি কার্য্য হইতে পারে? আনন্দোৎফুল্ল বিশ্বেশ্বর নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কণেক পরে দেখিল ডালিকত শেফালি ও কুন্দ লইয়া সাবিত্রী তাহার কক্ষাভিমুখেই আসিতেছে। বুঝিল তাহার পুষ্পাহরণের জন্য মাসিমা প্রত্যহ যে ফুল কটি তাহার কাষ্ঠাধারে রাখিয়া যান তাহাই সাবিত্রীর হস্ত দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। মাসিমার এ ক্ষুদ্র আদেশ সাবিত্রীর উপকারই করিয়াছে। সাবিত্রী দ্বারে উপস্থিত হইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করায় বিশ্বেশ্বর স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিল "এসো সাবিত্রী।"

সাবিত্রী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, ফুল কটি একখানা পুস্তকের উপর রাখিতে রাখিতে মৃদুস্বরে বলিল—"আপনার মাসিমা এই ফুল কটা ঘরে রেখে যেতে বল্লেন।"

ওই খানেই থাক্। তুমি কি মাসিমাকে কেবল ফুল দিতেই এসেছ, না কোন কথা আছে? বালিকার ঈষৎ পাণ্ডুতাযুক্ত গণ্ড রঞ্জিত হইয়া উঠিল, সহসানেত্রে মৃদুকণ্ঠে বলিল "হ্যাঁ! শুধু শুধু কি করে আসি তাই ফুল এনেছিলাম।" বলিতে বলিতে অঞ্চল হইতে পূর্ব্বদিন রক্ত কাগজের টুকরা কয়েকখানা বাহির করিয়া পুষ্পের নিকটে রাখিল। বিশ্বেশ্বর স্তম্ভিত হইয়া পড়িল,—অগ্রসর হইয়া বলিল ওকি,—ওকি সাবিত্রী?

"আপনার টাকা। দিদি বল্লেন আমাদের এ টাকার কোন দরকার নেই। আমাদের চেয়ে যারা গরীব তাদের দেবেন, তারা কত আশীর্ব্বাদ করবে। আমাদের কোন কষ্ট নেই।" কণেক পরে বিশ্বেশ্বর নিতান্ত অপরাধীরভাবে মৃদুস্বরে বলিল "তোমার মা? তিনি কি বল্লেন?"

"তিনি মনে কষ্ট পাবেন বলে দিদি আমায় বলতেই দেননি।"

মনে কষ্ট পাবেন? না না, তা কেন হবে আমি তাঁকে নিজেই বল্‌ব। তিনি অবশ্য নেবেন।"

দৃঢ়কণ্ঠে সাবিত্রী বলিল "তা করবেন্ না। দিদি যখন বলেছেন মা নেবেন না, তখন নিশ্চয়ই নেবেন না, মা দিদির কথামতই চলেন। তাহলে আপনি বেশী কষ্ট পাবেন। এ টাকা রাখুন, আমি ত বলেছিলাম আমাদের এত বেশী অভাব নয়।" মহাভারতকথিতা সন্ন্যাসিনী অথচ রাজকন্যার ন্যায় গৌরবিনী সাবিত্রী চলিয়া গেল। বিশ্বেশ্বর মুহ্যমান ভাবে বসিয়া রহিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

সম্ভ্রান্ত পরিবার বা ভদ্রগৃহস্থ পরিবার যদি কালবশে দরিদ্র হইয়া যায় ত তাহাদের কষ্টের উপরে অত্যধিক আত্মসম্মানজ্ঞান জনিত অভিমান বেশী কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অবস্থা সচ্ছল থাকিলে লোকের যে উপকার সচ্ছন্দে গ্রহণ করা যায়, অবস্থার ব্যতিক্রমে সে উপকার যেন শেলের মত অঙ্গে বিঁধে। যেখানে অত্যন্ত বেদনা মনোযোগ সেইখানেই অধিক। লোকে তাহা না বুঝিয়া হয়ত এ ভাবকে অহঙ্কার বলিয়া মনে করে। এ অভিমান, মনুষ্যের উপরে নহে, ভগবানের উপরে।

শীতের ম্লান সায়াহ্ন দরিদ্রের অঙ্গনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে। সংস্কার অভাবে রান্নাঘরখানা অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া আছে। ইটের খরগুলা অস্থিপঞ্জর বাহির করিয়া যেন মূর্ত্তিমতী দরিদ্রতার সাক্ষ্য দিতেছে। তথাপি অঙ্গনটুকু পরিষ্কার, তুলসীতলাটি নিকানো মুছানো। গাছপালাগুলি সযত্ন রক্ষিত। দরিদ্রতা রাক্ষসীকে ঢাকিবার জন্য মনুষ্যের অশ্রান্ত চেষ্টার প্রমাণ দিতেছে।

কালীপদ বাহিরে খেলা করিতে গিয়াছে। কয়খানি বস্ত্র ক্ষার দ্বারা সিদ্ধ করিয়া, কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া সতী তাহা বাঁশের উপরে টাঙ্গাইয়া দিতেছে, সাবিত্রী কতকগুলি শুষ্ক গোময় লইয়া গোরুর গুহে উত্তাপের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করিতেছে, ধূমে ক্ষুদ্র অঙ্গনটি পূর্ণ। জাহ্নবী একটি ক্ষুদ্র প্রদীপ লইয়া তুলসীতলায় দিলেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ। চিন্তাজ্বরে তিনি অবিশ্রান্ত দগ্ধ হইতেছেন। কন্যারা বুঝিত, আবার তাঁহার মার ব্যারাম হইয়াছে,—তাই ঔষধ পালারও জোগাড় করিত, জাহ্নবী নীরবেই থাকিতেন।

কালীপদ ছুটিয়া আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল "মা আমার লজঞ্চুস্!" মা হস্ত দ্বারা তাহাকে একটু ঠেলিয়া বলিলেন তোমার দিদির কাছে যাও; তিনি তখন ঠাকুরপ্রণাম করিতেছিলেন। সাবিত্রী ডাকিল, আয়রে কালি! কাল সিলীকে তোর লজঞ্চুস দিদি আন্‌তে দিয়েছে।" সে এল বলে। ভগ্নীর ক্রোড়ে উঠিয়া বালিকা বলিল "আজ যদি না পাই ত তোমায় খুব মারব। ভ্রাতার অঙ্গের ধূলা মুছাইয়া দিতে দিতে সাবিত্রী বলিল "পাবে বইকি! হাঁরে জামা গায়ে দিস্‌নি?" "যে তোদের ছেঁড়া জামা— ঐ জামা মানুষে পরে। বিপিন বড় ঠাট্টা করে ও আর আমি পরব না।" "এই ভাখ দিদি সেলাই করে ভাল করে দিয়েছে।" বালক জামা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া ভূমিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল "ঐ বুঝি ভাল? ও ত সেলাই করা, ও আমি পরব না।" "লক্ষ্মী ভাইটি আমার! ভাখ দেখি শীতে তোর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে—

শীতও কি লাগেনা। পর, এখন ত বিপিন এসে ঠাট্টা কর্‌তে পার্‌বে না,—তবে পরটি কে দেখবে?" বালক কোনমতেই প্রশ্নোত্তর-বাক্য বলিল না, হাত পা ছুঁড়িয়া সাবিত্রীকে অস্থির করিয়া তুলিল। তখন জাহ্নবী ধীরে ধীরে আসিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অঞ্চলে ঢাকিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন, সাবিত্রী চক্ষু মুছিয়া কার্য্যান্তরে চলিল,—সতী লজ্জিত বস্ত্রের অন্তরালে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্যান্ত বাগ্‌দির মেয়ে এবং তাঁহাদের অত্যন্ত অনুগত। তাহাদের কাটা পৈতা, দড়ি, কলটা মূলটা লইয়া সে-ই হাটে যাইত এবং বিনিময়ে চাউলাদি আবশ্যকীয় দ্রব্য কিনিয়া আনিয়া দিত। আপনার দুঃখের ভারে ভটচাযদের সুখদুঃখেও সে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই ভাবেই চলিত, সেই কারণে তাহাদের দৈন্যের কথা সকলে তেমন প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারিত না।

একটা ধামা মস্তকে লইয়া ক্যান্ত এখানে প্রবেশ করিয়া ডাকিল "সতী মা।" তাহার কণ্ঠের ধ্বনি পাইয়া কালিপদ ছুটিয়া বাহিরে আসিল—"দিদি আমার নেবেনচুন্?" "এই যে দাদা, তোমার লটনচুনি না এনে কি খাবুতে পারি এই ন্যাও—বলিয়া কাগজের মোড়ক বালকের হাতে দিল। বালক মহানন্দে "ওমা মা—ভাখ্ ভাখ্" বলিতে বলিতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সতী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। ধামা রাখিয়া ক্যান্ত বলিল "শীতে ঠাউরে মরেছিনু, হ্যাঁরে আগুন করেছিস্?" "না।"

"তা আলোটা আন্‌না বাছা। সাবি কোথা রে আলোটা আন্" সাবিত্রী ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া বলিল "তেল এনেছ, দাও প্রদীপ জ্বেলে আনি।" "আমার যেমন দশা! আ পাড়ি হাঁটতে, রাত হয়ে গেল; আর হাটে কি এখানে যাছা! তা ভাখ তোদের এখনো টাটকা চোখ আছে, এইত সন্ধ্যে আদি এখনি আঁধার দেখ্‌ছি। এই ন্যাও বাছা তেলের শিশি! চার পয়সার তেল ভাখ, এ বাজিতে কি আর বাস করা চলে, যেমন চাল আক্রা তেমনি তেল আক্রা সব ঘুষপোড়া মিন্‌সেদের এক হাঁক।"

সতী মৃদুস্বরে বলিল "খালা খানার কত হল?" ক্যান্ত প্রায় কাঁদিয়া উঠিল সে কথা আর বোলনি মা বোলনি! অমন বশী খালা খানা কিনা মিন্‌সেরা একটা টাকাতেও নিতে চায় না। কিন্‌বার সময় কোন্ না তিনটে টাকা লেগেছিল। মিন্‌সেরা ডাকাত না ডাকাত।"

সতী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া মৃদুস্বরে বলিল "পুরানো জিনিষে তাই হয় পিসী। 'অ কত দিলে?"

"এক টাকার কমে ছাড়িনি মা। আট আনা খোকার এই কাপড় খানার লাগল আর চালে ডেলে নুনে আট আনা,—হিসেব করে নাও মা। পাট কিনে আনতে আর পয়সায় কুলোল না। আরবারের দড়ি বিক্রীর আট আনায় সবই চাল কিনে এনেছিনু পাট কিনতে কুলোয়নি, এবারেও হ'ল না। তা হাঁগা পাট কেনা তুলোকেনায় কি হবে? ঘরকন্নার সব বাসন কখানাই কি এমনি করে যাবে?"

"বাসনই বা আর কই? ও কখানা নইলে সংসারও চল্‌বে না—জানি না কি হবে।"

সাবিত্রী দ্রব্যাদি সব ঘরে তুলিল। গৃহ হইতে দুইটা পক কদলী আনিয়া জ্যাঠাকে দিয়া বলিল "সাহেব কলা পিসী খেয়ে দেখিস।" জ্যাঠা রাগিয়া বলিল "রাখ রাখ তোর দিদি খাবে, মায়েরা খাবে। বামুনের ঘরের "আড়" পৃথিবীর সর্ব্ব জিনিষে বঞ্চিত। ঐ সবই তাদের আহার।"

"না পিসী তুমি নাও আরও আছে।" সতীও অনুরোধ করিল। অগত্যা জ্যাঠা বাক্যে ক্ষান্ত দিয়া কলা দুইটা ও ঘুঁটে করিয়া গোয়াল ঘর হইতে একটু আগুন লইয়া চলিয়া গেল।

প্রভাতে কালিপদ সঙ্গী বালকদের গৃহে খিচুড়ী দেখিতে পাইয়া গৃহে আসিয়া মহা ধুম ধরিল "আমি খিচুড়ী খাব। সাবিত্রী কাতর-কণ্ঠে মাতাকে বলিল "মা ডাল নেই ত।" সতী বলিল "তুই চুপ কর। আমি তোর খিচুড়ী রেঁধে দেব কালই।" আহারের সময় হরিদ্রারঞ্জিত অন্ন দেখিয়া বালক প্রথমে প্রতারিত হইল, শেষে বুঝিয়া ছড়াইয়া ছড়াইয়া ফেলিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ বাধাইল। সতী নীরবে একধারে সরিয়া গেল, জাহ্নবী যেখানে স্বামীর শয্যা পাতা থাকিত সেইখানে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া রহিলেন। কেবল সাবিত্রী দুর্দ্দান্ত বালককে নানাপ্রকার প্রলোভনে শান্ত করিবার বিফল চেষ্টা পাইতে লাগিল।

বহুক্ষণ কাঁদিয়া কাটিয়া শ্রান্ত বালক ঘুমাইয়া পড়িল। পাছে সে জাগিয়া আবার কাঁদে বলিয়া রোয়াক হইতে কেহ আর তাহাকে তুলিল না। সতী অনেকক্ষণ পরে স্নান করিয়া আসিল। সাবিত্রী উঠানের শাক পাতা তুলিয়া একটা ব্যঞ্জনের জোগাড় করিয়া দিল; জ্যেঠাইমা হরিনাম সারিয়া, গাঙীকে অনেক গালাগালি দিয়া দুধটুকু দুহিয়া আনিলেন। সতী বলিল "সাবি ভাখ ত গুড়ের ভাঁড়ে কি গুড় আছে, তা হলে দুধে দু'ট ভাত দিয়ে একটু গুড় রেখে পায়েসের মত করে রাখি। কালী যে কেঁদে ঘুমিয়েছে খায়ওনি—পায়েস পেলে খুসী হয়ে খাবে।" জ্যেঠাইমা চেঁচাইয়া উঠিলেন "তোদের সব নবাবী! গরীবের আবার অত বড়মানুষি কেন! খায় খাবে না খায় অমনি থাকবে। পেটে আলা ধরলে আপনি খাবে গুড়ট নষ্ট না করলে নয়!" জ্যেঠাইমার তিরস্কার তাহাদের সহিয়া গিয়াছিল। সাবিত্রী ভাঁড় দেখিয়া বলিল "না দিদি নেই।"

"থাকবে কি! যে সব অলক্ষী! ঘরে কি জিনিষ দাঁড়াতে পায়। ওমা এমন সংসারও দেখিনি!" একে সংসারের কষ্ট তাহাতে বাক্যযন্ত্রণা, একেবারে মরিকাকের যোগ! সতী নীরবে রন্ধন সারিয়া মাতাকে ডাকিতে গেল দেখিয়া অগত্যা জ্যেঠাইমা বকিতে বকিতে একটু গুড় বাহির করিয়া আনিয়া বলিলেন "এই নে, ছেলেটা খেতে পাবে না তাই না থাকলেও নেই বলতে পারিনে। সেদিন অলটুকু খেয়ে গুড়টুকু রেখে দিয়েছিলাম। এ সংসারে কিছু কি খাবার জো আছে।"

সতী জাহ্নবীকে গিয়া ডাকিল "মা ওঠো, খেতে চল।" জাহ্নবী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন "আমার বোধ হয় জ্বর এসেছে। তোরা খাওগে, দিদিকে খাওগে—আমি আজ আর খাবনা।"

সতী মাতার গাত্রে হস্ত দিয়া বলিল "এ

রকম অর ত মা তোমার রোজই হয়! না খেলে ক'দিন বাঁচবে। যা পায় খাবে চল!"

"না মা আমি খাবনা।"

সতী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "এর পরে উপোস ত কপালে আছেই মা, আগে হতেই কেন না খেয়ে শুকুবে।"

জাহ্নবী অগত্যা উঠিয়া গিয়া আহারে বসিলেন। তিনি যদিও কিছু দেখেন না কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমস্ত সংবাদই রাখেন। বুঝিতেছিলেন এ ভাবে আর বেশীদিন চলা দুর্ঘট। বিষম চিন্তাভারে সতীই প্রত্যহ ওঁহার অর আসিত।

ঘরের আহারীয় অন্ন জল দুই দিনেই ফুরাইয়া গেল সংসারে খাইতে চারিটি লোক অথচ কোন উপায় নাই। সকালে উঠিয়া কালী বলিল "মা ক্ষিদে খেতে দে।" মা বলিয়া ডাকিল, কিন্তু দাঁড়াইল গিয়া দিদির নিকটে। সতী নীরবে বসিয়া রহিল, তাহার হাত পা উঠিতেছিল না; বালক তখন ডাকিল "দিদি ওঠ্ না ভাত চড়াবিনে।" দিদি উঠিল না দেখিয়া বালক মাতার নিকটে নালিশ করিতে গেল। সতী তখন মৃদুস্বরে সাবিত্রীকে বলিল "ভাখ দেখি, টোকায় কি একটুকু চুলো নেই?"

"না দিদি।"

"সাবি—তবে আজ উপোস? কালীকে কি খেতে দি? আজ হাট-বার নয়, নইলে কাল পিসীকে দিয়ে ঘটিটা পাঠাতাম, কি করি সাবি?"

সাবিত্রী মৃদুস্বরে বলিল "ওরকমেই বা আর কদিন চল্‌বে দিদি,—তার চেয়ে বিশু দাদার"—সহসা সতী উঠিয়া দাঁড়াইল, তীব্রকণ্ঠে বলিল "ছিঃ! তার চেয়ে শুকিয়ে মরাও ভাল।"

সাবিত্রী অধোবদনে রহিল, শেষে মৃদুকণ্ঠে বলিল "শুকিয়ে না হয় তুমি আমি মরলাম কিন্তু কালী আর মা? তাদের কি ভিক্ষা করেও বাঁচান উচিত নয় দিদি?"

"ভিক্ষা? হাঁ—কিন্তু আরও দুদিন পরে। যেদিন একেবারে গাছতলায় দাঁড়াব, তখন সকলের কাছেই আঁচল পাততে পারা যাবে। তুই ঘটিটা আন্ একবার ক্ষ্যান্ত পিসীর কাছে যাই।

সহসা সাবিত্রী উচ্চকণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিল "দাদা—দিদি—দাদা।"

মস্তকে টেরী, হাতে ছড়ি, সুসজ্জিত বেশে হরি আসিয়া অঙ্গনে দাঁড়াইয়া বলিল "তোরা কি করছিস্ রে?" "দাদা বলিয়া সাবিত্রী কাঁদিয়া ফেলিল। সতী কাঠের মত বসিয়া রহিল।

"কি হয়েছে কাঁদিস কেন? মা, ভাল আছে ত?"

সাবিত্রী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "আছেন। তুমি কি তা একবার ভাব দাদা? তোমার কালী আজ খেতে পায় নি। মা আর বেশীদিন বেঁচে বাঁচেন কিনা সন্দেহ। আমাদের দশা কি একবার তুমি ভাবনা?"

"তা আমি কি করব। বাবা কি পয়সা খরচ করে আমায় লেখাপড়া শিখিয়ে গিয়েছেন তাই সকলকে পুষব। আমি নিজের বুদ্ধিতে নিজে করে খাচ্ছি, নইলে আমারও এই দশা হ'ত। এই নে দশটা টাকা আমার কাছে আছে, দিচ্ছি! আমি তোদের তেমন ভাই নই।" সাবিত্রী টাকা কটা কুড়াইয়া লইয়া

মৃদুকণ্ঠে বলিল "আমায় মাপ কর দাদা, আমি বড় দুষ্ট, বড় খারাপ হয়েছি—"বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল। ভ্রাতা বলিল "নে নে কাঁদিস্‌নে। আমি এখন চল্লাম। পারি ত এমাসে আর একবার আসব। এ বাড়ীতে কি দাঁড়ান যায়।"

"আর সঙ্গে দেখা করে যাও।"

"দেখা করে আর কি হবে! এসেছিলাম বলিস্।"

হরি চলিয়া গেল। সাবিত্রী বলিল "দিদি ওঠো! ক্ষান্ত পিসীকে ডেকে আনি, সে বাজার করে এনে দেক।" সতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—হাঁ। উঠি! ছাখ সাবি আপনার চেয়ে পরই ভাল, কিন্তু তবু পরের কাছেই লজ্জা, আপনার লোকের কাছে লজ্জা নেই।"

সতী এখন কিছুদিনের মত নিশ্চিন্ত হইল। কষ্টে তাহাদের গ্রাহ্য ছিল না কেবল যখন তাহা প্রাণঘাতী রূপে দাঁড়ায় তখনি কষ্ট অনুভব করে। শাক ভাত, এবং অক্লান্ত পরিশ্রম তাহারা নিতান্ত সচ্ছন্দতার সহিত গ্রহণ করিত। এক্ষণে টাকা কয়েকটিতে বেণী করিয়া পাট, তুলা প্রভৃতি কিনিয়া লইল, সংসারের যাহা নহিলে নয় তাহাই কেবল ক্রয় করিল। কালীপদের জামার কথা তাহারা ভোলে নাই, তাহাও একটা কিনিতে হইল। পরদিন সকালে ক্ষান্ত আসিয়া সতীকে বলিল আজকে বাবুদের বাড়ী শাক বেচ্‌তে গিয়েছিলুম, তা তেনাদের মেয়ে কোমোলা শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেছে। তোমায় একবার অবিশ্যি করে যেতে বল্‌লে; না গেলে বড্ড দুঃখ করবে বল্‌লে।"

সতী দেখিল কমলা এখন তাহাকে ভোলে নাই। একটু হাসি আসিল,—তাহা সুখের কি দুঃখের বলা যায় না। দ্বিপ্রহরে গেলে অনেকক্ষণ বসিতে হইবে এবং কার্য্যের ক্ষতি হইবে বলিয়া সতী মাকে বলিল "মা আমি এখনি একবার দেখা করে আসি।" "যাও"।

সতীকে দেখিবামাত্র কমলা পূর্ব্বের মতই আসিয়া গলা জড়াইয়া ধরিল। আনন্দপূর্ণ কণ্ঠে বলিল "সতি! ভাই! আমায় ভুলে যাস্‌নি ত? এক একবার মনে কর্‌তিস্?" সতী তাহার পানে চাহিয়া চমকিত হইল। এই কি সেই কমলা? দুই বৎসর পূর্ব্বে যাহার অঙ্গে সুখসৌভাগ্য ঝলমল্ করিত। সে এখন এমন শীর্ণকায়া; ম্লানমুখী। এ যেন সে কমলাই নয়! বলিল "কমলা এমন হ'য়ে গেছ ভাই? কোন' কি অসুখ করেছে?"

"অসুখ"? বলিয়া কমলা হাসিল। বলিল "আমার কথা ছেড়ে দে। আমার কথা বলছিস্, তোর দশার কাছে আমার কথা! আমি তোর বিয়েও দেখে যাইনি, একেবারে এই দশা দেখ্‌ছি।"

"আমার আবার দশা কি ভাই? আমি যেমন ছিলাম তেমনিই ত' আছি।"

"তাবলতে পারিস্ বটে, শুনেছি তুই বিয়ের সময় ভিন্ন দেখিস্‌নি; তা হলে কি হয় ভাই!"

বাধা দিয়া সতী বলিল "ওকথা ছেড়ে দাও তোমার কি হয়েছে বল? তোমায় তেমন হাসিমুখ নেই কেন?"

"তুই আমারই কথা আন্‌ছিস আমি কেবল তোর দিকে চেয়ে দেখ্‌ছি। সতি

দেখ্‌তে সত্যি তেমনি আছিস্ বটে কিন্তু তোর বেশ দেখে আমার চোখ বুজ্‌তে ইচ্ছে করছে। তাই কি পাপে আমাদের এমন দশা?" কমলা সতির গলা ধরিয়া তাহার বক্ষে মুখ লুকাইল। সতী নীরবে প্রস্তর-পুত্তলির মত বসিয়া রহিল। ক্রমে সুস্থ হইয়া কমলা মুখ তুলিল। সতী বলিল "পৌষ মাসে তারা আস্‌তে দিলে?"

"দুবছর আসিনি, দেখ্‌তে প্রাণ ব্যাকুল হ'ল, এলাম। এলেই হল, গেলেই হ'ল, কে বারণ কর্‌বে?"

"কেন স্বামী?" কমলা আবার হাসিল। সতীর সে হাসি বড় করুণ বোধ হইল। কমলা হাসিয়া বলিল "স্বামী? আমি তাঁর কে যে বারণ কর্‌বেন বা আমার খোঁজ রাখ্‌বেন। তাই মেয়েমানুষ আর ফুলের মালা এক, বাসি হলেই মাটীতে গড়াগড়ি! আমাদের আদর কদিন?" সতী নতমুখে বসিয়া রহিল। কমলা বলিতে লাগিল "কিছুরি স্বাদ জানিস্ না এক রকম বেশ আছিস, কিন্তু এ বড় জ্বালা সতী। এখন আমি তোর আমার তুলনা করে বুঝেছি, মেয়ে মানুষ কেবল দুঃখের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। সুখ তাদের জন্য নয়; তারা যেন সে আশা না করে।"

সতীর মনে পড়িল একদিন সে কি কার্য্যের জন্য বাহিরের দ্বারের নিকটে কালীকে ডাকিতেছিল এমন সময়ে জমিদার নরেন তাহুড়ীকে ঘোড়ায় চড়িয়া সেই পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া সরিয়া আসে,—কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ কদর্য্য দৃষ্টি দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আজ সে কথা মনে পড়িল এবং মনে হইল সত্যই কমলার সুখ স্বপ্নের মত অন্তর্হিত হইয়াছে। কিয়ৎক্ষণ গল্পের পর সতী বলিল "তবে এইবার ভাই উঠি?"

"বোস্ আর একটু, আবার কবে দেখা হবে কি না হবে তারও ঠিক নেই।" সতী একটু শিহরিয়া বলিল "কেন ভাই অমন অলক্ষণে কথা বল, এলেই দেখা হবে।" কমলা হাসিয়া বলিল "আমি মর্‌ব বলিনি, তত ভাগ্য আর আমার নয়। এইত এসে দেখ্‌ছি তোর বাবা নেই, তুই বিধবা, আবার এসে আরও কিছু দেখ্‌তে পারি।" সতীও একটু ছাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল।

আর একটু বসিয়াই সতী বিদায় লইল। কমলার দশা চিন্তা করিতে করিতে ভারাক্রান্ত চিত্তে বাটী চলিল। বামে বকুলীদের বেড়, দক্ষিণে বাঁশঝাড়, বৃক্ষচ্ছায়ায় শীতের তীক্ষ্ণ বায়ু যেন জমাট বাঁধিয়া আছে। সতী অন্যমনে নত নেত্রে চলিয়াছে, সহসা সম্মুখে কে যেন থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিল "কে সতী? সতী?"

সতী মাথা তুলিয়া দেখিল বিশ্বেশ্বর।

সঙ্কুচিতভাবে মস্তকের কাপড় আর একটু টানিয়া দিয়া সতী পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল। ইচ্ছা বিশ্বেশ্বর পথ পার্শ্ব হইতে সরিয়া গেলে সে অগ্রসর হইবে। বিশ্বেশ্বর সরিয়া গেল বটে, কিন্তু অগ্রসর হইল না, অস্পষ্ট ভাবে গলাটা একবার ঝাড়িয়া দুএকবার ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "সতি! আমি তোমার প্রতিবেশী সম্পর্কে ভাই হই, আমি যদি তোমার সঙ্গে কথা কই সেটা কি দোষের হয়?" সতী উত্তর দিল না, বিরক্তি, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি অনেক ভাব এক সঙ্গে তাহাকে

আলোড়িত করিতে লাগিল। বিশ্বেশ্বর পুনশ্চ বলিল "বোনের সঙ্গে কথা কইলে কি দোষ হয়?" সতী এইবার চেষ্টা করিয়া দ্রুত কণ্ঠে বলিল "কি বলবেন শীগ্‌গির বলুন"। বিশ্বেশ্বর মৃদু কণ্ঠে বলিল "আমি তোমার মাকে প্রণাম করেছিলাম, তুমি তা ফেরত পাঠিয়েছ।"

"দরকার হয়নি তাই ফেরত পাঠিয়েছি জান্‌বেন।"

"দরকার না হোক্, তবু কেউ যদি ভক্তি বা স্নেহ জানায় তা কি লোকে ফিরিয়ে দেয় সতী?" সতী একটু ফিরিয়া দাঁড়াইল, কেবল তীব্র কণ্ঠে বলিল "যারা নেবার উপযুক্ত লোক তারা নিতে পারে কেন না তাদের অভাব নেই। আর তাদের বোধহয় আপনি ওরকম প্রণাম করতেও যান্‌না আমরা গরীব জেনেই ওরকমে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন। আমরা গরীব সত্য, কিন্তু ভেবে দেখুন যতক্ষণ আমরা নিজে চালাতে পারব ততক্ষণ কেন পরের ভিক্ষে নেব।"

বিশ্বেশ্বর বহুক্ষণ নীরবে রহিল। সতীকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "আমায় মাপ ক'রো, আমি তোমাদের ভিক্ষা দিতে যাইনি। বিশ্বাস কর আমি—আমি কেবল তোমাদের স্নেহ"—বাধা দিয়া সতী বলিল "আপনিও আমায় মাপ করবেন আমি আপনার মত দয়ালু লোককে কঠিন কথা বলেছি। কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন আপনার কর্ত্তব্য আপনি করেছেন, আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি। ভগবান এখনো এক রকমে আমাদের দিন চালাচ্ছেন, যেদিন আর চালাবেন না, সেদিন কেবল আপনি কেন সকলের কাছেই আমাদের ভিক্ষা নিতে হবে।"

আমায় মাপ কর সতি! আমি তোমাদের বোনের মত ভেবেই এ কাজ করেছিলাম।"

"তা আমি বুঝেছি।"

তার পরে আরও একটু অগ্রসর হইয়া সতী একবার বিশ্বেশ্বরের পানে চাহিয়া ঈষৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল "আপনি বোধহয় আমাদের অবস্থার কথা মধ্যে মধ্যে ভাবেন কিন্তু তা ভেবে মন খারাপ করবেন না, পরশু দাদা এসেছিলেন; তিনি এখন চাকরী করছেন বোধহয়। তাঁকে আশীর্ব্বাদ করুন, সে মানুষ হলে আমাদের আর কোন কষ্ট থাকবে না।"

"আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি সে মানুষের মত হোক্। তোমরা আর না কষ্ট পাও। তার মতিগতি তাহলে এখন ভাল হয়েছে! বড় সুখী হলাম। সতি সরল ভাবেই বলছি তোমার ব্যবহারে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম, কিন্তু এখন আর তা মনে থাকবে না! তুমিও রাখবে না?"

"না?"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মাঘ মাসটা জাহ্নবী কোনরূপে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলেন কিন্তু ফাল্গুন মাসের প্রথমেই একেবারে শয্যাগ্রহণ করিলেন। অসুস্থ দেহে নীরবে দুর্দ্দান্ত শীত উপেক্ষা করিয়া কাটাইয়া দিয়া শেষকালে আর পারিয়া উঠিলেন না। মাতার এই নির্জ্জীব ভাব দেখিয়া সতী চক্ষে অন্ধকার দেখিল।

দরিদ্রের গৃহে চিকিৎসার তেমন ধুম নাই তথাপি তাহাদের সাধ্যমত চিকিৎসা হইতে লাগিল। হারাণ ডাক্তার কয়েক

টাকা ডিক্রিটের এবং ঔষধের বিল পাঠাইল। তাহা পরিশোধ করিতে সতী সংসারে যাহা কিছু সঙ্গতি আনিতে পারিয়াছিল তাহা অন্তর্হিত হইল। আবার সেই রক্তশোষণকারী অবস্থা আসিয়া তাহাদের ঘিরিল। জাহ্নবী কন্যাদের পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন "আমি ভাল হই ত এমনি ভাল হব, এই অবস্থায় কেন তোরা এত খরচ করছিস।" সময়ে সময়ে সংসারের খোঁজ লইতেন, তাহারা কোন কষ্ট পাইতেছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতেন। সতী বলিত "মা তুমি অত ভেবনা, তাহলে ভাল হতে পারবে না। আমাদের দিন চিরকাল যে রকমে কাটছে সেই রকমেই কাটবে। দাদা বাড়ী এলেই আর অভাব থাকবে না, এ দুদিন না হয় একটু কষ্ট হ'লই।" জাহ্নবী ভাবিয়া বলিলেন "তবে হরির কাছে একবার খবর পাঠা।" "পাঠিয়েছি, দুদিন পরেই দাদা আসবে।"

সতী মাতার কাছে বলিতে পারিল না যে যাহাকে পাঠাইয়াছিল, তাহাকে কটূক্তি করিয়া হরি ফিরাইয়া দিয়াছে। হরি ক্রমশঃই অধঃপাতে যাইতেছে। তথাপি সে মনে করিল আর একবার দাদাকে ডাকিতে পাঠাইবে। অন্য দিদীকে আবার অনেক করুণ কথা শিখাইয়া ও কালিপদকে সঙ্গে দিয়া চাঁদপুরে পাঠাইল। কয়েক ঘণ্টা পরে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল হরিবাবু কলিকাতায় গিয়াছেন। সতী নীরবে ঈশ্বর স্মরণ করিল।

সংসারে অবশিষ্ট যাহা তৈজসপত্র ছিল অন্যান্য গিয়া একে একে হাটে বেচিয়া আসিতে লাগিল এবং তাহাতেই রোগীর পথ্য এবং সংসার একরূপে চলিতে লাগিল। তথাপি তাহারা কাহার' নিকটে হাত পাতিতে পারিল না। দুরবস্থার কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। আপনাদের অবস্থাজনিত সঙ্কোচে তাহারা কাহারো বাড়ী যাইত না, কাজেই তাহাদের বাড়ীও বড় কেহ আসিত না। সেই জন্য তাহাদের অবস্থা সকলে বড় একটা জানিত না।

সতী যতদূর সম্ভব টানিয়া সংসার চালাইত। পাছে কালীকে কষ্ট পাইতে হয় বলিয়া তাহাকে একটু সচ্ছন্দে রাখিয়া গোপনে দুই ভগিনীতে প্রায় অর্দ্ধোপবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তথাপি বেশীদিন আর এভাবে চালাইয়া উঠিতে পারিল না।

চৈত্রের শেষ হইয়া আসিতেছে। রোগিনী এখন অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিতেছে। সংসারের এ অবস্থা সত্ত্বেও সতী যেন অন্ধকারে কূল দেখিতে পাইল। আবার ভাবিল রোগের কবল হইতে মুক্ত হইয়া মাতাকে হয়ত অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। বুক ফেটে আকুল প্রাণে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে সতী শেষ রাত্রে মাতার শয্যাপার্শ্বেই ঘুমাইয়া পড়িল। অতি প্রত্যূষে জাহ্নবী সতীকে ডাকিলেন "সতি! সতি! ওঠ্।" ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া সতী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল "কেন মা? কি হয়েছে?" কিছু হয়নি একটা দুঃস্বপ্ন দেখে মনটা ভারী খারাপ হয়েছে, আমার বুকে একটু হাত বুলো।" সতী মাতার বক্ষে হাত বুলাইতে লাগিল। কন্যার বিশুষ্ক ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া জাহ্নবী

বলিলেন "মা বিপদে অধৈর্য্য হয়োনা, ভগবান চিরদিন সমান রাখেন না, বিপদে পড়লে তাঁকে ডেকো, অবিশ্যি কূল দেবেন" সতী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "একথা এখন কেন বলছ মা"?

"কি জানি প্রাণের মধ্যে যেন কেমন করছে।"

সাবিত্রী উঠিল। মায়ের পদতলে একটু বসিয়া গৃহকার্য্যে প্রস্থান করিল। কালিপদ উঠিয়া এক চোট খেলা করিয়া আসিয়া বলিল "দিদি কি খাব!" কালিকার শেষ সম্বল দুইটি চাল আপনার অসুখ বলিয়া না খাইয়া ভ্রাতার জন্য অতি যত্নে সতী বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। সেই চাউল ক'টি ভাজিয়া আনিয়া একটু নুন মাখাইয়া ভ্রাতাকে দিল। ছোট বাটিটি লইয়া খাইতে খাইতে কালিপদ বাহির হইয়া গেল। সতী মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল "মা তোমার ক্ষেতা পেয়েছে?"

"না।" "হাঁ পেয়েছে। উঠে মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আহ্নিক সার। কিছু খাও।" জাহ্নবী একবার কন্যার প্রতি চাহিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন "মা আমি এক রকম করে বাঁচবোই, এ কঠিন প্রাণ সহজে বেরুবে না, কিন্তু আমার সম্মুখে কালী, তোমরা যেন অনাহারে শুকিও না। আমি না খেলেও বাঁচবো। সতী সেকথা কানে না করিয়া মাতাকে মুখ হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়াইয়া আহ্নিকে বসাইয়া দিল। জ্যেঠীমা গরুর দুধটুকু দুহিয়া দিয়া বকিতে বকিতে নদীস্নানে বাহির হইলেন। সতী ভাবিয়াছিল আজ আর সে দ্বার খুলিয়া বাহির হইবে না; কিন্তু মাতার জন্য তাহা পারিল না, ভাবিল যতক্ষণ দুধটুকুও আছে ততক্ষণ মাতাকে মরিতে দেওয়া হইবে না। সাবিত্রীকে বলিল সাবি তুই উনুনটা ধরা আমি দুটি করে দুধ দিয়ে আসি।" সাবিত্রী মৃদুস্বরে বলিল উনুন ধরিয়ে কি হবে?" "দুধ জাল দেব।" বলিতে বলিতে একটা কলসী লইয়া সতী খিড়কী দ্বার খুলিয়া পুকুরে চলিল। দ্বার খুলিয়াই দেখিল একটু দড়ী দিয়া একখানা ভাঁজ করা কাগজ কে দ্বারের বাহিরে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে। এখানা কি? একখানা পত্রের মত দেখাইতেছে, কৌতূহলবশতঃ খুলিয়া লইয়া দেখিল পত্রই বটে! অপরিচিত হস্তের অক্ষরে তাহারি নাম উপরে লেখা রহিয়াছে! বিস্ময়ের মাত্রা সীমা অতিক্রম করিল, তথাপি মাতা পিপাসিতা স্মরণ করিয়া পত্রখানা ইটের পাশে গুঁজিয়া রাখিয়া সে বাহির হইল। ঘাটে আসিয়া ভিজা কাপড়েই দুধটুকু জাল দিয়া অর্দ্ধেকটুকু ভ্রাতার জন্য রাখিয়া অর্দ্ধেকটুকু মাতাকে খাওয়াইল। জাহ্নবী বহু আপত্তি করিলেন শেষে কন্যার চক্ষে জল দেখিয়া অগত্যা আর একটু ঢালিয়া রাখিয়া দুধটুকু গ্রহণ করিলেন।

সতী তখন সিক্ত বস্ত্রেই ঘাটের দিকে চলিল। পূর্ণদিনের উপবাসে শরীর অত্যন্ত জ্বালা করিতেছিল। তাই সিক্ত বস্ত্র ত্যাগ করিলনা। ইটের ফাঁক হইতে পত্রখানা লইয়া প্রথম সম্বোধন পাঠ করিয়াই তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। শেষে অনেক চেষ্টায় ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া পত্রখানা পড়িয়া লইল। পত্রের লেখক নরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী জমিদার স্বয়ং, তাহার কমলার স্বামী। অতি কাতর ভাবায় করযোড়ে প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিয়াছে।

তাহাদের দুঃখে অনেক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছে যে তাহার প্রস্তাবে চলিলে তাহাদের আর কোন কষ্ট থাকিবে না। রোষে ক্ষোভে ঘৃণায় পত্রখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া সতী আবার জলে গিয়া নামিল; পত্রখানা পড়িয়া যেন সে অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিয়াছে, তাই পুনঃ পুনঃ ডুব দিয়া অনেকক্ষণ জলে পড়িয়া থাকিয়া উঠিয়া বাড়ী গেল। সাবিত্রী বলিল "দিদি আবার নাইলি? কিছুতে পা দিয়েছিলি বুঝি?"

"হাঁ।"

তারপরে সাবিত্রীকে বলিল "আমার বড় অসুখ করছে, আমি একটু শোব।"

সাবিত্রী শুষ্ক মুখে বলিল "কালীকে কি খেতে দেব দিদি?"

"যাহয় কিছু দিস্। একটু দুধ খাস্ একটু আকে দিস্।" সতী কাপড়খানা নিঙড়াইয়া লইয়া একটা ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। তাহার শরীরে তখন সত্যই অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল। পড়িয়া থাকিতে থাকিতে শ্রান্তদেহে ক্লান্ত চক্ষে নিদ্রা আসিল, সতী ঘুমাইয়া কতক যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, শুনিতে পাইল, ভাতের পরিবর্ত্তে দুধ পাইয়া কালিদাস অত্যন্ত বাঁকিয়া গিয়াছে। দুধটা ফেলিয়া দিয়া খুব কাঁদিতেছে, সাবিত্রীও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতেছে। সতী অঙ্গুলী দ্বারা কর্ণকুহর রোধ করিয়া প্রস্তর পুত্তলীর মত পড়িয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে দুয়ারে আঘাত পড়িল "দিদি—দিদি উঠে এস।" সতী উত্তর দিল না! "দিদি উঠে এস—বিশু দাদার মাসিমা কি সব পাঠিয়েছেন খাও।" সতী ধীরে ধীরে উঠিয়া দ্বার খুলিল, দেখিল একজন ভারী একদিকে একটা পুষ্পচন্দনশোভিত জলপূর্ণ কলসী ও অন্যদিকে একটি প্রকাণ্ড সিধা লইয়া ডাকা-ডাকি করিতেছে। সতী ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "এ সব কিসের?"

"আজকে সংক্রান্তি—মাঠাকরুণের অন্নদানের বেরতো—বামুন বাড়ী দিতে হয় তাই?"

একে একে সব নামাইয়া দিয়া ভারী চলিয়া গেল। সাবিত্রী ডোকার ফল মূল দিয়া কালিদাসকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। সতী ধীরে ধীরে আবশ্যকীয় দ্রব্য লইয়া রাঁধিতে গেল। কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু অগ্নির উপরে পড়িল তাহা অগ্নির মতই জ্বালা বিশিষ্ট। তাহা ভগবান বা মনুষ্যের কাহার উদ্দেশে—বলা যায় না।

আবার ধীরে ধীরে দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। সতী যথা স্থানে আবার একখানা পত্র পাইল, তাহা নানা প্রলোভন পূর্ণ। চিঠি খানা পূর্ব্বমত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সতী নীরবে রহিল। সাবিত্রীকে একথা বলিতে সাহস পাইল না, পাছে সে ভয় পায়।

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী এবার বৈশাখ মাসে বোধ হয় অনেক ব্রত লইয়াছিলেন। পাঁচ সাত দিন অন্তরই ভোজ্যাদি, ফলাদি, জলপূর্ণ কলসী নানা ব্রতের নামে তাহাদের বাড়ী পাঠাইতে লাগিলেন। সতী বুঝিল দারিদ্র্য অবস্থা মৃগনাভীর মত। সমস্ত বুঝিয়াও সে নীরবে রহিল কেননা এই দুর্দ্ধান্ত যাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সে অতি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আর যুঝিবার সাধ্য নাই। এই

দিন সংসারের ভাবনা একটু দূরে সরাইয়া পাঁচটা অবান্তর চিন্তা ভাবিয়া দেখিতে লাগিল কিন্তু তাহাদের এ নিরুদ্বেগ ভাব মুহূর্ত্তের জন্যও বোধ হয় ভাগ্য দেবতা বিধান করেন নাই। সহসা একদিন তারাপুরের কুঠীর মনিব তাঁহার প্রাপ্য তিন শত ও তাহার সুদ তিন শতের তাগাদা করিয়া পাঠাইল। না দিতে পারিলে অবিলম্বে বন্ধকী বাড়ী বিক্রয় করিয়া লইবে তাহাও বলিয়া পাঠাইল।

সেদিন জাহ্নবী আর শয্যা হইতে উঠিতে পারিলেন না। তিনি না খাইলে কন্যারা কিছু খাইবে না দেখিয়া অগত্যা মুষ্টিমাত্র আহার করিয়া শয্যায় গিয়া পড়িলেন। দুর্ভাবনায় ক্ষীণ দেহে কম্প দিয়া জ্বর আসিল। সাবিত্রী ম্লান মুখে মাতার নিকটে বসিয়া রহিল সতী একটা জীর্ণ কক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। ঘুমাইতে কি?

সে ভাবিতেছিল কাহার জন্য আজ এ বিড়ম্বনা। তাহাদের উদরের দায়ে ত এ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় নাই। কেবল তাহারি জন্য! তাহার সুখ সচ্ছন্দতা কিনিতে গিয়া পিতা মাতা নিজেরা আশ্রয়হীন হইয়াছেন! তাহাকে সুখী করিবার জন্য এ বিড়ম্বনা! সতী আপন মনে কাতরতার বিকট হাসি হাসিল। কাহার নিকটে এ বিপদে ভরসা পাইতে পারা যায়, কে এমন সময়ে আশ্রয় দিতে পারে। কাহাকে বলা যাইতে পারা যায় ওগো আমাদের মত দীন ভিক্ষুককে তোমায় ছয় শত টাকা ঋণ দিতে হইবে! এমন কেহ নাই! যদিও থাকে কে এমন নির্লজ্জ আছে যে তাহার নিকট এমন কথা বলিতে পারে! সতীর আবার মনে হইল হয়ত বলিতে হইবে না, আপনিই সে সাহায্য করিতে আসিবে। ছি ছি কি হেয় জীবন! কেবল কি ভিখারীর মত তাহার দয়া আশ্রয় করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে! আর কি কোন উপায় নাই?

সাবিত্রী ডাকিল "দিদি ঝড় এল, কাপড় কখানা তুলে আন, আমি ছোঁবনা।" সতী দ্বার খুলিয়া দেখিল তাহার অন্তরের ভাব অনুকরণ করিয়া প্রকৃতিও তুমুল বিপ্লব বাধাইবার উদ্যোগ করিতেছে। কাপড় কখানা তুলিয়া মনে পড়িল; ঘরে জল তোলা নাই, সমস্ত রাত্রি দুর্যোগ থামিবে না, সন্ধ্যার অভাবে শুষ্ক কূপ বারিহীন। সতীকে কলসী কক্ষে লইতে দেখিয়া সাবিত্রী বলিল "জল নেই বুঝি? আনি না দিদি!"

"তুই মার কাছে বস্ আমি এক দৌড়ে জলটা নিয়ে আসি।" জলে নামিয়া কলসী ডুবাইয়া কক্ষে তুলিতে গিয়াই সতী সহসা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল; পাড়ের উপরে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একজন লোক! কে? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল নরেন্দ্র।

ভয়ে চীৎকার করিতে গেল, কণ্ঠ দিয়া শব্দ বাহির হইল না, জলে দাঁড়াইয়া নীরবে কাঁপিতে লাগিল। নরেন হাসিয়া বলিল "ভয় কি সুন্দরি! আমি বাঘও নই ভালুকও নই, দু দুখানা পত্রের একখানারও জবাব দিলেনা যে?"

সতী সাহস সঞ্চয় করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "ভাল চান্ তো সরে যান্, নইলে আমি চেঁচাব।"

"এমন বোকার মত কথা বলছ? তুমি না খুব বুদ্ধিমতী! হাতের লক্ষ্মী পায়ে

স্নেহ! এই দশায় আছ, রাণীর মত থাকবে। আমি শুনেছি তোমাদের বাড়ী শীগগিরই ক্রোক হবে। তখন তোমরা কোথায় দাঁড়াবে? আমার কথায় রাজি হও, তোমার মা ভাই বোনেরও আর কষ্ট থাকবে না।"

সতী জলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। বোধ হইতেছিল যেন সাক্ষাৎ যম নরেন্দ্রের রূপ ধরিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। পাপিষ্ঠ আবার বলিল "কি বল? রাস্তায় রাস্তায় মা ভাই বোন নিয়ে ভিক্ষে করা ভাল,—অনাহারে তাদের মৃত্যু দেখা ভাল—না আমার কথায় রাজি হওয়া ভাল?"

সতী দুই হাতে মুখ ঢাকিল। নরেন্দ্র দেখিল তাহার ঔষধ ক্রমে ধরিতেছে, সোৎসাহে আবার বলিল "আমি হরির কাছে হ'তে তোমাদের সব খবর রাখি। যেদিন অবধি তোমায় দেখেছি সেই দিন হ'তে তোমার কথা আমার জপমালা হয়ে আছে। ভাল অবস্থায় থাকলে তোমরা কিছু গ্রাহ্য করনা, তাই এতদিন সাহস পাইনি। তুমি যদি আমার হতে চাও, তোমার আর কোন কষ্ট থাকবে না, যা চাবে তখনি তা পাবে। এই বিপদে পড়েছ, বল, এখনি তোমার টাকার দরকার কত?"

সতী আর্ত্ত কণ্ঠে চেঁচাইয়া বলিল "তুমি যাও, যাও, শীগগির যাও, নইলে এখনি জলে ঝাঁপ দেব।"

"আচ্ছা আচ্ছা—তা এখন যাচ্ছি,—কাল এই সময়ে আসব কি? আসব—কি বল? ঝড় আসছে তুমি বাড়ী যাও।"

সতী বলিল "তুমি আগে যাও তবে উঠব।"

"কেন আমি কি সাপ যে কাছ দিয়ে গেলে ছোবল দেব? আজ তবে বিদায়।"

পাপিষ্ঠ হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। আর সতী কাঁপিতে কাঁপিতে সেই জলের মধ্যেই বসিয়া পড়িল। মানবের সর্ব্বনাশী কুপ্রবৃত্তি যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তাহার চারিদিকে নানা কৌশলজাল বিস্তার করিতে লাগিল। সতীর আর সাধ্য নাই যে তাহাদের নিবারণ করে। যেন আশে পাশে অন্ধকারময় দেহধারীরা তাহার চারিপাশে আসিয়া তাণ্ডবনৃত্য বাধাইয়াছে। ভয়ে সতী নিস্পন্দ হইয়া পড়িল, এমন সাহস নাই যে অঙ্গুলীটি নাড়িতে পারে।

সহসা দেখিল পুকুরের দক্ষিণপার্শ্বে কে একজন ছুটিয়া যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইল, তীক্ষ্ণনয়নে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল। তারপরে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। সতী চিনিল, বিশ্বেশ্বর। বুঝিল নরেন্দ্রকে সে নিশ্চয় পুকুরের পাড় হইতে নামিতে দেখিয়াছে। সতীর এক একবার মনে হইতেছিল এখনই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলে কে রক্ষা করে। কিন্তু সবলে মনকে ফিরাইয়া অধরের উপরে ওষ্ঠ চাপিয়া সে উঠিয়া বাড়ী চলিল। আর এখন সে কাঁপিতেছে না, তাহার সঙ্কল্প পর্ব্বতের মত দৃঢ়। তাহাকে দেখিয়া সাবিত্রী উৎকণ্ঠিত মুখে বলিল "হিদি এত দেরী হল?

"আমি ঘাটে বাচ্ছিলাম।"

"কাপড় ভিজেছে, পড়ে গেছ বুঝি?"

"হ্যাঁ।" জাহ্নবী শুনিতে পাইয়া অন্তর্ভেদী নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

প্রভাতে জাহ্নবী সাবিত্রীকে বলিলেন, "ঝড়ে সব আমগুলো পড়ে গেছে, এই কাঁচা আম চারটে আর বেল কুল ক'টা বিশুর মাসীকে দিয়ে আয়ত মা।"

আম দিয়া ফিরিয়া সাবিত্রী বলিল "মা তিনি অক্ষয়তৃতীয়ায় গঙ্গাস্নান করতে নবদ্বীপ যাচ্চেন। বল্‌লেন, তোর মা তাল থাক্‌লে তোর মা কি দিদি যেতে পার্‌তেন। মা! উনি বড্ড আদর করেন, ভারী লজ্জা করে।" জাহ্নবী একবার নিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন সঙ্গে কে যাচ্চে?" "বিশু দাদাই যাচ্চেন।"

সেদিন অমাবস্যার ব্রতের প্রকাণ্ড একটা উৎসর্গীকৃত সিধা, পৈতা, সাদা একখানা কাপড় প্রভৃতি আসিল। জাহ্নবী নীরবেই রহিলেন; সতী একবার ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিল। ক্রমশঃ

শ্রীনিরুপমা দেবী।

শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে শ্রুতি, স্মৃতি, প্রত্যক্ষ, এবং অনুমানাদির প্রামাণ্য বিষয়।

শঙ্করের মতে অনুমানাদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায় মাত্র। শুধু তর্কমাত্র অবলম্বন করিয়া প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। "নৈষা তর্কেন মতির আপনেয়া"। আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ"। তিনি বলিতেছেন:— লৌকিক মণিমন্ত্র-ঔষধাদির মধ্যে ও দেশ কালের বৈচিত্র্য অনুসারে পরস্পরবিরুদ্ধ অনেক প্রকার কার্য্য-সাধক শক্তি দৃষ্ট হয়। বিনা উপদেশে কেবল তর্কমাত্র অবলম্বন করিয়া জানিতে পারা যায় না যে, এসকলের মধ্যে এই বস্তুর শক্তি এই পরিমাণ, অমুক বস্তুর সাহচর্য্যে অমুক বিষয়ে বা অমুক প্রয়োজন সাধনের জন্য তাহার শক্তি প্রকাশ হয়। অতি সামান্য বিষয় সম্বন্ধেই যখন এরূপ, তখন অচিন্ত্য প্রভাবশালী ব্রহ্মের স্বরূপাদি শ্রুতির উপদেশের সাহায্য ভিন্ন জানা যায় না, তাহা আর বিচিত্র কি? এই সকল কারণে শঙ্কর বলিতেছেন—"শ্রুতি বাক্যই ব্রহ্মজ্ঞানের মূল, শ্রুতিবাক্যই ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রমাণ। ইন্দ্রিয়াদি ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রমাণ নয়। অতএব শ্রুতি যেরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে বলে, সেই রূপেই লাভ করিতে হইবে। অ-২। পা-১। সূ-২৭॥

আমরা দেখিতেছি যে শঙ্করের মতে শ্রুতি "অপৌরুষেয়," "স্ববিষয়ে স্বতঃসিদ্ধ" প্রমাণ, বা "প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ," এবং "প্রত্যক্ষ" স্থানীয়। শ্রুতির সংজ্ঞা কি? শতাধিক উপনিষদ্ আছে—সকলই কি শ্রুতি? অথচ শঙ্কর সে সকলের মধ্যে মাত্র বারখানা প্রমাণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। এরূপ কেন? শ্রুতির "স্ববিষয়ের" বিস্তারই বা কতদূর? শ্রুতি অপৌরুষেয়, স্বতঃসিদ্ধ ইত্যাদি বিশেষণ-যোগ্য কেন? স্ববিষয় সম্বন্ধে যদি শ্রুতি স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যক্ষবৎ হইল, তবে বিষয়ান্তর সম্বন্ধে সেরূপ নয় কেন? শ্রুতিকে প্রত্যক্ষবৎ বলিয়া আবার তাহাকে শব্দ প্রমাণের মধ্যে গণ্য করার অর্থ কি? শ্রুতি যদি প্রত্যক্ষ বা স্বতঃসিদ্ধই হইবে

তবে বৌদ্ধগণ বেদবিরোধী হয় কেন? চার্ব্বাক্ বেদকর্ত্তাদিগকে ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচর বলিবার কারণ কি? শঙ্কর এই সকল প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছেন না। বোধ হয় যেন তিনি অনিচ্ছুক। তিনি বলিতেছেন "জন-সাধারণের জ্ঞান সবের অধীন"। বিনা বিচারে শ্রুতির স্বতঃসিদ্ধত্বাদি স্বীকার করাতে, তাঁহার নিজের প্রতিও কি কতক পরিমাণে সে দোষ আরোপ হইতে পারে না? শ্রুতি নিজেকে আপ্তবাক্যের বা স্বতঃসিদ্ধ বলিতেছে এমন শ্রুতিপ্রমাণেরও শঙ্কর উল্লেখ করিতেছেন না। ঋগ্বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যের ভূমিকায় বেদের স্বতঃসিদ্ধত্বের আলোচনা করিতে গিয়া বেদের 'স্বতঃ প্রামাণ্যের' বিরুদ্ধে একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন: "অতি সুশিক্ষিত নটও নিজের স্কন্ধে নিজে আরোহণ করিতে পারে না।" শ্রুতির প্রামাণ্য বিচার করিতে গেলেই তর্ক বা অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। শ্রুতির পবিত্রক্ষেত্রে উদ্দাম তর্ককে একবার প্রবেশ করিতে দিলে কি আর রক্ষা আছে? তর্কের স্রোতে পড়িয়া মানব সমাজ কোন্ অপরিজ্ঞাত অন্ধকার গহ্বরে পতিত হইবে, কে বলিবে? হয়ত বেদের প্রামাণ্যের বিচার করিতে গেলে বেদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইবে, হয়ত চার্ব্বাকের সঙ্গে মিলিয়া সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিবে—'ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারঃ ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচরাঃ'! বিচারে হয়ত বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করা অসাধ্য হইতে পারে; তাহার ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সমূলে উন্মূলিত হইয়া গিয়া, হৈতুক বৌদ্ধমত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে, বা চার্ব্বাকের প্রাদুর্ভাবে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লুপ্ত হইয়া যাইবে। "ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েদজ্ঞানং কর্ম্মসঙ্গিনাং" 'অজ্ঞানী কর্ম্মাসক্তদিগের মনে সংশয় উৎপাদন করিবে না' গীতার এই নিষেধবচন কোনরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত না হইয়া সর্ব্বত্র প্রযোজ্য হইলে, তাহা সত্যের বিভীষিকাব্যঞ্জক, অথবা মানব প্রকৃতির এবং সত্যের প্রতি বিশ্বাসের অভাব-ব্যঞ্জক কি না পাঠক চিন্তা করিবেন। অপরদিকে শ্রুতির স্বতঃসিদ্ধত্ব বিষয়ে তর্ক উত্থাপন করিতে না দিলে পরিণামে "সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো"ই দাঁড়ায়। আরিষ্টটল্ বলিয়াছিলেন—"তর্ক করা যদি ভাল হয় তবে তর্ক করিতেই হইবে, আর তর্ক করা যদি ভাল না হয় তবেও তর্ক দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। অতএব উভয়থা তর্ক করিতেই হইবে।" ইহা অতি দুঃখের বিষয় যে শঙ্করের মতন সিদ্ধ-হস্ত তার্কিকও শ্রুতির প্রামাণ্য বিষয়ক তর্কের বিভীষিকা পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মুক্তভাবে বিচার দ্বারা বৌদ্ধ এবং চার্ব্বাকমত খণ্ডন করিয়া শ্রুতির স্বতঃসিদ্ধত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। একথা সত্য যে 'তর্ক' বলিতে আমরা সচরাচর জিগীষামূলক কুতর্কই বুঝিয়া থাকি, ন্যায় যাহাকে 'বিতণ্ডা' এবং 'জল্প' নামে অভিহিত করিয়াছে। বস্তুতঃ সত্যানুরাগ প্রণোদিত জিগীষাশূন্য তর্ক বা বিচার, ন্যায় যাহাকে 'বাদ' নামে অভিহিত করিয়াছে, তাহাই আমাদের জীবনের পথ প্রদর্শক প্রদীপস্বরূপ। বিভীষিকা দর্শনে সেই বাদ কথার গতি রোধ করা আর মানব সমাজের জীবন প্রবাহ রোধ করিয়া মৃত্যুর

দ্বার উন্মুক্ত করা একই কথা। শঙ্কর নিজেই দুঃখ করিতেছেন যে "জনসাধারণের জ্ঞান পরের অধীন। তাহারা স্বাধীনভাবে শ্রুতির অর্থ অবধারণে অক্ষম। এজন্য তাহারা বিখ্যাত প্রণেতাদিকৃত স্মৃতিকে আশ্রয় করে এবং তখনই শ্রুতির অর্থ নির্ণয় করে। আমরা নিজে যদি শ্রুতির কোন ব্যাখ্যা করি তাহা বিশ্বাস করিবে না।" স্বাধীন চিন্তার অভাবই লোক-সমাজের রোগ। কোনরূপ বিভীষিকার ভয়ে লোকের স্বাধীন চিন্তার দ্বার রুদ্ধ করিলে, লোকের জ্ঞান যে আরও অধিকতর পরাধীন হইয়া পড়িবে! স্বাধীনভাবে তর্ককরা এবং সকলকে তর্ক করিতে দেওয়াই সেই পরাধীনতা মোচনের একমাত্র উপায়। সত্যই মানবের একমাত্র লক্ষ্য। "লোকে বিশ্বাস করিবে না" এই ভয়ে সত্য যাহা বুঝিয়াছ তাহা গোপন করা অথবা "স্মৃতি প্রণেতাদিগের প্রতি লোকের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা অতএব সত্য হউক আর না হউক স্মৃতি অনুসারে বেদের ব্যাখ্যা করিতে হয়"—এরূপ কথা শঙ্করের পক্ষে শোভা পায় না। তাহাতে সত্যের প্রতি সমুচিত আস্থা প্রদর্শন করা হয় না। তর্কের উদ্দেশ্য সত্য নির্দ্ধারণ, তর্কদ্বারা সত্যপথ স্থির করিয়া সেই পথে চলিতে হয়। তর্কে ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু সেই ভ্রমও তর্ক দ্বারাই সংশোধন হয়, কোনরূপ কল্পিত বিভীষিকা বা লোক-বুদ্ধির প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন দ্বারা নয়। সত্য-পথের জ্ঞান লাভ হইলেই তর্কের প্রয়োজন সিদ্ধ হইল। সে পথে চলা না চলা মানবের প্রযত্ন এবং পুরুষকার সাপেক্ষ। তর্ক পুরুষকারের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। গম্য পথ জানিয়াও অনেকে সে পথে চলে না, বা বিপথে চলে, বা বিতণ্ডা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করে। কিন্তু সে দোষের জন্য বাদ বা তর্ক দায়ী হইতে পারে না। আমেরিকা-যাত্রী তর্ক দ্বারাই তাহার গম্যপথ নির্ণয় করিবে, কিন্তু তর্ক তাহাকে আমেরিকা লইয়া যাইবে না। আমেরিকাগমন পুরুষকার এবং প্রযত্নসাপেক্ষ। নির্মুক্তভাবে সত্যের জন্যই সত্য নির্দ্ধারণ মানসে তর্ক করিলে যদি বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বা স্বতঃসিদ্ধত্ব চলিয়া যায় যাউক। ভয় কি? বরং তাহাতে সত্যের পথই কণ্টকমুক্ত হইবে। সত্যই মানবাত্মার অন্বেষণ। শ্রুতি স্বয়ংই সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া, সত্য জিজ্ঞাসুকে উৎসাহিত করিতেছেঃ—"সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ। যেনা ক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা, যত্র তৎসত্যস্য পরমং নিধানং"॥ মুণ্ডক॥ 'সত্যেরই জয় মিথ্যার নয়—সত্যের ভিত্তিতেই দেবলোকের পথ প্রতিষ্ঠিত, যে পথ আশ্রয় করিয়া পূর্ণকাম ঋষিগণ সত্যের পরমাশ্রয় সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।" তর্কদ্বারা শ্রুতির প্রামাণ্য সম্যক প্রতিষ্ঠিত না করিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞান শ্রুতি-মূলক, শঙ্করের এই সিদ্ধান্ত দোষশূন্য হইতে পারে না। জরাসন্ধের দেহ-সন্ধির ন্যায় ইহাতেই শঙ্করের দার্শনিক সিদ্ধান্তের দুর্ব্বলতা।

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

বঙ্কিম-যুগের কথা।

(৫)

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী বঙ্কিম-যুগের একজন প্রধান কবি।

বাঙ্গালার বিগুমান সাহিত্য যখন সবে ভোরের আলো দেখিয়াছে—তখনই বিহারীলালের আগমন। সাহিত্যক্ষেত্রের সর্ব্ববিভাগেই তখন এক একজন প্রতিভাবান্ বিচরণ করিতেছিলেন। বিহারীলালের সমাদর কাব্যক্ষেত্রে। এ'যুগের গীতিকবিতার যে নূতন রাগিণী শুনিতে পাই,—বিহারীলালের বীণার তন্ত্রীতে সর্ব্বপ্রথমে তাহা বাজিয়া উঠে। আগেই বলিয়াছি, তেমন গৌরবোজ্জ্বল যুগ আর নাই,—আর হইবে কিনা, কে জানে!

প্রথমবয়সে বিহারীলাল, গদ্য পদ্য—দুই লিখিতেন। "পূর্ণিমা" নামে তখন একখানি মাসিক ছিল। কবিবর হেমচন্দ্র, ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি উক্ত মাসিকে রচনা প্রকাশ করিতেন। (১২৮১—৮৮) বিহারীলাল, তাহার পর "অবোধবন্ধু" নামে একখানি মাসিকপত্র, নিজেই পরিচালন করিতে থাকেন। "স্বপ্নদর্শন" নামে বিহারীলালের একখানি ছোট গদ্যের বই ছিল। সে বই এখন পাওয়া যায় না। বিহারীলালের কবিতা অনেকেই দেখিয়াছেন, এখানে তাঁহার গদ্যের একটু পরিচয় দিতেছি।—

"হা আমার জন্মভূমি! তোমার একি দশা হইয়াছে! হা আমার স্বদেশীয় ভ্রাতা সকল! তোমরা কোথায় গমন করিয়াছ! যে আমি তোমাদের সহিত লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি, যে আমি তোমাদের সহিত কত আমোদ প্রমোদ করিয়াছি; হা! সেই আমাকে তোমাদের কঙ্কালমাত্র পতিত দেখিতে হইতেছে। হা কঠিন হৃদয়! কেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছ না? হা মাতঃ! হা ভ্রাতঃ! হা অবিবেকতে! তোমরা কোথায়? হে সূর্য্য! দেখ দেখ। তুমি যে দেশের প্রান্তরে কিরণদান করিতে, যে দেশের ক্ষেত্রের মুখ উজ্জ্বল করিতে, যে দেশের দশা সন্তোষ রাখিতে, যে দেশের কমলিনী প্রফুল্ল হইয়া তোমার প্রতি কতই আনন্দপ্রকাশ করিত, সে দেশের কি বিষম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে!"

৺দীননাথ চক্রবর্ত্তী, বিহারীলালের পিতা। তিনি পৌরহিত্য করিতেন; অনেক ধনী, তাঁহার যজমান ছিলেন। বিহারীলাল, তাঁহার একমাত্র পুত্র। শুনিতে পাই, ছেলেবেলায় তিনি খুব দুরন্ত ছিলেন। কাশ্মীররাজের অধীনে তিনি একবার চাকরী করিয়াছিলেন,—কিন্তু তাঁহার মত সৎলোক কর্ম্মক্ষেত্রের গোলমাল ও শঠতার ভিতরে বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারেন না। দু'বৎসর কাজ করিয়াই তিনি ইস্তফা দেন।

বিহারীলালের অনেকগুলি অধুনাপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের ভিতরে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি নাম উল্লেখ্য। এ'যুগের দুইজন প্রসিদ্ধ কবি, তাঁহার শিষ্যস্থানীয় ছিলেন।

তাঁহারা, রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার। সেকালকার অনেকের রচনায় বিহারী-লালের প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু বাঙ্গালার পাঠকদের নিকটে তিনি আশানুরূপ সম্মান পান নাই।

বিহারীলাল নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। ১। বঙ্গসুন্দরী। ২। সারদামঙ্গল। ৩। সাধের আসন। ৪। সঙ্গীতশতক। ৫। প্রেম-প্রবাহিণী। ৬। বন্ধুবিয়োগ। ৭। নিসর্গ-সন্দর্শন। ৮। বাউল-বিংশতি। ৯। স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি। কার্ত্তিক মাসের "আর্য্যাবর্ত্তে"র "পুরাতন প্রসঙ্গে" দেখিলাম, বিহারীলালের "সুরবালা" নামে একখানি কাব্য ছিল। "সুরবালা" নামে বিহারীলালের একখানি কাব্য ছিল বটে,—কিন্তু কোন অপ্রকাশ্য কারণবশতঃ বন্ধুবিচ্ছেদের ভয়ে তাহা আর মুদ্রিত হয় নাই। বিহারীলালের "বঙ্গসুন্দরী"তে "সুরবালা" মিশাইয়া যায়। "বঙ্গসুন্দরী"তে "সুরবালা"র নিম্নলিখিত সর্গগুলি আছে। ১। চির-পরাধিনী। ২। সুরবালা। ৩। করুণাসুন্দরী। ৪। বিবাদিনী। অভাগিনী। ৬। বিরহিনী। দ্বিতীয় সংস্করণে "বিরহিনী"তে কতকগুলি নূতন গান দেওয়া হয়।

"বঙ্গসুন্দরী" বিহারীলালের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নিকটে উপকারস্বরূপ সমর্পিত হয়। পুস্তকে তাঁহার নাম নাই বটে,—কিন্তু আমরা যতদূর জানি, বিহারীলালের উক্ত বন্ধু, শ্রীযুত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। "বঙ্গসুন্দরী"তে প্রধানতঃ যে ছন্দঃ অনুসৃত হইয়াছে, বাঙ্গালায় আগে তাহা ছিল না; "রঘুবংশ" হইতে বিহারীলাল সর্ব্বপ্রথমে সেই ছন্দঃ বাঙ্গলায় গ্রহণ করেন। এই নূতন ছন্দের মাধুর্য্য, আমরা এখানে দেখাইতেছি :—

"বিকশিত নীলকমল আনন,
বিলোচন নীলকমল ছাদে;
আলো করে নীল কমল বরণ,
পুষ্পেতে ভুবন কমল বাসে।

* * *

স্থাবর বরণ, বিমল আকাশ;
জগত তোমার অমরাবতী;
নয়নে কমলা করেন নিবাস,
আননে কোমলা ভারতী সতী।
লীলায় যত সরল অন্তর,
দ্রৌপদীর মত রূপসী ভাষা;
কালরূপে আলো করি চরাচর
কে গো এ বিরাজে মুকুতা বাস!"

বঙ্গসুন্দরী। তৃতীয় সর্গ। সুরবালা।

"বঙ্গসুন্দরী" প্রভৃতি পুস্তক, বিহারীলাল যেরূপ সুন্দর কাগজে সুন্দরভাবে ছাপাইয়া-ছিলেন—সে কালে তাহা দুর্লভ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণের "বঙ্গসুন্দরী" ও "সারদামঙ্গল" পাঠকগণের কৃপাদৃষ্টিলাভ করিতে পারে নাই। অবশেষে, একদিন মহা চটিয়া গিয়া, কবিবর, বইগুলি বটতলায় বিক্রয় করিয়া দিলেন!

বিহারীলালের রচনা-প্রণালী বড় বেশী রকম ছিল। একবার যাহা লিখিলাম—তাহা আর দেখিব না,—বিহারীলালের এ নীতি ছিল না। যতক্ষণ না একটী সর্গ, তাঁহার মনের মতন হইত,—ততক্ষণ তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। "সারদামঙ্গল" প্রথমে "আর্য্যদর্শনে" প্রকাশিত হয়। কিন্তু কাব্যখানি যখন পুস্তকাকারে বাহির হইল,—তখন তাহার ভিন্ন মূর্ত্তি! এই কাট ছাঁটের

ভিতরে পড়িয়া সময়ে সময়ে বিহারীলাল অনেক ভাল অংশ বাদ দিয়া বসিতেন। কবির একখানি দপ্তর ছিল। তাহার ভিতরে কবিতাগুলি থাকিত। একবার তাঁহার একখানি কাব্য-পুস্তক ছাপা হইয়া গিয়াছে, হঠাৎ এক যায়গায়, একটী শব্দের প্রতি কবির দৃষ্টি পড়িল। শব্দটি, তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি তখনই সেই অংশের ফর্ম্মাটি দ্বিতীয়বার প্রেসে দিলেন,—আগেকার ফর্ম্মা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাহার পর ইচ্ছামত একটী নূতন শব্দ পূর্ব্ব শব্দের স্থানে বসাইয়া দিলেন।

বিহারীলালের দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহে সন্তানাদি কিছু হয় নাই। দ্বিতীয় বিবাহের ফলে, বিহারীলাল অনেকগুলি সন্তানসন্ততি লাভ করিয়াছিলেন।

বিহারীলাল, যেমন বন্ধুবৎসল, তেমনি সদানন্দ ছিলেন। তাঁহার চিত্ত উদার ছিল—তিনি কদাপি সংকীর্ণতার দিক্ মাড়াইতেন না। তিনি দু'জন কবিকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসিতেন ও তাঁহাদিগের ভক্ত ছিলেন। তাঁহারা বাল্মীকি ও কীট্‌স্। তাঁহার মুখে প্রায়ই কীট্‌সের প্রশংসা শোনা যাইত। তিনি নিজেই গান বাঁধিতেন, নিজেই তাহাতে সুরসংযোগ করিতেন এবং নিজেই গান ধরিতেন। তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন না বটে; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়! গান, আনন্দের ভাষা—আনন্দে তাহার অভিব্যক্তি। কবিবর অক্ষয়-কুমারের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার দাঁত ছিল না,—কিন্তু সেই দন্তবিরল মুখেই ভাবে-ভোলা বৃদ্ধ কবি, গলা ছাড়িয়া গান ধরিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তবলার অভাবে দু'হাতে তক্তাপোষ পিটিয়া চমৎকার বাজনা চলিত।

এখন যেমন বন্ধুজনের বিবাহে প্রীতি-উপহার দিবার চলন হইয়াছে,—তখন তাহা ছিল না। তখন, স্কুল-কলেজের মাষ্টার ও পণ্ডিতগণ যখন অবসর বা বিদায় লইতেন, ছাত্রেরা কবিতায় একটী অভিনন্দন দিত। "বিহারীলাল এরূপ অনুরোধের কবিতা লিখিতে চাহিতেন না! সুতরাং এই মৎলোব মাথায় লইয়া যদি কেহ বিহারীলালকে অনুরোধ করিতে আসিত, তাহা হইলে বৃদ্ধ কবি রাগিয়া উঠিয়া তাহাকে মারিতে যাইতেন! ছোক্‌রারা তখন পলাইবার পথ পাইত না।

বিহারীলালের ভিতরে কতটা কবি-প্রাণ ছিল, নিম্নলিখিত ঘটনায় তাহা পরিস্ফুট হইবে। এখন যেমন বেলা একটা ও রাত্রি নয়টার সময়ে তোপ পড়ে; তখন তেমন ছিল না। তখন রাত্রি সাড়ে নয়টার সময়ে একবার ও ভোর ছয়টার সময় (বোধ হয়) আর একবার তোপ পড়িত।

বিহারীলাল ছাদে বসিয়া আছেন। ছাদের উপরে তাঁহার এক সাধের বাগান ছিল। কতকগুলি ফুলগাছের টবে, ফুলের গাছে অনেক ফুল ফুটিয়া থাকিত। সেদিন, পরিষ্কার পূর্ণিমার রাত্রি—নীলাঞ্জনীল আকাশে চাঁদের আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বিহারীলাল, কলিকার আগুন দিয়া ধূমপানের আশায় ছাদের উপরে বসিয়া, চাঁদের দিকে চাহিলেন। সেই সময়ে রাত্রি ৯॥ টার তোপ পড়িল। এদিকে চাঁদ দেখিতে দেখিতে কবির প্রাণ-বিহগ, মনঃকল্পিত কল্পনা-নন্দনে ডানা মেলিয়া উড়িয়া গেল। এবং নিখিল বিশ্বের উপরে যেন একটা বিস্মৃতির

আবরণ, যেন একটা স্বপ্ন-যবনিকা বিস্তৃত হইয়া গেল। কবিবর, তখন স্বভাবের শোভার ভিতরে—প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যের ভিতরে, ধ্যানমগ্ন যোগীর মতন বসিয়া!—হাতে কিন্তু হুকা আছে, কারণ বাতাসে তামাক ধরিতেছিল!

হঠাৎ আবার তোপ পড়িল। কবির ভাব-সমাধি টুটিয়া গেল! তামাক ধরিয়াছে ভাবিয়া, বিহারীলাল হুকায় একটা টান দিলেন —কিন্তু রাত্রি ৯৷৷০টা হইতে ভোর ৬৷৷০টা পর্য্যন্ত তামাক ধরিতেছিল, সুতরাং আগুন তখন নিবিয়া গিয়াছে। অতএব, দশ ঘণ্টা ধরিয়া, কবিবর, কেবল চাঁদের 'মোহনা' পান করিয়াই কাটাইয়া দিলেন—তামাক খাওয়া আর হইল না!

এই ছাদটি, নিশ্চয়ই বিহারীলালের কাছে অতি প্রিয়স্থান ছিল। কবির "শরৎকাল" পড়িয়া জানিতে পারি, একথা "শারদ্ পূর্ণিমা"র, তিনি প্রিয়ার সহিত এই ছাদে "যামিনী-যাপন" করিয়াছিলেন। সেই ঘটনাটী তিনি ভাবময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।—

"দ্বিতীয় প্রহর নিশি,
কি প্রশান্ত দশদিশি।
জোছনার সুধায় ভরপুর,
বাতাস হয়েছে শুদ্ধ,
নাই কোন সাড়া শব্দ,
পাপিয়ার মুখে নাই কথা।
ঘুমায় আমার প্রিয়া ছাদের উপরে
জোছনার আলোক আসি লুটেছে অধরে।
* * *
আর কিছু নাই সুখ,
ওই চাঁদ, এই মুখ,
যেন আমি অন্যান্তরে কিবে দুই পাই।"

* *

তারপর,—নিশান্তে।

"আহা স্নিগ্ধ সমীরণ!
কোথা ছিলে এতক্ষণ,
এস মোর আদরের চির-সহচর!
আলুথালু হ'য়ে প্রিয়া
আছে সুখে ঘুমাইয়া,
আলুথালু কুন্তলে সুখে খেলা কর।
* * *
ঐ প্রেয়সী আমার—
ঐ প্রেয়সী আমার—
হৃদয় সুখের কত স্বপনের হার।
বেড়ে তব চরাচর
যেন পাই ত্রিভুবন
অন্তরে উথলে ওঠে আনন্দ অপার।
ঐ প্রেয়সী আমার!
* *
ওই চাঁদ অস্ত যায়,
বিহঙ্গ কলিত গায়,
মঙ্গল আরতি বাজে নিশি অবসান।
বিমেল্ বিমেল্ বায়,
বিমে চুল ভিজে যায়,
শিশির মুকুতা ভালে ভিজেছে বয়ান;
ঐ প্রেয়সী আমার, যেন অলির সমান।"

কবির কি প্রাণ! কি প্রেম!

আমার অনুমান ঠিক্ কিনা, তাহা বলিতে পারি না,—কিন্তু আমার মনে হয়, এ যুগের কাব্য-সাহিত্যে একটা কৃত্রিমতা প্রবেশ-লাভ করিয়াছে। যে কথা, সোজা-সুজি বলা যায়, সে কথাটী অকারণে এমন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলা হয়, যে তাহার ভিতর হইতে কাব্য-লক্ষ্মীর একটী অখণ্ড, পরিপূর্ণ মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই না। সকল কবির কবিতাই যে এই দোষে দুষ্ট, এমন মিথ্যা কথা বলিবার সাহস আমার নাই—তবে, সাধারণতঃ

অনেকের প্রতিই আমার কথা খাটে। এ যুগের কবিতা, জ্যোৎস্নার মত অস্পষ্ট, স্বপ্নময়। সে যুগের কবিতা,—সবিতারই মত স্বপ্রকাশ—স্বপ্নচ্ছায়াশূন্য। বিহারীলাল, তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। তাঁহার কবিতা, সরল ভাষায় যখন যে ভাব পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছে,—তাহা করিয়াছে,—কিন্তু তাহার জন্য কদাপি বক্র পন্থা অবলম্বন করে নাই। ইহা তাঁহারই বিশেষত্ব,—কি সে যুগের বিশেষত্ব, পাঠকেরা ভাবিয়া দেখুন।

নারীর দেবীত্বে, বিহারীলালের অখণ্ড বিশ্বাস। তাঁহার মতে, রমণী কেবল শয্যা-সঙ্গিনী নন,—পরন্তু, তিনি দেবী, তিনি মহিমময়ী, তিনি বিশ্বদেবের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। বলিতে কি, এই নারীবন্দনাই যেন বিহারীলালের কবিতার প্রাণসঞ্চার করিয়াছে—তৎপূজিত কাব্য-পীঠে ধ্রুবের মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই দিক্ দিয়া দেখিলে, বিহারীলালকে অতিতীব্র বলিয়া মনে হয়।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু সম্বন্ধে দু' একটী কথা বলিয়া এবারকার মত বিদায় লইব। কেবল, কল্পনাকে সঙ্গিনী করিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসরচনায় হাত দেন নাই। নগেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ গোবিন্দলাল ও হরলাল প্রভৃতি সকলেই এক একজন জীবন্ত মানব,—যে মানবকে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে,—আমাদের সংসারে, আমাদের সমাজে, আমাদের প্রাত্যহিক সুখদুঃখের বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতরে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। তাঁহার হৃদয়ের ঘোষালে, স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায়ের চরিত্র নিপুণ তুলিকায় চিত্রিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাথমিক উপন্যাসগুলিতে বাস্তব অপেক্ষা কল্পনার ছায়াপাত অধিক প্রকট হইয়া উঠিলেও, তাহাদের ভিতরে হঠাৎ এমন এক একটী বাস্তব চরিত্রের সহিত আমাদের পরিচয় সাধন হইয়া যায়,—যাহাদের সহিত কল্পনার লীলাখেলা বড় অল্প। যেমন, দুর্গেশনন্দিনীর বিদ্যা-দিগ্‌গজ। আমরা শুনিয়াছি, কাঁটাল-পাড়ায় বিদ্যাদিগ্‌গজের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার নাম জানি না। তবে, তিনি সর্ব্বদাই বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ীতে আসা-যাওয়া করিতেন। তিনি একজন নির্ব্বোধ রসিক ছিলেন। রসিক বলিলে তাঁহার প্রকৃত চরিত্রের কথা বলা হয় না। কারণ, তিনি নিজে রসিকতা করিতেছি ভাবিয়া রস ছড়াইতেন না—শ্রোতৃগণ তাঁহার ভাবভঙ্গী ও কথাবার্ত্তার ভিতর হইতে প্রচুর হাস্যরস আবিষ্কার করিতেন। অর্থাৎ তিনি হাস্যার্ণব নন,—হাস্যাস্পদ বটে।

মানবের বহিঃপ্রকৃতির অবিকল প্রতিরূপ দীনবন্ধুর নাটকেও দেখা যায়। আমরা এই বিষয়ে দু'একটী গল্প বলিব। দীনবন্ধু যে কাঁটালপাড়ায় মাঝে মাঝে যাইতেন,—এ কথা আমরা আগেই বলিয়াছি। সেখানেও দীনবন্ধু ও স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় প্রভৃতি কয়েক জনে কাঁটালপাড়ায় যাইতেছিলেন। কার্ত্তিকেয় বাবু, কবি শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা। তিনি কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ানী করিয়া যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। কার্ত্তিকেয় বাবুর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদ্যতা ছিল এবং তিনিও মাঝে মাঝে কাঁটালপাড়ায় যাইতেন।

যাহা হউক, সকলে যখন নৈহাটিতে

নামিলেন, তখন রাত্রিকাল। পূর্ণবাবু সকলকে লইয়া যাইবার জন্ত ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। পূর্ণবাবুর সঙ্গে সকলে বঙ্কিমের আলয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন।

যাইতে যাইতে সকলের দৃষ্টি একদিকে গেল। পথের ধারে অন্ধকারে যেন কি একটা সচল পদার্থ পড়িয়াছিল! একটু পরেই বোঝা গেল, তাহা আর কিছু নয়,—একজন লোক। সুরাদেবীর দয়ায় ভূমিশয্যায় তিনি বিশ্রাম ভোগ করিতেছিলেন। দীনবন্ধু অগ্রসর হইলেন এবং লণ্ঠনের আলোকে মানুষটা কে, তাহাই চিনিতে চেষ্টা করিলেন। চিনিতে বড় দেরি হইল না। এখানে তাঁহার নামটী ছাপাইয়া দিয়া লাভ নাই। তবে এইটুকু বলিলেই চলিবে, যে তিনি একজন গণ্যমান্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। দীনবন্ধু, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের এখন কোথায় যাওয়া হবে?"

"শ্বশুরবাড়ী।"

"শ্বশুর কে?

"অমুক।"

"ওঃ! তাকে যে আমি চিনি!"

এই কথা শুনিবামাত্র তিনি তাড়াতাড়ি দীনবন্ধুকে বলিলেন "ইউ নো মাই ফাদার-ইন্-লা সার্? দেন্ ইউ মাই ফাদার ইন্ লা সাব্—আই সান্ ইন্-লা সার!" পথের ভিতরে অকস্মাৎ এমন একজন উদার "সন্-ইন্-ল" সংগ্রহ করিয়া দীনবন্ধু আর কি করিয়াছিলেন জানি না,—তবে এইটুকু জানি যে, এই নব "সন্-ইন্-ল"কে, তাঁহার পুরাতন ও আইন সঙ্গত "ফাদার-ইন্-ল"র বাড়ীতে নিরাপদে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, রাস্তার ধারে তাঁহাকে আর একজন "ফাদার-ইন্-ল" হস্তগত করিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। অনেকেই জানেন, উক্ত রসালো উক্তিগুলি, দীনবন্ধু তাঁহার "সধবার একাদশী"তে ভোলা-নাথের মুখে অবিকল বসাইয়া দিয়াছেন।

আমি আর একজনের কথা জানি,—তিনি দীনবন্ধুকে দেখিলে ভারি ভয় পাইতেন। আসরে সবাই বসিয়া আছে, দিব্য কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে দীনবন্ধু আসিয়া উপস্থিত, আর অমনি তাঁহারও মুখ বন্ধ। মৌনব্রতের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন,—"ইঁা, আমি তোমাদের কাছে হঠাৎ একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলি,—আর অমনি সেটী দীনবন্ধুর নাটকে গিয়ে উঠুক! বাবা, উনি কি সহজ লোক!"

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। "বিষবৃক্ষে", নগেন্দ্র দত্তের অন্তঃপুরের যে চমৎকার চিত্র আছে,—তাহা বঙ্কিমের তীক্ষ্ণদৃষ্টির ফল। কাঁটালপাড়ায় চট্টোপাধ্যায়গণের পরিবার, খুব বড় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় তাঁহাদের "পুরী বহুসংখ্যক আত্মীয় কুটুম্বকন্যা, মাসী, মাসীত ভগিনী, পিসী, পিসীত ভগিনী • • • ইত্যাদি নানাবিধ কুটুম্বিনীতে কাক সমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায় রাত্রি-দিবা কল কল করিত এবং অনুক্ষণ নানাপ্রকার চীৎকার, হাস্ত-পরিহাস কলহ, কুতর্ক, গল্প, পরনিন্দা, বালকের হুড়াহুড়ি, বালিকার রোদন, "জল আন্", "কাপড় দে" "ভাত রাঁধ্‌লে না" "খায় নাই" "দুধ কই" ইত্যাদি শব্দে সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ শব্দিত হইত।"

বঙ্কিমচন্দ্র, বসিয়া বসিয়া সে সব দেখিতেন, শুনিতেন ও লিখিতেন। ক্রমশঃ

রামটেক।

১

মেঘদূতের প্রথম শ্লোকে পাঠ করিয়াছিলাম :—

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু।

নাগপুরে গিয়া যখন বন্ধুদের মুখে শুনিলাম যে এই রামগিরিই বর্ত্তমান রামটেক, ও তাহা নাগপুর হইতে কেবলমাত্র সাত ক্রোশ, তখন রামটেক দেখিবার কৌতূহল সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

যাত্রার সময় স্থির হইয়াছিল ভোর সাড়ে চারটা। সবলে আলস্যপরিহার করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলাম। শুনিলাম পাঁচটায় ট্রেণ ছাড়িবে। তবে ষ্টেশন দূরে নহে, আর সহিসও বলিয়াছে 'যথাসময়ে টাঙ্গা লইয়া আসিবে। আমরা ধীরে ধীরে যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম। তীর্থদর্শনে যাইতেছি; সঙ্গে লোটা লইলাম। সেই শারদ প্রত্যূষে শীতের পূর্ব্বাভাস স্পষ্টই পাওয়া যাইতেছিল এবং কম্বল লইলে একেবারে অসঙ্গত হইত না। তবে সেটা আর লওয়া হইল না; ফ্লানেলের সার্টেই সে অভাব পূরান গেল। তীর্থযাত্রার অন্যান্য সরঞ্জামের মধ্যে কোঁচান ধুতি, তোয়ালে ও ক্যাশনাল ক্যাষ্টরীর সুগন্ধ সাবান। এইরূপে পনর মিনিট কাল সহজেই অতিবাহিত হইল। এমন সময়ে ভৃত্য আস্তাবল হইতে ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল যে ঘোড়ার পায়ে ব্যথা, টাঙ্গা আসিতে পারিবে না। বন্ধু কানে কানে সংক্ষেপে কহিয়া দিলেন—"পনর মিনিট! হাঁটিয়া পৌঁছান অসম্ভব।" এই টেলিগ্রাফিক উক্তি "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।" ব্যাপার বুঝিয়া ফেলিলাম।

ঘোড়ার পায়ে যে পরিমাণে দরদ, আমাদের পা সেই পরিমাণে 'জলদ' চলিতে লাগিল। মনে হইতেছিল "ঐ বুঝি বাঁশী বাজে," ট্রেণ বুঝি ছাড়িয়া যায়।

কিন্তু যথাসময়েই ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম প্লাটফর্ম্ম গ্যাসালোকে উজ্জ্বল। ট্রেণ ছাড়ে নাই; শুনিলাম "ঘোড়া" দেরী আছে। ইতিমধ্যে আমাদের যাত্রীদলের একটু পরিচয় লওয়া যাক্। সর্ব্বসমেত আমরা সাত জন। প্রথম ছিলেন বন্ধু চিত্তরঞ্জন বাবু। ইনিই যাত্রার পূর্ব্বে কানে কানে সেই নিরাশার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ইনি বিজ্ঞানে গ্রাজুয়েট হইলেও দর্শনশাস্ত্রকে বিশেষ আয়ত্ত করিয়াছেন। অধুনা ভারতের অতীত গৌরবের ধ্যানে মগ্ন; প্রাচীন ভারতের প্রকৃত ইতিহাস প্রণয়নের স্বপ্ন দেখিতেছেন। হিন্দু সভ্যতার বিশুদ্ধ আদর্শটিকে কোন প্রকারে খর্ব্ব করিতে সম্মত নহেন। শান্তস্বভাব সরলপ্রকৃতির লোক।

আর ছিলেন তদীয় বন্ধু পণ্ডিতজি। মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণ; এখন নাগপুরের প্রবাসী। স্মৃতি-শাসিত প্রচলিত হিন্দুত্বে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা। সংস্কৃতে গ্রাজুয়েট ও মীমাংসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ব্রাহ্মণ্যের

গর্ব্ব সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিতে তিনি ব্যস্ত। কোন কারণে কুত্রাপি তাহাকে সঙ্কুচিত করিতে চাহেন না। হিন্দুর আদর্শে ও হিন্দুর সভ্যতায় বিপুল বিশ্বাস। বিপক্ষের আক্রমণ হইতে ইহাদের রক্ষা করিতে তর্কচ্ছলে প্রায়ই উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন। স্বভাবতঃ অমায়িক ও বন্ধুবৎসল। বেশ বাঙ্গালা বলিতে পারেন।

তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন পাল্লু বাবু। তাঁহারই ছাঁচে গঠিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণযুবা। সুন্দর সুগঠিত দেহ মাথায় ঈষৎ শিখা।

ইঁহাদের অপর সঙ্গী সূর্য্য রাও। দেশ কাশীধাম; নাগপুরে থাকেন। তাঁহার গায়ে কোর্ত্তা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা; পায়ে খড়ম। পণ্ডিতজির আহ্নিকের উপাদানে পূর্ণ নাতি-বৃহৎ ঝোলা তাঁহার স্কন্ধে ঝুলিতেছে। অতি সজ্জন ও হাস্যরসিক ব্রাহ্মণ। হিন্দীতে কথা বলিতেছিলেন। হিন্দুস্থানী টিকেট কলেক্টর মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। তাঁহাকে বলিলেন—"আমরা যখন রাত্রে ফিরিব, তখনও তুমি থাকিও ও আমাদের টিকেট লইও।" তিনি উত্তর করিলেন—"আপনারা উত্তরে যাইতেছেন। রাত্রে হয়ত দক্ষিণ হইতে যে সকল গাড়ী আসিবে, তাহাতে আমার কাজ পড়িবে।" সূর্য্যরাও তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন —"আমরাও না হয় দক্ষিণ দিকের গাড়ীতেই আসিব।"

আর দুইজন যাঁহারা সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাদের বয়স অল্প। বিজয়কুমার কলেজের ছাত্র। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিখিতেছেন। তিনি বেশ কষ্টসহিষ্ণু। নীতিরঞ্জন দ্বাদশবর্ষীয় বুদ্ধিমান বালক।

২

আলাপ পরিচয়ে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল; কিন্তু এখনও ট্রেণ ছাড়িবার নামটি নাই। আমরা আসিবার প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে, সাড়ে ছয়টার সময়ে ট্রেণের বৃহৎ কলেবর ঈষৎ আন্দোলিত হইল। ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিল।

আমরা যে ট্রেনের আরোহী ছিলাম, রামটেকই তাহার শেষ গন্তব্যস্থান। কারণ একটি শাখা-লাইন রামটেক পর্য্যন্ত গিয়া শেষ হইয়াছে। প্রত্যেক গাড়ীর প্রান্তস্থিত দেওয়ালে খোলা জানালা আছে। এক গাড়ীর আরোহীগণ পশ্চাতের গাড়ীর আরোহী-দিগকে বেশ দেখিতে পায়। ট্রেণে উঠিয়াই পণ্ডিতজি ধীরে ধীরে তর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন। আমাদের তর্কনিনাদ ক্রমে ট্রেণের গম্ভীর নির্ঘোষকে বোধ হয় পরাস্ত করিল। আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিতেছিল; কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক এঞ্জিন তখনও সতেজে চলিতেছে; কণ্ঠযন্ত্রেরও বিরাম নাই। পাশের গাড়ীর লোকে সকৌতুকে আমাদের দেখিতেছিল।

বঙ্গদেশে তামাকটা যেমন সাধারণ নেশা, এখানে দেখিলাম সেইরূপ গঞ্জিকাদেবী হাতে হাতে মুখে মুখে ফিরিতেছেন।

নাগপুর হইতে উঠিয়া মেন লাইনে আমরা কাম্পটি পর্য্যন্ত আসিলাম। কাম্পটি ছাড়িয়া মেন লাইনে আরও প্রায় তিন মাইল আসিয়া শাখা লাইনে ট্রেন রামটেক আসে। কাম্পটির নিকটে সুপ্রশস্ত কান্‌হান্ নদীর উপরে সুন্দর পুল আছে। রেলওয়ে পুলের পার্শ্বেই পাবলিক

ওয়ার্কস্ বিভাগের দ্বারা নির্ম্মিত সুদৃঢ় লৌহ সেতু রহিয়াছে। তাহার উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবার ও গো যান প্রভৃতি চালাইবার রাস্তা আছে।

৩

বেলা আটটার পর রামটেক ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এখান হইতে রামটেক নগর ও পর্ব্বত প্রায় তিন মাইল হইবে। বেশ পাকা রাস্তা আছে; রাস্তার দুইধারে উচ্চ বৃক্ষশ্রেণী ও তাহার পরে হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্র। ষ্টেশন হইতে নগরে যাইবার জন্য গো-শকট ভাড়া পাওয়া যায়। শকটগুলি দিব্যদর্শন। ভূমি হইতে প্রায় এক হস্ত উচ্চে তাহার কাষ্ঠমঞ্চ স্থাপিত, এই মঞ্চ দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই হস্ত ও প্রস্থে পৌনে এক হস্ত; তাহার উপরে দেড় হস্ত ধূসরবর্ণ উচ্চ চটাচ্ছাদন। দুটি মাঝারি রকমের বলদ তাহাকে লইয়া ছুটিয়াছে। উক্ত মঞ্চের প্রান্তভাগে শকটচালক বিবিধ সুরতালসহযোগে তাহার স্বাভাবিক কর্ত্তব্য পালন করিতে করিতে চলিয়াছে। গাড়ী ছুটিতেছে; আর বিজ্ঞানের "শিরোহীন ভেকের" দেহ তাড়িৎ সঞ্চালনে যেরূপ কাঁপিয়া উঠে, আরোহী বেচারীদের শরীরও সেইরূপ গাড়ীর তালে তালে সবেগে নাচিয়া উঠিতেছে।

সুতরাং আমরা এই শকট-বিলাসের আশা ত্যাগ করিলাম। সকলে হাঁটিয়া রামটেক নগরের মধ্য দিয়া রামটেক পর্ব্বতের পাদমূলে গিয়া উপনীত হইলাম।

রামটেক বেশ বড় নগর। ইহা একটি তহশিল। অনেকটা বঙ্গের মহকুমার মত। এখানকার মিউনিসিপালিটি খুব পুরাতন। পথগুলি সুনির্ম্মিত ও সুরক্ষিত। পথের দুই পার্শ্বে কৃষক গৃহস্থের গৃহ দেখিতে পাইলাম। বেশ পরিষ্কার, মার্জ্জিত ও শুদ্ধ। বঙ্গের কৃষকপল্লীর ন্যায় অপরিষ্কার নহে। গৃহপ্রাঙ্গণেও সেরূপ গোময়স্তূপ দেখিতে পাইলাম না। বঙ্গদেশ শুঁৎসেঁতে বলিয়া বোধ হয় অতিরিক্ত লতাগুল্মে জঙ্গল হইয়া উঠে।

নগরের প্রান্তভাগে বসিয়া আমরা পর্ব্বতের শোভা দেখিতে লাগিলাম। গগনস্পর্শী তরুলতাচ্ছাদিত ভীমকায় পর্ব্বত শ্বেতবর্ণের মন্দিরগুলিকে শিরোমণি করিয়া সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে। শরৎকালের নির্ম্মল নীল আকাশে মেঘের লেশমাত্র নাই। প্রভাতসূর্য্যের কিরণে মন্দিরচূড়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সবুজবর্ণের পর্ব্বতগাত্রের উপরে শ্বেতকায় মন্দিরগুলি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। পর্ব্বত নিম্নে রামটেক নগরখানি দীর্ঘাকৃতি পিতার চরণসংলগ্ন ক্ষুদ্র শিশুর মত দেখাইতেছিল। মনে হইতেছিল যেন কত যুগ ধরিয়া এই পর্ব্বতের ছায়ায় নগরখানি আশ্রয় পাইয়াছে। নগরের শিশুগণ এই পর্ব্বতের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মানুষ হইয়া উঠিয়াছে; বিশালতাকে উপলব্ধি করিয়া উদার ও মহৎ হইয়া উঠিয়াছে।

নগরের পশ্চিমে ও পাহাড়ের ঠিক সম্মুখে আর একটি পাহাড়। ইহার বর্ণ ধূসর; আকৃতি উগ্র; তরুলতার সম্পর্ক নাই। সূর্য্যকিরণে ইহার শিলাময় গাত্র প্রচণ্ড রুক্ষভাব ধারণ করিয়াছিল। ইহার শিরোদেশে একটি মস্‌জিদ রহিয়াছে দেখিলাম। কেবল একটি মাত্র বৃক্ষ পশ্চাদ্দিক হইতে ইহাকে ছায়াদান করিতেছে ও হিন্দু মন্দিরের দৃষ্টি হইতে ইহাকে অন্তরাবৃত রাখিয়াছে।

৪

যাত্রার পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে রামটেক পর্ব্বতে উঠিবার জন্য সুপ্রশস্ত সিঁড়ি আছে। পর্ব্বতের নিম্নে আসিয়া সিঁড়ির কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। জিজ্ঞাসায় জানিলাম আমরা পশ্চাৎ দিকে আসিয়াছি। অপর দিকে সিঁড়ি আছে। সেখানে যাইতে হইলে পর্ব্বত ঘুরিয়া যাইতে হয় ও অনেক বিলম্ব হয়। যাহা হউক, পশ্চাৎ হইতে উঠিবার জন্যও অপ্রশস্ত পথ আছে। কিয়ৎ দূর উঠিয়া আমরা পথ ছাড়িয়া দিলাম ও পাহাড়ের গা দিয়া উঠিতে লাগিলাম। মধ্যে এক স্থলে দেখিলাম একটি মন্দির ও তাহার নীচে একটি পাথরে বাঁধান ক্ষুদ্র জলাশয়। ইহার জল কৃষ্ণবর্ণ। পাহু বাবু গত বৎসর একবার এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন এই জলে গন্ধকের গন্ধ স্পষ্ট অনুভূত হয়। আমরা কিন্তু পরীক্ষা করি নাই।

কিছুক্ষণ পাহাড়ে চড়িয়া আমরা আবার সেই পথ ধরিলাম। পথের দুই ধারে অনেক সীতাফল (আতা) দেখিলাম। বিজয় বাবু সোৎসাহে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু একটি ফলও পাকে নাই, পাকিবার বোধ হয় প্রয়োজনও ছিল না; একটু নরম হইলেই চলিত। কিন্তু সে আশাও মিটিল না।

আমরা এই ছায়াশীতল পথ দিয়া উঠিতে লাগিলাম। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলাম সুবিস্তীর্ণ উপত্যকা পশ্চিমে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। দূরে, তাহার প্রান্তদেশে, ধূসরবর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। তাহার উপরে এক স্থলে ধূম নির্গত হইতেছিল। নীতি কৌতূহলসহকারে জিজ্ঞাসা করিল —"ওটা কি আগ্নেয়গিরি?" চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিতজি সমস্বরে উত্তর করিলেন —"না, ম্যাংগানিসের খনি। প্রায় তিন মাইল দূরে।" শুনিলাম এখানে বহুপরিমাণে ম্যাংগানিস পাওয়া যায়। কয়েকটি খনি শ্রেণীর মূলধনে চলিতেছে।

পথের এক পার্শ্বে পর্ব্বতগাত্র ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে; অপর পার্শ্বে পর্ব্বত প্রাচীর গগনভেদ করিয়া উঠিয়াছে। যতই উঠিতে লাগিলাম উত্তরের উপত্যকা ভূমি ততই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। পথের দুই ধারে বিবিধ বর্ণের বনফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেখিলাম বানরকুল এই নির্জ্জন পর্ব্বতকাননে নিশ্চিন্ত ভাবে সংসার পাতিয়াছে।

কিছুদূর অগ্রসর হইতেই একটি লোক বলিল যে, ঐ পথ দিয়া ডাক বাঙ্গলায় যাইতে হয়; মন্দিরে যাইবার পথ ডান দিক দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। আমি এই প্রথম শুনিলাম যে এই পর্ব্বতের চূড়ায়, হিন্দুর সনাতন পবিত্র মন্দির শ্রেণীর অনতিদূরে ডাক বাঙ্গলার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কথাটা ভাল লাগিল না। এই পথ হইতে আমরা ডানদিকে একটি অপ্রশস্ত বৃক্ষসমাচ্ছাদিত পথে চলিতে লাগিলাম, ইহা এত অপ্রশস্ত যে দুইজন পাশাপাশি যাইতে পারে না। স্থানে স্থানে নীচু গাছের ডাল পথ পার হইয়া গিয়াছে; চলিবার সময় মাথা নত করিয়া যাইতে হয়।

৫

এই পথটি গিয়া পূর্ব্বোক্ত সোপানশ্রেণীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। এই মিলন-

স্থানে পাহাড়ের উপরে একটি পাথরে বাঁধান পুষ্করিণী আছে। তাহার চারিদিকে পাথরের প্রাচীর ও উত্তরদিকে ক্ষুদ্র ধর্ম্মশালা। জল দেখিলেই বুঝা যায় যে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। পুষ্করিণীতটে এক সুবৃহৎ বটবৃক্ষ। তাহার পাতা পচিয়া জলটি আরও খারাপ করিয়াছে। শুনা যায় এই পর্ব্বতের উপর বিষ্ণু নরসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়া এরূপ বেগে আপনার গদা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, তাহাতে পর্ব্বতগাত্রে এক বৃহৎ গহ্বরের সৃষ্টি হয়। তাহা হইতেই এই পুষ্করিণীর উৎপত্তি। নিকটেই দুইটি মন্দির; তাহাতে নরসিংহ অবতারের দুইটি বৃহৎ মূর্ত্তি আছে। রামগিরির অন্যতম নাম তপোগিরি; অপর নাম সিন্দূরগিরি। এই পর্ব্বতের প্রস্তর ভেদ করিলে ইহার অভ্যন্তর রক্তবর্ণ দেখায়। সূর্য্যের আলোকে এই বর্ণ বিশেষ ফুটিয়া উঠে। কথিত আছে হিরণ্যকশিপুর রক্তে পর্ব্বতের সমগ্র প্রস্তর লোহিত হইয়া গিয়াছে।

বটবৃক্ষের নিম্নে অনেক সাধু ধূনী জ্বালিয়া কৌপীন পরিয়া বসিয়া আছেন। আর দেখিলাম তাঁহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া অনেক মুসলমান ফকির রহিয়াছেন। তাঁহারাও মুক্তকণ্ঠে রামনাম বলিতেছেন। ইহার কারণ অচিরেই বোধগম্য হইল। কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই মন্দির দ্বারে এক মস্‌জিদ দেখা যায়। এই সকল ফকির তাহারই সম্পর্কে এ স্থানে বাস করেন। কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসীগণের সহিত তাঁহাদের অপূর্ব্ব সৌহার্দ্দ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আমি কলিকাতা হইতে আসিয়াছি। হিন্দু মুসলমানে প্রভেদনীতির চরম আস্ফোলন সহরে নিরন্তরই দেখিয়া থাকি। বঙ্গের গ্রাম্য জীবনে এ দৃশ্য বিরল না হইলেও আমার চক্ষে ইহা বিচিত্র বলিয়া বোধ হইল। ফকিরগণ একই নিশ্বাসে রাম ও রহিমের নাম গ্রহণ করিতেছেন। শুনিয়া আমার সেই গান মনে পড়িয়া গেল :—

রাম রহিমে না ছুদা কর ভাই,
দিল্‌কো সাচ্চা রাখ জি।"

বেলা অনেক হইয়াছিল; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত মাদাহারের কোন সম্ভাবনা দেখিতে-ছিলাম না। ইহাতে কাহার মন না উতলা হইয়া উঠে? শুনিলাম মারহাট্টাদের মধ্যে paying guest system প্রচলিত আছে; অর্থাৎ কোন সচ্ছল পরিবারে অতিথি গিয়া আশ্রয় লইলে, তাঁহার আহার্য্য মিলে, তিনি তৎপরে মূল্যাদি মিটাইয়া দেন। পণ্ডিতজি আহারের বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি সূর্য্যরাওকে রামটেক নগরের একজন বর্দ্ধিষ্ণু মালগুজারের (জমিদার) বাটী পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন যেন তিনজনের অন্ন ও চারি জনের "পুড়ী" (আটার লুচী) প্রস্তুত থাকে। সূর্য্যরাও সোপান শ্রেণী অবতরণ করিয়া মহা অন্বেষণে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আমার তৃষ্ণা তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; ক্ষুধাও যে হয় নাই, তাহা বলিতেছি না। তবে অদূর ভবিষ্যতে মালগুজার মহাশয়ের অতিথি-সৎকারের একটি মোহন চিত্র কল্পনায় আঁকিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা উভয়কেই সংযত করিলাম।

৬

ধীরে ধীরে মন্দির অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। কয়েকটি সোপান অতিক্রম করিতেই মন্দিরের বিশাল দুর্গপ্রাচীর দৃষ্টিগোচর হইল। শুনিলাম এই পর্ব্বত এক সময়ে পিণ্ডারী দস্যুযোদ্ধাগণের আবাসস্থল ছিল, ও মন্দিরটিকে তাহারা দুর্গরূপে ব্যবহার করিত। পর্ব্বতচূড়ার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক পরিখার ন্যায় খাড়া থাকায় প্রকৃতি স্বয়ং এই দুই দিক রক্ষা করিতেছেন। উত্তর দিকে দুই স্তর প্রাচীর। ভিতরের প্রাচীরটি মন্দিরসংলগ্ন। বাহিরের প্রাচীর মন্দিরের ঠিক নিম্ন দিয়া পশ্চিমে গিয়াছে; এবং অপর দিকে এক সঙ্কীর্ণ উপত্যকা পার হইয়া আম্বালা সরোবরের নিকটে গিয়া পৌঁছিয়াছে। পর্ব্বতের দক্ষিণ কিনারে রামটেক নগরকে সম্মুখে রাখিয়া এই প্রাচীর গিয়াছে। এখন ইহার ভগ্নাবশেষমাত্র বিদ্যমান। গাওলিগণ (Goalia) ইহার নির্ম্মাতা বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার মধ্যে এক সময়ে একখানি বৃহৎ গ্রাম ছিল; ভগ্নমন্দির ও গৃহাদি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রধান মন্দিরগুলি পর্ব্বতের পশ্চিমপ্রান্তে সর্ব্বোচ্চ শিখরে স্থাপিত। রামটেক নগর হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় পাঁচশত ফুট।

দুর্গপ্রাচীরের গাত্রলগ্ন একটি ক্ষুদ্র মস্‌জিদ দেখিলাম। একটি মুসলমান বালক রামদর্শনের পূর্ব্বে আমাদিগকে রহিম দর্শন করিয়া যাইতে আহ্বান করিল। কিন্তু আমরা তখন পথশ্রমে একান্ত কাতর; রাম রহিম কিছুই দেখিতে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম না। মন্দিরের একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইতে উপরে উঠিতেছিলাম। আরও কয়েকটি সোপান অতিক্রম করিয়া মন্দিরের প্রকাণ্ড প্রবেশদ্বারে উপনীত হইলাম। অপরাহ্নে আবার যখন এখানে আসিয়াছিলাম তখন এই দরজার ভিতরে একটি মুসলমান বালক বিড়ি তৈয়ার করিতেছিল, ও আর একটি ফকিরবেশী যুবক তাহার কাছে বসিয়াছিল। সে রহিমের নামে আমাদের কাছে সেলামী চাহিল। সূর্য্যরাও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রামকা রহিম কোন থে? অর্থাৎ রহিম রামের কে ছিলেন? ফকির প্রশ্ন বুঝিলেন না। বিড়িওয়ালা বুঝাইয়া দিল। তখন উত্তর হইল—"সব একই হ্যায়।" সূর্য্যরাও বলিলেন—"বস্, তব্ কেয়া?"

এই দরজার নাম বরাহ দরজা। ইহার নিকটেই একটি গোলাকার ঘরে প্রকাণ্ড রক্তবর্ণ এক বরাহমূর্ত্তি—দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় সমস্ত ঘরটি জুড়িয়া রহিয়াছে। ইহা বিষ্ণুর বরাহ অবতারের মূর্ত্তি। একটি গহ্বরের উপরে ইহা দাঁড়াইয়া আছে। যাত্রীরা বরাহের পেটের তলা দিয়া ইহার ভিতরে নামিয়া থাকেন। শুনিলাম যে সকল স্থূলকায় ব্যক্তি তাঁহাদের পরিধির আধিক্য-বশতঃ গুহার ভিতরে নামিতে অসমর্থ হন, তাঁহারা মহাপাপী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। এই অপবাদ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অনেক উচ্চোদর ভক্ত ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়া মধ্যপথে বিপদগ্রস্ত হন। তাঁহাদের বরবপুষ উত্তমার্দ্ধ বাহিরে, আর অধমার্দ্ধ ভিতরে, এইরূপে "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় থাকিতে হয়। এইরূপ বিষম দুর্দ্দশা দেখিয়াই বোধ হয় দুই লোকে "পাপী"

দুর্গামের সৃষ্টি করিয়াছে। যীশু বলিয়াছেন পাপীকে সহানুভূতি দেখাইবে। এরূপ অবস্থা দেখিলে কোন নিষ্ঠুরের প্রাণে না সহানুভূতির উদয় হয়?

আমরা মন্দিরাভিমুখে উঠিতে লাগিলাম। এখানে সিঁড়িগুলি খুব প্রশস্ত। দরজার ভিতরেও এখানে দেখিলাম আর একটি মস্‌জিদ। উত্তর দক্ষিণে প্রাচীরে বেষ্টিত এই স্থানটি বিশেষ প্রশস্ত নহে। ইহার দুই পার্শ্বে প্রাচীরগাত্রে কয়েকটি দরিদ্র পরিবারের আবাসকুটীর রহিয়াছে।

দ্বিতীয় দ্বারের নাম সিংহপুর দরজা। এই দরজা পার হইয়া দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে পড়িলাম। বহির্প্রাচীরের অপেক্ষা এই অংশটি অধিকতর পুরাতন। প্রাঙ্গণের প্রান্তে, তৃতীয় দরজার সম্মুখে দুই দিকে দুটি কামান পাতা রহিয়াছে। এই তৃতীয় দরজার নাম ভৈরব দরজা। মারহাট্টাগণ ইহার সংস্কার করিয়াছিলেন; এবং ইহা এখনও বেশ ঝলিকেরানো ও নূতনের মত দেখাইতেছিল। এই প্রাচীরের উপরিভাগ (battlement) কতকটা প্রাচীন পাশ্চাত্য দুর্গসমূহের প্রাচীরের মত। পণ্ডিতজি বলিলেন ইহা Saracen স্থাপত্যপ্রণালী অনুযায়ী গঠিত। কারণ বহু পুরাকালে এই মন্দির হিন্দুদের দ্বারা নির্ম্মিত ও তাঁহাদের অধীন হইলেও, ইহা পরে মুসলমানদিগের করতলগত হয়। শিবাজির পরে আবার মারহাট্টাদিগের হাতে ফিরিয়া আসে। এখানে মারহাট্টাদের একটি অস্ত্রশালা স্থাপিত ছিল। ইহার দরজা দুটি কাঠের ও তাহাতে বড় বড় ছুঁচালো পেরেক বসানো।

দরজা পার হইয়া ভিতরে গিয়া দেখি যে প্রাচীরের দুইপ্রান্তে, পাহাড়ের ঠিক ধারের উপর, দুইটি মাতিপ্রশস্ত দাঁড়াইবার স্থান (platform) আছে। যেটি দক্ষিণ দিকে সেটি একটি গোল ঘরের মত; ছোট ছোট জানালা দেওয়া। উত্তরের স্থানটির উপরে ছাদ নাই। দুইদিকে উঠিবার জন্য প্রাচীরগাত্র দিয়া দুটি খুব সঙ্কীর্ণ সোপানশ্রেণী আছে। আমরা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম।

দক্ষিণের ঘরের জানালা দিয়া নীচে চাহিয়া দেখিলাম রামটেক নগরখানি আমাদের ঠিক নীচেই খেলাঘরের মত ছোট দেখাইতেছে। ছোট ছোট ঘর, ছোট ছোট রাস্তা, তাহার উপর দিয়া পুতুলের মত লোক যাতায়াত করিতেছে। Gulliver's Travels এ বর্ণিত Liliput রাজ্যের একটা ধারণা জন্মিল। বন্ধু চিত্তরঞ্জন বলিলেন—"এখান হইতে দেখিলে, নীচের ছোট বড় সব এক হইয়া যায়। কার্লাইল তাই বলিতেন যে "পাহাড়ে উঠিয়া দেখ, সকলকে সমান দেখাইবে।" আমার তখন মনে হইল যে ঋষি টয়ফেল্‌স্‌ড্রক (Teufelsdroch) এই জন্যই ওয়েস্‌নিক্‌টো (Weesnichto) নগরের সর্ব্বোচ্চ গৃহে বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার নিকট উচ্চ নীচ বলিয়া কোন পার্থিব প্রভেদ ছিল না, এবং তাঁহার নিম্নে, নরলোকের সকলকে তিনি সমচক্ষে দেখিতে পারিতেন।

এই স্থান হইতে প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। নিকটস্থ আর একটি পর্ব্বত লতাগুল্মে ফলের আচ্ছাদিত করিয়া প্রভাতসূর্য্যের আলোকে উজ্জ্বল হইয়াছিল।

আমরা জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া এই সকল দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। এই ঘরে দুই তিনটি অতি বৃহৎ ঢাক রহিয়াছে। মন্দিরে আরতির সময়ে বাজান হয়।

এই ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রাচীর সংলগ্ন অপ্রশস্ত বারান্দা দিয়া উত্তরের মুখে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা কখনও ভুলিবার নহে। রামটেক পর্ব্বত ঢালু হইয়া নীচে নামিয়া গিয়াছে। তাহার পরে একটি গভীর খাদ। এই খাদের পরেই একটি অনুচ্চ পাহাড়। পাহাড়ের উপর সবুজবর্ণ গাছে ঢাকা কৃষকদের কুটীর, ও নিকটেই হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্র। এই পাহাড়ের পরেই সুবিস্তীর্ণ উপত্যকাভূমি উত্তরে ও পশ্চিমে বহুদূর প্রসারিত হইয়া অস্পষ্ট গিরিশ্রেণীর চরণমূলে গিয়া মিলিত হইয়াছে। পূর্ব্বে গিরিমালা অপেক্ষাকৃত নিকটে স্থাপিত। তথা হইতে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে জল আনিয়া পূর্ত্ত-বিভাগ চাষের সুবিধার জন্য এই উপত্যকাকে উর্ব্বর করিতেছেন। সেই জলরাশি রামটেক পর্ব্বতের নিম্নে অনতিদূরে এক বিশাল হ্রদের ন্যায় দেখাইতেছিল।

এই প্রাচীরের নিকটে দাঁড়াইয়া সম্মুখে মন্দিরগুলি দেখা যায়। পশ্চিমে কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া আর একটি দরজা পার হইলেই মন্দিরপ্রাঙ্গণ। ইহার নাম গোকুল দরজা। ইহার গঠনপ্রণালী দেখিয়া পণ্ডিতজি বলিলেন যে ইহা ভৈরবীচক্র। তখন তিনি সুর করিয়া এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন :—

"প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ দ্বিজোত্তমাঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্॥"

অর্থাৎ ভৈরবীচক্রে প্রবেশ করিলে বর্ণভেদ লুপ্ত হয় ও সকল বর্ণ দ্বিজরূপে গণ্য হয়। ভৈরবী চক্রের বাহিরে আসিলে তাহারা বিভিন্ন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। শুনিয়া আমার মনে হইল যে শুধু মানব নির্ম্মিত এই মন্দির কেন, সমস্ত বিশ্বজগৎকেই বিধাতা এক বিশাল ভৈরবীচক্ররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই তৃতীয় প্রাঙ্গণে মন্দিরের কার্য্যে নিযুক্ত দাস দাসীদের বাসভবন রহিয়াছে। শুনিলাম দেড়শতের অধিক দাস দাসী আছে।

৭

বেলা অনেক হইয়াছিল। ক্ষুধা তৃষ্ণায় সকলেই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। মন্দিরে প্রবেশ করিবার সংকল্প ত্যাগ করিয়া তখন প্রত্যাবর্ত্তন করা গেল। বহির্দ্বার পার হইয়া মন্দিরের ঠিক বাহিরে আসিয়াছি, এমন সময়ে দার্শনিক চিত্তরঞ্জন তাঁহার গাত্রবস্ত্রের খোঁজ করিলেন। বলা বাহুল্য দলের কেহই তাহার কোন সন্ধান বলিতে পারিলেন না। সাব্যস্ত হইল যে মন্দিরের নিকটে সেই গোল ঘরে প্রকৃতিশোভায় নিমগ্ন হইয়া বন্ধু যখন উচ্চ পাহাড়ের দার্শনিকতা আলোচনা করিতে-ছিলেন, তখন তাঁহার অজ্ঞাতসারে বস্ত্রখানি তাঁহার স্কন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছে। পণ্ডিতজি, পাহুবাবু ও চিত্তরঞ্জন আবার অন্বেষণে ফিরিয়া গেলেন; আমরা তিনজনে মসজিদের ছায়ায় মস্তক রক্ষা করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। আমাদের সম্মুখেই একখানি মিঠাইয়ের দোকান ছিল। একখানি মাঝারি রকমের খোলার ঘর, কিন্তু তাহাতে অধিবাসী অনেক। দোকানী, তাহার স্ত্রী, তাহাদের সন্তান; একটি মহিষী, তাহার সন্তান ও

তাহাদের খাদ্যাধার; এবং মানবের খাদ্যরূপে প্রসিদ্ধ পেঁড়নিামধারী কোন বস্তু, ও তাহাদের আধার কয়েকটি বাক্স পেঁড়া। দেখিলাম একটি গাড়ী আসিয়া নিঃসঙ্কোচে জিহ্বা-সংযোগে পেঁড়ার আস্বাদন লইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বন্ধুরা যখন গাত্রবস্ত্র লইয়া ফিরিয়া আসিলেন ও আমাদিগকে ঐ পেঁড়া খাইতে অনুরোধ করিলেন, তখন মনে হইল যে কিয়ৎপূর্ব্বেই আর একটি প্রাণী আসিয়া ঐ পেঁড়ার রস গ্রহণ করিয়া গিয়াছে, এবং যেহেতু আপনার সহিত উক্ত প্রাণীর প্রভেদ আছে বলিয়া স্পর্দ্ধা রাখি, সেহেতু ঐ প্রস্তাবে আমি কিছুতেই সম্মত হইতে পারিলাম না।

দেখিলাম আমাদের ঠিক সম্মুখে পাহাড়ের উপর গাছপালার মধ্য দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। এই পথে ঘৃষ্ণেশ্বর মহাদেবের মন্দির। কথিত আছে যে রামায়ণপ্রসিদ্ধ শূদ্র শম্বুক এই স্থানেই তপস্যা করিতেন। শূদ্রের তপস্যার ফলে একটি ব্রাহ্মণসন্তান হত হইলে যখন রামচন্দ্র আসিয়া শম্বুকের শিরশ্ছেদন করেন, তখন শম্বুক এই সম্মানে প্রীত হইয়া প্রার্থনা করেন যেন রামচন্দ্র চিরদিন এই পর্ব্বতে অবস্থান করেন; এবং শম্বুক নিজেও যেন এখানে পূজিত হন। তখন রাম এই পর্ব্বতে বাস করিতে আরম্ভ করেন ও শম্বুকও একটি শিবলিঙ্গে পরিণত হন। এই শিবলিঙ্গের উপরেই ঘৃষ্ণেশ্বরের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। শুনা যায় রামচন্দ্র যে শম্বুকের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন, ও এই মন্দিরে বসবাস করিতেছেন, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ তিনি মাঝে মাঝে আলোকশিখার আকার ধারণ করিয়া মন্দিরচূড়ার ত্রিশূলের কাছে ঘুরিয়া বেড়ান। সেই হইলে এই ব্যাপার দেখা যায় বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে উহা তাড়িতক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই মন্দিরে একটি সাধু বাস করেন। তিনি নাকি সকল প্রকার ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারেন। ইনি স্পর্শমণির সন্ধান ঠিক কোথায় পাইলেন বলিতে পারি না; তবে ইঁহার নাম ফক্কড়নাথ। নাম শুনিয়া মনে হইল ইঁহার অসাধ্য কিছুই নাই।

৮

এইবার আমরা সোপানশ্রেণী ধরিয়া আধালা সরোবরের দিকে নামিতে লাগিলাম। অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলাম; মনে হইতেছিল সোপানশ্রেণীর বুঝি আর শেষ নাই। আমরা সরোবরে চলিয়াছি এই চিন্তা যেন তৃষ্ণা আরও বাড়াইয়া দিতেছিল। সোপানশ্রেণী অবতরণ করিয়া কিছুদূর গিয়া দেখিলাম কয়েকখানি কুটীর রহিয়াছে। কয়েকটি সাধু একখানি ক্ষুদ্র আশ্রম করিয়া এখানে বাস করিতেছেন। আশ্রমপ্রাঙ্গণে একটি ইঁদারা ছিল। তাহার শীতল জলে তৃষ্ণা দূর করিয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আধালা সরোবরের তীরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

ভাবিয়াছিলাম সরোবরে স্নান করিয়া অবিলম্বে মালগুজার মহাশয়ের আতিথ্যগ্রহণ করিব। দেখিলাম সূর্য্যরাও স্নান সমাপন করিয়া জলে দাঁড়াইয়া আহ্নিক করিতেছেন। তাঁহাকে স্নান করিতে দেখিয়া আশা হইল; ভাবিলাম ইহা আহারের পূর্ব্বাভাষ। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই শুনিলাম যে আহারের কোন আয়োজনই হয় নাই। সূর্য্যরাও মালগুজারের

বাটীতে সংবাদ লইয়াছিলেন; কিন্তু তখন তাঁহাদের আহারাদি সমাপ্ত হইয়াছে। তখন শুনিলাম আহার সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই অতিথির উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। ইহা মারহাট্টাদিগের রীতির শেষাংশ। এইরূপে কল্পনার রাজ্য ফুৎকারে উড়িয়া গেল। তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব না। সহৃদয় পাঠক নিজেই বুঝিয়া লউন।

যাহা হউক, পণ্ডিতজি উদ্ধার করিলেন। তিনি স্বয়ং তখন রন্ধনে মনোযোগ দিলেন। তৎক্ষণাৎ সূর্য্যরাওএর সহিত সমস্ত আয়োজন আরম্ভ করিলেন। বন্ধুগণ সকলে মিলিয়া কাজ ভাগ করিয়া লইলেন। আমিও স্নানাদি সারিয়া প্রস্তুত হইলাম, এবং দূরে শয্যা পাতিয়া শুইয়া নির্লিপ্তভাবে রন্ধন কার্য্য দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

বন্ধু চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন—"আপনি নিদ্রা যান। উঠিয়াই দেখিবেন যে আহার প্রস্তুত।" উঠিয়া দেখিলাম যে ভাত ফুটিতেছে, এবং ভবিষ্যতেও ফুটিতে থাকিবে। ডাল মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছে। সূর্য্য রাও উনানে ফুঁ দিতে দিতে চক্ষু লাল করিয়া তুলিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন বলিলেন—"এরই মধ্যে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল? দশ মিনিটও হয় নাই।" পরে শুনিলাম যে প্রায় এক ঘণ্টা ঘুমাইয়াছিলাম। এক ঘণ্টা সময় কাটিয়া গিয়াছে শুনিলে পাছে আমার ক্ষুধা বাড়িয়া যায়, তাই তিনি মনস্তত্ত্বের (Psychology) আশ্রয় গ্রহণ করিয়া- ছিলেন। দেখিলাম তিনিও এ রত্ন চিনিয়াছেন। উপায়টি বিজ্ঞানসম্মত হইলেও আমার ক্ষুধা তাহাতে সান্ত্বনা মানিল না।

আমরা সুবিস্তীর্ণ আষাঢ়া সরোবরের তীরে এক বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে আশ্রয় লইয়াছিলাম। সরোবরের দক্ষিণ তীরে একটি পাকা রাস্তা এক বিশাল বনরাজিশোভিত পর্ব্বত ঘুরিয়া রামটেক ষ্টেশনের রাস্তায় গিয়া মিলিয়াছে। মন্দিরের যাত্রীগণ গো-শকটে এই পথে আসিয়া সিঁড়ি দিয়া মন্দিরে উঠে। এই রাস্তার ধারে, সরোবরের নিকটে দুই একটি মুদীর দোকান আছে। ইহাদেরই একজন আমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিল; এমন কি রন্ধনের বাসন পর্য্যন্ত দিল। নিদ্রাভঙ্গে যখন দেখিলাম যে কেবল ভাত ডালের বন্দোবস্ত হইয়াছে, এবং শুনিলাম যে কোন তরকারী পাওয়া গেল না, তখন আমি সশব্যস্তে মুদীর শরণাপন্ন হইলাম। লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষের প্রতি প্রসন্ন হন। মুদীর নিকট কুমড়া ও নারিকেল পাওয়া গেল। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ বিজয়বাবু বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেগুলি কুটিয়া ফেলিলেন।

ভাত ডাল প্রস্তুত হইতেছিল। তাহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলাম। পণ্ডিতজি স্নান করিয়া আহ্নিক সমাপ্ত করিলেন ও গীতাপাঠে নিযুক্ত হইলেন। একাদশ সর্গের বিশ্বরূপ বর্ণনা সুর করিয়া পাঠ করিলেন। সকলে মিলিয়া শুনিলাম। আহ্নিকান্তে তিনি কয়েকটি রসগোল্লা উৎসর্গ করিয়া আমাদিগকে বিতরণ করিলেন। সেই সুদূর মধ্যপ্রদেশে এই বাঙ্গালার আদরের ধনকে সাগ্রহে গ্রহণ করিলাম।

ডাল নামিলে দেখিলাম যে যাহা প্রকৃত ডাল তাহা বন্যার ডুবিয়া আছে। গল্পে শুনিয়াছিলাম যে বিলাতে কোন হোটেলে

একবার একটি ভদ্রলোক অতিথি হন। তাঁহাকে মাছের ঝোল আনিয়া দিলে, তিনি দেখিলেন যে পাত্রের মধ্যস্থলে ঝোলে পরিবেষ্টিত হইয়া একখণ্ডমাত্র মাংস রহিয়াছে। দেখিয়াই তিনি ব্যস্তভাবে কোট প্রভৃতি খুলিতে লাগিলেন। হোটেলকর্ত্রী পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি মশায়! ব্যাপার কি?" ভদ্রলোক বলিলেন—"ঐ মাংসখণ্ড লইতেই হইবে। ঝোলে সাঁতার দিয়া মাঝখানে গিয়া উহাকে ধরিব।" আমারও ভাল দেখিয়া মনে হইল যে ডুবারী ডাকিয়া সেই রত্ন উদ্ধার করিতে হইবে। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিলাম সূর্য্যরাও সের তিনেক জল ফেলিয়া দিতেই কাঞ্চনবর্ণের ভাল মাংসখণ্ড প্রকাশ পাইল।

বেলা চারটার সময় আহারে বসিলাম। সমস্তই পরম উপাদেয় বলিয়া বোধ হইল। সূর্য্যরাও রন্ধন করিয়াছিলেন; তাঁহাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম। পণ্ডিত জি তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন; তাঁহাকেও বিশেষ ধন্যবাদ জানাইলাম। নীতি অতি সুন্দর দধি আনিয়াছিল। তিনি সংযোগে অন্ন মধুরে সমাপ্ত করা গেল।

হাত ধুইবার জন্য আমরা সরোবরে গিয়া দেখি ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ পাথর বাঁধান ঘাটের কাছে খেলা করিতেছে। বিনয় ছোলাভাজা ফেলিয়া দিল। বড় বড় রোহিত মৎস্য আসিয়া খাইতে লাগিল। মনে হইল, হাত দিয়া ধরা যায়। শুনিলাম এ মাছ কেহ ধরে না; তাহার কারণ মারহাট্টারা নিরামিষভোজী। পাছে বাবু মৎস্য ধরিবার লোক সমবরণ করিতে অক্ষম হইয়া আমার সাহায্য চাহিলেন। একখানি তোয়ালে লইয়া দুই জনে দুই কোণ ধরিয়া তুলিতেই একটি মাছ ডাঙ্গায় গিয়া লাফাইতে লাগিল। একটি মারহাট্টা ভদ্রলোক কাতরভাবে বলিলেন —"আহা কেন মাছটাকে মারেন? জলে ছেড়ে দিন্।" কিন্তু আমাদের দুজনেরই সহসা তখন ভয় হইল পাছে মাছটির গায়ে হাত দিলে কামড়াইয়া দেয় বা ডানা ফুটাইয়া দেয়। আমরা ভয়ে একেবারে অবশাঙ্গ, অগ্রসর হইতেই পারিলাম না। তখন মারহাট্টা মহাশয় স্বয়ং মাছটিকে উদ্ধার করিলেন।

ইতিমধ্যে এক কনষ্টেবল আসিয়া আমাদের নাম ধাম লিখিয়া লইয়া গেলেন। একটি নিরীহ সাধু আহারে বসিয়াছিলেন। তাঁহাকেও খাতায় গিয়া নাম লিখাইয়া আসিতে বলিলেন। শুনিলাম সকল সাধুর পক্ষেই এই নিয়ম হইয়াছে।

৯

তখন বেলা পড়িয়া আসিতেছে। আমরা পাহাড়ের উপর হইতে সূর্য্যাস্ত দেখিবার আশায় তাড়াতাড়ি পশ্চিমে সোপান শ্রেণীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমাদের বামে সেই অত্যুচ্চ পর্ব্বতটি দাঁড়াইয়া আছে। নিবিড় বন তাহার গাত্র সবুজ বর্ণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এমন বৃক্ষলতাচ্ছন্ন পর্ব্বত সেখানে আর অল্পই দেখিলাম। টেনিসনের Enoch Arden এর সেই লাইনটি মনে পড়িয়া গেল:—

"The mountain wooded to the peak, * *"

পর্ব্বত পথে চলিতে চলিতে বেলা পড়িয়া আসিল। দেখিলাম সেই পথ হইতে আরও কয়েকটি সঙ্কীর্ণ পথ বাহির হইয়া পর্ব্বত-মালার পাদদেশ দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। চারিদিক তখন নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে। আমরা আপনাদের পদশব্দে আপনারাই চমকিয়া উঠিতেছিলাম। মনে হইতেছিল আমরা জনতার জীব বুঝি এই নির্জ্জনতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতেছি না। বুঝি আমাদের সহাস্য চীৎকারে শুপ্তা বনদেবীর নিদ্রাভঙ্গ হইবে। জানি না কেন আপনা হইতেই আমাদের বাক্যালাপ থামিয়া গেল। সেই শান্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে দূরে কোন বৃক্ষ শাখায় বসিয়া একটি ঘুঘু করুণস্বরে ডাকিয়া ডাকিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। পর্ব্বত-গাত্রে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছিল। আমরা নীরবে চলিতে চলিতে তাহাই শুনিতে লাগিলাম।

পর্ব্বতমালার সানুদেশে ভ্রাম্যমান ঘনরাজি; শিখরদেশে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিধারা। উভয়ের সংমিশ্রণে এক ছায়া-লোকময় স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রকৃতির লীলা-নিকেতন এই শান্তি-স্বর্গ হইতে কলকোলাহলময় লোকালয়ে আর যেন ফিরিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। পশ্চাতে ফিরিয়া ফিরিয়া বনভূমির সেই স্নিগ্ধশ্যাম শোভা উপভোগ করিতে লাগিলাম।

প্রশস্ত সোপানশ্রেণী দিয়া আবার উপরে উঠিতে লাগিলাম। অতি সুন্দর, সুনির্ম্মিত, অক্ষুণ্ণ সোপানাবলী। দুই পার্শ্বে সুরক্ষিত। শুনা যায় পুরাকালে অম্বা নামে এক কুষ্ঠগ্রস্ত, সূর্য্যবংশীয় রাজপুত নরপতি মৃগয়ার জন্য এই স্থানে আসিয়াছিলেন। তিনি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া এক গিরিনির্ঝরে জলপান করিতে আসিয়া তাহাতে হস্তপদ প্রক্ষালণ করেন। তৎক্ষণাৎ তিনি দেখিলেন যে তাঁহার শরীরের যে যে অংশ ঐ জলস্পর্শ করিয়াছে, তথা হইতেই কুষ্ঠ ব্যাধির সকল চিহ্ন লুপ্ত হইয়াছে। তিনি তখন সেই নির্ঝর খনন করিয়া আম্বালা সরোবরের সৃষ্টি করেন। আর অমনি পাতাল হইতে ভোগবতী উত্থিত হইয়া সরোবরকে জলপূর্ণ করেন। এই কারণে মৃত ব্যক্তি গঙ্গালাভ করিবে এই আশায় নাকি ইহাতে তাহার অস্থি ফেলিয়া দেওয়া হয়। রাজা অম্বা এই সোপানশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

উঠিতে উঠিতে এক স্থলে দেখিলাম একটি সোপানের প্রান্তে এক অপরিসর প্রকোষ্ঠে একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে। উহা পুরাতন ভারতীয় ভাস্কর্য্য প্রণালী অনুসারে গঠিত। একটি মূর্ত্তি মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে; এবং তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি স্ত্রীমূর্ত্তি তাহার হাতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের প্রতি উন্মুখ হইয়া চাহিয়া আছে। এই স্ত্রীমূর্ত্তি দুটির মুখে স্নেহ, নির্ভরতা, আগ্রহ ও ব্যাকুলতা অতি স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাদিগকে এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। মূর্ত্তিগুলি যেন সজীব। স্ত্রীমূর্ত্তির ভাব দেখিয়া বোধ হইল এখনই যেন মুখ ফুটিয়া কথা কহিবে। চিত্তরঞ্জন প্রাচীন ভারতীয় কলা বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধক। তিনি শিল্প-কলায় ডাক্তার কুমারস্বামীর পরম ভক্ত।

তিনি মুগ্ধনেত্রে এই মূর্ত্তিগুলি দেখিতে লাগিলেন। বাস্তবিক সজীব ও নির্জীব প্রতিমায় কি প্রভেদ, প্রকৃত কলানৈপুণ্য ও শিল্প চাতুর্য্য কাহাকে বলে, তাহা এই মূর্ত্তি দেখিলে স্পষ্টই বোধগম্য হয়।

সোপানশ্রেণীর মধ্যপথে বিশ্রামের জন্য একটু বসিয়া আবার উঠিতে লাগিলাম। নীতিসিঁড়ি গুনিবার ভার লইয়াছিল। আমরা যখন মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়া পৌঁছিলাম, তখন সে বলিল যে আমরা সর্ব্বসমেত সাড়ে ছয় শত সিঁড়ি উঠিয়া আসিয়াছি।

১০

ছুতা খুলিয়া গোকুল দরজা পার হইয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। দরজার দেউড়িতে ঢাল তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র সজ্জিত রহিয়াছে। প্রথমেই লক্ষ্মণের মন্দির। ইহার সম্মুখভাগে, ইহার গাত্রসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র বারান্দা। আটটি বৃহৎ থামের উপর তাহার ছাদ রহিয়াছে। বারান্দার পরে একটি ক্ষুদ্র দালান। সেখানে তখন ঈষৎ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তর অতি সঙ্কীর্ণ। তাহার ভিতর প্রদীপ জ্বলিতেছিল। কৃষ্ণবর্ণের নাতিবৃহৎ মূর্ত্তি সিংহাসনের উপর স্থাপিত। শুনা যায় আদি মূর্ত্তিগুলি মুসলমানগণ ভাঙ্গিয়া দিলে দুখানা সংবোধন হইতে বর্ত্তমান মূর্ত্তিগুলি উদ্ধার করা হয়। মন্দিরদ্বারের চৌকাঠের বাহিরের দিক পিতলে বাঁধান; ভিতরদিক রূপার। মূর্ত্তির সমক্ষে বারান্দায় দাঁড়াইয়া দুইটি নর্ত্তকী বন্দনা গাহিতেছিল; পার্শ্বে একটি লোক দাঁড়াইয়া বেহালা বাজাইতেছিল। এ স্থানে এ ব্যাপার প্রত্যাশা করি নাই। এই সনাতন দেবালয়ে দেবমূর্ত্তির সম্মুখে নর্ত্তকী ভিন্ন কি বন্দনা গাহিবার লোক ছিল না? শুনিলাম ইহারা মাসিক বেতন পাইয়া থাকে। মাসে চারি দিন এই নর্ত্তকীর নৃত্যগীত হয়। আমরা অবিলম্বে এই মন্দির ত্যাগ করিয়া তাহার ঠিক পশ্চাতে রামের মন্দিরে * গেলাম।

এই মন্দিরটিও পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুযায়ী গঠিত। তবে ইহার দালানটি আরও প্রশস্ত। দেখিলাম অষ্ট্রিয়ার প্রস্তুত ডিট্‌মারের ল্যাম্প এখানেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই মন্দিরের দালানে একটি প্রকৃত ভক্তির দৃশ্য দেখিলাম। কয়েকজন লোক, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ—একটি প্রৌঢ় ব্যক্তিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এবং সকলে মিলিয়া খোল, করতাল ও অন্যান্য যন্ত্রসংযোগে ভজন গাহিতেছেন। সন্ধ্যার প্রাকালে সেই মৃদু-গম্ভীর সঙ্গীতধ্বনি মন্দিরপ্রাঙ্গণ প্লাবিত করিতেছিল।

---

* প্রতি বৎসর কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে আরম্ভ হইয়া পনর দিন ধরিয়া রামটেকে একটী বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। মেলার প্রথম দিনে রামের মন্দিরের চূড়ায় "পীতাম্বর" নামে এক খণ্ড পীতবর্ণ রেশমের বস্ত্র পোড়ান হয়। শিব ত্রিপুরাসুরকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। তাহারই স্মরণ চিহ্নস্বরূপ এই ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

নাগপুর অঞ্চলে রামটেক মন্দির সুপ্রসিদ্ধ। সেইজন্য মেলায় প্রায় ষাট সত্তর হাজার লোক সমবেত হইয়া থাকে। লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী ক্রয়বিক্রয় হয়; এবং মন্দিরেও প্রায় দুই সহস্র মুদ্রা আয় হইয়া থাকে। এ বৎসরও মেলার জন্য রেল কোম্পানী বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; এবং মেলের উচ্চতন ইংরাজ কর্ম্মচারীরা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

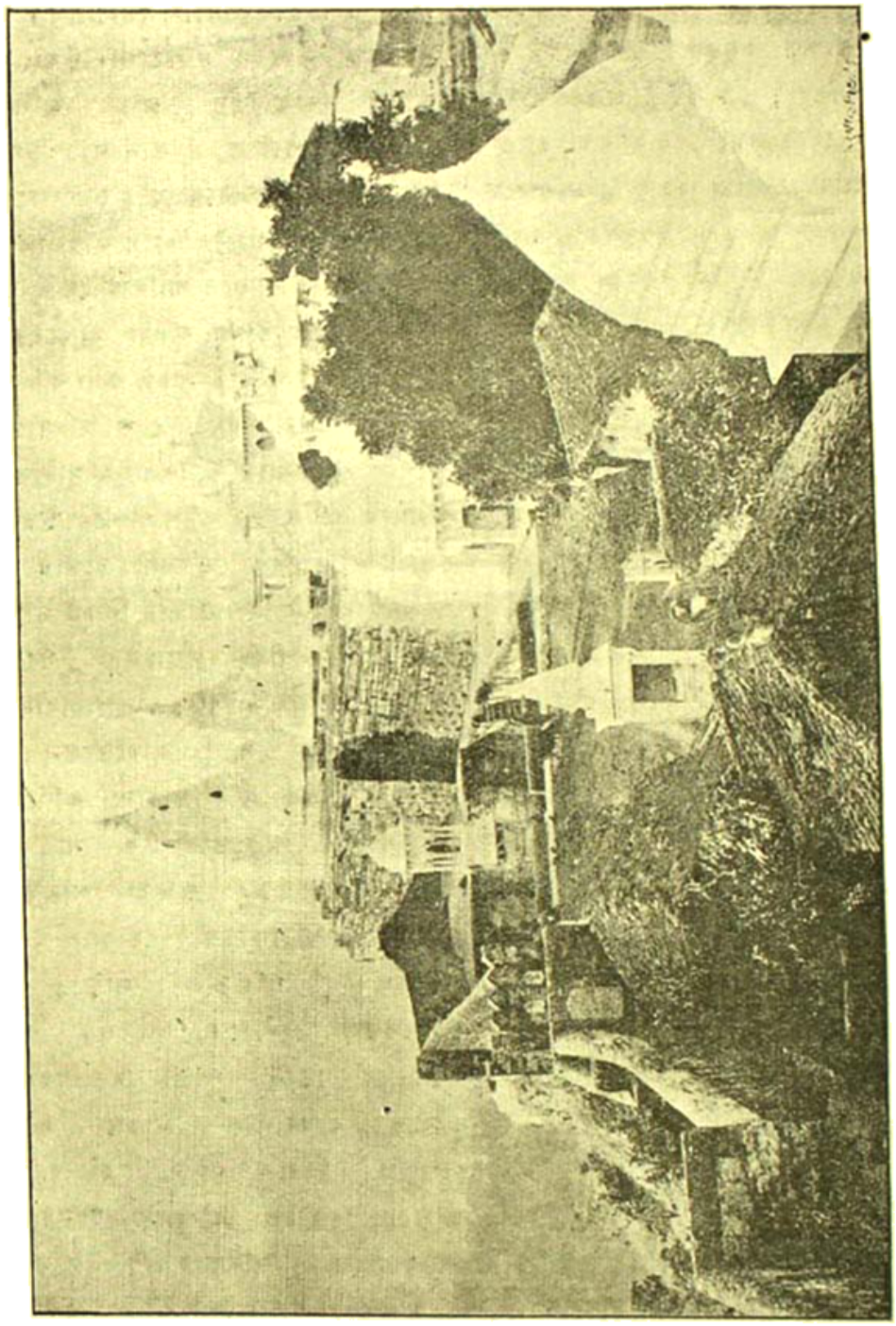

প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে এই দুইটি মন্দির। ইহাদের পশ্চিমে ও দক্ষিণে, শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরে রাধা কৃষ্ণ প্রভৃতি বহু দেবদেবীর মূর্তি আছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত দেখিয়া, প্রাঙ্গণের পশ্চিম সীমার কয়েকটি ক্ষুদ্র সিঁড়ি বাহিয়া, অনুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত একটি

মঞ্চে গিয়া বসিলাম। প্রাচীরের পশ্চিমে পর্ব্বতটি আরও অল্প কিছুদূর বিস্তৃত ছিল। সে স্থানটি প্রায় সমতল; এক সময়ে প্রস্তরে বাঁধান ছিল। এখন তাহার ভগ্নাবশেষ মাত্র রহিয়াছে।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে সূর্য্যদেব অস্তাচলগত। সম্মুখের একটী পর্ব্বতের অন্তরালে তিনি কলেবর লুক্কায়িত করিয়াছেন। আকাশের কোণে পীত, লোহিত, নীল, বেগুনী প্রভৃতি সপ্তবর্ণ স্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে। আর পর্ব্বতশিখর উদ্ভাসিত করিয়া, মন্দির-চূড়া অনুরঞ্জিত করিয়া, সপ্তবর্ণে বিমণ্ডিত সুদীর্ঘ কিরণরেখা পশ্চিম হইতে আকাশের শিরোদেশে উঠিয়া অর্দ্ধগগন শোভিত করিয়াছে। মনে হইল দূরে, অনন্তলোকে, বিশ্বনিয়ন্তার চরণসমীপে, সুমহান্ জ্যোতিঃ সমুদ্র পরম পুলকে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই এই মহা মুহূর্ত্তে, দিবসরজনীর মিলন সময়ে, ধরণী যখন দিবসের কর্ম্ম সারিয়া, শুচি হইয়া বিধাতার চরণ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন সেই আলোকসাগরের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গরাশি তাহার মস্তকোপরি আশীর্ব্বাদধারা বর্ষণ করিতেছে।

ঊর্দ্ধে অনন্তের এই মনোমোহন চিত্র, গগনব্যাপী মহালীলা। নিম্নে তিমিরময়ী উপত্যকাভূমির অসীম প্রসার। দূরে, বহুদূরে, অস্পষ্ট পর্ব্বতশ্রেণী প্রকৃতিদেবীর ভীমকায় প্রহরীর ন্যায় নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। স্থানে স্থানে বৃক্ষলতার একত্র সমাবেশে উপত্যকাবক্ষে কুঞ্জ কাননের সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে পুঞ্জীভূত অন্ধকারে যবনিকা গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। সেই সুবিপুল সন্ধ্যান্ধকারে বিশ্ব চরাচর ডুবিয়া গিয়াছিল। কেবল রামটেক নগরের দীপমালা কৃষ্ণ পটভূমির উপরে খদ্যোতের ন্যায় জ্বলিতেছিল। আকাশে, পর্ব্বতে, কাননে, উপত্যকায়, সন্ধ্যাদেবীর সেই শান্তগম্ভীর চরণক্ষেপের মধ্যে আমরা মন্দির প্রাচীর ত্যাগ করিলাম।

মন্দিরের বাহিরে আসিয়া দেখি যে শান্ বাঁধান চত্বরের উপর বসিয়া মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা মহাশয় কাহার সহিত কথা কহিতেছেন। তাঁহার প্রৌঢ় বয়স; বেশ জমিদারের মত সুগোল মসৃণ আকৃতি, শিখাযুক্ত মুণ্ডিত মস্তক। শুনিলাম এই মন্দির বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পেন্সন-ভোগী নাগপুরের ভোঁসলা রাজার অধীন। পাণ্ডা ঠাকুর নাকি তাঁহার নিকট মাসিক ছয় টাকা বৃত্তি পাইয়া থাকেন। তাঁহার দুই হাতে সোনার বালা; রূপাবাঁধান ফর্সির নলে তামাকু সেবন করিতেছেন। তিনি নীতিকে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে সংস্কৃত পড়িতেছে কি না। নীতি বলিল পড়ে। ইহা শুনিয়া আমরা ভাবিলাম পাণ্ডাঠাকুরের সংস্কৃতে অত্যন্ত অনুরাগ। পণ্ডিতজি সংস্কৃতে সুন্দর কথোপকথন করিতে পারেন। আমাদের অনুরোধে তিনি পাণ্ডা মহাশয়ের সঙ্গে সংস্কৃতে বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডাজি কিন্তু একটু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া হিন্দীতে বলিলেন—"নেই, নেই", অর্থাৎ না না। আমরা হতাশ হইলাম।

মন্দিরের পশ্চাৎ দিক হইতে একটি সিঁড়ি নামিয়া রামটেক নগরের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। আমরা এই সিঁড়ি দিয়া নামিব স্থির করিলাম। ঐ দিকে যাইতে মন্দির

প্রাঙ্গণে, পাথরে বাঁধান ও রেলিং দিয়া ঘেরা একটি ছোট জলাশয় দেখিলাম। জল অতি বিশ্রী; প্রায় কৃষ্ণবর্ণ। তাহা হইতে একটি অতি উৎকট দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল। জানি না কি কারণে এই পচা জল এখানে ধরিয়া রাখা হইয়াছে।

পশ্চাৎদিকে পাহাড়ের গা খুব খাড়া হওয়ায় সিঁড়িগুলি বড় উঁচু উঁচু। নামিতে বড় কষ্ট হইতেছিল। ইহার দুই পার্শ্বে নিবিড় বন। বৃক্ষের শাখায় ইহা দিবসেও প্রায় অন্ধকার হইয়া থাকে। আমরা নামিতে নামিতে শুনিলাম উপরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল। দেখিলাম নগর হইতে কত লোক ব্যাকুলহৃদয়ে মন্দিরে উঠিতেছে। নীচে আসিয়া রামটেক নগরের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। এক বাড়ীতে কতকথা হইতেছিল। কত শুরু নরনারী নিস্পন্দভাবে শুনিতেছিলেন। পণ্ডিতজি আমাকে বলিলেন —"ইহাই ভারতের প্রকৃত লোকশিক্ষার উপায়।"

ট্রেণে গিয়া একেবারে দৈর্ঘ্যপ্রস্থ বিস্তার করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে শুইয়া পড়িলাম। যাত্রাসময়ের অভিজ্ঞতাফলে বুঝিয়াছিলাম যে ট্রেণ এখন বহুক্ষণ নড়িবে না। গৃহে ফিরিতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেও, নিরুপায় হইয়া মনকে এবিষয়ে দৃঢ় করিয়াছিলাম। ঘড়ি খুলিয়াও দেখিলাম যে ট্রেণ ছাড়িবার ঠিক সময় আরও প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে; তার পরে অবশ্য প্রথমতে আরও কিছু বিলম্ব হইবে। কিন্তু একটু পরেই ট্রেণ যখন চলিতে আরম্ভ করিল, তখন ভাবিলাম পাহাড়ে উঠার ফলে আমিই বুঝি নড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। তারপর যখন দেখিলাম সত্যই ট্রেণ চলিতেছে, তখন বক্ষ হইতে ঘড়িটিকে তুলিয়া দেখি তিনি অনেকক্ষণ অভিমান করিয়া বসিয়া আছেন।

রাত্রি সাড়ে নয়টার পর নাগপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। সুধীরাওয়ের সেই টিকেট কলেক্টর আসিয়া আমাদের টিকেট লইলেন। সুধীরাওয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়া গেল।

শ্রীসন্তোষকুমার বসু।

'আয় ঘুম আয়।'

আঁধার ঘনায়ে আসে, তন্দ্রার মতন,
পুষ্পবাসে নিঃঝুমে ধরণী;
আকুল কুন্তল-জালে আবার গগন,
নামে নিশি তিমির-বরণী।
করুণ-মধুর সুর ফিরে, দিশি দিশি,
ডেকে, ডেকে, "আয় ঘুম আয়",
"ঘুমের পরশ লয়ে, এস মাসি পিসি,
ঘনশ্যাম আম্রবনচ্ছায়।
সুবর্ণ পর্য্যঙ্ক নাই, শুভ্র আলিঙ্গনে,
নাই পিঁড়ি, চিত্রিত, সুন্দর;
অপূর্ব্ব আসন কোথা, খচিত রতনে?
এস সুপ্তি, বস আঁখিপর।

নিশি অবসান হলে, ক্লান্তদেহ দেহে,
শিরে বহি স্বপন বেশতি,
ফিরিবে যখন তব বহুদূর গেহে
অঞ্চলে বাঁধিয়া মুখ, জাতি;
অশোক বকুল দিবে রচিব যতনে
ছায়াপথ, হবে নিশিভোর;
পাছে বাজে তৃণাঙ্কুর কোমল চরণে,
বাধা পেলে টুটে ঘুম ঘোর!
অধরে তাম্বুল-রাগ, অলক্ত চরণ,
রঞ্জিব গো অরুণ-আভায়;
ছন্দপদ্মে লক্ষ্মিরূপা, করিব বরণ,
শ্রান্ত চোখে আয় ঘুম আয়।"

শ্রীমতী স্বর্ণলতা কাঞ্জিলাল।

চন্দন।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

সুভদ্র যে স্থানে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার নিকটেই একটী স্তূপ আছে। এইখানেই বজ্রপাণি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দয়ালু পৃথিবীপতি পৃথিবীর কার্য্য শেষ করিয়া পূর্ব্বোক্ত দুইটী শালবৃক্ষের মধ্যস্থলে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। উত্তর দিকে শির মস্তক ন্যস্ত করিয়া তিনি নিদ্রাভিভূত হন। ঋদ্ধিযুক্তা বর্জ্জিত হওয়াতে, ঐশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন প্রধান বুদ্ধদেবকে নির্ব্বাণোন্মুখ দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে বলিলেন "তথাগত আমাদের পরিত্রাণ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতেছেন; আমরা আশ্রয়যুক্ত হইলেও আমাদের রক্ষা করিবার কেহই রহিলেন না, নিদারুণ ভীতি আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়াছে এবং দুঃখাগ্নি আমাদিগকে দগ্ধ করিতেছে; ইহার কোন প্রতিকারও নাই।' পরে তাঁহাদিগের মত ত্যাগ করিয়া তাঁহারা ভূমিতে পতিত হইল এবং অনেকক্ষণ সেই অবস্থায় ক্রন্দনাতিপাত করিল। পরে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহারা একবাক্যে বলিল" এইক্ষণ অন্ধকারময় দুস্তর সমুদ্র পার হইতে আমাদের কে নৌকা যোগাইবে। দীর্ঘ অন্ধকারাবৃত প্রদীপ লইয়া কে আমাদের পথ প্রদর্শন করিবে?"

যে স্থানে মস্তকগুলি ভূতলচ্যুত হইয়াছিল, তথায় একটী স্তূপ আছে। এই স্থানে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে সাত দিবস পূজা করা হইয়াছিল। তথাগতের মৃত্যুর পূর্ব্বাহ্নে সর্ব্বত্রই উজ্জ্বল আলোক দৃষ্ট হইয়াছিল; দেবতা ও মনুষ্যগণ একত্রিত হইয়া বিয়োগ মর্ম্মে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন "এইক্ষণ পৃথিবীপতি প্রধান বুদ্ধ নির্ব্বাণ লাভ করিবেন; মনুষ্যের সুখের অবসান হইল; পৃথিবীতে আর আপনের আর কেহই রহিলেন না।" তথাগত তখন সঙ্ঘকে বিয়োগ মর্ম্মে সম্বোধন করিলেন "তথাগতের মৃত্যু হইতেছে বলিয়া মনে করিও না যে তথাগতের চিরদিনের জন্য তিরোধান হইতেছে; ধর্ম্ম চিরদিনেরই জন্য রহিল; ইহা অবিনশ্বর। আলস্য ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে মুক্তির অনুসন্ধান কর।"

তখন ভিক্ষুগণ ক্রন্দন ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অনিরুদ্ধ তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন। তিনি ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "এ প্রকারে দুঃখ প্রকাশ করিলে দেবতাগণ উপহাস করিবেন।" তখন মল্লগণ নিজ নিজ উপহার প্রদান করিয়া, সুবর্ণনির্ম্মিত শবাধারে উত্তোলন পূর্ব্বক শ্মশানে লইবার জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ করিল। ইহাতে অনিরুদ্ধ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে আদেশ দিলেন; কেননা দেবগণ সাতদিবস পূজা করিবেন এইরূপ ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন।

পরে, দেবগণ অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্গীয় পুষ্প বারণ করিয়া প্রত্যেকে যথাযথ ভাবে তাঁহাকে পূজা করিলেন। যে স্থানে অনিরুদ্ধের আদেশে মল্লগণ শবাধার উত্তোলন স্থগিত করিয়াছিলেন, তথায় একটী স্তূপ আছে; মায়া—মহামায়া এই স্থানেই বুদ্ধদেবের জন্য ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

তথাগত পৃথিবী ত্যাগ করিলে এবং তাঁহার শব শবাধারে স্থাপন করিলে অনিরুদ্ধ স্বর্গীয় আবাসে আরোহণ করিয়া মায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "অত্যাত্তম প্রভু এইক্ষণ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।" মায়া এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দেবগণসহ শালবৃক্ষ তলে উপনীতা হইলেন। সজ্ঞাতি, পাত্র ও ধর্ম্ম যষ্টি স্পর্শন করিয়া প্রত্যেকটীকে তিনি আলিঙ্গন করিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। পরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন "মনুষ্য ও দেবগণের সুখ অন্তর্হিত হইল; পৃথিবী চক্ষুহীন হইল; পথপ্রদর্শকবিহীন হইয়া সমস্ত পৃথিবী মরুভূমি হইল।' তখন তথাগতের ঐশ্বরিক ক্ষমতায় শবাধার উন্মুক্ত হইল; চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইল, উপবেশন

করিয়া বুদ্ধ বলে, তিনি তাঁহার মাতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "আপনি অনেক দূর হইতে আগমন করিয়াছেন; আপনি ধর্ম্মাচরণে কালাতিপাত করিতেছেন, সুতরাং আপনি বিমর্ষ হইবেন না।" আনন্দ নিজ দুঃখ দমন করিয়া পৃথিবীপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি কি উত্তর করিব?" এতদুত্তরে তিনি বলিলেন "বুদ্ধের মৃত্যুর পর, তাঁহার স্নেহময়ী জননী স্বর্গ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দুই শাল বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন বুদ্ধ অবিশ্বাসী মানবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য সুবর্ণের পর্য্যঙ্কে হইতে তাঁহার মাতার জন্য যুক্তকরে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, এইরূপ উত্তর দিবে।"

নদী পার হইয়া ৩০০।৪০০ পদ হস্ত দূরে নগরের উত্তরে একটি স্তূপ আছে। এই স্থানে তাঁহারা তথাগতের শব দাহন করিয়াছিলেন। এই স্থানের মৃত্তিকা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ। ধর্ম্মবিশ্বাসী যে কোনব্যক্তি এই স্থানে অনুসন্ধান করিলে বুদ্ধের কোন না কোন শরীর চিহ্ন পাইবেন।

তথাগতের মৃত্যু হইলে দেবতা ও মনুষ্যগণ স্নেহপ্রণোদিত হইয়া সাতটী মূল্যবান দ্রব্য দ্বারা তাঁহার শবাধার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং সহস্রখানি গাত্রাচ্ছাদন দ্বারা তাঁহার শব আবৃত করিয়াছিলেন; তাঁহারা শবাধারের উপরে পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য এবং তদুপরি আবরণ ও টাবোয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে মল্লগণ শবাধার উত্তোলন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল এবং শবাধারের অগ্রপশ্চাৎ সকলে যাইতে লাগিলেন। সুবর্ণ নদী পার হইয়া, তাঁহারা গন্ধ তৈল দ্বারা শবাধার পূর্ণ করিয়া, চতুষ্পার্শ্বে সুগন্ধি কাষ্ঠস্তূপ করিয়া উহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। মাত্র দুইখানি গাত্রাবরণ ব্যতীত সমস্তই ভস্মীভূত হইল। পরে, পৃথিবীর হিতার্থে তাঁহারা বুদ্ধদেবের কেশ ও নখগুলি অংশ করিয়া লইলেন। বুদ্ধদেবের শরীরের কেবল এই দুই দ্রব্যই অগ্নি গ্রহণ করে নাই। যে স্থানে তাঁহার দেহ দাহ করা হয়; তাহার নিকটেই একটি স্তূপ আছে। এই স্থানে বুদ্ধদেব কক্ষপের প্রীত্যর্থে নিজ পদযুগল শবাধারের বহির্দ্দেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। তথাগতকে শবাধারের মধ্যে স্থাপিত করিয়া উহা ভৈষজপূর্ণ করা হইলে চতুষ্পার্শ্বে কাষ্ঠ সজ্জিত করিয়া অগ্নি দেওয়া হইল কিন্তু অগ্নি প্রজ্বলিত হইল না। এতদ্দৃষ্টে সমাগত জনমণ্ডল ভীত ও সন্দিগ্ধচিত্ত হইলে অনিরুদ্ধ বলিলেন "আমাদের কক্ষপের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

এই সময়ে পাঁচশত শিষ্য সমভিব্যাহারে কক্ষপ পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া কুশীনগরে আসিয়া আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কি বুদ্ধদেবের শব দর্শন করিতে পারি?" আনন্দ বলিলেন "সহস্র গাত্রাবরণ দ্বারা আবৃত করিয়া আমরা তাঁহার শবকে শবাধারে স্থাপিত করিয়া, চতুর্দ্দিকে সুগন্ধি কাষ্ঠ স্তূপীকৃত করিয়া উহাতে অগ্নি প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।" ঠিক এই সময়ে বুদ্ধদেব শবাধারের মধ্য হইতে নিজ পদযুগল বহির্দ্দেশে স্থাপন করিলেন। চক্র চিহ্নের উর্দ্ধদেশে বিচিত্র বর্ণের চিত্র ফুটে হইতে লাগিল। আনন্দকে সম্বোধন করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সকল কি?" আনন্দ উত্তর করিলেন "তিনি যখন প্রথম দেহত্যাগ করেন, তখন দেবতা ও মনুষ্যের চক্ষের জল তাঁহার পদযুগলের উপর পতিত হওয়ায় এই সকল চিত্র হইয়াছে।

তখন কক্ষপ শবাধার প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বুদ্ধদেবের উপাসনা ও তাঁহার গুণগান করিতে লাগিলেন। সুগন্ধি কাষ্ঠ আপনা হইতেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং মহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সমস্তই ভস্মীভূত হইল।

তথাগতের মৃত্যু হইলে তিনি তিনবার শবাধারের বহির্দ্দেশে আগমন করেন। প্রথমবার—তিনি নিজ হস্ত উত্তোলন করিয়া আনন্দকে জিজ্ঞাসা করেন "তুমি কি পথ প্রস্তুত করিয়াছ?" দ্বিতীয়বার—তিনি উপদেশ করিয়া তাঁহার মাতার প্রীত্যর্থে ধর্ম্ম প্রচার করেন; তৃতীয়বার তিনি মহাকক্ষপকে নিজ পদযুগল দেখাইয়াছিলেন। শেষোক্ত ঘটনা যে স্থানে ঘটে, তথায় রাজা অশোকনির্ম্মিত একটী স্তূপ আছে। এই স্থানেই আটজন রাজা বুদ্ধের শরীর চিহ্ন বিভক্ত করিয়াছিলেন। ইহারই

সম্মুখভাগে প্রস্তর গাত্রে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে।

যুদ্ধের মৃত্যুর পর এবং তাঁহার শবদাহ হইলে আটজন নরপতি স্ব স্ব চতুরঙ্গ সৈন্যসহ এক একজন অপক্ষপাতী ব্রাহ্মণকে মৃগীনগরের মল্লগণকে নিম্নোক্ত মর্ম্মে সম্বোধন করিতে প্রেরণ করেন "দেব ও মনুষ্যের পথপ্রদর্শক এই দেশে দেহত্যাগ করিয়াছেন; আমরা বহুদূর হইতে তাঁহার শরীরের অবশিষ্টাংশ লইতে আগমন করিয়াছি।" মল্লগণ উত্তর করিলেন "তথাগত এই দেশে অনুগ্রহ পূর্ব্বক শুভাগমন করিয়াছেন; পৃথিবীর উপদেশক দেহত্যাগ করিয়াছেন, সমগ্র জীবিতের স্নেহশীল পিতা প্রস্থান করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের শেষ চিহ্নের সম্মান আমাদের করা একান্ত কর্ত্তব্য। আপনাদের পথশ্রম বৃথা হইয়াছে, কেননা আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।" তখন এতদ্রূপ পরাক্রান্ত রাজা পুনরায় প্রার্থনা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া বলিলেন "আপনারা আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না, আমাদের সৈন্যগণ নগরিকটেই অবস্থান করিতেছে।" তখন ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দয়ালু প্রভু কি প্রকারে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া পুণ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন, আপনারা সেই বিষয় চিন্তা করুন। চিরদিনের জন্য তাঁহার যশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। আপনারা যে যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্ত হইয়াছেন, উহা সমীচীন নহে। বুদ্ধদেবের শরীর চিহ্ন আট অংশে বিভক্ত করুন; তাহা হইলে সকলেই উহা পূজা করিতে সমর্থ হইবেন। যুদ্ধের কি আবশ্যক আছে?" মল্লগণ এই অনুরোধ রক্ষা করিয়া শরীর চিহ্নগুলি আট অংশে বিভক্ত করিলেন। তখন দেবতাধিপতি শক্রও বলিলেন যে দেবগণেরও এক অংশ প্রাপ্য; সেই অংশ লইয়া কেহ বিবাদ করিও না।" নাগ অমবতপ্ত এবং সুচিলিম্ব ও ইলাপত্রও বিবেচনা করিয়া বলিলেন "উহাদিগকে অংশ প্রদানে বাধা দেওয়া আমাদের উচিত নহে; আমরা বলপূর্ব্বক গ্রহণে উদ্যত হইলে, ইহা আমাদের মঙ্গলজনক হইবে না।" ব্রাহ্মণ বলিলেন 'এরূপ বিবাদ করিও না।' পরে তিনি চিহ্নগুলি তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ দেবগণের জন্য, একভাগ নাগগণের জন্য এবং তৃতীয়াংশ মনুষ্যগণের জন্য রাখিলেন। দেবতা ও নাগগণের এই অংশ গ্রহণে নরপতিগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

এই স্তূপের দক্ষিণে আন্দাজ ২০০লি যাইয়া আমরা একটী বৃহৎ গ্রামে উপস্থিত হই, এই স্থানে ধনাঢ্য সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ, পঞ্চবেদজ্ঞ, ত্রিপিটকপারদর্শী এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার গৃহের নিকটে তিনি পুরোহিতগণের জন্য এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং এই গৃহ সুসজ্জিত করিবার জন্য তাঁহার অর্থ নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে কোন পর্য্যটক পর্য্যটনকালে এই স্থানে উপস্থিত হইলে, তিনি পর্য্যটককে এই স্থানে অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন এবং সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। পর্য্যটকগণ একরাত্রি বা ক্রমাগতঃ ৭ দিবস এই স্থানে অপেক্ষা করিতে পারিতেন।

পরে রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম্ম বিনষ্ট করিলে সঙ্ঘের যতিগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়েন এবং মহাকালের জন্য লুক্কায়িত হন। কিন্তু উপরোক্ত ব্রাহ্মণ যতিগণের প্রতি চিরকালই ভক্তিমান থাকেন। একদিবস ভ্রমণকালে তিনি মুণ্ডিতমস্তক ও বহির্ব্বাসী শ্রমণকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তিনি কোন স্থান হইতে আগমন করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। এবং যতিগণের জন্য নির্ম্মিত গৃহে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। প্রাতঃকালে উক্ত শ্রমণকে তিনি পাথেয় প্রদান করিলেন। ক্রমণ একগ্রাস মাত্র গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার ভিক্ষাপাত্রে স্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া নিবেদন করিলেন "কি কারণে আপনি আমার সহিত এক রাত্রিও অতিবাহিত করিবেন না? আহার কি আপনার প্রীতিকর হইতেছে না?' শ্রমণ অনুগ্রহ করিয়া উত্তর করিলেন "অদ্যে আহার সমাপন করিয়া পরে আপনার প্রশ্নোত্তর দিব।" আহার সমাপনান্তে তিনি তাঁহার বস্ত্রাদি একত্রিত করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন "আপনি আমার সহিত

বাক্যালাপ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; এইক্ষণ কি কারণে মৌনাবলম্বন করিলেন?" শ্রবণ উত্তর করিলেন "আমি বিস্মৃত হই নাই; কিন্তু তোমার সহিত বাক্যালাপ বিপজ্জনক; এবং আমি যাহা বলিব তাহাও সন্দেহজনক; তত্রাপি আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। তোমার প্রথম আহারে আমি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করি নাই, কেন না বহুশতাব্দী ধরিয়া আমি আহার গ্রহণ করি নাই। যখন তথাগত এই পৃথিবীতে বাস করিতেন, এবং যেমুদম বিহারে কালাতিপাত করিতেন, তখন আমি তাঁহার শিষ্যরূপে নদীর পবিত্র জলে তাঁহার পাত্রপূর্ণ করিতাম; তাঁহার মুখপ্রক্ষালনের জন্য জল দিতাম; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তুমি যে গ্রন্থ প্রবাহ করিয়াছ, তাহা পুরাকালের সেই জলের ন্যায়ও সুস্বাদু নহে। ইহার কারণ এই যে, দেব ও মনুষ্যগণের পুণ্য হ্রাস হইয়াছে।" ব্রাহ্মণ তখন উত্তর করিলেন "আপনি যে স্বচক্ষে বুদ্ধ দেবকে দেখিয়াছেন ইহা কি সম্ভবপর?" শ্রবণ উত্তর করিলেন "তুমি কি কোনদিন বুদ্ধের পুত্র রাহুলের নাম শ্রবণ কর নাই? আমিই সেই রাহুল। ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্যই আমি এতদিন নির্ব্বাণ লাভ করি নাই।" শ্রবণ এই বলিয়াই অন্তর্দ্ধান করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ গৃহ পরিষ্কার করিয়া ঐ কক্ষে রাহুলের মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক রাহুল তথায় সশরীরে বর্ত্তমান এই মনে করিয়া, সেই মূর্ত্তিকে পূজা করিতেন।

মহাবনের মধ্য দিয়া ৫০০ লি যাইয়া আমরা বারাণসীরাজ্যে পৌঁছি।

(ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত)

সপ্তম খণ্ড

বারাণসী।

এই প্রদেশ প্রায় ৪ হাজার লি বিস্তৃত। ইহার রাজধানী গঙ্গানদীর পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। রাজধানী দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৮।১৯ লি এবং ৫।৬ বিস্তৃত; রাজধানীর দ্বারগুলি চিরুনীর ন্যায়। লোকসংখ্যা যথেষ্ট। অধিবাসীরা সমৃদ্ধিশালী, এবং বাসগৃহে অনেক বহুমূল্য রত্নাদি আছে। অধিবাসীরা দয়ালু ও কোমলপ্রকৃতিবিশিষ্ট এবং অধ্যয়নশীল। বিধর্ম্মীর সংখ্যাই অধিক; মাত্র কয়েকটী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী আছে। জলবায়ু মনোরম। প্রচুর শস্য জন্মে; ফলবান বৃক্ষের অভাব নাই। প্রায় ৩০টী সঙ্ঘারামে ৩০০০ সহস্র ভিক্ষু বাস করেন। ইহারা সম্মিতি-সম্প্রদায়ভুক্ত হীনযানমতাবলম্বী। প্রায় একশত দেবমন্দির আছে; ইহাতে প্রায় ১০০০০ সহস্র সন্ন্যাসী বাস করে। ইহারা প্রধানতঃ মহেশ্বরকে পূজা করে। কেহ কেহ মস্তক মুণ্ডন করে; কেহ তাহাদের কেশ একত্র বন্ধন করে এবং উলঙ্গ হইয়া গমনাগমন করে। ইহারা অঙ্গে বিভূতি মাখে এবং সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করে।

রাজধানীতে বিশেষত্বহীন দেব মন্দির আছে; এই সকল মন্দিরের কক্ষ ও তলগুলি কারুকার্য্যশোভিত প্রস্তর ও কাষ্ঠের নির্ম্মিত। বৃক্ষের পল্লবসমূহে ছায়া এবং মন্দিরগুলির চতুর্দ্দিকে সুমিষ্ট জলপূর্ণ নদী বিরাজিত। তাম্রমিশ্রিত মহেশ্বরের মন্দিরটি এক শত ফুটের কিছু কম উচ্চ। মহেশ্বরমূর্ত্তি দেখিতে গম্ভীর ও মহিমাময় এবং দেখিলে ভীতির উদ্রেক হয়।

রাজধানীর উত্তর পূর্ব্বদিকে, বরুণা নদীর পশ্চিমে রাজা অশোক নির্ম্মিত স্তূপ। ইহা উচ্চে প্রায় এক শত ফুট ইহার সম্মুখে প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ; ইহা দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময়, ইহার উপরিভাগে মানুষের ন্যায় মস্তক এবং বৃক্ষের অভিবিম্ব ইহাতে সকল সময়ই প্রতিফলিত হয়।

বরুণা নদীর প্রায় ১০ লি উত্তর পূর্ব্বে আমরা সুদর্শন সঙ্ঘারামে উপস্থিত হই। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর এবং ইহা আট অংশে বিভক্ত। প্রাসাদ, গৃহের ছাদ ও অলিন্দগুলি সুচারুকার্য্যে সমন্বিত। এই মঠে সম্মিতি-সম্প্রদায়ভুক্ত হীনযান মতাবলম্বী পঞ্চশত যতি বাস করে। প্রাচীর মধ্যে ২০০ ফুট উচ্চ একটি বিহার আছে; ছাদের উপরিভাগে সুবর্ণাবৃত আম্র বৃক্ষের মূর্ত্তি। প্রাসাদের ভিত্তি প্রস্তরনির্ম্মিত কিন্তু মন্দির ও কোলঙ্গাগুলি ইষ্টক নির্ম্মিত। কোলঙ্গাগুলি প্রত্যেক দিকে এক এক শত করিয়া চারিদিকে তিনশত

কোলঙ্গা আছে এবং প্রত্যেক কোলঙ্গাতে সুবর্ণের বুদ্ধ মূর্ত্তি আছে। বিহারের ময়দানে তাম্রমিশ্রিত বুদ্ধের মূর্ত্তি। ইহা মানবাকৃতি এবং বর্ণপ্রলেপে বিভূষিত এইরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছে।

বিহারের দক্ষিণ পশ্চিমে রাজা অশোকনির্ম্মিত প্রস্তরস্তূপ। ভিত্তিমূল নষ্ট হইয়া গেলেও, বর্ত্তমানেও প্রাচীরের প্রায় ১০০ ফুট অবশিষ্ট রহিয়াছে। স্তূপের সম্মুখে ৭০ ফুট উচ্চ প্রস্তর স্তম্ভ। স্তম্ভের 'প্রফুল' আলোকের ন্যায় উজ্জ্বল এবং যাহারা ভক্তিসহকারে ইহার সম্মুখে প্রার্থনা করে, তাহারা মনো মধ্যে তাহাদের প্রার্থনানুযায়ী শুভাশুভ চিহ্ন দর্শন করে। তথাগত জ্ঞান লাভ করিয়া এই স্থানেই ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন।

এই স্তূপের সন্নিকটেই অন্য একটি স্তূপ। অজাতশত্রু এবং অন্যান্য সকলে বোধিসত্ত্বকে কঠোর তপস্যা হইতে বিরত হইতে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, এই স্থানে আসিয়া বাসস্থান করিয়াছিলেন। ইহার নিকটে একটি স্তূপ আছে; এই স্থানে পাঁচ শত বুদ্ধ একই সময়ে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু, আরও তিনটি স্তূপ আছে, যথায় পূর্ব্বোক্ত তিন জন বুদ্ধের অবশেষ ও উপবেশনের চিহ্ন আছে।

এই শেষোক্ত স্থানের নিকটেই অন্য একটি স্তূপ। এই স্থানে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির আশ্বাস পাইয়াছিলেন। পুরাকালে যখন তথাগত রাজগৃহে বাস করিতেছিলেন, তখন তিনি ভিক্ষুগণকে নিম্নোক্ত প্রকারে সম্বোধন করিয়াছিলেন। "ভবিষ্যতে যখন অনুষ্ঠানে শান্তি বিরাজ করিবে এবং মনুষ্যের আয়ুঃ সহস্র বৎসর পরমায়ু হইবে, তখন মৈত্রেয় নামে এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার অবয়ব সুবর্ণবর্ণ এবং চাকচিক্যশালী হইবে। গৃহত্যাগ করিয়া তিনি বুদ্ধ হইবেন এবং সকল জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি ত্রিপিটক প্রচার করিবেন। যাহাদের অন্তঃকরণে আমার প্রচারিত ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহারাই রক্ষা পাইবে। মৈত্রেয়ের দ্বারা অনেকে দীক্ষিত হইবে।" (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

ভারতে নাট্যের উৎপত্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পারিভাষিক শব্দ—প্রাকৃত

নাট্যকলার শব্দকোষে এমন অনেকগুলি মৌলিক শব্দ পাওয়া যায়—যাহা শ্রেষ্ঠী-বিভাগ-কার্য্যের প্রয়োজনবশতঃ সৃষ্ট হইয়াছে, ব্যবহৃত হইয়াছে, বা রূপান্তরিত হইয়াছে। এই সকল শব্দের ইতিহাস অনেকস্থলেই তমসাচ্ছন্ন; উহাদের ব্যুৎপত্তি ও মূলধাতু হইতেও উহাদের যথোচিত ব্যাখ্যা হয় না। উহাদের নামের সহিত ভাবার্থের যে সম্বন্ধ তাহা সাধারণতঃ যদৃচ্ছাসম্ভূত বলিয়া মনে হয়, এবং টীকাকারগণ যেরূপ ব্যাখ্যা করেন তাহাতে বুদ্ধির চাতুর্য্যমাত্র প্রকাশ পায়। এই সকল পারিভাষিক শব্দের মধ্যে একটা সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় যাহা প্রথম দৃষ্টিতেই মনোযোগ আকর্ষণ করে।—অর্থাৎ উহাদের গঠনে অনুনাসিক বর্ণের সমধিক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃত পরিবেষ্টনের মধ্যে এই সকল শব্দের প্রাকৃত-অলঙ্কার কেমন বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। যদি নাট্যশাস্ত্র গোড়ায় সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইত, তাহা হইলে সংস্কৃত ভাষার বাহিরে, শব্দ উদ্ভাবন করিবার

প্রয়োজন হইত না। কেননা সংস্কৃত ভাষা এত সমৃদ্ধ যে সর্ব্বপ্রকার রচনাতেই অতি-সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারদিগেরও প্রয়োজনসাধনে অনায়াসে সমর্থ। তাই আমাদের মনে স্বতই এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, এই সকল অ-সংস্কৃত শব্দ,—সংস্কৃত নাটকের যুগ অপেক্ষা আরও কোন প্রাচীন সাহিত্যিক যুগের সাক্ষ্য দেয় কি না। সম্ভবতঃ ঐ সকল শব্দ সেই যুগের তথ্যাবশেষমাত্র। ভাস ও কালিদাসের যুগের পূর্ব্বে এক সময় নিশ্চয়ই প্রাকৃতভাষায় রচিত নাট্যাবলীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, সেই সকল নাটক সাহিত্যিক আকারে প্রাপ্ত হইলেও উহাদের ভাষা ব্রাহ্মণিক দেবভাষা অপেক্ষা তখনকার লৌকিক ভাষারই অনেকটা কাছাকাছি। এই সকল নাট্যাবলীকে পত্তনভূমি করিয়া সম্ভবতঃ একটা অলঙ্কারশাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল; উহা "নাট্যশাস্ত্রের" আগমনের পথ প্রস্তুত করিয়া দেয়। ভরত, প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্র হইতে যথাযথ সংকলন করিয়া স্বকীয় গ্রন্থ রচনা করেন। কতকগুলি পারিভাষিক শব্দকে তিনি সংস্কৃত আকার প্রদান করিয়াছিলেন, এবং যে সকল শব্দ সংস্কৃতে পরিণত হইবার নহে, তাহাদিগের মৌলিক রূপ বজায় রাখিয়াছিলেন। কিন্তু উহাদের সংস্কৃত ব্যাখ্যা সকল-স্থলে যথাযথ হয় নাই; প্রাচীন প্রাকৃতের সবিশেষ অভিজ্ঞতা ব্যতীত কতকগুলি শব্দের ঠিক্ অর্থ বুঝা যায় না।

সাহিত্যিক প্রাকৃতের ব্যবহার ও শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে যে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম নিয়মাবলী আলঙ্কারিক গ্রন্থসমূহে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে ভারতীয় নাট্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি অভিনব তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাকৃত নাটক সংস্কৃত নাটকের পূর্ব্ববর্ত্তী,—এই যে আমাদের অনুমান—উক্ত তথ্য এই অনুমানটিকে আরও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ও সাহিত্যদর্পণে প্রাকৃত ভাষার যে দীর্ঘ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে,—তাহাদের প্রয়োগসম্বন্ধে একটি সাধারণ নিয়ম দৃষ্ট হয় যাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। সেই নিয়মটি এই:—নিম্নশ্রেণীর পাত্রগণ "স্ব স্ব দেশের প্রচলিত ভাষায় কথা কহিবে।" (১) কিন্তু নাটকের প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে, প্রাকৃত ভাষা চারিটিমাত্র আদর্শ-শ্রেণীতে বিভক্ত হয়।—যথা, শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী ও মহারাষ্ট্রী। এই প্রাকৃতগুলির মধ্যে তিনটি, ভারতের তিনটি প্রদেশের নাম গ্রহণ করিয়াছে। (২) কিন্তু ঐ তিন প্রাদেশিক চলিত ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি পর্য্যালোচনা করিলে উহাদের সুস্পষ্ট প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থ প্রাকৃত যাহা পিশাচদিগের ভাষা, উহা স্পষ্টই দেখা যায় ভূগোলের বাহিরে—এমন কি, প্রচলিত ব্যবহারেরও বাহিরে। নাটকের প্রাকৃতিগুলি কৃত্রিম ধরণের ও নিছক্ সাহিত্যিক ভাষা। সংস্কৃত ভাষার পুনরুত্থানের পূর্ব্বেও মহারাষ্ট্রী ও পৈশাচী বেশ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

(১) দশরূপ II, ৬১।

(২) মথুরার চারিধারে যে শূরসেনদিগের দেশ সেই দেশের ভাষা শৌরসেনী। মগধের ভাষা মাগধী। পাটলীপুত্র = পালিবোথ্রা = পাটনার চারিধারে মগধ দেশ। মহারাষ্ট্রদিগের দেশ যে মহারাষ্ট্র সেই মহারাষ্ট্রের ভাষা মহারাষ্ট্রী।

মহারাষ্ট্রীই বিশেষরূপে 'প্রাকৃত'-নামে পরিচিত। . হালের যুগে (খৃষ্টোত্তর তৃতীয় শতাব্দী) যে সকল ভাষা বিশেষরূপে অনুশীলনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, মহারাষ্ট্রী তাহার অন্তর্ভুক্ত। "যে ব্যক্তি প্রেম লইয়া ব্যাপৃত, অথচ প্রাকৃতভাষার কাব্য পাঠ বা শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারে না, তাহার কি লজ্জা হয় না?(৩) যে কাব্যের প্রতি লোকের বিশেষ আদর থাকায় তাহার রচনা কালিদাসের প্রতি আরোপিত হয়, সেই "সেতুবন্ধ" কাব্যটি মহারাষ্ট্রী ভাষার গৌরব-সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়। পৈশাচী ভাষায় গুণাঢ্য বৃহৎ কথা লিখিয়াছিলেন। স্বকীয় সাহিত্যিক সৌভাগ্যের জন্য মাগধী ভাষা জৈন ও বৌদ্ধদিগের নিকট ঋণী। জৈন ও বৌদ্ধগণ স্বকীয় শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়নে ঐ ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, মাগধী ভাষা, প্রাচীন মাগধগণের ভাষা। এই মাগধেরা সমস্ত ভারতময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রাজদরবারে উহারা নৃপগণের প্রসাদ লাভ করিত, উহারা রাজাদিগের গুণকীর্ত্তন করিত। উহারা অতীত মহাকাব্যের ও পৌরাণিক গাথাসমূহের গায়ক ছিল। পাটলীপুত্র বা পাটনার চতুষ্পার্শ্বে (এখনকার বিহার) তাহারা বাস করিত। সম্ভবতঃ নাটকের মাগধী সেই প্রাচীন কথকথার ভাষারই অনুবৃত্তি। কেবল শৌরসেনীর কোন সাহিত্যিক পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে ঐ শৌরসেনী ভাষার কৃষ্ণকথার প্রাচীন ঐতিহ্য চলিয়া আসিয়াছে।

শূরসেনদিগের যে দেশ সেই দেশের রাজধানী মথুরা। ঐ মথুরাই কৃষ্ণধর্ম্মের পীঠস্থান। ঐখানেই কৃষ্ণের জন্ম হয়, ঐ খানেই তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়; তাঁহার প্রাথমিক অসুর কর্ম্মসমূহের জন্য ঐ স্থানই প্রসিদ্ধ। তাঁহার প্রেমে আত্মহারা গোপী-দিগের উপর তাঁহার অজস্র প্রসাদ ঐখানেই তিনি বর্ষণ করেন। এই সকল পুণ্য-স্মৃতির গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া, শৌরসেনী ভাষা কৃষ্ণধর্ম্মের উৎসস্থানেতে ও কৃষ্ণধর্ম্মসংক্রান্ত কাব্যে একটা ধর্ম্মের মর্য্যাদা ও শ্রদ্ধা আসন লাভ করে। এবং তদবধি কৃষ্ণ ও তাঁহার প্রণয়িনী গণ, রাধা ও তাঁহার গোপী সখিবৃন্দ শৌরসেনীভাষার কথা কহিয়া আসিতেছে। এইরূপে কৃষ্ণধর্ম্মের পুনরুত্থানের পর হইতেই প্রাচীন শৌরসেনীদেশের কথিত ব্রজভাষা ধর্ম্মের পবিত্র ভাষা বলিয়া গৃহীত হয়। বৈষ্ণব কবিগণ (৪) ব্রজভাষায় কিংবা ইহার কাছাকাছি কোন ভাষায় কৃষ্ণপ্রেম কীর্ত্তন করিতে লাগিল। তাহার সাক্ষী বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস এবং অন্যান্য বাঙ্গালী গীতিকাব্যের কবিগণ। এই প্রথা যাত্রাতেও রক্ষিত হইয়াছে। "দিব্যোন্মাদে" নন্দগোপ ব্রজভাষায় একটা ধর্ম্মগীত গান করিলেন। (৫) কৃষ্ণকাহিনীর সহিত শৌরসেনীর একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকায় Lassen পূর্ব্ব হইতেই মনে করিয়াছিলেন উহা প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম্ম-

(৩) হাল, V. ২।

(৪) ব্রজ—মথুরার নিকটবর্ত্তী স্থান।

(৫) Nisikantas, Essay 23.

সংক্রান্ত নাট্যাভিনয়ের একটা স্মৃতিচিহ্ন। (৬) হরিবংশে দ্বারবতীর উৎসবের যে বর্ণনা আছে, তাহা এই মতটিকে আরও দৃঢ় করে। যাদবদের উৎসব-আমোদে যোগ দিবার জন্য অপ্সরাগণ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিল, গোপীদিগের সহিত একযোগে কৃষ্ণ যে মণ্ডলাকার নৃত্য উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহারা সেই রাস-নৃত্য করিতে লাগিল, এবং তদ্দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, দেশভাষায় দেবতাদিগের মহিমা কীর্তন করিতে লাগিল। দ্বারবতী শূরসেনদিগের একটি উপনিবেশ। তাই সেখানে শৌরসেনী ভাষা সংরক্ষিত হয়।

সাহিত্যিক ইতিহাসে যে প্রাকৃত সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত, নাটকে তাহার বড় একটা ব্যবহার দেখা যায় না। যে সকল শ্লোক প্রধান পাত্রগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া থাকে শুধু সেই সকল শ্লোকই মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত। কোন জাত নাটকে পৈশাচীর ব্যবহার দেখা যায় না। মাগধীর ব্যবহারও অতীব সংযত। নাটকের যাহা প্রকৃত প্রাকৃত-ভাষা, যাহা সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—সাহিত্যিক ইতিহাসে তাহারই শুধু কোন বংশাবলী নির্ণয় করা যায় না। (৭) এই বিষয়ে শৌরসেনীর অপূর্ব্ব সৌভাগ্য। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের রচনায় শৌরসেনীর প্রভাব যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ ছিল তাহা উক্ত সাহিত্যিক সৌভাগ্যই তাহার সাক্ষী। তা ছাড়া, শূরসেনদিগের উপনিবেশে,—কৃষ্ণের রাজধানী দ্বারবতীর রমণীরাই শাস্ত্রনামক নাট্যনৃত্য প্রচার করিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন। শূরসেনদিগের দেশেই যে কৃষ্ণধর্ম্মের প্রভাব বলবৎ ছিল তাহা তখনকার প্রচলিত ব্যবহার ও ঐতিহ্য উভয়ই সাক্ষ্য দেয়।

কৃষ্ণকাহিনীর সহিত নাটকের চারিটি বৃত্তিও সংযুক্ত। এই বৃত্তিগুলি "নাট্যাভিনয়ের মাতৃস্বরূপ।" সাত্বতী, কৈশিকী ও ভারতী, এই বৃত্তিত্রয়ের, নিরুক্তকারগণ যেরূপ ব্যুৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছেন তাহাতে যেন কৃত্রিমতা প্রকাশ পাইলেও উহা যথাযথ বলিয়া মনে হয় না। উহাদের নাম রূপই ঐ অলীক ব্যুৎপত্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং উহাদের প্রকৃত ব্যুৎপত্তির সম্বন্ধে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়। কৃষ্ণ যে যাদববংশের নায়ক ও অধিপতি,—সেই যাদববংশেরই দুই প্রধান শাখার নাম সাত্বত ও কৈশিক। এমন কি, অনেক স্থলেই কৃষ্ণ কেবল সাত্বত নামেই নির্দ্দেশিত হইয়াছেন। মহাভারতে কৃষ্ণের গৃহীত ভূমিকা, অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার সখ্য —ভরত হইতে ব্যুৎপন্ন "ভারতী বৃত্তি" নামের সার্থকতা ও যাথার্থ্য সমাক্‌রূপে সমর্থন করে। কেবল, আরভটী বৃত্তির ব্যুৎপত্তি কি তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। ইহার ব্যুৎপত্তিসম্বন্ধে কোন প্রমাণলেখ্য পরে আবিষ্কৃত হইতে পারে।

কথোপকথনের (সংবাদ) আকারে রচিত ঋগ্বেদের মন্ত্র হইতে জানা যায়, ভারত ইতিহাসের আরম্ভেই নাট্য জাতীয় রচনার সৃষ্টি

(৬) Md. Alt., II 507.—তথা Md. Stud IV. 269, IX 380 দ্রষ্টব্য।

(৭) Garrez Journ. Asiat. 1872, XX., p. 208 দ্রষ্টব্য।

হয়। আখ্যান-বিনির্মুক্ত এই যে কথোপকথন যাহাতে একজন আখ্যানকারীর মধ্যবর্ত্তিতা ব্যতীত উত্তর প্রত্যুত্তর পর-পর চলিয়াছে, ইহা আসলে লেখকের একটা রচনাকৌশল মাত্র নহে। প্রচলিত ব্যবহার হইতেই ইহা সাহিত্যে গৃহীত হয়। দুই তিন জন পাত্র লইয়া বৈদিক কবিরা যে প্রকৃত নাট্য রচনা করিয়াছিলেন—তাহার কারণ, তাহারা বাস্তব নাট্যাভিনয় স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। বৈদিক আখ্যানের গীত বাদ্য নৃত্য ও নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে যেরূপ অনুরাগ ও রুচি লক্ষিত হয়, তাহাতে এইরূপ প্রতীতি হয় যে সেই প্রাচীন বৈদিক যুগেই ভারতীয় নাট্যকলা শৈশবাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ধর্ম্ম প্রকাশ্যভাবে এই সকল বিনোদ-ব্যাপার গ্রহণ না করিলেও প্রকারান্তরে উহাদিগকে আপনার কাজে লাগাইয়াছিল। দেবতাদের মহিমা ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ভক্তদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য পুরোহিত সম্প্রদায় উহার সাহায্য গ্রহণ করিত। তখন কথোপকথন তিনজন পাত্রের মধ্যে বদ্ধ ছিল; কিন্তু উহার মধ্যে (মানব বা দৈব, বাস্তব বা অতিলৌকিক) "কোরস" (chorus) পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তিত হওয়ায় নাট্যের প্রসর ও গৌরব বর্দ্ধিত হয়। বৈদিক সংবাদগুলি এক প্রকার অঙ্কুরাকারে নাটক বলিলেই হয়। উহার কার্য্য আরম্ভ হইয়া তখনই শেষ হইয়া যায়। উহাতে নাটকের উদ্‌ঘাটন, গ্রন্থি, উপসংহার—সমস্তই একত্র মিশ্রিত। পাত্রগুলির চরিত্র, তেমন স্পষ্টরূপে চিত্রিত নহে। কিন্তু নাটকের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন হইয়া ঐখানেই প্রকৃত নাটকের জন্ম আরম্ভ হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাতৃঋণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রে।

অদূরে কলকারখানার গগনস্পর্শী চূড়া দেখিয়া দুই বাহু উচ্ছ্বাসভরে বিস্তার করিয়া দিয়া লাবাস্যাদ্‌ব্ জ্যাককে ডাকিয়া কহিল, "দেখ জ্যাক—কি চমৎকার দেখাচ্ছে চারিধার।"

উভয়ে তখন নৌকারোহণে লয়ার নদী অতিক্রম করিতেছিল। লাবাস্যাদরের স্বরে কৃত্রিমতা থাকিলেও সম্মুখে ইন্দ্রের কর্ম্মকোলাহলের অস্ফুট চীৎকারের সহিত জ্যাকের চক্ষে সত্যই এক নূতন জগৎ ফুটিয়া উঠিতেছিল!

তখন অপরাহ্ণ বেলা। সূর্য্য পশ্চিমাকাশে হেলিতেছিল—তাহার ক্ষীণ রশ্মি গলিত রজতধারার মত নদী বক্ষে ঝরিয়া পড়িতেছিল। বায়ুতে একটা কম্পন লাগিয়াছিল। সেই কম্পিত বায়ুতরঙ্গ ভেদ করিয়া সম্মুখস্থ নগরী কুহেলিকাচ্ছন্ন মায়াপুরীর মত মনে হইতেছিল।

নদীবক্ষে অসংখ্য ষ্টীমার নৌকা—কোন ষ্টীমার মহদার বক্তা বহিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—তীরের নিকট জেটিতে বাঁধা কোন ষ্টীমারে লবণ বোঝাই হইতেছে, পুরুষ ও রমণী কুলি-

দিগের বিচিত্র পোষাকে লবণের টুকরা লাগিয়াছে, তাহাতে সৌরকিরণ পড়ায় সেগুলা চুমকির মত ঝিকমিক করিতেছে। বাঁশি বাজাইয়া জ্যাকদিগের নৌকার পাশ দিয়া কোন ষ্টীমার চলিয়া যাইতেছে—চারিধারে একটা ব্যস্ততার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

জ্যাক কহিল, "আর কতদূর—ইভ্রে?"

"ইভ্রে! কেন, এই ত ইভ্রে।"

নৌকা তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। অস্পষ্ট তীর স্পষ্টতর হইয়া আসিতেছিল। জ্যাক দেখিল, সম্মুখে বড় বড় বাড়ী তাহাতে চিমনির সারি—চিমনিগুলা হইতে কয়লার ধূম নির্গত হইয়া সারা আকাশ কালো করিয়া দিয়াছে। কোঁসকোঁসানির শব্দ, কলের ঘড় ঘড় শব্দ, লোকের চীৎকার, ষ্টীমারের বাঁশি, সমস্ত মিলিয়া একটা বিরাট কোলাহলের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে।

ক্রমে নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল। তীরে ঘাটে একটি লোক দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া লাবার্স্যাদ্র্ চীৎকার করিয়া উঠিল, "আরে, রুডিক যে!"

"এই যে, লাবার্স্যাদ্র্ এসেছ!"

লাবার্স্যাদ্র্ ও রুডিক দুই ভাই। দুইজনের মুখে অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও, রুডিকের দেহ পরুষ ও বলিষ্ঠ, লাবার্স্যাদ্র্ স্থূল না হইলেও তাহার অবয়ব কতকটা কোমল ধরণের!

লাবার্স্যাদ্র্ কহিল, "বাড়ীর খবর কি? ক্লারিসা, জেনেভা সকলে ভাল আছে ত!"

"সবাই ভাল আছে। এটি বুঝি সেই ছোকরা—কাজ শিখতে এসেছে! এর শরীর তেমন শক্ত মনত!"

"কে বললে নয়। দেখতে এমন রোগা হলে হবে কি—পারির ডাক্তারেরা অবধি বলেছে, ওর শরীর বেশ মজবুত।"

"তা হলেই ভাল! নইলে আমাদের কাজ কর্ম্ম যা—তাতে শরীর বেশ মজবুত না হলে চলবেই না! এস এখন—তোমার নাম কি, ছোকরা?"

জ্যাক কহিল, "আমার নাম, জ্যাক!"

"জ্যাক! বাঃ, বেশ নাম! এস জ্যাক—লাবার্স্যাদ্র্ও এস—এখনই কারখানার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে নিই, তারপর বাড়ী যাওয়া যাবে।"

সকলে কারখানার দিকে চলিল। দুই ধারে ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের গাছ—তাহারই মধ্য দিয়া সরু পথ—দুই ধারে কারখানাবাড়ীর বিভিন্ন ঘর, মাঝে মাঝে দূরে অদূরে কোথাও জানালায় জামা শুখাইতেছে—কোথাও শিশুর ক্রন্দন বা মাতার ঘুমপাড়ানী গান শুনা যাইতেছে—এইগুলা না থাকিলে জ্যাকের মনে হইত, যেন এক পরিত্যক্ত জনমানবহীন গ্রামপ্রান্তে সে আসিয়া পড়িয়াছে; —তখন পথে একটিও লোক চলিতেছিল না।

লাবার্স্যাদ্র্ চীৎকার করিয়া উঠিল, "ঐ যে নিশান নামানো রয়েছে! ওঃ, আগে নামানো নিশেন দেখলে কি ভয়ই না লাগত!"

জ্যাককে তখন নিশান নামাইয়া রাখার অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হইল। কারখানা খুলিবার পর পাঁচ মিনিট অবধি নিশান তোলা থাকে তার পর নামাইয়া রাখা হয়। নিশান নামানো হইলে আর কোন কারিকরকে কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।

কারিকরদিগের বিলম্ব হইলেই বিপদ—প্রথম অপরাধে, সেদিনকার হাজিরা লওয়া হয় না, পরে আর দুই একবার কারখানায় আসিতে বিলম্ব ঘটিলে কারখানা হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া হয়।

সকলে কারখানার দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল। ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্যাক দেখিল, এ যেন এক লৌহনির্ম্মিত নগর! কত লোক কাজ করিতেছে। বড় বড় লোহার গম্বুজ পড়িয়া রহিয়াছে—কোথাও একটা এঞ্জিনের চারি ধারে বসিয়া অসংখ্য কারিকর এঞ্জিনের গায়ে পেরেক আঁটিতেছে। অসংখ্য পুরাতন মরিচাধরা মৃত্যুর দূত কামানের সারি মেরামতের জন্য পড়িয়া রহিয়াছে!

জ্যাক এই সকল দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। এ কি বিরাট ব্যাপার! অমানুষিক কাণ্ড! যেন কোন্ গল্প-শ্রুত দৈত্য মহাসমারোহে নরমেধ যজ্ঞ সাধনোদ্দেশে লৌহকটাহ ও অন্যান্য যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে অসংখ্য কারিকর নিযুক্ত করিয়া দিয়াছে! জ্যাক দেখিল, পার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড অন্ধকার ঘর—ভিতরে মধ্যে মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে, আর সেই ঘরের মধ্যে কতকগুলা ছোট ছোট দৈত্য কি এক মহা ষড়যন্ত্র করিতে লাগিয়া গিয়াছে। রুডিক কহিল, "এই ঘরে লোহা পেটা হচ্ছে।"

অবশেষে একটা ঘরের সম্মুখে আসিয়া রুডিক কহিল, "এইটে ম্যানেজারের ঘর—যাওয়া যাক"—পরে লাবাসাঁদ্রুকে কহিল, "তুমি আসছ ন্যাক?"

"আমি? আচ্ছা, চল—একবার বুড়োর সঙ্গে দেখা করা যাক—সে ত আমাকে বলেছিল, আমার দ্বারা কারখানা কাজকর্ম্ম চলবে না! এখন শুধু গান গেয়েই আমার অবস্থাটা কেমন হয়েছে, একবার তাকে দেখিয়ে খাতির আদায় করতে দোষ কি!" গর্ব্বে লাবাসাঁদ্রুর চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

তিনজনে ম্যানেজারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ম্যানেজার কহিল, "কে—রুডিক যে!"

রুডিক কহিল, "এই সেই ছেলেটি—এখানে কাজ শিখতে চায়!"

"বটে!" বলিয়া ম্যানেজার জ্যাকের দিকে চাহিয়া দেখিল, কহিল, "এর শরীর তেমন মজবুত নয় ত! এস—কি—তুমি কারখানায় কাজ শিখবে—বেশ!"

রুডিক কহিল, "না—ও বেশ শক্ত আছে।"

লাবাসাঁদ্রু কহিল, "বেশ শক্ত!"

ম্যানেজার তাহার দিকে ফিরিয়া কহিল, "এই যে, তোমায় না চিনি"—

লাবাসাঁদ্রু মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল—ভাবিল, এবার সে পরিচয় দিবে, ছয় বৎসর পূর্ব্বে যাহাকে অযোগ্য বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছিলে সে এই ছয় বৎসরে গান গাহিয়া কেমন প্রভূতধনের অধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রতিভায় কেমন স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। কিন্তু ম্যানেজার তাহার প্রতি আর লক্ষ্যই করিল না। একি অবজ্ঞা?

ম্যানেজার কহিল, "তোমার ছাত্রকে তাহলে আজ নিয়ে যাও, রুডিক! তোমার হাতে ওর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। ওকে মানুষ করে তোল!"

তিনজনে গমনোদ্যত হইলে ম্যানেজার রুডিককে আহ্বান করিল। নিভৃতে দুইজনে কি কথাবার্ত্তা হইল। পরে রুডিক বাহিরে আসিলে লাবাস্যাদ্‌র্‌ কহিল, "কি বললেন, ম্যানেজার? আমার সম্বন্ধে কোন কথা কি? লোকটার ভারী অহঙ্কার হয়েছে!"

রুডিক কহিল, "না, তোমার কথা নয়-ও আমাদের চালির কথা বলছিল চার্লি ভারী কষ্ট দিচ্ছে, সবাইকে!" চালি রুডিকের খুড়তুত ভাই।

লাবাস্যাদ্‌র্‌ কহিল, "চালি কষ্ট দিচ্ছে। কেন, ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার গুরুতরই। খুড়িমা মারা যাবার পর সে একেবারে উৎসন্ন গেছে। জুয়া-খেলে, মদ খেয়ে বিস্তর দেনা করে ফেলেছে। ডিজাইনের কাজ বেশ জানে! দু পয়সা পায়ও তাতে! ডিজাইনের কাজে এ সহরে ওর সমতুল্য লোক পাবে না আর একটি! তা দু পয়সা আনলে হবে কি—যা পায় সবই উড়িয়ে দেয়। তাকে শোধরাবার জন্য ম্যানেজার, আমি, আমার স্ত্রী কম চেষ্টা করছি! ও কাঁদে, কেঁদে বলে আর কোন রকম বদখেয়ালি করবেনা—তার পর যেমন মাইনেটি পাওয়া অমনি আবার যে-কে সেই! ওর বিস্তর দেনা আমি শোধ করে দিয়েছি। কিন্তু কতক্ষণ আর পেরে উঠি বল! আবার মেয়ে জেনেদাটা হয়েছে, বড় হয়েছে—ওর বিয়ের যোগাড় করতে হবে—সে বেশ মোটা রকম ব্যয় আছে! এক সময় আমি ভেবেছিলাম, চালির সঙ্গে ওর বিয়ে দোব কিন্তু এখনই চার্লিকে দিয়ে মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পারিনে ত! তাই আমরা স্থির করেছি—কোনমতে এদের থেকে এই বদ সঙ্গীগুলোর কাছ থেকে ওকে দূরে পাঠাতে পারি ত ওর শোধরাবার কিছু আশা হয়! তাই ম্যানেজার আমাকে ডেকে বললেন, নিভাগে ওর জন্য ভাল একটা কাজের যোগাড় করেছেন—উপার্জ্জনও এখানকার চেয়ে বেশী হবে। আমরা ত নাচারে এখন তুমিও বুঝিও দেখি; তোমার কথা শুনলে শুনতে পারে!"

লাবাস্যাদ্‌র্‌ সগর্ব্বে উত্তর দিল, "বেশ, বোঝাব! তার জন্যে ভাবনা কি!"

সকলে মিলিয়া রুডিকের গৃহের দিকে চলিল। পথে বিস্তর লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল! লাবাস্যাদরের পুরাতন সঙ্গীর দল পরিচয় পাইয়া একান্ত কৌতূহল ও আগ্রহের সহিত তাহার পানে চাহিয়া দেখিতেছিল—সে ইহাদেরই দলের লোক ছিল! এখান হইতে হিটকাইয়া গিয়া শুধু প্রতিভার জোরে কেমন অবস্থা ফিরাইয়া ফেলিয়াছে—আর তাহারা—! হায়, বেচারা কারিকরের দল, তাহারা জানে না, লাবাস্যাদরের প্রকৃত মূল্য কি—তাহার অবস্থা যে এই কারিকরগুলার অবস্থা হইতে কোনমতে উৎকৃষ্ট নহে,—কারিকরদিগের অন্নচিন্তা নাই—কিন্তু লাবাস্যাদরের তাহা বিলক্ষণ আছে! তাহার এই পরিচ্ছন্ন কায়েমী পরিচ্ছদের ভিতর কি ভীষণ দৈন্য রি-রি করিতেছে, লাবাস্যাদরের সৌভাগ্য যে তাহা লক্ষ্য করিতে কারিকর-গুলার তেমন দিব্যদৃষ্টি ছিল না!

লাবাস্যাদর ও জ্যাককে আনিয়া রুডিক আপনার গৃহসংলগ্ন ছোট উদ্যানে বসাইল! উদ্যানটি ছোট হইলেও পরিচ্ছন্ন! উদ্যানের মধ্যে একটি টেবিল তাহার

চতুষ্পার্শ্বে কয়েকখানা চেয়ার। একটি চেয়ার ধরিয়া এক সুশ্রী তরুণী দাঁড়াইয়া—রুডিক কহিল, "ঐ আমার স্ত্রী ক্লারিসা দাঁড়িয়ে রয়েছে!"

পথে রুডিক লাবার্স্যাদরকে বলিয়াছিল, তাহার প্রথমা পত্নী জেনেদার মাতার মৃত্যু হইলে ক্লারিসাকে সে আবার বিবাহ করিয়াছে। ক্লারিসাকে দেখিয়া জ্যাকের সে কথা মনে পড়িল।

ক্লারিসা সুন্দরী। তাহার মুখে এমন একটি কমনীয়তা বিরাজ করিতেছিল, যাহা এই পল্লীতে একান্ত বিরল। জ্যাকের মনে হইল, এই নিরানন্দময় বীভৎস দৈত্যপুরীর মধ্যে সে যেন কাহিনী-বর্ণিত-দৈত্য বন্দিনী কোন রূপসী পরীকন্যা! আকাশে সন্ধ্যাসমাগমে এই যে দিব্য আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে যেন এই পরীকন্যারই রূপচ্ছটার বৃক্ষপত্র দুলাইয়া এই যে স্নিগ্ধ ধীর বায়ু বহিয়া চলিয়াছে, সে যেন এই রূপসী পরীকন্যারই মৃদু নিশ্বাস! রুডিক কহিল,"ক্লারিসীকে দেখতে খাসা নয়।"

"চমৎকার—তোমার স্ত্রীভাগ্যটা এবার ভাল দেখছি।"

রুডিক স্ত্রীর সহিত সকলের পরিচয় করাইয়া দিলে যথারীতি অভ্যর্থনাদি হইল। পরে লাবার্স্যাদ্‌ গান ধরিল,—"ওগো, পূত-শান্তিকরা চারু নিবাস—"সঙ্গীত থামিবার পূর্ব্বেই কে কহিল, "এই যে দাদা—তুমি কখন এলে!" সে চার্লি।

পরে চার্লি ও লাবার্স্যাদরে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। ক্লারিসা আসিয়া জ্যাককে কোলের কাছে টানিয়া কহিল, "তোমার নামটি কি?"

"জ্যাক।"

রুডিক কহিল, "জেনেদা—জেনেদা কোথায়? জান, লাবার্স্যাদ্‌র, জেনেদা এক দর্জীর দোকানে কাজ করছে! আমা ফ্রক এ সব তৈরি করতে পারে বেশ—মাহিনাও বেশ পাচ্ছে!"

"বটে!" মৃদু হাস্যের সহিত লাবার্স্যাদ্‌র কহিল, "কোথায় সে?

ক্লারিসা কহিল, "ঐ যে আসছে!"

ক্লারিসার কথার সহিত উদ্যানমধ্যে এক নারীমূর্ত্তি দেখা দিল। এই নারী জেনেদা। জেনেদার শরীরখানি কিঞ্চিৎস্থূল—মুখে কমনীয়তা নাই! গড়নটাও সুশ্রী নহে! চোখে একটা পরুষভাব! বাহু ও পেশীগুলা পুরুষোচিত কাঠিন্যে মণ্ডিত—জেনেদাকে দেখিলে মনে হয় তাহার নিজের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে! কর্ম্মজীবনের বন্ধুর বন্ধুর বিরুদ্ধে বৃক্ষের মত সবলভাবে দাঁড়াইতে সে সমর্থ, তাহার পার্শ্বে তাহার বিমাতা ক্লারিসাকে দেখিলে মনে হয়, ক্লারিসা যেন একান্ত পরমুখাপেক্ষিনী! লতার মত সে বৃক্ষের আশ্রয় চাহে!

জেনেদা আসিয়াই তাহার ছুঁচ সুতা লেস ও কাঁচিভরা ব্যাগটা টেবিলের উপর রাখিল। পরে চার্লিকে দেখিয়া কহিল, "এই চার্লি। তোমার ম্যানেজার বলছিল তোমায় নিয়ে সে ভারী আলাতন হয়ে উঠেছে তোমার বদখেয়ালি ত ছাড়বে না।"

চার্লি কহিল, "না না, চার্লি, ম্যানেজারের দোষ দিওনা! ম্যানেজার তোমায় যথেষ্ট ভালবাসেন! তোমার জন্যে নিস্তারে একটা ভালো চাকরি তিনি জোগাড় করেছেন, জানো না?"

"নিভার ?"

"হ্যাঁ—নিভার! সেখানে সবদিকে উন্নতির সম্ভাবনা আছে।"

বেশ—যাব! আমাকে এখান থেকে তাড়াবার জন্যে তোমাদের সকলের যখন এত সাধ্যসাধনা, তখন আমি যাব।"

রুডিক কহিল, "রাত হয়ে আসচে, চল ভিতরে যাই। ক্লারিসা খাবার তৈরি ?"

"হ্যাঁ।"

রাত্রে আহারে বসিয়া লাবার্স্যাদর কারিকরদিগের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা সুরু করিয়া দিল।

লাবার্স্যাদর কহিল, "জ্যাক, এখন তুমি একজন নগণ্য লোক কেউ তোমায় জানে না, চেনে না—কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তুমি দেখবে, তুমি জগতের একজন সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে দাঁড়িয়েছ।"

রুডিক কহিল, "সর্ব্বেসর্ব্বা! দুবেলা পেটভরে খেয়ে বুড়ো বয়সে মরবার সময় কিছু জায়গা জমি করে যেতে পারে যে সে আপনাকে মস্ত ভাগ্যবান বলে মনে করতে পারে! সর্ব্বেসর্ব্বা—কি বল তুমি লাবার্স্যাদর! ক্লারিসা খাওয়া হলে জেনেদার ঘরের পাশের ঘরটায় তুমি জ্যাকের বিছানা করে দিও—কাল ভোরে পাঁচটার সময় ডেকে দিও—ওর জন্যে একটা ছোটখাট পোষাক জোগাড় করে দিতে হবে—আছে, বোধ হয়, একটা দেখে শুনে ঠিক করে রেখো—কাল ভোরে ওকে কারখানায় যেতে হবে।"

আহারের পর নির্দ্দিষ্ট ছোট ঘরে আসিয়া বিছানায় পড়িয়া জ্যাকের মনে হইতে লাগিল, ঐ যে পথে অসংখ্য কুশ্রী কুৎসিত কারিকর গুলাকে সে দেখিল, সেও তাহাদেরই একজন হইবে! এই নির্ব্বাসনে থাকিয়া তাহাকে দুঃসহ জীবন বহন করিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা ময়রোভার স্কুলও যে লক্ষগুণে ছিল ভাল। সেখানে সঙ্গীত দল ছিল! মাদু, আহা সে যদি এখানে থাকিত। জ্যাক আরও ভাবিল উন্নতি! তাহারই বা আশা কোথায়! এ কোথায় সে আসিয়া পড়িল! গৃহ হইতে কত দূরে? কত নয়নমণী ছাড়াইয়া, কোন্ অপরিচিত রাজ্যে সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! মা—কোথায় মা! না, জ্যাকের মার কথা মনে পড়িল! সে কারিকর হইলে মার দুঃখ ঘুচিবে, মার আনন্দ হইবে। মার সুখের জন্য এ কষ্টটুকু আর সহ্য করিতে পারিবে না? নিশ্চয় পারিবে! এ দুঃখ ও কষ্ট সে গ্রাহ্যই করিবে না! নিজের সুখের কথা সে আর ভাবিবে না।

বিছানায় পড়িয়া কিন্তু সেই কথাই তাহার বার বার মনে পড়িতে লাগিল—মার মুখ, মার হাসি, মার স্নেহ! এ জীবনে আর কি সে সব সে ফিরিয়া পাইবে!

বাহিরে তখন লাবার্স্যাদর উচ্চকণ্ঠে গান ধরিয়াছে,—

"চল মৃদু বায়ে ধীরে তরী বেয়ে,
চল গো ফ্রান্সে, গান গেয়ে গেয়ে—"

ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

যোগাদ্যা।

(তরুদত্ত)

(১)

সকাল বেলাতে শাঁখারি চলেছে হেঁকে,—
"শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা!"
সকালের আলো সকল অঙ্গে মেখে
ছেলে ওঠে রাঙা পথটি গাঁয়ের বাঁকা।
রাঙা সেই পথ—বরাবর গেছে চ'লে
ক্ষীরের জন্য বিখ্যাত ক্ষীর-গাঁয়ে;
দুই পাশে তার গোচর-ভূমির কোলে
ঘন ঘাসে গরু চরিছে ডাহিনে বাঁয়ে।
গরু ও বাছুর ঘন কুয়াসায় ঢাকা
ভাল ক'রে যেন জাগেনি ঘুমের ঘোর;
সহসা রৌদ্র ফুটিল আধীর মাখা,—
রামধনু রঙ,—শোভায় নাহিক ওর।

(২)

গাছপালা হতে শিশির টোপায়ে পড়ে,
কুঁড়ি কুঁড়ি ফুলে ভ'রে গেছে যত শাখা;
চড়ুই নাচিয়া ধান খুঁজিছে খড়ে।
"শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা!"
ফিরিওলা হেঁকে ফিরিছে গাঁয়ের মাঝে,
মানুষ এখনো চলে না তেমন বাটে;
দু'একটি লোক ভিন্ গাঁয়ে যায় কাজে,
চাষী যায় ক্ষেতে, রাখাল চলেছে মাঠে।
পাঠশালে পোড়ো মন্থরগতি চলে,
ডাবা ডাবা দুই চক্ষে কাজল আঁকা;
শাঁখারির হাঁক কর্ণে কেহ না তোলে
"শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা!"

(৩)

পথের প্রান্তে দীঘি সে বিপুল কায়,—
স্বচ্ছ বিমল হ্রদের মতন ঠাট;
কলস গাছ তিন দিকে করে ছায়া,
তিন দিকে গাছ একদিকে শুধু ঘাট।
বাঁধা সে ঘাটটি,—পাথর-বাঁধানো সিঁড়ি,
ঝকঝক করে চাঁদনি ঘাটের পাকা,
চাঁদনির তলে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি,
প্রভাতের আলো খিলানে খিলানে আঁকা।
বসেছিল সেথা আয়ত-লোচনা নারী,—
কালো কেশ-ভার ভূমিতে পড়েছে লুটে;
শাঁখারির ডাক কর্ণে পশিল তারি,—
উৎসুক তার আঁখি ইতি উতি ছুটে।

(৪)

"শাঁখা চাই! ভাল শাঁখা নেবে? ওগো মেয়ে!
তোমার হাতে মা খাসা মানাবে এ শাঁখা;
তারি কারিকুরি, দেখ তুমি, দেখ চেয়ে,
এ শাঁখা যে পরে হয় না সে দুর্ভাগা।—
বিধবা না হয় এ শাঁখা যে নারী পরে
স্বামীর সোহাগ অটুট তাহার থাকে;
অক্ষয় হ'য়ে থাকে মা এ শাঁখা করে,
সতীনত্ব এ,—নানান্ ভণ্ড এ রাখে;
হাতে দিয়ে দেখ,—দেখি মা তোমার হাত"—
কৌতুক ভরে হস্ত বাড়াল নারী,
"ঠিকটি হয়েছে,—মিলে গেছে সাথে সাথ।
যেমন হাত, মা, শাঁখাও যোগ্য তারি।"

(৫)

সোনালি রৌদ্রে,—দেখিতে শাঁখার শোভা,—
হাতখানি তুলে ধরিল সহসা নারী;
নিরখি দেখিতে সেই শোভা মনোলোভা
শাঁখারির বুক কাঁপিয়া উঠিল ভারী।

সুন্দরী বটে!—তবু সে রূপের পানে
চাহিতে আপনি আঁখি নত হ'য়ে আসে;
সে রূপ নয়নে চয়নেরি পানে টানে,—
প্রাণ ভরে আধ বিস্ময়ে আধ-ত্রাসে!
গ্রীবার হেলনে সামালি' চুলের রাশি,
"শাঁখার মূল্য?" পুছে শাঁখারিরে নারী;
দাম শুনি' শেষে, খুসী হ'য়ে কহে হাসি'
"পাবে যাছা দাম,—যাও আমাদের বাড়ী।"

(৬)

"বাড়ী? কোন্ পাড়া? দাম নেব বাড়ী যেয়ে?
না, না,—সন্দেহ তোমারে আমি না করি;
মা লক্ষ্মী তুমি ঘরাণা ঘরের মেয়ে,—
দেখে মনে হয় রাণী রাজ্যেশ্বরী।"
"না বাছা, পড়েছি আমি গরীবের হাতে,
রাজরাণী নই আমি ভিখারীর নারী;
বাপের ভিটায় ঘুঘু চরে বাপের ভাতে,
এ গাঁয়েতে বাপু আমার বাপের বাড়ী।
সোনার ফলল—ওই যে—গাছের ফাঁকে,—
দেখিতে পেয়েছ?—ওই আমাদের ঘর;
বাবা ঘরে আছে, বল গিয়ে তুমি তাঁকে,—
কড়ি পাবে, দেরী হবে না, নাহিক ডর।"

(৭)

"ও যে দেউল গো" "দেউলেই মোরা থাকি,
ওই দেউলের পূজারী আমার পিতা;
তিনি কানে খাটো, জোরে তাঁরে ডেকো হাঁকি'
জোরে না ডাকিলে তাঁরে বাপু ডাকা বৃথা।
দেখা হ'লে পরে, ব'ল,—'খামখেরা ঘাটে
কন্যা তোমার কিনিয়া পরেছে শাঁখা,
দাম সে তাহারি কড়ি তো ছিল না গাঁটে,
তাই সে পাঠালে চাহিতে শাঁখার টাকা।'...
দাম তো পাবেই, আর পাবে পরসাদ,
অমুক কেউ ফেরেনা মোদের বাড়ী;

অতিথি দেখিলে বাবার যে আহ্লাদ,—
না খাওয়ায়ে তিনি কিছুতে ছাড়েন না ছাড়ি'।

(৮)

"হাতে তাখ, যদি শোনো, ঘরে নেই কড়ি,
তা' হ'লে পিতারে ব'ল মোর নাম ক'রে,—
প্রতিমার ঘরে কাঁপিতে যা' আছে পড়ি',
—সে টাকা আমার, তাই যেন তান্ ঘরে;
শাঁখার মূল্য তাতেই কুলায়ে যাবে;
এস বাছা, তবে,—বেলা হ'ল নাহিবার।"
মুগ্ধ শাঁখারি পথে যেতে যেতে ভাবে,—
'মধু মাখা কথা—জনমে সে তোলা ভার।'
ক্রমে গ্রাম-পথে শাঁখারি অদর্শন,
ঘাটের সোপানে নামিতে লাগিল নারী;
নিরমল জল করিল আজিগন
পদ্মের মত চরণ দু'খানি তারি।

(৯)

অবলা বলিয়া সে নহেক বলহীনা,
শকতির জ্যোতি সকল অঙ্গে তার;
তবুবারি সম প্রখরা অথচ ক্ষীণা,
পূর্ণ উরস, তনু বিদ্যুৎ-সার।
কুন্তল-কালো-মেঘে-ঘেরা মুখখানি
আঁকিতে সে পটু পটুয়ার মানে হার।
সে রূপ কেমনে বাখানিব নাহি জানি
গৌরব-ভঙ্গ প্রদ্যোত দ্যুতি-হার!
শান্ত সে আঁখি হেরে যবে উত্তাসে
তার আগে আঁখি তুলিতে সাধ্য কার?
রাজা মহারাজা সে দিঠিরে ডর বাসে,
পথের ভিখারী শাঁখারী সে কোন্ ছার?

(১০)

শাঁখারি চলেছে বাঁকা পথখানি ধ'রে,
আম কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় একা;

সোনার কলস ঝলসে দেউল 'পরে,
পূজারীর ঘর থাকে তার বাম দেখা। ৫৫৮
খালা ঘরখানি! দুয়ার রয়েছে খোলা;
ডাহিনে গোহাল, বাঁয়ে পোয়ালের গাদা।
আঙিনার কোণে একটি ধানের গোলা,
ছাতা জবা গাছ, করবী—রাঙা ও শাদা।
'টুং টাং' বাজে ঘণ্টা গরুর গলে,
মরা'য়ের পাশে চড়ুই শালিক নাচে;
অতিথি-পথিকে মিলি' সবে যেন বলে
'সুখ এই খানে,—শান্তি সে হেথা আছে।'

(১১)

"শাঁখা চাই,—শাঁখা!" হাঁকিল শঙ্খ-বেনে,
স্বর শুনি' ঘরে পূজারি এলেন ছুটে;
ডাকিলেন দ্বিজ তারে অদূরে জেনে,—
শাঁখারির মুখে আহ্লাদে হাসি ফুটে!
ডাকেন বিপ্র "শাঁখারি দাঁড়া রে দাঁড়া,
অতিথি আজিকে হ'তে হবে মোর ঘরে;
মায়ের প্রসাদ—নেমেছে ভোগের হাঁড়া,—
আয় বাপু, আয়, কোথা যাবি দু'পহরে?
ঠাকুরের ভোগ,—তা'তে বামুনের বাড়ী,
হাত মুখ ধুয়ে ব'সে পড় পাত পেতে;
বেলাও দু' প'র,—ঠাণ্ডা ক'রে নে নাড়ী,
ভিন্ গাঁয়ে যাবি,—কতদূর হ'বে যেতে।"

(১২)

কহিল শাঁখারি "ঠাকুর দণ্ডবৎ,
কাজের বরাতে এসেছি তোমার কাছে;—
তবু জানি মনে,—ভেবেছি সারাটা পথ,—
বামুন বাড়ীর প্রসাদ কপালে আছে।
পাঁচ খানা গাঁয়ে গরীব অনাথ যত
সবাই জেনেছে দুয়ার তোমার খোলা;
পাঁচ খানা গাঁয়ে কে আছে তোমার মত?
তোমার জন্যে স্বর্গে দুলিছে দোলা।
ভাল কথা,—আগে, যে কাজে এসেছি শোনো,
কন্যা তোমার পরেছে দু' গাছি শাঁখা;
দাম তার—এই,—তাড়াতাড়ি নেই কোনো,
তবু জিজ্ঞাসি'—আছে তো নগদ টাকা?

(১৩)

"খুব ভাল শাঁখা,—ভরা সে মীনার কাজে,—
তাই অত দাম।" "সে কিরে আমার মেয়ে?
কি বলিস্ তুই? কি বকিস্ তুই যাজে?"
"তোমারি তো মেয়ে, চল না দেখিবে যেয়ে,—
নাহিছে সে ওই পাথর-বাঁধানো ঘাটে,—
ভাগর চক্ষু,—সেই তো পরেছে শাঁখা।"
হাসিয়া পূজারি কহে "তাই নাকি? বটে!
বাপু হে! তোমার সকল কথাই ফাঁকা।
কন্যা আমার হয় নাই এ জীবনে,
এক সন্তান,—তাও সে কন্যা নয়;
নিশ্চয় তোরে ঠকিয়েছে কোনোজনে;—
ধরা সে পড়িবে,—সেই তোর কোনো ভয়।"

(১৪)

"বল কি ঠাকুর? মোরে ফাঁকি দিয়ে গেছে?
ঠকাবার মত চেহারা তো তার নয়;
তোমারে সে চেনে,—আর সে যে বলে দেছে,
বলিস্ বাবাকে, টাকা যদি কম হয়,—
ঠাকুর ঘরের ঝাঁপি খুলে যেন দেখে,
তাতে আছে টাকা," "দাঁড়া, বাপু, দাঁড়া, দেখি।"
ঘরে গেল দ্বিজ,—শাঁখারীরে, দ্বারে রেখে;
ফিরে এসে, বলে, "তাই ত! তাই ত! এ কি!
শাঁখার যে দাম বলেছিস্ তুই মোরে,—
ঝাঁপি খুলে দেখি রয়েছে যে ঠিক তাই।
ঠিক পুরাপুরি, কম বেশী নাই, ওরে!
কম বেশী নাই একটা পয়সা নাই।

(১৫)

"অবাক! অবাক! বিস্ময় মানি মনে।
ধন্য শাঁখারি! জনম ধন্য তোর!
ব্রহ্মা বিষ্ণু পড়ি' যার শ্রীচরণে,
তার হাতে বেঁধে দিলি অক্ষয় ডোর।
বুড়া হ'য়ে গেনু পূজা অর্চ্চনা করি,—
তবু দরশন পাই নাই আজো আমি;
ব্রত উপবাস করিনু জনম ভরি,
ঝাপ্‌সা দু' চোখ,—সাধনে জাগিয়া স্বামী;
দেউল আগুলি গোঁয়ানু,—খোয়ানু দিন
সে ছবি অতুল আজো না দেখিনু চোখে।
কি দোষে না জানি মোরে দেবী দয়াহীন
না জানি কি গুণে অভয়া সদয় তোকে!

(১৬)

"অবাক! অবাক! দেখা যদি পেলি তার
বর মাগি' কোন্ পুণ্যালি অনন্তায়?
চতুর্বর্গ করতলে সদা যার,—
তার কাছে তুই চাহিলি শাঁখার দায়?
বুঝেছি, বুঝেছি, চেয়ে সেই চাঁদমুখে
হ'য়ে গিয়েছিলি বুঝি বচন-হারা।"
চমকে শাঁখারি,—স্পন্দন জাগে বুকে,—
নয়নে দীপ্তি,—চিত্তের মাঝে সাড়া।
হাত হ'তে তার খসিল শাঁখার পেটি,
যে পথে এসেছে ছুটিল সে পথ ধরি'
তবে তো সে আজ দেবীরে এসেছে ভেটি',
আনন-লোচনা—সে তবে মহেশ্বরী!

(১৭)

হরিণের বেগে ছুটিল শঙ্খ-বেণে,
পিছে পিছে ধায় দেবল স্খলিত-গতি;
ঘাটে পৌঁছিয়া চাহে বিস্ময় মেনে,
ধামসেরা ঘাটে নাই লাবণ্যবতী।
নীরব পাখীরা নাহিক কলধ্বনি,
নির্জ্জন দীঘি সারস ঝিনায় একা;
সুপ্ত বাতাসে উঠে মৃদু রণরণি'
পদ্ম-ফুলের ক্ষীণ সৌরভ-লেখা!
হাঁকিল শাঁখারি পূজারি ডাকিল কত,
নাই সাড়া নাই, বুকে নাই স্পন্দনই!
স্থলজল মূক—মুগ্ধ—মূর্চ্ছাগত
ঘুমায়ে বুঝিবা পড়েছে প্রতিধ্বনি।

(১৮)

দিন দু'পহরে নিশীথের নীরবতা!
নীরব ভুবনে আলো ঝলমল করে;
আশাহত হিয়া—আকুল প্রাণের কথা
করে নিবেদন দেবল মৃদুল স্বরে,—
"জননী! জননী! দেখা দে মা একবার,
মম হৃদয়ে রয়েছি মা পথ চেয়ে;
শূন্য ফিরিব? দয়া কি হ'বে না আর?
দয়া কি হবে না? ওগো পাষাণের মেয়ে!
অযাচিত দেখা দিছিস্ যেমন আজি
আরেকটিবার দেখা দে তেমনি ক'রে;
স্বপন, চোখের ভ্রম, কি তোদের বাজী—
না যদি হয় গো, দেখা দে মূরতি ধ'রে।

(১৯)

"দৈববাণীতে বিদ্যুৎরূপে কিবা
জানায়ে যাও মা আপন আবির্ভাব;
সমীরণ সম সমীরিয়া যাও শিবা
পরাণে বিথারি' অনুপম পরভাব!"
সহসা শঙ্খ-বলয়িত কার পাণি
জাগিয়া উঠিল পদ্মদীঘির বুকে!
তার পরে ধীরে নমর সে হাতখানি
হ'ল তিরোহিত;—চক্ষেরি সম্মুখে!
শাঁখারি পূজারি—অবাক হইয়া রহে
বার বার তারা প্রণমে দেবোদ্দেশে,

ধামসেরা ঘাটে পদ্ম আহরি' যোরে
নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল দিনশেষে।

(২০)

দিন চলে গেছে,—গেছে শতাব্দী কত
আজো ক্ষীরগাঁয়ে হারায়ো বাঁশী মেলে,
যবে দিতে আসে শাঁখা পূর্ব্বের মত
সেই শাঁখারির বংশের কোনো ছেলে ;
হরষে তাহারা দেবীরে যোগায় শাঁখা
বরষে বরষে আসি' দেউলের দ্বারে,
যদিও তাদের এখন অনেক টাকা,—
ধনী তারা শাঁখা পরায়ে যোগাদ্যারে !

ধনী তারা নাকি দেবীর নিয়োগ পেয়ে !
দেবীর প্রসাদে দুঃখ গিয়েছে ঘুচি' ;
দুধে ভাতে আছে শাঁখারির ছেলে মেয়ে
আঁচলে বেঁধেছে পরশ মণির কুচি !

•

কাহিনী এ মোর—অদ্ভুত অতিশয়,
মিলে না এ মোটে নবাযুগের সাথে ;
যাঁর মুখে শোনা স্মৃতি তাঁর মধুময়
তাঁরে স্মরি' এরে রেখেছি খাতার পাতে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।*

ফরাসী দার্শনিক ভিক্টর কুঁজাঁ রচিত দার্শনিক গ্রন্থখানি সম্প্রতি বঙ্গভাষায় অনূদিত করিয়া শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে একটী অপূর্ব্ব রত্ন উপহার দিলেন !

ইউরোপীয় জাতিগণের স্বদেশপ্রীতি দেখাইবার একটী প্রধান উপায় তাঁহারা বিদেশীয় সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়া জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডার পরিপুষ্ট করেন। মাতৃভাষা অলঙ্কৃত করিতে জ্যোতিরিন্দ্র-বাবুর এই যে বৈদেশিক সকল প্রয়াস ইহা তাঁহাকে একজন একনিষ্ঠ স্বদেশসেবক আখ্যা প্রদান করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি তাঁহার আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন তিনিই বুঝিবেন যে অনুবাদকালে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু কি কঠোর পরিশ্রম, গভীর অনুসন্ধিৎসার এবং প্রচ্ছন্ন স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দিয়াছেন।

কুঁজাঁর রচনার বিশেষত্ব প্রাঞ্জলতা, সুললিত রচনবিন্যাস ও মনোরম তর্কপ্রণালী। জ্যোতিবাবু অনুবাদকালে বিশেষ যত্নসহকারে যাহাতে তাঁহার বক্তব্য অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য-প্রকাশের আস্ফালনে কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হইয়া না পড়ে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়াছেন।

গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত। সত্য সুন্দর ও মঙ্গল, এই তত্ত্বগুলি পর্য্যায়ক্রমে খণ্ডত্রয়ে আলোচিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড যুক্তি তর্কের সমাবেশে অপেক্ষাকৃত নীরস বোধ হইলেও, ধৈর্য্যসহকারে যাঁহারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের পাঠ সমাপ্ত করিবেন, তাঁহারা

---

* ভিক্টর কুঁজাঁর ফরাসী হইতে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীনগেন্দ্রগোপাল চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

নিশ্চয়ই আনন্দলাভ করিবেন। দার্শনিক গ্রন্থের বিশেষতঃ কুর্ঁ্যার ন্যায় একজন মৌলিক চিন্তাশীল মনীষীর মতবাদ সংক্ষিপ্ত-ভাবে প্রকাশ করিতে আমরা অক্ষম। কিন্তু যাঁহারা এই অপূর্ব্ব প্রতিভাবান্ লেখকের চিন্তা প্রণালীর সহিত পরিচিত হইতে অভিলাষী, তাঁহারা কুর্ঁ্যার মত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য কি।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আত্মা ও বাহ্য জগৎ এই অসীম কারণ-দ্বয়ের পার্থক্য এবং উভয়ের সহিত অসীম কারণের পার্থক্য কুর্ঁ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দুই সসীম কারণ—অসীম কারণের প্রকারভেদমাত্র স্পাইনোজার এইরূপ (Spinoza) মত। কিন্তু কুর্ঁ্যার মত তাহা নহে। তিনি বলেন উহারা স্বাধীন শক্তি। উহাদের ক্রিয়াশক্তি • উহাদের আত্মত্ব। স্বাধীন অসীম সত্তার সম্বন্ধে এইটুকু ধারণাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তবে, তাঁহার মতে, এই সসীম সত্তা সেই পরম কারণপ্রসূত। উহারা পরম কারণের সহিত কার্য্যসম্বন্ধে আবদ্ধ। কুর্ঁ্যা যে ঈশ্বরের কথা বলেন, তিনি সেই ঈশ্বর—বিশ্ব-ব্রহ্মবাদীগণের ঈশ্বর নহেন, অথবা Eleactics সম্প্রদায়ের ঈশ্বর নহেন। তিনি যে ঈশ্বরের প্রতিপাদন করেন, সে ঈশ্বর ক্রিয়াশীল, সৃজনশীল, ও তাঁহার সৃজনশীলতা অবশ্যম্ভাবী হইলে তিনি সেই অবশ্যম্ভাবিতার অধিকারী হন—এই যুক্তির উত্তরে কুর্ঁ্যা বলেন যে প্রকৃত পক্ষে এই অধীনতা অধীনতাই নহে। ইহা স্বতঃ পূর্ত্ত স্বাধীনতার উচ্চতম রূপ।

আমাদিগের উপনিষদোক্ত উপদেশের সহিত তাঁহার এই মতের সামঞ্জস্য আছে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র কুর্ঁ্যার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কিনা তাহা আমরা জানিনা।

জ্যোতিরিন্দ্রবাবু এই বিরাট যুক্তিতর্কপূর্ণ বিশাল গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। শুধু এই গ্রন্থ নহে, বহু বিদেশীয় ও সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন। প্রায় সমুদয় নাটকেরই সে অনুবাদ গ্রন্থগুলি রচনা-ভঙ্গীতে মৌলিকের সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে বলিয়াই আমাদিগের বিশ্বাস। এই অক্লান্ত সাহিত্যসেবী যে পরিমাণে বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবর্দ্ধনে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহার যোগ্য সম্যক সমাদর বাঙ্গালী তাঁহাকে প্রদান করে নাই, ইহা

আমাদিগের জাতিগত দুর্ব্বলতার আর একটি নিদর্শন পরিচয়। কিন্তু এ দুঃখ কি ঘুচিবে না? গুণের আদর করিতে এখনও আমাদিগের ত্রুটি থাকিবে?

এই অবসরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন সম্বন্ধে মোটামুটি দু এক কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

যে বয়সে লোকে অবসরের সন্ধান করেন,—শুধু সন্ধান নহে যে বয়সে জীবন রক্ষার পক্ষে অবসর একান্ত প্রয়োজনীয়—সেই বার্দ্ধক্যের সীমায় ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াই জ্যোতিবাবু যে অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত বিদেশীয় ও সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার হইতে বহুমূল্য রত্নাদি বঙ্গসাহিত্যের জন্য সঞ্চয় করিতেছেন—সে অধ্যবসায় আদর্শস্থানীয়। সাহিত্য-সাধনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আনন্দ নহে—সাহিত্য-সাধনা তাঁহার জীবনের আরাম। বহুদিন হইতে তিনি বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান—সমগ্র জীবন যেন তিনি বঙ্গসাহিত্যের সেবায় ঢালিয়া দিয়াছেন। লক্ষ্মীর বরপুত্র, অথচ ভোগ নাই, বিলাস নাই, অত্যন্ত সাদাসিধা চাল—সদাশয়, কলাকুশলী, মিষ্টভাষী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থপাঠ ও রচনাতেই নিমগ্ন আছেন! তাঁহার জীবন পুণ্যময় সাধনার জীবন। বাঙ্গালী সাধারণ—শুধু বাঙ্গালী কেন—শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে অনুকরণীয়। তাঁহার জীবনের আর একটি শিক্ষণীয় গুণ—অপূর্ব্ব বিনয় ও অকপট সরলতা। অনাড়ম্বর জীবনপ্রথা বাঙ্গালার মাটিতে একান্ত বিরল। যিনি একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তিনিই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শৈশব হইতেই কলা-বিদ্যার প্রতি অনুরাগী। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ "পুরুবিক্রম" নাটক শৈশবেরই রচনা—সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকর্ত্তৃক তাৎকালীন "বঙ্গদর্শনে" সবিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত "সরোজিনী" "অশ্রুমতী" প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যের অলঙ্কারস্বরূপ। বঙ্গসাহিত্যে তিনিই প্রথম ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। তাঁহার রচিত "অলীক বাবু" "দায়পড়ে দারগ্রহ" প্রভৃতি প্রহসন বিশেষ আদৃত গ্রন্থ। শুনিয়াছি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহেই কবিবর রবীন্দ্রনাথ প্রথম সাহিত্য-সেবায় অনুপ্রাণিত হন। "ভারতী" সম্পাদিকা রচিত প্রথম উপন্যাস "দীপ-নির্ব্বাণ" জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহেই রচিত বলিয়া শুনিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাদি কিম্বা অন্য সদ্গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহা গৃহের মহিলাগণের নিকট সাগ্রহে পাঠ করিয়া শুনাইয়া পরিবারে সাহিত্যানুরাগ সঞ্চারিত করিতেন।

চিত্রবিদ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিশেষ দক্ষতা আছে। তিনি একবার যাঁহাকে মনোনিবেশসহকারে দেখেন, কয়েকটি রেখাপাতেই তাহার মুখের একটা মোটামুটি চিত্র আঁকিয়া দিতে পারেন। ইহারই ফলে কবি ৺ বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর রেখাচিত্র লাভে আমরা সমর্থ হইয়াছি, বিহারীলালের অন্য চিত্র নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গীতপারদর্শিতা দেশ-প্রসিদ্ধ। তাঁহারই প্রচেষ্টায় "ভারত সঙ্গীত সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং সঙ্গীত-চর্চ্চা যাহাতে দেশব্যাপী হয়, সে বিষয় তিনি যথেষ্ট

আয়াস করিয়াছেন। শুধু যে তিনি ভারতীয় সঙ্গীতে পারদর্শী তাহা নহে, বৈদেশিক সঙ্গীতশাস্ত্রেও তাঁহার সবিশেষ অধিকার আছে। তাহারই ফলে আমরা "ইটালিয়ান মিক্সিচ" শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। প্রাচ্য সুর পাশ্চাত্য 'টোন' গীত হইলে কি সুমধুর হয়, তাহা তাঁহারই সুর দেওয়া কবিবর রবীন্দ্রনাথের গানগুলি শুনিলে স্পষ্ট বুঝা যায়—সেগুলি তাঁহার অসামান্য সুরজ্ঞানের পরিচায়ক।

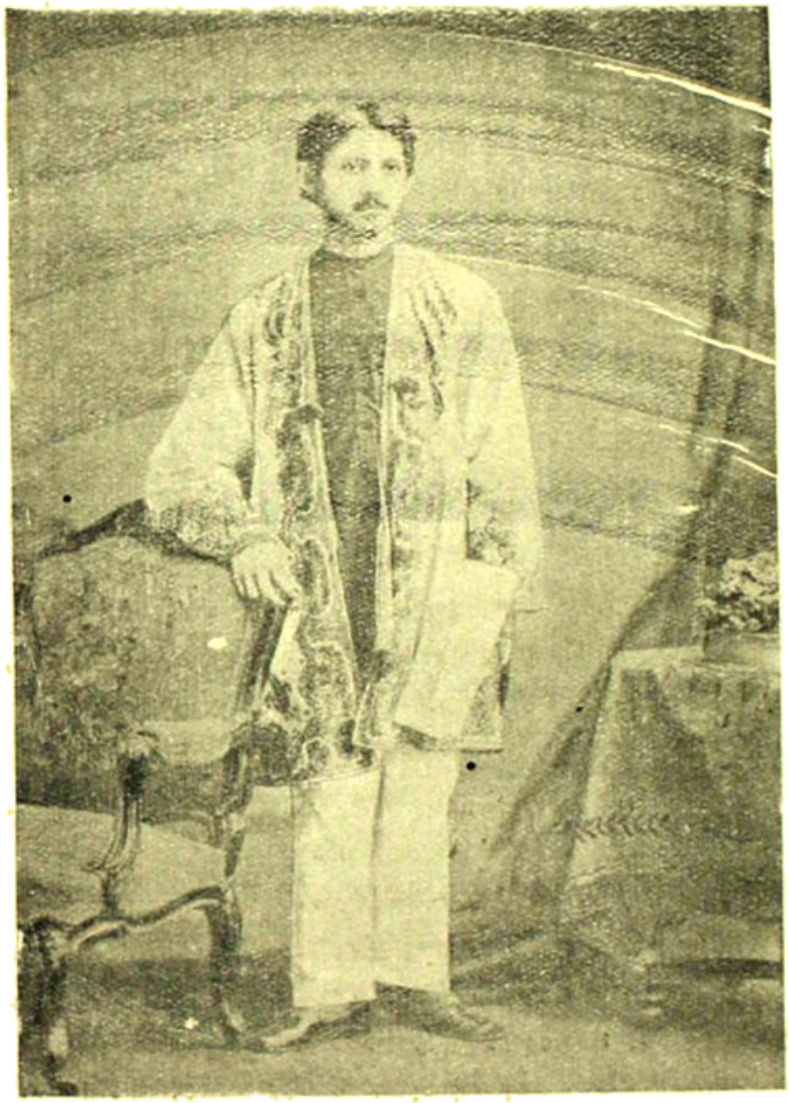

অধুনাপ্রচলিত সাঙ্কেতিক স্বরলিপির প্রথম প্রবর্তক ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও রাজা শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। প্রাচীনকালে কবির কাব্য যেমন শ্রুতির সাহায্যেই বংশ-পরম্পরায় চলিয়া আসিত সঙ্গীতও তেমনিভাবে চলিয়া আসিত। আমাদের গায়কেরা গানের ভাবে তন্ময় হইয়া গান গাহিতেন—সেই গান শুনিয়া শ্রোতা সুর আয়ত্ত করিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই স্বরলিপি প্রথার কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া সরল ও আধুনিক স্বর-লিপি প্রথার সৃষ্টি করেন।

সৌরীন্দ্রমোহনের পদ্ধতিকে দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। যথা সা রা গা। মাথায় দণ্ড দিয়া মাত্রার চিহ্ন দেওয়া হইত। পরে শূন্যমাত্রিক স্বরলিপিপ্রথা প্রবর্ত্তিত করেন, দ্বিজেন্দ্র-নাথ। যথা স ০ ০ ০ র ০ গ ০। সংখ্যা-মাত্রিক স্বরলিপি প্রথা-প্রবর্ত্তন করেন জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ। যথা—স^{১} র^{২} গ^{৩}। এই প্রথা বেশ সরল, শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজবোধ্য। জ্যোতিরিন্দ্র-

মাঘের পর শ্রীমতী প্রতিভা দেবী, শ্রীমতী সরলা দেবী ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী এবং পরে অনেকেই এই প্রথার অনুসরণ করিয়াছেন।

দেশের প্রতি তাঁহার অনুরাগ অপরিসীম। সে অনুরাগ শুধু রচনার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। নানাকার্য্যের মধ্যে তাহা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্ব্বেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ

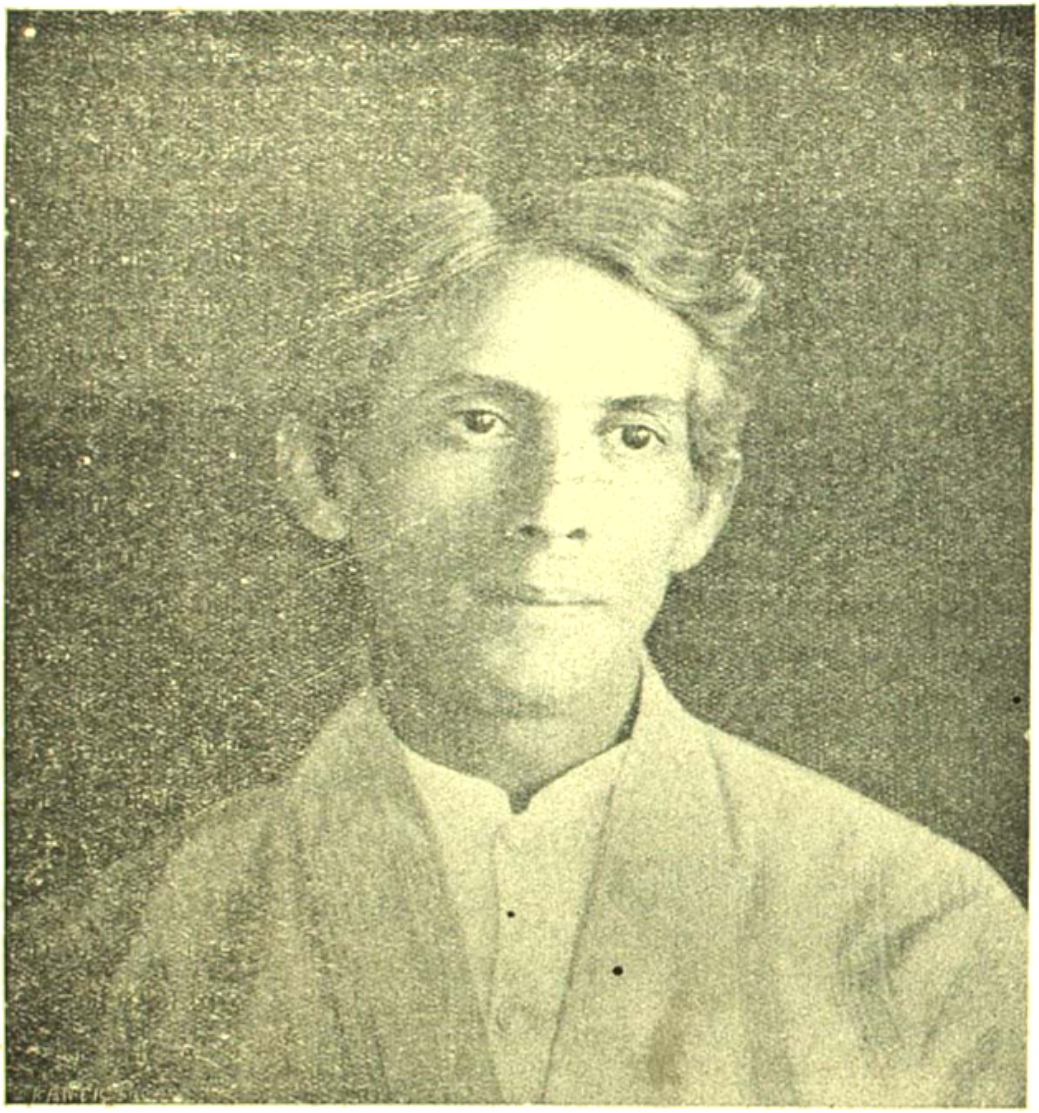

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তদানীন্তন কৃতবিদ্য উদ্যোগী যুবকগণ হিন্দুমেলার প্রবর্ত্তন করিয়া দেশের জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশী শিল্পের প্রতি অনুরাগ-সঞ্চার ও শিক্ষাবিস্তারের উপায় করিয়া দেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই চেষ্টায় বরিশাল অঞ্চলে দেশীয় পরিচালিত প্রথম ষ্টীম লাইন প্রতিষ্ঠিত হয়। সে লাইন বিদেশীয় প্রতিযোগিতায় অবশ্য অকালে উঠিয়া যায়—ইহাতে তাঁহাকে বহু

আর্থিক কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু উদ্যোগী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত বা নিরুদ্যম হইয়া পড়েন নাই।

দেশের প্রায় প্রত্যেক সদনুষ্ঠানে তৎকালে তিনি অগ্রণী ছিলেন। স্বদেশী সভার প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি আত্মীয় বন্ধুসমাজে স্বদেশানুরাগের বীজ অঙ্কুরিত করেন। শুনিয়াছি, ভারতী সম্পাদিকা রচিত "স্নেহলতা" উপন্যাসে নব্যযুবকবৃন্দের পরিচালিত যে সভার উল্লেখ আছে, সে সভার চিত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশীসভার আদর্শ অবলম্বনে রচিত। ইহা হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৈশোরজীবনের একটা মোটামুটি পরিচয়ও আমরা পাইতে পারি।

এক্ষণে আমরা তাঁহার বিস্তারিত জীবন-চরিত লিখিতে বসি নাই—এবং এখন তাহা সঙ্গতও নহে—তাই অল্প কথায় তাঁহার জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয়মাত্র দিলাম। তাঁহার শরীর নীরোগ হউক এবং এখনও বহুবর্ষ ধরিয়া তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য জগৎ সুললিত রচনায় অলঙ্কৃত করিতে থাকুন, তাঁহার মিষ্ট সুরে বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস ভরিয়া থাকুক, ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

কন্‌গ্রেস।

এবার পাঁচ বৎসর পরে আবার কলিকাতা মহানগরীতে ইহার ষড়বিংশতিতম অধিবেশন হইল। বৎসর বৎসর বিশাল ভারতবর্ষের নির্ব্বাচিত স্থানে এই জাতীয় সভার অধিবেশন আজ পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরিয়া হইয়া আসিতেছে। তিন দিনের অধিবেশন, তাহাতেই দেশের মঙ্গল, অমঙ্গল, সংস্কার, কুসংস্কার, শিক্ষার অভাব এবং প্রভাব, রাজার ন্যায়ান্যায়, প্রজার দাবী দাওয়া, শিক্ষা বাণিজ্য, রাজনীতি ধর্ম্মনীতি সমাজসংস্কার সকল বিষয়েরই আলোচনা আন্দোলন হয়—স্বতঃই মনে প্রশ্নের উদয় হয়—ইহাতে কার্য্যতঃ ফলতঃ কোন উপকার হইতেছে কিনা, জাতীয়তার বন্ধন আত্মীয়তার বন্ধনের ন্যায় দৃঢ় হইতেছে কি, না কেবলি বক্তৃতার উত্তেজনা ক্ষণিকের জন্য হৃৎপিণ্ডের দ্রুত রক্ত সঞ্চালন সঞ্চার করিয়া চির অবসান লাভ করিতেছে? তিনদিনের এ উৎসবোৎসব, প্রবাসীর প্রত্যাগমন আনন্দের এই মিলন মন্দির, শক্তি সঞ্চয়ের উদ্বোধন জাতীয়তার বন্ধন দৃঢ়তর করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। যখন অহংগর্ব্বিত রাজপ্রতিনিধির নিষ্ঠুর আজ্ঞায় বঙ্গ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল তখন যে বেদনা কেবল মাত্র বাঙ্গালীর বক্ষে বাজে নাই, তাহা আমাদের পাঞ্জাবী মহারাষ্ট্রী মাদ্রাজী ভ্রাতার বক্ষেও বেদনার সহানুভূতি জাগাইয়া তুলিয়াছিল। বঙ্গব্যবচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ বঙ্গের সাহায্য করিয়াছিল! আজ প্রজাবৎসল রাজার অনুশাসনে আবার বিখণ্ডিত বঙ্গ একত্র হইয়াছে তাই আজ বঙ্গের আনন্দে প্রত্যেক ভারতবর্ষীয় আনন্দিত। যখন দেখিতে পাই উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে হাইদ্রাবাদের জল প্লাবনে পঞ্জাবের মহামারীতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক

প্রদেশে বেদনা সঞ্চারিত হয়, আর্ত্ত আতুরের সাহায্যের জন্য দেহ হস্ত প্রসারিত হয়, মঙ্গল সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার-চেষ্টায় সকলেই এক প্রাণ এক মন হইয়া সমর্থন করে, তখনি এই জাতীয় সম্মিলনের সার্থকতা বুঝিতে পারি।

যখন দেখিতে পাই সুদূর আফ্রিকার দক্ষিণতম প্রান্ত, আমেরিকা, কেনেডা হইতে প্রবাসী ভারতবর্ষীয় এই সম্মিলনে স্বীয় দুঃখ জ্ঞাপন করিতে আসিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া যাননা তখন আর এ জাতীয় সম্মিলনীর উপকারিতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। তবে সর্ব্ব প্রথমে যে কার্য্য প্রণালী অনুসৃত হইত ক্রমে তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইতেছে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা নিতান্ত আবশ্যক ছিল আজ তাহার আর সার্থকতা নাই। আবেদন নিবেদনের দিন গিয়াছে, আন্দোলন উত্তেজনার আবশ্যক হ্রাস হইয়া আসিতেছে, এখন নিয়ত চেষ্টা, অক্লান্ত অধ্যবসায়, নিশ্চল নিষ্ঠার সহিত জীবনের ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে—পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতার প্রভাবে আমাদের মনে স্বদেশ প্রীতির যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে তাহাকে সঞ্জীবিত ও বর্দ্ধিত করিতে হইলে আর রাজ-দ্বারে আবেদনের ডালি বহিয়া সময় ক্ষেপ করিলে চলিবে না। তাহার জীবন সিঞ্চন দেশের অন্তরতম অমৃতকূপ হইতে সঞ্চয় করিতে হইবে; আমাদের পিতৃপিতামহ আমাদের যে সকল শ্রেষ্ঠতম বিষয়ে অধিকারী করিয়া গিয়াছেন তাহারি ঐশ্বর্য্য বলে সবল দৃঢ় এক প্রাণ হইয়া দেশের কাজে জীবন নিয়োজিত করিতে হইবে। রাজাদেশ যতদূর অনুকম্পা প্রকাশ করিতে পারে তাহাত করিয়াছে এখন আত্মচেষ্টা কি করিতে পারে তাহারি পরীক্ষা। যে স্বদেশ ভক্ত জননায়কগণ এই সম্মিলন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেরি যৌবনকাল অতীত হইয়াছে এখন ক্রমে নব্য যুবাদিগকে দেশের কার্য্যে দীক্ষা দান করিয়া সহায় করিয়া লওয়া আবশ্যক। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যে নীতি যে নিয়ম নূতন ছিল আজ পঁচিশ বৎসর পরে তাহা প্রায় তামাদি হইতে চলিল, সে নজির এখনও চালাইতে গেলে ক্রমে দেশের কাজের ক্ষতি হওয়া সম্ভব, তাই যোগ্য শিক্ষিত, দেশনিষ্ঠ ধর্ম্মপ্রাণ নব্যদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে আহ্বান করিয়া লওয়া আবশ্যক; দেশনায়কগণ কখনই এ কর্ত্তব্যে বিমুখ হইবেন না। বঙ্গব্যবচ্ছেদের বেদনা দূরীভূত হইবার পর এই প্রথম জাতীয় সম্মিলনে সকলেই আশা করিয়াছিলেন প্রাদেশিক প্রতিনিধিদিগের সংখ্যা আরো অধিক হইবে, কিন্তু সুবৃহৎ মণ্ডপের অনেকাংশের শূন্যতায় এই প্রত্যাশার ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ প্রমাণীকৃত হইয়াছিল; সেই জন্যই আমরা এ কথা বলিতেছি।

গত ২৬, ২৭, ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে জাতীয় সম্মিলনীর অধিবেশন হয়, সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রতিদিনই জননী জন্মভূমির গৌরব গাথা গীত হইত। প্রথম দিন ভারতবর্ষের সুজলা শ্যামলা মাতৃমূর্ত্তির, দ্বিতীয় দিন মানব জাতির অদৃষ্ট বিধাতা যিনি—

পরিত্রাণায় সাধূনাম বিনাশায়চদুষ্কৃতাম্
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়"—

যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করেন সেই ত্রিলোকনাথের; এবং তৃতীয় দিন অতীত

গৌরবস্মৃতি ঐশ্বর্য্যের চিরন্তন ধনি হিন্দুস্থানের বন্দনা গান হইয়াছিল। সুমধুর বালিকা কণ্ঠের সহিত যুবকদিগের সুগম্ভীর কণ্ঠে যখন এই স্তবগান সকল ধ্বনিত হইত তখন হৃদয় ভক্তিপরিপূর্ণ এবং নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত। ধূপসুগন্ধ যেমন মনকে পূজার অনুকূল অবস্থা দান করে এই সকল বন্দনাগান তরুণ যুবক ও বালিকাদিগের কণ্ঠে সমস্বরে গীত হইয়া অন্তরে সেই প্রকার ভক্তি সঞ্চার করিত।

বর্ত্তমান বৎসরে জাতীয় সম্মিলনীর সভাপতি শ্রীযুক্ত বিষাণনারায়ণ ধর উত্তর পশ্চিম প্রদেশের একজন সুপণ্ডিত জন-মান্য ব্যক্তি। সাধারণের নিকট বিশেষ পরিচিত না হইলেও তাঁহাকে জানিবার সুবিধা যাহার ঘটিয়াছে তিনিই আপনাকে সৌভাগ্যবান জ্ঞান করিয়াছেন। তাঁহার সুলিখিত প্রবন্ধ সাহিত্য ভাণ্ডারের একটি বিশেষ অর্জ্জন স্বরূপ। ভাষা এবং লিখিবার ভঙ্গী চমৎকার। ইহারি সহযোগে গবেষণা, সূক্ষ্মবিচার, অপক্ষপাত, সমদৃষ্টি, ভাবের ওজস্বিতা, গভীর স্বদেশপ্রীতি, মণিকাঞ্চন সংযোগ। ভগ্নস্বাস্থ্য ক্ষীণ শরীর লইয়া সুদূর স্বাস্থ্যনিবাস ত্যাগ করিয়া জাতীয় সম্মিলনীর আহ্বানে তিনি যে তাহার সভাপতিত্বের দুরূহ ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা কেবল তাঁহার স্বদেশ ভক্তির প্রমাণ নয় ইহা জাতীয় সম্মিলনীর কার্য্যকারিতার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

রাজধানী পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে তিনি মনে করেন কলিকাতার বিশেষ কোনই ক্ষতি হইবে না, কলিকাতার প্রাধান্য, তাহার ঐশ্বর্য্য এবং মার্জ্জিত শিক্ষা বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে, ইহার কোনটিই বড় লাটের দিল্লী অবস্থানের দ্বারা নষ্ট কিম্বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, কলিকাতার যাহা ছিল তাহাত থাকিবেই দেশের লাভের মধ্যে আবার দিল্লীতে নূতন করিয়া জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইবে।

তাঁহার মতে উত্তরপশ্চিম ভারতবাসীগণ বুদ্ধিমত্তা কিম্বা চরিত্র বলে কোন অংশেই ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাদেশিকগণের অপেক্ষা হীন নহে তবে সামাজিক এবং রাজনৈতিক দুরবস্থাদোষে তাহাদের উন্নতি স্থগিত ছিল—এখনও কিছুকাল আরো অতীত না হইলে বিশেষ উন্নতির কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হইবে না। এখনও কিছু দিন নূতন রাজধানী রাজনৈতিক কার্য্যকুশলতায় কলিকাতার সমকক্ষ হইবে না সত্য, কলিকাতায় জনসাধারণের মত যে গৌরব বহন করে নূতন রাজধানীনিবাসীগণের মতামত সে সম্মান লাভ করিতে আরো কিছু কাল প্রতীক্ষা করিতে হইবে সন্দেহ নাই তবুও যখন নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানীতে নূতন সভা সমিতির অধিষ্ঠান হইবে, ঐশ্বর্য্য বাণিজ্য এবং বিলাসের আকর্ষণে, দেশদেশান্তরের বহু জনসংখ্যা সেখানে উপস্থিত হইবে, যখন তাহা গৌরবজনক রাজনৈতিক আন্দোলনের রঙ্গভূমি হইবে, তখন ইহার অধিবাসীগণের হৃদয়ের সবলসঙ্ঘ উদ্বুদ্ধ চেতনা, স্বীয় সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া একদিকে পঞ্জাব অপর দিকে যুক্তপ্রদেশকে উৎসাহে সংক্রামিত করিয়া ক্রমে ভারতবর্ষের দূরতম প্রদেশের শিরা উপশিরায় নূতন জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিতে সক্ষম হইবে। দিল্লীর সম্মুখে মহৎ গৌরবময় ভবিষ্যৎ—দিল্লীর মহত্ব সমগ্র উত্তর

ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিবে, ভারতবর্ষের জাতীয়তার প্রসার যদিও চিরদিনই বঙ্গদেশের নিকট ঋণী থাকিবে—তবুও বঙ্গদেশ হইতে দূরতার কোন ক্ষতি না হইয়া নূতন অবস্থার গুণে সমগ্র দেশ আরো লাভবান হইবে। পাঞ্জাবী এবং হিন্দুস্থানী বহুদিনের অন্যায় জড়তা পরিহার করিয়া নূতন বলে নূতন উৎসাহে প্রশস্ততর, উদারতর, বৃহত্তর, অধিকতর উত্তেজক জীবনে এবং কালে প্রবেশ লাভ করিবে।

ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীনগরীতে পরিবর্ত্তিত হইলে বঙ্গদেশের বিদ্যবংশে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা—কিন্তু যদি দিল্লীতে পরিবর্ত্তনে সমগ্র ভারতবর্ষের উপকার সাধিত হয় যদি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাসীগণের সহিত মধ্য ও দক্ষিণ ভারত লাভবান হয় তবে বঙ্গদেশের সামান্য ক্ষতি গণনীয় নহে; কেন না সমগ্র ভারতের উপকারে প্রত্যেক ভারতবাসীর লাভ; তিনি পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রী মাদ্রাজী বোম্বাইনিবাসী কিম্বা বাঙ্গালী হউক না কেন, একই কথা!

বঙ্গব্যবচ্ছেদ রহিতপ্রসঙ্গে পণ্ডিত বিপিন নারায়ণ বলিয়াছেন—"যে অধিকার লাভ করিবার জন্য বঙ্গ দাবী করিয়াছিল তাহা কেবল মাত্র বঙ্গের সম্পত্তি নয় তাহা সমগ্র ভারতের—তাই তাহার প্রার্থনা পূরণে, তাহার সিদ্ধিলাভে, ভারের জয় ঘোষণা করিয়াছে—পঞ্চ মাসের মধ্যে উর্দ্ধেই যে ন্যায়ের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত তাহা এই ঘটনায় আবার নূতন করিয়া প্রমাণিত হইল।

"বিপুল সৈন্য বলের বিরুদ্ধে বঙ্গদেশ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া অবিচলিত সাহস এবং প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছিল—আজ মহৎ গৌরব পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছে। আমাদের শাসনকর্ত্তাদিগের ন্যায় এবং ধর্ম্মবুদ্ধির প্রভাবে এই জয় সম্ভব হইয়াছে সত্য কিন্তু দেশভক্ত জননায়কগণের বীরোচিত সাহস, আত্মত্যাগ, স্বার্থশূন্যতা যে অন্যতম কারণ সে বিষয় সন্দেহ নাই—তাঁহারা ঝটিকাসঙ্কুল মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার পথে যাত্রা করিয়াও সুদূর নন্দনের সমুজ্জ্বল দিব্য তোরণ কখনও বিস্মৃত হয়েন নাই, কখনো তাহাকে অলীক স্বপ্ন জ্ঞান করেন নাই।

দিল্লী।

প্রাচীন দিল্লী।—দিল্লীর প্রাচীন নাম ইন্দ্রপ্রস্থ। ইহা যমুনাতীরে অবস্থিত। মহাভারত হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুর হইতে আসিয়া এই নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের পর ঐ বংশের ৩০ জন রাজা এখানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ইহার পর অন্যান্য রাজারা ঐ স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। চতুর্থ শতাব্দির প্রারম্ভে রাজা ধব্ একটী পঞ্চাশ ফুট উচ্চ লৌহ স্তম্ভ স্থাপিত করিয়া নিজের স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাকে লৌহ মিনার (স্তম্ভ) কহে। ইহার পর কিছুকাল অবধি দিল্লীর অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে রাজা অনঙ্গ পাল আবার দিল্লী স্থাপিত

করেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরি পৃথ্বীরাজকে থানেশ্বর যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং তাঁহার সেনাপতি কুতুবুদ্দিনকে ভারতবর্ষে রাখিয়া যান। সেই অবধি দিল্লী মুসলমানের রাজধানী। দিল্লীতে কুতুবুদ্দিন অনেক বড় বড় অট্টালিকা ও মিনারাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তন্মধ্যে কুতুবমিনার এখনও বর্ত্তমান। ইহা নবীন দিল্লীর দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ইহার মস্তকের চূড়াটী ভগ্ন হইয়া যায়। দিল্লীর আশপাশের লোকেরা এই স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তন করিবার জন্য আসিয়া থাকে। এই স্থানটী পর্ব্বত মালায় বেষ্টিত। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিশয় চিত্তাকর্ষক। ছোট ছোট পাহাড়গুলি হরিৎ সুন্দর বৃক্ষ লতাদি বক্ষে লইয়া বহুদূর অবধি চলিয়া গিয়াছে। শ্যামস্নিগ্ধ ছায়াবহুল বৃক্ষশাখায় নানা বর্ণের বিহঙ্গমের কলকণ্ঠের মধুর ঝঙ্কার আর সেই সুরে সুর মিলাইয়া ছোট ছোট নির্ঝরগুলি ঝর ঝর রবে আঁকিয়া বাঁকিয়া রজত রেখার ন্যায় কোন্ দূর বনে মিলাইয়া যাইতেছে। এই ছায়াস্নিগ্ধ শান্ত মধুর স্থানটী বাস্তবিকই প্রাণে একটা নব আনন্দ ঢালিয়া দেয়। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে এখানে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। ইহা 'ফুল ওয়ালুকি সার' নামে অভিহিত। ধনী লোকেরা এই সময় কুতুব মিনারের নিকট গৃহাদি ভাড়া করিয়া বাস করে ও পুষ্প পত্রে গৃহ সাজাইয়া রাখে। দিল্লীর ফুলওয়ালাদের ফুল বিক্রয়ের ইহাই উপযুক্ত অবসর। এই সময় এখানে নৃত্য গীত প্রভৃতি অনেক কৌতুকাদি হইয়া থাকে। ঘোরি বংশের গিয়াসুদ্দিন তুগলক ইহার চারি মাইল দূরে এক নব দিল্লী স্থাপন করিয়া। উহার নাম তুগলকাবাদ রাখিয়া ছিলেন—ইহা এখন বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। হিন্দুনগর ইন্দ্রপ্রস্থের অবস্থাও তদনুরূপ। ইহার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

তাইমুরলঙ্গের আক্রমণে তুগলক বংশ ধ্বংস হইয়া যায়; ইনি মহম্মদ তুগলককে পরাস্ত করিয়া দিল্লীতে অমানুষিক উপদ্রব করিয়াছিলেন। পাঁচ দিন অবধি নগর লুণ্ঠন ও প্রজাদিগকে নানা প্রকারে উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। তখন দিল্লীর অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়াছিল। তাইমুরের পর লোডি বংশ রাজা হইল। পানিপতের যুদ্ধে বাবর বাদশা ইব্রাহিম লোডিকে পরাস্ত করিয়া মোগলবংশ স্থাপিত করিলেন। বাবর আগ্রাতেই থাকিতেন। কিন্তু উহার পুত্র হুমাউন দিল্লীতেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

নবীন দিল্লী।—হুমাউনের পৌত্র সাজাহান দিল্লীর জীর্ণসংস্কার করিয়া সাজাহানাবাদ নাম রাখিলেন। ইহাই বর্ত্তমান দিল্লী, এবং ২৭৮ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। দিল্লীর তিনদিক প্রস্তরের উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। উহা সাড়ে পাঁচ মাইল দীর্ঘ, ৪ গজ প্রস্থ ও ৯ গজ উচ্চ। ইহাতে বারটী ফটক চারটী খিড়কি (ক্ষুদ্রদ্বার) ও ৬৪টী স্তম্ভ আছে। সহর পরিষ্কার—জনসংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। বাটীগুলি অধিকাংশই ইষ্টক নির্ম্মিত। বাজার অত্যন্ত প্রশস্ত, গলির সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। সাজাহাননির্ম্মিত সাহিমহল দুর্গ ও জুমামস্জিদ দর্শনযোগ্য।

সাজাহানের খাস মহলের সৌন্দর্য্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। ইহার এক স্থানে ফারসি অক্ষরে একটী কবিতা খোদিত আছে যথা :—

অগর ফিরদৌস বরুরুএ জমিনস্ত।
হমীনস্ত, হমীনস্ত, হমিনস্ত।

অর্থাৎ, পৃথিবীর উপরিভাগে কোথাও স্বর্গ থাকে, তবে ইহাই! ইহাই!! ইহাই!! কিন্তু হায়, এই স্বর্গ অল্প দিনই ছিল। সুখের পর দুঃখ দুঃখের পর সুখ কালচক্রের মত সর্ব্বদাই ঘুরিতেছে। মোগল বাদসাহেরা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হইয়া আপনাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। পাঠান ও আফ্‌গানেরা তাঁহাদিগকে অনেকবার আক্রমণ করিয়াছিল। অবশেষে মারাট্টারা শেষ মোগল বাদসাহকে পরাস্ত করিয়া ইংরাজদের আগমন কাল পর্য্যন্ত বন্দীকরিয়া রাখিয়াছিল। ইহা ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহিবিদ্রোহের পর ইংরাজেরা তখনকার নামমাত্র মোগল বাদসাহকে রেঙ্গুনে প্রেরণ করেন, তিনি তথায় কালগ্রাসে পতিত হন। তদবধি দিল্লীতে ইংরাজের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান। ইহার ৫০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটন দিল্লীতে প্রথম দরবার করেন। সে সময়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতেশ্বরী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্জন অতিশয় জাঁক জমকের সহিত দরবার করিয়া সপ্তম এডোয়ার্ডকে ভারত সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এখন মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহার মহিষী সাম্রাজ্ঞী মেরীর সহিত এইখানে অভিষিক্ত হইলেন।

প্রাচীন কীর্ত্তি।—প্রাচীনকালের কীর্ত্তির মধ্যে রাজা ধবের লৌহ স্তম্ভের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মুসলমানদের সময়ের প্রধান কীর্ত্তি কুতবমিনার, কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে উহা পৃথ্বীরাজের নির্ম্মিত। তাঁহার কন্যা প্রতিদিন উহার উপর হইতে গঙ্গা দর্শন না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। পরে মুসলমানেরা উহার অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছিল। ইহার নিকট বহুমন্দির ও অনেক মসজিদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কুতব মিনারের উপর এত উচ্চ যে তাহার উপর হইতে নিম্নে চাহিলে, প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয়, এবং নিম্নস্থ লোকদিগকে ছোট ছোট পুতুলের ন্যায় দেখায়। ইহা ব্যতীত ফিরোজ-সাহের স্তম্ভ দর্শনযোগ্য। কথিত আছে রাজা অশোক নির্ম্মিত একটী প্রস্তর স্তম্ভকে ভগ্ন করিয়া ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন কবরের মধ্যে হুমাউন বাদসাহের কবর অতিশয় সুন্দর—ইহা আগ্রার তাজের অনুরূপ কিন্তু আকারে ক্ষুদ্র।

জুমামসজিদ।—ইহা সাজাহান নির্ম্মিত। লালকেল্লার সম্মুখে একটী উচ্চ স্থানে নির্ম্মিত। ইহা ২০০ শত ফুট দীর্ঘ ও ১০০ ফুট প্রস্থ। প্রত্যেক শুক্রবার সমস্ত মুসলমান একত্র হইয়া এই স্থানে নিমাজ পড়িয়া থাকে। ইহার ভিতর মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত একটী সুন্দর গৃহ আছে; উহার দুই পার্শ্বে দুইটী মিনার সংলগ্ন; উহাদের উচ্চতা প্রায় ১৩০ ফুট। ইহারই সম্মুখ দিয়া সম্রাটের মিছিল গিয়াছিল।

লাল কেল্লা।—ইহাও সাজাহান

দিল্লী

चित्र ८७।

মতি মসজিদ (দিল্লী)।

হেড়াতী কাম।

দিল্লী।

দেওয়ানি খাস।

যমুনা হইতে দিল্লীর রাজপ্রাসাদ।

ভারা মসজিদ।

Plate 2nd

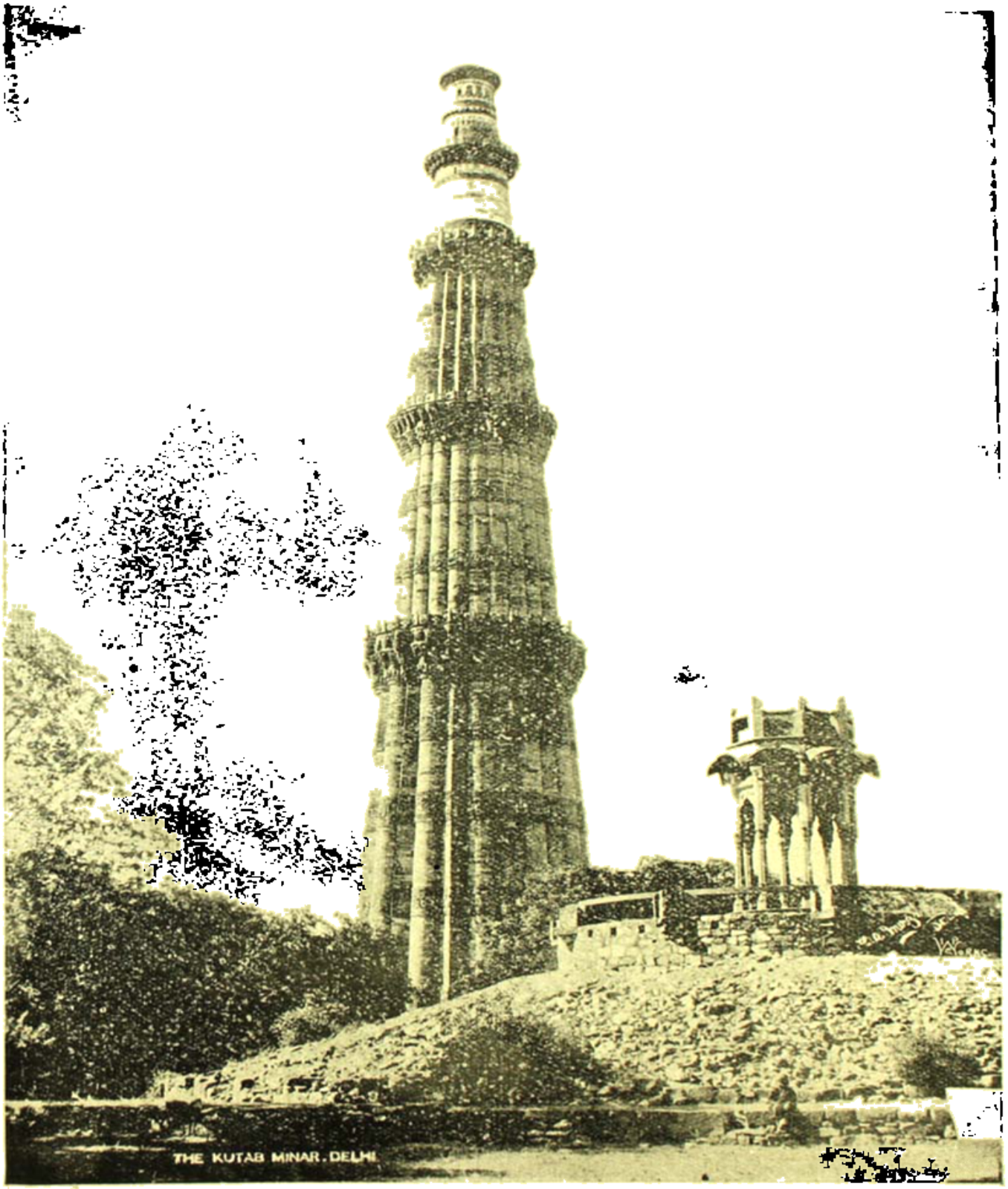

কুতব বিনার।

ক্লক টাওয়ার।

দিল্লী দরওয়াজা দৃশ্য।

চিত্র ৩(ক)।

দুধের কেল্লা, চিত্রকার অঙ্কিত।

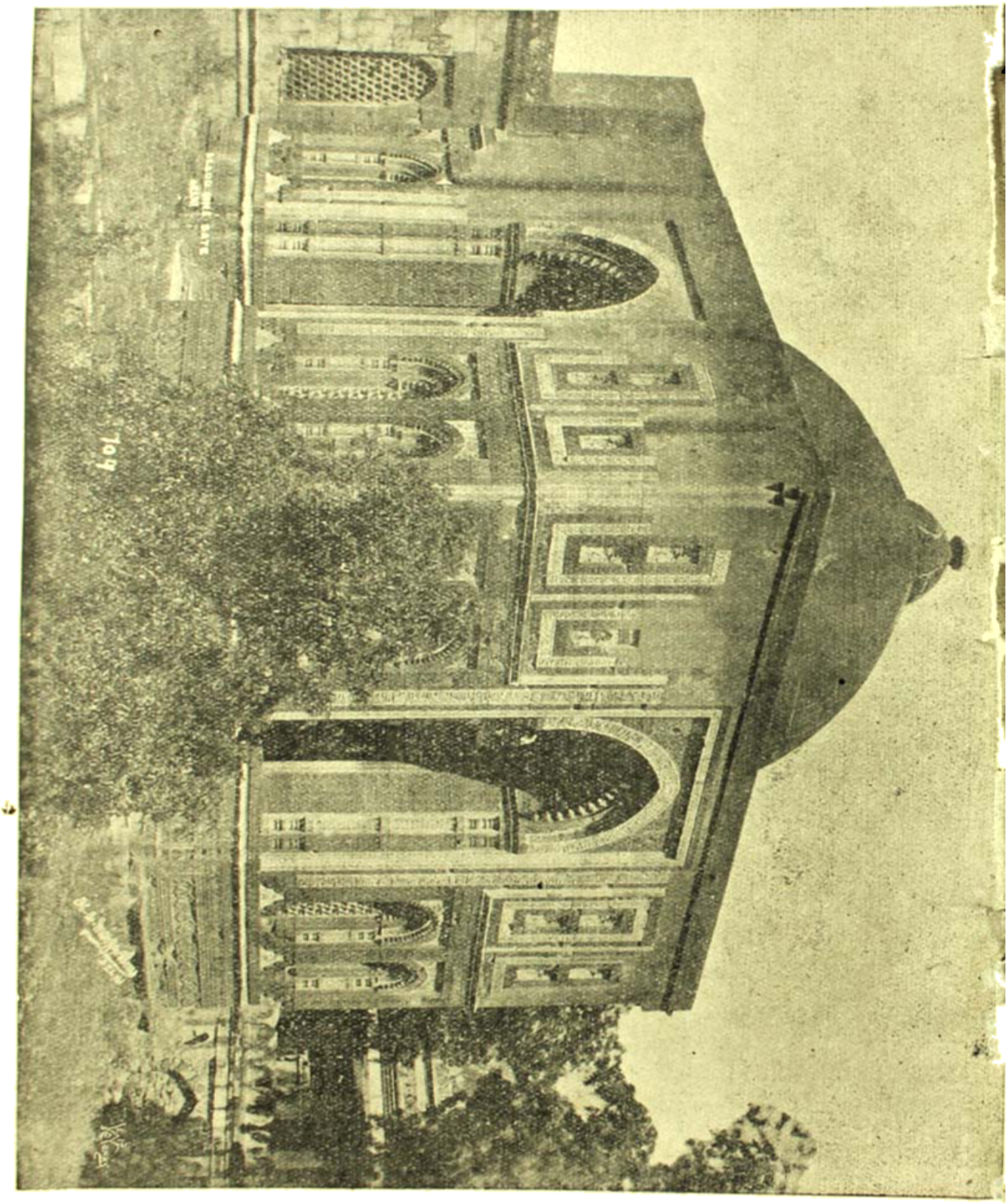

নির্ম্মিত। ইহা লাল প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া লোকে ইহাকে লালকেল্লা বলে। ইহার পরিধি দেড়মাইল। পূর্ব্বে মোগল বাদশাহ এই স্থানে বাস করিতেন। এখন গোরা পল্টন থাকে। যে স্থানে বাদসাহ বসিয়া দরবার করিতেন, তাহাকে দেওয়ানী খাস কহে। ইহা এখনও পূর্ব্বাংশে আছে। উহার প্রাচীরগাত্রে নানাবর্ণের প্রস্তরের বৃক্ষ লতা ফল ফুল, পশুপক্ষী প্রভৃতির শিল্পনৈপুণ্য দেখিলে সুধীকে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। বাদসাহ যে স্থানে বসিয়া নিমাজ পড়িতেন উহাকে মতিমসজিদ বলে। উহা মহামূল্য মর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত। বাদসাহের খানাগার ও বেগমদিগের নিমাজ পড়িবার স্থান এখনও বর্ত্তমান আছে, এবং যে স্থানে বসিয়া উঁহারা যমুনা দর্শন করিতেন তাহাও ঠিক আছে—দরবারের সময় এই দুর্গের যে স্থানে সাহিমজলিস হইত—সেই স্থানে সম্রাটকে লইয়া এবার একটি গার্ডেন পার্টি হইয়াছিল। এইখানে পঞ্জাবের ছোটলাট একটী প্রদর্শনী খুলিয়া ছিলেন, উহাতে মোগলদের সময়ের বস্ত্র, অলঙ্কার, পুস্তক ইত্যাদি দেখান হইয়াছিল।

জাহানারার কবর।—প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে সাহাজানের কন্যা জাহানারার কবর দেখিবার যোগ্য। ইহার আকার প্রায় হুমায়ুনের কবরের অনুরূপ। ইহা দেখিয়া প্রাণের ভিতর একটী অপূর্ব্বভাবের সঞ্চার হয়। যখন পাষাণহৃদয় আওরেনজেব তাঁহার বৃদ্ধ পিতা সাহাজানকে বন্দী রাখিয়া ছিলেন; তখন তাঁহার এই পিতৃবৎসলা কন্যা জাহানারা ও আপনার দুর্দ্দশাপন্ন পিতাকে সেবা করিবার জন্য কারাগারে ছিলেন। ইনি অত্যন্ত সুশীলা ও দয়াবতী সাহাজাদি ছিলেন। জাহানারার আদেশানুযায়ী তাঁহার কবরের উপর এই কবিতাটী পারস্য অক্ষরে লেখা ছিল। যথাঃ—

বগৈর সবজানঃ পোশদ কসে মজারে মরা,
কি কবর পোশে গরীবা হামি গয়াহে বস্ অস্ত।

অর্থাৎ আমার সমাধির উপরে শ্যামল তৃণ ব্যতীত আর যেন কিছু না থাকে; কারণ গরীবের পক্ষে এই হরিৎবর্ণ তৃণই কবর শোভার যথেষ্ট।

জাহানারার হৃদয় উদার ছিল। ইনি দীন দুঃখীদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীলা ছিলেন ও যথেষ্ট দানধ্যানাদি করিতেন।

চাঁদনীচক।—চাঁদনীচক দিল্লীর একটী প্রসিদ্ধ বাজার।

সুনহরি মসজিদ ও ঘণ্টাঘর।—চাঁদনীচকের মধ্যে কোতোয়ালীর নিকট অবস্থিত। এই মসজিদের নিকট ঘণ্টাঘর লাল প্রস্তর নির্ম্মিত একটি সুন্দর মিনার—উহার উপর একটী প্রকাণ্ড ঘণ্টা আছে। উহার শব্দ বহুদূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার অনতিদূরেই Municipal Office ও Town Hall এবং ইহার উত্তরে রেলওয়ে ষ্টেসন। নিকটেই প্রায় অর্দ্ধমাইল দীর্ঘ যমুনার পুল। ভাদ্র মাসে যমুনার তীরে একটী প্রকাণ্ড মেলা হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত দিল্লীতে আরো অনেক দ্রষ্টব্য প্রাসাদাদি আছে। তাহার কতকগুলি চিত্র প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট হইল।

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

দিল্লীর দরবার।

প্রতীক্ষা।

সম্রাটের দিল্লী পৌঁছতে এখনও কিছুদিন বাকি আছে। এই এডেন পর্য্যন্ত জাহাজ পৌঁছল, এই বম্বেতে এলেন, সেখানকার ধুমধাম আরম্ভ হল—এই সব শোনা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দিল্লীতে শোভা ও আমোদের লহরী প্রতিদিনই ফেণায়িত হয়ে উঠছে।

রাজাদের শিবিরনিবাসের যে বাহার আহা মরি মরি! কর্জ্জনের দরবারকে অন্তত এই একটা বিষয়ে সম্রাটের দরবার টেক্কা দিয়েছে। সেবার ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন রাজারা দিল্লীসহরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বাড়ী ভাড়া করে বাস করছিলেন। এবার সমস্ত ভারতবর্ষ এক জায়গায় পাশাপাশি একত্র হয়ে ভিন্ন ভিন্ন শিবির নিবাসে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের এলাকা নির্দ্দেশ করে বিরাজ করেছে। নিজাম, মাইশোর, বরদা, কাশ্মীর, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ভূপাল, ধর, দেবাস, সিকিম, ভুটান, কোলাপুর উদয়পুর, ভাওয়ালপুর, রামপুর, ঝালাওয়ার, মেবার, জয়পুর, ভাউলপুর, গোন্দল, নবনগর, রাজপিপলা, কনোলি, শাপুরা, কাথে, জিন্দা, পাতিয়ালা, কর্পূরতালা, সোলন, ফুলরা, ফুন্‌গা, কোটা, বুন্দি, কুচবেহার, ত্রিপুরা, নাহান, চম্বা, সুকেৎ মণ্ডি—এবং আরও অসংখ্য রাজার বস্ত্রনিবাস প্রাচীরে, তোরণে, ভূষণে, বাদ্যে, আলোকে ও লোকে সজ্জিত হয়ে দিল্লীবাসী নরনারীর নয়ন ও মনের আনন্দ বর্দ্ধন করছে। মনে হচ্ছে হঠাৎ যেন একটা যাদুনগরী ইন্দ্রজালে গড়ে উঠেছে—তাতে যেন সোনার গাছে রূপোর পাতার হীরের ফুল ফুটে উঠছে। যা কিছু অসম্ভব তা যেন এখানে সম্ভব হতে পারে। কলিকাতার এক রাত্রির দীপাবলী দেখতে লোকে যেমন যাত্রায় বাহির হয়েছিল দিল্লীতে সেই রকম পনের দিন ধরে রাজাদের ক্যাম্পের আলো দেখার জন্যে প্রতি সন্ধ্যা বেলায় সহর শুদ্ধ গাড়ীঘোড়া, জুড়ি, ল্যাণ্ডো, ফিটন, ছকর, পাল্কী মোটর ও পদাতিক ভেঙ্গে পড়ত। প্রসিদ্ধ পরদাপ্রিয় দিল্লী পরদা একেবারেই উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছিল। বড় বড় ঘরের, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র সব রকমের মেয়েরা খোলা গাড়ীতে বা পায়ে হেঁটে রাজাদের ক্যাম্পের শোভা দেখতে বাহির হত। যে সব পরিবারের গৃহিণীরা ইতি পূর্ব্বেই পরদা ভাঙ্গার বদনামে দোষারিত ছিলেন—তাঁদের বড় আনন্দ। তাঁরা বলতে লাগলেন—"এবার! এখন কেমা পরদা খুলে 'ক্যাম্পো কি সয়ের' করছেন।"

শুধু গাড়ীতে বসে আলো দেখে আসা নয়! যতদিন রাজা রাণীরা এসে না পৌঁছিয়েছিলেন—ততদিন ক্যাম্পে ক্যাম্পে নেবে প্রত্যেক ক্যাম্পের আভ্যন্তরিক সজ্জাও সকলে দেখে আসছিল। সুতরাং পরদা ঘেরাটোপ, আরু আবরণ দিনকতক দিল্লী ছেড়ে বহুদূরে গিয়ে বাসা নিতে বাধ্য হয়েছিল। সোশাল রিফর্মারদের বিনা বক্তৃতায় দুর্গজয় হয়ে গিয়েছিল। তার প্রবাহ এখন পর্য্যন্ত বহমান। অনেকে স্ত্রীকে সেই সময় পরদা থেকে বাহিরে আনবার যে সুযোগ পেয়েছিলেন আর সেটা হাতছাড়া করতে চান না। এখনও মধ্যে মধ্যে তার রেশ চালাচ্ছেন।

নানা শিবির নানা ভাবে সজ্জিত। কিন্তু কাশ্মীররাজের শিবিরের সঙ্গে আর কারও তুলনা হতে পারে না। তার বাইরের প্রাচীর ও তোরণ হচ্ছে কাশ্মীরের অত্যুত্তম কাঠের আলিকান্ন, আর ভিতরের তাম্বুটাও দুষ্প্রাপ্য শাল দোশালা ও আমিয়ারের কানাৎ আর গালিচায় ফরাস! কাশ্মীর শিবিরের দুর্গুলা প্রাচীর ও তোরণ সম্রাটকে উপহার দেওয়া হয়েছে—তিনি নাকি সেটা দেখে অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছিলেন এবং অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে উপহার গ্রহণ করেছেন।

সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীর আসবার কদিন আগে থাকতেই রিহার্সালের বিভ্রাট পড়ে গেল। হঠাৎ কোন কোন দিন শুনা যায় কাল অমুক বিষয়ের রিহার্সাল হবে, ভোর থেকে বেলা এতক্ষণ পর্য্যন্ত অমুক অমুক রাস্তাঘাট সব বন্ধ থাকবে। যদি কোন বিভ্রান্ত পথিক অধারোহী বা মোটরারোহী বিজ্ঞাপিত সময়ের মধ্যে কোন একটা নিষিদ্ধ রাস্তায় এসে পড়ে ত ভিড় ঠেলে পিছে পালাবারও পথ পায় না—সম্মুখে অগ্রসর হওয়া ত দূরের কথা। ইংরেজ সান্ত্রী অতি ভদ্রতার সঙ্গে উত্তর দেয়—"Very sorry cant let you pass. We are in possession."

৫ই ডিসেম্বর ভারতস্ত্রী-মহামণ্ডলের দিল্লী-শাখা থেকে দিল্লীতে সমাগত ভারতবর্ষের রাণীবেগম ও অন্যান্য ভদ্রমহিলাদের একটি পার্টি দেওয়া হল। তার ভিতর পঞ্জাবের লাটসাহেবের মেম ও অন্যান্য প্রদেশের বড় বড় মেমেরাও ছিলেন। নিমন্ত্রণ পেয়ে সবাই বলতে লাগলেন—এই থেকেই তাহলে দরবার ফাংশন্‌স্ আরম্ভ হল।

কোন কোন রাণী নিজেরা আগ্রহ প্রকাশ করে অনুরোধ করলেন "অমুক, অমুককেও যেন নিমন্ত্রণ করা হয়, ওঁদের কখন দেখিনি, দেখবার বড় সাধ আছে।"

যে বেচারীরা পার্টির উদ্যোগ করেছিলেন তাঁদের কিন্তু সেদিন যে দুর্গতি। তার আগের রাত্রে খবর পাওয়া গেল সেদিন সম্রাটের দিল্লী প্রবেশের রিহার্সাল হবে, ভোর ছটা থেকে ১২টা পর্য্যন্ত রাস্তা বন্ধ থাকবে। তাঁরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। যদি ১২টা পর্য্যন্তই রাস্তা বন্ধ তবে তাঁরা পার্টির জায়গায় নিজেরা কখন উপস্থিত হবেন, কখন সাজাবেন, তিনটের মধ্যে সকলের অভ্যর্থনার জন্যে কি করে প্রস্তুত হবেন। যাহোক নিরুপায়। যে হিন্দু বালিকাবিদ্যালয়ের গৃহে পার্টি হবে সেখানকার শিক্ষয়িত্রীরা কাজ অনেকটা অগ্রসর করে রাখবেন এই আশা করা গেল। তার পরদিন ১২টার সময় উদ্যোগিনীরা 'দুর্গা শ্রীহরি' স্মরণ করলেন। রাস্তা খোলার তখনও কোন নামগন্ধ নেই। পল্‌টনে পল্‌টনে ঠাসা। ১২টা থেকে ৩টে পর্য্যন্ত ঠায় গাড়ীতে একই জায়গায় অপেক্ষা করতে হল। এদিকে যত মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাচ্ছে ঘড়ি খুলছেন আর দেখছেন, তাঁদের বুকের রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে। "আজ কি লজ্জাই পেতে হবে।" গাড়ীতলা গৌ কি সবাই ডাকছে—হে রঘুনাথ হে কিষণজি হে পরমাত্মন্ আজ আমাদের লজ্জা রাখো—আজ আমাদের এ দায় থেকে উদ্ধার করো, আজকের পার্টি মানে মানে উৎরে যাও।

ঠিক তিনটের সময়—নিমন্ত্রিতদের আসবার

সময়—নিমন্ত্রণকারিণীরা কনগৃহে গিয়ে পৌঁছলেন। ভোর পাঁচটার সময় কুলিদের কাঁধে যে সব ভাল ভাল কৌচ চৌকি পাঠান হয়েছিল—সে সবও তখনি পৌঁছল। যে উঠান সাজাবার কথা ছিল তা আর হলনা——অপেক্ষাকৃত অল্প পরিসর জায়গাতেই তাড়া তাড়ি সব গোছান গাছান হল। "ফুলের মালা এসেছে?—"না—লোক গেছে ফেরেনি, সেদিকের রাস্তা এখনও বন্ধ, বটনহোল এসে পৌঁছেছে।" "সোনালি পাতা মোড়ান পান?" "এখনও না"—"তবে এই পাশের দোকান থেকে এখনই সাদা খিলিই আনিয়ে রাখ।" "গোলাব পাশ? গোলাব?" "গোলাব পাশ আছে, গোলাব এখনও আসেনি।"—এই রকম প্রশ্নোত্তর হতে হতে একটা কলরব উঠল—"দেবীজী কোথায়, শীঘ্র পাঠাও তাঁকে, একটা মোটর এসেছে, কেউ এসেছেন! লাটসাহেবের মেম্।" আসুন আসুন শীঘ্র অভ্যর্থনা করুন। ইংরেজের চিরন্তন প্রথামত ঠিক সময়টিতে পঞ্জাবের লাটমেমের গাড়ী দরজায় উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে তাঁর কন্যা ও একজন পঞ্জাবী রাণী। এর পর থেকেই মোটরের স্রোত অবিরাম প্রবাহিত হতে লাগল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ হিন্দুবালিকাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ রাজন্যবর্গের অসূর্যম্পশ্যা রাণী ও বেগমদের নয়নহারী সমাবেশ হল। সেদিন সহর শুদ্ধ রমণীরা এই পার্টিতে নিমন্ত্রণ পাবার জন্যে লালায়িত হয়েছিলেন—কিন্তু দুঃখের বিষয় স্থানাভাব বশতঃ কেবল ভিন্ন বেছে বেছে আর অল্প দুচার ঘরের মেয়েদেরই এতে আহ্বান করা গিয়েছিল।

থেকে থেকে রাস্তাঘাট বন্ধের দিনটাতে সকলেই এখন কি ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তের লাট-সাহেবের মেমেদেরও অনেক সময় বিপদে পড়তে হয়েছিল। একদিন এক বেগমের বাড়ী আহূত পার্টিতে লেডি হিউইট এই কারণে উপস্থিত হতে না পেরে—এন্‌গেজমেণ্ট জানার লজ্জায় বিশেষ লজ্জান্বিতা হয়েছিলেন।

আগমন।

৭ই ডিসেম্বর সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞী দিল্লীতে পদার্পণ করলেন। কলিকাতায় যেমন রাজ-দর্শনের জন্যে রাজপথের স্থানে স্থানে স্থাপিত ষ্ট্যাণ্ডের টিকিট কিনে লোকের রাজাকে দর্শন করতে যান দিল্লীতেও সেই রকম হয়েছিল। তা ছাড়া দিল্লীতে আর এক সুবিধা ছিল। সেখানে সম্রাট সহরের মধ্যে দিয়ে যাওয়াতে পথের দুধারের অসংখ্য বাড়ীর বারান্দা ও ছাদের থেকে তাঁকে দেখার সুবিধা হয়েছিল। সেদিন রাজপথবর্ত্তী গৃহ-পতি ও গৃহপত্নীদের কাছে হাজার হাজার অনাহূত অতিথি অতিথিনী এসে উপস্থিত। অনেকেই সেদিন রাত তিনটে চারটের থেকে উঠে যাবার আয়োজন করেছেন। কেউ কেউ আগের রাত্রি থেকেই পুরীতরকারী মিষ্টান্ন তৈরি করে গাঁটরী বেঁধে বেঁধে ঠিক করে রেখে দিয়েছেন। একজনেরা পাঁচটার সময় একজন গৃহস্থদের বাড়ীর সামনে গাড়ী করে উপস্থিত। কিন্তু শীতের দিনে অত ভোরে গৃহস্থদের জাগাননি, সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত চুপ করে গাড়ীর ভিতর বসে ছিলেন। ফরসা হতে, গৃহস্থরা আপনি দরজা খুলতে

তাঁদের বাড়ীতে উঠে গিয়ে বারান্দার অনেকটা অংশ সব প্রথমেই দখল করে নিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে মাটিতে পেতে বসার জন্যে কম্বল, সতরঞ্চি এমন কি মোড়া চৌকি পর্য্যন্ত ছিল। তাছাড়া তিন চারজন চাকর সর্ব্বদা কাছাকাছি হাজির, যখনই যা দরকার হচ্ছে, পান লুচি, তরকারী, মিষ্টান্ন, ফল—সারাদিনের জীবন নির্ব্বাহের উপায় তৎক্ষণাৎ উপস্থিত করছে। তাঁরা একশ টাকা দিয়ে একটা ষ্ট্যাণ্ডে টিকিট কিনেছিলেন। কিন্তু তার চেয়ে এখান থেকে ভাল দেখা যাবে শুনে সে টিকিট নষ্ট করে এখানে এসেছেন।

দিল্লীতে যাদের অতিথি ছিলেম তাঁরা অপেক্ষাকৃত কইদর্শনীয় স্থানে নিজেরা গিয়ে আমাকে এইখানে পাঠিয়ে দেন—গৃহস্বামিনী তাঁদের আত্মীয়া। আমি নিরায়োজনে রিক্তহস্তে সেখানে উপস্থিত হতেই আমার অপরিচিত ও স্বল্পপরিচিত সকলেরই অতিথি হয়ে পড়লুম। যাঁরা সব প্রথমে এসে সব চেয়ে ভাল জায়গাটা দখল করেছিলেন—তাঁরা আমায় বহুদিন পরে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। কেউ 'মাতাজি', কেউ 'বহিন্‌জি', কেউ 'বহুজি', কেউ 'ভাবিজি', বলে সম্বোধন করে তাঁদের সেরা জায়গাটার মধ্যে যেটুকু আরও সেরা সেটুকুতে আমাকে টেনে বসালেন—দুখানা চৌকির মধ্যে একখানা আমার ভাগ্যে পড়ল, —চৌকির উপর আবার দুচার প্রস্থ কম্বল পড়ল—নরম ও গরম স্পর্শের জন্যে। আমার পুত্রটি তাঁদের আলাপের মধ্যে দুলাল হয়ে পড়লেন।

পথের ওপাশে একখানা বাড়ী আপাদ মস্তক লোকে ভরা। আমাদেরও বাড়ীখানা তাই ছিল—ছাদের উপরে পুরুষ, দোতলায় মেয়ে, একতলায় আবার পুরুষ। এ বাড়ীর লোকবিন্যাস আমরা নিজেরা দেখতে পাচ্ছিলাম না কিন্তু সামনের বাড়ীর গ্রুপিং বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। সেখানকার মেয়েদের মধ্যে চেনা মুখও অনেক ছিল। তাঁরা নমস্কারে স্মিতহাস্যে আমায় অভিবাদন করতে লাগলেন। ওখানে দোতলায় শুধু মেয়ে বটে কিন্তু ছাদের উপর মেয়ে পুরুষ দুই ছিল। কারো সঙ্গে পাখের ডিবে, কারো ডাবার ভরা লাড্ডু পুরী—থেকে থেকে ছেলেদের মধ্যে বিতরিত হচ্ছে।

আমি যখন পৌঁছই তখনও রাস্তা বন্ধ হয় নি। তার একটু পরেই প্রায় আটটার সময় দুদল শিখ পল্টনে আমাদের সামনের রাস্তার দুধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিলে। তাদের লাল পোষাক, হলদে পেটি, পাগড়ীর উপরে একটা করে মস্ত লোহার চক্র। প্রথমে দুএকটা বড় বড় কুপো ফুটপাথের এক পাশে ধরাধরি করে রেখে সেপাইরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সেই রাস্তেরই কাপড় পরা দুজনমাত্র ইংরেজ অফিসার কতকটা ব্যবধানে দাঁড়িয়ে রইল—বাকি সব অফিসারই শিখ। কিছুক্ষণ পরে একটা নড়াচড়ার ভাব দেখা গেল। একটা কিছু হুকুমজারি হল। শব্দটা ধরতে পারা গেল না, ফলে দেখা গেল, সেপাইরা সব আপনার আপনার পিঠে ঝোলা ব্যাগের ভিতর থেকে এক একটা ডিবে বের করে তার থেকে তাদের প্রাতরাশ

বের করলে—শুক্‌নো রুটি আর কাঁচা পেয়াজ কারও বা একটু তরকারী। চটাপট চর্ব্বণ ও ভক্ষণের কাজ চলতে লাগল। তার পরেই সেই পূর্ব্ব রক্ষিত কূপোদকা থেকে জল টিপে টিপে বের করে জল খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে ডিবের চুক্তাবশেষ রাস্তার খাড়া মেথর-দের দান করে, ডিবে ধুয়ে বাগের ভিতর পুরে, একখানা অশ্বতরের পাড়ীতে একটা সিপাই-য়ের জিম্মায় সব বাগগুলি পুয়ে দিয়ে, ফিট-ফাট হয়ে সিপাইরা আবার যে যার স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সম্রাটের আগমন প্রতীক্ষা কর্ত্তে লাগল। আমার বোধ হয় মাইল ছয় সাত ধরে যতদূর পর্য্যন্ত রাস্তার দুধারে সেপাইয়ের শ্রেণী ছিল ততদূর একই সময় এই একই রকমের প্রক্রিয়া চলেছিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। গবর্ণর জেনেরলের গাড়ী সোয়ারী নিয়ে ষ্টেশনের দিকে চলে গেছে, এক আধটা ছুটো ছাটা রাজাও এই দিক দিয়ে গেছেন, ইম্পি-রিয়াল ক্যাডেট কোরের অশ্বারোহী দল আসমানী পাগড়ী ও সাদা জরির পোষাকে দিগন্ত শোভান্বিত করে অদৃশ্য হয়েছে, এখনও সম্রাটাগমনের কোন খবর নাই। হঠাৎ তোপ পড়ল—গুড়ুম গুড়ুম—সেই যে আরম্ভ হল আর শেষ নেই, একশ একবার গুড়ুম। সম্রাট ষ্টেশনে এসে পৌঁচেছেন। সামনের সেপাইরা হুকুমের অনুবর্ত্তী হয়ে বন্দুক খাড়া করলে—শত শত বন্দুক এক সঙ্গে খাড়া হল। শত শত পেটি থেকে এক সঙ্গে ছয়রা বেরোল, শত শত বন্দুকে এক সঙ্গে ছয়রা ভরল, শত শত ছয়রাভরা বন্দুক আকাশমুখী হয়ে এক সঙ্গে গর্জ্জন করে উঠল, মেঘ গর্জ্জনের মত অনেকক্ষণ ধরে তার শব্দ প্রবাহ গড়িয়ে গড়িয়ে যেতে লাগল। তার পরেই জলুস অর্থাৎ Pro-cession আরম্ভ হল। প্রথমে লাল, হলদে, কালো সবুজ নানা বেশধারী নানা পল্টনের ফৌজ সঙ্গে সঙ্গে স্ব স্ব ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে অগ্রসর হল। প্রত্যেক পল্টনের কি দেশী কি গোরা ড্রামার বাদ্যকালে শোভিত, প্রত্যেক পল্টনের ইংরেজ অফিসর সেপাইদের মতে রঙ বেরঙ পোষাক পরা, লালের রুমালের পেটি বাঁধা, আর কাল জরির লুঙ্গির পাগড়ী পরা। সাদা মুখে কাল পাগড়ী বড়ই মানান সই হয়েছিল। ইংরেজদের নিজের পোষাকের চেয়ে যে কত বেশী ভাল দেখাচ্ছিল তা বলা যায় না। তার পরে ভাইসরয়ের বডি গার্ড দেখা দিলে, তার পরে ভারতের রাজা ও রাজকুমারগণে গঠিত শেতহস্তারোহী ইম্পিরিয়াল ক্যাডেট কোরের মনোহারী দৃশ্য-পট আবার উদ্‌ঘাটিত হল। এর পরে heraldsদের জমকালো সাজ ও বুক কোলান তক্তিতে রাজের সমরেখায় ঠিক সম্মুখে দৃষ্টিপাতী চেহারা আবার দেখা গেল, তারপরে হেল্মেটের উপর পালকধারী কতিপয় অশ্বারোহী ইংরেজ অফিসার—তৎপশ্চাতেই সাম্রাজ্ঞীর গাড়ী—তার উপর রাজছত্র ধৃত হয়ে রয়েছে। ব্যাণ্ডে God save the King ধ্বনিত হয়ে উঠল, রাজপথে সিপাইদের হস্তধৃত নিশান মাটিতে লুণ্ঠিত হয়ে পড়ল, সাম্রাজ্ঞীর গাড়ী এগিয়ে গেল—সবাই খুঁজতে লাগল—সম্রাট কোথায়? সবাই সবাইকে জিজ্ঞেস করে সম্রাট এখনও এলেন না? আশা টৈল পিছনে এখনও আসছেন। কিন্তু লেডি হার্ডিং চলে গেলেন, সম্রাট-অতিথিরা সব

চলে গেলেন—নিজাম চলে গেলেন, গাইকোয়াড় গেলেন, মহীশূর গেলেন—কাশ্মীর রাজেন্দ্র সহস্র সহস্র উৎসুক দর্শকবৃন্দের চোখের সামনে গম্ভীর নিস্তব্ধতায় হয়ে, এত জনতা, এত আগ্রহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে, চোখ বুজে এক পাশে মাথা কাৎ হয়ে চলে গেলেন—অথচ সম্রাট এলেন না, সম্রাটকে কেউ দেখতে পেলে না। নীরবে নিঃশব্দে সেন একটা শোকার্ত্ত মৌন প্রোসেশন চলে গেল। বাদশা নেই, সম্রাট নেই—সাম্রাজ্ঞী আছেন। একি হল? তার পরে রাজা রাজড়াদের সোয়ারীর স্রোত চলল। সোনা রূপায় গাড়ী, অনুযাত্রিকদের নানা রকমের পোষাক, ঘোড়ার নানা রকম আভরণ, নানা সুরের ব্যাণ্ড। সিকিমরাজের অনুচরদের একরকম পোষাক, ভুটানের আর একটু রকমারী ধরণের, বর্ম্মিরাজের অতি অদ্ভুত, এক মধ্যদেশরাজার আরও কিছুত। এর মধ্যে ভূপালের বেগম এলেন। খোলা গাড়ী, মুখে পরদা, দুধারে ঝুঁকে ঝুঁকে প্রত্যভিবাদনে রত, বাম পাশে প্রেসিডেণ্ট সাহেব সমাসীন, সম্মুখে পৌর। দর্শক মেয়ে মহলে একটা মস্ত আনচান পড়ে গেল। "ছি—ছি—এদিকে পরদা, এদিকে পরপুরুষ পাশে বসে।" একজন বেগমের পক্ষ নিয়ে বল্লেন "তা কি করবেন—গবর্ণমেণ্টের হুকুম—প্রেসিডেণ্টকে পাশে বসাতেই হবে।" সে সাফাই কারো মনে ধরল না। সবাই তারস্বরে বলাবলি করতে লাগলেন "হাঃ গবর্ণমেণ্ট যদি হুকুম দিতেন যে মুখের পরদা খুলে তোমায় যেতে হবে, তা কি উনি মানতেন? তবে পর্দ্দানসীন বেগম হয়ে পরপুরুষকে পাশে বসিয়ে যেতে কেমন করে রাজী হলেন? তিনি যদি বসতেন এতে পর্দ্দানসীন স্ত্রীলোকের সম্বন্ধের হানি হবে—তবে গবর্ণমেণ্ট কখনই জোর করে প্রেসিডেণ্টকে পাশে বসাতেন না।" নানা রকম টীকা টীপ্পনী চলতে লাগল। উপস্থিত মেয়েদের মধ্যে বেগমসাহেবের সমানধর্ম্মিণী মুসলমান রমণীও অনেক ছিল।

যখন প্রোসেশনের শেষ কণাটুকুও মিলিয়ে গেল—গৃহাভিমুখী দর্শকের ভিড় ঠেলে যে যার আপনাপন ঘরে ফিরে এল তখনও পরস্পরের মধ্যে সেই প্রশ্ন চলতে লাগল—"সম্রাটকে দেখেছ? সম্রাটকে চিনতে পেরেছিলে?" কেউই দেখেনি, কেউই চেনেনি। সহরে একটা জনরব উঠল যে সম্রাট প্রোসেশনে যাননি—তাঁকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কেউ বল্লে—না তিনি ঘোড়ার উপর ছিলেন কিন্তু কোন্ ঘোড়াটা তা কেউ চিনে পারে নি। কেউ বলে তিনি আজ দাড়ি কামিয়ে এসেছেন যেন কেউ চিনতে না পারে—স্ত্রীলোকে দুই অভিসন্ধি পূরণ করতে না পারে। ফল কথা সকলেই বড় নিরাশ ও অসন্তুষ্ট হয়ে গেল—রাজদর্শন হল না—যাঁর জন্যে রাত থাকতে সেনা ৪টা পর্য্যন্ত অনাহারে অনিদ্রায় সকলে এত কষ্ট স্বীকার করলে, যাঁর জন্যে এত উদ্যোগ এত হাঙ্গাম তাঁকেই কেউ দেখতে পেলে না—তিনিই নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন।

প্রজারা সেদিন রাজদর্শন পেলে না কিন্তু ভারতবর্ষীয় রাজাগণ, তাঁদের বড় বড় অনুচরেরা ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লাটেরা সম্রাটের দিল্লী পদার্পণের ক্ষণবিলম্বেই একটা পাহাড়ের উপর

সমবেত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। প্রোসেশনের পর সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী সেইখানে গিয়ে অভ্যর্থনা গ্রহণ করে পশ্চাৎ স্বীয় শিবির আবাসে যান। পরদিন সম্রাট এডওয়ার্ড মেমোরিয়ালের প্রস্তর স্থাপনের জন্যে সহরের এক অংশ দিয়ে যাত্রা করবেন বলে রাস্তায় দুধারে আবার জন সমাবেশ হ'ল। প্রতিদিনই এই রকম চলতে লাগল। সেই প্রথম দিন ছাড়া বাকী সব দিনই সম্রাট সম্রাজ্ঞীর পাশে গাড়ীতে বসে গিয়েছিলেন—তাঁর উপর রাজছত্র ছিল, সুতরাং তাঁকে অতিজ্ঞানের আর অসুবিধা হয়নি।

দরবার।

দরবারের দিন এল। দরবারের amphitheatre কলিকাতার amphitheatre এর ধরণে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক সুদৃশ্য আর অনেক প্রকাণ্ড। চৌদ্দ হাজার স্ত্রী পুরুষ এতে বসেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন ব্লকে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেদের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাই বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে থাকলে কেউ কারো দর্শন পাননি। Amphitheatre এর সামনে ইডেন গার্ডেনের ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ডের মত একটা গোলাকার উচ্চ গৃহ। তার সব উপরের থাকে দুখানি সিংহাসন পাতা রয়েছে। নীচে ও আশেপাশে চৌকি রয়েছে। হাত কতক দূরে আর একটা গোলঘর, সেটা আর এক দল দর্শকমুখী। তার উপর শুধু দুটি সিংহাসন। Amphitheatre এর সামনাসামনি বহু যোজন পর্য্যন্ত অর্দ্ধগোলাকারে Mound—অর্থাৎ উচ্চাকার স্থান—সেখানে সহস্র সহস্র সাধারণ লোকে বসবার স্থান পেয়েছে। সেই লোকময় অঙ্কস্থলের প্রসারটিকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে। যেন একটা প্রকাণ্ড উদ্যানে নানাজাতীয় ফুল ফুটে রয়েছে। দূরের থেকে মানুষের মুখ দেখাই হচ্ছে না—শুধু এক জায়গায় খানিকটা হলদে দেখা যাচ্ছে,—একটা জায়গায় সবই নীল—এক জায়গায় সবই লাল, আর মধ্যে মধ্যে শাদা কালো সবুজ গোলাপী ও যতগুল রঙের যত রকম মিশ্রণ সম্ভব তাই। একটা প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া ঢালু বাগানে যেন নানা রঙের ফোপাটি ফুটে রয়েছে মনে হচ্ছে। এমন রঙের খেলা কখনো দেখিনি।

God save the King বেজে উঠ্‌ল, হাজার নরনারী দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। Viceroy ও তাঁর পত্নীর গাড়ী সামনের মণ্ডপে এসে দাঁড়াল। তাঁরা দুজনে সিংহাসনের নীচের তলায় বিস্তৃত দুখানি চৌকিতে বসলেন। একটি ছোট্ট রাজকুমার লেডি হার্ডিংয়ের page হবার জন্য প্রস্তুত ছিল। তাকে অগ্রসর করে আনতে তিনি তাকে আদর করে বুক করে কাছে বসালেন। আবার God save the King বাজল, আবার লোকেরা উঠে দাঁড়ালে। এবার সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী এলেন। অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় রাজকুমার তাঁদের page হয়ে তাঁদের বিলম্বিত বহুমূল্য পরিচ্ছদের প্রান্ত ধরে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হতে লাগল। তাঁরা সিংহাসনে আসীন হলে, রাজকুমারেরা সিঁড়ির ধাপে ধাপে বসে পড়ল। একটা নাট্যশালায় যেন যবনিকা উদ্‌ঘাটিত হল; এবার সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর মাথায় মুকুট পরা। খেলার তাসে, গল্পের বইয়ে, ইংরিজি রূপকথার ছবিতে

সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী

যেমন রাজা রাণী দেখা যায় ঠিক তেমনি। এ কি সত্যি ইংলণ্ডের রাজা ও রাণী এত দূর থেকে এত সমুদ্র নদী পাহাড় ও মরুভূমি অতিক্রম করে আজ ভারতবর্ষে দিল্লীতে এসেছেন দরবার করার জন্য! উইণ্ডসর কাসেলে, পার্লামেণ্টে, য়ুরোপের বড় বড় নগরীতে যাঁদের গতিবিধি ক্রিয়া-কলাপের কাহিনী কাগজে পড়া যায়, তাঁরা আজ সত্যিই ভারতীয় প্রজার চোখের সামনে সশরীরে উপস্থিত? ঐ যে কিছু দূরে ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যাচ্ছে, যেখানে মহারাজা যুধিষ্ঠির এক দিন রাজচক্রবর্ত্তী রাজা হয়েছিলেন, রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। পৃথ্বীরাজও একদিন যেখানে রাজত্ব করে গেছেন। তারপরে মোগল বাদশাহদের স্মরণ চিহ্নাবলী তার পাশেই বর্ত্তমান। আজ ব্রিটন বাদসাহের রাজসূয় যজ্ঞ সেই ইন্দ্রপ্রস্থ সেই দিল্লীর বুকের উপর। সেকালের ছবি ও আজকের ছবিতে কত তফাৎ। সেকালে শুধু সেকালই ছিল। আজ সেকাল ও একালে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে মিলিয়ে মিলিয়ে নূতন রঙের খেলা বেরিয়েছে। এই যে এত ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা এখানে উপস্থিত রয়েছে যুধিষ্ঠির বা পৃথ্বীরাজ বা আকবরের দরবারে তাদের অস্তিত্ব কল্পনারও অগোচর ছিল। আর এই যে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় লোককে নিয়ে ব্রিটিশ-রাজের দরবার আর কোন King George এর কালে তা স্বপ্নেরও অগোচর হত। আজ এত ইংরেজকে এত ভারতীয় লোকের সঙ্গে একত্রে দরবারে বসতে দেখে বারম্বার এই উপলব্ধি হতে লাগল—এ রাজা আমাদেরও বটে, তোমাদের একলার নয়,—তা যদি হত তোমাদের রাজা তোমাদের দেশেই থাকতেন, রাজদর্শন কর্ত্তে হত ত তোমরাই সেখানে যেতে। রাজা আমাদের ভারতবর্ষীয়দের; তাই রাজা স্বয়ং প্রজার দেশে এসে প্রজাকে রাজদর্শন দিতে এসেছেন, প্রজার ভক্তি নিতে এসেছেন। তোমরা আমাদের fellow subjects মাত্র তার বেশী আর কিছুর ভড়ং আর মানছিনে। এবার আসল দেখেছি, নকলে আর ঠকছিনে।

সম্রাটের কাছে গিয়ে ভারতবর্ষের বড় বড় রাজারা একে একে অভিবাদন করে এলেন। নানা রাজা নানা ঢঙে করলেন। যিনি যত মাটির সঙ্গে নত হয়ে পড়লেন ইংরেজ দর্শকেরা তাঁকে তত হাততালি দিতে লাগল—যেন সম্রাট-ভক্তি আর আত্ম-অবনতির মাপ কাঠিটা একই। ইংরেজ লাটেরা যে ভঙ্গিতে সম্রাটকে অভিবাদন জানিয়ে ছিলেন আমার বোধ হয় তার চেয়ে সুন্দর ভঙ্গি আর কিছু হতে পারে না। সকলেরই সেইটের অনুকরণ করা উচিত। Military salute এর ভিতর আত্মমর্য্যাদার সঙ্গে যে রাজভক্তি বিকশিত হয় তাতেই পৌরুষ ও নম্রতার শ্রেষ্ঠ সম্মিলন।

দরবারের পূর্ব্ব থেকে ভারতবর্ষীয় শত শত রাজার শিবিরনিবাসে পর্য্যটন করতে করতে আর রাজারাণী নবাব বেগমদের সঙ্গে দেখাশুনা কথাবার্ত্তা হতে হতে মনে হয়েছিল আর আজ দরবারেও অনুভব করলুম—ভারতবর্ষ একটি সুবৃহৎ ভূমিস্থান বা সুবৃহদ্বানন—তাতে শত শত ফুল ফুটে রয়েছে। এমন বিরাট ফুলবাগানের খবর-

দারির জন্যে একজন সর্দ্দার মালির নিতান্তই প্রয়োজন। যে দেশে ছোট বড় এত রাজা, যে দেশে ধর্ম্মের ঐক্য নেই, বর্ণের ঐক্য নেই, জাতির ঐক্য নেই, যেখানে দণ্ডের ভয় না থাকলেই রাজায় রাজায় কাড়াকাড়ি মারামারি অনুষ্ঠাবী—সেখানে একজন পরাক্রান্ত চক্রবর্ত্তী রাজার প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দিগ্ধ। আর চক্রবর্ত্তী রাজা যদি থাকতেই হয় তবে ইংলণ্ডের মত এমন constitutional রাজ্যের রাজাকে আমাদের মাথার উপর সম্রাট করে রাখবার সৌভাগ্য কৃতজ্ঞমনে স্বীকার করে নেওয়াই আমাদের ধর্ম্ম। রাজাদের অভিবাদন শেষ হলে সম্রাট উঠে দাঁড়ালেন। হাতের কাগজ থেকে পড়তে লাগলেন, সব কথা শুনা গেল না, কোন কোন শব্দ কাণে পৌছল মাত্র। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের মর্ম্ম একখানা ছাপান কাগজে তখনই দেখলাম। বঙ্গচ্ছেদ রহিত হয়েছে আর রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়েছে! বুকের ভিতর রক্ত চনচনিয়ে উঠল। এক মিনিট পার্শ্ববর্ত্তী লোকেদের সঙ্গে কথা কইবার শক্তি রইল না। মনে হল এক হাতে কে স্বর্গ দিলে, আর এক হাতে ঠাস্ করে সভার মাঝে চাপড় মেরে চলে গেল। সুখী হব কি দুঃখী? ভিন্ন দেকেও মন টলমল করে স্থির হল। বুক বেঁধে নিলুম, মুখে আনন্দ ছাড়া আর কিছু দেখাব না। পার্শ্ববর্ত্তী পশ্চাৎবর্ত্তী ও সম্মুখবর্ত্তী ইংরেজ সাহেব মেম ও ভারতবর্ষের বঙ্গেতর প্রদেশীয় স্ত্রী পুরুষদের বদনে "জয় রাজের জয়। সম্রাটের জয়! ভারতের জয়! লোকবাণী যে ঈশ্বরের বাণী প্রজার আবেগ যে ঈশ্বরাদেশ এ কথা সম্রাট আজ মানলেন (People's voice is Gods voice), এর চেয়ে বড় কথা এ দেশের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না। এত বড় Magna charta কোন পরাধীন জাত পায়নি। আজ জানলুম আমরা পরাধীন নই, আমরা স্বাধীন—আমাদের স্বরাজ, সেই স্বরাজের সম্রাট ইনি কিং জর্জ।"

"আর রাজধানী হরণ? তাতে তোমাদের ক্ষতি হবে না?" "কিছু হবে। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আমলা। তার সঙ্গে বঙ্গচ্ছেদের সঙ্গে কোন যোগ নেই। আমরা যে বিষয়ে আপত্তি করেছিলুম, আন্দোলন করেছিলুম সম্রাটের দরবারে সে মকদ্দমায় আমাদের জিৎ হয়েছে। —bureaucracyর উপর peoples victory —এইটেই একমাত্র আমাদের দেখবার জিনিষ আর দিল্লী হোকনা রাজধানী; বাস্তবিকই দিল্লীর তাতে চিরন্তন অধিকার আছে। দিল্লী রাজধানী হলে তাতে আশপাশের বাসিন্দাদের যদি উন্নতির সম্ভাবনা থাকে, তারা যদি বাঙ্গালীদের সমান সব বিষয়ে তৎপর হয়ে উঠে তাতে বাঙ্গালীরা সুখী হবে। রাজধানী সরে গেল বলে বাঙ্গালীর পতন হবেনা, তারা যেখানে উঠে বসেছে সেখান থেকে হুকুম পড়বেনা—আরও উচ্চে আরও উচ্চে উঠতে থাকবে।"

সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী সেখান থেকে নেমে দ্বিতীয় গৃহটাতে উঠলেন। এবার আমাদের দিকে পিঠ করে Moundএর দিকে লক্ষ লক্ষ প্রজার সম্মুখীন হয়ে সিংহাসনে বসলেন। রাজা মৌন হলেন, ভেরী নিনাদে রাজার আজ্ঞা চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হতে লাগল। ইত্যবসরে সাহেব মেমেরা, কেউ কাগজের বাক্স থেকে কেউ থলির থেকে, কেউ পকেট

থেকে ভাঙা উইচ, বিস্কট, চকোলেট, কেক প্রভৃতি বার করে খেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সম্রাট প্রস্থানোদ্যত হলেন। রাজকুমারেরা আবার তাঁদের বস্ত্রপ্রান্ত ধরলে, ধীরে ধীরে মরাল গমনে সম্রাট সাম্রাজ্ঞী—গাড়ীর উপর গিয়ে উঠলেন। হাততালি ও হিপ্ হিপ্ হুররের গর্জ্জন চলতে লাগল। আবার God Save the King বাজল।

এই God Save the King আজ কত বৎসর ধরে ভারতবর্ষীয় প্রজারা শুনে আসছে, শিখে আসছে, গেয়ে আসছে। কিন্তু এতদিন এটা একটা রূপকমাত্র ছিল, একটা প্রাণহীন বচন, সব সাধারণ অনুষ্ঠানের শেষে অবশ্য-পালনীয় একটা শুষ্ক প্রথামাত্র। কিন্তু আজ সেটা কত সরস হয়ে উঠেছে, কত সজীব, কত প্রাণময়। আজ তার বাক্যে বাক্যে পদে পদে যথার্থ সার্থকতা আছে। ব্যাণ্ড বাজল—

God save our gracious King

আমাদের মনে প্রতিধ্বনি হল—

হে ঈশ্বর, হে ভারতের ভাগ্যবিধাতা, এ হৃদয়বান প্রজারঞ্জক রাজাকে রক্ষা কর!

Long live our noble King

এই মহাপ্রাণ রাজাকে দীর্ঘায়ু কর

Send him Victorious, happy

and glorious

Long to reign over us

একে জয়শালী, গৌরবশালী ও সুখী করে আবার আমাদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এস—এমন রাজা শতায়ু হয়ে আমাদের উপর রাজত্ব করুন।

God Save the King.

আহা যিনি আমাদের ক্ষত হৃদয়ে প্রলেপ লাগাতে এত দূরের থেকে এসেছেন, তিনি যেন অক্ষত হয়ে ফিরে যান, যেন কোন দুরভিসন্ধির গুপ্ত সন্ধান তাঁর পিছনে পিছনে ফিরে না বেড়ায়।

God Save the King

ভগবান এঁকে রক্ষা করুন।

ব্যাণ্ডের প্রার্থনা শুনতে শুনতে আজ প্রথম আমার চোখের কোণে একফোঁটা জল এল। সম্রাটের গাড়ী দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। অপূর্ব্ব নাট্যাভিনয় শেষ হয়ে গেল। একখানি দৃশ্যপট এখনও উঠতে বাকী ছিল। লর্ড হার্ডিং ও লেডি হার্ডিংয়ের গাড়ী এল। তাঁরা উভয়ে প্রসন্ন দৃষ্টিতে হাসিমুখে দুধারে নমস্কার করতে করতে অদৃশ্য হলেন। রাজ-প্রতিনিধি স্বরূপ লর্ড হার্ডিংয়ের জন্যও—God Save the King বাজতে লাগল। সে বাজনা মনে করিয়া দিলে সত্যি ত, প্রজার এমন চিত্ত বিনোদন করলে কে? এই রাজপ্রতিনিধিই ত তা করেছেন। এই রাজ প্রতিনিধির ভারত রাজক্ষেত্র বিচরণের পথ প্রতি পদক্ষেপে প্রজার সঙ্গে সহানুভূতিতে মণ্ডিত। তাঁরই পরামর্শে তাঁরই উদ্যোগে, তাঁরই চেষ্টায় আজ প্রজার কণ্ঠ বিধাতার কর্ণে বলে গণ্য হয়েছে। ভগবান তাঁকে রক্ষা করুন, ভগবান তাঁকে দীর্ঘায়ু করুন হে বিধাতা এমন রাজ-প্রতিনিধি জন্ম জন্ম আমাদের উপর রাজত্ব করুন।

অন্তত বাক্যে—

"এখন আমার যদি আর কিছু প্রার্থনা তবে সে এই:

গাভী হোক দুগ্ধবতী, শস্যপূর্ণা বসুমতী
মেঘ কালে করুক বর্ষণ।
সকল জনের চিত্ত করিয়া গো হরষিত
বহে যেন মধুর পবন।

বৈদ অনুষ্ঠানে রত, বিপ্র হোন অবিরত
মন্ত্রপূত হোন সাধুগণ।
রিপু কুল প্রশমন, নৃপ বর্গ পরায়ণ
পৃথিবীরে করুন পালন!—

শ্রীসরলা দেবী।

হিজলী কাঁথির একটী প্রাচীন কাহিনী।

নিম্নবঙ্গের প্রান্তবর্ত্তিনী হিজলী প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যিনি অবলোকন করিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। একদিকে ধবল শিখরমালা শোভিত বহুযোজন পর্য্যাপী বন্ধুর চালুকা স্তূপশ্রেণী, অন্যদিকে 'ধারা নিবন্ধের কলঙ্করেখা তনুপারাবারের' সুন্দর দৃশ্যই ইহাকে এত মনোরম করিয়াছে। বঙ্গের অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ইহার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, 'কপালকুণ্ডলা'র পাঠক মাত্রেই তাহা জ্ঞাত আছেন। এই হিজলীতেই আমরা—তাঁহার কাব্যের চরমসৃষ্টি —নিছক সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি সৌন্দর্য্য সুষমা-মণ্ডিতা, প্রকৃতিপালিতা, সরলতাময়ী বালিকা মৃন্ময়ীর প্রথম সাক্ষা পাই; আবার —এই হিজলীই তাঁহার সেই নর-রাক্ষস কাপালিকের লীলাভূমি। কোমল ও কঠোরের অপূর্ব্ব সম্মিলন ক্ষেত্র।

কপালকুণ্ডলার পাঠকগণের মনে কাপালিকের স্মৃতি এরূপভাবে জড়িত যে হিজলীর নাম শুনিলেই কাপালিকের কথা মনে পড়ে। মনে হয়—যেন এখনও 'ঐ অরণ্যগর্ভে বৃক্ষের অন্তরাল দর্পের ন্যায় সেই কাপালিক মুখ ব্যাদান করিয়া বসিয়া আছে, পথভ্রষ্ট অসহায় পথিক পাইলেই গ্রাস করিয়া বসিবে।'

এক সময় এই হিজলীর সহিত 'মসন্দরী সা' বা তাজ খাঁ—মহম্মদ আলি নামক একজন মুসলমান সিদ্ধ পুরুষের নাম সমস্ত নিম্নবঙ্গে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা বর্ত্তমান এ প্রদেশের লোক ব্যতীত অন্যের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এক সময় তাঁহার নামে কি হিন্দু, কি মুসলমান, নিম্নবঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বনিতার মস্তক ভক্তিতে অবনত হইত। এখনও এ প্রদেশের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই তাঁহাকে সমভাবে পূজা করিয়া থাকেন। মসন্দরী সার নাম এ প্রদেশের ধনী দরিদ্র সকলের নিকটেই সুপরিচিত। হিজলীর কাপালিকের অস্তিত্ব কবি-কল্পনা প্রসূত;— মসন্দরী সা ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

পৃথিবীতে কাহারও চিরদিন সমান যায় নাই। হিজলীরও এক সময় গৌরবের দিন আসিয়াছিল। যে নবাববংশ হিজলীর সিংহাসনে বসিয়া এ প্রদেশের উপর শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন, যে বংশীয় নবাব ঈশা খাঁ মসন্দরী বঙ্গগৌরব মহারাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন এই তাজ খাঁ মসন্দরীও সেই বংশীয়। তাজ খাঁ মসন্দরী ১৫৩৫ খৃঃ অব্দ

হইতে ১৪১৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এ প্রদেশের রাজা ছিলেন। তিনি অতি ধার্ম্মিক ও ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অটল ধর্ম্ম বিশ্বাস, মহাপ্রাণতা ও ত্যাগস্বীকারের বৃত্তান্ত বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি নিজে রাজ কার্য্যাদি কিছুই দেখিতেন না—সর্ব্বদাই ধর্ম্মকার্য্যে—ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার ভ্রাতা সিকান্দর আলিই রাজকার্য্যাদি পর্য্যালোচনা করিতেন। সিকান্দর একজন রাজকার্য্যনিপুণ বীর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বীরত্বের অনেক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। এ প্রদেশে তিনি "সিকান্দর পাণ্ডুয়ান," নামেই পরিচিত। কথিত আছে যে তিনি এক দিবস—তৎকালীন সুবাদার বাহিনীকে পর্য্যন্ত পরাস্ত করিয়াছিলেন।

১৪১৪ খৃঃ অব্দে সিকান্দর পরলোক গমন করেন। যতদিন সিকান্দর জীবিত ছিলেন, ততদিন তাজখাঁ মসন্দরীকে রাজকার্য্যাদি কিছুই দেখিতে হইত না—কিন্তু সিকান্দরের মৃত্যুর পর তাঁহার হস্তেই সমস্ত কার্য্যের ভার পড়ে। এইরূপ কিম্বদন্তী যে তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যাঘাত হইতেছে অনুভব করিয়া তিনি পর বৎসর ১৪১৫ খৃঃ অব্দে স্বেচ্ছায় জীবিতাবস্থায় 'কবরস্থ' হয়েন। তাজ খাঁর লোকান্তর হইলে তাঁহার বংশধরগণ বহুদিন যাবৎ এ প্রদেশের উপর আধিপত্য করিয়াছিলেন। পরে এই বংশের—শেষ নবাব ঈশা খাঁর রাজত্বকালে মহারাজা প্রতাপাদিত্য হিজলী আক্রমণ করিলে জলে ও স্থলে অষ্টাদশ দিনব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের পর ঈশা খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। প্রতাপাদিত্য, ঈশা খাঁর কন্যা পাতা ও ঈশার পট্টনায়েক নামক দুইজন হিন্দু কর্ম্মচারীর হস্তে হিজলীর রাজস্ব আদায় ও বিচার শাসনভার ন্যস্ত করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরবর্ত্তীকালে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হইলে ঐ দুইজন কর্ম্মচারী তৎকালীন দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া হিজলীর শাসনে যথাক্রমে জলামুঠা ও মাজনামুঠা জমিদারীর ভিত্তি স্থাপন করেন।

হিজলীর এখন আর সেকালের শ্রী-সৌভাগ্য কিছুই নাই। চারিদিক বন জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নবাব বংশের প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহের অধিকাংশই বঙ্গোপসাগর ও রসুলপুর নদী গ্রাস করিয়াছেন। এখন কেবল কতকগুলি ইষ্টক স্তূপ ও তাজ খাঁ মসন্দরীর মস্‌জিদটী পূর্ব্ব গৌরবের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছে। তাহাই লইয়া স্বদেশ বিদেশের ইতিহাসতত্ত্বজ্ঞ ও দর্শকগণ মধ্যে মধ্যে অতীত গৌরবের বিলুপ্ত কাহিনীর অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। যাহা আছে কালে তাহাও ধ্বংস হইয়া যাইবে—থাকিবে কেবল তাজ খাঁ মসন্দরীর পবিত্র নাম আর তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের কাহিনী। সেইজন্য বঙ্গের একজন খ্যাতনামা লেখক বলিয়াছেন —"বনবাসের শেষ চিহ্ন এইরূপ প্রস্তর খণ্ড বা ইষ্টক স্তূপ।" হিজলীর নবাব-তাজ খাঁ মসন্দরীকে লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু হিজলীর সেই সর্ব্বত্যাগী—"ফকির মসন্দরী" বলিলে আজও সকলেই তাঁহাকে চিনিতে পারে!

রসুলপুর নদী যেখানে বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে—তাহার পূর্ব্ব তটে মসন্দরী পীর মস্‌জিদটী অবস্থিত। এই

স্থানটী 'কলমা হিজলী' নামেই পরিচিত। মস্‌জিদটী সমুদ্রের এত নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত হইলেও এইরূপ কিম্বদন্তী যে, সমুদ্রের জল কখনও কোন সময়ে মস্‌জিদের সীমার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। এমন কি ১৮৬৩ খৃঃ অব্দের ভীষণ সাইক্লোনের সময় যখন এদেশের সমস্ত ভূমিই প্রায় জলে ডুবিয়া গিয়াছিল তখনও ইহা নিজ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া অনেক নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়াছিল। মস্‌জিদটী দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় ৫০+২৫ হাত। ইহার উপরে তিনটী গম্বুজ আছে, এবং সম্মুখে ও পার্শ্বে মসন্দরী সায় ও সিকান্দরের এবং তাঁহাদের স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি স্ত্রী পুরুষের অনেকগুলি সমাধি আছে। সমাধিগুলি ইষ্টক নির্ম্মিত, মধ্যে মধ্যে মেরামত করা হয়। সিকান্দরের সমাধি পার্শ্বে একটী লৌহদণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, উহা ওজনে প্রায় এক মণ হইবে। কেহ কেহ ইহাকে সিকান্দরের যষ্টি বলিয়া থাকেন।

মস্‌জিদটীর প্রাঙ্গণে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী সমস্ত কূপ ও পুষ্করিণীর জলই ঈষৎ লবণাক্ত; কিন্তু ইহার জল অতিশয় নির্ম্মল ও সুস্বাদু। জনশ্রুতি যাহাই থাকুক না কেন, লবণ-সমুদ্রের পার্শ্বে থাকিয়াও কিরূপে যে ইহার জল এরূপ সুমিষ্ট হইল ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। পুষ্করিণীতে নামিবার সিঁড়ি ও জল পর্য্যন্ত চারিদিকে প্রস্তর দিয়া বাঁধান। কিন্তু ইহার গাত্রে ও পার্শ্বে বড় বড় গাছ জন্মিয়া ইহাকে ধ্বংসের পথেই আনিয়াছে।

মস্‌জিদের অনতিদূরে রসুলপুর নদীর মোহনায়—একটী তালবৃক্ষ আছে—এরূপ উচ্চ বৃক্ষ প্রায় দেখা যায় না। যাঁহারা জাহাজে বঙ্গোপসাগর বক্ষে—কলিকাতা হইতে চাঁদবালী কিম্বা পুরী প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিয়াছেন তাঁহারা অনেক দূর হইতেই এই বৃক্ষটীকে দেখিয়া থাকিবেন। শুনিলাম এই কারণে Marine Department কর্ত্তৃক মধ্যে মধ্যে ইহার গোড়ায় মাটি দেওয়া হইয়া থাকে, এবং ঝড় ও বন্যা ইত্যাদি দুর্ঘটনার সম্ভাবনা দেখিলে ইহার উপর নিশান বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কথাটি কতদূর সত্য জানি না, তবে বর্ত্তমানে বৃক্ষটির অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আর যে ইহাকে বহুদিন এরূপ উন্নত মস্তকে দাঁড়াইতে দেখা যাইবে তাহা ত বোধ হয় না। হিজলীর অবশিষ্ট কীর্ত্তিরাশির সঙ্গে ইহাকেও আর কিছু দিন পরেই চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হইতে হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু।

সমালোচনা।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব। ২য় ও ৩য় ভাগ। শ্রীযুক্ত ডাক্তার হরিনাথ ঘোষ এম, ডি, প্রণীত। আমি যত্নের সহিত এই পুস্তক দুখানি পাঠ করিয়াছি। বই দুখানি ছেলেমেয়েদের পাঠোপযোগী হইয়াছে। ডাক্তার সাহেবের নিজের পোষাকে ও কথাবার্ত্তায় অনেক ইংরাজী ভাব থাকিলেও এই পুস্তকখানি সহজ ও সুন্দর বাঙ্গালাতেই রচিত। বক্তব্য বিষয়গুলির মূলতত্ত্ব সবই অতি সরল কথায় বলা হইয়াছে। পুস্তকখানি পড়িতে বা বুঝিতে কষ্ট হয় না, অনেক জটিল ও কূট

মোটে ভাল করিয়া বুঝান আছে। ছবিগুলির নির্ব্বাচনও সুসঙ্গত হইয়াছে, সেগুলি দেখিলেই তাহার প্রকৃত ভাব ও তাৎপর্য্য বুঝা যায়।

পুস্তকখানি শুধু বালকবালিকা নয় আমাদের দেশের যুবকযুবতী ও আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই পড়া উচিত। কারণ যাহাদের সম্বন্ধীয় গুরুতর বিষয়ের আলোচনা এগুলি এমন কি আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই জানেন না।

পুস্তকখানি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিলেই ভাল হয়। এ গ্রন্থে কোনরূপ মিষ্ট কথা লিখিয়া লোক তুষ্ট করিবার প্রয়াস নাই। ইহাতে যাহা সম্বন্ধে অনেকগুলি রুঢ় সত্যের তীব্র প্রতিবাদ আছে।

আমাদের এখন এমন অবস্থা যে শিক্ষিত লোকেও হিতাহিত বুদ্ধিরাও কার্য্যে তাহা পরিণত করিতে পারেন না। জ্ঞান আসিলেও সময়ে কার্য্য আসে না। এইরূপ অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি শিশু বয়স হইতে শিখাইলে ফল অনেক সুফল হইবে।

পুস্তক দুখানি বিদ্যালয় এবং সাধারণ এই উভয়বিধ পাঠ্য হইবারই উপযোগী হইয়াছে।

(ডাকায়) শ্রীঅমূল্যধন মল্লিক।

গোধূলি। শ্রীযুক্ত ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী এম এ, বি, এল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্তকৃষ্ণ চৌধুরী বি, এল, বসিরহাট। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। এখানি কবিতাগ্রন্থ। 'গোধূলির' কবি বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহার রচিত 'মঞ্জরী' পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ভাষার লালিত্যে, ভাবের মৌলিকতায় ও অভিনবত্বে এবং ছন্দের বৈচিত্র্যে ও ঝঙ্কারে 'গোধূলি'র কবিতাগুলি পরম উপভোগ্য হইয়াছে। 'মঞ্জরীতে' কবি যে প্রেমের গান গাহিয়াছিলেন—যৌবনের মোহময়, ধমনি-বিহ্বল হৃদয়ের চপলতার উচ্ছ্বাস সে। 'গোধূলিতে' সান্ধ্য সমীরে হৃদয়ের আনন্দ-সঙ্গীত। আসন্ন সন্ধ্যার গম্ভীর রাগিণী কবিতাগুলির সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে—যাহাদের এক বিচিত্র ভাবের সে ঐকতান। কবি গাহিয়াছেন, "হে রূপসি! খুলে দাও বাহুপাশ, তোমার এ মোহন রূপমোহ অন্ধকারিকায়—যামিনী সরম ঘনে; মায়া-অভিনয় কর সাঙ্গ। এ উষায় বাসরনিশির কর মোহ; চিত্ত পুন কর নির্ব্বিকার। নির্ব্বাণ লভুক আত্মা তোমার মাঝার।" 'বসু সন্ধিনম', 'বিদায়', 'সিন্ধু' 'কাল-বৈশাখী' প্রভৃতি কবিতাগুলি কাব্য সাহিত্যে অপূর্ব্ব সৃষ্টি। কবির 'বিদায়' ও 'ছায়াপথ' পাঠ করিবার জন্য আমরা উৎসুক হইয়া রহিলাম। যাঁহারা প্রকৃত ভাবুক পিপাসু, তাঁহারা 'গোধূলি' পাঠে সুখী হইবেন, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ সুন্দর হইয়াছে।

অশোক। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীকেশবচন্দ্র চৌধুরী, সিটিবুক সোসাইটি কলিকাতা। কালিকা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১।০ টাকা। গ্রন্থকার বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। নানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পুঁথি, লিপির সাহায্যে তিন বৎসরের ঐকান্তিক চেষ্টা ও পরিশ্রমে গ্রন্থকার অশোকমুখের বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্য ও অশোকের জীবনী সঙ্কলন করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন গ্রন্থাদির বিভিন্ন মতাদি আলোচনা করিয়া যুক্তিতর্কে যে মত স্থির করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া আমাদিগের মনে হয়। লিপিকুশলতার গুণে গ্রন্থখানি উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য হইয়াছে। ঐতিহাসিক তথ্যসংগ্রহে গ্রন্থকার অসাধারণ অধ্যবসায় পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীন মগধ, চন্দ্রগুপ্ত, আলেকজাণ্ডার, ও মৌর্য্যরাজ্য স্থাপনার কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অশোকের মৃত্যুকাল অবধি যেন একটি ধারাবাহিক ইতিহাস গ্রন্থকার সঙ্কলন করিয়াছেন। পাঠে কোথাও বৈষম্যচ্যুতি ঘটে না, বর্ণনা এমনই সরল হইয়াছে। গ্রন্থে কয়েকখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ছাপা কাগজ ও বাঁধাই পরিপাটি হইয়াছে। গ্রন্থখানি আমাদের লাইব্রেরীর শোভা সমধিক বৃদ্ধি করিবে, সে বিষয়ে আমাদিগের কোন সন্দেহ নাই।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৫৫, গুড় বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

ডাকহরকরা

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতী

৩৫শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩১৮ [১১শ সংখ্যা

অন্নপূর্ণার মন্দির।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিশ্বেশ্বর কুঠীর সহিত কারবার অনেকদিন ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাহাদের সহিত মতের মিল না হওয়াই তাহার কারণ। সে কারবার ছাড়িয়া দিয়া রবি শস্যের ও ধান্যের আড়ত করিয়া এবং অনেক জমী জমা কিনিয়া বেশ একটু ফলাও কারবার করিয়া তুলিয়াছিল। ইহা ভিন্ন করাসডাঙ্গা অঞ্চল হইতে কয়েকজন তাঁতী আনাইয়া নিজের জমীতে তাহাদের ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে দেশে স্থাপিত করিয়াছিল। তাহাদের দ্বারা তাঁত বুনাইয়া অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া কলিকাতায় তাহার দোকানে চালান দিত। এই সব নানাকার্য্যে বিশ্বেশ্বর সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত। অর্থের উন্নতি করিতে তাহার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, কেননা অধিক অর্থ না হইলে পশ্চিমে গিয়া যথোচিত কার্য্য আরম্ভ করা হইবে না।

বিশ্বেশ্বর গ্রামের লোকের দারিদ্র্যের জন্য যে একেবারে ভাবিত না তাহা নয়। তবে পাড়াগ্রামে সকলেরই একরূপ সচ্ছন্দে চলে দেখিয়া এবং অযাচিত ভাবে সাহায্য করিতে গেলে কিরূপ লজ্জা পাইতে হয় তাহা সতীদের নিকটে শিক্ষা পাইয়া আর সে গ্রামের লোকের দিকে বড় ঘেঁসিত না। আপনার কার্য্য ও কল্পনা লইয়াই মত্ত থাকিত।

নবদ্বীপে মাসিমাতাকে গঙ্গাস্নান ও ঠাকুর দর্শন করাইয়া পাঁচদিন পরে তাহারা বাটী ফিরিল। বাটী পৌঁছিতে সন্ধ্যা লাগিল। মাসিমা রন্ধনে নিযুক্ত হইলেন, বিশ্বেশ্বর এই অবকাশে আড়ত ও তাঁতশালা ঘুরিয়া আসিল, দেখিল কার্য্যের কোন বিশৃঙ্খলা হয় নাই। আহারে বসিয়া বিশ্বেশ্বর দেখিলেন অন্নপূর্ণার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর অথচ ঈষৎ করুণার আভাযুক্ত। বুঝিল কোন কারণে তিনি নূতন কোন মনঃকষ্ট পাইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিল কি হয়েচে মাসিমা?"

"কই কিছুই ত হয়নি বিশু" বলিয়া তিনি নিশ্বাস ফেলিলেন, নিশ্বাসটা অত্যন্ত পুরাতন; বিশ্বেশ্বর আহার করিয়া যাইতে লাগিল। মাসিমা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে যেন আপনাকে বলিলেন "আহা দেখলেও দুঃখ হয়।"

"কাকে দেখলে দুঃখ হয় মাসিমা?"

এই ভটচাজদের মেয়ে দুটোকে। এই খানিক আগে সতী আমাকে নমস্কার করতে এসেছিল।"

"সতী?

কেন?"

বিশ্বেশ্বর সহসা ভ্রূযুগ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া মাসিমাতার পানে চাহিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তা এলে দোষ কি? নবদ্বীপ থেকে এসেছি

তাই বোধ হয় দেখতে তার মা পাঠিয়েছিল।" বিশ্বেশ্বর আর কিছু বলিল না। একটু অন্যমনা ভাবে তাহার সমাধা করিয়া শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। কি একটা সমস্যার মীমাংসায় মন চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক করিতেছিল। অন্নপূর্ণা ডাকিয়া বলিলেন "প্রদীপে তেল নেই হয় ত,—হাতে করে আন্‌ত বাবা, মেলে দি।"

"আমি এখনি শোব, আলোর দরকার নেই।" বলিয়া বিশ্বেশ্বর শুইয়া পড়িল। কুটিল তর্কটাকে 'অসম্ভব' বলিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া পাশ বালিশটা কাঁকড়াইয়া ধরিয়া নিদ্রার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইল।

প্রত্যূষে উঠিয়া মুখে চোখে জল দিয়া প্রথমে কি করিবে ভাবিয়া লইল। একবার কুঞ্চিত লোচনে ইতস্ততঃ তাহার হস্তস্পর্শশূন্য পুস্তক রাশির প্রতি দৃক্‌পাত করিল। পরক্ষণে বসিয়া একবার অন্যমনস্কভাবে মস্তকের নিকটস্থ তাকের প্রথম পুস্তকখানা টানিয়া লইয়াই বিস্মিত হইয়া দেখিল, এখানা ইংরাজী দর্শনশাস্ত্র, সংস্কৃত সাহিত্যের উপর কে আনিয়া রাখিয়াছে। এ কার্য্য কখনই তাহার কৃত নয়, মাসিমাও এ ঘরে কখনও আসেন না। পুস্তকের উপরের মলাটখানাও একটু উঁচু,—যেন তাহার ভিতরে কিছু লুক্কায়িত আছে। বিশ্বেশ্বর মলাট খানা উল্টাইতেই দেখিল একখানা চিঠি। উপরে মেয়েলি অক্ষরে লেখা "শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর মৈত্রেয় শ্রীচরণেষু।" একি? এ পত্র কে লিখিবে? ত্বরিত হস্তে পত্রের আবরণ খানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিল। কয়েক ছত্র পড়িয়াই অধিকতর বিস্মিত হইয়া পড়িল, হস্ত ও মস্তিষ্ক নানা ভাবনায় চঞ্চল হইয়া পড়িতে লাগিল, চেষ্টা করিয়া ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার প্রথম হইতে পড়িতে আরম্ভ করিল "শতকোটী প্রণামান্তর নিবেদন!

আপনি এই পত্র খানা পড়িতে গিয়া প্রথমেই বিস্ময়ের সহিত ভাবিবেন কে লিখিয়াছে, হয়ত নামও অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন। সেই জন্য পত্রের প্রথমেই আপনাকে জানাইতেছি, আমি সতী।

অনেক কথা লিখিব বলিয়া পত্রখানা লিখিতে বসিয়াছি কিন্তু এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না কি লিখি! লিখিবার অনেক আছে বটে কিন্তু প্রথমে কি কথা বলিয়া আরম্ভ করি। প্রথমেই কি লিখিতে কি লিখিব বলিয়া ভয়ে প্রাণ অবসন্ন হইয়া যাইতেছে, কিন্তু আমার আর এমন কিসের লজ্জা! যাহা কলমে আসিবে তাহাই লিখিয়া যাই; কোনটা গোড়ায় কোনটা শেষে বলিলে ভাল হয় তাহার বিচারের চেষ্টা কেন করি!

আপনাকে আমি এ পত্র লিখিতাম না, আমি যে কার্য্য আজ করিব তাহার সাফাই গাহিয়া রাখিবার আমার কোনই প্রয়োজন ছিল না। নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণের জন্য আমি কাহাকেও কিছু বলিয়া গেলাম না; আপনিও আমার সুখ দুঃখের এমন কোন অংশী নন যে আপনাকে এ কথা না বলিলে চলিত না। সংসারের চক্ষে আমি দোষী, অপরাধীর বেশেই গেলাম, কিন্তু আপনার কাছে এ কথাগুলা না বলিয়া কেন যাইতে পারিতেছি না তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

পাঁচ দিন পূর্ব্বে ঝড়ের দিন বৈকালে আমাদের খিড়কীর পুকুর ঘাটের কথা আপ-

নার মনে আছে কি? সে দিন আপনি যাহাকে ঘাটেতে দেখিয়াছিলেন সে চাঁদপুরের জমিদার নরেন্দ্র ভাদুড়ী। আর পুকুর ঘাটে জলে যে ঝাঁপিয়াছিল সে আমি। ইহা আপনি অবশ্য বুঝিয়াছেন,—কিন্তু কেন তাহা বোধহয় ভাবিয়া দেখেন নাই, অথবা সকলে এরূপ দৃশ্য দেখিলে যেরূপ অর্থ ভাবিয়া লয় তাহাই ভাবিয়া লইয়াছেন। ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ভদ্র লোকের মেয়ের এ কার্য্য সম্ভব কি না?

আমি নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য এ পত্র লিখিতেছি না। আমি দোষী! সত্যই আমি সেই পাপিষ্ঠের প্রলোভনে পতিত হইয়াছি। আমার আর সাধ্য নাই যে এ প্রলোভন হইতে আপনাকে ফিরাই। কিন্তু শুনুন আমি তাহাকে প্রতারণা করিয়াছি। প্রতারণা কেন বলি—সে যাহা চাহিয়াছিল আমি তাহার অনেক বেশী তাহাকে দিতে সম্মত হইয়াছি। সে দেহ চাহিয়াছিল, আমি তাহাকে আত্মা দান করিয়াছি। সে আমার এক জন্ম না হয় অপবিত্র করিত, নষ্ট করিত, আমি সেই মূর্ত্তিমান নরকের দ্বারপালের পায়ে আমার জন্ম জন্মান্তর ইহকাল পরকাল স্বর্গ মর্ত্ত্য সব দান করিয়া বসিলাম। আমি কি তাহাকে প্রতারণা করিলাম?

স্পষ্ট কথায় বলি সে আমায় অনেক টাকা দিতে চাহে। যেদিন তুমি তাহাকে দেখিয়াছ তারপর আর একদিন, গত পরশ্ব যেদিন চাঁদপুরের কুঠির মহাজনেরা আমাদের বাড়ীর দ্বারে ঢেঁটরা দিয়া যায় যে, তিন দিনের মধ্যে উঠিয়া যাইতে হইবে, সেইদিন প্রথম বেলা আবার সে আসে। আমার পায়ের গোড়ায় হাজার টাকার নোট ফেলিয়া দেয়; আমি সে টাকা গ্রহণ করিয়াছি। অদ্য রাত্রে শেষ আসিয়া ঘাটের ধারে দাঁড়াইবে, আমি তাহার সঙ্গে চলিয়া যাইব,—এই কথা। আমি চলিলাম,—আজ আমি নিশ্চয়ই যাইব,—কিন্তু তাহার কাছে নয়,—আর এক জনার কাছে।

জানিনা তিন সংসারের লোক অপেক্ষা সদয় কি নির্দ্দয়! জানি না তিনি আমায় কি শাস্তি বিধান করিবেন। যাহাই করুন আমি তাঁহার হস্ত হইতেই সে দণ্ড গ্রহণ করিব, সংসারের লোকের হস্ত হইতে আর নয়। আর যদি পাপিষ্ঠ নরেন্দ্র আমায় এমন করিয়া প্রলোভিত না করিত! এমন করিয়া আমার নরকের মুখে টানিয়া লইয়া না যাইত, সংসারের কষ্টে, আঘাতে জ্ঞানশূন্য আমাকে এ সুযোগ না দান করিত তাহা হইলে কি আমি মরিতে সাহস পাইতাম! কখনো না!

কাল আমার মা ভাইবোন পথে দাঁড়াইবে! ভিক্ষা করিয়া খাইবে, লোকের উপহাস সহ করিবে হয়ত অনাহারে মরিবে আমি আজ কি তুচ্ছ নিজের মায়ায় এ লোভ সম্বরণ করিতে পারি! আমার আত্মা চিরকাল যন্ত্রণা পাইবে এই ভয়ে আমি আত্মহত্যা হইতে বিরত হইব? যন্ত্রণা বা কষ্টকে ত আমি চিরকালের সাথীর মত জানি। সে কষ্ট কি ইহাপেক্ষাও বেশী? হয় হউক আমি তাহাতে ভীত নই। লোকে আমার নিন্দা করিবে? করিলই বা! আমার মা ভাই বোন ত' কাল বিপদ হইতে মুক্ত হইবেন, এখন কিছুকাল ত তাঁদের সুখে চলিবে! তাহার পর ভগবান হয়ত তাহাদের উপরে প্রসন্নও হইতে

পারেন; আমি তাঁর সে প্রসাদের যোগ্য নই বুঝিয়াছি, তাই নিশ্চিন্ত হইয়া অনেক দিন পরে প্রাণে একটু সুখ অনুভব করিয়া বিদায় লইতেছি। সরলা সাবিত্রীকে এটাকা কুড়াইয়া পাইয়াছি বলিয়াছি,—এ টাকা লইতে দোষ নাই বলিয়া বুঝাইয়াছি, সে আমার উপর একান্ত নির্ভরশীল তাই কিছুই বুঝিতে পারে নাই। আমার বিপদের পরিত্রাণ লাভের আশায় তাহার মুখ আনন্দোৎফুল্ল! এমন মুখ তার অনেকদিন দেখি নাই। সে ত জানে না যে এ টাকা তাহার দিদির শোণিত। ভগবান তাকে তার দিদির শোক ভুলাইয়া রাখিবেন।

তুমি হয়ত বলিবে তোমাকে একবার এ বিপদের কথা জানাইলাম না কেন! একথা তুমি বলিতে পার কেননা তোমার দয়ার শরীর। অনাথাদের তুমি অনেক বার দয়া করিতে আসিয়াছ, দয়া করিয়াছ, কিন্তু আর না। সেই যথেষ্ট! সেই অল্পই আমার বুকে শেলের মত বিঁধিয়া আছে! আর ঋণের ভার বাড়াইতে চাহি না।

তোমাকে অনেক কথা বলিব বলিয়াছি—লিখিলামও কিন্তু গোটাকত আরও কথা আছে। তাহা হইলে আমার বক্তব্য শেষ হয়। মনে আছে কি? একবার টাকা দিয়া দয়া করিতে আসিয়াছিলে? আমি সে টাকা লই নাই। মনে কর কি সত্য তখন আমাদের কোন অভাব ছিল না? তাহা নয়। তুমি আমাদের কে যে তোমার দয়া আমরা লইব? তোমার কি মনে পড়িবে তুমি আমায় সব দিতে পারিতে। আজ তুমি ভিক্ষুক দেখিয়া আমায় দয়া করিতে আসিয়াছ? তোমার ও দয়া আমি কেন লইব! আমি এখন অহঙ্কার করিয়া বলিতেছি, এই আজ প্রথম এবং শেষ,—আমি তোমার দাসী হওয়ার নিতান্ত অযোগ্য ছিলাম না। তবু তুমি আমায় গ্রহণ কর নাই! যদি আর কাহাকেও করিতে বুঝিতাম তোমার স্নেহের অভাব নাই,—কেবল যোগ্যপাত্র পাও নাই বলিয়া গ্রহণ কর নাই—কিন্তু তাহাও কর নাই। আমি বুঝিতেছি তুমি স্ত্রী জাতিকেই ঘৃণা কর। তাই আজ মরিবার সময় অভিশাপ দিয়া যাইতেছি এই অধর্ম্ম জাতিকেই একদিন তুমি ভাল বাসিবে! অধর্ম্ম জাতি কতখানি সমুদ্র বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখে তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিবে। স্বীকার করিবে সংসারে সেই স্নেহের আদান প্রদানই শ্রেষ্ঠ সুখ।

তবে এইবার পত্রের এবং জন্মের মত বিদায়ের শেষ করি। তুমি হয়ত বিরক্ত হইতেছ, আমার ব্যাপিকা ভাবিতেছ। তাহা ভাবিওনা। স্ত্রীলোকে যাহা সহিতে পারে তাহাতে আমি পশ্চাদ্‌পদ হই নাই, সকল দুঃখ অম্লান বদনে মাথায় লইয়াছি, কিন্তু দেখিলাম আমার এ দুর্ভাগ্যের কূল কিনারা নাই, তাই এ জীবন ব্রত উদ্‌যাপন করিতেছি। না মরিয়া আমার আর উপায় কি? অদৃষ্টের বশে সেই ঘৃণিত প্রস্তাবে মুখের কথাতেও আমাকে সম্মত হইতে হইয়াছে, ভদ্রলোকের মেয়েরা যে কথা শুনিলে কানে আঙ্গুল দেয় সেকথা আমি দাঁড়াইয়া শুনিয়াছি, শেষে এই চাতুরীও খেলিলাম। সবই পারিলাম—কি আর বলিব! তাহাপেক্ষা আত্মহত্যার ভয়াবহ মূর্ত্তিও আমার আদরনীয় মনে হইতেছে। সকলে আমার নিন্দা করিবে

কিন্তু তুমি করিওনা। একবার মনে করিও তোমার পায়ে স্থান পাইলে আমার আজ এদশা হইত না। আজ বিনিময়ে আমাকে মা ভাই বোনকে বিপদ মুক্ত করিতে হইত না।

মনে ভাবিওনা যে অন্যের পরিগৃহীতা হইয়াও, বিধবা হইয়াও কেবল পরপুরুষকে চিন্তা করিতাম। আমরা বাঙ্গালী হিন্দুকন্যা কষ্ট হইলেও আমরা দুদিনেই নিজের অবস্থার মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া লই! তোমার মাসিমার কথায় আমার হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য বালিকা মনে যে আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল কয়েকমাসেই আবার তাহা সঙ্কুচিত করিয়া লইয়াছিলাম। হয়ত কমলার মত (সেকথা তোমার মনে আছে কি?) সুখ সৌভাগ্যের মধ্যে পড়িলে তাহারি মত সব ভুলিয়া যাইতাম। আমার অদৃষ্টে তাহা হইলনা। দারিদ্র্য আমার পাষাণকলকে তোমার দয়ার মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিতে চাহিত। আমি চিরদিন তাহা অন্ধকারের মধ্যেই লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি, তোমার সাক্ষাতে সত্য করিয়া বলিতেছি নিজেও কোন' দিন সে মূর্ত্তি বাহির করিয়া দেখি নাই! দেখিবার অবসরও ছিলনা। আজ একান্ত অবসর! আজ আর কোন' কাজ নাই—আজ আমার বিশ্রামের তাই বোধহয় তুমি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছ।

মনে করিয়াছিলাম তোমায় অনেক কঠিন কথা লিখিব, অনেক রাগ প্রকাশ করিব কিন্তু এখন ক্রমশঃ আমার মন হইতে যেন সব সরিয়া যাইতেছে। সংসারে কাহারো উপরে কোন দাবী বা ক্ষোভ রাখি নাই কিন্তু তোমার সম্বন্ধে কেন এ অভিমান আমার মনে উদয় হইয়াছিল বলিতে পারিনা। আজ আর আমার মনে কোন' অভিমান নাই। আমি বুঝিতেছি আমি অন্যায় করিয়াছি, কেন তোমার নিকটে সাহায্য চাহিলাম না। তোমার উপরে কি দাবী সাজে! কিন্তু যাহা করিয়াছি আর তাহা ফিরিবার নয়।" এখন বলিতেছি আমার মা বোনকে কালীকে দেখো তারা যেন কোন' বিপদে না পড়ে। পারত—দাদাকে সুমতি দিয়ো। আমার যেন মনে হচ্ছে আমি গেলেই এদের সব বিপদ কেটে যাবে। তুমি মনে কিছু কষ্ট ক'রনা, সুখী হও, পার ত' একটী ভাল পাত্রে সাবিত্র বিয়ে দিও। তবে আমি আসি! প্রণাম জেনো ইতি।

সতী।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পত্র পাঠ সমাপ্ত হইয়া গেল, তথাপি বিশ্বেশ্বর স্পন্দহীন প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। চিন্তা করিবার ক্ষমতাও যেন তাহার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যতক্ষণ পত্রখানা পড়িতেছিল, যেন অগাধ জলে সন্তরণহীন মূঢ়ের ন্যায় হাবুডুবু খাইতেছিল। এখন যেন সে তলাইয়া গিয়াছে, অতল সলিলে যেন তাহার এখন সমাধি হইতেছে। হস্তপদ স্থির, বলহীন, ঈষৎ সঞ্চালনের ক্ষমতাও রহিত, চক্ষু বিস্ফারিত অথচ দৃষ্টি হীন, মনও চাঞ্চল্য শূন্য, নিস্পন্দ।

সহসা কক্ষের বাহিরে অন্নপূর্ণার কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। তিনি যেন আর্ত্ত কণ্ঠে ডাকিতেছেন "বিশু! বিশ্বেশ্বর!" বিশ্বেশ্বরের উত্তর দিবার সাধ্য নাই।

অন্নপূর্ণা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "ঘরে আছিস্? গাঁয়ের খবর কিছু শুনেছিস?" "শুনেছি"।

"এখনো দাঁড়িয়ে আছিস্!

—এখনো উপায় আছে।"

"কিসের উপায়?"

"তবে কি শুনেছিস্ বল্‌ছিস্? রামশঙ্কর ভট্‌চায্‌দের বাড়ী মহাজনেরা দখল করেছে। আজ তিন দিন নাকি নোটিস্ দিয়েছিল। আমার কপাল, আমি বাড়ী ছিলেম না। এক গাঁয়ে হ'লেও ওদের বাড়ী এত দূর যে কাল সন্ধ্যেবেলায় এসেও খবর পাইনি। নিধের মা এখনি দেখে এল মহাজন আর পেয়াদা এসে বাড়ী ঘিরেছে। এখনি হাত ধরে পথে বসাবে। যা শীগ্‌গির যা, আমিও এখনি যাচ্ছি—দুই আগে গিয়ে যাযা দে গে।" বিশ্ব চাহিয়া দেখিল মাসিমার চক্ষু হইতে গর্ গর্ করিয়া জল পড়িতেছে। তখন তাহার চক্ষে জল আসিল। মনে হইল হয়ত এখনো কোন উপায় আছে। সতী হয়ত এখনো আছে এখনো তাকে বাঁচাইতে পারা যায়,—বিশ্বেশ্বর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

গিয়া দেখিল ভট্‌চায্‌দের ভগ্নদ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রতিবেশীবর্গ দিব্য জটলা বাধাইয়াছেন। মহাজন এবং পেয়াদারা বাটীতে প্রবেশের উদ্যোগ করিতেছে। ভিতর হইতে রোদন ধ্বনি উঠিয়াছে, অসহায় প্রতিবেশীর আশ্রয়হীন ক্রন্দনে প্রতিবেশীরা দিব্য আমোদ পাইয়াছেন, বলিতেছেন "এত যাদের অহঙ্কার, তাদের ত এ অবস্থা ঘটবেই! —কেন আমরা পাড়া প্রতিবেশী, আমাদের একথা একবার জানাতে নেই, কিছু চাইতে নেই! গরীবের এত তেজ কেন! কিন্তু তাঁহারা যদিও সমস্তই জানেন। বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়া একজন বলিলেন "কি বল ছোক্‌রা? আমাদের এখন আর হাত কি বল? আর এ ভদ্র লোকই বা নিজের পাওনা গণ্ডা ছাড়্‌বে কেন? এতে কান্নাকাটি না করে বেরিয়ে আসাই ভাল।" বিশ্বেশ্বর সেকথার উত্তর দিলনা। এ রোদন ধ্বনি যেন তাহার অন্যরূপ বোধ হইল, তাহাকে সবেগে বাড়ীর মুখে যাইতে দেখিয়া মহাজন একটু সম্ভ্রমের সহিত সরিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে পেয়াদারাও সরিল।

অঙ্গন পার হইয়া যে কক্ষ হইতে রোদন ধ্বনি নির্গত হইতেছে বিশ্বেশ্বর সেই কক্ষাভিমুখে ছুটিল। দেখিল জ্যেঠাইমা দ্বারের নিকটে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছেন, কক্ষের মধ্যে সাবিত্রী ও কালী মাটীতে লুটাইয়া লুটাইয়া অব্যক্ত কণ্ঠে কাঁদিতেছে; জাহ্নবী নীরবে কাহাকে যেন আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন। বিশ্বেশ্বর গিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইল, আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল 'সতি!' কেহ কেহ চাহিয়া দেখিল। বালক কালী চেঁচাইয়া উঠিল—

"ও বিশুবাবু আমার দিদি—আমার দিদি"। বিশ্বেশ্বর বিকৃত কণ্ঠে বলিল,—

"কি হয়েছে কালী? তোমার দিদির কি হয়েছে?"

"জানিনে বিশুবাবু দিদি কথা কচ্চেনা। জ্যেঠাই মা বল্‌ছে দিদি মরে গিয়েছে।" বিশ্বেশ্বর সেই খানে হাঁটু গাড়িয়া বসিল, একটু জোরের সহিত জাহ্নবীকে সরাইয়া দিতে যাইবা মাত্র জাহ্নবীর কণ্ঠে স্বর ফুটিল, আর্ত্তকণ্ঠে বলিলেন

"কেরে পাষাণ সয় সয় এখন নয়। আর একটু পরে। আমি আপনিই ছেড়ে দেব, এখন আমার পানিকটে বুকে নিতে দে।"

"মা, আমি; আমি বিশু। আমায় একবার দেখ্‌তে দেন। যদি এখনো বাঁচাতে পারা যায়"—জাহ্নবী চোখ মেলিয়া চাহিলেন। কিন্তু আর্ত্তকণ্ঠে বলিলেন "কে এলেরে বাবা? বিশ্বেশ্বর? আমার সতীকে কি পায়ে স্থান দিতে এলেরে? আমার সতীর কি আজ বিয়ে? ঐ শ্মশান বুড়োর সঙ্গে তার কি আমি বিয়ে দিই নি? সতী কি আমার বিষ খেয়ে মরেনি? আমি কি স্বপন দেখ্‌ছিলাম! এসো বাবা, এসো।"

বিশ্বেশ্বর অতি কষ্টে জাহ্নবীকে এক পার্শ্বে ঠেলিয়া দিয়া দেখিল সতী উবুড় হইয়া শুইয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ খানা গুঁজিয়া পড়িয়া আছে। তাহাকে স্পর্শ করিতে সহসা বিশ্বেশ্বরের সাহস হইল না। যেন সে কি মহা চিন্তায় আচ্ছন্ন, কি যোগে নিমগ্ন, সে যোগ ভঙ্গ করিতে গেলে অপরাধীকে তখনি যেন ভস্মীভূত হইতে হইবে। বিশ্বেশ্বরের সঙ্কোচ দেখিয়া, সাবিত্রী ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল, দুই হাতে সতীকে পার্শ্ব পরিবর্ত্তিত করাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "দেখুন, দেখ্‌বার কিছু আর নেই! দিদি অনেকক্ষণ চলে গেছে।"

তথাপি বিশ্বেশ্বরের মনে হইতেছিল হয়ত এখনো সতী বাঁচিয়া আছে। শীতল নাসারন্ধ্রে পুনঃ পুনঃ অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া দেখিল, কালিমাবেষ্টিত নিমীলিত চক্ষু টানিয়া টানিয়া দেখিল, মুখে মধ্যে অঙ্গুলি দিয়া জিহ্বার উত্তাপ অনুভব করিতে চেষ্টা করিল। কিছু না কিছু না!

"সব ঠাণ্ডা! কিছু নেই—"

"বিশ্বেশ্বর! কেন বাবা "মিথ্যে চেষ্টা করছ! আমার সতী' ঢলাঢলি কর্‌বার মেয়ে নয়। সে ক'দিন কষ্ট সয়ে বেঁচেছিল, কাউকে একবারও জান্‌তে দেয়নি। আজ আর না সইতে পেরে চলে গেল, তাও" তাকে একবার থাক্‌তে বল্‌বারও কাউকে সময় দিলে না। এখন আমায় পানিকটা ছেড়ে দাও! মা আমার জলে জলে এখন বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে, সতীর আমার ঠাণ্ডা শরীর, ঠাণ্ডা বুকটা আমি এখন খানিকক্ষণ বুকে করে নিয়ে থাকি,—দাও। সতী আমার এমন নিশ্চিন্দি হয়েত' একদিনও একদণ্ডও ঘুমুতে পায়নি! সুখ, শরীরে সুস্থ মনে সতী আমার ঘুমুচ্ছে, আমি পানিক তাই চেয়ে চেয়ে দেখি।"

ক্রমে লোকে ঘর পুরিয়া গেল। 'একি সর্ব্বনাশ!' "কেন এমন হ'ল?" "কিসে হ'ল?" "কি খেয়ে?" বিষ কোথায় পেলে?" "কি দুঃখে বিষ খেলে?" "কেউ কিছু বলেছিল?" ইত্যাদি শব্দে বাটী মুখরিত হইতে লাগিল। লোকের কোলাহলে ও উৎসাহসূচক আন্দোলনে জ্যেঠিমা পর্য্যন্ত থামিয়া গেলেন। অনুসন্ধিৎসু পরোপকারী মাতব্বরগণ নানারূপ ঘোঁট করিতে লাগিলেন। সন্ধান করিয়া সতীর মাথার শিয়রের নিকট হইতে একটা মালিশের ঔষধের শিশি, একটা অহিফেন গন্ধযুক্ত পাতা ও এক টুকরা কাগজ বাহির করিলেন। কাগজে লেখা—"আমি স্ব-ইচ্ছায় আত্মহত্যা করিলাম। আমার মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনেরা ইহার বিন্দু বিসর্গও জানেন না। ইতি সতী"

বাহির হইতে মহাজনের লোক আসিয়া

বলিল "তবে বাবু আপনারা সব সাক্ষী রইলেন, বাড়ীতে আজ বিপদ, আমরা যাচ্চি কাল আমরা কিন্তু কিছু বলব না।"

কেহ কোন কথা কহিলনা। বিশ্বেশ্বর চাহিয়া দেখিল, অন্নপূর্ণা বসিয়া নীরবে জাহ্নবীকে শুশ্রূষা করিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে এক একবার সতীর ললাট বক্ষ স্পর্শ করিয়া দেখিতেছেন। তিনি বিশ্বেশ্বরকে নিকটে ডাকিয়া আঁচল হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া তাহার হস্তে দিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন "ওদের বিদেয় করে দাও। কাল আর ওরা না আসে।"

বিশ্বেশ্বর বাহিরে গিয়া নিভৃতে মহাজনের সঙ্গে সমস্ত মিটাইয়া লইল। মহাজন একে বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে বাধাবাধকতায় আবদ্ধ, তাহাতে তাহার খরচা সমেত সাতশত টাকার উপরেও লভ্য হইয়াছে, নীরবে মটগেজ কাগজ খানা ফিরাইয়া দিয়া সদলবলে স্থানে প্রস্থান করিল। বিশ্বেশ্বর সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

তাহাকে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সকলে প্রশ্নবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। লোকটা ভদ্র—এখন কিছুদিন খুসিদ রেখে চলে গেল—এই বলিয়া বিশ্বেশ্বর তাহাদের ঔৎসুক্য নিবারণ করিলেন। নিরাশ হইয়া অগত্যা সকলে বলিল "এখন এদিকের কি হবে? দারোগাকে খবর না দিলে ত চলবে না, আমরা অনেকক্ষণ খবর পাঠিয়েছি—তিনি এলেন বলে। তারাপুরের বড় ডাক্তারও এল বলে।" বিশ্বেশ্বর নীরবে রোয়াকে পা ঝুলাইয়া বসিয়া রহিল।

ডাক্তার ও দারোগা একসঙ্গে আসিলেন। বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়া তাঁহারা উভয়ে সাদর সম্ভাষণ করিলেন, বিশ্বেশ্বরও শুষ্ক মুখে প্রত্যভিবাদন করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ঘরে ঢুকিল। ডাক্তার নীরবে মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে লাগিল, দারোগা মালিশের শিশি, অহিফেণের পাতা ও কাগজ টুকরা লইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বিশ্বেশ্বর চাহিয়া দেখিল সতীর শান্ত, নিদ্রাচ্ছন্ন শুভ্র মুখ যেন লজ্জায় ঘৃণায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিতেছে, প্রশান্ত শুভ্র ক্ষুদ্র ললাটে আশঙ্কার নীলবর্ণ রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিতেছে, লজ্জা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যেন সতী অন্তরে অন্তরে ভগবানকে ডাকিতেছে। বিশ্বেশ্বর অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে অনেক কথা বলিলেন। বিশ্বেশ্বর কেবল শুনিয়া যাইতে লাগিল, কথা কহিতে বা কোন যুক্তি করিতে তাহার যেন সাধ্য নাই। ডাক্তার ডাকিল "বিশ্বেশ্বর বাবু" বিশ্বেশ্বর নিকটে গেল।

"রোগী অনেকক্ষণ মরিয়াছে। দেখিতেছি অহিফেণ ও বেলেডোনাযুক্ত মালিশে এ মৃত্যু ঘটাইয়াছে। দেখা যাইতেছে ইহা আত্মহত্যা।"

দারোগা বলিলেন—"এ মালিশ কাহার ডিস্পেন্সারীর! দেখিতেছি হারাণচন্দ্র নাগের ডিস্পেন্সারীর। কিরূপে ইহা সে প্রাপ্ত হইল? এবং আকিংই বা কোথায় পাইল?"

জ্যেঠাই মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, বৌয়ের মাজার বেদনার জন্যে ওটা আনা হয়েছিল। বাপা ভাল হ'য়ে যাওয়ায় বেশী খরচ হয়নি—প্রায় সবটাই ছিল।

আজ বাগ্‌দী প্রধান দিল, পায়ে ব্যথা হয়েছে বলে দুতরো পাতা আর একটু আফিং আমার কাছ হতে কাল চেয়ে নিয়েছিল। সেত' বেশী নয়। আমি কি জানি ছাই যে তার মনে এত ছিল।"

বিশ্বেশ্বর বুঝিল যে পাছে মালিশেও মৃত্যু না হয় সেজন্য সতী এত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে। ডাক্তার তখন বিশ্বেশ্বরের পরামর্শ চাহিল। বলিল "হস্‌পিটালে লইয়া যাওয়াই আমার কর্ত্তব্য এখন আপনি কি বলেন?" বিশ্বেশ্বর শিহরিয়া উঠিল, মৃদুস্বরে বলিল "যদি অন্য কিছু উপায় থাকে বলুন, আমার যতদূর সাধ্য আপনাকে সন্তুষ্ট করব। আমার নিজের বাড়ীর ব্যাপার বলেই জান্‌বেন্। আপনি কি আমায় সাহায্য কর্‌বেন না?"

"আমার কোন আপত্তি নাই। আমি এখনি সর্পাঘাতে মৃত্যু বলে রিপোর্ট লিখ্‌ব। আপনি দারোগাকে হস্তগত করুন।"

দারোগাকে হস্তগত করিতে বিশ্বেশ্বরের অধিকক্ষণ লাগিল না। তখন ডাক্তার ও দারোগা "সর্পাঘাতে মৃত্যু" লিখিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। গ্রামের লোক তখন নিরাশচিত্তে নানাপ্রকার জল্পনা করিতে করিতে গৃহে চলিল। কেহ কেহ বা নিতান্ত নাচার হইয়া আপনার সাধুতা দেখাইবার জন্য বিশ্বেশ্বরের অনেক প্রশংসার সঙ্গে নিজের হাতে এখন কিছু না থাকার যথেষ্ট প্রমাণ দিতে লাগিল। হাতে কিছু থাকিলে কি তিনি এতক্ষণ নীরবে থাকিতেন? ডাক্তার ও দারোগাকে নজর পাঠাইয়া দিয়া সমস্তই পরিষ্কার করিয়া ফেলিতেন, লোকে এ কেলেঙ্কারীটা জানিতেও পারিত না। কেহ বা বলিল "ওর মানীরই এসব খরচ—ও কর্‌ বেটার এত আর কর্‌তে হয় না, মাসী মাগী লোক ভাল। কেহ বা আরও কিছু ভাবিয়া লইয়া পরম গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে চলিল। সকলকেই এখন গৃহাভিমুখে ছুটিতে হইল; কেননা এইবার মড়া ফেলা।

বিশ্বেশ্বর তাহার কর্ম্মচারী নিবারণ চাটুয্যে, হরীশ গাঙ্গুলী, চির উপকৃত বন্ধু রামতনু সান্যাল এই তিন জনকে ডাকিয়া লইয়া আসিল। তাহাদিগকে অঙ্গনে দাঁড় করাইয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্নপূর্ণার মুখ পানে চাহিয়া একপার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইল। অন্নপূর্ণা বুঝিলেন—গম্ভীর খেদপূর্ণস্বরে জাদুবীকে বলিলেন "বৌ, তোমার সতীকে যে তার বাপের কোলে দিয়ে আস্‌তে হবে। আমরা ত' তার কষ্ট একদিনও ঘুচুতে পারিনি, তাই সে বাপের কাছে যাচ্ছে। মেয়ে ত' চিরদিনই পরের ঘরে যায় বৌ! সতীকে তার স্বামীর কাছে—"

"ওকথা বলোনা দিদি, ওকথা ব'লোনা। সতী আমার কুমারী। আমি কি তার বিয়ে দিয়েছি? সেই ঘাটের মড়া কি তার বর? আমার কুমারী মেয়ে তার বাপের কোলে যাচ্ছে। এ খান কাপড় সতীর ছাড়িয়ে দাও দি! ছোটবেলার সেই নীলাম্বরী খানি পরিয়ে দাও, যে কাপড়খানা পরে তার বাপের হাত ধরে বেড়িয়ে বেড়াত। কাঁচের কাল চুড়ি কগাছি পরিয়ে দাও, বিধবার বেশে আমার সতীকে যেতে দিতে পারব না, তার বাপ আমার কিবল্‌বে—"

অন্নপূর্ণা দেখিলেন প্রবোধ দেওয়া মিথ্যা। সাবিত্রীকে বলিলেন "সাবিত্রী মাকে এনে ধর্", সাবিত্রী ছুটিয়া আসিয়া সতীর মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিল। আর্ত্তকণ্ঠে বলিল "অমন কথা বলোনা পিসিমা। আমার দিদি কোথায় যাবে? আমার দিদি ত' কোথাও যায় না। আজ কেন সে যাবে, আমাদের ফেলে সে কখ্খোনো যাবে না।"

অনেকক্ষণ পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন "বিন্তু কি কর্‌ছিস্! যে গেছে সেত' গেছেই, এদের ত' বাঁচাতে হবে! ওদের ডাক্।"

জাহ্নবী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া সাবিত্রীকে একদিকে সরাইয়া দিলেন। সতীর মৃতদেহ কোলে টানিয়া লইয়া, একবার স্থির চক্ষে কন্যার মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন মুখের পানে চাহিলেন, শীতল গণ্ডে চুম্বন করিয়া বলিলেন "মা! সতী! তবে এস মা, আমার কাছে বড় কষ্ট পেয়েছ। তোমার বাপের কোলে গিয়ে সেই ছোট সতী হয়ে ঘুমোওগে। যদি একবার মা বলে দেখবার ডেকে যেতে মা! কাল রাত্রে যখন পায়ের তলায় শুয়ে পায়ে হাত বুলিয়েছিলে তখন জানিনি যে তুমি বিদায় নিচ্ছ; তাহলে একবার মা বলে ডাকতে বলতাম। মা! তবে নিতান্তই চল্লে? এস মা এসো। বিশ্বেশ্বর! সতীকে এই নাও।" জাহ্নবী যেন যথার্থ বিশ্বেশ্বরের চরণে কন্যাকে সমর্পণ করিয়া সবলে দুই হস্তে তাহার ক্ষীণ দেহ ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিলেন। তিনজন ব্রাহ্মণ অমনি তাঁহার হস্ত হইতে সতীর দেহ টানিয়া লইয়া বাহিরে চলিল। বিশ্বেশ্বরও নীরবে অনুসরণ করিল। সাবিত্রী ছুটিয়া আসিয়া পাগলিনীর মত তাহার পায়ে আছড়াইয়া পড়িল। আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল "বিন্তু দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, পায়ে পড়ি, আমার দিদিকে নিয়ে যেও না, ফিরিয়ে দিতে বল, ওগো তোমার কি দয়া নেই? দাও আমার দিদিকে, ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও।" বিশ্বেশ্বর আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল "দিদিমা।"

অন্নপূর্ণা বাহিরে আসিয়া সাবিত্রীকে জোর করিয়া গৃহ মধ্যে টানিয়া লইয়া গেলেন। জোর করিয়া জাহ্নবীর ক্রোড়ে তাহাকে বসাইয়া দিয়া বলিলেন "বৌ, এটাকে ধর্, ওর সঙ্গে এটাও যায় যে। মুখ দিয়ে কেপা উঠছে যে—বড় বৌ একটু জল দে, পাখা খানা আমায় দে কালী।" জাহ্নবী সাবিত্রীকে ক্রোড়ে চাপিয়া ধরিয়া ডাকিলেন "সাবি—সাবি।"

মা—দিদি—দিদি—দিদি।

কালীপদকে লইয়া বিশ্বেশ্বর নীরবে শব-বাহকদের সঙ্গে সঙ্গে নদীতীরে গেল। সতীর ক্ষীণ দেহ দুইজন ব্রাহ্মণেই বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিল। সেখানে চিতা সাজাইয়া শবকে মানাস্তে নব বস্ত্র পরাইয়া, কালিপদর দ্বারা মুখাগ্নি করাইয়া চিতায় অগ্নি সংযোগ করান হইল। বৃদ্ধ রামতনু কালীকে দূরে লইয়া নানা প্রবোধ দিতে লাগিলেন। বিশ্বেশ্বর নীরবে একটা বৃক্ষকাণ্ডে হেলান দিয়া বসিয়া দেখিতেছিল সতীর বক্ষপঞ্জর হইতে অগ্নি শিখা উত্থিত হইয়া ছড়ায় ছাড়িতেছে। হু হু হু! ধূ ধূ ধূ!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অন্নপূর্ণা জাহ্নবীকে কয়েকদিনের জন্য নিজের বাটীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পীড়া-

পীড়ি করিলেন। জাহ্নবী শুনিলেন না, বলিলেন, "দিদি একথা বলোনা, এই বাড়ীতে তিনি গেছেন, সতী গেছে, সতী আমার ঘরে পড়ে একা মা বলে কাঁদবে, আমি এ বাড়ী ছেড়ে কোথায় যাব! আমি কোথাও যাব না।" অগত্যা অন্নপূর্ণাকে কয়েক দিন ধরিয়া রাত্রে তাহাদের নিকটে থাকিতে হইল, কেন না জ্যেঠাইমা তাঁহার বহুদিনলুপ্তসম্বন্ধীয় এক ভগিনীপুত্রের বাটীতে চলিয়া গিয়াছেন। প্রাণের কাছে মান অপমান কিছুই নাই! তাঁহার বিশ্বাস তিনি ঘুমাইলেই সতী তাঁহার ঘাড় মটকাইবে। সতী যে বাড়ীতে প্রেতিনী হইয়া ঘুরিতেছে না একথা ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু এসে বল্লেও তাঁর পেত্যয় হবে না। চিরাগুগত ক্যান্ত বান্দীও তাহাদের আগলাইবার জন্য সেই বাড়ীতে পড়িয়া থাকিত।

চতুর্থ দিবসে কালীপদ যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিল। জাহ্নবীর অনুরোধে সতীর সপত্নী-পুত্রকে সংবাদ ও অর্থ প্রেরণ করিয়া বিশ্বেশ্বর কালীর দ্বারা সতীর শ্রাদ্ধ করাইলেন। জাহ্নবীর বিশ্বাস, নহিলে সতীর তৃপ্তি হইবে না।

এ কয়দিন বিশ্বেশ্বর যেন উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে কাটাইতেছিল। দারুণ দুর্ঘটনায় অপ্রত্যাশিত বিপদে লোকের হৃদয় যেরূপ বিকল হইয়া যায়, তাহারও সেইরূপ হইয়াছিল। সহসা একদিন মনে পড়িল সাবিত্রীর নিকট হইতে সতীর শোণিতাপ্লুত সেই নোটগুলা চাহিয়া লইয়া সেই পালিতকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। সেই ঘৃণিত অর্থ, সাবিত্রীর নিকটে বেশী দিন না থাকে। সাবিত্রী জানে না, সে অর্থের মূল্য কি! বিশ্বেশ্বর নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়াছিল; দূরস্থিত শ্মশানের দিকে একবার চকিতের মত চাহিল, বোধ হইল যেন সেই অনির্ব্বাণ বৈশ্বানর নিষ্করুণ জগৎকে শুনাইয়া এখনও হুঙ্কার ছাড়িতেছে, এখনো সতী যেন সেই দারিদ্র্য অনলে পুড়িতে পুড়িতে নিশ্বাস ফেলিতেছে, হু হু ত!

সভয়ে বিশ্বেশ্বর নদীতীর ত্যাগ করিয়া গ্রামাভিমুখে চলিল। অনেকক্ষণ গ্রামের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাবুদের বাড়ীর উদ্যানে সেদিন বিষম বৈঠক বসিয়াছে। শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত চত্বরে বসিয়া তাঁহারা রজনীর চন্দ্রালোক ও পুষ্পের স্নিগ্ধ সৌরভযুক্ত বায়ু উপভোগ করিতে করিতে বাঁয়া তবলা হারমোনিয়ম্ বেহালা লইয়া গান বাজনা করিতেছেন। বিশ্বেশ্বর চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, পৃথিবী এমন সৌন্দর্য্যময়ী, তবু মানুষের এত দুঃখ কেন? কেহ সুখের সপ্তসমুদ্রে সাঁতার দিতেছে, কেহ অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে কেন! কেহ কাহারো পানে চাহে না কেন! দুঃখ বোঝে না কেন? তবে পৃথিবীর এ আনন্দ উল্লাস শোভা ঐশ্বর্য্য সবই পৈশাচিক হাসি, অন্তরস্থ দৈন্য ঢাকিবার জন্য ধরণীর এ কৃত্রিম শোভা নিষ্ফল নিষ্ফল। বাদ্যের ঝঙ্কার ভাল লাগিল না, বিশ্বেশ্বর ফিরিয়া চলিল। দূরে—যেখানে বাদ্যের উৎকট ধ্বনি মস্তকে পীড়া না দেয় এরূপ স্থলে উপস্থিত হইতেই দূরাগত বেহালার সুরের সঙ্গে একটা করুণ সুর বড় মিষ্ট লাগিল। দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে চেষ্টা করিল—ক্ষণেক চেষ্টার পরে গান বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতে লাগিল—কে গাহিতেছে

"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল
সকলি ফুরায়ে যায় মা।

জনমের শেষ ডাকি মা তোমায়,
কোলে তুলে নিতে আয় মা।"

বিশ্বেশ্বরের মাথা যেন ঘুরিতে লাগিল। কে এমন গান গাহিতেছে! এমন উৎসবের রাত্রে এমন খেদের গান কে গায়? যে গাহিতেছে সে কি বুঝিতেছে—যে তাহার গীতের মধ্যে কত অশরীরী আত্মা কাঁদিয়া কাঁদিয়া পৃথিবীকে শুনাইতেছে

"এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না,
এ পৃথিবী ভাল বাসিতে চাহে না,
যেথা আছে শুধু ভাল বাসা বাসি
সেথা যেতে প্রাণ চায় না।"

এতক্ষণে বিশ্বেশ্বরের চক্ষে জল আসিল। সত্যই এ নিষ্করুণা পৃথিবীতে ভালবাসা আছে কি? কে কাহার পায়ে জীবন উৎসর্গ করিয়া নীরবে ঝরিয়া যাইতেছে কে তাহার সংবাদ রাখে! সতী যে এমন করিয়া নিজকে উৎসর্গ করিয়াছিল সে কি তাহার কোন খবর রাখিত। আবার এই যে তাহাকে নমস্কার করিয়া নীরবেই পৃথিবী হইতে সরিয়া গেল! তথাপি তাহার আত্মা কি সেই বাঞ্ছিত বস্তু পাইয়াছে? এই যে করুণার সমবেদনায় তাহার হৃদয় উথলিয়া উঠিতেছে, সে কি ইহাই চাহিয়াছিল? এই কি সেই ভালবাসা? যদি এমনি সুশীলা ধৈর্য্যময়ী সুন্দরী, অনাহারে, কষ্টে, ভাবনায়, পৃথিবীর কুৎসিৎ ব্যবহারে, অন্য একজনকে নীরবে ভালবাসিয়া এইরূপে প্রাণত্যাগ করিত তবে সেও কি এইরূপে না কাঁদিয়া থাকিতে পারিত? দারুণ ব্যথা কি হৃদয় মধ্যে অনুভব করিত না? সামান্য একখানা পুস্তক পড়িয়া হৃদয় ব্যথায় আকুল হইয়া উঠে; আর এমন বাস্তব করুণ দৃশ্যে কাঁদিবে না এমন নির্দ্দয় কে আছে? তবে? এই কি পৃথিবীর ভালবাসা! সত্যই কি পৃথিবীতে ভালবাসা নাই?

গান চলিতেছিল

"বড় জ্বালা পেয়ে বাসনা ভাঙ্গেছি, বড় দাগা পেয়ে কামনা ভুলেছি, অনেক কেঁদেছি, কাঁদিতে পারি না, বুক ফেটে ভেঙে যায় মা।
স্বরগ হইতে আনহি জগতে কোলে তুলে নিতে আয় মা।"

বিশ্বেশ্বর অস্ফুটস্বরে একবার বলিল "বেশ করেছ সতি! এজগৎ ত' এড়াইয়াছ।" গান থামিয়া গেল। তথাপি সেই করুণ সুর যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছিল। ক্রমশঃ অসহ্য হওয়াতে বিশ্বেশ্বর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সহসা দেখিল সম্মুখে ভট্টাচার্য্যের ভগ্নদ্বারপথে শ্রীহীন অঙ্গন অম্লান চন্দ্রকরে যেন বিধবার মত পড়িয়া রহিয়াছে। ধীরে ধীরে সে অঙ্গনের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল কুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়া কে সেইখানে নতজানু হইয়া যোড়হাতে বসিয়া রহিয়াছে। এ কে! সতী কি? সেই রকমই ত! সেই রুক্ষ চুলের রাশি সেই ক্ষীণ তনুযষ্টি অর্দ্ধ মলিন ছিন্ন বাস, সেই অবনত ম্লান পাণ্ডুর আভা-যুক্ত মুখ! বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা হইল একবার "সতি" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকে কিন্তু কণ্ঠ দিয়া স্বর বাহির হইল না। কেবল নীরবে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল।

যে তুলসীতলায় বসিয়াছিল সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া বিশ্বেশ্বরকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া বিস্মিত মৃদু ক্ষীণকণ্ঠে

বলিল, "কে?" বিশ্বেশ্বর বুঝিল "সতী নয় সাবিত্রী।

"কে, বিশু দাদা? আপনি এসেছেন? মাকে কি ডাকব?"

সাবিত্রীর করুণ ক্ষীণস্বরে আবার বিশ্বেশ্বরের চোখে জল আসিল। মৃদু স্বরে বলিল "না, তোমার সঙ্গেই একটা কথা আছে, শোন।"

সাবিত্রী নীরবে চাহিয়া রহিল।

"তোমার দিদি কি তোমাকে কিছু দিয়ে গিয়েছেন?"

"হাঁ! অনেকগুলো নোট! তিনি নাকি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।"

"সেগুলো সব আছে? খরচ করনি?"

"না।"

"সেগুলো সব আমায় এনে দাও।"

সাবিত্রী কক্ষ মধ্যে চলিয়া গেল অল্পক্ষণ পরে এক তাড়া নোট আনিয়া নীরবে বিশ্বেশ্বরের হস্তে দিল। সে নোট হস্তে লইতেও বিশ্বেশ্বরের হৃদয় বিচলিত হইতেছিল, কিন্তু পাছে সাবিত্রী কিছু মনে করে ভাবিয়া লইল। জিজ্ঞাসা করিল "এ নোটের কথা তোমার মা কিছু জানেন?"

"না, একদিন বলব ভেবেছিলাম।"

"না বলেছ ত' আর বলোনা। যার নোট তোমার দিদি কুড়িয়ে পেয়েছিল তাকে আমি ফিরিয়ে দেব।" সাবিত্রী নীরবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। বিশ্বেশ্বর তাহার মাসিমাতার নিকটে শুনিয়াছিল সাবিত্রী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। সে উঠেনা, খায়না, কাহারও সহিত কথা কহেনা, জাহ্নবীও তাহাকে প্রবোধ দিতে পারিতেছেন না। বিশ্বেশ্বরের তাহার সহিত দুই একটা কথা কহিতে ইচ্ছা হইল, মনোগত ভাব তাহাকে একটু সান্ত্বনা দেওয়া। জিজ্ঞাসা করিল "তুমি ওখানে বসে কি করছিলে সাবিত্রি?"

"তুলসী তলায় প্রদীপ দিতে গিয়েছিলাম।"

"আমি দেখলাম যোড় হাতে যেন কি বলছিলে।"

সাবিত্রী নতমস্তকে মৃদু স্বরে বলিল "শুনেছি, আত্মহত্যা করলে অগতি হয়, তাই ঠাকুর তলায় প্রদীপ দিয়ে"—বলিতে বলিতে রুদ্ধকণ্ঠে সাবিত্রী থামিল।

বিশ্বেশ্বরের চক্ষেও বালিকার ন্যায় অশ্রু প্রবাহ ছুটিল। অনেকক্ষণ পরে রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল—

"তোমার দিদি স্বর্গে গিয়েছে সাবিত্রি। তার মত পুণ্যবতীর কি অগতি হতে পারে? তোমার কি একথা বিশ্বাস হয়?"

আপনি বলছেন দিদি স্বর্গে গিয়েছে? সত্যিতে আছে, ভাল আছে?"

"হাঁ।

সাবিত্রী নতজানু হইয়া বিশ্বেশ্বরের পদতলে প্রণাম করিল। তার পরে দাঁড়াইয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল "আর আমি তবে কাঁদবনা। আমাদের ছেড়ে গেছে, ভুলে গেছে তাতে বেশী দুঃখ কি! সে ত' ভাল আছে, স্বস্তিতে আছে।"

সাবিত্রীর চক্ষু হইতে ধীরে ধীরে ঝর ঝর করিয়া মুক্তা বিন্দুর ন্যায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ব্যথিত বিশ্বেশ্বর তাহাকে সে অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে ক্লেশ বোধ করিল। হয়ত সে এখন পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিবে। দিদি

দিদি বলিয়া ডাকিবে! জিজ্ঞাসা করিল "তোমার মা কই! কালী কই?"

"কালীকে মা ঘুম পাড়াচ্ছেন—সে কেবল দিদি দিদি করে কাঁদে, থামাতে পারা যায় না।"

"তুমিও যে বড় কাঁদ সাবিত্রী। কাঁদলে কি আর তাকে ফিরে পাবে! ওতে কেবল মাকে কষ্ট দেওয়া হয়।" সাবিত্রী নতমস্তকে ফুকরিয়া উঠিল "আমি দিদিকে ছেড়ে যে কখনও থাকিনি।"

"চিরদিনের সঙ্গীকেও লোকে ভুলে যায়, জগতের নিয়মই এই।"

"আমি এত শীগ্‌গির কি করে ভুলব? দিদির সঙ্গী কমলা দিদি আজ এসেছিল, কতদিন সে দিদির সঙ্গছাড়া—তবু দিদির নাম করে কেঁদে কেঁদে অস্থিচর্ম্ম সার হয়ে গিয়েছে। সেও আর বেশী দিন বাঁচবেনা। তারা দিদিকে ভুলতে পারেনি, আমি কি করে ভুলব?

"কে এসেছিল! নরেন ভাদুড়ীর স্ত্রী? তার বুঝি খুব কষ্ট হয়েছে? নরেন ভাদুড়ীর স্ত্রী না সে?"

"আপনি জানেন বুঝি, তাঁর স্বামী শুনেছি ভাল লোক নন—কমলা দিদিকে খুব কষ্ট দেন্। দিদি কেবল কমলা দিদির নাম করে চোখের জল ফেলতেন, কমলা দিদিকে তিনি বড্ড ভাল বাসতেন।"

বিশ্বেশ্বরের অনেক দিনের কথা মনে পড়িল। কমলার সহিত বিবাহের জন্য সতীর সেই দৌত্য কার্য্য। আবার হৃদয়ে একটা আঘাত লাগিল।

জাহ্নবী কক্ষদ্বারে আসিয়া ডাকিলেন "সাবিত্রী! কার সঙ্গে কথা কচ্চিস্ মা?"

সাবিত্রী ফিরিয়া বলিল "বিশু দাদা।"

"বিশ্বেশ্বর! এস বাবা"।

বিশ্বেশ্বর নীরবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একটু বসিল। জাহ্নবীর সমক্ষে তাহার যেন শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিত। বেশীক্ষণ বসিতে পারিল না। বিদায় লইয়া উঠিয়া পড়িল।

অতি প্রত্যূষে চাঁদপুর অভিমুখে চলিল। প্রাতর্ভ্রমণের পূর্ব্বেই নরেন্দ্রকে ধরিতে হইবে। অচিরে জমিদারের হৃদয়হীন পাষাণময় অট্টালিকা চক্ষের সম্মুখে পড়িল। বিশ্বেশ্বর চক্ষু নত করিয়া গেটের নিকটে পৌঁছিল। বাহিরের উদ্যানেই একখানা বেঞ্চের উপরে নরেন্দ্র ভাদুড়ী বসিয়া প্রাতঃসমীর সেবন করিতেছেন। মুখখানা অতি বিষণ্ণ যেন পীড়িত। বিশ্বেশ্বর গিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। জমিদার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "কে আপনি মশায়?"

"আমার নাম বিশ্বেশ্বর মৈত্রেয়। মহৎপুরে আমার বাড়ী।"

"মশায়কে দেখেছি দেখেছি বোধহচ্ছে, বসুন।"

"দেখ্‌বেন তার আর আশ্চর্য্য কি—আপনি মহৎপুরে প্রায়ই হাওয়া খেতে যেতেন আমি অতি সামান্য লোক কখনও চোখে পড়েছি বোধহয়।" নরেন্দ্র একটু চঞ্চল ভাবে নড়িয়া বসিল। বলিল "মশায়ের কি প্রয়োজন?

"প্রয়োজন আছে একটু নির্জ্জনে বলতে চাই।"

"এ ত নির্জ্জন স্থানই। কি বলতে চান্ বলতে পারেন।"

বিশ্বেশ্বর ভূমিকা মাত্র না করিয়া

পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া নরেন্দ্রের হস্তে দিয়া বলিল "আপনার নোট! গুনে নেন্, হাজার টাকাই আছে"।

নরেন্দ্র স্তম্ভিত ভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল, বিশ্বেশ্বরও নীরবে অন্য দিকে চাহিয়া রহিল। অনেক পরে নরেন্দ্র বলিল যদি কিছু মনে না করেন, ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

"করুন"।

"আপনি এ নোট কোথায় পেলেন?"

"যাকে দিয়েছিলেন তিনিই আমায় দিয়েছিলেন—তিনি আমার ধর্ম্মপত্নীস্বরূপা"।

"তিনি? আপনাকে দিয়েছেন! মশায় শুনেছি তিনি নাকি মারা গেছেন?"

"মারা যাওয়া ঠিক নয়, তিনি আত্মহত্যা করেছেন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ সেই রকমই বটে—তা সে আত্মহত্যার কারণ কিছু জানেন?"

"জানি বই কি! এই যে আপনার হাতের নোটগুলি! এই গুলিই তাঁর মৃত্যুর কারণ। এই গুলি তাঁকে নিতে হয়েছিল বলেই মরে আপনার হাত এড়িয়েছেন।"

"মশায় তবে অনেক কথা জানেন দেখছি; তবে আর লুকোছাপা করছি না। কিন্তু আমার প্রতি আপনি অন্যায় দোষারোপ কচ্ছেন। তিনি নোট না নিলে কি আমার জোর চলত? আমিত-আমিত—জোর করিনি, স্বইচ্ছায়—

"চুপ্ কর্ চুপ্ কর পাপিষ্ঠ! বল্‌তে তোর জিব কাঁপ্‌ছেনা? কে পুনঃ পুনঃ তাকে প্রলোভিত কর্‌তে যেত? তুমি না ভদ্রলোকের ছেলে? ঘৃণ্য স্ত্রীলোক নিয়ে দিন কাটাও বলে কি মা বোন তার মুখও দেখনি? বোঝনি ভদ্রকুলের স্ত্রী কি ঐ পৈশাচিক কাজে সম্মত হতে পারে? যে হয় সে বড় কষ্টেই হয়। সে ভাইবোনদের রক্ষা কর্‌বার জন্যই পাপিষ্ঠ তোমারও অর্থ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু সুলটা হতে তার জন্ম নয়। সে স্বর্গে চলে গিয়েছে। এই নও তোমার সে অর্থ, যে অর্থে লোকে দুঃখীর দুঃখ মোচন করে, আর্ত্তের প্রাণদান দেয়, সেই অর্থ তোমার হাতে পড়ে একটা সাধ্বী দুঃখিনী বালিকার প্রাণ অকালে নষ্ট করে গেল। তোমার ধন, তোমার প্রবৃত্তিকে ধন্য! কিন্তু মনে জেনে রেখ' কু প্রবৃত্তির বশে একটী নারী হত্যার পাপে পাপী হয়েছ! এ জীবনে আর কখনও শান্তি পাবে না। চিরদিন তার নষ্ট আত্মা তোমার পেছনে ফিরবে। তোমায় অধঃপাতিত করে নরকের পথে নিয়ে যাবে! তুমি মানুষ খুন করেছ তোমার পেছনে আত্মহত্যার প্রেতাত্মা ঘুরছে।"

নরেন্দ্র স্তম্ভিত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। সর্ব্বাঙ্গে তাহার ঘর্ম্ম ছুটিতেছিল। ভীরু পাপী সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া ভীত কণ্ঠে বলিল "আমার এমন দোষ কি পেলেন? আমায় কি করতে বলেন? এ কাণ্ড হবে আমি ত' আগে জানিনি। জান্‌লে কি এমন করি?"

"ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে যদি ভদ্রলোকের মেয়ের স্বভাব না বোঝ তবেও তুমি পশু। যে মাতাইকে মুক্ত কর্‌বার জন্য নিজের প্রাণ এমন ভাবে নষ্ট কর্‌লে, মনে কর দেখি' সে কত উচ্চপ্রাণ! নরেন্দ্র! তোমার কি এ জন্মে উদ্ধার হবার আশা আছে?

কুপ্রবৃত্তিতে তুমি সাধ্বীর প্রাণ নষ্ট করেছ! কি পাপিষ্ঠ তুমি।"

নরেন্দ্র নীরবে রহিল। এ কয়দিন সে প্রতারিত হইয়া পরে সতীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া নীরবে কিছু কিছু অনুতাপ ভোগ করিতেছিল। অনুতাপের মাত্রা এইবার পূর্ণ হইয়া উঠিল। বিশ্বেশ্বর আবার বলিল,

"শুনেছি হরি তোমার আশ্রয়ে বাবুগিরি করে বেড়ায়। তাকে ডাকাও দেখি"।

কলের পুতুলির মত নরেন্দ্র তাহার আজ্ঞা পালন করিল। বাটীর দুর্ঘটনা সেও গুরুরে শুনিয়াছিল, ভীত বিষণ্ণমুখে সে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিশ্বেশ্বর তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নরেন্দ্রকে বলিল "এটা বুঝি তোমার অভিনয়ের নায়িকা সাজে? এটাকে তোমার ত্যাগ করতে হবে? এর মা বোন এখনো এর জন্যে চখের জল ফেলছে, সেই চখের জলে আরও তোমাকে পুড়িয়ে মারবে। এটাকে তোমার বাড়ী থেকে দূর করতে হবে"।

"নিয়ে যান্ নিয়ে যান্, আমি আর থিয়েটার রাখ্‌ছিনে। ঐ থিয়েটারই আমার দশা এমন করেছে, নইলে মশায় আমি লোক মন্দ ছিলাম না।"

"তা আমি জানি। তোমার স্ত্রী কমলা, সতী এরা আমার—বোনের মত ছিল, সকলের কাছে শুনি তোমার ব্যবহারে তোমার সাধ্বী পতিপ্রাণা স্ত্রী মৃতপ্রায়,—সেও কোন দিন আত্মহত্যা করে তোমার পাপের নৌকা ডুবো বোঝাই করে দেবে। তোমার ডুবাডুবির আর দেরী নেই।"

নরেন্দ্র অধোবদনে রহিল। বিশ্বেশ্বর হরির পানে চাহিয়া বলিল "আমার সঙ্গে তোমায় বাড়ী যেতে হবে।" হরি একবার দীন নয়নে নরেন্দ্রের পানে চাহিল, করুণ বচনে বলিল "নরেন বাবু আমায় আপনি"—

নরেন্দ্র বাধা দিয়া সবেগে বলিল "যাও যাও তোমরাইত আমার মাথা আরও খেয়েছ; যা করেছ খুব করেছ,—আমি আর থিয়েটার রাখ্‌ছিনা—আমার বাড়ী থেকে চলে যাও বল্‌ছি"।

অপমানে হরির মুখ লোহিত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে বাহির হইয়া গেল। বিশ্বেশ্বর উঠিয়া বলিল, নগেনবাবু আমি চলিলাম। বেশী আর কি বল্‌বো; যে সতীকে তুমি নাশ করেছ, সেই সতী কমলার অভিন-হৃদয় ছিল, যদি তার কাছে ক্ষমা পেতে চাও তবে কমলাকে সুখী করো।"

"বিশ্বেশ্বর পথে আসিয়া হরিকে বলিল, কোথায় যাচ্ছ হরি?"

"কোথায় যাব? বড়লোকের আশ্রয়ে আর নয়—ওঁর থিয়েটারের শ্রীবৃদ্ধিতে আমি এত করলাম, আর উনি কিনা আজ আমায় অপমান করলেন। একবার বাড়ী গিয়ে মাকে দেখে, অন্য কোথাও যাব।"

"অন্য কোথাও যেতে হবে না। মাকে সুখী করে গ্রামেই মানুষের মত থাকতে পারবে। মোসাহেবি ছেড়ে দিয়ে ভদ্র-লোকের মতনই কাজকর্ম্ম করলে অনেক সাধারণ লোকেরও সাহায্য পাবে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

(ঘ) শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার বিচার।

যদিও শঙ্করাচার্য্য বিচারে অনেক স্থলে উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তথাপি একথা আমরা বলিতে বাধ্য যে, কোন কোন বিষয়ের আলোচনায় তিনি উদারতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। যে সকল স্থলে নির্পক্ষভাবে বিচার করিলে আবহমান কালের বদ্ধমূল সংস্কারের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত করিতে হয়, সেই সকল স্থলে প্রায়ই তিনি প্রচলিত সংস্কারের পৃষ্ঠপোষণ করিয়াছেন।

শঙ্করের মতে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ শ্রুতিমূলক। সমাজের প্রচলিত সংস্কার এই যে, স্ত্রী-শূদ্রাদি বেদ-পাঠে অনধিকারী। এখন প্রশ্ন এই, ব্রহ্মজ্ঞান-লাভে স্ত্রী-শূদ্রাদির অধিকার আছে কি নাই? ব্রহ্মজ্ঞানে স্ত্রীজাতির অধিকার সম্বন্ধে গার্গী, মৈত্রেয়ী, সুলভা প্রভৃতি প্রসিদ্ধা ব্রহ্মবাদিনীগণই জলন্ত নিদর্শন। এজন্যই বোধ হয় শঙ্করাচার্য্য নারীজাতির অধিকার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা সঙ্গত বোধ করেন নাই। তিনি শূদ্রের অধিকার সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া দেশের প্রচলিত সংস্কারের অনুবর্ত্তন করিয়া শূদ্রের বিরুদ্ধেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি প্রথমে প্রতিপক্ষের যুক্তির উল্লেখ করিতেছেন :—"শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যা লাভে অধিকার আছে স্বীকার করা যাউক, কারণ অর্থিত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বাসনা, এবং সামর্থ্য অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের উপযোগী মেধা-শক্তি শূদ্রেরও থাকা সম্ভবপর। যজ্ঞে শূদ্রের অধিকার নাই সত্য, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভে শূদ্রের কোন অধিকার নাই, এরূপ কোন নিষেধ শ্রুতি নাই"। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে ঐতরের ব্রাহ্মণে ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি বৈদিক ঋষিগণ, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক শূদ্র ঋষি কবষ ঐলুষকে যজ্ঞে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব যজ্ঞেও শূদ্রের অধিকার নাই বলা যায় না। বল প্রয়োগেই কবষকে অধিকার চ্যুত করা হইয়াছিল। শুধু তাহা নয় ঋগ্বেদ সংহিতাতে দেখা যায় যে, দশম মণ্ডলের ৩০, হইতে ৩৪ পর্য্যন্ত পাঁচটী সূক্তেরই দ্রষ্টা ঋষি এই কবষ। এই কারণেও এই শূদ্র ঋষি কবষের প্রতি ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতির মনে কিঞ্চিৎ বিদ্বেষ ভাব থাকাও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। সে যাহা হউক, শঙ্কর বলিতেছেন :—"অনগ্নিত্বই শূদ্রের কর্ম্মে অনধিকারের কারণ। ব্রহ্ম-বিদ্যা-লাভ সম্বন্ধে অনগ্নিত্ব অনধিকারের কারণ হইতে পারে না। আহবনীয়াদি অগ্নিস্থাপন করে না বলিয়া কেহ ব্রহ্মবিদ্যা লাভে অসমর্থ হয় না। ব্রহ্মবিদ্যা লাভে শূদ্রের অধিকারের সমর্থনকারী নিদর্শন সকলও বর্ত্তমান। সম্বর্গ-বিদ্যায় ব্রহ্মজ্ঞান-শ্রবণার্থী রাজা জানশ্রুতিকে শূদ্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বিদুর প্রভৃতি শূদ্র-যোনিজাত হইলেও স্মৃতিতে তাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান লাভের উল্লেখ আছে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান লাভে শূদ্রেরও অধিকার আছে। এরূপ মীমাংসার বিরুদ্ধে আমরা বলিতেছি :—শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই, কারণ তাহার পক্ষে বেদাধ্যয়নের অভাব।" প্রতিপক্ষের মত ও

যুক্তি অতি বিশদরূপে প্রকাশ করাই শঙ্করের বিচারের প্রধান গৌরব। প্রতিপক্ষের উক্তি বলিয়া শঙ্কর যে অকাট্য যুক্তি বিন্যাস করিয়াছেন, আমরা আশা করিয়াছিলাম যে শঙ্করেরও তাহাই মত। তাহা হইলেই আমরা তাঁহার উদারতার ভূয়সী প্রশংসা করিতাম। তাহা নয় শঙ্করের মত শূদ্রের প্রতিকূল। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে শূদ্রের বেদাধ্যয়নের অভাব কেন? শঙ্কর তদুত্তরে বলিতেছেন:—"উপনয়ন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিতে হয়, এবং উপনয়ন ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েরই জন্য।" শঙ্করের কথার সারমর্ম্ম এই:—উপনয়ন ভিন্ন বেদপাঠ হয় না, বেদপাঠ ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। শূদ্রের উপনয়নের ব্যবস্থা নাই। যদি প্রশ্ন কর:—শূদ্রের উপনয়ন নাই কেন? তাহার উত্তর:—যেহেতু সে শূদ্র। হেতুর নামে এরূপ চক্রক হেত্বাভাসের (arguing in a circle) সহস্তর স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্বেদের অনুবাদ করিয়াই প্রদান করিয়াছেন। শূদ্রের উপনয়ন শ্রুতি-নিষিদ্ধ, শঙ্কর এরূপও বলিতেছেন না। উপনয়ন লোকের কার্য্য। শূদ্রের উপনয়ন করিলেই ত শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানে অনধিকার বলিবার আর কোন ভিত্তি থাকে না। শ্রুতিতে জাবালের উপনয়ন সম্বন্ধে গৌতম যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে, সেই প্রণালী মতে, যে কেহ সত্যবাদী সেই ব্রাহ্মণ, এবং তাহারই উপনয়ন হইতে পারে। জাবাল সত্যকামের গোত্র, এমন কি তাহার পিতার নামও অপরিজ্ঞাত ছিল, কারণ তাহার মাতা যৌবনকালে বহুচারিণী দাসী ছিলেন। তখনই সত্যকামের জন্ম হয়। সত্যকাম ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণার্থে হারিদ্রুম গৌতমের নিকটে উপস্থিত হইলে পর, গৌতম তাহাকে তাহার গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্যকাম বলিল:—"আমি কোন্ গোত্র জানি না। আমার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এবং তিনি বলিয়াছেন যে যৌবনকালে তিনি বহুচারিণী পরিচারিকা ছিলেন, তখন আমার জন্ম হয়। আমার গোত্র তিনিও জানেন না। তাঁহার নাম জবালা, আমার নাম জাবাল।" ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণার্থ উপনয়নের অধিকার বিচার সম্বন্ধে গৌতম এইমাত্রই যথেষ্ট মনে করিয়া, সত্যকামের সত্য-পরায়ণতা দৃষ্টেই তাহার উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ইহাতে কি মনে হয় না যে চরিত্র দৃষ্টে উপনয়নের অধিকার অনধিকার স্থির করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য, জন্মদৃষ্টে নয়! বিনা উপনয়নে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান না করাও নিষিদ্ধ শ্রুতির অভিপ্রায় নয়। বরং ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা দেখিতেছি (৪র্থ প্রপাঠক—৫ম অধ্যায়):—উপমন্যব প্রভৃতি ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ লাভ করিবার জন্য উদ্দালক আরুণির নিকট গমন করেন। পরে তথা হইতে তাঁহারা সকলে মিলিয়া কেকয়রাজ অশ্বপতির নিকটে যাইয়া বৈশ্বানর ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশপ্রার্থী হন, এবং সমিৎ-হস্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে পর, রাজা তাঁহাদের উপনয়ন না করিয়াই ব্রহ্মোপদেশ করিয়াছিলেন—"তান্ হানুপনীয়ৈবৈতদুবাচ"। স্ত্রীলোকেরও উপনয়নে অধিকার নাই—শূদ্রেরই তুল্য। তথাপি গার্গী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী। "চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ" "দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ" —"চাতুর্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ" ইত্যাদি অসংখ্য স্মৃতিবচন শূদ্রের অনুকূলে

রহিয়াছে। তাহা জানিয়াও শঙ্কর "শাস্ত্রীয় সামর্থ্যের" আভাস হেতু শূদ্রকে ব্রহ্মজ্ঞানে অনধিকারী স্থির করিতেছেন।

শঙ্কর নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে, "ব্রহ্মজ্ঞানে শূদ্রের অনধিকার, এরূপ নিষেধ শ্রুতি নাই," তথাপি তিনি বলিতেছেন :— "সামর্থ্য না থাকিলে শুধু অর্থিত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বাসনা, অধিকারের কারণ হয় না। কেবল 'লৌকিক সামর্থ্য' ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারের কারণ হয় না। শাস্ত্রীয় বিষয়ে 'শাস্ত্রীয় সামর্থ্য' থাকা আবশ্যক। যখন শূদ্রের জন্য বেদাধ্যয়ন নিরাকৃত হইয়াছে সেই সঙ্গেই 'শাস্ত্রীয় সামর্থ্য'ও নিরাকৃত হইয়াছে। যে ন্যায়ের বলে শূদ্র যজ্ঞে অনধিকারী, সেই ন্যায়ের বলেই তাহার ব্রহ্মবিদ্যাতেও অনধিকার প্রমাণিত হয়, কারণ সেই ন্যায় উভয়তঃই সাধারণ। স্বর্গীয় রমেশদত্ত কিম্বা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র শীলের মত লোকের বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণের সামর্থ্য নাই, একথা বলা বাহুল্যতা। তবে বলিতে হয়, এ সামর্থ্য 'লৌকিক। শাস্ত্রীয় সামর্থ্য" নয়। রৈক প্রযুক্ত "হা রে ত্বা শূদ্র" এই বাক্যে জানশ্রুতি যে সত্য সত্যই শূদ্র ছিলেন, ক্ষত্রিয় কিম্বা অন্য কিছু ছিলেন না, এইরূপ কোন লিঙ্গ বা ব্যাবর্ত্তক গুণের উল্লেখ নাই। শঙ্করের এ আপত্তি অমূলক। 'শূদ্র' নামে সম্বোধনই তাহার শূদ্রত্বের লিঙ্গ। শুচ যেমন চণ্ডাল রাজা ছিলেন, জানশ্রুতিও সেইরূপ একজন শূদ্র রাজা ছিলেন—এরূপ অনুমানই যুক্তি-যুক্ত। আবার শঙ্কর বলিতেছেন :—"জানশ্রুতির শূদ্রত্ব স্বীকার করিলেও একমাত্র সম্বর্গ (জগতের লয় বিষয়ক) ব্রহ্মবিদ্যাতেই শূদ্রের অধিকার, সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যার নয়।" আধখানা নৌকা,আধখানা কুমীর কখনও হয় না। শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানে অনধিকার প্রমাণ করিবার জন্য শঙ্করের মতন —শুষ্কাদ্বৈতবাদীর এইরূপ শিরঃপীড়া অতিশয় বিস্ময়কর। সম্বর্গ বিদ্যায় শূদ্র রাজা জানশ্রুতির অধিকার দৃষ্টে সমগ্র ব্রহ্মবিদ্যায় সমগ্র শূদ্র জাতির অধিকার অনুমান করাই সঙ্গত। শঙ্কর আবার বলিতেছেন :—"শূদ্র শব্দ এস্থলে অর্থবাদ বা নিন্দাবাক্য মাত্র, এতদ্দ্বারা কোন ব্রহ্মবিদ্যাতেই শূদ্রের অধিকার প্রমাণিত হয় না।" নিন্দার্থে দ্বিজাতির প্রতি শূদ্র শব্দের প্রয়োগ, অথবা প্রশংসার্থে শূদ্রের প্রতি দ্বিজ শব্দের প্রয়োগ, শ্রুতিতে অন্য কোথাও আছে, শঙ্করও এরূপ বলেন না। অতএব জানশ্রুতির প্রতি প্রযুক্ত শূদ্র শব্দকে অর্থবাদ মাত্র মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু শঙ্কর কোন মতেই নিরস্ত হইতেছেন না। তিনি বলিতেছেন :—"এ স্থলে শূদ্র শব্দের অন্য অর্থও কথা যায়। হংস-বাক্য শ্রবণ করিয়া জানশ্রুতি শোক-যুক্ত মনে রৈকের নিকট গমন করিয়াছিলেন (শুক্+দ্রু), এজন্যই পরোক্ষজ্ঞ রৈক তাঁহাকে শূদ্র নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাহারা জাতিতে শূদ্র তাহাদেরই অনধিকার।" রৈক যে পরোক্ষজ্ঞ ছিলেন, অথবা জানশ্রুতি যে জাতিতে শূদ্র ছিলেন না শঙ্কর তাহার কোন প্রমাণ দিতে চান না। এরূপ স্থলে দীর্ঘ ঊকারান্ত শূদ্র শব্দের সহজ রূঢ় অর্থ শূদ্র-জাতিত্ব, গ্রহণ না করিয়া ব্যাকরণের শ্রাদ্ধ করিয়া হ্রস্ব উকারান্ত শুক শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন বলিয়া, তাহার অনুরূপ অর্থকরা শঙ্করের পক্ষে নিতান্তই অসঙ্গত, শুধু অসঙ্গত

তাহা নয়, নিতান্তই অনুদারতার পরিচায়ক। অপরদিকে ছান্দোগ্য-উপনিষদে জানশ্রুতির যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহাকেও শূদ্রজাতির অন্য কিছুই মনে করা যায় না। তিনি 'সধুখান্' বা শকটবান্ ছিলেন, তাঁহার শকটের নিম্নে তিনি বসিয়াছিলেন—"অধস্তাচ্ছকটস্য!" তিনি শূদ্র ছিলেন বলিয়াই বোধহয়, বিনা বাক্যব্যয়ে শূদ্র রাজা জানশ্রুতির কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পুনরায় শঙ্কর বলিতেছেন :—"ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদায়ে উপনয়নাদি সংস্কারের উল্লেখ আছে।" উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু উপনয়নের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার নিমিত্ত-নৈমিত্তিক কোন সম্বন্ধ আছে, শঙ্করও তাহা বলেন না। আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে ঔপমন্যব প্রভৃতি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছি যে শ্রুতিতে উপনয়ন ভিন্ন ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে শ্রুতি-বচন দ্বারা শূদ্রের বেদে বা ব্রহ্মজ্ঞানে অনধিকার প্রমাণ করিতে অসমর্থ হইয়া শঙ্কর মন্বাদি স্মৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্কর বলিতেছেন :—"স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে শূদ্র চতুর্থবর্ণ, একজাতি, এবং সংস্কারের অযোগ্য। তাহার পক্ষে বেদশ্রবণ নিষিদ্ধ, শ্রবণ করিলে সীসা বা লাক্ষা দ্বারা তাহার কর্ণবিবর রুদ্ধ করিয়া দিতে হয়। শূদ্র চলন্ত শ্মশানস্বরূপ, তাহার নিকট শ্রুতি পাঠ করিবে না। যাহার নিকটে বেদ-পাঠ নিষিদ্ধ সে কিরূপে বেদ পাঠ করিবে? শূদ্রকে জ্ঞান দান করিবে না, ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য দ্বারা দ্বিজাতির জন্যই অধ্যয়ন, ইজ্যা এবং দানাদি কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।" ইহা সাতিশয় পরিতাপের বিষয় যে, যিনি স্বীয় জীবনে চণ্ডাল বা পুক্কসকেও গুরুমন্ত্র দান করিতে প্রস্তুত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, সেই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-বাদী শঙ্করও এই সকল জাতিগত বিদ্বেষপূর্ণ একদেশদর্শী শ্রুতি-বিরুদ্ধ স্মৃতি-বচন প্রমাণরূপে ব্যবহার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। তপস্যা করিবার অপরাধে রাম কর্ত্তৃক নিহত রামায়ণোক্ত শম্বুকনামা শূদ্রের বধও কি তিনি শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানে অনধিকারের প্রমাণরূপে গণ্য করিতে প্রস্তুত? শঙ্কর নিজেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শ্রুতির সহিত বিরোধ হইলে স্মৃতি প্রমাণ, আদরের অযোগ্য।" শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে বহুচারিণী দাসী জবালার অজ্ঞাত গোত্র পুত্র সত্যকাম অথবা শূদ্র রাজা জানশ্রুতি, অথবা ঐলূষ কবষ ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী। শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে যে উপনয়নে স্ত্রীজাতির অধিকার না থাকিলেও, গার্গী এবং মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনীগণ ব্রহ্মজ্ঞানে, অধিকারিণী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এই সকল শ্রুতি-প্রমাণের সহিত বিরোধ হেতু, ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অনধিকার-সূচক স্মৃতি বচন সকল শঙ্করের নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারেই দুর্ব্বল এবং আদরের অযোগ্য। কিন্তু শঙ্কর যেন প্রচলিত সংস্কারের উপরে আঘাত করিবার ভয়ে ভীত হইয়াই এ স্থলে শ্রুতি-বিরুদ্ধ স্মৃতি-বচন অগ্রাহ্য করেন নাই। বরং তিনি মহাভারতোক্ত শূদ্র-প্রবর ব্রহ্মজ্ঞানী বিদুর এবং ধর্ম্মব্যাধ যিনি গুরুর আসন গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ-কুমারকেও ব্রহ্মজ্ঞান দান করিয়াছিলেন অথবা ধীবরী-পুত্র ব্যাস, এবং দাসীপুত্র নারদ প্রভৃতির ব্রহ্মজ্ঞান লাভের এক অপূর্ব্ব প্রমাণ-

শূদ্র কারণ কল্পনা করিতেছেন :—"বিদুর ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি যাহাদের পূর্ব্বকৃত সংস্কার হেতু জ্ঞানোদয় হয়, তাহাদের জ্ঞানের ফল-প্রাপ্তি বারণ করা যায় না, কারণ জ্ঞানের ফল-লাভ অবশ্যম্ভাবী।" প্রচলিত সংস্কারের দাসত্ব কি শঙ্করের মনে এতই প্রবল ছিল যে বিদুরাদি শূদ্র মহাপুরুষগণের স্বাভাবিক জ্ঞান ফল-লাভের প্রতিবন্ধক জন্মাইতেও তিনি অসম্মত নহেন। যাহার অন্তরে শূদ্র-বিদ্বেষ এতদূর প্রবল, তাহার পক্ষে শূদ্রের অধিকার বিচারভাব গ্রহণ করা কখনও নিরাপদ হইতে পারে না। যে বিদ্বেষ শূদ্রের মোক্ষপথ পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিতে প্রস্তুত, তাহা আমেরিকাবাসী গোরাদের কালাবিদ্বেষ অপেক্ষাও দুর্বাহ। পূর্ব্বকৃত সংস্কার কাহার আছে, কাহার নাই, কে বলিবে? তাহা জানিবার যদি কাহারও অকপট আগ্রহ থাকে, তবে শূদ্রজাতির জন্য বেদ-পাঠের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া পরীক্ষা করিয়া, ফল দৃষ্টে নিষ্কারণ করা কর্ত্তব্য, কাহার পূর্ব্ব সংস্কার আছে, এবং কাহার নাই। পূর্ব্বকৃত সংস্কার সম্বন্ধে সকল জাতিই সমান। দ্বিজাতিরও যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ পূর্ব্ব সংস্করণ জনিত নয়, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? সে যাহা হউক, উল্লিখিত একদেশদর্শী যুক্তি অবলম্বন করিয়া শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিতেছেন :—"অতএব বেদ-পাঠ-পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান লাভে শূদ্রের অধিকার নাই।" ব্রহ্মসূত্র অ-১। পা-৩। সূ-৩৪, ৩৮॥

শ্রীবিজয়রাম দত্ত।

কবীর।

উত্তর ও মধ্য-ভারতবর্ষের জনসাধারণের ভিতর অন্যান্য হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারকগণের মধ্যে কবীরই অধিকতর পরিচিত ও সমাদৃত। সুপ্রসিদ্ধ হাণ্টার সাহেব কবীরকে পঞ্চদশ শতাব্দীর ভারতীয় লুথার নামে অভিহিত করিয়াছেন।

কবীরকে যাঁহারা ধর্ম্মগুরু বলিয়া মান্য করেন তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চনদ প্রদেশের শিখ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা মহাবীর নানক এবং আহাম্মোদাবাদের "দাদূ-পন্থ"—প্রচলকর্ত্তা দাদূই প্রধান। শিখদিগের ধর্ম্মপুস্তক "আদিগ্রন্থ" হইতে কবীরের জীবন ও ধর্ম্মদীক্ষার সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। মহাবীর নানকের কবীরের সহিত নিবিড় ঘনিষ্ঠতা হেতু তিনি তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত ও মতাদি সংগ্রহ করিয়া রচনা করিয়াছেন।

কবীরের ধর্ম্মমতাবলম্বীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। ইংরাজী ১৯০১ সালের আদম-সুমারীর হিসাবে কবীরপন্থির সংখ্যা ৮,৪৩১১৭ হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অধিক। কারণ প্রথমতঃ যুক্ত প্রদেশের কবীরপন্থিগণকে রামানন্দী শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, পঞ্চনদ প্রদেশের কবীরপন্থীদিগকে ধরা হয় নাই।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশ সমস্ত স্তোত্রাকারে নিবদ্ধ। সেইগুলি এত সরল সুমিষ্ট ও মর্ম্মস্পর্শী এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষশূন্য যে ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের নিকট

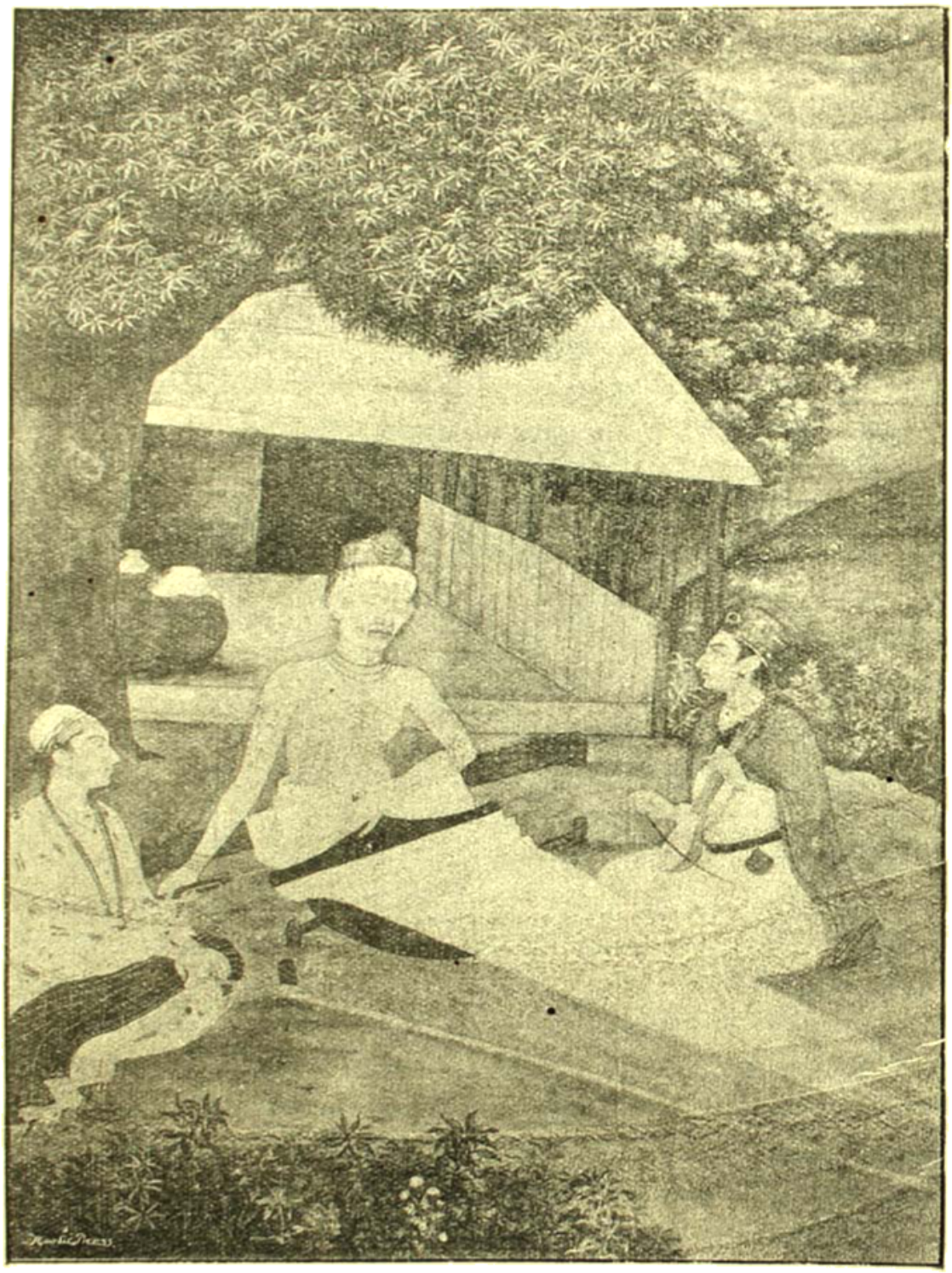

কবীর।

তাহা সমভাবে আবৃত হইয়া থাকে। কবীরের জন্মসম্বন্ধে কোন বৃত্তান্ত তাঁহার কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। যেটুকু জানা যায়, তাহা এত আশ্চর্য্য ও অলৌকিক যে তাহা বিশ্বাস যোগ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। সর্ব্বত্রই মহাপুরুষদিগের জন্মবৃত্তান্তের সহিত যেমন কোন না কোন অলৌকিক ঘটনা জড়িত থাকে এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কবীরেরও জন্মবৃত্তান্ত অতি রহস্যময়। যাহা হউক অনুমানে তিনি ১৪২১ খৃঃ অব্দে* জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১২৬ বৎসর জীবন ধারণ করিয়া ১৫৪৮ খৃঃ অব্দে নশ্বর দেহ ত্যাগ। রেভারেণ্ড জি, এইচ, ওয়েষ্টকোট, এম্ এ, "কবীর ও কবীর পন্থা" গ্রন্থে কবীরের জন্ম ১৪০৩ খৃঃ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কবীর হিন্দু, কি মুসলমান তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। এসম্বন্ধে তিনিই তাঁহার নিজের স্তোত্র গ্রন্থে দুই তিন স্থানে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে এইটুকু স্পষ্ট বুঝা যায় যে তিনি মুসলমান তন্তুবায় নিরু গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেও অন্তরে হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন। স্তোত্র গ্রন্থের এক স্থানে, তিনি বলিয়াছেন আমি তাঁত বুনা একবারে ত্যাগ করিয়া হরিগুণ গান গাহিয়া জীবন অতিবাহিত করিব। আবার এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন পূর্ব্ব জন্মে আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম, বোধ হয় রামের পূজায় অবহেলা করিয়া ছিলাম বলিয়া এজন্মে জোলার গৃহে জন্ম লইতে হইয়াছে।

কবীরের জন্মরহস্য যেমন আশ্চর্য্য তাঁহার নামকরণ রহস্যও তদ্রূপ। নিরু এই শিশু পুত্রের নামকরণের জন্য একটী কাজীর নিকট গমন করেন। কাজী সমস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন শিশুর নাম কবীর হওয়া উচিত। কিন্তু কবীর এই শব্দ যে ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, 'আকবর,' 'কুবরা,' প্রভৃতি শব্দও সেই ধাতু হইতে সাধিত। নিরুর ন্যায় নীচ জাতির পুত্রের ঐ উচ্চ ও পবিত্র নামকরণ সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইল না। তখন অন্যান্য কয়েকজন কাজীকে এই পুত্রের নাম করণের জন্য অনুরোধ করা হইলে তাঁহারাও সকলে পূর্ব্বোক্ত কাজীর ন্যায় মত প্রকাশ করিয়া নিরুকে বলিলেন—"তুমি যে কোন উপায়ে এই শিশুর প্রাণ সংহার কর নচেৎ দেশে ঘোর বিপ্লব আশঙ্কা।" তাঁহাদের উপদেশ মতে নিরু শিশুর জীবন সংহার মানসে তাহাকে গৃহের প্রাঙ্গণে ফেলিয়া গেলেন। এমন সময় সেই শিশু কথা কহিয়া বলিল "মায়া সমস্ত জগৎকে ঢাকিয়া আছে, সেই জন্য কেহ আমায় চিনিতে পারিতেছে, না। আমি কোন স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মগ্রহণ করি নাই। আমি মহাপুরুষের অংশ মাত্র আমায় কেহ ধ্বংস করিতে পারিবে না।"

ইহাতে বিস্মিত হইয়া নিরু তাহার প্রাণ সংহারের কোন চেষ্টা না করিয়া, সেই শিশুকে কবীর নামেই অভিহিত করিলেন। শৈশব-কাল হইতে কবীর ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা সহ্য করিতে

---

* কবীরের জন্ম সম্বন্ধে একটা প্রবাদ :—

রামানন্দ নামক কোন মহাপুরুষের ঘোর প্রভাবে কবীর তাঁহার মাতার (ব্রাহ্মণকন্যা) হস্তের তালু হইতে অলৌকিক উপায়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার মাতা একটি সরোবরের মধ্যে পদ্মের উপর তাঁহাকে রাখিয়া চলিয়া যান। দৈবাৎ নিরুর স্ত্রী নীমার চক্ষে পড়াতে নীমা তাহাকে গৃহে লইয়া যায়।

পারিতেন না। বাল্যে তিনি হিন্দু মুসলমান সঙ্গীগণকে তাহাদের গোঁড়ামীর দরুণ বড়ই উত্যক্ত করিতেন—মুসলমান বালকদের নিকট কেবল "রাম রাম" ও "হরি হরি" উচ্চারণ করিতেন। মুসলমানেরা তাঁহাকে কাফের বলিয়াগণনা করিত। কবীর বলিত যাঁহারা অন্যায় করে তাহারা কাফের। একদিন কবীর তাঁহার ললাটে তিলক শোভিত করিয়া গলায় উপবীত ধারণ করিয়া "নারায়ণ, নারায়ণ" বলিয়া ব্রাহ্মণদের সম্মুখ দিয়া যাইতে ছিলেন। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা কুপিত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন। তিনি বলেন "এই আমার ধর্ম্ম, আমার জিহ্বায় বিষ্ণু, চক্ষে নারায়ণ, হৃদয়ে গোবিন্দ বিরাজ করিতেছেন। আপনারা মৃত্যুর পর আপনাদের কার্য্যের কি হিসাব নিকাশ দিবেন। তন্তুবায়ের পুত্র হইয়া আমি উপবীত ধারণ করিয়াছি বলিয়া আপনাদের গাত্রদাহ হইয়াছে। আপনারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া নাম মাত্র গায়ত্রী জপ ও গীতা পাঠ করেন। আমি দেখ, আপনারা মেষপালক, আমাদের প্রতি হিংসা ভাব পোষণ না করিয়া আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করাই আপনাদের কর্ত্তব্য। আপনারা নশ্বর পার্থিব সুখ ও উন্নতির জন্য সতত লালায়িত, আমি সেই হরিপদ পাইবার জন্য সতত ব্যগ্র।"

কবীরের গুরু নাই বলিয়া লোকে উপহাস করিত। এই জন্য তিনি রামানন্দের শিষ্য হইবেন বলিয়া মনস্থ করেন। কিন্তু তিনি মুসলমান বলিয়া তাঁহার ইচ্ছা সফল হওয়া অসম্ভব জানিতেন, সেই জন্য তিনি কৌশলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কবীর অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন রামানন্দ কোন নির্দ্দিষ্ট ঘাটে স্নানের জন্য গমন করেন। ইহা শুনিয়া কবীর একদিন প্রাতঃকালে সেই ঘাটের একটী সোপানের উপর শয়ন করিয়া রহিলেন। রামানন্দ নির্দ্দিষ্টকালে সোপান অবতরণ করিতে গিয়া সহসা তাহার উপর পদার্পণ করিয়া 'রাম রাম' বলিয়া চমকিয়া উঠিলেন। কবীর —তখন মনে করিলেন এই মহাপুরুষের মুখে রামনাম যত সহজে উচ্চারিত হয় অন্য কথা তেমন হয় না। সেই হইতে রামনাম মন্ত্রের স্বরূপ গ্রহণ করিয়া কবীর সাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে, কবীর রামানন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে আশ্চর্য্য হইয়া রামানন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া মুসলমান বালক কবীরকে তিনি শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। রামানন্দ সেই বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন "কবে তোমাকে আমি মন্ত্রদান করিয়াছি?" কবীর বলিলেন "গুরু নানারূপে শিষ্যকে মন্ত্র দিয়া থাকেন, আপনিও আমাকে আমার মাথায় পদস্পর্শ করিয়া রাম নাম মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি সেই দিবসের ঘাটের ঘটনার কথা উল্লেখ করিলেন ইহাতে রামানন্দ অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিয়া বলিলেন "শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তুমি আমার শিষ্য।"

কবীর গৃহে তাঁতের কর্ম্ম করিতেন এবং যখন কোন সাধু সন্ন্যাসী বা কোন অতিথি আসিতেন তখন তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করি-

তেন। তাঁহার প্রকাশ্য স্বীকার দিন হইতে নিয়মিতরূপে তিনি গুরুপদ দর্শনে যাইতেন এবং সময় সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত শাস্ত্রালোচনায় ও তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিতেন।

কেহ বলেন লুইয়া নাম্নী স্ত্রীলোককে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার কমল নামে এক পুত্র ও কমলী নামে এক কন্যা ছিল। আবার কেহ কেহ বলেন লুইয়া তাঁহার স্ত্রী নহে তাঁহার শিষ্যা এবং উল্লিখিত বালকবালিকা দুইটি তাঁহাদের সন্তানও নহে। তাহাদিগকে মৃতাবস্থায় কুড়াইয়া পাইয়া লুইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

কবীর জাতিভেদ মানিতেন না। একদা কন্যা কমলী একটী কূপ হইতে জল তুলিতে ছিল এমন সময় একটী তৃষিত ব্রাহ্মণ তাহার নিকট জল চাহিলেন এবং তৃষা নিবারণ করিয়া বালিকার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কমলী তন্তুবায়ের কন্যা শুনিয়া তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন "তুমি আমার জাতি নষ্ট করিয়া দিলে?"

কমলী তাঁহার ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল এবং ইহার মীমাংসার জন্য তাহাকে লইয়া স্বামিজীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। কবীরকে কমলী স্বামিজী বলিয়া ডাকিত। এই ঘটনা বিজ্ঞাপিত করিবার বহুকাল পূর্ব্বে কবীর তাঁহার যোগবলে ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিতকে বলিলেন "জল পান করিবার পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখা উচিত, অশুচি কি নয়। জলে কি না—মিশিতেছে। আমাদের কার্য্যে ও অন্নে কত অপবিত্রতা আছে। আপনারা কেবল বাহ্য বস্তু লইয়া ব্যস্ত। প্রথমে নিজ অন্তর শুদ্ধ করুন তাহা হইলে জগৎ শুদ্ধ হইবে।" এইরূপ বুঝাইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন এবং কমলীর সহিত তাহার বিবাহ দিলেন।

কবীর হিন্দী সাহিত্যের একরূপ জন্মদাতা। তিনি হিন্দু ও মুসলমান গ্রন্থের মহিমা কীর্ত্তন করিতেন কিন্তু উহা জনসাধারণের উপযোগী নহে বলিয়া তিনি জনসাধারণের উপকারের জন্য তাঁহার শিক্ষাসমূহ হিন্দী ভাষায় লিখিলেন। কবীর একজন সুকবি ও সুবক্তা ছিলেন। তিনি বলিতেন, "ধর্ম্ম বিষয়ের শিক্ষা যদি পদ্যে প্রচার করা হয় তাহা হইলে শীঘ্র সকলের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে।"

দয়া নম্রতা সাম্যজ্ঞান সৎস্বভাব তাঁহার শিষ্যদের বিশেষ গুণ। তাঁহার শিষ্যেরা বাহ্যানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেন। কবীরের শিষ্যগণের মধ্যে আমিষ ভোজন এবং পরিধীতা পত্নীত্যাগ নিষিদ্ধ।

গোরক্ষপুরের অন্তর্গত মাঘরে কবীর দেহত্যাগ করেন। তাঁহার হিন্দু শিষ্যদের ইচ্ছা ছিল তিনি কাশীধামে দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস কাশীধামে দেহত্যাগ করিলে পূর্ণমুক্তি লাভ ঘটে। কবীর তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন "ভগবানের ক্ষমতা কি এতই সীমাবদ্ধ যে কাশী ব্যতীত অন্য স্থানে কেহ দেহত্যাগ করিলে তাহার উদ্ধার হয় না?"

তাঁহার মৃতদেহ সৎকারের সম্বন্ধে একটী বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দুরা তাঁহার মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য এবং

মুসলমানেরা তাঁহাকে সমাধিস্থ করিতে ব্যস্ত।

এইরূপ যখন দুই দলের মধ্যে ঘোরতর তর্ক চলিতেছিল তখন সকলে দেখিল কবীরের বস্ত্রাচ্ছাদিত মৃতদেহ প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের স্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। উহার অর্দ্ধেক গুলি ফুল লইয়া হিন্দুরা কাশীতে দাহ করিল এবং অপরার্দ্ধ মুসলমানেরা লইয়া মাগরে সমাধিস্থ করিল!

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ।

চিন্তামণির বিপদ।

চিন্তামণি সরকার, নামেও সরকার—কাযেও তাই। লোকটা আধা বয়সী শক্ত সমর্থ কাযের লোক। জীবনের ১৬ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া আজ ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ডিষ্টার সিন কোং'র বাড়ী সরকারী করিতেছে। সাহেবেরা তাহাকে বিশ্বাস করেন। তাহার হাতে টাকা আদায়ের ভার থাকিলেও এ পর্য্যন্ত তাহার নামে কেহ কখনও কোনরূপ দোষ দিতে পারে নাই। ইহা সত্ত্বেও অর্থ ই অনর্থের মূল এই নীতি বাক্য তাহার জীবনে সে যথেষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিল।

একদিন সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় বরানগরের এক মহাজনের বাড়ী হইতে অনেক দিনের প্রাপ্য ২৫০০৲ টাকার মধ্যে প্রায় ২০০০৲ টাকার নোট কোম্পানির তহবিলের জন্য ও রকার বকসীসস্বরূপ নিজ তহবিলের জন্য ১ খানি ১০০ টাকার নোট লইয়া চিন্তামণি দ্রুতপদে আফিসের দিকে ফিরিতেছিল। অনেক টাকা সঙ্গে, সন্ধ্যাও হয় হয়; চিন্তামণির যে একটু ভয় হইতেছিল না এমন নয়। অথচ থোক্ ১০০ টাকার এক কেতা নোট নিজের লভ্য হইয়াছে বলিয়া কতকটা—কতকটাই বা কেন বেশ প্রফুল্ল ভাবেই চলিতেছিল।

চলিতে চলিতে সহসা তাহার মনে হইল যে নিজের ১০০ টাকার নোটখানি সে সঙ্গে লইয়া আসে নাই—কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছে। যেমন মনে হওয়া অমনি সঙ্গে সঙ্গে অন্বেষণ। পকেট, বই, ব্যাগ, কাগজ পত্র সব দেখা হইল কৈ নোট ত নাই? থাঃ এত কষ্টের উপায় পাঠে ম'জা গেল। পুনরায় সব পকেট কাগজ পত্র ব্যাগ হাতড়াইল, নোট খানা আফিসের জমা দিবার নোটের সহিত রাখে নাই তো? রাস্তার ধারে বসিয়া আফিসের টাকাগুলা চার পাঁচবার করিয়া গণিয়া দেখিল। অবশেষে নোট প্রাপ্তির আশায় একপ্রকার হতাশ হইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম চিন্তামণি বুকের পকেট হইতে রুমাল খানা টানিয়া বাহির করিতেই নোটখানি রুমালের সহিত বাহির হইয়া পড়িল। বুকের পকেটে যে নোট ছিল তাহা তাহার বিন্দুমাত্র স্মরণ ছিল না।

সহসা হারানিধি পাইয়া তাহার বড় আনন্দ হইল। সে একবার নোটখানি খুলিয়া চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া দেখিতে লাগিল। আগে হইতেই মেঘ করিয়া অল্প অল্প বাতাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছিল—ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ঝড় উঠিয়া চিন্তামণির হাত

হইতে নোটখানি উড়াইয়া লইয়া গেল। নোটখানি হাওয়ার জোরে প্রথমে খুব খানিকটা উঁচুতে উঠিয়া ধীরে ধীরে একটা চাবিবন্ধ বাড়ীর কার্ণিশে গিয়া পড়িল। চিন্তামণি ভাবিল এখনি সেখানা উড়িয়া মাটিতে পড়িবে। কিন্তু তখনি বাতাসের জোর বন্ধ হইয়া গেল। অর্দ্ধঘণ্টা অপেক্ষা করিয়াও চিন্তামণি দেখিল নোটখানা উড়িয়া পড়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। দুএকটা ঢিল ছুড়িয়া মারিল, নোটের উপর লাগিল না। চিন্তামণি দেখিল মহাবিপদ। কার্ণিশের উপর নোট রহিয়াছে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে অথচ উড়িয়া পড়ে না। এখানে মই বা আকুশীও নাই যে নোটখানি উদ্ধার করিবে। চিন্তামণি উৎকণ্ঠিতচিত্তে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল রাস্তায় লোক জন বড় বেশী নাই। সে দৌড়িয়া বাড়ীর পাশের বাগানে ঢুকিয়া একখানা মইয়ের সন্ধান করিতে লাগিল। তখনও তত অন্ধকার হয় নাই। চিন্তামণি দেখিল একখানি অর্দ্ধ শুষ্ক মই প্রাচীরের গাত্রে সংলগ্ন রহিয়াছে তাহার উপর একটা লতাগাছ উঠিয়াছে। মইটা কোন রকমে টানিয়া হিঁচড়াইয়া অনেক কষ্টে বাহিরে লইয়া আসিল। লতা গাছটা ছিঁড়িয়া খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল। কিন্তু ততক্ষণ অন্ধকারও ঘনাইয়া আসিতেছিল, সেই অল্প আলোকে কার্ণিশে নোটখানি আর ভাল দেখা যায় না। তাড়াতাড়ি মইখানা কার্ণিশে লাগাইয়া চিন্তামণি উঠিতে আরম্ভ করিল। তাড়াতাড়িতে মই খানার দুটা পা যথাস্থানে পড়িল না, উৎকণ্ঠিত চিন্তামণির সেদিকে লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না। যেখানে নোট খানা ছিল তাহার ঠিক সম্মুখেই একটা জানালা, তাহাতে খড়খড়ি নাই কেবল সার্শি আঁটা। মইখানা কার্ণিশের চেয়ে অনেক বড়, ঠিক করিয়া বসানোও হয় নাই, তাই মইখানা বক্রভাবে সার্শির গায়ে লাগিয়াছিল। চিন্তামণি তাহা দেখে নাই। পাঁচ সাত ধাপ উঠিতেই চিন্তামণি ও মইয়ের ভারে সার্শির কাচ সশব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। চিন্তামণিও আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া উপর হইতে পড়িয়া গেল। সার্শির ভাঙ্গা কাচে গায়ের দু একস্থান কাটিয়া রক্তপাত হইল। চিন্তামণি অতিকষ্টে উঠিয়া মইখান ঠিক করিয়া বসাইল। বসাইয়া সবে মাত্র দুই চারি ধাপ উঠিয়াছে এমন সময় দেখিল তাহার সেই নোটখানি সহসা ঈষৎ বায়ু সংযোগে ভাঙ্গা সার্শি খানার ভিতর দিয়া ঘরের ভিতর গিয়া পড়িল। সর্ব্বনাশ, নোটখানি আর দেখাও যায় না। চিন্তামণির ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল। এমন বিপদে সে জীবনে কখনও পড়ে নাই। চিন্তামণি সাহসে বুক বাঁধিয়া একবার এধার ওধার চাহিয়া দেখিয়া কার্ণিশে গিয়া দাঁড়াইল। তারপর অতি কষ্টে সেই ভাঙ্গা সার্শির ভিতর দিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিল। বিপদ বিপদেরই অনুসরণ করে, অন্ধকারে অসতর্ক অবস্থায় কাচে তাহার হাতের একস্থান অত্যন্ত গভীর ভাবে কাটিয়া রক্তধারা ঝরিতে লাগিল। কিন্তু সে দিকে তখন মনোযোগ দিবার সময় নাই। অন্ধকারটা চোখে সহিয়া গেলে চিন্তামণি দেখিল তাহার নোটখানি মেঝের উপর পড়িয়া আছে। তাড়াতাড়ি নোটখানি কুড়াইয়া লইয়া রাগে তাহাকে দুই একবার খুব জোরে নাড়া দিয়া দিল। এমন রাগ হইয়াছিল যে ছিঁড়িয়া ফেলিলেও রাগ যায় না, তথাপি

না ছিঁড়িয়াই চিন্তামণি সাবধানে নোটখানা কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া সেটাকে বেশ করিয়া কোমরে জড়াইয়া লইল। তারপর কাটা হাতের উপর নজর পড়িল তখন সেখানটা দিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছিল ও ঘরের মেজের মধ্যে স্থানে স্থানে ঘপেষ্ট রক্ত জমিয়া গিয়াছিল। বস্ত্রাদিও রক্ত রঞ্জিত। চাদর ছিঁড়িয়া ক্ষত স্থান বাঁধিয়া চিন্তামণি বাহির হইবার উদ্যোগ করিল। জানালার নিকট আসিয়া চিন্তামণির সংজ্ঞা লোপ হইবার উপক্রম হইল। চিন্তামণি দেখিল একজন পাহারাওয়ালা ও দুইজন ভদ্রলোক মইখানার নিকট দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে। ভদ্রলোকেরা বলিতেছিলেন "এই দেখ মই! চোরটাকে এই মই দিয়ে আমরা উপরে উঠিতে দেখিয়াছি।" পাহারাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল "এ বাড়ী কাহার।" বাড়ীর অধিকারীর নাম বলিয়া ভদ্রলোকটী বলিল "এ বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয় ভাড়াটিয়াদের দুইটী ছেলে এখানে থাকিয়া কলেজে পড়ে। আমি জানিতাম তাহারা দুজনই দেশে গিয়াছে জিনিষ পত্র এখানেই সব আছে। তখন পাহারাওয়ালা ভদ্রলোকদের মধ্যে একজনকে খিড়কীর দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইতে অনুরোধ করিয়া একজনকে লইয়া মই দিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল।

চিন্তামণি সব শুনিয়া নিজের বিপদ বুঝিল। তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া সন্তর্পণে বাড়ীর ভিতরের সিঁড়ি দিয়া নামিতে আরম্ভ করিল। এদিকে পাহারাওয়ালা ও ভদ্র লোকটা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। চিন্তামণি শুনিল পাহারাওয়ালা অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিতেছে 'এতো শুধু চুরী নয় এযে দেখ্‌চি খুন্। রক্ত দেখ্‌চনা। বাড়ির মধ্যে খুনী আসামী কোথায় লুকিয়ে আছে, সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র নিশ্চয় আছে আমি এখানেই থাকি, আপনি নেমে গিয়ে লোক ডাকুন দুচার জন কনেষ্টেবল।" এইরূপ গোলমালে খিড়কীর দরজায় যে ভদ্রলোক পাহারা দিতেছিলেন অন্ধকারে একাকী থাকিতে সাহস না করিয়া তিনিও সরিয়া পড়িলেন। চিন্তামণি সন্তর্পণে খিড়কী দরজা খুলিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িয়া একবারে দে ছুট্। যে ভদ্র লোক দরজায় পাহারা দিতেছিলেন—তিনি রাস্তায় চিন্তামণিকে দৌড়িতে দেখিয়া চোর চোর করিয়া সঙ্গে ছুটিলেন; এবং অতি শীঘ্র তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া—দুজনে ধস্তাধস্তি করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে ভদ্রলোকটির অঙ্গেও রক্ত মাখামাখি হইল। অনেক কষ্টে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া চিন্তামণি আবার ছুটিয়া পড়িল; ভদ্র লোকটিও অনুসরণ করিলেন,—রাস্তার লোকও চোর চোর করিয়া তাহাদের সঙ্গ ধরিল,—অবিলম্বে পুলিস কনষ্টেবল আসিয়া জুটিল—তাহাদের প্রশ্নে —উত্তরে উভয়কে চোর প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস চলিতে লাগিল। তখন উভয়কেই তাহারা গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। এইরূপে একরাত্রি কারাবাসের পর পরদিন চিন্তামণির বড়সাহেব এই সংবাদ পাইয়া থানায় আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলেন। আর সেই ভদ্রলোকটি কিরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন, সে খবরটি আমরা জানিতে পারি নাই।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাপানের সেনা এবং নৌবিভাগ।

জাপানের অসাধারণ কৃতিত্বে অনেকে উহাদের সেনা এবং নৌবিভাগ সম্বন্ধে অনেক রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। আজ সংক্ষেপে উহার বিবরণ কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলাম। ১৮৬৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত প্রায় সাত শত বৎসর ব্যাপিয়া জাপানে জায়গীর প্রথা (Feudal system) প্রচলন ছিল। ঐ সময় সৈনিক বিভাগে সামুরাই জাতির একাধিপত্য ছিল। কিন্তু জায়গীর প্রথা উঠিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৬৭ খ্রীঃ হইতে প্রত্যেক শ্রেণীর বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই সেনা বিভাগে সমধিকার জন্মিয়াছে। প্রায় এই সময় হইতেই পাশ্চাত্য সৈনিক প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্শ্যাল ওইয়ামা, জেনারেল কাওয়াকামি এবং জেনারল কাউন্ট কাৎসুরা ইউরোপের প্রধান প্রধান শক্তির সৈনিকপ্রথা অধ্যয়নে বাহির হন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উহারা প্রুশিয়া প্রথানুযায়ী সেনা-বিভাগের সংস্কার করেন। এই সময় (১৮৮৫ খ্রীঃ) প্রুশিয়ান আর্ম্মির বিখ্যাত জেনারেল মেকেল জাপানসেনা বিভাগের উপদেষ্টা হইয়া আসিয়াছিলেন। যে সকল জেনারল চীনজাপান এবং রুষজাপান সময়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই জেনারেল মেকেলের ছাত্র।

সুশৃঙ্খলরূপে কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য সেনা-বিভাগকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভাগ করা হয়। যথা (১) ওয়ার অফিস; (২) জেনারল ষ্টাফ; (৩) মিলিটারি এডুকেশন।

প্রাইমারী স্কুল হইতে কলেজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পাঠাগারে মিলিটারি ড্রিল, তলোয়ার খেলা, বন্দুক চালনা প্রভৃতি শিক্ষা দিলেও শুধু মিলিটারি শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনেক রকম স্কুল কলেজ আছে। যাঁহারা সেনাবিভাগে অফিসার হইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন তাঁহারা প্রথমতঃ মিলিটারি প্রিপারেটরী স্কুলে যোগ দেন। এরূপ স্কুল তোকিও, হেনদাই, ওমাহা, নাগোইয়া, হিরোশিমা এবং কুমামতো সহরে এক একটি আছে। এই সকল স্কুলের উত্তীর্ণ ছাত্র তোকিও সেণ্ট্রাল মিলিটারী প্রিপারেটারী স্কুলে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন; এখানকার অধ্যয়ন সমাপ্তির পর তোকিওস্থ অফিসার স্কুলে অধ্যয়ন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন। তোকিওস্থ ষ্টাফ কলেজে দক্ষ এবং সুচতুর লেপ্টেনাণ্ট এবং ক্যাপটেনদিগকে ষ্টাফ অফিসারশ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়।

উল্লিখিত স্কুল কলেজ ছাড়া বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য আরও অনেক রকম কলেজ আছে।

আর্টিলারী এবং ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে সব-লেপ্টেনাণ্ট দিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়; তৈয়ামা স্কুলে নন্-কমিশণ্ড অফিসারদিগকে নানারূপ কৌশল, বন্দুকচালনা, লাঠিখেলা, কুস্তি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। রাইডিং স্কুল অশ্বারোহী সৈন্যের শিক্ষাস্থল। এতদ্ব্যতীত ফোর্ট আর্টিলারি গুটিং স্কুল, পেয়াদার স্কুল, সার্জ্জারি স্কুল, ভেটেরিনারি স্কুল, গানারি স্কুল, মেকানিক্যাল্ ওয়ার্ক স্কুল, এবং ব্যাণ্ড স্কুল প্রভৃতি আছে।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর

বয়স্ক সুস্থকায় পুরুষমাত্রকেই যে কোনমুহূর্ত্তে গবর্ণমেণ্টের "আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া জাতীয় শক্তিতে যোগ দান করার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। আজকাল বিশ বৎসর পূর্ণ হইয়া গেলে একুশ বৎসরের প্রারম্ভে প্রত্যেক যুবককে সেনাবিভাগে যোগ দিতে হয়, যাহারা সৈনিকবিভাগে চাকুরি করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করে তাহারা আইনানুমোদিত অনিবার্য্য (compulsory) দুই বৎসর কাল কাজ করার পরও ঐ বিভাগেই রহিয়া যায়। অন্যান্য সকলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়, কিন্তু আবশ্যক হইলে যে কোন মুহূর্ত্তে রাজসরকার তাহাদিগকে ডাকিয়া লয়। সৈনিকবিভাগে ১৭ বৎসর ৪ মাসে কার্য্যকাল পূর্ণ হয়—উহার তিন বছর য়্যাক্টিভ্ সার্ব্বিস, চারি বছর চারি মাস রিজার্ভ সার্ব্বিস, এবং অবশিষ্ট দশ বছর ডিপো-সার্ব্বিস।

৬০ বৎসর বয়সের উপর যে পিতার বয়স এবং যিনি জীবিকা উপার্জ্জনে অক্ষম তাঁহার একমাত্র পুত্রকে উপরোক্ত আইনের হাত হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পাঠ্যাবস্থায় যুবকদিগকে পাঠ সমাপ্তির জন্য অবকাশ দেওয়া হইয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটের কেহই ২৪ বৎসর বয়স না হইলে সৈনিক হইতে পারে না, কাজেই গ্রাজুয়েটগণকে প্রায়ই ভলাণ্টিয়ার অর্থাৎ স্বেচ্ছাসেবী হইয়া ২৫ বৎসর বয়সে সেনাবিভাগে কাজ করিতে হয়। মধ্য-স্কুলের পাঠ সমাপ্তির পর ভলেণ্টিয়ার হইবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়—এক বৎসর ভলেণ্টিয়ার হইয়া কাজ করিলে সব্‌লেফটেনাণ্ট লিষ্টে রিজার্ভ শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। ভলাণ্টিয়ারদিগকে আর পূর্ব্বোল্লিখিত ১৭ বৎসর ৪ মাস কাল বাধ্য হইয়া সেনাবিভাগে থাকিতে হয় না। তবে গবর্ণমেণ্টের হুকুম মাত্র আবশ্যকীয় কাজে যোগ দিতে হয়। গত যুদ্ধে আমাদের কলেজের ৪৭ জন ছাত্র মাঞ্চুরিয়া ক্ষেত্রে রুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। উহার ১৯ জনকে দেশের কাজে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। উহারা বলিয়া কেন সাধারণ সৈন্যগুলিও অর্থলোভে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হয় না। সৈনিকবিভাগের কাজকেই উহারা সব চেয়ে সম্মানের বলিয়া মনে করে। যেহেতু ঐ বিভাগে থাকিলেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মাতৃভূমির সেবায় নিয়োজিত থাকিতে পারা যায়। আজকাল শিক্ষিত নব্য মেয়েদেরও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা দক্ষ সৈনিক পুরুষকে বিবাহ করা। সাধারণ সৈন্যগণ কেল্লা বা ব্যারাকে খোরাকী পায় এবং সিগারেট অন্যান্য পকেট খরচ বাবদ এক আনা মাত্র মাহিয়ানা পাইয়া থাকে, অনেককেই বাড়ী হইতে প্রতি মাসে কিছু কিছু পকেট-খরচ আনিতে হয়।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রীম মিলিটারি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্রাট ঐ কাউন্সিলের পরামর্শে সেনা এবং নৌবিভাগের কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত ছয় জন প্রথম কাউন্সিলর নিযুক্ত হয়েন—মার্শ্যাল ইয়ামাগাতা প্রিন্স কোমাৎস্ মার্শেল ওইয়ামা, য়্যাডমিরাল মার্কুইশ সাইগো, জেনারল কাউণ্ট নজু, এবং য়্যাডমিরাল ভাইকাউণ্ট ইতো।

সুপ্রীম কাউন্সিল অব ওয়ার নামক যুদ্ধের জন্য আর একটি কাউন্সিল আছে। উপরোক্ত সুপ্রীম কাউন্সিলের মেম্বর ছাড়া, যুদ্ধের

মিনিষ্টারগণ, জেনারেল এবং ষ্টাফের প্রধান অফিসারগণ ইহার মেম্বর হইবার অধিকারী। বর্ত্তমানে যে সমস্ত নায়কগণ এই কাউন্সিলের মেম্বর তাঁহারা অনেকেই শিক্ষিত ভারতবাসীর নিকট অনেকটা সুপরিচিত।

সম্প্রতি জাপানে সৈনিকবিভাগে ১৮ জন জেনারেল আছেন। যুদ্ধের কতিপয় মাস পরই সুবিখ্যাত রাজনীতিবিশারদ, এবং মাঞ্চুরিয়া ক্ষেত্রের প্রধান সেনানায়ক প্রিন্স মাশাশ প্রিন্স ওইয়ামার দক্ষিণ বাহুস্বরূপ জেনারল ভাইকাউণ্ট কোদামা প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের আপামর সাধারণ সকলকেই যেরূপ ক্ষুণ্ণ হইতে দেখিয়াছি এরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুতে অন্য কোন জাতির চিত্তর তেমন দেখি নাই।

জাপানের স্থলসৈন্যের ১৬টি প্রধান প্রধান স্থানে হেডকোয়াটার আছে। উহার দুইটি হেডকোয়াটার কোরিয়ায় এবং দুইটি মাঞ্চুরিয়ায়। প্রত্যেক হেডকোয়াটারেই ইন্‌ফ্যান্ট্রি ক্যাভালরি, ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটালিয়ন, কমিসরিয়ট ব্যাটালিয়ন প্রভৃতি আছে।

জাপান ক্ষুদ্র দেশ হইলেও শক্তিতে অসাধারণ, সকলেই যোদ্ধা; যুদ্ধের সময় মেয়েগুলি পর্য্যন্ত বলিত "পুরুষগণ নিঃশেষিত হইলে মেয়েদের পালা আরম্ভ হইবে।" প্রত্যেকের যেমন সাহস তেমনি কার্য্যকুশলতা। সৈনিকবিভাগের কার্য্যে অতি সামান্য বেতন গ্রহণ এবং মহাশক্তির প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শুরু ব্যয়ভার বহনে উহাদের আপত্তি নাই। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যে বজেট হয় উহাতে এক বৎসরের জন্য আট কোটী এগার লক্ষ আট চল্লিশ হাজার তিন শত তেইশ টাকা শুধু স্থল সৈন্য (মিলিটারী) বিভাগের খরচ ধার্য্য হয়। আর ঐ বৎসর নৌবিভাগের (নেভি) জন্য ছয় কোটী একাত্তর লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার চারি শত নয় টাকা ধার্য্য হয়। ঐ বৎসরে মোট প্রায় পনর কোটি টাকা মিলিটারী এবং নেভি খরচ।

নেভি সম্বন্ধে ইহাদের ইতিহাস অদ্ভুত। আমাদের বিজয়সেনানী যখন বেলার লঙ্কা জয় করেন তখন কেন—তাহার অনেক পরেও জাপানীদের রণতরী আদৌ ছিল না। খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে পেন এবং হেই জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম দায়োউয়ো নামক স্থানের জলযুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় ঐ সময়েই কোরিয়ার সমীপবর্ত্তী সমুদ্রে জাপানিদের সহিত কোরিয়ানদের এক জলযুদ্ধ হয়, সপ্তদশ শতাব্দীতে জাপানী জলদস্যুর জাহাজ নৌকা দক্ষিণ চীনের তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। উহার কতিপয় বৎসর পর হইতেই কোরিয়া, চীন, যাবা, ফিলিপ্পাইনস্, শ্যাম এবং ভারতবর্ষের সহিত পরস্পর ব্যবসাবাণিজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

তোকুগাওয়া সোগুণের রাজত্বকালে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষার জন্য কয়েকখানা রণতরী ক্রীত হয়। ছাৎসুমা এবং তোসাবংশের ডিম্যগণও এই সময় কয়েকখানা যুদ্ধ জাহাজ ক্রয় করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইম্পিরিয়াল নেভিতে কেবল মাত্র ১৭ খানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণতরী ছিল এবং উহার মোট টনেজ মাত্র ছয় হাজার ছিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে যখন চীন জাপ যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন জাপানীদের ৬১ হাজার টনেজের তেত্রিশখানা জাহাজ ছিল। ঐ সময়ে চীনের তাৎকালিক নব্য এবং বৈজ্ঞানিক রণতরী ছিল। ওয়েই-হাই-ওয়েই নামক স্থানে জাপানীরা চীনের ঐ সকল জাহাজ জলমগ্ন করিয়া দেয় এবং জয় লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর উৎসাহের সহিত নব্য নেভির প্রবর্ত্তনে মনোনিবেশ করে। জাপানের বর্ত্তমান ইতিহাসে দেখিয়াছি যে চীন যুদ্ধের পর নৌবিভাগে জাপানের যত উন্নতি হইয়াছে অন্য কোন বিভাগে তেমন হয় নাই। ঐ যুদ্ধের পরই নৌশক্তির বৃদ্ধির জন্য পার্লিয়ামেণ্ট নূতন নৌবাহিনীর জন্য তেত্রিশ কোটী দুই লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ঐ সকল জাহাজ প্রস্তুত হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে জাপানিদের মোট দুলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টনেজের ৭৮ খানি রণতরী ছিল। পুনরায় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে দশ বৎসরের মধ্যে আরও কতিপয় নব্যধরণের রণতরীর জন্য সতের কোটী সাতাত্তর লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়। এই সময়ের মধ্যে সে সকল জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছে।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ড্রেডনট টাইপের যুদ্ধ জাহাজ আজকাল জাপানীরা নিজেদের দেশেই প্রস্তুত করিতেছে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ৮৭০ টনের রণতরী "হেইকি" জাপানে সর্ব্বপ্রথম প্রস্তুত হয়। সেই সময় হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৭ খানা যুদ্ধ জাহাজ জাপানের ডকে প্রস্তুত হয়। জাপানীদিগকে দেশে জাহাজ প্রস্তুত কালে অনেক দিন পর্য্যন্ত বৈদেশিক সাজসরঞ্জামের উপর নির্ভর করিতে হইত। কিন্তু ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পর জাপানী ডকে "আকি" এবং "ছাৎসুমা" এক একখানা প্রায় বিশ হাজার টনেজের ড্রেডনট টাইপের জাহাজও একেবারে বহির্দ্দেশের বিনা সাহায্যে প্রস্তুত হইয়াছে। তাই এক জাপানী লেখক লিখিয়াছেন "আত্মরক্ষার যথাসম্ভব উপায় নিজেরা উদ্ভাবন করিতে শিখিয়াছি; এতদিনে আমাদের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল।"

সম্প্রতি র‍্যাকটিভ র‍্যাডমিরালের পদে আট

জন নৌসেনানী নিয়োজিত আছেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে অফিসার ও নৌসেনা মোট ৩৪৬৩৩ জন এবং ভলান্টিয়ার চারি হাজারের উপর ছিলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জাপানিদের যে নৌবাহিনী ছিল তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল

শ্রেণী	সংখ্যা	টন
যুদ্ধ জাহাজ (Battle Ship)	১১ খানা	১৫৩২৩৪
ক্রুজার (Cruiser)	২৯	
তট রক্ষক (Coast defence ship)	১২ খানা	
কামান বাহক (Gunboat)	৭	
ডাক বাহক (Despatch boat)	৩ „	
টর্পেডো ডিপোবোট	১	৪১২০
	মোট টনেজ	৩৮৫০৬৭

এতদ্ব্যতীত টর্পেডো ধ্বংসকারী (destroyer) যুদ্ধজাহাজ ২৯ খানা, এবং টর্পেডো মোট ৮৫ খানা।

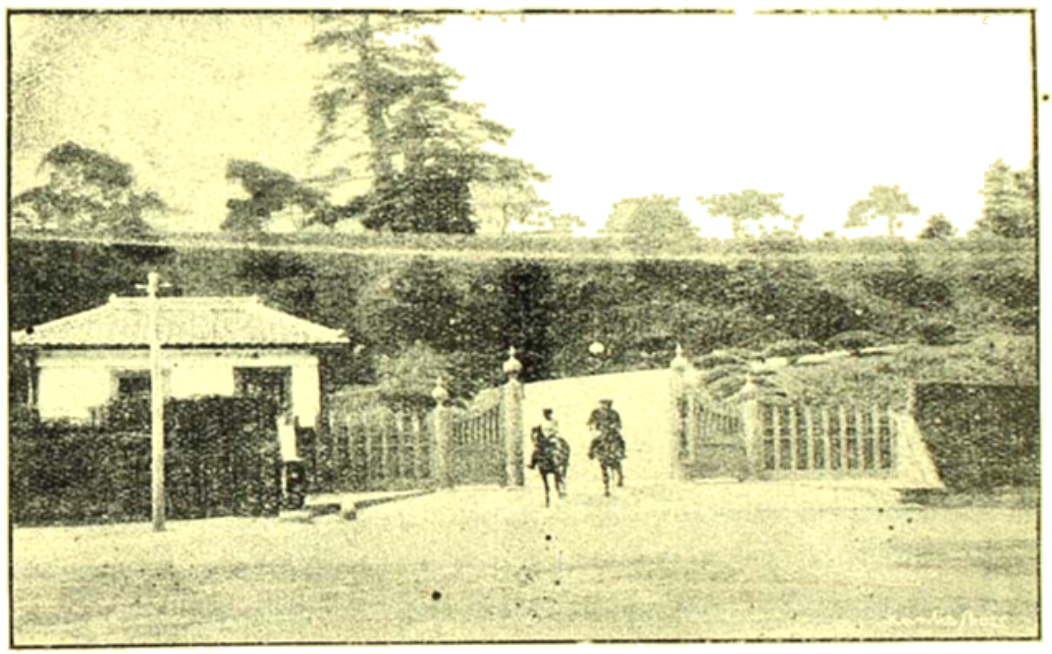

রাজকীয় যুদ্ধবিদ্যালয়—টোকিও।

গত রুষজাপান যুদ্ধের পর মোট ৯৭৫০০ টনেজের ২ খানা ড্রেড্‌নট টাইপের যুদ্ধ জাহাজ, ৪ খানা প্রথম শ্রেণীর আর্ম্মার্ড ক্রুজার এবং ৪ খানা তৃতীয় শ্রেণীর ক্রুজার জাপানী ডকে প্রস্তুত হইয়াছে।

গত রুষজাপান যুদ্ধে জাপান ছোট বড় মোট ৪৮০০০ টনের ১২ খানা জাহাজ হারাইয়াছে; পক্ষান্তরে রুষিয়ার নিকট হইতে মোট ১৪৪০০০ টনের ১৬ খানা বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ অধিকার করিয়াছে।

সামরিক নৌ-বিদ্যা শিক্ষার জন্য অনেক স্কুল কলেজ রহিয়াছে; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান। (১) ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তোকিও জাভাল টাফ কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজে উপযুক্ত এবং দক্ষ অফিসার যুবকদিগকে এবং ইঞ্জিনিয়ারদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। (২) হিরোশিমার অন্তর্গত এদাজিমা নামক স্থানের জাভাল একাডেমিও বিখ্যাত। এখানে ভাবী নৌবিভাগীয় কর্ম্মপ্রার্থী যুবকগণ চারি বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া থাকে। (৩) ফি জাভাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, এখানে চারি বৎসরকাল নৌ বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দেওয়া হয়।

এতদ্ব্যতীত জাভাল সার্জ্জারি স্কুল, পে মাষ্টার ট্রেনিং স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাকটিস্ ট্রেনিং স্কুল, গানারি ট্রেনিং স্কুল, টর্পেডো প্রাকটিস্ ট্রেনিং স্কুল প্রভৃতিতে নৌবিভাগীয় বিশেষ বিশেষ বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়।

ইয়োকুসুকা, কুরে, ছাকেবো, মাইজুরু, পোর্ট আর্থার, তাকেশিকি, মেকং এবং ওমিনাতো এই আটটি জাভাল ষ্টেশন বিখ্যাত।

যুদ্ধ জাহাজের ন্যায় বাণিজ্যজাহাজেরও অতি দ্রুত প্রসারণ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মিৎসুবিশি মেল ষ্টিমশিপ কোম্পানি খোলা হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইউনিয়ন শিপিং কোম্পানী এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ওসাকা মার্চ্চাণ্ট ষ্টিমশিপ কোম্পানী খোলা হয়। প্রথমোক্ত দুই কোম্পানীর মধ্যে ঘোরতর প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে, অবশেষে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে উভয় কোম্পানী মিলিত হওয়ায় নিপ্পন য়ুসেন কাইসা নামক অতি বিশাল কোম্পানী গঠিত হয়। উহাই বর্ত্তমান জাপান মেল ষ্টিমশিপ কোম্পানী।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বড় বড় জাহাজ নির্ম্মাণের এবং নেভিগেশনের প্রসারণ জন্য সাধারণকে উৎসাহিত করিতে জাপান গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি আইন প্রণয়ন করেন এবং সেই আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীসমূহকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। দেখিতে দেখিতে এখন কত ষ্টিমশিপ কোম্পানী, কত ডক, আর কত সারি সারি জাহাজ জাপানিদের কৃতিত্ব শুধু জাপানে নহে সমগ্র ভূখণ্ডে কীর্ত্তন করিতেছে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ১৪২৩ খানা ষ্টিমার, ৩৭৪২ খানা সেলিং ভেসেল রেজেষ্টারী করা হইয়াছিল। জাহাজের সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ পূর্ণ আইনে ভিন্ন ভিন্ন ডকে ডাক, আরোহী এবং ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য বড় বড় জাহাজ প্রস্তুত হইতে থাকে। জাপানে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ২০৫টি শিপ য়ার্ড ছিল এবং ঐ বৎসর দেশে ২০০ খানা ষ্টিমার প্রস্তুত হয় এবং বিদেশ হইতে ৭২ খানা ক্রীত হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানিগণ যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত থাকায় ঐ বৎসর দেশে মাত্র ১০৩ খানা জাহাজ প্রস্তুত হয় এবং বিদেশ হইতে ৯৫ খানা ক্রয় করা হয়। জাহাজ প্রস্তুতের ডকের সংখ্যা কিকিদদিক একশত। নগাসাকি সহরস্থ মিৎসুবিশির তিনটি, কোবে সহরস্থ কাওয়াসাকির তিনটি এবং ইয়োকোহামার দুইটি ডকই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওসাকা আয়রণ ওয়ার্কসের ডকে ইদানীং অনেক জাহাজ প্রস্তুত হইতেছে।

প্রায় ২৫০ খানা জাপানী জাহাজ রেগুলার

সার্ভিসে এবং ৩০০ খানা ইরেগুলার সার্ভিসে নিয়োজিত আছে। ছয় সাতটি কোম্পানী এবং কতকগুলি ফ্রোবপতি কর্ত্তৃক জাপানের সমুদয় জাহাজ পরিচালিত হইয়া থাকে। নিপ্পন ইউসেন কাইসা, তোয়োকিসেন কাইসা, মিৎসুইবুসান কাইসা এবং ওসাকা সোসেন কাইসা বিখ্যাত। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ব্যবসা-বাণিজ্যে ৪১০৪১ টনেজের জাহাজ চলিত।

জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিপ্পন ইউসেন কাইসা শৈশব অবস্থায় আমাদের টিটাগড়িন বা হেস্থুন লাইনের ন্যায় অতি ক্ষুদ্রই ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে দুইটি ক্ষুদ্র নূতন প্রতিযোগী কোম্পানী মিলিত হইয়া এই কোম্পানীর গঠন হয়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে চীনজাপান যুদ্ধে এই কোম্পানী মোট ১৩০০০০ টনেজের ৪৭ খানা জাহাজ দ্বারা গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করে। গত যুদ্ধের সময় উহাদের ২২২০০০ টনেজের মোট

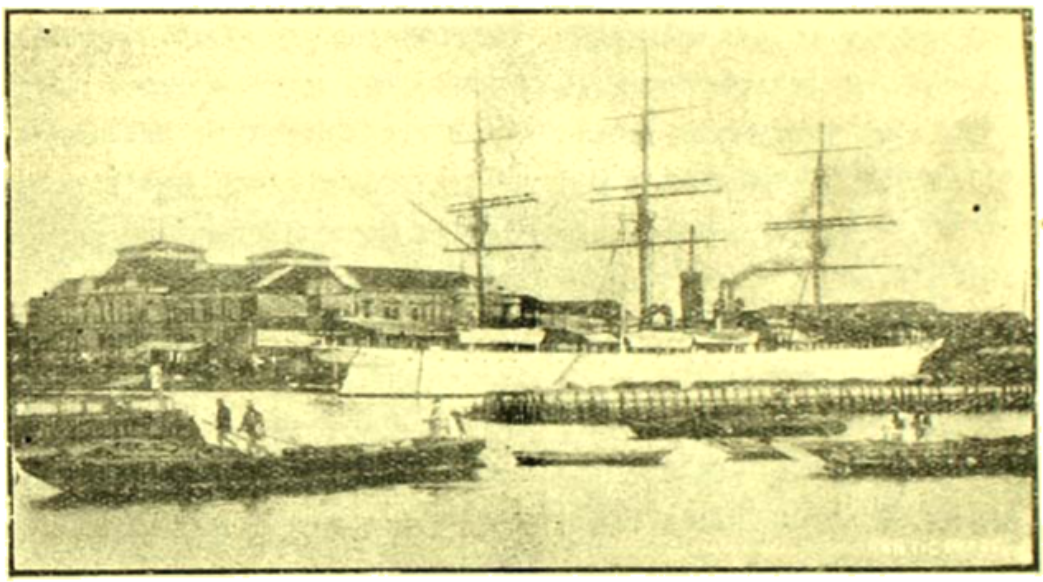

যুদ্ধ শিখিবার জাহাজ।

৭১ খানা জাহাজ চলিতেছিল। এখন ঐ সংখ্যা একশতে পরিণত হইয়াছে। জাপান উপকূলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাইনের সংখ্যা অনেক বেশী। বিদেশের সহিত অর্থাৎ ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, সাইবিরিয়া, ভারত এবং ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপ সমূহে ৩২টি লাইনে উহাদের জাহাজ চলিতেছে। নিপ্পন ইউসেন কাইসা ইহার ১৫টি লাইন চালাইতেছে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জাপানী জাহাজে প্রথম শ্রেণী ৭০৪ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর ৫০১ জন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ৭২ জন কাপ্তান ছিল। প্রথম শ্রেণীর চীফ অফিসার (chief mates) ৩৩৮ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৩২৫ জন এবং দ্বিতীয় অফিসারের (second mates) সংখ্যা ২৯০৭ জন ছিল। ঐ বৎসরের তালিকায় দেখা যায় যে জাহাজে মোট চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার ৫১২ জন, প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ার

৯৬২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ার ৫৯৮ জন এবং তৃতীয় শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ার ১৮৫৬ জন ছিল। জাহাজের মোট ইঞ্জিনিয়ার সংখ্যা ৩৯২৮। এখনও জাপানিদের বৈদেশিক কোন কোন লাইনে দুই চারিজন বিদেশী কাপ্তান, ইঞ্জিনিয়ার এবং অফিসার দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু ক্রমেই উহাদের সংখ্যা লোপ পাইতে বসিয়াছে।

গত রুষ জাপান যুদ্ধে ৬৪ খানা বৈদেশিক জাহাজ জাপান কর্ত্তৃক ধৃত এবং অধিকারভুক্ত হইয়াছে—উহার ২৩ খানা ইংরাজদের, ১৬ খানা রুষিয়ার ১০ খানা জার্ম্মান, ৪ খানা আমেরিকান, ৪ খানা নরওয়েজিয়ান, ২ খানা ফরাসী, ২ খানা অষ্ট্রিয়ান, ১ খানা ওলন্দাজ এবং ১ খানা সুইডিশ। ঐ যুদ্ধে জাপানিদের প্রায় ২০ খানা জাহাজ নিমজ্জিত, ধৃত এবং বৈদেশিক অধিকারভুক্ত হইয়াছে।

জাহাজের বিবরণীতে আমার নিজের একটু অভিজ্ঞতা এই স্থলে উল্লেখ করিয়াই অদ্য এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। একদা গ্রীষ্মাবকাশে সমুদ্রতীরস্থ কোন এক স্বাস্থ্যকর জায়গায় আমরা তিন চারিজন ভারতীয় ছাত্র কয়েকদিনের জন্য গিয়াছিলাম। তথায় এক হোটেলে জনৈক নৌবিভাগের অফিসারের সঙ্গে বেশ একটু বন্ধুত্ব জন্মে। তিনি রয়াল-মিরাল তোগোর বিখ্যাত ফ্ল্যাগ শিপ "মিকাহাও" জাহাজের লেফ্‌টেনাণ্ট। তিনি আমাদিগকে তাঁহার ষ্টাভাল ষ্টেশন এবং ফ্ল্যাগশিপ দেখিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা এ সুযোগ ছাড়িলাম না। তথা হইতে তাঁহার সঙ্গেই এক আরোহীজাহাজে পাঁচ ঘণ্টা চলিয়া তাঁহাদের ইয়োকুসুকা ষ্টাভাল ষ্টেশনে গিয়া পৌঁছিলাম। এক হোটেলে খাওয়া দাওয়া করিয়া সকলে এক সঙ্গেই ষ্টাভাল ষ্টেশনে ঢুকিলাম। দ্বারদেশের অফিসার আমাদের নাম ধাম, কলেজের নাম এবং ঐ অফিসার বন্ধুর নাম ইত্যাদি লিখিয়া লইলেন।

কলেজের ডাইরেক্টারের স্বাক্ষরিত পরিচয় পত্র আমার সঙ্গেই ছিল, তাহাও দেখাইলাম। স্থানে স্থানে কলকারখানা স্কুল কলেজ প্রভৃতি দেখিবার জন্য নিজ নিজ কলেজের অধ্যক্ষের পরিচয় পত্র অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বারদেশের অফিসারের অনুমতিতে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। বলা বাহুল্য গবর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে সাধারণ লোকের বিশেষতঃ বৈদেশিকদের পক্ষে তথায় প্রবেশ অসম্ভব। জালিবোটের সাহায্যে আমরা ফ্ল্যাগশিপের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে দুই ধারে অনেক নূতন জাহাজ প্রস্তুত করিতে এবং রুষিয়াগণ হইতে ধৃত অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যুদ্ধ জাহাজগুলি মেরামত করিতে দেখিলাম। কতকদূর গিয়া আমরা মিকাহা ফ্ল্যাগশিপে গিয়া পঁহুছিলাম। লেফটেনাণ্ট বন্ধু প্রথমতঃ আমাদিগকে অফিসারদের বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া কতিপয় অফিসারের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। তথায় বন্ধুটি জলযোগেরও বেশ সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সেই বৈঠকখানার দেওয়ালে শত শত কোষবদ্ধ শাণিত কৃপাণ ঝুলান রহিয়াছে। উহার কতকগুলি উন্মুক্ত করিয়া আমাদের হাতে দিলেন এবং তরবারিগুলির ইতিহাস বলিতে লাগিলেন। কোন্ তরওয়াল কাহার হাতে

ছিল, কোন্ তরওয়ালে কতজন বিপক্ষীয় লোক হত ও আহত হইয়াছে, কোন তরওয়ালের কত বয়স এবং কোন্ তরওয়াল কোন্ কোন্ যুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে ইত্যাদি তরওয়ালের ইতিহাস।

তার পর আমরা বৈঠকখানার বাহিরে আসিলাম। বন্ধু ক্রমে ক্রমে দুই ধারে সজ্জিত ছোটবড় নানা ধরণের কামানগুলি দেখাইয়া উহার কার্য্যপ্রণালী বুঝাইতে লাগিলেন। গোলা বারুদ প্রভৃতির ভাণ্ডার দেখাইলেন। জাহাজ খানা উচ্চে ছয়তালা; লম্বাতেও নেহাৎ কম নয়; টনেজ ১৪২০০। ক্রমে সর্ব্বোচ্চে তালায় উঠিলাম! সম্মুখ দেশে দেখানে

দাঁড়াইয়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের নেলসন্ য়্যাড্‌মিরাল তোগো সমগ্র নৌবাহিনী পরিচালনা করিয়া ভুবনবিখ্যাত বিশাল রুষ আর্ম্মাডাকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া জাপানের ইতিহাসের এক অধ্যায়কে অনন্ত সুবর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছেন সেইখানে দাঁড়াইয়া আমরাও আমাদিগকে কথঞ্চিৎ গর্ব্বিত মনে করিলাম। সম্মুখভাগের দুই পাশে দুই মেশিন-কামান রহিয়াছে, লেপ্টেনাণ্ট কি ভাবে মেশিন কামানে প্রতি মিনিটে ছয় শত গোলা বর্ষিত হয় দেখাইলেন। সার্চ্চলাইট বুঝাইয়া দিলেন। এবং ডকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন "আপনারা সহরে বাস করেন; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠের দালান, লোকজনের যাতায়াত এবং দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি দেখিয়া থাকেন। তাহাতে অন্যান্য জাতির সহিত তুলনা করিয়া জাপানীদের বিশেষত্ব কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন না, যদি জাপানী সভ্যতার পরিচয় কিঞ্চিৎ লইতে চাহেন তবে এই প্রকাণ্ড ডকের দিকে তাকাইয়া দেখুন; আজ আমরা গর্ব্বের সহিত বলিতে পারি যে আমরা আমাদের দেশের পরিচালক, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে নিরাপদে রাখিতে সম্পূর্ণ সক্ষম; কিন্তু এজন্য আমরা আজ পরমুখাপেক্ষী নহি। এই প্রকাণ্ড ডকে যে সহস্র সহস্র লোক—জাহাজ, গোলাগুলি বারুদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেছে, ব্যবহার করিতেছে এবং সময় বিশেষে উহার সাহায্যে বৈদেশিক

শত্রুকে নিস্তেজ করিতেছে উহারা সকলেই জাপানী, উহার মধ্যে একটিও বিদেশী খুঁজিয়া পাইবেন না।" অবনত মস্তকে তাঁহার সমস্ত কথাই অনুমোদন করিতে করিতে তাঁহার সহিত পঞ্চম তালায় নামিলাম। সেখানে তিনি এক ফুট পুরু লৌহ নির্ম্মিত বেওয়ালে প্রায় চতুর্দ্দিক বেষ্টিত এক ছোট প্রকোষ্ঠ দেখাইয়া বলিলেন জাহাজ খানা ইংলণ্ডে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই প্রকোষ্ঠ র‍্যাড্‌মিরালের স্থান। ইউরোপীয় র‍্যাড্‌মিরালগণ আত্মরক্ষার নিমিত্ত এই দুর্ভেদ্য প্রাচীরে বেষ্টিত প্রকোষ্ঠে থাকিয়া বাহিনী চালাইয়া থাকেন। কিন্তু জাপানী র‍্যাড্‌মিরালগণ প্রকোষ্ঠান্তরে থাকিয়া আত্মরক্ষার জন্য উদ্‌গ্রীব নহেন। তাঁহারা জাহাজের সম্মুখভাগের খোলা জায়গায় দাঁড়াইয়াই রণতরী পরিচালনা করিয়া থাকেন। কাযেই এ প্রকোষ্ঠ আমাদের একেবারে অব্যবহার্য্য। তারপর প্রত্যেক কামানের পশ্চাদ্দেশে ও পরিচালকদের আত্মরক্ষার জন্য এক লৌহ আবরণ আছে, উহাও আমাদের ব্যবহারে আইসে না। যেহেতু সাহসে ভর করিয়া প্রকাশ্যভাবে কামান চালাইলে বিপদ পাতের আশঙ্কা সত্ত্বেও লক্ষ্য ঠিক করিয়া বিপক্ষের অধিকতর ক্ষতি করিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে অন্তরালে থাকিয়াও লক্ষ্য স্থির না করিয়া অনির্দ্দিষ্ট ভাবে গোলা চালাইলে কোনই ফল হয় না।" লেপ্টেনাণ্ট বলিলেন "জাপানী ও রুষিয়ানদের মধ্যে এই একটি বিশেষ পার্থক্য দেখা যাইত।

আদ্যন্ত জাহাজের সমস্ত বিভাগ দেখিয়া বন্ধুকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ প্রদানান্তর পরস্পর অভিবাদন করিয়া জালিবোটের সাহায্যে তীরে চলিয়া আসিলাম। লেপ্টেনাণ্টটির নাম মিঃ টি তাগামি। তার পরে মাঝে মাঝে তাঁহার পত্রও পাইতাম।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

খাদ্যের অভিব্যক্তি।

এজীবনে খাদ্যের কথা একটা খুবই বড় কথা। সেইজন্য মানুষের খাদ্যের ক্রম-অভিব্যক্তির কথাও মূল্যবান। সেই পর্য্যায় অনুসরণ করিয়াই আমাদের খাদ্যের অনেক হিতাহিত কথা বুঝা যায়। মনুষ্যদেহের অনেক রোগেরই কারণ ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে এই অভিব্যক্তির জ্ঞান হইতে আলো পাওয়া যায়।

এই অভিব্যক্তির কথা বুঝিতে হইলে প্রথমেই আধুনিক সভ্যজাতির খাদ্যের বর্ত্তমান অবস্থা জানা উচিত। খোটামুটি এই।—

১। তাহারা উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ উভয় রকম খাদ্যই খায়।

২। সেই সকল খাদ্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তারা চাষ করে ও পশুপালন করে।

৩। খাদ্য বাঁটিয়া খায়।

৪। চিনি ও শ্বেতসার প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে।

৫। ভবিষ্যতের জন্য সংস্থান করে।

৬। কৃত্রিম নানা উপায়ে খাদ্যের নানা রকম পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা অতীষ্টমত ব্যবহার করে।

এইরূপে তাহাদের খাদ্য সম্বন্ধে নানা কার্য্য করিবার কিরূপে জ্ঞান ও শক্তি ক্রমে ক্রমে আসিয়াছে—এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য বিষয়।

স্তন্যপায়ী জীবের খাদ্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

Carnivora বা মাংসাশী জীব—যথা ভল্লুক ইত্যাদি। ইহাদের মাংস ভিন্ন চলে না। আর এমন অল্প আয়তনে এত সারাল দ্রব্য আহার করে বলিয়া ইহাদের দেহ বলিষ্ঠ ও মাংসপেশীপূর্ণ ও মনে সাহসও বেশী। ইহাদের পাকস্থলী ইত্যাদি খাদ্যযন্ত্র তুলনায় শরীরের ওজন ও আয়তন হইতে অনেক কম।

2. Hebivora বা উদ্ভিজ্জভোজী জীব—যথা,—গরু ভেড়া ইত্যাদি। ইহারা উদ্ভিদের উপর একান্ত নির্ভর করে। উদ্ভিদজাতীয় খাদ্যগুলি আয়তনে এত বেশী বলিয়া ইহাদের পাকযন্ত্র অত্যন্ত বৃহৎ। ইহাদের গায়ে তত বল নাই মনে তত সাহস নাই; বুদ্ধিবৃত্তি ও ক্ষিপ্রতাতেও ইহারা প্রথমোক্ত শ্রেণী হইতে নিকৃষ্ট।

3. Frugivora বা ফলভুক জীব, যথা—কাঠবিড়ালী, বানর ইত্যাদি। ইহারা উদ্ভিদের শুধু সারাল অংশ মাত্র খায়—যথা ফল, বীচি কচি ডগা ইত্যাদি। সেগুলিতে অতি অল্প আয়তনে অনেক বেশী সার আছে। তাই এই শ্রেণীর জন্তুরা মাংসল ক্ষিপ্র চতুর। ইহাদের পাকযন্ত্র মাংসাশীর তুলনায় বড়, কিন্তু উদ্ভিদভোজী প্রাণী গরু ভেড়া অপেক্ষা অনেক ছোট।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে প্রাণী যত সারাল ও পরিমাণে কম আহার্য্য দ্রব্য খায়—তাহারা তত মাংসল বলিষ্ঠ ও চতুর, ও তাহাদের স্থান অন্য প্রাণী হইতে উন্নত।

এইবার স্তন্যপায়ী প্রাণীদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ ও মানবের নিকটসম্বন্ধীয় তাহাদের কথা বলা যাক।—অর্থাৎ বানরজাতির বিভিন্ন শ্রেণীতে তাহাদের খাদ্যের কিরূপ অভিব্যক্তি হইয়াছে তাহাই দেখা যাক।

অভিব্যক্তিবাদে বানর হইতে ক্রমে ক্রমে মানুষের অভিব্যক্তির সম্বন্ধে যে সকল অবয়া নির্ণীত হইয়াছে তাহার সিঁড়ি পনেরটি ধাপে পূর্ণ হইয়াছে। সাদার্লাণ্ড সাহেবের খাদ্য প্রণালীতে (Southerland System of Diet) এসম্বন্ধে যে তালিকাগুলি ছাপা আছে সেইগুলি উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইলে এই বিষয় সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

একটি লম্বমান রেখা—পনের ভাগে বিভক্ত। তার প্রতি ভাগ এক একটি ধাপ। অন্ততঃ ৩০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে তার প্রথম ধাপটিতে অভিব্যক্তির স্রোত আসে। সেই অবস্থাতেই বানর জাতির আদি পুরুষের অভিব্যক্ত। এইরূপে তিনটি শ্রেণীতে অভিব্যক্ত হইয়া সেই স্রোত ক্রমে নরজন্ম আনিয়াছে। লামুর ও নরূপী বানরেরা মনুষ্যের পূর্ব্বপুরুষ। আর নরের নিম্নতর স্তরে বানররূপী নর অবস্থিত। অর্থাৎ

ক্রমবিকাশের স্রোত অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে বানর হইতে নরের অভিব্যক্তি হইয়াছে।

উপরিউক্ত Evolutionary ladder বা ক্রমবিকাশের পর্য্যায়ের তালিকা হইতে অনেক কথা শিখা যায়।—যথা,

১। মানুষ ফলভোজী বানর হইতে উৎপন্ন।

২। মানুষের অভিব্যক্তির পর তার আহারের নানা পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

মনুষ্যযুগে আহারের পরিবর্ত্তনের এইরূপ ক্রম চলিয়াছে।

১ম। Hunting or Fishing age অর্থাৎ কৌশল অবলম্বনে শীকার ও মাছধরার যুগ।

২য়। খাদ্যদ্রব্য আহারের পূর্ব্বে তাহা পরিবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা, বা রন্ধনের যুগ।

৩য়। পরিশেষে কৃত্রিম উপায়ে শস্য উৎপাদন ও পশুপালনের যুগ। কৃষিকার্য্য ও পশুপালন।

শেষোক্তটির দুটি খণ্ড যুগের কথা আছে।

প্রথম—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন পূর্ব্বক কৃষি কর্ম্ম ও পশুপালন। কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসতি নাই।

দ্বিতীয়—এক স্থানে বসবাস করিয়া বছর বছর সেই স্থানেই চাষবাস ও পশুপালন।

এই দ্বিতীয় অবস্থাটিই জাতীয় উন্নতির অনুকূল অবস্থা। এই দিন হইতেই শরীর মনের প্রকৃত উন্নতির যুগ আসিয়াছে।

উপরি উক্ত খাদ্যের অভিব্যক্তির সম্বন্ধে দেখা গেল যে ফলভুক্ বানর হইতে উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যযুগের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ শীকার যুগে (Hunting and Fishing age) তাহারা প্রধানত প্রাণীভুক্ ছিল। সেরূপ খাদ্য রাঁধার বা চিবানর বড় আবশ্যক ছিল না। কিন্তু কাঁচা উদ্ভিজ্জ খাদ্য লি যথা, গাছের পাতা ফলমূল বা বীচিগুলি বিশিষ্টরূপে চিবান অথবা রন্ধন দ্বারা নরম করিয়া লওয়া আবশ্যক। এই কারণে "রন্ধনযুগের" আবির্ভাব। পরে শস্যগুলিকে আবশ্যকমত উৎপন্ন করিতে বৃক্ষ গুলিকে সুবৃক্ষ ও ফলবান করিতে চাষবাসের আরম্ভ হয়,—পশু উৎপাদনের চেষ্টা জন্মে। এই সময়েই কৃষি ও পশুপালনযুগের আবির্ভাব।

মনুষ্যযুগে ক্রমে ক্রমে খাদ্যের এইরূপ পরিবর্ত্তনের ভিতর কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে।

প্রথম।—খাদ্যের পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই আয়তনে কম ও সারে বেশী এইরূপভাবে হইয়াছে। শাকপাতা অপেক্ষা ফলমূল অনেক সারাল ও বীচি সর্ব্বাপেক্ষা সারাল অংশ। কারণ তাহাতেই উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্য সঞ্চিত থাকে। তাই আমরা ভাত ডাল আহার করি।

দ্বিতীয়।—মিষ্টতার দিকেও মানুষের স্বভাবত বেশী ঝোঁক। অসভ্যজাতিরাও মৌচাক হইতে মধু, ও গাছের ডাল হইতে নির্য্যাস প্রভৃতি সংগ্রহ করে।

আহারের অভিব্যক্তির মধ্যে আর একটি কথা অনেকেই জানেন না। সেটি এই যে;—

গরু ভেড়া প্রভৃতি উদ্ভিদভোজী প্রাণীদের অপেক্ষা আহারের তুলনায় বানরের ফল মূল

বা বীজ আহার অধিকতর সারাল। কিন্তু তাহারা ইহাপেক্ষা আরও সারাল দ্রব্যের আহার লাভ জন্ত—পাখীর ডিম, পোকা মাকড় ও কখনও কখনও বা ছোট ইঁদুর ইত্যাদি ছোট প্রাণী ধরিয়াও খায়। পশুশালায় পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে উদ্ভিদভোজী প্রাণীদের মাংসজাতীয় খাদ্য আহার করিতে সহজেই শিখান যাইতে পারে—কিন্তু প্রাণীভুক্ জীবদের সহজে উদ্ভিদভুক করা যায় না। অল্প আয়তনে সারাল খাদ্য আহারে শরীরের সহজেই উন্নতি হয় বলিয়া সকল প্রাণীরই ভিতর ওরূপ অভ্যাস পরিবর্ত্তন সহজ। কিন্তু শরীর মনের অবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উল্টাদিকে পরিবর্ত্তন তত সহজ নহে।

পুনরাবৃত্তি করিতে গেলে খাদ্যের অভিব্যক্তির এই সকল ঘটনাগুলি একত্রে এইরূপ দাঁড়াইবে।

মানুষের খাদ্য বানরের আহার হইতেই ক্রমশঃ উন্নত পর্য্যায়ে পরিবর্ত্তিত। বানরেরা উদ্ভিদভোজী নয়—গরু ভেড়ার মত ফল-ভোজী। অর্থাৎ অল্প আয়তনে সারাল খাদ্য খায়। তাই তাহাদের শরীরে এত ক্ষিপ্রতা এবং বুদ্ধিও অপেক্ষাকৃত উন্নত। শুধু তাই নহে তাহারাও সুবিধা পাইলে ফল মূল ত্যাগ করিয়া পোকা মাকড় ধরিয়া বা পাখীর ডিম ভাঙ্গিয়া খায়। একেবারেই প্রাণীভুক্ নয় তা বলা যায় না। পরে মনুষ্যযুগে মানুষ প্রথমে শীকার করিয়া মাছ ধরিয়া খাইত। তখন সে বেশী ভাগ প্রাণীভোজীই ছিল। খাদ্য রাঁধিতও না ভাল করিয়া চিবাইতও না।

পরে কৃষিকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে যখন উদ্ভিজ্জজাতীয় খাদ্য যথা ফলমূল ইত্যাদি আহার করিতে লাগিল তখন সেগুলিকে নরম করিবার জন্ত রান্নার প্রথাও আসিল। আর চাষবাসের মুখ্য উদ্দেশ্য সেই সকল খাদ্য প্রচুর পরিমাণে ও মনের মত এবং সুস্বাদু ও সারাল করিয়া উৎপন্ন করা। মানুষ মিষ্টতার পক্ষপাতী এবং সারাল খাদ্যের দিকে সকল জীবেরই সহজ ঝোঁক আছে কারণ তাহাতে অভিব্যক্তির সহায়তা করে তাই সকল উন্নতিশীল সভ্যদেশের লোকের খাদ্য মিশ্রিত খাদ্য। আজ পর্য্যন্ত যতদূর জানা আছে—বহুদিন উদ্ভিজ্জ আহার করিয়া কোনও জাতি আপনার জাতীয় জীবনের সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষসাধন করিতে পারে নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম হিসাবে যাহাই হোক না কেন, শরীরের উৎকর্ষের জন্ত মিশ্রিত খাদ্যই প্রশস্ত। যৌবনে বিশেষতঃ বাল্যজীবনে ইহার উপকারিতা অশেষ।

আমাদের জাতির আহার সম্বন্ধে এই কয়টি কথা এই প্রসঙ্গে বলিবার আছে।

১। আমাদের আহার অধিকাংশই উদ্ভিজ্জ হওয়াতে আকৃতিতে বড় বেশী, ও সারে বড়ই কম।

২। তাহা মাংসপেশী গড়িবার পক্ষে বড়ই অল্প বলিয়া আমাদের দেশে মাংসপেশী এত কম ও সহজে ক্লান্তি আসে!

৩। আহারে রন্ধনে ও অন্যান্য প্রকারে আমরা প্রায় খাদ্যের অর্দ্ধেক অংশ অপচয় করি।

৪। ভাত চাল হইতে চার গুণ ফাঁপে মানে চার গুণ স্থান লয় অথচ সারে

পোষায় না। তাহা অপেক্ষা রুটী তিন গুণ সারাল।

৫। ডালে মাংসপেশী গড়িবার উপযুক্ত দ্রব্য আছে সত্য কিন্তু হজম করা শক্ত, প্রায় ২৫ পারসেণ্ট বাহির হইয়া যায়।

৬। উদ্ভিজ্জ খাদ্যসামগ্রী শতকরা ২৫ ভাগ বাহির হইয়া যায়—মাংস জাতীয় খাদ্য কেবলমাত্র শতকরা ৩ ভাগ অপচয় হয়।

৭। মাংস জাতীয় আহার রাঁধিবার পর চার ভাগের এক ভাগ কমে, উদ্ভিজ্জাতীয় খাদ্য চার ভাগের এক ভাগ বাড়ে।

৮। আমাদের শরীরে মাংসপেশীর ওজন প্রায় অর্দ্ধেক; স্নায়ুমণ্ডলের ওজন আবার ইহার অর্দ্ধেক। মস্তিষ্কের তিন ভাগের ভিতর দুইভাগ মাংসপেশীর সহিত সংশ্লিষ্ট। শরীরের প্রধান প্রধান অঙ্গগুলি মাংসপেশীর সাহায্যে কাজ করে ও মনের সনাতন জ্ঞানগুলি যথা, "সময়ের" ও "বিস্মৃতির"—সে সব গুলির ভিত্তিতে মাংসপেশীর চালনা সংলিপ্ত। সেইজন্য যেরূপ খাদ্যে মাংসপেশী গঠনের উপকরণ অধিক পরিমাণে আছে তাহাই আমাদের প্রশস্ত আহার। আমাদের জাতীয় খাদ্যে তাহা বড়ই কম। তাই দেশের লোকেরা এত দুর্ব্বল ও অসুস্থ। বিশেষ বাল্যজীবনে ইহার অভাব বড়ই ক্ষতিকর। দেশের উন্নতির কথা ভাবিতে গেলে আমাদের একথাটি স্মরণ রাখা চাই।

ডাক্তার—শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

কুড়ানী।

পোষের বিষম কন্‌কনে শীত তখনো হয়না ভোর,
পুবের আকাশ হয়নাক লাল মাঠ ঘাট ঘোর ঘোর,
মায়ের ছাড়িয়া উঠি তাড়াতাড়ি ছেঁড়া কাঁথা গ'য়ে দিয়ে,
মাঠেতে বেরুই কুড়াইতে ধান ছোট ঝুড়িটি নিয়ে।
ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরি, শাবুকে করিয়া খুটে খুঁটে তুলি ধান;
গোটা শীষ যদি দেখি ভুঁয়ে পড়ে উথলিয়া উঠে প্রাণ।
হাঁটিয়া হাঁটিয়া এমনি করিয়া সারা হয় ধান খোঁজা।
নিয়ে যায় ঘরে পাড়ার লোকেরা রাশি রাশি বোঝা বোঝা,—
পিছু পিছু যাই ঝুড়িটি লুকায়ে বা'র করি মোর ঝুলি,
যেটি ভুঁয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে সেটি খুটে লই তুলি।
ঠোঁট মুখ গাল শীতে জর জর পা-দুটা গিয়াছে কাটি!
ছুটে আসি যাই—কি করিবে বল—মাঠের কুচল মাটি।
ছোট ঝুড়িটি হয় চুরচুর, ভয়ে যায় মোর ঝোলা,
লোকে কয় "চাষে কি করিবি তোরা কুড়ানী বাঁধিবে গোলা"।

শীত যায় যায় ক্ষেতে নাহি ধান ধূ ধূ করে সারা মাঠ,
গাছের তলায় শুকনো পাতায় ভরে যায় পথঘাট।

ছোট্ট ঝুড়িটি রাখিয়া এবার বড় ঝুড়িগুলি কাঁধে,
শুকনো পাতার উঠানে আমার ঠাঁইটুকু নাহি থাকে।
দুপুরে গোবর ঝুড়িটি লইয়া ফিরি রাখালের পাছে,
বাজে কথা কয়ে' খুসি ফিরি পরু বাছুরের কাছে কাছে।
গোবর ঝুড়িটা ভরে' গেলে পরে গাছের তলায় বসে,
জিরেন লইয়া ঘরে ফিরে আসি কোমর বাঁধিয়া কসে'।
বিকালে বেরুই কুড়াইতে কাঠ বনে বনে ঘাটে-মাঠে,
পড়সীরা কয়—"ধন্যি কুড়ানী সারাদিনটাই খাটে।"

বর্ষা পড়িলে পথে ঘাটে কাদা নিতে আসে পর তাপ,
তালের পাতায় বাঁধা চালাটিতে জল পড়ে টুপটাপ।
কাঠখড় কিছু মিলে না কোথাও, জ্বলেনা কাহারো আখা।
আমার দুয়ারে আসেন সবাই হাতে লয়ে ঝুড়ি ঝাঁকা,
নালার জলেতে জালিটী পাতিয়া বসে থাকি আমি ঠায়,
চুনোপুঁটী দুটা আঁচলে বাঁধিয়া, ফিরি কাদামাখা গায়।
বর্ষা ফুরায় লাউ কুমড়ায় গোটা চাল যায় ভরে',
পুকুরে পুকুরে কল্মী শুতনী, তরে' আনি ঝুড়ি করে'।
নালাটি শুকায় কাঁকড়া লুকায়! মাছ খুঁজে মরা মিছে,
শুতলি শামুক ঝুড়ায়ে বেড়াই রাখালের পিছে পিছে।
ডালটি বেলটি কুড়ালে লোকেরা হাঁহা করে আসে ছুটে,
আমার কপালে, লোকে যা না ছোঁয়, নিতে হয় তাহা খুঁটে।
এমনি করিয়া তিনটি কুড়ায়ে ডালটি করিয়া জড়,
কুড়ানো ভাতেতে পেটটি পুরিয়া হইয়াছি এত বড়।
খোঁড়ামা আমার ঘরে পড়ে আছে, বাপমরা মনে নাই,
ঘরটি পুড়িলে পাড়া পড়সীরা, দেয়নিক কেহ ঠাঁই।
কাঁচা আলে কারো দেইনা পা আমি, মনে মনে তেজ আছে,
চাকরী করিনা ভিক্ষে করিনা, ধারিনা কাহারো কাছে।
বাছুর, ছাগল, হাঁস, ভুলো, পুষি আমার খেলার সাথী,
তাদেরে মারিলে বলিলে কিছু বা ফেটে যায় মোর ছাতি।
অনেক বকেছি, কুড়ানী বলিয়া ডাকিওনা মিছে পিছু,
মাঠেতে হাঁটিলে ঝুড়িটি ভরিবে খুঁজিলে মিলিবে কিছু।

শ্রীকালিদাস রায়।

বঙ্কিমযুগের কথা।*

(৬)

"স্বাধীনতা এবং আত্মমর্য্যাদার ভাব বঙ্কিমবাবুর চরিত্রে যেরূপ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল, রাজকর্ম্মচারীদের ভিতর তাহা সচরাচর সুলভ নহে। স্বর্গীয় শ্যামাধব বাবু বলিতেন, উচ্চতন কর্ম্মচারীদের সহিত বঙ্কিমবাবুর বাক্যে এবং ব্যবহারে সর্ব্বদা তিনি ইহা প্রত্যক্ষ করিতেন। হুগলীতে নূতন নূতন আসিয়া শ্যামাধব বাবু একদিন ১১টার সময় কোন বড় সাহেব সন্দর্শনে চলিয়াছেন। ছুটীর দিনে ধড়াচূড়া আঁটিয়া প্রখর রোদে তিনি ছুটিয়াছেন, বঙ্কিম বাবুর বারাণ্ডার সম্মুখে তাঁহার সাম্নে পড়িয়া গেলেন। "এত রৌদ্রে ব্যস্ত হয়ে কোথা যাও শ্যামাধব?" ব্যাপার বুঝিয়াও বঙ্কিমবাবু প্রশ্ন করিলেন এবং উত্তর শুনিয়া হাসিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে গলদঘর্ম্মাবস্থায় শ্যামাধব বাবু গৃহে ফিরিতেছেন, আবার বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন, "শ্যামাধব, আমার ইচ্ছা তোমার আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান আর একটু বাড়ে।"

সাহেবসুবার দ্বারা তিনি কখন বড় ইচ্ছা করিয়া মাড়াইতেন না, জামাতৃস্নেহের আধিক্যবশতঃ ইদানীং দুই একবার সে নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিলেন। * * * একবার কোন গেরুয়াবসনধারী, পূর্ব্ব-পরিচিত আগন্তুক নিজের কোন আত্মীয়ের জন্য সাহেবসুবার কাছে একখানি অনুরোধ-পত্রের প্রার্থনা করিলেন। বঙ্কিমবাবু ঔদাস্যসহকারে অথচ মিষ্টভাবে বলিলেন, "ওসবে আমি আর নাই। তুমি গেরুয়া ধরেছ, মনে মনে আমারও তাই জেনো।" (৺ শ্রীচন্দ্র মজুমদার)

তথাকথিত "স্বাধীনতা ও আত্মমর্য্যাদার ভাব," বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে বাল্যকাল হইতে। এ বিষয়ে আমি দু'একটী গল্প জানি'।

হুগলী কলেজের প্রফেসর ৺ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম, অনেকেরই কাছে

---

* পৌষ-সংখ্যায় প্রকাশিত "বঙ্কিমযুগের কথা"র অনবধানবশতঃ কয়েকটি বিষয় ভ্রম রহিয়া গিয়াছে পাঠকগণ, ক্ষমা করিবেন। আমি লিখিয়াছিলাম, বঙ্কিমবাবু সাঁতার জানিতেন। একবার ডিঙ্গি ধরিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। এবং তাঁহার পাণ্ডুলিপি কেবল পূর্ণবাবুই দেখিতেন। পরে জানিয়াছি, কথাগুলি ঠিক নয়। সংশোধিত পাঠ এইরূপ হইবে :—

১। বঙ্কিমচন্দ্র, সাঁতার জানিতেন না। "পসল" নদীর বোঁহানায়, তুফানের সময়ে, তিনি কাহারও নিষেধ না মানিয়া 'পাড়ি' দিয়াছিলেন। যিনি সাঁতার জানেন না, তাঁর পক্ষে এটি বড় সাহসের কাজ বলিতে হইবে।'

২য়। গঙ্গাবক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্রের কোন শত্রু বালক, যখন তাঁর ডিঙ্গির কাছি কাটিয়া দিয়াছিল, তিনি তখন ডিঙ্গিতেই নির্ভয়ে বসিয়াছিলেন। ভয় পান নাই এই জন্য, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, চারিদিকে এত নৌকা থাকিতে ডুবিয়া মরিবার ভয় নাই। শেষটা, তাই দাঁড়াইয়াছিল।"

৩য়। বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডুলিপি যে পূর্ণবাবুই দেখিতেন, তা নয়; সঞ্জীবচন্দ্রও দেখিবার সুযোগ পাইতেন। তবে, পূর্ণবাবুর সুবিধা ছিল বেশী। কারণ, তিনি বঙ্গদর্শনের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁর হাত দিয়াই পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় যাইত।—

সুপরিচিত। বঙ্গদেশের এক সুপ্রসিদ্ধ মহারাজের পুত্রকে তিনি পড়াইতেন। হুগলী কলেজে, বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার ছাত্র ছিলেন। ছাত্র প্রতিভাবান্ হইলে শিক্ষক মাত্রেরই প্রীতিভাজন হন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত মেধাবী বালক তৎকালে দুর্লভ ছিল। অতএব ঈশানবাবু, বঙ্কিমচন্দ্রকে বড় ভালবাসিতেন। এবং কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ ও মহারাজকুমারের কাছে প্রায়ই বঙ্কিমচন্দ্রের সুখ্যাতি করিতেন। ফলে, কুমার ও মহারাজ, দুজনেই বঙ্কিমের সঙ্গে আলাপ করিতে উৎসুক হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, তখন বালকমাত্র। সুতরাং এ সম্মান তাঁর পক্ষে লোভনীয় হইবার কথা।

কাঁটালপাড়ায় রাসের বড় ঘটা হইত। সে উৎসব-সমারোহ দেখিবার জন্য দূরদেশ হইতে প্রতি বৎসর ধনী ও দরিদ্র বহুলত লোক আসিতেন। পূর্ব্ব-কথিত মহারাজও বজরা ভাসাইয়া সেই সময়ে কাঁটালপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন; যে বারের কথা বলিতেছি, সেবারেও আসিয়াছিলেন। আসিয়া, বঙ্কিমচন্দ্রকে আনিবার জন্য দু'জন প্রধান কর্ম্মচারীকে চট্টোপাধ্যায়-বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। কর্ম্মচারীরা, যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে মহারাজের উদ্দেশ্য বলিলেন। শুনিয়া, যাদববাবু বলিলেন, "আমার ভাগ্য, আমার ভাগ্য!" তিনি ছেলের স্বভাব জানিতেন। অতএব, বঙ্কিম যাইবেন কি যাইবেন না, সে সব কথা কিছু না বলিয়া কর্ম্মচারী দুজনকে একেবারে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, তখন পড়িবার ঘরে বসিয়া বই পড়িতেছিলেন। কর্ম্মচারীরা, তাঁহার কাছে গিয়া মহারাজের কথা তুলিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র, সমস্ত শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন :—"আমরা গৃহস্থমানুষ, রাজারাজড়ার খবরে আমাদের দরকার কি? আমি যাব না। দরকার থাকে যদি, তাঁরা আসুন।"

তাঁহার বাল্যকালের একটী অভ্যাসের কথা আমরা শুনিয়াছি। রোজ স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া, আগে বইগুলি তিনি একদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। তার পর গা হইতে জামাটি খুলিয়া আর একদিকে নিক্ষেপ করিতেন। তৎপরে, আদুড় গায়ে, মাথায় বাবরি-কাটা কেশ দুলাইয়া, এক ছুটে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতেন। এবং যতক্ষণ না জলখাবার পাইতেন, ততক্ষণ অস্থির হইয়া বেড়াইতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র, একদা বলিয়াছিলেন, "চাকরি আমার জীবনের অভিশাপ।" কাহার দাসত্ব করা, তাঁর স্বভাবসঙ্গত ছিল না। কিন্তু এদেশের সাহিত্যিকের জীবন, উদর-চিন্তায় কণ্টকিত। বিলাতের দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন লেখিকার, সাহিত্য হইতে বাৎসরিক আয় ৩৫০০০ হাজার পাউণ্ড! আর একজন লেখকের ৩২০০০ পাউণ্ড!! এদেশে এ কথা স্বপ্নসম্ভবও নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের—বঙ্গের সাহিত্য-সম্রাটের,—পুস্তকের বিক্রয়-লব্ধ অর্থের বাৎসরিক পরিমাণ ৬০০০ হাজার টাকার অধিক ছিল না। এক্ষেত্রে, অন্য সকলের অবস্থা বিবেচ্য। বাঙ্গালার সাহিত্য, দেহের রক্তশোষণ করে—কিন্তু প্রাণ ত বাঁচায় না! অতএব, সাহিত্যিকগণকে প্রাণধারণের জন্য ভিন্ন উপায় দেখিতে হয়। গেটে কিংবা দান্তে, ঠিক্ স্মরণ নাই—

একবার কহিয়াছিলেন, "সাহিত্যিকের বসিয়া থাকা উচিত নয়,—তাঁহার পক্ষে কোন কাজ করা ভাল।"—কিন্তু তিনি দাসত্ব করিতে বলেন নাই।

এই দাসত্বকে বঙ্কিমচন্দ্র বড় ঘৃণা করিতেন। অর্থোপার্জ্জনের জন্য তিনি চাকুরিতে ঢুকিয়াছিলেন বটে—কিন্তু তাঁহার কর্ম্মকাল পূর্ণ হইবার আগেই—বোধ হয় ৫৩ বৎসর বয়সে তিনি কাজ ছাড়িয়া দেন। এ কাজে তাঁহার সুনাম হইয়াছিল যথেষ্ট। ইচ্ছা করিলে, আরও কিছুদিন তিনি থাকিতে পারিতেন। কিন্তু দাসত্বে তাঁর বড় ঘৃণা। অতএব তিনি থাকেন নাই।

পেন্‌সন্ লইবার পরে, একবার কোন দেশবিখ্যাত জমিদার, তাঁহার নিকটে এক লোক পাঠান। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন। প্রেরিত ব্যক্তি তাঁহার কাছে আসিয়া কহিলেন "আপনি দয়া ক'রে যদি আমার প্রভুর কোন উপকার করেন।"

"কি উপকার বাপু?"

"আজ্ঞে, তাঁর বিষয় দেখাশোনার ভারটি যদি আপনি নেন।"

"না বাপু, আমাকে দিয়ে আর তা হবে না।"

"তিনি মোটা-মাইনে দেবেন।"

"না। অনুরোধ সত্ত্বেও কোম্পানীর চাকরি আমি ছেড়েছি। আর সামান্য লোকের দাসত্ব কর্ত্তে আমার ইচ্ছে নাই।"

"আজ্ঞে, তিনিই আপনার অধীন হয়ে থাকবেন।"

"দেখ, তাঁর মত লোক আমার অধীন হয়ে থাকেন। ইচ্ছে নয়।"

কেবল এই একবার নয়। আর একবার আর একজন জমিদারের কাছ হইতে এমনি ধরণের অনুরোধ আসিয়াছিল। কিন্তু সেবারেও বঙ্কিমবাবু সম্মত হন নাই।

বিচারাসনে বসিয়া, বঙ্কিমবাবু যে সকল রায় লিখিতেন—তা অপূর্ব্ব। তাতে যে খুব বড় বড় কথা থাকিত, তা'ও নয়। কিন্তু অতি সাধারণ কথাগুলিকে বঙ্কিমচন্দ্র এমনি গুছাইয়া, সাজাইয়া লিখিতেন, যে, যিনি পড়িতেন,—তিনিই মুগ্ধ হইতেন। আমাদের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট বেকার সাহেব, তখন ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত রায় পড়িয়া তিনি বলিয়াছিলেন:—"এ রকম রায় আমি আর কখনও দেখি নি।"

ইডন সাহেব যখন এখানকার ছোটলাট, বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাঁহার সেক্রেটারী মেকলের সহকারী ছিলেন। অনেকে মনে করেন, উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সঙ্গে অবনিবনাও হওয়াতে বঙ্কিমচন্দ্রকে এ কর্ম্ম হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়। এই পৃথিবীটি গুজবে ভরা। এ কথাটাও গুজবমাত্র—মূলে সত্য নাই আদৌপে! সহকারী সেক্রেটারীর পদ aboiish হওয়াতেই,—বঙ্কিমচন্দ্র বেশীদিন পূর্ব্বকথিত কাজটি করিতে পারেন নাই। যতদিন করিয়াছিলেন—যথেষ্ট সুখ্যাতি কিনিয়াছিলেন। কিন্তু মেকলের সঙ্গে প্রায়ই তিনি মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারিতেন না। এর কারণ আর কিছু না—বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাধীনচিত্ত, পরের ভালমন্দ সকল কথায় তলেই ঢ্যারা সই দিবার জন্য নির্ম্মিত হয় নাই। সে মন,

আপনার পথ আপনিই চিনিয়া লইত—কাহার মুখ তাকাইত না। কাজেই, অন্যের সঙ্গে মত-ভেদ অনিবার্য্য। কিন্তু ইডেন সাহেব, স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন, যে মেকলে ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে মত বিভেদ হইলে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতই সারবান্ বলিয়া গ্রহণ করিতেন।

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পিতৃদেব, স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের যথেষ্ট সৌহৃদ্য ছিল। বঙ্গদেশ—শুধু বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে তথা পৃথিবীর ভিতরে, বোধ হয়—দুটি মাত্র পরিবার ভিন্ন আর কোন পরিবারেই সাহিত্যিকের পরে সাহিত্যিকের উদয় দেখা যায় নাই। তন্মধ্যে, একটি আমাদের জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী এবং আর একটি শ্যামবাগানের দত্তবাড়ী। দত্তবাড়ীর রমেশচন্দ্র ও তরুদত্ত পৃথিবী-যোড়া নাম কিনিয়াছেন। তদ্ভিন্ন Lotus Leaves-প্রণেতা হরচন্দ্র, Cherry Blossoms প্রণেতা গিরীশচন্দ্র ও Indian Pilgrim প্রণেতা যোগেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির নামও উল্লেখ্য। S. C. Dutt—যিনি লিখিয়াছিলেন—

"My native land, I love thee still !
There's beauty yet upon thy
lonely shore ;
And not a tree, and not a rill,
But can my soul with rapture thrill
Though glory dwells no more—"

তাঁহারও নাম করা যায়। এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া ঈশানচন্দ্রও সাহিত্য-রসিক হইয়াছিলেন।

বোধহয়, যখনকার কথা বলিতে যাইতেছি, ঈশানবাবু, তখন খুলনা মহকুমার Survey Deputy Collector। আর বঙ্কিমচন্দ্রও তখন সেইখানেই কার্য্যভার পাইয়াছিলেন। ঈশানবাবু, একবার আপনার কাজের খাতিরে কুষ্টিয়ার নিকটে কোন স্থানে জলপথে যাত্রা করিলেন। নৌকা, একটি পদ্মিল খালের ভিতরে ঢুকিল। তারপর কিরূপে বলিতে পারি না, ঈশানবাবু হঠাৎ জলে পড়িয়া গেলেন। এবং আর উঠিতে পারিলেন না। নিয়তির এরূপ কঠোর পরিহাস সচরাচর দেখা যায় না।

ঈশানবাবুর বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ মাত্র। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে তাঁহার এই শোচনীয় পরিণাম হয়। সখাপ্রীত বঙ্কিমচন্দ্র, এই কথা শুনিলেন। ঈশানবাবু, বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা অনেক বড় হইলেও, দুজনের ভিতরে ভালবাসা হইয়াছিল খুব। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ লোকজন সংগ্রহ করিয়া অকালমৃত ঈশানচন্দ্রের মৃতদেহ সলিল-সমাধি হইতে উদ্ধার করাইয়া আনিলেন। এদিকে ঈশানবাবুর আত্মীয়েরাও তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই সকল ঘটনায় এবং তাহার উপরে বঙ্গসাহিত্যগুরু বলিয়া, রমেশচন্দ্র চিরকাল বঙ্কিমচন্দ্রকে ভালবাসিতেন। প্রথমে যিনি মন্ত্র দেন, তিনিই গুরু। বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশেই রমেশচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে প্রবিষ্ট হন। সেকথা আগেই বলিয়াছি। অতএব, বঙ্কিমচন্দ্রকে, রমেশচন্দ্রের গুরু বলিতে হইবে।

রমেশচন্দ্র যখন বর্দ্ধমানের কমিশনর,

বঙ্কিমচন্দ্রের তখন মৃত্যু হয়। বঙ্কিমের পীড়ার সংবাদ পাইয়া, রমেশচন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না। মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তিমশয়নের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। সাহিত্য-সম্রাটের জ্ঞানসূর্য্য তখন 'অস্ত যায় যায়'। কিন্তু রমেশচন্দ্র আসিয়াছেন শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ধীরে ধীরে চোখদুটি খুলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে, রমেশচন্দ্রও যথাসাধ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে, বর্দ্ধমানে এক শোক-সভার অনুষ্ঠান হয়। সভায়, রমেশচন্দ্র বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং সভাস্থলে বর্দ্ধমানের মহারাজ স্বয়ং ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ইংরাজ আর দেশীয় কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রসম্বন্ধে, রমেশচন্দ্র বঙ্গভাষায় একটী প্রবন্ধও রচনা করিয়াছিলেন।

বন্ধুগণের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র বরাবর স্নেহশীল। জলেশ্বর কমিশনে বঙ্কিম যখন সেক্রেটারী,—তখন তাঁহার সহিত একজনের আলাপ হয়। ভদ্রলোকের দুটি ছেলে, কলিকাতায় মেসে থাকিয়া পড়াশুনা করিত।

হঠাৎ একটি ছেলে, কঠিন কলেরা-রোগে পড়িল। অমনি তাঁর প্রেমালু প্রাণও কাঁদিয়া উঠিল—তিনি তখনি ছেলেদুটি যে মেসে থাকিত, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। কলেরা শুনিয়া ভয় পাইলেন না, পীড়িত বালকটির পাশে বসিয়া তাহাকে দেখিয়া শুনিয়া তবে ফিরিলেন।

শেষ জীবনে, বঙ্কিমচন্দ্রের একটি পীড়া হইল। তাঁর দাঁত দিয়া মাঝে মাঝে রক্ত বাহির হইত। কিন্তু সে সকল উপসর্গ গ্রাহ্য না করিয়া তিনি লিখিতে বসিতেন। শুনিয়া, ডাক্তার, লেখা বন্ধ করিতে বলিলেন। লেখা ত' বন্ধ হইল, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ত' চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি, দাবা ও পাশা খেলিতে জানিতেন। অতএব, সন্ধ্যার সময়ে রোজ দাবা বা পাশা লইয়া বসিতেন। কিন্তু, প্রত্যহ নিয়মিতরূপে খেলার সাথী পাওয়া যায়। তখন, বঙ্কিমচন্দ্র আপনার স্ত্রীকে সতরঞ্চ বা ঐ শ্রেণীর কোন একটা খেলা শিখাইলেন। তারপর, স্বামী ও স্ত্রী দুজনে বসিয়া বসিয়া অবসররঞ্জন করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী, সত্যই তাঁর ধর্ম্মে সহায়, সেবায় দাসী, যত্নে জননী এবং ক্রীড়ায় সখী ছিলেন। সুধানন্দিনীর অনেক গুণ বঙ্কিম-গৃহিণীতে দেখি। আদর্শ চরিত্র, বঙ্কিমের শুদ্ধান্তেই ছিল,—তাই তৎলিখিত কাব্যপটেও আমরা সেই মোহনীয় চরিত্রের দীপ্তমঙ্গলশ্রী,—এবং মহান্ ছায়াপাত দেখিতে পাই।

ক্রমশঃ

বিবেক।

প্রহরী, ধনীর গৃহে, আলোক জ্বালিয়া,
সতর্ক পাহারা দেয় সর্ব্বরী জাগিয়া;
অজ্ঞান-তমিস্রা-মগ্ন অন্তর ভবন
বিবেক বর্ত্তিকা জ্বালি' জাগে অনুক্ষণ।

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

১৮৮৩ সালে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রেখা-চিত্রিত।

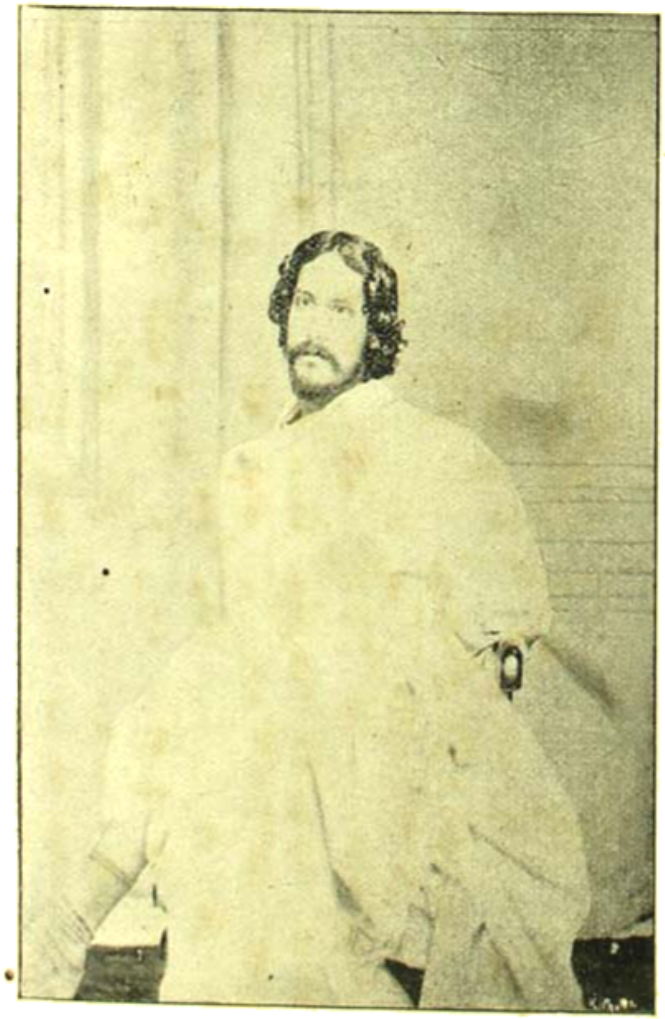

বিভিন্ন বয়সে রবীন্দ্রনাথ

ধর্ম্মের নবযুগ।

সংসারের ব্যবহারে প্রতিদিন আমরা ছোট ছোট সীমার মধ্যে আপনাকে রুদ্ধ করিয়া থাকি। এমন অবস্থায় মানুষ স্বার্থপরভাবে কাজ করে, গ্রাম্যভাবে চিন্তা করে, ও সঙ্কীর্ণ সংস্কারের অনুসরণ করিয়া অত্যন্ত অনুদারভাবে নিজের রাগদ্বেষকে প্রচার করে। এই জন্যই দিনের মধ্যে অন্তত একবার করিয়াও নিজেকে অসীমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখিবার উপদেশ আছে। অন্তত একবার করিয়াও এ কথা বুঝিতে হইবে যে কোনো ভৌগোলিক ভূমিখণ্ডই আমার চিরকালের দেশ নহে, সমস্ত ভূর্ভুবঃস্বঃ আমার বিরাট আশ্রয়; অন্তত একবার করিয়াও অন্তরের মধ্যে এই কথাটিকে ধ্যান করিয়া লইতে হইবে যে, আমার বীশক্তি আমার চৈতন্য কোনো একটা কলের জিনিষের মত আমার মধ্যেই উৎপন্ন ও আমার মধ্যেই বদ্ধ নহে, জগদ্ব্যাপী ও জগতের অতীত অনন্ত চৈতন্য হইতেই তাহা প্রতিমুহূর্ত্তে আমার মধ্যে বিকীর্ণ হইতেছে।

এইরূপে নিজেকে যেমন সমস্ত আবরণ হইতে মুক্তি দিয়া সত্য করিয়া দেখিতে হইবে নিজের ধর্ম্মকেও তেমনি করিয়া তাহার সত্য আধারের মধ্যে দেখিবার সাধনা করা চাই। আমাদের ধর্ম্মকেও যখন সংসারে আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করিতে থাকি তখন কেবলি তাহাকে নিজের নানাপ্রকার ক্ষুদ্রতার দ্বারা বিজড়িত করিয়া ফেলি। মুখে যাহাই বলি না কেন, ভিতরে ভিতরে তাহাকে আমাদের সমাজের ধর্ম্ম, আমাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম করিয়া ফেলি। সেই ধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদের সমস্ত চিন্তা সাম্প্রদায়িক সংস্কারের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে। অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারের ন্যায় আমাদের ধর্ম্ম আমাদের আত্মাভিমান বা দলীয় অভিমানের উপলক্ষ্য হইয়া পড়ে; ভেদবুদ্ধি নানাপ্রকার ছদ্মবেশ ধরিয়া জাগিতে থাকে, এবং আমরা নিজের ধর্ম্মকে লইয়া অন্যান্য দলের সহিত প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় হারজিতের ঘোড়দৌড় খেলিয়া থাকি। এই সমস্ত ক্ষুদ্রতা যে আমাদেরই স্বভাব, তাহা যে আমাদের ধর্ম্মের স্বভাব নহে সে কথা আমরা ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া যাই এবং একদিন আমাদের ধর্ম্মের উপরেই আমাদের নিজের সঙ্কীর্ণতা আরোপ করিয়া তাহাই লইয়া গৌরব করিতে লজ্জা বোধ করি না।

এই জন্যই আমাদের ধর্ম্মকে অন্তত বৎসরের মধ্যে একদিনও আমাদের স্বরচিত সমাজের বেষ্টন হইতে মুক্তি দিয়া সমস্ত মানুষের মধ্যে তাহার নিত্য প্রতিষ্ঠায় তাহার সত্য আশ্রয়ে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিতে হইবে; দেখিতে হইবে, সকল মানুষের মধ্যেই তাহার সামঞ্জস্য আছে কিনা, কোথাও তাহার বাধা আছে কিনা—বুঝিতে হইবে তাহা সেই পরিমাণেই সত্য যে পরিমাণে তাহা সকল মানুষেরই।

কিছুকাল হইতে মানুষের সভ্যতার মধ্যে একটা খুব বড় রকমের পরিবর্ত্তন দেখা দিতেছে—তাহার মধ্যে সমুদ্র হইতে যেন একটা জোয়ার আসিয়াছে। একদিন ছিল যখন প্রত্যেক জাতিই ন্যূনাধিক পরিমাণে আপনার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। নিজের সঙ্গে

সমস্ত মানবেরই যে একটা গূঢ়গভীর যোগ আছে ইহা সে বুঝিতই না। সমস্ত মানুষকে তফাৎ দিয়াই যে নিজেকে সত্য করিবে।

যার একথা যে স্বীকার করিতেই পারিত না। সে এই কথা মনে করিয়া নিজের চৌকিতে খাড়া হইয়া মাথা তুলিয়া বসিয়াছিল, যে, তাহার জাতি, তাহার সমাজ, তাহার ধর্ম যেন ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টি এবং চরম সৃষ্টি —অন্য জাতি, ধর্ম, সমাজের সঙ্গে তাহার মিল নাই এবং মিল থাকিতেই পারে না। স্বধর্মে এবং পরধর্মে যেন একটা অটল অলঙ্ঘ্য ব্যবধান।

এদিকে তখন বিজ্ঞান বাহিরের বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের বেড়া ভাঙিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই একটা মস্ত ভুল সে আমাদের একে একে ঘুচাইতে লাগিল, যে, জগতে কোনো বস্তুই নিজের বিশেষত্বের ঘেরের মধ্যে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া নাই। বাহিরে তাহার বিশেষত্ব আমরা যেমনি দেখিনা কেন, কতকগুলি গূঢ় নিয়মের ঐক্যজালে সে ব্রহ্মাণ্ডের দূরতম অণুপরমাণুর সহিত নাড়ির বাঁধনে বাঁধা। এই বৃহৎ বিশ্বগোষ্ঠীর গোপন কুলজিখানি সন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে তখনি ধরা পড়িয়া যায় যে যিনি আপনাকে যত বড় কুলীন বলিয়াই মনে করুন না কেন, গোত্র সকলেরই এক। এই ভক্ত বিশ্বের কোনো একটি কিছুর তত্ত্ব সত্য করিয়া জানিতে গেলে সব কটির সঙ্গে তাহাকে বাজাইয়া দেখিতে হয়। বিজ্ঞান সেই উপায় ধরিয়া সত্যের পরখ করিতে লাগিয়া গেছে।

কিন্তু ভেদবুদ্ধি সহজে মরিতে চায় না। কেননা জন্মকাল হইতে আমরা ভেদটাকেই চোখে দেখিতেছি, সেইটিই আমাদের বুদ্ধির সকলের চেয়ে পুরাতন অভ্যাস। তাই মানুষ বলিতে লাগিল জড়পর্য্যায়ে যেমনি হোকনা কেন,জীবপর্য্যায়ে বিজ্ঞানের ঐক্যতত্ত্ব খাটেনা; পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন বংশ এবং মানুষ, আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, সকল জীব হইতে একেবারেই পৃথক। কিন্তু বিজ্ঞান এই অভিমানের সীমানাটুকুকেও বজায় রাখিতে দিল না; জীবের সঙ্গে জীবের কোথাও বা নিকট কোথাও বা দূরবর্ত্তী কুটুম্বিতার সম্পর্ক আছে এ সংবাদটিও প্রকাশ হইয়া পড়িল।

এদিকে মানবসমাজে যাহারা পরস্পরকে একেবারে নিঃসম্পর্ক বলিয়া সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন পারে স্বতন্ত্র হইয়া বসিয়াছিল, ভাষাতত্ত্বের স্তরে স্তরে তাহাদের পুরাতন সম্বন্ধ উদ্ঘাটিত হইতে আরম্ভ হইল। তাহাদের ধর্ম ও সামাজিক ইতিহাসের নানা শাখা প্রশাখার উজান বাহিয়া মানুষের সন্ধান অবশেষে এক দূর গঙ্গোত্রীতে এক মূল প্রস্রবণের কাছে উপনীত হইতে লাগিল।

এইরূপে জড়েজীবে সর্ব্বত্রই একের সঙ্গে আরের যোগ এমনি সুদূরবিস্তৃত এমনি বিচিত্র করিয়া প্রত্যহ প্রকাশ হইতেছে, যেখানেই সেই যোগের সীমা আমরা স্থাপন করিতেছি সেখানেই সেই সীমা এমন করিয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছে যে, মানুষের সকল জ্ঞানকেই আজ পরস্পর তুলনার দ্বারা তৌল করিয়া দেখিবার উদ্যোগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দেহগঠনের তুলনা, ভাষার তুলনা, সমাজের তুলনা, প্রথার তুলনা, কাহিনীর তুলনা, ধর্ম্মের তুলনা— সমস্তই তুলনা। সত্যের বিচারসভায় আজ জগৎজুড়িয়া সাক্ষীর তলব পড়িয়াছে; আজ

একের সংবাদ অন্যের মুখে না পাইলে প্রমাণ সংশয়াপন্ন হইতেছে; নিজের পক্ষের কথা একমাত্র যে নিজের জবানীতেই বলে, যে বলে আমার শাস্ত্র আমার মধ্যেই, আমার তত্ত্ব আমাতেই পরিসমাপ্ত, আমি আর কারো ধার ধারি না—তৎক্ষণাৎ তাহাকে অবিশ্বাস করিতে কেহ মুহূর্ত্তকাল দ্বিধা করে না।

তবেই দেখা যাইতেছে মানুষ যেদিকটাতে অতি দীর্ঘকাল বাঁধা ছিল আজ যেন একেবারে তাহার বিপরীত দিকে আসিয়া পড়িয়াছে। এতদিন সে নিশ্চয় জানিত যে সে খাঁচার পাখী, আজ জানিতে পারিয়াছে সে আকাশের পাখী। এতকাল তাহার চিন্তা, ভাব ও জীবনযাত্রার সমস্ত ব্যবস্থাই ঐ খাঁচার লৌহশলাকাগুলার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়াছিল। আজ তাহা লইয়া আর কাজ চলে না। সেই আগেকার মত ভাবিতে গেলে সেই রকম করিয়া কাজ করিতে বসিলে সে আর সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায় না। অথচ অনেক দিনের অভ্যাস অস্থিমজ্জায় গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। সেইজন্যই মানুষের মনকে ও ব্যবহারকে আজ বহুতর অসঙ্গতি অত্যন্ত পীড়া দিতেছে। পুরাতনের আসবাবগুলা আজ তাহার পক্ষে বিষম বোঝা হইয়া উঠিয়াছে, অথচ এত দিন তাহাকে এত মূল্য দিয়া আসিয়াছে যে তাহাকে ফেলিতে মন সরিতেছে না; সেগুলা যে অনাবশ্যক নহে, তাহারা যে চিরকালই সমান মূল্যবান এই কথাই প্রাণপণে নানাপ্রকার সুযুক্তি ও কুযুক্তির দ্বারা সে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

যতদিন খাঁচায় ছিল ততদিন সে মূঢ়রূপেই জানিত তাহার বাসা চিরকালের জন্যই কোনো এক বুদ্ধিমান পুরুষ বহুকাল হইল বাঁধিয়া দিয়াছে; আর কোনো প্রকার বাসা একেবারে হইতেই পারে না, নিজের শক্তিতে ত নহেই; —সে জানিত তাহার প্রতিদিনের খাদ্যপানীয় কোনো একজন বুদ্ধিমান পুরুষ চিরকালের জন্য বরাদ্দ করিয়া দিয়াছে, অন্য আর কোনো প্রকার খাদ্য সম্ভবপরই নহে, বিশেষত নিজের চেষ্টায় স্বাধীনভাবে অন্নপানের সন্ধানের মত নিষিদ্ধ তাহার পক্ষে আর কিছুই নাই। এই নির্দ্দিষ্ট খাঁচার মধ্য দিয়া যেটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে তাহার বাহিরেও যে বিধাতার সৃষ্টি আছে একথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয় এবং এই সীমাকে লঙ্ঘন করার চেষ্টামাত্রই গুরুতর অপরাধ।

আধুনিক পৃথিবীতে সেই পুরাতন ধর্ম্মের সহিত নূতনবোধের বিরোধ খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে এমন একটি ধর্ম্মকে চাহিতেছে যাহা কোনো একটি বিশেষ জাতির বিশেষ কালের বিশেষ ধর্ম্ম নহে; যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজাপদ্ধতির দ্বারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় নাই; মানুষের চিত্ত যতদূরই প্রসারিত হউক যে ধর্ম্ম কোনো দিকেই তাহাকে বাধা দিবে না, বরঞ্চ সকল দিকেই তাহাকে মহানের দিকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিবে। মানুষের জ্ঞান আজ যে মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেইখানকার উপযোগী হৃদয়বোধকে এবং ধর্ম্মকে না পাইলে তাহার জীবনসঙ্গীতের সুর মিলিবে না, এবং কেবলি তাল কাটিতে থাকিবে।

আজ মানুষের জ্ঞানের সম্মুখে সমস্ত কাল জুড়িয়া, সমস্ত আকাশ জুড়িয়া একটি চিরধাবমান মহাযাত্রার লীলা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে—সমস্তই চলিতেছে সমস্তই কেবলি উন্মেষিত হইয়া উঠিতেছে। প্রকাশ কোনো জায়গাতেই স্থির হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে নাই, এক মুহূর্ত্ত তাহার বিরাম নাই; অপরিস্ফুটতা হইতে পরিস্ফুটতার অভিমুখে কেবলি সে আপনার অগণ্য পাপড়িকে একটি একটি করিয়া খুলিয়া দিকে দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেছে। এই পরমাশ্চর্য্য নিত্যবহমান প্রকাশ ব্যাপারে মানুষ যে কবে বাহির হইল তাহা কে জানে—সে যে কোন্ বাষ্পসমুদ্র পার হইয়া কোন্ প্রাণহরন্তের উপকূলে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল তাহার ঠিকানা নাই। যুগে যুগে বন্দরে বন্দরে তাহার তরী লাগিয়াছিল, সে কেবলি আপনার পণ্যের মূল্য বাড়াইয়া অগ্রসর হইয়াছে; কেবলি "শঙ্খের বদলে মুকুতা", স্থূলের বদলে সূক্ষ্মটিকে সংগ্রহ করিয়া ধনপতি হইয়া উঠিয়াছে এ সংবাদ আজ আর তাহার অগোচর নাই। এইজন্য যাত্রার গানই আজ তাহার গান, এইজন্য সমুদ্রের আনন্দই আজ তাহার মনকে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছে। একথা আজ সে কোনোমতেই মনে করিতে পারিতেছে না, যে, নোঙরের শিকলে মরিচা পড়াইয়া হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া চুপ করিয়া কূলে পড়িয়া থাকাই তাহার সনাতন সত্যধর্ম্ম। বাতাস আজ তাহাকে উতলা করিতেছে, বলিতেছে, ওরে মহাকালের যাত্রী, সব কটা পাল তুলিয়া দে,—ধ্রুব নক্ষত্র আজ তাহার চোখের সম্মুখে জ্যোতির্ম্ময় তর্জ্জনী তুলিয়াছে, বলিতেছে ওরে দিগ্বিকাতর, ভয় নাই অগ্রসর হইতে থাক! আজ পৃথিবীর মানুষ সেই কর্ণধারকেই ডাকিতেছে যিনি তাহার পুরাতন শুরুভার নোঙরটাকে গভীর পঙ্কতল হইতে তুলিয়া আনন্দচঞ্চল তরঙ্গের পথে হাল ধরিয়া বসিবেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্তে এই বাংলাদেশে আজ প্রায় শতবৎসর পূর্ব্বে রামমোহন রায় পৃথিবীর সেই বাধামুক্ত ধর্ম্মের পালটাকেই ঈশ্বরের প্রসাদবায়ুর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন। ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের ঐক্য, তখন পৃথিবীর অন্য কোথাও মানবের মনে পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পায় নাই। সেদিন রামমোহন রায় যেন সমস্ত পৃথিবীর বেদনাকে হৃদয়ে লইয়া পৃথিবীর ধর্ম্মকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন।

তিনি যে সময়ে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। তিনি মূর্ত্তি-পূজার মধ্যেই জন্মিয়াছিলেন এবং তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এই বহুকালব্যাপী সংস্কার ও দেশব্যাপী অভ্যাসের নিবিড়তার মধ্যে থাকিয়াও এই বিপুল এবং প্রবল এবং প্রাচীন সমাজের মধ্যে কেবল একলা রামমোহন মূর্ত্তিপূজাকে কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না। তাহার কারণ এই, তিনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বমানবের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মূর্ত্তিপূজা সেই অবস্থারই পূজা যে অবস্থায় মানুষ বিশেষ দেশকে বিশেষ জাতিকে বিশেষ বিধিনিষেধসকলকে

বিশ্বের সহিত অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখে;—যখন সে বলে যাহাতে আমারই বিশেষ দীক্ষা তাহাতে আমারই বিশেষ মঙ্গল; যখন সে বলে আমার এই সমস্ত বিশেষ শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে বাহিরের আর কাহারও প্রবেশ করিয়া ফল নাই এবং কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবই না; "তবে বাহিরের লোকের কি গতি হইবে" এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে যখন মানুষ উত্তর দেয় পুরাকাল ধরিয়া সেই বাহিরের লোকের যে বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা চলিয়া আসিতেছে তাহাতেই অচলভাবে আবদ্ধ থাকিলেই তাহার পক্ষে শ্রেয়; অর্থাৎ যে সময়ে মানুষের মনের এইরূপ বিশ্বাস যে, নিজায় মানুষের সর্ব্বত্র অধিকার, বাণিজ্যে মানুষের সর্ব্বত্র অধিকার, কেবলমাত্র ধর্ম্মেই মানুষ এমনি চিরন্তনরূপে বিভক্ত যে সেখানে পরস্পরের মধ্যে যাতায়াতের কোনো পথ নাই; সেখানে মানুষের ভক্তির আশ্রয় পৃথক্; মানুষের মুক্তির পথ পৃথক, পূজার মন্ত্র পৃথক; আর সর্ব্বত্রই স্বভাবের আকর্ষণেই হউক আর প্রবলের শাসনের দ্বারাই হউক্ মানুষের এক হইয়া মিলিবার আশা আছে, উপায় আছে; এমন কি, নানাজাতির লোক পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধের নাম করিয়া নিদারুণ নরহত্যার ব্যাপারেও গৌরবের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে, কেবলমাত্র ধর্ম্মের ক্ষেত্রেই মানুষ দেশবিদেশ স্বজাতি বিজাতি ভুলিয়া আপন পূজাসনের পার্শ্বে পরস্পরকে আহ্বান করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ মূর্ত্তিপূজা সেইরূপ কালেরই পূজা যখন মানুষ বিশ্বের পরমদেবতাকে একটি কোনো বিশেষরূপে একটি কোনো বিশেষ স্থানে আবদ্ধ করিয়া তাহাকেই বিশেষ মহাপুণ্য ফলের আকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে অথচ সেই মহাপুণ্যের দ্বারকে সমস্ত মানুষের কাছে উন্মুক্ত করে নাই, সেখানে, বিশেষ সমাজে জন্মগ্রহণ ছাড়া, প্রবেশের অন্য কোনো উপায় রাখা হয় নাই; মূর্ত্তিপূজা সেই সময়েরই যখন পাঁচসাত ক্রোশ দূরের লোক বিদেশী, পরদেশের লোক ম্লেচ্ছ, পরসমাজের লোক অশুচি, এবং নিজের দলের লোক ছাড়া আর সকলেই অনধিকারী—এক কথায় যখন ধর্ম্ম আপন ঈশ্বরকে সঙ্কুচিত করিয়া সমস্ত মানুষকে সঙ্কুচিত করিয়াছে এবং জগতে যাহা সকলের চেয়ে বিশ্বজনীন তাহাকে সকলের চেয়ে গ্রাম্য করিয়া ফেলিয়াছে। সংস্কার যতই সঙ্কীর্ণ হয় তাহা মানুষকে ততই আঁট করিয়া ধরে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া বাহির হওয়া ততই অত্যন্ত কঠিন হয়;—যাহারা অলঙ্কারকে নিরতিশয় পিনদ্ধ করিয়া পরে তাহাদের সেই অলঙ্কার ইহজন্মে তাহারা আর বর্জ্জন করিতে পারে না, সে তাহাদের দেহচর্ম্মের মধ্যে একেবারে কাটিয়া বসিয়া যায়। সেইরূপ ধর্ম্মের সংস্কারকে সঙ্কীর্ণ করিলে তাহা চিরশৃঙ্খলের মত মানুষকে চাপিয়া ধরে,—মানুষের সমস্ত আয়তন যখন বাড়িতেছে তখন সেই ধর্ম্ম আর বাড়ে না, রক্তচলাচলকে বদ্ধ করিয়া অঙ্গকে সে কৃশ করিয়াই রাখিয়া দেয়, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়াই কঠিন হয়। সেই অতি কঠিন সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মের প্রাচীন বন্ধনকে রামমোহন রায় যে কোনোমতেই আপনার আশ্রয় বলিয়া

কল্পনা করিতে পারেন নাই তাহার কারণ এই যে, তিনি সহজেই বুঝিয়াছিলেন, যে, যে সত্যের সুধার মানুষ ধর্ম্ম প্রার্থনা করে সে সত্য ব্যক্তিগত নহে, জাতিগত নহে, তাহা সর্ব্বগত। তিনি বালাকাল হইতেই অনুভব করিয়াছিলেন, যে, যে দেবতা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকল মানুষের দেবতা না হইতে পারেন, অর্থাৎ যিনি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করেন অন্যের কল্পনাকে বাধা দেন, যিনি আমার অভ্যাসকে আকর্ষণ করেন অন্যের অভ্যাসকে পীড়িত করেন তিনি আমারও দেবতা হইতে পারেন না, কারণ সকল মানুষের সঙ্গে যোগ কোনোখানে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষের পক্ষে পূর্ণসত্য হওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না এবং এই পূর্ণ সত্যই ধর্ম্মের সত্য।

আমাদের একটি পরমসৌভাগ্য এই ছিল, যে, মানুষের শ্রেষ্ঠধর্ম্মের মহোচ্চ আদর্শ একদিকে আমাদের দেশে যেমন বাধাগ্রস্ত হইয়াছিল তেমনি আর একদিকে তাহাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ আমাদের দেশে যেমন সহজ হইয়া ছিল জগতের আর কোথাও তেমন ছিল না। একদিন আমাদের দেশের সাধকেরা ব্রহ্মকে যেমন আশ্চর্য্য উদার করিয়া দেখিয়াছিলেন এমন আর কোনো দেশেই দেখে নাই। তাঁহাদের সেই ব্রহ্মোপলব্ধি একেবারে মধ্যাহ্নগগনের সূর্য্যের মত অদ্বিতীয় হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, দেশকালগত সংস্কারের লেশমাত্র বাষ্প তাঁহাকে কোথাও স্পর্শ করে নাই। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম যিনি, তাঁহারই মধ্যে মানবচিত্তের এরূপ পরিপূর্ণ আনন্দময় মুক্তির বার্ত্তা এমন সুগভীর রহস্যময়বাণীতে অথচ এমন শিশুর মত অকৃত্রিম সরলভাষায় উপনিষৎ ছাড়া আর কোথায় ব্যক্ত হইয়াছে! আজ মানুষের বিজ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞান যতদূরই অগ্রসর হইতেছে সেই সনাতন ব্রহ্মোপলব্ধির মধ্যে তাহা অন্তরে বাহিরে কোনো বাধাই পাইতেছে না। তাহা মানুষের সমস্ত জ্ঞানভক্তিকর্ম্মকে পূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে, কোথাও তাহাকে পীড়িত করে না, সমস্তকেই সে উত্তরোত্তর ভূমার দিকেই আকর্ষণ করিতে থাকে, কোথাও তাহাকে কোনো সাময়িক সঙ্কোচের দোহাই দিয়া মাথা হেঁট করিতে বলে না।

কিন্তু এই ব্রহ্ম ত কেবল জ্ঞানের ব্রহ্ম নহেন —রসো বৈ সঃ—তিনি আনন্দরূপং অমৃতরূপং। ব্রহ্মই যে রসস্বরূপ, এবং এবাস্য পরম আনন্দঃ ইনিই আত্মার পরম আনন্দ, আমাদের দেশের সেই চিরলব্ধ সত্যটিকে যদি এই নূতন যুগে নূতন করিয়া সপ্রমাণ করিতে পারি না তবে ব্রহ্ম-জ্ঞানকে ত আমরা ধর্ম্ম বলিয়া মানুষের হাতে দিতে পারিব না—ব্রহ্মজ্ঞানী ত ব্রহ্মের ভক্ত নহেন। রস ছাড়া ত আর কিছুই মিলাইতে পারে না, ভক্তি ছাড়া ত আর কিছুই বাঁধিতে পারে না। জীবনে যখন আত্মবিরোধ ঘটে, যখন হৃদয়ের এক তারের সঙ্গে আর এক তারের অসামঞ্জস্যের বেসুর কর্কশ হইয়া উঠে তখন কেবলমাত্র বুঝাইয়া কোনো ফল পাওয়া যায় না—মজাইয়া দিতে না পারিলে দ্বন্দ্ব মিটে না।

ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ তাহা যেমন বিশ্বসত্যের মধ্যে জানি, তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা যেমন আত্মজ্ঞানের মধ্যে বুঝিতে পারি, তেমনি তিনি

যে রসস্বরূপ তাহা কেবলমাত্র ভক্তের আনন্দের মধ্যেই দেখিতে পাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিহাসে সে দেখা আমরা দেখিয়াছি এবং সে দেখা আমাদিগকে দেখাইয়া চলিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজে আমরা একদিন দেখিয়াছি ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরের মধ্যে, পূজা অর্চ্চনা ক্রিয়া কর্ম্মের মহা সমারোহের মাঝখানে বিলাসলালিত তরুণ যুবকের মন ব্রহ্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহার পরে দেখিয়াছি সেই ব্রহ্মের আনন্দেই সাংসারিক ক্ষতিবিপদকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, আত্মীয়স্বজনের বিচ্ছেদ ও সমাজের বিরোধকে ভয় করেন নাই; দেখিয়াছি চিরদিনই তিনি তাঁহার জীবনের চিরবরণীয় দেবতার এই অপরূপ বিশ্বমন্দিরের প্রাঙ্গণতলে তাঁহার মস্তককে নত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার আয়ুর অবসানকালপর্য্যন্ত তাঁহার প্রিয়তমের বিকশিত আনন্দ কুলঙ্কাষার বুদ্‌বুদের মত প্রহরে প্রহরে গান করিয়া কাটাইয়াছেন।

এমনি করিয়াইত আমাদের নবযুগের এবং চিরযুগের ধর্ম্মের রসস্বরূপকে আমরা নিশ্চিত সত্য করিয়া দেখিতেছি। কোনো বাহ্যমূর্ত্তিতে নহে, কোনো ক্ষণকালীন কল্পনায় নহে—একেবারে মানুষের অন্তরতম আত্মার মধ্যেই সেই আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে অখণ্ড করিয়া অসন্দিগ্ধ করিয়া দেখিতেছি।

বস্তুতঃ পরমাত্মাকে এই আত্মার মধ্যে দেখার জন্যই মানুষের চিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। কেননা আত্মার সঙ্গেই আত্মার স্বাভাবিক যোগ সকলের চেয়ে সত্য;—সেইখানেই মানুষের গভীরতম মিল। আর সর্ব্বত্র নানাপ্রকার বাধা। বাহিরের আচারবিচারঅনুষ্ঠান বন্ধনকর্ম্মনীতিতে পর স্পরের মধ্যে পার্থক্যের অন্ত নাই; কিন্তু মানুষের আত্মায় আত্মায় এক হইয়া আছে—সেইখানেই যখন পরমাত্মাকে দেখি তখন সমস্ত মানবাত্মার মধ্যে তাঁহাকে দেখি, কোনো বিশেষ জাতিকুলসম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিনা।

সেইজন্যই আজ উৎসবের দিনে সেই রসস্বরূপের নিকট আমাদের যে প্রার্থনা তাহা ব্যক্তিগত প্রার্থনা নহে, তাহা আমাদের আত্মার প্রার্থনা, অর্থাৎ তাহা একইকালে সমস্ত মানবাত্মার প্রার্থনা! হে বিশ্বমানবের দেবতা, হে বিশ্বসমাজের বিধাতা,—একথা যেন আমরা একদিনের জন্যও না ভুলি যে, আমার পূজা সমস্ত মানুষের পূজারই অঙ্গ, আমার হৃদয়ের নৈবেদ্য সমস্ত মানবহৃদয়ের নৈবেদ্যেরই একটি অর্ঘ্য। হে অন্তর্যামী, আমার অন্তরের বাহিরের, আমার গোচর অগোচর যতকিছু পাপ যতকিছু অপরাধ এই কারণেই অসহ্য যে আমি তাহার দ্বারা সমস্ত মানুষকেই বঞ্চনা করিতেছি, আমার সে সকল বন্ধন সমস্ত মানুষেরই মুক্তির অন্তরায়, আমার নিজের নিজত্বের চেয়ে যে বড় মহত্ত্ব আমার উপর তুমি অর্পণ করিয়াছ আমার সমস্ত পাপ তাহাকেই স্পর্শ করিতেছে; এইজন্যই পাপ এত নিদারুণ, এত ঘৃণ্য;—তাহাকে আমরা যত গোপনেই করি তাহা গোপনের নহে, কোন্ একটি সুগভীর যোগের ভিতর দিয়া তাহা সমস্ত মানুষকে গিয়া আঘাত করিতেছে, সমস্ত মানুষের উপলব্ধিকেই ম্লান করিয়া দিতেছে।

হে ধর্ম্মরাজ, নিজের যতটুকু সাধ্য তাহার দ্বারা সর্ব্বমানবের ধর্ম্মকে উজ্জ্বল করিতে হইবে, বন্ধনকে মোচন করিতে হইবে, সংশয়কে দূর করিতে হইবে, মানবের অন্তরাত্মায়। অন্তর্গূঢ় এই চিরসঙ্কল্পটিকে তুমি বীর্য্যোদ্যমদ্বারা প্রবল কর, পুণ্যের দ্বারা নির্ম্মল কর, তাহার চারিদিক হইতে সমস্ত ভয়-সঙ্কোচের জাল ছিন্ন করিয়া দাও, তাহার সম্মুখ হইতে সমস্ত স্বার্থের বিঘ্ন ভগ্ন করিয়া দাও। এ যুগ, সমস্ত মানুষে মানুষে কাঁধ কাঁধে মিলাইয়া হাতে হাতে ধরিয়া, যাত্রা করিবার যুগ। তোমার হুকুম আসিয়াছে চলিতে হইবে। আর একটুও বিলম্ব না। অনেক দিন মানুষের ধর্ম্মবোধ নানা বন্ধনে বদ্ধ হইয়া নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। সেই ঘোর নিশ্চলতার রাত্রি আজ প্রভাত হইয়াছে। তাই আজ দশদিকে তোমার আহ্বানভেরী বাজিয়া উঠিল। অনেক দিন বাতাস এমনি স্তব্ধ হইয়া ছিল যে মনে হইয়াছিল সমস্ত আকাশ যেন মূর্চ্ছিত; গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়ে নাই, ঘাসের আগাটি পর্য্যন্ত কাঁপে নাই;—আজ ঝড় আসিয়া পড়িল; আজ শুষ্ক পাতা উড়িবে, আজ সঞ্চিত ধূলি দূর হইয়া যাইবে। আজ অনেকদিনের অনেক প্রিয়বন্ধনপাশ ছিন্ন হইবে সেজন্য মন কুণ্ঠিত না হউক্। ঘরের, সমাজের, দেশের যে সমস্ত বেড়া-আড়ালগুলাকেই মুক্তির চেয়ে বেশি আপন বলিয়া তাহাদিগকে লইয়া অহঙ্কার করিয়া আসিয়াছি সে সমস্তকে ঝড়ের মুখের খড় কুটার মত শূন্যে বিসর্জ্জন দিতে হইবে সেজন্য মন প্রস্তুত হউক! সত্যের ছদ্মবেশপরা প্রবল অসত্যের সঙ্গে, ধর্ম্মের উপাধিধারী প্রাচীন অমঙ্গলের সঙ্গে, আজ লড়াই করিতে হইবে সেজন্য মনের সমস্ত শক্তি পূর্ণবেগে জাগ্রত হউক্! আজ বেদনার দিন আসিল, কেননা, আজ চেতনার দিন,—সেজন্য আজ কাপুরুষের মত নিরানন্দ হইলে চলিবে না। আজ ত্যাগের দিন আসিল কেননা আজ চলিবার দিন, আজ কেবলি পিছনের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিলে দিন বহিয়া যাইবে—আজ কৃপণের মত রুদ্ধ সঞ্চয়ের উপর বুক দিয়া পড়িয়া থাকিলে ঐশ্বর্য্যের অধিকার হারাইতে থাকিব। ভীরু, আজ লোকতন্ত্রকেই ধর্ম্মতন্ত্রের স্থানে যদি বরণ কর তবে এমন মহাদিন ব্যর্থ হইবে;—আজ নিন্দাকেই ভূষণ, আজ অপ্রিয়কেই প্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে! আজ অনেক খসিবে, ঝরিবে, ভাঙিবে, ক্ষয় হইয়া যাইবে;—নিশ্চয় মনে করিয়াছিলাম যেদিকে পর্দ্দা, সেদিকে হঠাৎ আলোক প্রকাশ হইবে; নিশ্চয় মনে করিয়াছিলাম যেদিকে প্রাচীর, সেদিকে হঠাৎ পথ বাহির হইয়া পড়িবে। হে যুগান্তবিধাতা, আজ তোমার প্রলয়লীলার ক্ষণে ক্ষণে দিগন্তপট বিদীর্ণ করিয়া কতই অভাবনীয় প্রকাশ হইতে থাকিবে, বীর্য্যবান আনন্দের সহিত আমরা তাহার প্রতীক্ষা করিব;—মানুষের চিত্ত-সাগরের অতলস্পর্শ রহস্য আজ উন্মথিত হইয়া জ্ঞানে কর্ম্মে ত্যাগে ধর্ম্মে কত কত অত্যাশ্চর্য্য অজেয় শক্তি প্রকাশমান হইয়া উঠিবে তাহাকে জয়শঙ্খধ্বনির সঙ্গে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য আমাদের সমস্ত দ্বারবাতায়ন অসঙ্কোচে উদ্ঘাটিত করিয়া দিব। হে অনন্ত শক্তি, আমাদের হিসাব তোমার হিসাব নহে,

—তুমি অক্ষমকে সক্ষম কর, অচলকে সচল কর, অসম্ভবকে সম্ভব কর এবং মোহমুগ্ধকে যখন তুমি উদ্বোধিত কর তখন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে তুমি যে কোন্ অমৃতলোকের তোরণ-দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দাও তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না এই কথা নিশ্চয় জানিয়া আমরা যেন আনন্দে অমর হইয়া উঠি, এবং আমাদের যাহা কিছু আছে সমস্তই পণ করিয়া, তুমার পথে নিখিলমানবের বিজয়-যাত্রায় যেন সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যোগদান করিতে পারি।

জয় জয় জয় হে, জয় বিশ্বেশ্বর,
মানব-ভাগ্যবিধাতা!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চয়ন।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব, এই সময়ে বুদ্ধদেবের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া, নিজ আসন পরিত্যাগ করতঃ দণ্ডায়মান হইয়া বুদ্ধদেবকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কি সত্যই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইব?" তখন তথাগত নিম্নোক্ত প্রকারে তাঁহাকে বলিলেন "তাহাই হইবে; তুমি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইবে এবং আমি যেরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছি, তোমার সেইরূপ ক্ষমতা হইবে।"

এই স্থানের পশ্চিমে একটী স্তূপ আছে। এই স্থানেই শাক্য বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্বলাভের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদ্ভকল্পযুগে, যখন মনুষ্যের পরমায়ু দশসহস্র বৎসর ছিল, তখন কাশ্যপ বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া ধর্মচক্র পরিচালনপূর্বক, জনসাধারণের মত পরিবর্তন করিয়াছিলেন এবং প্রজাপাল বোধিসত্ত্বের নিকট এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। "এই বোধিসত্ত্ব, যখন মানবের পরমায়ু শতবর্ষে পরিণত হইবে, তখন বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবেন এবং শাক্যমুনি নামে কথিত হইবেন।"

এই স্থানের নিকটেই, পূর্ববর্তী চারিজন বুদ্ধের ব্যায়ামার্থ ভ্রমণের চিহ্ন আছে। এই বিহার স্থান দৈর্ঘ্যে প্রায় পঞ্চাশপদ এবং ঊর্দ্ধে উঠিবার সোপানগুলি প্রায় সাত ফুট উচ্চ। ইহা পুঞ্জীকৃত নীলপ্রস্তর নির্ম্মিত। ইহার ঊর্দ্ধদেশে আদ্যাপি বৌদ্ধমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটি অপরূপ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট। মস্তকে অত্যাশ্চর্য্য দীর্ঘ কেশ রহিয়াছে। ঐশ্বরিক ঘটনাবলী স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয়।

সঙ্ঘারামের মধ্যে বহুসংখ্যক পবিত্র চিহ্ন আছে এবং কয়েকশত বিহার ও স্তূপ আছে। বাহুল্যভয়ে আমরা মাত্র দুই তিনটী উল্লেখ করিয়াছি।

সঙ্ঘারামের সীমার পশ্চিমে দুইশত ফুট পরিধিবিশিষ্ট স্বচ্ছবারিপূর্ণ একটী হ্রদ আছে; তথাগত সময় সময় এইস্থানে অবগাহন করিতেন। এই হ্রদের পশ্চিমে ১৮০ হস্ত পরিধিবিশিষ্ট একটী বৃহৎ পুষ্করিণী; তথাগত নিজ ভিক্ষাপাত্র এই পুষ্করিণীতে প্রক্ষালন করিতেন ইহার উত্তরে দেড়শত হস্ত পরিধিবিশিষ্ট একটী হ্রদ, তথাগত এই হ্রদে নিজ বস্ত্র ধৌত করিতেন। প্রত্যেক জলাশয়ের অভ্যন্তরেই একটী করিয়া সৈতা বাস করে। এই সকল হ্রদের জল অত্যন্ত সুমিষ্ট এবং হ্রদগুলি গভীর। হ্রদের জল অত্যন্ত পবিত্র এবং উজ্জ্বল এবং ইহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। ভক্তিহীন ব্যক্তিগণ ইহাতে অবগাহনার্থে অবতরণ করিলে, কুম্ভীরগণ বহির্গত হইয়া, উহাদের অনেককে হত্যা করে। যে সকল পবিত্রচেতা ব্যক্তিগণ এই স্থানে অবগাহন করেন, তাঁহাদের কোনই শঙ্কা নাই। তথাগত, যে জলাশয়ে নিজ বস্ত্রাদি ধৌত করিতেন, তাহার

নিকটেই একটি চতুষ্কোণ প্রস্তর খণ্ডে তাঁহার কথার যত্নের চিহ্ন অদ্যাপি পাওয়া যায়। এরূপ বোধ হয়, যে যন্ত্রের দ্বারা প্রস্তরখণ্ডের উপর পরিষ্কাররূপে লেখিত করা হইয়াছে। বিদ্যার্থী এবং সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই এইস্থানে পূজার্থ আগমন করেন, কিন্তু বিদ্বেষিগণ বা দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণ এই প্রস্তরখণ্ডকে হেয়জ্ঞান বা অপমান করিলে, জলাশয়স্থ দৈত্যরাজ বায়ু উৎপাদন করিয়া বৃষ্টি আনয়ন করেন।

হ্রদের পার্শ্বে এবং নিকটেই একটী স্তূপ। বোধিসত্ত্ব পূর্ব্বজন্মে এইস্থানে হস্তীরাজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার ছয়টী দন্ত ছিল। বস্তুসংগ্রহকামনায় এক শিকারী সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া এবং ধনুক হস্তে হস্তীরাজের অপেক্ষা করিতে লাগিল। হস্তীরাজ কদাচ বদনের প্রতি সন্ধান পরবশ হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার দন্তগুলি ভগ্ন করিয়া শিকারীকে প্রদান করিলেন।

এই স্থানের পার্শ্বে এবং নিকটেই অন্য একটী স্তূপ। এই স্থানে, বোধিসত্ত্ব পূর্ব্বজন্মে মনুষ্যগণের মধ্যে শীলতার অভাব দেখিয়া পঞ্চিতপ্রধারণ করতঃ, এক বানর ও শেতহস্তীকে নিম্নোক্ত মর্ম্মে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের মধ্যে প্রবর কে এই ন্যগ্রোধ বৃক্ষ দর্শন করিয়াছে?" উত্তরে নিজ নিজ বয়সানুযায়ী উত্তর করাতে, বুদ্ধদেব বয়সানুযায়ী তাহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। সর্ব্বত্রই এই কথা প্রচারিত হওয়াতে, মনুষ্যগণ উচ্চ ও নীচের প্রভেদ বুঝিতে পারিল এবং ধার্ম্মিক ও সর্ব্বসাধারণ এই দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে লাগিল।

এই স্থানের অনতিদূরেই বৃহৎ অরণ্যমধ্যে একটী স্তূপ আছে। বহুপূর্ব্বে, এইস্থানে দেবদত্ত ও বোধিসত্ত্ব মৃগরাজ অবস্থায় একটী বিষয় স্থির করিয়াছিলেন। পুরাকালে, এইস্থানে এক অরণ্য মধ্যে দুইটী মৃগযূথ ছিল; প্রত্যেক দলে পাঁচশত মৃগ ছিল। এই সময়ে, তত্রত্যেশ্বর রাজা মৃগয়ার্থ বহুতর শ্রমণ করিতে লাগিলেন। মৃগরাজ বোধিসত্ত্ব, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "মহারাজ, আপনি প্রত্যহ আপনার মৃগয়াবনে অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক এবং তীর নিক্ষেপ করিয়া আমার অনুচরগণকে হত্যা করিতেছেন। সূর্য্য উদিত হইবার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এইস্থানে রাখাতে, তাহারা খাদ্যের অনুপযুক্ত হয়। আমি প্রার্থনা করি যে, আমরা প্রত্যহ আপনার আহারার্থ পর্য্যায়ক্রমে একটী করিয়া মৃগ দিব; তাহা হইলে আপনিও সদ্য মাংস পাইবেন, আমাদেরও আয়ু বৃদ্ধি হইবে।" রাজা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, নিজ রথের গতি প্রতিরোধ করিয়া মৃগে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যহ, এইরূপে একটী করিয়া মৃগ হত্যা করা হইতে লাগিল।

দেবদত্তের দলের মধ্যে আসন্নপ্রসবা একটী কুরঙ্গী ছিল; যখন তাহার সময় আসিল, তখন সে দেবদত্তকে নিবেদন করিল "প্রভু, যদিও আমি প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তথাপি আমার গর্ভস্থ সন্তানের সময় হয় নাই।" দেবদত্ত ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "বাঁচিয়া থাকিতে কাহার না সাধ হয়?" কুরঙ্গী দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিল "প্রভু, যে জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহাকে হত্যা করা নিষ্ঠুরতা মাত্র।" পরে, কুরঙ্গী বোধিসত্ত্বের নিকট সকল বিষয় নিবেদন করিল. বোধিসত্ত্ব বলিলেন "দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই; গর্ভস্থ সন্তানের জন্য মাতা দুঃখিতা হইয়াছেন। অদ্য আমিই তোমার স্থান অধিকার করিয়া, প্রাণত্যাগ করিব।"

রাজধানীর নিকটবর্ত্তী উপস্থিত হইলে, রাজপথে যে সকল লোক গমনাগমন করিতেছিল, তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "মৃগরাজ রাজধানীতে গমন করিতেছেন।" রাজধানীর অধিবাসীবৃন্দ, মৃগয়াকন্ডু এবং অন্যান্য সকলে এই দৃশ্য দেখিতে তৎপর হইল। রাজা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। কিন্তু যখন দ্বারাধ্যক্ষ স্বয়ং এই সংবাদ নিবেদন করিল, তখন তিনি বিশ্বাস করিলেন। পরে মৃগরাজকে সম্বোধন করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি প্রয়োজনে তুমি এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছ?"

মৃগরাজ উত্তর করিলেন "মৃগযূথের মধ্যে আসন্নপ্রসবা একটী কুরঙ্গীর পালা পড়িয়াছে।

কিন্তু ইহাতে তাহার গর্ভস্থ সন্তানও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, সেইজন্য আমিই তাহার মূলাভিমিক্ত হইয়া আসিয়াছি।" রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "আমি মনুষ্যশরীর ধারণ করি বটে, কিন্তু আমি বস্তুতঃ মৃগ। মৃগের শরীর ধারণ করিলেও, তুমি মনুষ্য।" পরে, করুণাপরবশ হইয়া, তিনি মৃগকে মুক্ত করিলেন এবং তাহার মৃগহত্যা হইতে বিরত হইলেন। ঐ বনও তিনি মৃগদের ব্যবহারার্থ প্রদান করিলেন এবং সেইজন্য ঐ অরণ্য মৃগদাব নামে কথিত হইতেছে।

এইরূপ পরিত্যাগ করিয়া এবং সন্ন্যাসাশ্রমের দক্ষিণপশ্চিম দিকে, ৩০০ শত ফুট উচ্চ একটী স্তূপে আসিয়া উপস্থিত হই। স্তূপের ভিত্তিমূল প্রশস্ত এবং মন্দিরটীও উচ্চ। মন্দিরটী মূল্যবান প্রস্তরাদি দ্বারা সজ্জিত। মন্দিরটী একতল এবং গম্বুজের ঊর্দ্ধদেশে ছত্র থাকিলেও, উহাতে ঘূর্ণায়মান যষ্টি নাই। ইহার সন্নিকটেই অন্য একটী ক্ষুদ্র স্তূপ। এই স্থানেই অজ্ঞাতকৌণ্ডিন্য এবং অন্যান্য পাঁচজন ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। সর্ব্বার্থসিদ্ধ যখন সর্ব্বপ্রথম নগর পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতমধ্যে বাস করিতে ও তদভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া ধর্ম্মচিন্তা করিতেছিলেন, তখন শুদ্ধোদনরাজ তিনজন জ্ঞাতি ও দুইজন মাতুলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার পুত্র সর্ব্বার্থসিদ্ধ জ্ঞানপিপাসাতিশয়ে গৃহপরিত্যাগ করিয়াছেন; তিনি একাকী পর্ব্বতে এবং প্রান্তরে ভ্রমণ করেন এবং সঙ্গিহীন হইয়া অরণ্যে বাস করেন। আমি সেইজন্য আপনাদের আদেশ করিতেছি যে আপনারা তাঁহার অনুসরণ করিয়া, তিনি কোথায় বাস করিতেছেন তাহা অনুসন্ধান করুন। তিনি যেখানে গমন করিয়াছেন, আপনারা তথায় হইয়া তাহা নির্দ্ধারণ করুন।" উপরোক্ত পাঁচজন, এই আদেশানুযায়ী দেশের বহির্ভাগে একত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী হইয়া এই কার্য্যে ব্রতী ছিলেন তখন তাঁহাদিগের মনেও গৃহপরিত্যাগের বাসনা উদিত হইল এবং সেইজন্য তাঁহারা পরস্পরে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, "অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া জ্ঞানলাভ হয় কিম্বা সুখে কালাতিপাত করিলে হয়?" দুইজন উত্তর করিলেন "বিলাস এবং সুখভোগ আত্মাধীনস্থ দ্বারাই জ্ঞানলাভ হয়।" অপর তিনজন উত্তর করিলেন, ক্লেশ দ্বারাই জ্ঞান লাভ হয়।" এই প্রকারে, যখন তাঁহাদের বাগবিতণ্ডা চলিতেছিল, তৎপূর্ব্বেই রাজপুত্র, বিষয়বিলিপ্সের কঠোর আত্মাধীনস্থ দ্বারা দুঃখমোচন করিতে সমর্থ হইবেন মনে করিয়া, তাহাদের তায়, শরীরধারণের জন্য যবসামান্য তাউল গ্রহণ করিতেছিলেন মাত্র।

উপরোক্ত দুই জন রাজপুত্রকে এতদাবস্থায় দেখিয়া তাঁহাকে বলিল যে, রাজপুত্রের এইরূপ ক্লেশ স্বীকার শাস্ত্র "বিগর্হিত; প্রীতিকর পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক জ্ঞান শিক্ষা করিতে হয়; কিন্তু যখন তিনি ক্লেশকর প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তখন তিনি কদাচ আমাদের সঙ্গী হইতে পারিবেন না।" তাহারা সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া মৃগদেশে গমন করিল। ছয় বৎসর ধরিয়া কঠোর ক্লেশস্বীকার করিয়াও যোগিলাভ না হওয়ায় রাজপুত্র তখন তাহাদের কথিত পদ্ধতি অবলম্বন করিলেই মোক্ষলাভ হইবে, এই মনে করিয়া এই প্রকার ক্লেশকর তপস্যা হইতে বিরত হইতে ইচ্ছুক হইলেন, পরে, তিনি বালিকা প্রদত্ত পায়সান্ন গ্রহণে প্রস্তুত হইলেন ও এই প্রকারে মোক্ষ লাভ হইবে, বিবেচনা করিলেন। ইহাতে যে তিন জন অনুসন্ধানকারী, ক্লেশ ব্যতীত জ্ঞান লাভ হয়না মনে করিতেন, তাঁহারা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "রাজপুত্র কেবলমাত্র পুণ্যার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এইক্ষণ সকলই বিনষ্ট হইল। ছয় বৎসর গভীর ক্লেশ স্বীকার করিয়া, এক দিনেই তিনি তাঁহার সকল পুণ্য নষ্ট করিলেন।" তাঁহারা অপর দুই জনকে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতে স্থির করিলেন। সকলে একত্রিত হইলে, তাহারা উপবেশন করিয়া উত্তেজিত স্বরে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন

"পূর্ব্বে আমরা সর্ব্বার্থসিদ্ধকে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া জনশূন্য প্রান্তরে যাইতে দেখিয়াছি; তিনি তাঁহার বসন ও মণিমুক্তা পরিত্যাগ করিয়া বল্কল গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং, পরে, স্থিরচিত্তে ও একাগ্র মনে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব ও ফল লাভের জন্য অসীম ক্লেশ সহ্য করিতেছিলেন। কিন্তু এইক্ষণ, সকল পরিত্যাগ করিয়া তিনি কৃষক-কন্যাদত্ত পয়মান্ন গ্রহণ করিয়া, সকল বিনষ্ট করিয়াছেন। আমরা বুঝিতেছি, তিনি আর কোন কর্ম্মেই সক্ষম হইবেন না।"

অপর দুই জন উত্তর করিলেন "আপনারা কি প্রকারে, এতক্ষণে এই ব্যক্তি যে উপায়ের ন্যায় আচরণ করে, বুঝিতে পারিলেন? যখন তিনি রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন, তখন সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে সম্মান করিতেন এবং তিনি কৃতজ্ঞতাশালী ছিলেন; কিন্তু তিনি বিশ্চিন্ত হইয়া বাস করিতে পারিলেন না এবং সেই জন্য, তিনি চক্রবর্ত্তী রাজার রাজত্ব ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে ও অরণ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা আর কি বিবেচনা করিব? তাঁহার কথা স্মরণ হইলে দুঃখের উপর আরও দুঃখ হয়।"

এইক্ষণ, বোধিসত্ত্ব, মৈত্রচিত্ত মনীতে স্নান করিয়া, বোধি বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন এবং সর্ব্বজ্ঞান লাভ করিয়া "দেবতা ও মনুষ্যাধিপতি" নামে আখ্যাত হইলেন। পরে, নির্জ্জনে কে মোক্ষলাভ করিবার উপযুক্ত, সেই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। "রামের পুত্র উদ্রই ইহার উপযুক্তপাত্র, কেননা তিনি সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন," এই কথা শ্রবণ করা মাত্র, আকাশ-স্থিত দেবতাগণ, উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "রামপুত্র উদ্র আজ সপ্তাহকাল দেহত্যাগ করিয়াছেন।" তথাগত এই সংবাদ শ্রবণে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "উদ্র ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিতে এবং দীক্ষা গ্রহণে অত্যন্ত অভিলাষী ছিলেন; কেন আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিল না?" পরে, পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাগ্রে কাহাকে দীক্ষা দিবেন, এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া কালামকে দীক্ষিত করিবেন, এইরূপ স্থির করিলেই আকাশস্থিত দেবতাগণ বলিলেন, তিনি পাঁচদিবস দেবতাগণ করিয়াছেন। তথাগত পুনরায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, নিজ অক্ষমতার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন পুনর্ব্বার কাহাকে দীক্ষা দিবেন, এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মৃগদাব-স্থিত পূর্ব্বোক্ত পাঁচব্যক্তির কথা তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইল। তখন, তথাগত বোধিবৃক্ষ ত্যাগ করিয়া, ধীর পদবিক্ষেপে এবং গম্ভীর ভাবে, প্রদীপ্ত জ্যোতিঃসহ মৃগদাবে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কেশ হইতে উজ্জ্বল জ্যোতি নির্গত হইতে লাগিল এবং তাঁহার অবয়ব সুবর্ণনির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই পাঁচ জনকে দীক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রসন্ন চিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহারা দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া নিম্নোক্ত প্রকারে কথোপকথন করিতে লাগিলেন "এই স্থানে, সেই সর্ব্বার্থসিদ্ধ আসিতেছেন; তিনি বহুবৎসর ধরিয়া মোক্ষলাভের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন; এইক্ষণ তাঁহার শিথিলতা আসিয়াছে এবং আমাদিগকে শিষ্য করিবার উদ্দেশ্যে এই স্থানে উপস্থিত হইতেছেন। আমরা উঁহাকে দেখিয়া দণ্ডায়মান হইব না বা সম্মান করিব না। আমরা নিঃশব্দে উপবেশন করিয়া থাকি।"

তথাগত, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে, তাঁহার দর্শনে সকল জীব অভিভূত হইল এবং উপরোক্ত ব্যক্তিগণ, নিজ নিজ প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং ভক্তিভাবে অনুগত হইল। তথাগত, ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন; বর্ষাকাল অতিবাহিত হইলেই তাহারা বোধিবৃক্ষের ফল লাভ করিল।

মৃগদাবের ২.৩ লি পূর্ব্বে, আমরা একটী স্তূপে উপস্থিত হইলাম। ইহার সন্নিকটে ৮০ ফুট পরিধি বিশিষ্ট একটী শুষ্ক জলাশয় আছে। এই জলাশয়ের এক নাম "মৃত সঞ্জীবনী"; অপর নাম "অনুরাগী প্রভু।" এ সম্বন্ধে প্রাচীন কিংবদন্তী এইরূপ। বহু-বৎসর পূর্ব্বে, এই জলাশয়ের সন্নিকটে, এক বৃদ্ধ তপস্বী লোকালয় হইতে দূরে নির্জ্জনে বাস করিতেন। তিনি যাদুবিদ্যা আয়ত্ত করিতেন এবং ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক খণ্ডকে মূল্যবান প্রস্তরে এবং মনুষ্য ও অন্যান্য জন্তুকে ভিন্নাকারে পরিণত করিতে পারিতেন।

কিন্তু তিনি আকাশমার্গে গমনাগমনে বা ঔষধিদের গুপ্ত উদ্ভিদ আহরণে সক্ষম ছিলেন না। পরে, আমাকৃত গ্রন্থপাঠ করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, যে সকল ঋষিগণ দীর্ঘজীবন লাভের প্রক্রিয়া জানেন, তাঁহারাই উর্দ্ধে আরোহণ করিতে পারেন। এবিষয় শিক্ষা করিতে হইলে, প্রথমতঃ দশফুট পরিধি বিশিষ্ট একটী বেদী নির্ম্মাণ করিতে হইবে; পরে কোন বিশ্বাসী ও সাহসী বীর, দীর্ঘ তরবারি হস্তে, বেদীর এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া, শ্বাস প্রশ্বাস স্থির করিয়া রাখিবেন। যিনি ঋষি হইবার ইচ্ছা করেন, তিনি বেদীর মধ্যস্থলে বৃহৎ ছুরিকা হস্তে উপবেশন করিয়া যাদু মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সংলগ্নিকে লক্ষ্য রাখিবেন। অকস্মাৎ, তাঁহার হস্তস্থিত ছুরিকা, মরুমচিত তরবারিতে পরিণত হইবে এবং তিনি উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া আকাশমার্গে বিচরণ করিতে থাকিবেন এবং ঋষিগণের উপর আধিপত্য করিবেন। হস্তস্থিত তরবারি ঘুরাইয়া, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পূর্ণ হইবে এবং তিনি জরা,বৃদ্ধত্ব এবং মৃত্যু হইতে মুক্ত হইবেন। পূর্ব্বোক্ত যাদুকর, এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, "অনুরাগী প্রভু"র অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। বহুবৎসর ধরিয়া অনুসন্ধানেও তিনি কৃতকার্য্য হইলেন না। অবশেষে, কোন নগরে একব্যক্তি কাতরভাবে ক্রন্দন করিতেছে দেখিতে পাইলেন। যাদুকর, এই ব্যক্তির শরীর-চিহ্ন দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি জন্য ক্রন্দন করিতেছ এবং কি জন্য তুমি এত ব্যথিত হইয়াছ?" সে ব্যক্তি উত্তর করিল "আমি দরিদ্র এবং অর্দ্ধাহারে এবং অনাশোপবাসের জন্য আমাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইত। কোন ব্যক্তি আমাকে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া এবং আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী জানিয়া, আমার পরিশ্রমানুযায়ী বেতন দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া পাঁচবৎসরের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেন। ইহাতে আমি ধৈর্য্যসহকারে কার্য্য করিতে থাকি। পাঁচবৎসরান্তে, এক দিবস প্রাতঃকালে, আমার সামান্য ত্রুটীর জন্য আমাকে বেত্রাঘাত করিয়া এবং বেতন স্বরূপ এক পয়সাও না দিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। এই কারণে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। অহো! কে আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করিবে?"

যাদুকর, উহাকে তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং নিজ কুটীরে উপস্থিত হইয়া, যাদুবিদ্যা দ্বারা তিনি সুস্বাদু খাদ্য আহরণ করিয়া তাহাকে জলাশয়ে অবগাহন করিতে আদেশ দিলেন। পরে তিনি তাহাকে নূতন বসন প্রদান করিলেন এবং পাঁচশত স্বর্ণ মুদ্রা দান করিয়া নিম্নোক্ত মর্ম্মে সম্বোধন করিয়া বিদায় দিলেন,—"যখন ইহা নিঃশেষিত হইবে তখন এই স্থানে আগমন করিয়া, বিষাদমুক্ত হইয়া পুনরায় প্রার্থনা করিবে।" অতঃপর, তিনি তাহাকে সর্ব্বদাই উপহার দিতে লাগিলেন এবং গোপনে নানা প্রকার উপকার করিতে লাগিলেন; ইহাতে সে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইল এবং এই সকল উপকারের জন্য প্রাণদিতেও কুণ্ঠাবোধ করিত না। এই বিষয় বুঝিতে পারিয়া যাদুকর তাহাকে বলিলেন "আমি একজন উৎসাহী ব্যক্তি চাই। বহুবৎসর ধরিয়া আমি এইরূপ ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়াছি; অবশেষে সৌভাগ্য বশতঃ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি দেখিতে সুন্দর এবং অপরের তুল্য নও। এইক্ষণ, আমি প্রার্থনা করি, যে তুমি নিস্তব্ধ থাকিয়া এক রাত্রি প্রহরীর কার্য্য কর।"

ভারতে নাট্যের উৎপত্তি।

দৃশ্য কাব্যের সাহিত্যিক উৎপত্তি।

ভারতীয় নাটককার সাহিত্যিক লক্ষণসমূহ কিরূপে প্রকাশ পাইল—ভারতীয় নাট্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে তাহার ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্য জাতীয় রচনাসমূহের ন্যায় নাট্য জাতীয় রচনার পূর্ব্ববর্ত্তী রচনাগুলি বহুকাল যাবৎ লোপ পাইয়াছে। সাহিত্য ও সাহিত্যিক ইতিহাস যে বিষয়ে নিরুত্তর, আমাদের সংগৃহীত কতকগুলি প্রমাণ-লেখা ও সাক্ষ্য সেই শূন্য নিরুত্তরতাকে পূরণ করিতে সমর্থ।

গোড়া ধরিতে গেলে ভারতীয় দৃশ্যকাব্য মহাকাব্যের খুব কাছাকাছি। সম্ভবত ভারতীয় দৃশ্যকাব্য মহাকাব্য হইতে প্রসূত;—অন্তত মহাকাব্য হইতে বিকাশলাভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদিগের বর্ণিত পুরাতন ইতিহাস, দুই জাতীয় রচনার পর্য্যবসিত —এক—মহাকাব্য, দ্বিতীয়—নাটক।

কালিদাসের রঘুবংশ—বাল্মীকির রামায়ণের অনুরূপ, এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তলা পুরাতন কুশীলবদিগের অভিনয়ের অনুরূপ। সাহিত্যদর্পণে মহাকাব্যের লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—"মহাকাব্য সর্গবদ্ধ হইবে; উহার একটি নায়ক দেব-বিশেষ হইবে; অথবা ধীরোদাত্তগুণান্বিত সদ্বংশ ক্ষত্রিয় হইবে। একবংশপ্রসূত অনেক নৃপতি উহার নায়ক হইবে। শৃঙ্গার, বীর, শান্ত—এই রসগুলি উহার অঙ্গী হইবে এবং অন্য সমস্ত রস উহার অঙ্গ হইবে। উহাতে নাটকসন্ধিগুলি সমস্তই থাকিবে। উহার বৃত্তান্ত, ইতিহাস বা সজ্জনাশ্রয় অন্য কোন বিষয় হইতে উৎপন্ন হওয়া চাই। উহাতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ থাকিবে, উহার মধ্যে একটি ফলস্বরূপ হইবে। আদিতে নমস্কার, আশীর্ব্বাদ বা বস্তুনির্দ্দেশ হওয়া চাই। কখন বা খলের নিন্দা কখন বা সজ্জনের গুণকীর্ত্তন থাকিবে। পদ্য এক ছন্দবিশিষ্ট হইবে, অবসানে অন্য ছন্দবিশিষ্ট হইবে। নাতিস্বল্প, নাতিদীর্ঘ এইরূপ অষ্টাধিক সর্গ থাকিবে।··· সর্গান্তে ভাবি সর্গের কথা সূচিত হইবে। সন্ধ্যা, সূর্য্য, ইন্দু, রজনী, প্রদোষ, অন্ধকার, দিবস, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, মৃগয়া, শৈল, ঋতুন, সাগর, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ, মুনি, নগর, যজ্ঞ, রণপ্রয়াণ, বিবাহ, পুত্রের জন্ম ইত্যাদি বিষয় সকল যথাযোগ্যরূপে ও সাঙ্গোপাঙ্গরূপে বর্ণিত হইবে।"

মহাকাব্যের এই লক্ষণ অবলম্বন করিয়া আমরা দুইটি মহাকাব্যগত বিষয়ের নির্ঘণ্ট নিম্নে দিতেছি। এই দুইটি মহাকাব্য দুই বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত—এমন কি দুই প্রতিপক্ষ সম্প্রদায়ভুক্ত কবির রচিত। উহার মধ্যে একটী "শ্রীকণ্ঠ চরিত"—দ্বাদশ শতাব্দীতে, কাশ্মীর প্রদেশে, মঙ্খকর্ত্তৃক রচিত; অন্যটি "ধর্ম্মচর্ম্মাভ্যুদয়",—কোন এক অজ্ঞাত যুগে হরিচন্দ্র নামক একজন জৈন কর্ত্তৃক রচিত।

শ্রীকণ্ঠ রচিত।—১। আশীর্ব্বাদ।—২। বনশালী ও দুষ্ট লোকদিগের বর্ণনা।—৩। দেশ ও জাতি প্রভৃতির বর্ণনা।—৪। কৈলাস-পর্ব্বতের বর্ণনা।—৫। মহাপ্রভুর বর্ণনা।—

৬। বসন্তকালের সাধারণ বর্ণনা। ৭। বাস বাড়ির বর্ণনা।—৮। পুষ্পচয়নের বর্ণনা। —৯। জলক্রীড়ার বর্ণনা।—১০। প্রদোষ বর্ণনা।—১১। চন্দ্রের বর্ণনা। ১২। চন্দ্রোদয়ের বর্ণনা।—১৩। প্রসাধনের বর্ণনা। —১৪। পান-বিনোদের বর্ণনা।—১৫। বিবিধ ক্রীড়ার বর্ণনা।—১৬। উষা বর্ণনা। —১৭। পরমেশ্বরের সহিত পুনর্মিলনের বর্ণনা।—১৮। গণদিগের সংমিশ্রনের বর্ণনা। —১৯। গণদিগের সমুত্থানের বর্ণনা। —২০। রথসজ্জার বর্ণনা। —২১। গণদিগের বনযাত্রার বর্ণনা।—২২। দৈত্য-পুরীর বিভ্রাট বর্ণনা।—২৩। যুদ্ধ বর্ণনা।—২৪। ত্রিপুরদহনের বর্ণনা।—২৫। গ্রন্থকার ও তাঁহার মিত্রমণ্ডলীর বর্ণনা।

ধর্ম্মচর্য্যানুবাদ।—১। আশীর্ব্বাদ। ধনাঢ্য ও পুণ্যলোকদিগের বর্ণনা। জম্বুদ্বীপের বর্ণনা। মেরুবর্ণনা। ভারতবর্ষের বর্ণনা। আর্য্যাবর্ত্তের বর্ণনা। উত্তর কোশল রাজ্যের বর্ণনা। রত্নপুরের বর্ণনা।—২। রাজার, রাজবংশের, ও রাজমহিষীর বর্ণনা। রাজা পুত্রলাভের জন্য ইচ্ছুক হইলেন। একজন মুনির আগমন। বর্ণনা।—৩। রাজা মুনির অন্বেষণে গেলেন। বন, উপবন ও মুনির বর্ণনা। মুনি রাজাকে জানাইলেন শীঘ্রই তাঁহার একটি পুত্র জন্মিবে।—৪। ধর্ম্মনাথের পূর্ব্বজন্ম। বৎসদেশের, সুসীমা-নগরের ও রাজা দশরথের বর্ণনা। দশরথ রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন। একজন সচিব কর্ত্তৃক চার্ব্বাক্ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা। রাজার তপস্যার বর্ণনা।—৫। রাজা মহাসেনের রাজসভায় অপ্সরাদিগের অবতরণ; বর্ণনা। উহারা স্বপ্নযোগে রাণীকে দর্শন দিলেন; স্বপ্নের বর্ণনা। ধর্ম্মনাথ রাণীর গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন।—৬। রাজকুমারের জন্ম। এই উপলক্ষে ইন্দ্রকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত উৎসবের বর্ণনা।—৭। জন্মিবামাত্রই দেবগণ ধর্ম্মনাথকে তুলিয়া সুমেরু পর্ব্বতে লইয়া গেলেন। পর্ব্বতের বর্ণনা। দেবগণ সেইখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অশ্ব গজাদির বর্ণনা।—৮। ধর্ম্মনাথের সংস্কারক্রিয়া। পরে দেবগণ ধর্ম্মনাথকে স্বকীয় জননীর নিকট প্রত্যর্পণ করিলেন।—৯। ধর্ম্মনাথের বাল্য ও যৌবনের বর্ণনা। স্বয়ম্বর ঘোষণা। অনুচরবর্গ লইয়া রাজকুমার তথায় গমন করিলেন; প্রয়াগের বর্ণনা। গঙ্গার সহিত সাক্ষাৎকার বর্ণনা।—১০। বিন্ধ্যাচলের বর্ণনা।, ১১। ঋতু বর্ণনা। ১২। পুষ্পচয়নের বর্ণনা।—১৩। নর্ম্মদা নদীতে জলক্রীড়া। ১৪। সন্ধ্যা বর্ণনা; ক্রীড়াকলাপ ও রাত্রির বর্ণনা। ১৫। উষা বর্ণনা। ধর্ম্মনাথের বিদর্ভদেশে গমন। বিদর্ভ দেশের বর্ণনা।—১৬। স্বয়ম্বর বর্ণনা; রাজকুমারী ধর্ম্মনাথকে বরণ করিলেন। সমারোহ-সহকারে রাজধানীতে প্রবেশ। রমণীদিগের গতিভঙ্গীর বর্ণনা; বিবাহের বর্ণনা; বিমানারোহণে রাজকুমারের পিত্রালয়ে যাত্রা; যাত্রাপথের বর্ণনা। ১৮। রত্নপুরে উৎসবাদির বর্ণনা। রাজা মহাসেন সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। পুত্রের নিকট নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিলেন। ধর্ম্মনাথের যৌবরাজ্যাভিষেকের বর্ণনা। স্বকীয় পিতার সন্ন্যাস গ্রহণ বর্ণনা। ১৯। ধর্ম্মনাথের সেনাপতি কর্ত্তৃক প্রভৃত যুদ্ধাদির বর্ণনা।—২০। উষা বর্ণনা। ধর্ম্মনাথও সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন;

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, দেবগণের মধ্যে রাজত্ব করিবার জন্য গমন করিলেন, দেব-সভার বর্ণনা।—২১। জৈন মতের ব্যাখ্যা।

আমরা ইচ্ছা করিয়াই দ্বিতীয় শ্রেণীর দুইটি মহাকাব্য দৃষ্টান্তস্বরূপ নির্ব্বাচন করিয়াছি; কেন না, ঐ দুইটি মহাকাব্যে অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রচলিত উপাদানগুলি স্পষ্টরূপে সন্নিবিষ্ট আছে; কোন প্রতিভাবান গ্রন্থকার আপনার মানস-ভাণ্ডার হইতে নূতন রত্ন বাহির করিয়া যেরূপ মৌলিকতার পরিচয় দেন—উহাতে সেরূপ কোন মৌলিকতা নাই। বাস্তবপক্ষে যদি আমরা কালিদাসের রঘুবংশ, ভারবীর কিরাতার্জ্জুনীয়, তাহার সমসাময়িক মাঘের শিশুপালবধ প্রভৃতি সংস্কৃত মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখি তো দেখিতে পাইব, উহাদের সকলের মধ্যেই একই ধরণের প্রাসঙ্গিক বর্ণনার বাহুল্য এবং বিষয়-সম্বন্ধে একই প্রকার বৈচিত্র। নাট্যগ্রন্থগুলিতে আখ্যানবস্তু ও বর্ণনা এই উভয়ের মধ্যে পরিমাণ-বৈষম্য দেখিয়া-দেখিয়া ক্লান্ত হইতে হয়। যে সকল বিষয় মহাকাব্যের আলোচ্য সেই বিষয়গুলির তালিকা প্রায় অবিকল, নাট্য সাহিত্যের উপদেশের মধ্যেও ভুক্ত করা যাইতে পারে। তা ছাড়া, সেই একই রকমের প্রাসঙ্গিক বর্ণনা উক্ত সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মধ্যেও দৃষ্ট হয়। কথা ও আখ্যায়িকায়, একটা বর্ণনামালা ন্যূনাধিক নিপুণতা সহকারে আখ্যানবস্তুর সহিত যুড়িয়া দেওয়া হয়। বাণ-কবি যাহার প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন এবং অনুকরণ করিয়াছেন সেই সুবন্ধুপ্রণীত গ্রন্থ বাসবদত্তাকে দুই পৃষ্ঠার মধ্যে সহজে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে;—উহাতে কতকগুলি উপাখ্যান ও কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ আছে মাত্র। ঋতু ও ঋতুর পরিবর্ত্তনের বর্ণনা করিয়া এই আখ্যায়িকা-টিকে যদৃচ্ছাক্রমে বাড়ান হইয়াছে। বর্ষঘটিত পরিবর্ত্তন, আকাশের জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী, দিবারাত্রি, সূর্য্যের উদয় ও অস্ত—এই সমস্ত বিষয় লইয়া রাশিরাশি কৃত্রিম গুণবাচক সংজ্ঞা ও উদ্ভট উপমার দ্বারা উহাকে ভারাক্রান্ত করা হইয়াছে। সাধারণ ধরণের প্রসঙ্গাদি একবার নিঃশেষিত হইয়া গেলে, আখ্যায়িকাটি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বর্ণনার মধ্যে বিদ্ধ্যা চল, নর্ম্মদা এবং উহাদের চিত্রবৎ শোভা সৌন্দর্য্য অবশ্যই একটা গৌরবের স্থান অধিকার করিতে পারে। কিন্তু সুবন্ধু ঐ সমস্ত বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াও কৃতকার্য্য হয়েন নাই।" (১) বাণ যে গ্রন্থে স্বীয় আশ্রয়দাতা কনৌজের রাজা হর্ষবর্দ্ধনের চরিতাখ্যান লিখিয়াছেন সেই হর্ষচরিত গ্রন্থের দুই শত পৃষ্ঠার মধ্যে, ইতিহাস দশ পৃষ্ঠাও অধিকার করিয়াছে কিনা সন্দেহ।

অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে সকল অবস্থা শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে সেই বিবিধ অবস্থায় অবস্থিত প্রেমিকদিগের বর্ণনা নাট্য-কবিদিগের একটা সাধারণ বর্ণনীয় বিষয়—এই বিষয়টি উত্তরাধিকারসূত্রে নাটকে আসিয়া বর্ত্তিয়াছে। স্বয়ং কালিদাস হইতেও আমরা ইহার উৎপত্তির আভাস পাই। শকুন্তলার সখীগণ প্রতিদিন দেখিতেছেন,—দৈহিক তাপের বৃদ্ধি হইতেছে, শকুন্তলা দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন, কষ্ট পাইতেছেন। শকুন্তলা গুপ্ত প্রেমের

(১) Hall—বাসবদত্তার ভূমিকা, পৃ ২১—২৮

কথা সখিগণের নিকট প্রকাশ করিতে সাহস পাইতেছেন না। কিন্তু অনুসূয়া প্রকৃত ব্যাপারটা আবিষ্কার করিল; "দেখ শকুন্তলে, মদন-ব্যাপারের রহস্য আমরা কিছুই বুঝিনে, কিন্তু ইতিহাসকথায় বিরহীজনের অবস্থা যেরূপ শুনতে পাই, তোমার যেন সেইরূপ হয়েছে। (২) নাটক ও মহাকাব্যের ন্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে, আর একজাতীয় রচনা আছে যাহাকে বিলাপ-কাব্য (Elegy) বলা যাইতে পারে।

সংস্কৃত সাহিত্যে, কালিদাসের একটি উৎকৃষ্ট কাব্য মেঘদূতই, এই জাতীয় রচনার আরম্ভ। একজন নির্ব্বাসিত ও বিরহী যক্ষ একটি মেঘখণ্ডের নিকট তাহার অনন্ত ও বিষাদময় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া দূতস্বরূপ তাহাকে তাহার প্রিয়তমার নিকট প্রেরণ করিতেছে। এই জাতীয় একটি পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা প্রাকৃত-ভাষায় সংরক্ষিত আছে।—"সপ্তশতক" নামক হাল কর্ত্তৃক সংকলিত একটি কবিতা-মালা। ইহা ৭০০ শ্লোকে বদ্ধ। ইহাতে পাত্রগুলির প্রণয়ব্যাপার অলঙ্কারশাস্ত্রের লক্ষণানুরূপ। নায়ক, নায়িকা, বন্ধু, সখী, দূতী ইত্যাদি সকলেই এরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে আদিরসের বিবিধ ভাব প্রকাশ করিতেছে যে ভরতের অপেক্ষাকৃত আধুনিক শিষ্যদিগেরও বিলক্ষণ ঈর্ষা হইতে পারে।

যাহা অন্যান্য সমস্ত জাতীয় রচনার উত্তরাধিকারী অথবা অনেক সেই নাটককে আলঙ্কারিকগণ সাহিত্যিক রচনার যে আদর্শ-রূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন—নাটক সেই আদর্শ-উপাধির যোগ্য সন্দেহ নাই। অলঙ্কার-শাস্ত্রের একটি প্রাচীনতম গ্রন্থ—বামন-প্রণীত "কাব্যালঙ্কার-সূত্র-বৃত্তি", এই সম্বন্ধীয় সাধারণ মতটিকে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছে; "সমস্ত সাহিত্যিক রচনার মধ্যে নাট্যের দশরূপই শ্রেষ্ঠ (রূপক, নাটক ইত্যাদি)। একটি বহুবর্ণ চিত্রের ন্যায়, উহাতে অন্যান্য জাতীয় রচনার সমস্ত লক্ষণগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।"

(সমাপ্ত)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাতৃঋণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রুডিক-গৃহে।

কারখানায় কাজ শিখিতে আসিয়া জাক অস্থির হইয়া পড়িল। চারিধারে অবিরাম ভীষণ কোলাহল,—পার্শ্বের লোকের কথা শুনা যায় না। তিন শত বড় মুগুরের ঘা পড়িতেছে, তাহার সহিত তিনশত ব্যক্তির উৎসাহ-প্রয়োচক উচ্চ চীৎকারধ্বনি উঠিতেছে। তদ্ভিন্ন কোন ধারে অবিশ্রাম-গতিতে বড় বড় চাকা ঘুরিতেছে—কোন খানে বা বাষ্প-নির্গমনের সুভীষণ শব্দ—মুহূর্ত্ত বিরাম নাই!

কারখানার মধ্যে রুক্ষকেশ মলিনবেশ কুৎসিত কারিকরের দল—কেহ ছাপরে কাজ করিতেছে—কেহ চাকায় তৈল প্রদান করিতেছে—কেহ চাকা ঘুরাইতেছে—কেহ বা

* শকুন্তলা—তৃতীয় অঙ্ক।

হাতুড়ি পিটিতেছে। ইহাদের সহিত একত্র দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া জ্যাক নূতন জীবন আরম্ভ করিয়াছে! তাহার মস্তক বহিয়া ললাট বহিয়া ঘর্ম্মধারা ঝরিয়া পড়িতেছে—হাতে মুখে কালি লাগিয়াছে—বেশভূষাও নিতান্ত বিশ্রী! এই সুরম্য ভেদ করিয়া সার্লটির দৃষ্টি যদি জ্যাকের উপর নিক্ষিপ্ত হইত ত সে আপনার পুত্রকে চিনিতে পারিত না! এই কি জ্যাক? শীর্ণ, মলিন, এক বালক, হাতের উপর ছিন্ন জামার আস্তিন গুটান, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, চোখ দুইটা লাল, গণ্ড ও গলদেশের ভাঁজে ভাঁজে সূক্ষ্ম কয়লার গুঁড়া পড়িয়া মনে হইতেছে, কে কালির দাগ কাটিয়া দিয়াছে! জ্যাকের এ মূর্ত্তি দেখিলে সার্লটি নিশ্চয়ই শিহরিয়া উঠিত, সন্দেহ নাই!

জ্যাকের শিক্ষার ভার পড়িয়াছিল, শিবসাদ নামে এক সর্দ্দার কারিকরের উপর। শিবসাদের প্রকৃতি ছিল উগ্র, কর্কশ। জ্যাকের এই শান্ত নিরীহভাব, কারখানার কঠোর কার্য্যের পক্ষে তাহার এই অপটুতা শিবসাদের প্রাণে এতটুকু করুণতার পরিবর্ত্তে ঘৃণা ও বিরক্তির উদ্রেক করিত! তাহার কঠিন পরুষ দৃষ্টির সম্মুখে বালক আরও থতমত খাইয়া যাইত। তথাপি সে সাধ্যমত আপন কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে চেষ্টা করিত। হাতে ফোস্কা পড়িয়া যন্ত্রণা হইলেও সে আদেশমত কার্য্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইত না। সে আপনাকে এই কারখানার প্রকাণ্ড যন্ত্রগুলারই একটা অংশবিশিষ্ট মনে ভাবিয়া কাজ করিত। এই যন্ত্রগুলার যেমন সুখ, দুঃখ, অনুরাগ, বিরাগ নাই, মানুষের আদেশমত চলাফেরা করিয়া মানুষের কাজটুকু সম্পন্ন করিয়া দেওয়াই তাহাদিগের কর্ত্তব্য, কখনও কোন অনুযোগ-অভিযোগের ধার ধারে না, ধারিলেও তাহা কেহ গ্রাহ্য করিবে না, তাহার অবস্থাও তেমনই! তাহারও সুখ নাই,—দুঃখ নাই, সর্দ্দারের আদেশমত ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যই সমাধা করিয়া দেওয়াই তাহার কর্ত্তব্য! তাহার আবার অনুযোগ কি? অভিযোগই বা কি থাকিতে পারে?

কি দুর্ব্বিসহ এ জীবন! বিশেষতঃ গত দুই বৎসরের মুক্ত স্বাধীন জীবন-প্রবাহের পর এ কি কঠোর বন্ধন! এ যে নিতান্ত অসহ্য! হউক অসহ্য, তবু মুক্তি নাই—উপায়ান্তর নাই।

প্রত্যূষে পাঁচটা বাজিতে না বাজিতে রুডিক তাহার নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিত, "জ্যাক, কারখানার সময় হল—উঠে পড়।" নিদ্রিত নিস্তব্ধ গৃহের দেওয়ালে-দেওয়ালে সে স্বর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত। এক টুকরা রুটি দ্রুত নিঃশেষ করিয়া, ক্লারিসার প্রদত্ত জলে গলা ভিজাইয়া রুডিকের সহিত জ্যাক পথে বাহির হইয়া পড়িত। ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়া তখন সূর্য্যের প্রথম রশ্মিচ্ছটা জগতে নামিবার জন্য পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছে—ভোরের পাখী বাসা হইতে বাহির হইবার আয়োজন করিতেছে, চারিধারে আকাশ নদী ও বন্দরের বক্ষে জীবনের স্পন্দন আবার অল্প সূচিত হইবার উপক্রমে করিতেছে এবং কারিকরের শান্তি ভাঙ্গাইয়া প্রাণ কাঁপাইয়া কারখানার ঘণ্টা অবিশ্রাম ঢং ঢং শব্দ করিয়া তাহাদিগকে কর্ত্তব্যে সচকিত করিয়া দিতেছে!

কারখানার নির্দ্দিষ্ট হাজিরার সময়ের দশমিনিট পরে প্রবেশদ্বার বন্ধ হয়—ঘণ্টাও থামিয়া যায়! এই সময়ের মধ্যে পৌঁছিতে না পারিলে প্রথম অপরাধে জরিমানা, দ্বিতীয়বারে মাহিনা কাটিয়া লওয়া হয়—তৃতীয়বার এ অপরাধ করিলে কারখানা হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। জ্যাকের মনে হইত, আর্জেন্তর নিয়ম যতই কঠিন ও নির্দ্দয় হউক না কেন, ইহার তুলনায় তাহা কিছুই নহে!

একটা বিষয়ে জ্যাকের বড় ভয় ছিল—পাছে কোনদিন ঠিক সময়ে কারখানায় হাজিরা দিতে সে না পারে! সেইজন্য সময়ের কিছু পূর্ব্বে—অপর কারিকরদিগের পৌঁছিবার প্রাক্কালেই কারখানার প্রবেশদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইত! একদিন শুধু কয়েকটা কারিকরের চটীমিতে তাহার বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। সেদিন ভোরে বেশ একটু জোরে বায়ু বহিতেছিল—পথে জ্যাকের টুপি হঠাৎ বায়ুর বেগে উড়িয়া যায়। পশ্চাতে কয়েকটা কারিকর আসিতেছিল—তাহারা উল্লাসে চীৎকার করিয়া টুপিটাকে লোফালুফি করিতে করিতে অনেক দূরে ফেলিয়া দিয়াছিল—বেচারা জ্যাক বহুকষ্টে টুপি, উদ্ধার করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখে, কারখানার দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেদিন তাহার কষ্টের সীমা ছিল না। বেচারা ফটকের সম্মুখে বসিয়া পড়িল। চোখের জল বাধা মানিল না। সে ভাবিল, সে কি করিয়াছে—এই কারিকরগুলার কোন অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, চিন্তাতেও সে কাহারও অনিষ্ট করে না, তথাপি ইহারা জ্যাককে এত জ্বালাতন করে কেন? চারিধার হইতে অজস্র ঘৃণা, দ্বেষ হিংসা, কেন তাহার শিরে বর্ষিত হয়? সে নিতান্তই অভাগা, পরিত্যক্ত, ভাগ্যলক্ষ্মীর একান্ত উপেক্ষিত, কাহারও অধিকারে সে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না—কাহারও সুখের মাত্রা হইতে তিল অংশও সে কামনা করে না—তবু কেন হা! ভগবান ইহাদিগের বজ্রদৃষ্টি হইতে তাহার পরিত্রাণ নাই? এক শ্রেণীর তরুলতা যেমন আপন জীবনধারণের জন্য একান্তভাবে উত্তাপের মুখাপেক্ষা করে, জ্যাকও তেমনই আপনার জন্য এতটুকু স্নেহ, একটি মিষ্টকথা বা আদর-বচনের মুখ চাহিয়া থাকে, সেটুকু না হইলে জ্যাকের চলে না। কিন্তু এখানে না আছে ভালবাসা, না আছে স্নেহ! একটি বিন্দুও নাই।

আসল কথা, কারখানার লোকগুলা জ্যাককে বড় পছন্দ করিত না। এই নিরীহ-নম্র শান্ত বালক,—নারীসুলভ মুখশ্রী লইয়া কারখানায় কি করিবে? এখানে চাই পরুষ বলিষ্ঠ দেহ, অশান্ত উগ্র প্রকৃতি! কিন্তু জ্যাকের তাহা কিছুই ছিল না, কাজেই তাহার পক্ষে কারখানার সহিত খাপ খাইয়া যাওয়া একান্ত অসম্ভব! প্রত্যহই তাহাকে লইয়া বিদ্রূপ শ্লেষ চলিত। অত্যাচার নির্য্যাতনও কি অল্প ছিল? একদিন একটা তপ্ত লৌহদণ্ড লইয়া এক সঙ্গী কারিকর আসিয়া তাহাকে কহিল, "এইটে একবার ধরত, জ্যাক, আমায় সর্দ্দার ডাকছে, শুনে আসি, শীগগির!" বেচারা জ্যাক সরলভাবে সে অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া এমন হাত পুড়াইয়া ফেলিল যে তাহার ফলে একসপ্তাহ তাহাকে হাঁসপাতালে বাস

করিতে হইল! তাহার উপর, এমন দিন ছিল না, যেদিন খুসি চড় জ্যাকের অঙ্গে বর্ষণ করিতে কেহ ক্ষান্ত থাকিত!

কিন্তু সপ্তাহে একদিন ছিল, যেদিন জ্যাকের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ভাব ধারণ করিত, সেদিন তাহার ভাগ্যে আনন্দ ও বিশ্রাম মিলিত,—সেদিনটি রবিবার। এই রবিবারে প্রাতর্ভোজন শেষ করিয়া ডাক্তার রিভালের প্রদত্ত গ্রন্থরাজি হইতে দুই একখানি গ্রন্থ বাছিয়া লইয়া সে নদীর ধারে নিরালায় বসিয়া এক নূতন জগতের পরিচয় লাভ করিত! ভগ্ন জনহীন ঘাটের প্রান্তে সে বহি খুলিয়া বসিত, অদূরে ঘাটের পদতলে নদীর ঢেউ আসিয়া উছলিয়া পড়িত—যেন কোন্ অমরীর ললিত, সান্ত্বনা-বাণী ধীরে ধীরে জ্যাকের প্রাণ শীতল আশ্বাসে ভরিয়া তুলিত। সে বহির পাতা উল্টাইয়া যাইত, কতক বুঝিত, কতক বুঝিত না—তথাপি এই অজানা জগতে অস্ফুট রহস্যালোকে সে কিসের সন্ধান পাইত, তাহা সেই জানিত! ইহার মধ্যেই সে মাতার অকৃত্রিম স্নেহ, বন্ধুর অমল সৌহার্দ্দের পরিচয় লাভ করিত। বহি দেখিতে দেখিতে তাহার চিত্ত আবেশে ভরিয়া আসিত, মানসচক্ষের সম্মুখে বাহ্যজগৎ মিলাইয়া যাইত—মার মুখের বাণী, ডাক্তার রিভালের আদরের স্বর, সসিলের সুমধুর কলহাস্য, সমস্ত মিলিয়া জ্যাকের হৃদয়ে আনন্দ-নির্ঝরের সৃষ্টি করিত! বালক সেই দুর্লভ সুখাস্পর্শে সপ্তাহের অতীত ছয়টা দিনের সকল ক্লান্তি সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইত। আপনাকে অপূর্ব্ব সুখী ভাবিয়া সে পরম নিশ্চিন্ত হইত!

অবশেষে বর্ষা নামিল। হিমশীতল বায়ুর বেগ বাড়িল—তখন নদীতীরস্থ শান্তি-কুঞ্জে এই মহাতীর্থে আসিবার জ্যাকের আর কোন উপায় রহিল না। রবিবারের অবসর-মুহূর্ত্ত-গুলা নিরানন্দে কাটাইতে হইবে ভাবিয়া সে রুডিক গৃহেই অগত্যা বহি খুলিয়া বসিল।

বালকের শান্তপ্রকৃতিতে রুডিক তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ক্লারিসা জেনেরাও তাহাকে ভালবাসিত। সকল রকম ফরমাস খাটিয়া সে জেনেরার হৃদয়টিকে ভাল করিয়াই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। এই নিরীহ বালকটির উপর রুডিক পরিবারের প্রকৃতই মায়া পড়িয়াছিল। সকলেই তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত। জ্যাকের কর্ম্মসঙ্গীগুলা তাহার অসমতা লইয়া যখন রুডিকের নিকট অনুযোগ করিতে আসিত, রুডিক তখন মৃদু হাসিয়া জ্যাকের পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিত, "বড় ভালমানুষ বেচারা।"

রুডিক ভাবিত, লেখাপড়া লইয়াই বালক থাকিতে ভালবাসে—এ সব কঠিন কাজ উহার শক্তিতে কুলাইবে কেন? কারখানায় না আসিয়া যদি স্কুলের শিক্ষক বা পাদ্রী হইবার সে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে লেখা-পড়া ভাল ছিল—কিন্তু কারখানার কাজ করিয়া যখন তাহাকে জীবিকার সংস্থান করিতে হইবে, তখন এ লেখাপড়ার অনুরাগটা কিছু কমাইলেই ভাল হয়! জ্যাককে একবার সে এই বিষয়টার আভাষও দিয়াছিল, তাহাতে জ্যাক তাহার পানে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া করুণ স্বরে বলিয়াছিল, "আমি ত আর কখন বই পড়ি না, শুধু ছুটির দিন একটু পড়ি—মার জন্যে মন কেমন—" জ্যাকের স্বরটুকু ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহার বক্তব্যটিকে

সম্পূর্ণ করিতে দিল না। রুডিকের প্রাণে সেই কাতর দৃষ্টি, সেই করুণ সুর, তীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় বিঁধিয়াছিল, তাহার পর সে জ্যাককে দ্বিতীয় বার আর গ্রন্থ পাঠ হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা পায় নাই।

সেদিন বর্ষার রবিবার যখন ম্লানভাবে আসিয়া দেখা দিল—বারিধারে নিরানন্দ অবসাদে আচ্ছন্ন হইল, তখন ক্লারিসা আসিয়া জ্যাককে কহিল, "ও কি বই পড়ছ, জ্যাক?"

জ্যাক বলিল, "একটা গল্প!"

"চেঁচিয়ে পড় না—আমি শুনি।"

জ্যাক তখন তাহার এই নবাগতা শ্রোত্রীর চিত্তবিনোদনার্থ গল্প পড়িয়া যাইতে লাগিল। কত বিচিত্র সে বেদনাহর্ষের কাহিনী—কত আশা নিরাশার মধ্য দিয়া কত প্রমোদ স্বপ্ন যৌবনগীতির উন্মাদ বহিয়া চলিয়াছে—গল্প শেষ হইলে জ্যাক দেখিল, তাহার শ্রোত্রী কাহিনী-বর্ণিত নরনারীর দুঃখে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে!

ইহার পর হইতে যখনই জ্যাক বহি পড়িত তখনই ক্লারিসা আসিয়া সাগ্রহে তাহার বহি শুনিত। এই মুগ্ধা অনুরক্তা শ্রোত্রীটির উপর জ্যাকের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। পূর্ব্বে সে বহি পড়িত, আপনার সুখের জন্য—এখন হইতে ক্লারিসাকে গল্প পড়িয়া শুনাইয়া তাহার যে সুখ হইতে লাগিল, তাহা অননুভূতপূর্ব!

ক্লারিসার প্রকৃতিতে কেমন একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল। রুডিকগৃহ যেন তাহার পক্ষে ঠিক উপযুক্ত স্থান নহে। সে যেন কোন স্বপ্নলোক হইতে এই রুদ্রলোকে তারার মত ঝরিয়া পড়িয়াছে! এখানকার এই পঙ্কবতার মধ্যে তাহার কান্ত কোমলশ্রী দেখিলে মনে হইত—সে যেন এখানকার কেহই নহে! তাহার পরিচ্ছন্ন সুশ্রী বেশ, কমনীয় হাবভাব, কেমন এক বিশেষত্বে মণ্ডিত! ইহা লইয়া পল্লীতে জাগাঘুষা চলিত—নিন্দুকের দল রুডিককে একটু করুণার চক্ষে দেখিত—ভাবিত, আহা বেচারা রুডিক! যে স্ত্রীকে সে একান্তভাবে বিশ্বাস করিয়া আপনারই ভাবিয়া রাখিয়াছে, সে—!

নিন্দুকের কথাগুলার কি কিছু সত্য নিহিত ছিল না? কে জানে! নিন্দুকের নিন্দায় ক্লারিসার সহিত শেষে নার্ভের নামটাও জড়িত হইয়া গিয়াছিল! এ নিন্দা রুডিকের শ্রুতিকেও আঘাত করিয়াছিল—কিন্তু সে সরল বিশ্বাসীর চিত্তকে এতটুকু নাড়া দিতে সক্ষম হয় নাই!

ক্লারিসার স্বপক্ষে এইটুকু বলা যাইতে পারে, সে নার্ভেকে বিবাহের পূর্ব্ব হইতে চিনিত। পরস্পরের মধ্যে বন্ধনটুকু প্রীতিমধুরও ছিল! ক্লারিসার পিতৃগৃহে নার্ভে নিত্য অতিথি ছিল—তাহার বহু অলস অবসর এককালে ক্লারিসার সহিত সুখদুঃখের গল্পে কাটিয়াছিল; এবং রুডিক যদি তাহাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না করিত, তাহা হইলে নার্ভের সহিত তাহার পরিণয় হইয়া যাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু রুডিকের সহিত ক্লারিসার বিবাহের পূর্ব্বে নার্ভে বুঝিতে পারে নাই, ক্লারিসা এমন! নার্ভে পূর্ব্বে দেখে নাই, ক্লারিসা এত সুন্দরী তাহার সজ্জিত সুন্দর সুঠাম দেহে এমন লাবণ্যের রাশি ঝরিয়া পড়িয়াছে! কি অন্ধ, নির্ব্বোধ অভাগা সে!

বিবাহের পর ক্লারিসা ও নার্ভের বন্ধুত্ব

হ্রাস না হইয়া বাড়িয়াই চলিয়াছিল! রুডিক নিদ্রিত হইলে কত অম্লান জ্যোৎস্নারাত্রি উভয়ে গল্প করিয়া কাটাইয়াছে। পাড়ার লোক রুডিকের কাণে এ কথা তুলিলে রুডিক বলিত, "দোষ কি? নাহেঁত আমার ভাই!" পাড়ার লোক হাসিয়া মুখ ফিরাইত, পরস্পরকে ডাকিয়া বলিত, "আহা বেচারা বেচারা, রুডিক!"

নিন্দুকের নিন্দায় একজন বিচলিত হইয়াছিল, সে জেনেদা! জেনেদা অলক্ষে উভয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিত—জেনেদার সমস্ত প্রাণ দানবী হিংসায় জ্বলিয়া উঠিত—নিষ্ফল আক্রোশে প্রাণের জ্বালা প্রাণের মধ্যেই সে চাপিয়া রাখিত, ভাবিত, "এ কি গ্রহ—এ কি পাপ!" তাই যখন ম্যানেজারের চেষ্টায় নাস্তে এ গৃহ ছাড়িয়া দেশান্তরে চাকরি করিতে গেল, তখন সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ হইল, জেনেদার! বিজয়ীর গর্ব্ব অনুভব করিয়া জেনেদা তখন মনে মনে ভাবিল, "চমৎকার!" তাহার পিতার গৃহ এ দুর্বৃত্তের পাপ হইতে এবার নিস্তার পাইল! এ কি জয়! কি আনন্দ!

সেদিন রবিবার। জ্যাক কাব্য পাঠ করিতেছিল। এবার ক্লারিসা একেলাই শুধু তাহার শ্রোত্রী ছিল না—রুডিক ও জেনেদাও বসিয়া কাব্য শুনিতেছিল। দুই এক ছত্র শুনিতে না শুনিতেই রুডিক ঘুমে ঢুলিয়া পড়িয়াছিল। ক্লারিসা ও জেনেদা একান্ত আগ্রহে নিস্পন্দ মনোযোগ সহকারে কাব্য শুনিতেছিল! ফ্রান্সেসকা রিমির করুণ গাথা! জ্যাক যখন পড়িতেছিল,—

"দুঃখ এল যক্ষ চেপে ধরে,
প্রতি শিরা গ্রন্থি উঠে দহি—
তবু, অতীত সে সুখের স্মৃতি চিতে
মর্ম্মের এ দুঃখ কিসে সহি!"

তখন ক্লারিসার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল,—সত্য, দুঃখ কোনমতে সহ্য হয়, কিন্তু দুঃখের দিনে অতীত সুখের স্মৃতি যখন প্রাণের মধ্যে গুমরিয়া মাথা দিয়া উঠে, তখন সে দুঃখ—কি করিয়া রুধিয়া রাখি—সে যে একান্ত অসহ্য!

জ্যাক পড়িয়া যাইতেছিল। কবির ছত্র হইতে যেন অগ্নি ঠিকরিয়া পড়িতেছিল—এই যে বাসনার তীব্র উচ্ছ্বাস, নিরাশার করুণ তান, জ্যাকের কণ্ঠ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছিল, ক্লারিসার মনে হইতেছিল, সেগুলা শুধু কথা নহে—সেগুলা যেন জীবন্ত—যেন জ্বলন্ত অগ্নি-কণা,—গৃহের চারিধারে ঘুরিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে!

ক্লারিসার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছিল। প্রেমের এই করুণ কাহিনী তাহার চিত্তকে একেবারে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। কাহিনী সমাপ্ত হইলে, জেনেদা কহিল, "কি দুষ্ট ঐ মেয়ে মানুষটা—এমন ভাবে আপনার পাপের কথা প্রকাশ করতে তার এতটুকু লজ্জা হল না—এমন সতেজে বলে গেল।"

ক্লারিসা কহিল, "দুষ্ট হোক, যাই হোক, বড় দুঃখী সে!"

জেনেদা কহিল, "দুঃখী! ওকথা বলোনা মা—এই ফ্রান্সেস্‌কার জন্ত তোমার দুঃখ হয়? —আপনার স্বামীর ভাইকে ভাল বাসে সে—এত বড় পাপ!"

"কি করবে বল সে! কোন উপায়

ছিলনা বেচারীর! বিয়ের আগে হতেই দুজনের মধ্যে ভালবাসা জন্মেছিল যে, —জোর করে শুধু আর একজনের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিলে বইত না—অত ভালবাসা—"

"চুপ কর, জোর করে হোক, যে করেই হোক—যখন বিয়ে হয়ে গেল—তখন সেই মুহূর্ত্ত থেকে মেয়েমানুষ স্বামীর দাসী—স্বামী-কেই ভালবাসবে সে! বইয়ে আছে, তার স্বামী বুড়ো,—বুড়ো বলেই ত স্ত্রীর উচিত স্বামীকে আরো বেশী ভক্তিকরা, ভালবাসা, যাতে অপরে তার জন্যে তার স্বামীকে কোন কুৎসিৎ কথা বলতে না পারে। তার জন্য তার স্বামীর মাথা না হেঁট হয়! বুড়ো স্বামী দুজনকে মেরে ফেলে খুব ভাল কাজ করেছে—তাদের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে —বিচারিণী স্ত্রী, বিশ্বাসঘাতক ভাই! স্ত্রীর কর্ত্তব্য, প্রেম, ভালবাসা, এমনভাবে দলিত করবে, কি ভীষণ প্রবৃত্তি! শুধু রূপ, শুধু যৌবনের মোহে এমন নির্লজ্জ পাপাচরণ করবে! কি ভয়ঙ্কর কথা!

ক্লারিসা কোন উত্তর দিল না। সে আনলার পানে চাহিয়া রহিল। রুডিকের সহসা নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে সে বলিয়া উঠিল, "খাসা গল্প—চমৎকার!"

জ্যাক একবিচিত্রমোহে বিভোর ছিল! তিন শত বৎসরের প্রাচীন কবির গাথায় একি সুর আজ ভাসিয়া উঠিল পৃথিবীর এই নিভৃত এক প্রান্তে অবস্থিত এক দরিদ্রের কুটিরের কোণে সহসা এ কি সত্য আজ সাড়া পাইয়া উঠিয়াছে! ধন্য কবির নিপুণতা, রচনার সার্থকতার কি অপূর্ব্ব প্রমাণ! কোন্ বহু অতীতের অন্তরাল হইতে ভবিষ্যতের যবনিকা তুলিয়া কবি এক সত্যের অপূর্ব্ব ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন! নির্ম্মল রাত্রে সুদূর আকাশের গায় বসিয়া চন্দ্র যেমন নিম্নে চরাচরের প্রতি নর-নারী প্রতি পথঘাট গৃহ-কোণটি আপনার অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলে, কবিও তেমনই কোন্ গোপন রহস্যান্তরালে বসিয়া আপন তুলিকায়েখাপাতে নরনারীর গোপন অন্তস্তলের হর্ষবেদনা ও ভাবরাশি কি বিচিত্র উজ্জ্বলবর্ণে সূচিত স্ফুটিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার উন্মাদস্পর্শে এতগুলি প্রাণী আজ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে!

সহসা জ্যাক উঠিয়া দাঁড়াইল। "নিশ্চয় সে।" বলিয়া দ্রুত সে রাস্তায় চলিল, তখন বাহিরে পথে কে হাঁকিতেছিল, "টুপি—ভাল টুপি চাই—।"

জ্যাক পথে আসিতে দেখিল, ক্লারিসা গৃহ মধ্যে আসিতেছে! ইহার মধ্যে ক্লারিসা বাহিরেই বা আসিল, কখন? আশ্চর্য্য!

টুপিওয়ালা কিছুদূর চলিয়া গিয়াছিল—জ্যাক দৌড়িয়া গিয়া ডাকিল,—বেলিসার, ও বেলিসার।"

টুপিওয়ালা জ্যাকের পূর্ব্বপরিচিত—তাহার নাম, বেলিসার।

"আমি এই টুপি বেচে দিনগুজরাণ করি! এখানে কিছুকাল এসেছি। ভগ্নীপতির অসুখ হল—যেখে যোজগারও তেমন সুবিধা-মত হচ্ছিল না, তাই এখানে চলে এলুম! এখানে দুপয়সা হচ্ছে, মন্দ নয়! মোদ্দা তুমি এখানে যে—।"

জ্যাক তখন আপনার কথা খুলিয়া বলিল। বেলিসার কহিল, "তুমি কারখানায় কাজ

কচ্ছ! অমন সুন্দর বাড়ী তোমাদের, অত পয়সা আছে, তুমি কারিকর হবে?"

জ্যাক কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। সে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল—বেলিসার তাহা লক্ষ্য করিয়া কথাটা উড়াইয়া দিবার মানসে বলিল, "সে রাত্রে হ্যামটা বেশ ছিল—আর তিনি, সেই মেয়েমানুষটি তোমার মা? তোমার মুখে তাঁর মুখে কেমন মিল আছে, তাই আন্দাজ করছি! ঠিক না?"

মার কথা শুনিয়া জ্যাকের চিত্ত বিষণ্ণ হইল। জ্যাকের ইচ্ছা হইল, বেলিসারকে লইয়া কিছুক্ষণ সে গল্প করে, কিন্তু বেলিসার কহিল, "আজ আসি, কাজ আছে আর একদিন এসে গল্প-স্বল্প করব। এখন তুমি এখানে আছ ত। প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হবে, ভাবনা কি?"

উভয়ে করকম্পন করিয়া বিদায় লইল। বেলিসার চলিয়া গেলে জ্যাক গৃহে ফিরিল।

দ্বারের নিকট ক্লারিসা উদ্বেগাকুল হৃদয়ে দাঁড়াইয়াছিল। জ্যাক ফিরিতেই ক্লারিসা অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করিল, "ও কি বলছিল, তোমায় জ্যাক?"

ক্লারিসার স্বর ঈষৎ কম্পিত হইয়াছিল, সন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে জ্যাক্ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না।

জ্যাক কহিল, "আমার সঙ্গে ওর প্রতিযোগিতে আলাপ হয়েছিল, অনেকদিন পরে দেখা হল—তাই কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা কচ্ছিল!"

জ্যাকের দুই হাত আপন হাতে চাপিয়া ধরিয়া ক্লারিসা জিজ্ঞাসা করিল, "আর কোন কথা বলেননি? কোন কথা না? আমার সম্বন্ধে—?"

জ্যাক সরল ভাবে উত্তর দিল, "না, আর কোন কথা হয়নি!"

পরম আশ্বাসে ক্লারিসা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সে নিশ্চিন্ত হইল।

নিশ্চিন্ত হইল বটে, তথাপি সেদিন সারা সন্ধ্যা ধরিয়া সে যেন কেমন স্বপ্নাবিষ্টবৎ রহিল। কি যেন এক নূতন অজানা ভাবনা পাষাণের মত তাহার ক্ষুদ্র বুকখানা চাপিয়া রহিল—শত চেষ্টাতে বুকের সে পাষাণভার ক্লারিসা ঠেলিয়া ফেলিতে সক্ষম হইল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বাসন্তিকা।

(একটি জাপানী কবিতা অবলম্বনে)

বাসন্তিকা! বাসন্তিকা!
দু'খানি তোর রঙীন্ পাখা
দুলিয়ে দে!
হাস্-হাসার গন্ধেতে তোর
প্রাণের 'পরে স্বপ্নেরি ঘোর
বুলিয়ে রে!

আয় কলিকের সহচরী
পুষ্পাবলী আয় গো পরী,
আয় গো আয়;
সোনালি তোর ছায়াখানি
মেঘের বুকে পড়ুক রাণী
গগন-গায়।

উঁকি দিয়ে লুকিয়ে ফেরা,—
এই খেলা কি খেলার সেরা ?—
মর্ত্তো আয়!
ধরতে তোরে হারিয়ে ফেলি,
চোখের জলে চক্ষু মেলি,
হায় রে হায়!

এবার ফাগুন ফিরলে পরে,—
ছাড়ব নাকে,—রাখব ধ'রে ;
ভাবছি তাই।
হায় গরবী! হায় সোহাগী!
আমরা যে তোর পরশ মাগি'
ধরতে চাই।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

"পালিভদ্র কোথায় ?"

এই প্রবন্ধটি বহুদিবস পূর্ব্বে আমাদের হস্তগত হইয়াছে—কিন্তু স্থানাভাবে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিতে পারি নাই। তাঃ সঃ।

(আলোচনা)

বিগত কার্ত্তিক মাসের—"ভারতী"তে শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "পালিভদ্র কোথায়" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি প্রবন্ধে সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে গ্রীক্ বর্ণিত 'পালিমথ্রো' নগরের সংস্থান বর্ত্তমান পাটনায় নহে পরন্তু প্রয়াগে বা এলাহাবাদে। তিনি প্রবন্ধে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এই :—

(১) 'পালিভদ্র' স্বাবনিক শব্দ নহে। উহা যদি পাটলিপুত্রের অন্যতম নাম হইত, তাহা হইলে প্রামাণিক অভিধানে উহার উল্লেখ থাকিত। অভিধানে পাটলিপুত্রের অপর নাম কুসুম-পুর বা পুষ্পপুর। পাটলিপুত্রের অপভ্রংশ পালিবোথ্রা হওয়াই সুসঙ্গত।

(২) আরিয়ান বলেন, 'পালিভদ্র' গঙ্গা এবং হিরণ্যবহা নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত। হিরণ্যবহা গঙ্গা ও সিন্ধু অপেক্ষা ক্ষুদ্র কিন্তু অন্যান্য নদী অপেক্ষা বৃহত্তর। গঙ্গার নিম্নেই যে যমুনা স্থান পাইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করেন। গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ হিরণ্যবহাকে 'ইরাণাবয়েস' বলিয়াছেন। লেখকের মনে হয়, উহা যমুনার নামান্তর।

(৩) প্রাচীন গ্রীক্ ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে "প্রাসজী"র রাজধানী পালিভদ্র ছিল। "প্রয়াগী" শব্দের সহিত "প্রাসজী" শব্দের বিশেষ সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

(৪) প্লিনের হিসাব ধরিলে "পালিভদ্র' নগর গঙ্গা যমুনা-সঙ্গমের ৪২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু এলাহাবাদ হইতে পাটনা প্রায় দুই শত মাইল দূরবর্ত্তী হইবে।

(৫) 'পালিভদ্র' দৈর্ঘ্যে অন্যূন দশ মাইল প্রস্থে দুই মাইল ছিল। পাটলিপুত্রের যে ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে উহার ঐরূপ বিস্তৃতি ছিল বলিয়া অনুমিত হয় না বরং প্রয়াগকেই ঐরূপ নগর বলিয়া স্থির করিতে ইচ্ছা হয়।

লেখকের এই সকল যুক্তি ভ্রম-প্রমাদ শূন্য বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তাঁহার প্রত্যেকটী যুক্তির বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উঠিতে পারে তাহা যথাসম্ভব নিম্নে প্রদত্ত হইল। এইরূপ আলোচনা সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলাম।

(১) প্রবন্ধের প্রথমেই লেখক লিখিয়াছেন, ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই পালিভদ্র বা

পালিবোথরার নাম শুনিয়াছেন।" ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে লেখকের মতে পালিভদ্র ও পালিবোথরা এক নাম। গ্রীক্ গ্রন্থকার-গণের পুস্তকে পালিবোথ বা লেখকলিখিত পালিবোথরার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। 'পালিভদ্র' নাম বোধ হয় লেখকের স্বকপোল-কল্পিত। কোন কোন লেখক অবশ্য পালি-বোথ্র স্থানে 'পালিমবোথ্' লিখিয়াছেন। তথাপি যখন তিনি পালিভদ্র ও পালিবোথর এই দুই নাম অভিন্ন বলিয়াছেন, তখন স্বীকার করিতেই হইবে পালিভদ্র থাকিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। লেখকের কথার ন্যায় আমরাও বলিতে পারি যে পালিভদ্র যদি প্রয়াগের নাম হইত তাহা হইলে অভিধানে প্রয়াগের নামের সহিত উহার উল্লেখও আমরা দেখিতে পাইতাম। প্রয়াগের অপভ্রংশ পালিবোথরা না হইয়া পাটলিপুত্রের অপভ্রংশ পালিবোথরা বা পালিবোথ্ হওয়াই সম্ভবপর। শব্দতত্ত্ব ইহাই ইঙ্গিত করিয়া দিতেছে। 'পাটলিপুত্রে'র 'ট' এর লোপ করিলে 'পালিবো'থ্র সহিত যথেষ্ট ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত 'ব' বা 'প' স্থলে গ্রীক্ 'বিটা' বা 'পি'র আগম হইতে দেখা যায়। যথা, সংস্কৃত 'বাহু'—গ্রীক্ 'পেখুস'।(১) এরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে।

(২) আরিয়ান তাঁহার পুস্তকে 'হিরণ্য-বহার উল্লেখ করেন নাই; ইরাণবোয়াস নামের উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ লেখক 'ইরাণ-বোয়াস'কে মনে মনে 'হিরণ্যবহা' মানিয়া ইহা অবলীলা ক্রমে আরিয়ানের উপর ইহা আরোপ করিয়াছেন! 'হিরণ্যবহা' নামই বা লেখক কোন্ পুস্তকে পাইলেন? ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহই শোণকে হিরণ্যবহা বলেন নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ অমর-কোষ-অনুসারে শোণকে 'হিরণ্যবাহ' বলিয়াছেন।(২) গঙ্গার নিম্নেই যে যমুনার স্থান একথা সকলে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা লেখক কিরূপে জানিলেন? তিনি কি পৌরাণিক মাহাত্ম্যে যমুনার এরূপ স্থান নির্দ্দেশ করিলেন? তাহা হইলে লেখকের অনুমান বোধ হয় কতকটা সম্ভবপর হইতে পারে। গ্রীকগণ যে কয়েকটী নদ নদী দেখিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে সত্ত গণ্ডককেই অনেক প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্গণ ভারতের তৃতীয় নদ বা নদী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।(৩) বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণও বহু পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে তাঁহাদের প্রত্যেকের মত সংকলন করিতে পারিলাম না। প্লিনি এবং আরিয়ান 'জোমা-নিস' বা যমুনা নামে স্বতন্ত্র নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে যমুনা ও 'ইরাণবোয়াস' এক নদী নহে। টলেমিও 'ডিয়াজোমা,' বা 'যমুনা'র পৃথক উল্লেখ করিয়া-ছেন। সুতরাং ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে যমুনা ও 'ইরাণ বোয়াস' এক নদী

(১) Mulvany's "our common Inheritence", p. 15

(২) "শোণো হিরণ্যবাহঃ স্যাৎ"—অমর।

(৩) "The Physical characteristic of size of the great Gandak agrees with the Greek accounts which make it the third river in India, inferior only to the Indus and the Ganges."—Archæological Survey Reports vol. VIII., p. 26.

নহে। (৪) প্লিনি ও আরিয়ান শোণ ও ইরাণ বোয়াসকেও দুইটী পৃথক নদী বলিয়া লিখিয়াছেন। এই দুইটী নদী যে এক নহে তাহা সুবিখ্যাত উইলসন সাহেবও বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। (৫) এরূপ ক্ষেত্রে গঙ্গার উপনদী গুলির মধ্যে বড় গণ্ডক-কেই ইরাণ বোয়াস বলিয়া অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। গঙ্গা ও বড় গণ্ডকের সঙ্গমস্থল পাটনা হইতে অধিক দূর নহে। সঙ্গম স্থলেই যে প্রাচীন 'পালিবোথ্' নগর অবস্থিত ছিল তাহাও আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি। আবার কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদের মতে কুশীই গ্রীক বর্ণিত ইরাণ বোয়াস। কারণ গঙ্গার সহিত ইহার সঙ্গম-স্থলও পাটনা হইতে দূরবর্ত্তী নহে এবং ইহার একটি পতিত-প্রবাহ এখনও পাটনার সন্নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার এক্ষণে স্থানীয় নাম, 'পুরাণপাহ'। (৬) রবার্টসন সাহেব ব্যতীত সকলেই এইরূপ পাটনাকেই প্রাচীন পালিবোথ্ প্রতিপন্ন করিতে নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার যাঁহারা শোণকে 'ইরাণবোয়াস' সপ্রমাণ করিতে চাহেন তাঁহারা বলেন যে শোণেরও একটি ক্ষীণ প্রবাহ পাটনার নিকট দিয়া বহিয়াছে। তাহাকে এখন সাধারণে "মরা নদী" বলিয়া থাকে।(৭)

(৩) "প্রাসঈ"র রাজধানী 'পালিভদ্র' হইলেও হইতে পারে; কিন্তু 'পালিভদ্র' যে 'পালিবোথ্' তাহা লেখক কিরূপে অবধারণ করিলেন? 'প্রাসঈ' ত দেশবাসীর সাধারণ নাম তাহা রাজার নাম কি করিয়া হইবে? এইরূপ সাদৃশ্য থাকিলেই যে উভয় নাম এক তাহাই বা কি করিয়া নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করা যায়। 'প্রাসঈ"র (?) রাজধানী যে পালিভদ্র, ইহা আমরা কোনও ইতিহাসে দেখিতে পাই না। লেখক কি তবে "প্রাসি-য়াই" শব্দ দেখিয়াই তাহাকে "প্রাসঈ" স্থির করিলেন? পালিবোথ্র অধিবাসীগণকে 'প্রাসিয়াই' বলা হইত, ষ্ট্রাবো এই কথাই লিখিয়াছেন। প্লিনি ও আরিয়ানের মতেও পালিবোথ্র অধিবাসিগণ 'প্রাসিয়াই' বলিয়া কথিত হইতেন। এই শব্দটী সংস্কৃত 'প্রাচ্য' শব্দেরই বিকৃত উচ্চারণ। প্রকৃত-প্রস্তাবেও পঞ্চনদের অধিবাসীগণ বিহারীগণকে 'প্রাচ্য' নামে অভিহিত করিতে পারিতেন। (৮)

(৪) প্লিনি যে পালিবোথ্ নগর এলাহাবাদ হইতে ৪২৫ মাইল দূরবর্ত্তী লিখিয়াছেন

---

(৪) "Ptolemy—Diamonna—it is easy to recognise the Yamuna' which after passing Delhi, Mathura, Agra and other places joins the Ganges at Allahabad."—Indian Antiquary, 1884.

(৫) Wilson's "Hindu Theatre" vol. II. (Preface to the Mudra Rakshasa)

(৬) "The Erannoboas, now the Coosy has greatly altered its course for Several Centuries passed * * * the old bed is still visible and is called now 'পুরাণপাহ' or the Old Channel.."—Asiatic Researches Vol. v., p. 273.

(৭) Imperial Gazetteer, Vol. VXX., p. 66.

(৮) "Pliny and Arnian agree with our author (Strabo) in calling the inhabitants

তাহা যে রোমান মাইল লেখক বোধ হয় ইহা লক্ষ্য করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। প্রত্যেক রোমান মাইল সাধারণ ইংলিস মাইল অপেক্ষা ১৪৯ গজ কম। যাহা হউক এই দূরত্ব ধরিলে পাটনা, পালিবোথ্র হউক বা না হউক, গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম বা প্রয়াগকে তো আর পালিবোথ্র কখনই বলা যায় না। কারণ, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, পালিবোথ্র বা 'পালিভদ্র' (?) প্রয়াগ হইতে ৪২৫ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

লেখক কিরূপে জানিলেন যে পাটলিপুত্রের ভগ্নাবশেষ খনন শেষ হইয়া গিয়াছে। কোন কার্য্য সমাপ্ত না হইবার পূর্ব্বে (অন্ততঃ ঐতিহাসিক আলোচনায়) এইরূপ ক্ষিপ্র সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলা কোন ক্রমেই সমীচীন নহে। এলাহাবাদের প্রাচীন অবস্থানও কি সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে? ভিটা প্রভৃতি এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে যে খননকার্য্য চলিতেছে তাহার সহিত ত ইহার কোন সম্বন্ধই আমরা দেখিতে পাই না। (৯) বরং পাটলিপুত্রের ভগ্নাবশেষ খননেই সেই গ্রীক্ বর্ণিত চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীর কাষ্ঠ-নির্ম্মিত প্রাচীর বহির্গত হইয়াছে। (১০) ফাহিয়ানও এই কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রাচীর দেখিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি পালিবোথ্রকে 'পালিহেন-ফু' বলিয়াছেন।

প্রবন্ধের অনেক স্থলে লেখক কোনরূপ যুক্তি না দেখাইয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য প্রমাণিত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। যথা, "শোণ কখনই যমুনার ন্যায় প্রবল ছিল না।" "আমাদের মনে হয়, উহা যমুনার নামান্তর।"

ইত্যাদি। এগুলির আলোচনা নিতান্ত অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে আমাদের দেশে কোন বিষয়ের মীমাংসায় একপক্ষের যুক্তি অপর পক্ষের অপেক্ষা দুর্ব্বল হইলে, সে পক্ষ নিজ ভ্রম মনে মনে স্বীকার করিয়াও অপর পক্ষের নিকট নিজমত অক্ষুণ্ণ রাখিতে পশ্চাৎপদ হয়েন না। ইহাতে বিচার বিতর্কের অবসান হয় না এবং বিচার ক্রমশঃই কলহের নামান্তর হইয়া উঠে। ইংরাজী পত্রিকাদিতে বিদেশীয়গণের সহিত বিচারে কিন্তু আমরা চিরকালই এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া আসিতেছি। তবে বাঙ্গালা সাহিত্যেই বা কেন এ সত্যের অযোগ্যতা প্রমাণ করিব? আমরা আশা করি অন্যান্য সভ্য দেশের ন্যায় এ দেশে, বাঙ্গালা ভাষাতেও ভবিষ্যতে কোন বিষয়ের আলোচনায় আমাদের ভ্রমপ্রমাদ থাকিলে আমরা প্রকাশ্য-স্বীকার করিতে কখনই ইতস্ততঃ করিব না।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
বারাণসী।

---

of Palibothra, Prasii, a name which transliterates Sanskrit Prachya i,e, Eastern"—M'Crindle's "Ancient India." p. 43, Foot-note.

(৯) J. R. A. S., Part I.

(১০) "Remains of the wooden wall by which the city, as we learn from Strabo was defended, we discovered a few years ago in Patna by workmen engaged in digging a tank."—Indian antiquary, 1884 এই সঙ্গে "Report on the Excavation at Patna" (Calcutta, 1903) নামক গ্রন্থও অনুসন্ধেয়।

রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ অনুসারে অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক
চিত্রাঙ্গদা কাব্যের চিত্র পরিকল্পনা

বিভিন্ন বয়সে রবীন্দ্রনাথ

অভিভাষণ।*

অকালে যাহার উদয় তাহার সম্বন্ধে মনের আশঙ্কা ঘুচিতে চায় না। আপনাদের কাছ হইতে আমি যে সমাদর লাভ করিয়াছি, সে একটি অকালের ফল—এইজন্য ভয় হয় কখন সে বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়ে।

অন্যান্য দেবকদের মত সাহিত্যসেবক কবিদেরও খোরাকী এবং বেতন এই দুই রকমের প্রাপ্য আছে। তাঁরা প্রতিদিনের ক্ষুধা মিটাইবার মত কিছু কিছু রসের খোরাকী প্রত্যাশা করিয়া থাকেন—নিতান্তই উপবাসে দিন চলে না। কিন্তু এমন কবিও আছেন তাঁহাদের আপ্‌খোরাকী বন্দোবস্ত—তাঁহারা নিজের আনন্দ হইতে নিজের খোরাক জোগাইয়া থাকেন, গৃহস্থ তাঁহাদিগকে একমুঠা মুড়িমুড়কিও দেয় না।

এই ত গেল দিনের খোরাক—ইহা দিন গেলে জোটে এবং দিনের সঙ্গে ইহার ক্ষয় হয়। তার পরে বেতন আছে। কিন্তু সে ত মাস না গেলে দাবি করা যায় না। সেই চিরদিনের প্রাপ্যটা, বাঁচিয়া থাকিতেই আদায় করিবার রীতি নাই। এই বেতনটার হিসাব চিত্রগুপ্তের খাতাঞ্চিখানাতেই হইয়া থাকে। সেখানে হিসাবের ভুল প্রায় হয় না।

কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতেই যদি আগাম-শোধের বন্দোবস্ত হয় তবে সেটাতে বড় সন্দেহ জন্মায়। সংসারে অনেক জিনিষ ফাঁকি দিয়া পাইয়াও সেটা রক্ষা করা চলে। অনেকে পরকে ফাঁকি দিয়া ধনী হইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত একেবারে দেখা যায় না তাহা নহে। কিন্তু যশ জিনিষটাতে সে সুবিধা নাই। উহার সম্বন্ধে তামাদির আইন খাটে না। যেদিন ফাঁকি ধরা পড়িবে সেইদিনই ওটি বাজেয়াপ্ত হইবে। মহাকালের এমনি বিধি। অতএব জীবিতকালে কবি যে সম্মানলাভ করিল সেটি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জো নাই।

শুধু এই নয়। বাঁচিয়া থাকিতেই যদি মাহিনা চুকাইয়া লওয়া হয় তবে সেটা সম্পূর্ণ কবির হাতে গিয়া পড়ে না। কবির বাহির দরজায় একটা মানুষ দিনরাত আড্ডা করিয়া থাকে সে দালালী আদায় করিয়া লয়। কবি যত বড় কবিই হউক তাহার সমস্তটাই কবি নয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে একটি অহং লাগিয়া থাকে সকলতাতেই সে আপনার ভাগ বসাইতে চায়। তাহার বিশ্বাস, কৃতিত্ব সমস্ত তাহারই; এবং কবিত্বের গৌরব তাহারই প্রাপ্য। এই বলিয়া সে থলি ভর্ত্তি করিতে থাকে। এমনি করিয়া পূজার নৈবেদ্য পুরুত চুরি করে। কিন্তু মৃত্যুর পরে ঐ অহং-পুরুষটার বালাই থাকে না—তাই পাওনাটি নিরাপদে যথাস্থানে গিয়া পৌঁছে।

অহংটাই পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে বড় চোর। সে স্বয়ং ভগবানের সামগ্রীও নিজের বলিয়া দাবি করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই জন্যই ত ঐ দুর্বৃত্তটাকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য এত অনুশাসন। এই জন্যই ত মনু বলিয়াছেন—সম্মানকে বিষের মত জানিবে, অপমানই অমৃত। সম্মান যেখানেই লোভনীয়

* ২৩শে মাঘ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আনন্দ সম্মিলনে প্রদত্ত বক্তৃতা।

সেখানেই সাধ্যমত তাহার সংস্রব পরিহার করা ভাল।

আমার ত বয়স পঞ্চাশ পার হইল। এখন বনে যাইবার ডাক পড়িয়াছে। এখন ত্যাগেরই দিন। এখন নূতন সঞ্চয়ের বোঝা মাথায় করিলে ত কাজ চলিবে না। অতএব এই পঞ্চাশের পরেও ঈশ্বর যদি আমাকে সম্মান জুটাইয়া দেন তবে নিশ্চয় বুঝিব সে কেবল ত্যাগশিক্ষারই জন্য। এ সম্মানকে আমি আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। এই মাথার বোঝা আমাকে সেইখানেই নামাইতে হইবে যেখানে আমার শ্রদ্ধা নত করিবার স্থান। অতএব এটুকু আমি আপনাদিগকে ভরসা দিতে পারি যে আপনারা আমাকে যে সম্মান দিলেন, তাহাকে আমার অহঙ্কারের উপকরণরূপে ব্যবহার করিয়া অপমানিত করিব না।

আমাদের দেশে বর্ত্তমানকালে পঞ্চাশ পার হইলে আনন্দ করিবার কারণ আছে—কেননা দীর্ঘায়ু বিরল হইয়া আসিয়াছে। যে দেশের লোক অল্পবয়সেই মারা যায় প্রাচীন বয়সের অভিজ্ঞতার সম্পদ হইতে সে দেশ বঞ্চিত হয়। তারুণ্য ত ঘোড়া আর প্রবীনতাই সারথী। সারথীহীন ঘোড়ায় দেশের রথ চালাইলে কিরূপ বিষম বিপদ ঘটিতে পারে আমরা মাঝে মাঝে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। অতএব এই অল্পায়ুর দেশে যে মানুষ পঞ্চাশ পার হইয়াছে উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু কবি ত বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ঐতিহাসিক বা রাষ্ট্রনীতিবিৎ নহে। কবিত্ব মানুষের প্রথম বিকাশের নবীনপ্রভাত। সম্মুখে জীবনের বিস্তার যখন আপনার সীমাকে এখনও খুঁজিয়া পায় নাই, আশা যখন পরম রহস্যময়ী—তখনি কবিত্বের গান নব নব সুরে জাগিয়া উঠে। অবশ্য, এই রহস্যের সৌন্দর্য্যটি যে কেবল প্রভাতেরই সামগ্রী তাহা নহে, আয়ু অবসানের দিনান্ত কালেও অনন্ত জীবনের পরমরহস্যের জ্যোতির্ম্ময় আভাস আপনার গভীরতর সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। কিন্তু সেই রহস্যের শুভ্র গাম্ভীর্য্য গানের কলোচ্ছ্বাসকে নীরব করিয়াই দেয়। তাই বলিতেছি, কবির বয়সের মূল্য কি?

অতএব বার্দ্ধক্যের আরম্ভে যে আদর লাভ করিলাম তাহাকে প্রবীন বয়সের প্রাপ্য অর্ঘ্য বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। আপনারা আমার এবয়সেও তরুণের প্রাপ্যই আমাকে দান করিয়াছেন। তাহাই কবির প্রাপ্য। তাহা শ্রদ্ধা নহে, ভক্তি নহে, তাহা হৃদয়ের প্রীতি। মহত্ত্বের হিসাব করিয়া আমরা মানুষকে ভক্তি করি, যোগ্যতার হিসাব করিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, কিন্তু প্রীতির কোনো হিসাবকিতাব নাই। সেই প্রেম যখন যজ্ঞ করিতে বসে তখন নির্বিচারে আপনাকে রিক্ত করিয়া দেয়।

বুদ্ধির জোরে নয়, বিদ্যার জোরে নয়, সাধুত্বের গৌরবে নয়, যদি অনেককাল বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে তাহারই কোনো একটা সুরে আপনাদের হৃদয়ের সেই প্রীতিকে পাইয়া থাকি তবে আমি ধন্য হইয়াছি—তবে আমার আর সঙ্কোচের কোনো কথা নাই। কেননা, আপনাকে দিবার বেলায় প্রীতির যেমন কোনো হিসাব থাকে না, তেমনি যে লোক ভাগ্যক্রমে তাহা পায় নিজের যোগ্যতার হিসাব লইয়া তাহারও কুণ্ঠিত হইবার কোনো

প্রয়োজন নাই। যে মানুষ প্রেম দান করিতে পারে ক্ষমতা তাহারই—যে মানুষ প্রেম লাভ করে তাহার কেবল সৌভাগ্য।

প্রেমের ক্ষমতা যে কত বড় আজ আমি তাহা বিশেষরূপে অনুভব করিতেছি। আমি যাহা পাইয়াছি তাহা সস্তা জিনিষ নহে। আমরা ভৃত্যকে যে বেতন চুকাইয়া দিই তাহা তুচ্ছ, স্তুতিবাদককে যে পুরস্কার দিই তাহা হেয়। সেই অযাচিত দান আমি প্রার্থনা করি নাই, আপনারাও তাহা দেন নাই। আমি প্রেমেরই দান পাইয়াছি। সেই প্রেমের একটি মহৎ পরিচয় আছে। আমরা যে জিনিষটার দাম দিই তাহার ত্রুটি সহিতে পারি না—কোথাও ফুটা বা দাগ দেখিলে দাম ফিরাইয়া লইতে চাই। যখন মজুরি দিই তখন কাজের ভুলচুকের জন্য জরিমানা করিয়া থাকি। কিন্তু প্রেম অনেক সহ্য করে, অনেক ক্ষমা করে; আঘাতকে গ্রহণ করিয়াই সে আপনার মহত্ত্ব প্রকাশ করে।

আজ চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল সাহিত্যের সাধনা করিয়া আসিয়াছি—ভুল চুক যে অনেক করিয়াছি এবং আঘাতও যে বারম্বার দিয়াছি তাহাতে কোনোই সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমার সেই সমস্ত অপূর্ণতা, আমার সেই সমস্ত কঠোরতা বিরুদ্ধতার উর্দ্ধে দাঁড়াইয়া আপনারা আমাকে যে মালা দান করিয়াছেন তাহা প্রীতির মালা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। এই দানেই আপনাদের যথার্থ গৌরব এবং সেই গৌরবেই আমি গৌরবান্বিত।

যেখানে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়ম প্রবল, সেখানে প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্যের প্রয়োজন আছে। সেখানে অনেক জন্মে সেখানে মরেও বেশি তাহার মধ্য হইতে কিছু টিকিয়া যায়। কবিদের মধ্যে যাঁহারা কলানিপুণ, যাঁহারা আর্টিষ্ট, তাঁহারা মানসিক নির্ব্বাচনের নিয়মে সৃষ্টি করেন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে কাছে ঘেঁষিতে দেন না। তাঁহারা যাহা কিছু প্রকাশ করেন তাহা সমস্তটাই একেবারে সার্থক হইয়া উঠে।

আমি জানি, আমার রচনার মধ্যে সেই নিরতিশয় প্রাচুর্য্য আছে যাহা বহুপরিমাণে ব্যর্থতা বহন করে। অমরত্বের তরণীতে স্থান বেশি নাই, এই জন্য বোঝাকে যতই সংহত করিতে পারিব বিনাশের পারের ঘাটে পৌঁছিবার সম্ভাবনা ততই বেশি হইবে। মহাকালের হাতে আমরা যত বেশি দিব ততই বেশি সে লইবে ইহা সত্য নহে। আমার বোঝা অত্যন্ত ভারি হইয়াছে—ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে ইহার মধ্যে অনেকটা অংশে মৃত্যুর মার্কা পড়িয়াছে। যিনি অমরত্বের রথের রথী তিনি সোনার মুকুট, হীরার কণ্ঠী, মাণিক্যের অঙ্গদ ধারণ করেন, তিনি বস্তা মাপায় করিয়া লন না।

কিন্তু আমি কারুকরের মত সংহত অথচ মূল্যবান গহনা গড়িয়া দিতে পারি নাই। আমি, যখন যাহা জুটিয়াছে তাহা লইয়া, কেবল মোট বাঁধিয়া দিয়াছি; তাহার দামের চেয়ে তাহার ভার বেশি। অপচয় বলিয়া যেমন একটা ব্যাপার আছে অপসৃষ্টিও তেমনি একটি উৎপাত। সাহিত্যে এই অপরাধ আমার ঘটিয়াছে। যেখানে মাল-চালানের পরীক্ষাশালা সেই কষ্টম্ হৌসের হাত হইতে ইহার সমস্তগুলি পার হইতে পারিবে না। কিন্তু সেই লোকসানের আশঙ্কা লইয়া ক্ষোভ করিতে চাই না।

যেমন একদিকে চিরকালটা আছে তেমনি আর একদিকে ক্ষণকালটাও আছে। সেই ক্ষণকালের প্রয়োজনে, ক্ষণকালের উৎসবে, এমন কি, ক্ষণকালের অনাবশ্যক খেলাছড়ার ব্যাপারেও যাহা জোগান্ দেওয়া গেছে, তাহার স্থায়িত্ব নাই বলিয়া যে তাহার কোন ফল নাই তাহা বলিতে পারি না। একটা ফল ত এই দেখিতেছি, অন্ততঃ প্রাচুর্য্যের দ্বারাতেও বর্ত্তমানকালের হৃদয়টিকে আমার কবিত্ব-চেষ্টা কিছু পরিমাণে জুড়িয়া বসিয়াছে এবং আমার পাঠকদের হৃদয়ের তরফ হইতে আজ যাহা পাইলাম তাহা যে অনেকটা পরিমাণে সেই দানের প্রতিদান তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই দানও যেমন ক্ষণস্থায়ী তাহার প্রতিদানও চিরদিনের নহে। আমি যে ফুল ফুটাইয়াছি তাহারও বিস্তর ঝরিবে, আপনারা যে মালা দিলেন তাহারও অনেক শুকাইবে। বাঁচিয়া থাকিতেই কবি যাহা পায় তাহার মধ্যে ক্ষণকালের এই দেনাপাওনা শোধ হইতে থাকে;—অন্তকার সম্বর্দ্ধনার মধ্যে সেই ক্ষণকালের হিসাবনিকাশের অঙ্ক যে প্রচুর পরিমাণে আছে তাহা আমি নিজেকে ভুলিতে দিব না।

এই ক্ষণকালের ব্যবসাহে ইচ্ছার অনিচ্ছায় অনেক ফাঁকি চলে। বিস্তর ব্যর্থতা দিয়া ওজন ভারি করিয়া তোলা যায়—যতটা মনে করা যায় তাহার চেয়ে বলা যায় বেশি,—রস অপেক্ষা দম্ভরের দিকে বেশি দৃষ্টি পড়ে, অনুভবের চেয়ে অনুকরণের মাত্রা অধিক হইয়া উঠে। আমার সুদীর্ঘকালের সাহিত্য কারবারে সেই সকল ফাঁকি স্থানে অস্থানে অনেক জমিয়াছে সেকথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে।

কেবল একটি কথা আজ আমি নিজের পক্ষ হইতে বলিব, সেটি এই যে—সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত আমি যাহা দিবার যোগ্য মনে করিয়াছি তাহাই দিয়াছি, লোকে যাহা দাবি করিয়াছে তাহাই জোগাইতে চেষ্টা করি নাই। আমি আমার রচনা পাঠকদের মনের মত করিয়া তুলিবার দিকে চোখ না রাখিয়া আমার মনের মত করিয়াই সভায় উপস্থিত করিয়াছি। সভার প্রতি ইহাই যথার্থ সম্মান। কিন্তু এরূপ প্রণালীতে আর যাহাই হউক্ সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত বাহবা পাওয়া যায় না। আমি তাহা পাইও নাই। আমার যশের ভোজে আজ সমাপনের বেলায় যে মধুর জুটিয়াছে বরাবর এ রসের আয়োজন ছিল না। যে ছন্দে যে ভাষায় একদিন কাব্যরচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম তখনকার কালে তাহা আদর পায় নাই এবং এখনকার কালেও যে তাহা আদরের যোগ্য তাহা আমি বলিতে চাই না। কেবল আমার বলিবার কথা এই যে, যাহা আমার তাহাই আমি অন্তকে দিয়াছিলাম—ইহার চেয়ে সহজ সুবিধার পথ আমি অবলম্বন করি নাই। অনেক সময়ে লোককে বঞ্চনা করিয়াই খুসি করা যায়—কিন্তু সেই খুসিও কিছুকাল পরে ফিরিয়া বঞ্চনা করে—সেই সুলভ খুসির দিকে লোভদৃষ্টিপাত করি নাই।

তাহার পরে আমার রচনার অপ্রিয় বাক্যও আমি অনেক বলিয়াছি এবং অপ্রিয় বাক্যের যাহা নগদ বিদায় তাহাও আমাকে বারবার

পিঠ পাতিয়া লইতে হইয়াছে। আপনার শক্তিতেই মানুষ আপনার সত্য উন্নতি করিতে পারে, মানিয়া পাতিয়া কেহ কোনো দিন স্থায়ী কল্যাণলাভ করিতে পারে না, এই নিতান্ত পুরাতন কথাটিও দুঃসহ গালি না খাইয়া বলিবার সুযোগ পাই নাই। এমন ঘটনা উপরিউপরি অনেকবারই ঘটিল। কিন্তু যাহাকে আমি সত্য বলিয়া জানিয়াছি তাহাকে হাটে বিকাইয়া দিয়া লোকপ্রিয় হইবার চেষ্টা করি নাই। আমার দেশকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি, আমার দেশের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার তুলনা আমি কোথাও দেখি নাই;—এইজন্য দুর্গতির দিনের যে কোনো ধূলিজঞ্জাল সেই আমাদের চির-সাধনার ধনকে কিছুমাত্র আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহার প্রতি আমি লেশমাত্র মমতা প্রকাশ করি নাই,—এইখানে আমার শ্রোতা ও পাঠকদের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে আমার মতের গুরুতর বিরোধ ঘটিয়াছে। আমি জানি, এই বিরোধ অত্যন্ত কঠিন এবং ইহার আঘাত অতিশয় মর্মান্তিক; এই অনৈক্যে বন্ধুকে শত্রু ও আত্মীয়কে পর বলিয়া আমরা কল্পনা করি। কিন্তু এইরূপ আঘাত দিবার যে আঘাত তাহাও আমি সহ্য করিয়াছি। আমি অপ্রিয়তাকে কৌশলে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করি নাই।

এইজন্যই আজ আপনাদের নিকট হইতে যে সম্মানের লাভ করিলাম তাহাকে এমন দুর্লভ বলিয়া নিরোধার্য্য করিয়া লইতেছি। ইহা [illegible]কের মূল্য নহে, ইহা প্রীতিরই উপহার। ইহাতে, যে ব্যক্তি মান পায় সেও সম্মানিত হয়, আর যিনি মান দেন তাঁহারও সম্মান বৃদ্ধি হয়। যে সমাজে মানুষ নিজের সত্য আদর্শকে বজায় রাখিয়া নিজের সত্য মতকে খর্ব্ব না করিয়াও শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারে সেই সমাজই যথার্থ শ্রদ্ধাভাজন;—যেখানে আদর পাইতে হইলে মানুষ নিজের সত্য বিকাইয়া দিতে বাধ্য হয় সেখানকার আদর আদরণীয় নহে। কে আমার দলে, কে আমার দলে নয় সেই বুঝিয়া যেখানে স্তুতি সম্মানের ভাগ বণ্টন হয় সেখানকার সম্মান অস্পৃশ্য; সেখানে যদি ঘৃণা করিয়া লোকে গায়ে ধূলা দেয় তবে সেই ধূলাই যথার্থ ভূষণ, যদি রাগ করিয়া গালি দেয় তবে সেই গালিই যথার্থ সম্বর্দ্ধনা।

সম্মান যেখানে মহৎ যেখানে সত্য সেখানে নম্রতায় আপনি মন নত হয়। অতএব আজ আপনাদের কাছ হইতে বিদায় হইবার পূর্ব্বে এ কথা অন্তরের সহিত আপনাদিগকে জানাইয়া যাইতে পারিব যে, আপনাদের প্রদত্ত এই সম্মানের উপহার আমি দেশের আশীর্ব্বাদের মত মাথায় করিয়া লইলাম—ইহা পবিত্র সামগ্রী, ইহা আমার ভোগের পদার্থ নহে—ইহা আমার চিত্তকে বিশুদ্ধ করিবে; আমার অহঙ্কারকে আলোড়িত করিয়া তুলিবে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের প্রতি।

১

এ মোহিনী বীণা কোথায় পাইলে ?
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে প্রাণ কেড়ে নিলে !
হেন স্বর্ণবীণা নাইরে নিখিলে,
সুধাভরা কুধাহরা !
উল্লাসে উচ্ছ্বাসে উছলিছে সুর
পদ্মবধু জিনি' মধুর, মধুর ;
এ যেন রবির চরণ-নূপুর,
পরশে শিহরে ধরা।

২

বাজে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী ;
উর্ব্বশীর যেন বীণা বিমোহিনী !
সৌন্দর্য্য-নন্দনে সুধা-প্রবাহিনী
লীলায় উছলে চলে !
এ যেন গোলাপে শিশির পতন,
পূর্ণিমা রাতির উছল কিরণ !
শেফালির যেন নিশান্ত-স্বপন,
সৌরভ-হিল্লোল ছলে।

৩

ওহে কবিবর, ধন্য তব শিক্ষা !
ওহে যোগিবর, ধন্য তব দীক্ষা।
প্রতিভা তোমার অনল-পরীক্ষা
দিয়া আজি দীপ্তিময়ী !
সীতাসতী সম হাসে বরাননী
অনলের ক্রোড়ে কাঞ্চন-বরণী,
কাঞ্চনের সম ! সূর্য্যকান্ত মণি,
তেজে যেন বিশ্বজয়ী।

৪

বহুদিন ছিল অহল্যা পাষাণী ;
রামচন্দ্র আসি, চরণ ছুখানি
রাখিলা যেমতি, হাসি ঋষিরাণী
চমকিলা নিদ্রা ভঙ্গে।
পাষাণের সম ছিল যেন জড়
এই বঙ্গভাষা ! বহুদিন পর
তোমার পরশে কাঁপি থর থর
জাগিয়াছে লীলারঙ্গে !

৫

ভাগবতে যার অপূর্ব্ব ভাবনী
ত্রিবক্রা কুবুজা পাইলা যেমতি
অপরূপ রূপ, অপূর্ব্ব সদ্গতি,
গোবিন্দের আগমনে ;
ওহে যাদুকর, তেমতি, তেমতি,
শ্রীহীনা এ ভাষা লভিয়াছে গতি,
কুবুজা হয়েছে অতি রূপবতী,
তব কর-পরশনে !

৬

পূর্ব্বকালে যথা, সঙ্গীতে সঙ্গীতে
সৌধময়ী টুয় উঠি আচম্বিতে
রাজিল সহসা, কিরণরাজিতে
উষা যথা হিরণ্ময়ী ;
ওহে যাদুকর, তোমার সঙ্গীতে
স্বর্ণবর্ণাময়ী হাসিতে হাসিতে
এ কোন্ অলকা ভাতিল প্রাচীতে
কিরণে কিরণময়ী ?

৭

পূর্ণকালে যথা অমৃত তরঙ্গে,
কল্লোলে, হিল্লোলে, লীলারঙ্গ ভঙ্গে
ত্রিদিব হইতে ভগীরথ সঙ্গে
এসেছিলা মন্দাকিনী,
ওহে যাদুকর, তোমার সঙ্গীতে
নব মন্দাকিনী নেমেছে মহীতে!
চলেছে সাগরে কি লীলা-গতিতে,
কলকল-প্রবাহিনী!

৮

এ জাহ্নবী-তটে এ কি গো নেহারি!
মোহিনী নগরী শোভে সারি সারি,
যেন হাস্যময়ী রূপসী এ নারী
নব হরিদ্বার, কাশী।
সদা লীলাময়ী, বিলাস-বিভ্রমে,
পড়ে সুধানদী অকূল সঙ্গমে,
ক্ষীর-সাগরের পবিত্র সঙ্গমে,
হাসিয়া ফেনিল হাসি!

৯

বাণী-বরপুত্র! সুধামকরন্দ
বিতোর হইয়ে বাণীবক্ষে নিয়ে
হইয়া অমর, আনন্দের কন্দ
আনিয়াছ বঙ্গে তুমি!
ভগবানে আজি করিয়া আহ্বান,
তাই এ প্রার্থনা,—হয়ে আয়ুষ্মান,
থাক জননীর দুলাল সন্তান,
মহিমা-ছটায় বালার্ক সমান,
উজলিয়া বঙ্গভূমি!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

বরণ।

তোমারে বরি হে কবিসম্রাট
কবিসুহৃৎ মহাযজ্ঞে কবি!
বঙ্গবাণীর হে বরপুত্র!
প্রতিভা-প্রতিমা অনুপ রবি!
কবি হোতা কবি উদ্গাতা হেথা
মিলিয়াছে কবি-কুঞ্জ ধামে;
যজ্ঞ-নিপুণ বুধমণ্ডলী
আজি একত্র তোমার নামে।
বঙ্গদেশের ইঙ্গিতে মোরা
হে কবি! তোমায় বরি হে আজি,—
বঙ্গের ফুলে মাল্য রচিয়া
বঙ্গের ফুলে ভরিয়া সাজি।
অমৃত আঁখির উজল আলোকে
হে কবি! তোমার আরতি করি,
অমৃত হিয়ার শুভ-কামনায়
শুভ্র-শোভন চাঁদোয়া ধরি।
গান গেয়ে তুমি গানের রাজারে
গঙ্গারে পূজি গঙ্গাজলে;
পঞ্চাশতের পাদ্যশালায়
সাজাই তোমারে পুষ্পদলে।
বঙ্গের কবি-মনীষীরা আজি
ব্যাপৃত নূতন সবন-কাজে,
কবি-নৃপমণি! তব আগমনী
ধ্বনিছে লক্ষ হৃদয় মাঝে!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

রাজপ্রসঙ্গ।

যাহারা দিল্লির দরবার দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন কলিকাতার রাজ-অভ্যর্থনা-সমারোহ তাহার তুলনায় নগণ্য। আমরা দিল্লির দরবার দেখি নাই—আমিয়া সইলাম বাহিক অনুষ্ঠানে দিল্লিরই জয়, সৈন্যগণের বিশাল সমাবেশ—বা নগর সাজসজ্জার আড়ম্বর সম্ভবত এখানে ততদূর ছিল না, ক্যাডেট কোর—বা হাজরাজড়ার শোভাযাত্রার বৈচিত্র্যেও কলিকাতা নগরী শোভান্বিতা হয় নাই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উৎসবের প্রাণ যে জনসঙ্ঘের হর্ষোচ্ছ্বাস তাহা কি দিল্লি হইতে এখানে কিছুমাত্র কম ছিল! তাহা হইতেই পারে না।

রাজা রাণীর শুভাগমন কাল হইতে বিদায় কাল পর্য্যন্ত এই যে পুণ্যময় নয়টি দিন ইহার প্রতিদিনকার মহোৎসবমত্ততা—জনগণের হৃদয়োত্থিত প্রীতিভক্তি উথলিত আনন্দ প্রবাহ এবং তদ্দর্শনে প্রীতিমুগ্ধ সম্রাটসম্রাজ্ঞীর প্রফুল্ল অভিবাদন—সে কি অপূর্ব্ব হৃদয়মনোহারী সুন্দর দৃশ্য। সে দৃশ্য একবার যে দেখিয়াছে একটি চিরন্তন আনন্দ দৃশ্য তাহার হৃদয়পটে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে!

রাজারাণী কলিকাতার প্রিন্‌সেপ ঘাটে পৌঁছিবামাত্র সেই যে চতুর্দ্দিক জয় জয় রবে পরিপূরিত হইয়া স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল যেন একাকার করিয়া তুলিল তাঁহারা যে কয়দিন এখানে ছিলেন—সে আনন্দধ্বনির আর বিরাম বিশ্রাম ছিল না—কেবলই জয় জয় রাজ রাজেশ্বরের জয়, জয় জয় রাজরাজেশ্বরীর জয়, রাজভক্ত প্রজাগণের সহাস্য মুখ ও উন্নত মস্তক ছাড়া সেকয়দিন আর কিছু দেখা যায় নাই—অসংখ্য জনস্রোতের বিশাল বাহিনী আর সেই দৃশ্য অবলোকনে রাজা রাণীর প্রীতিস্নিগ্ধ প্রশান্ত অভিবাদন—ইহাতেই কলিকাতার মহোৎসব সার্থক ও মহাপ্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল! কোন্ সমারোহের তুলনায় ইহা কম—তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। যেদিন কোন শোভাযাত্রা বা অনুষ্ঠান-উৎসবে রাজা রাণীকে দেখিবার আশা ছিল না—সেদিনও শত শত নরনারী বড়লাট ভবনের সম্মুখে ও ময়দানে জমতা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত; তাহাদের মনের আশা যদি বায়ু-সেবনে বা ভজনালয়ে যাইবার পথে রাজারাণীর দর্শন পায়।

বঙ্গনরনারীর মন রাজভক্তিতে কিরূপ উথলিত হইয়াছিল, পেজেন্ট অথবা শোভা-যাত্রার দিনে পরদার মধ্যে উপবিষ্ট রমণীগণের আচরণ তাহার আর একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া অসূর্য্যম্পশ্যাগণ রাজভক্তিতে উৎসাহিত হইয়া নেটের পর্দ্দার সূক্ষ্ম আবরণও রাখেন নাই। রাজা রাণী অবরোধবাসিনীগণের সম্মুখ দিয়া যাইবেন এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহারা স্বহস্তে সেই নেটের পর্দা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া মুখ বাহির করিয়া দিলেন এবং আনন্দ উৎফুল্ল মুখে দাঁড়াইয়া হুলুধ্বনি এবং জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। কোন্ রাজভক্তির উৎসাহে তাঁহারা সহসা আজন্ম সংস্কার বিস্মৃত হইতে পারিয়াছিলেন তাহা যে একান্ত অকৃত্রিম তাহাতে আর কাহারো সন্দেহ হইতে পারে না। বৃদ্ধা অন্তঃপুরমহিলাগণের

মধ্যে অনেকের রাজভক্তি বড় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। রাজদম্পতির শকট যে সময় পর্দ্দার সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল ও আমাদের রাজা দুই হাত তুলিয়া সেলাম ও রাণী মস্তক অবনত করিয়া অভিবাদন করিতেছিলেন তখন এই সকল প্রবীণমহিলা আনন্দাশ্রু অতিরিক্ত নেত্রে কল্যাণ বর্ষণ করিয়া জয় জয় রবে ও বন্দেমাতরং ধ্বনি করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন।

নিশীথে দিবাগমের ন্যায় আলোক মালায় পরিশোভিতা মহানগরী যেদিন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল; সে রাত্রে নিদ্রাদেবীকে কেহ ডাকে নাই। রাত্রে অসংখ্য লোককে পদব্রজে এবং "শকটে শকটে মেদিনী ছাইয়া" যাইতে দেখিয়া মনে কেমন এক অভূতপূর্ব্ব ভাব হইয়াছিল। কতবার মনে হইয়াছিল আমাদের দয়ালু রাজারাণী এই অসংখ্য দীপালোকে তাঁহাদের প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ের দিব্য ভক্তির আলোক দেখিতেছেন এবং এই অনুরাগ না জানি তাঁহাদের কত প্রীতিকর বোধ হইতেছে।

অনেক সময় বেশী আশা করিয়া নিরাশ হইতে হয়। কিন্তু রাজারাণীর প্রতি আমাদের হৃদয়ের এই স্বতঃ উৎসারিত ভক্তি তাঁহাদের মধুর ব্যবহারে আরও শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। উপস্থাসে রাজারাণীর দয়া করুণা সহৃদয়তার যেরূপ কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়—আমাদের রাজারাণীর ব্যবহারে আমরা তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহাদের উদারতা প্রজাবাৎসল্য ও সহৃদয়তার কত শত কাহিনী আমাদের হৃদয়ে আজ চিরমুদ্রিত এবং আমাদের ইতিহাসে চিরলিপিবদ্ধ হইয়া রহিল।

রাজকর্ম্মচারীগণ যখনই সম্রাট দর্শনলোলুপ প্রজাদিগের দর্শনপথ রোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে—তখনই সম্রাট আজ্ঞা দিয়াছেন,—তোমাদের বেষ্টন দূরে রাখ, বাধা অপসারিত করিয়া দাও—আমার প্রজাপুঞ্জ আমাকে অবাধে দর্শন করুক।

মহারাণী আলিপুরের পশুশালায় গিয়া সেখানে জনতা না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "পশুশালা এমন জনহীন কেন?" যখন উত্তরে শুনিলেন তাঁহাদের আগমন জন্যই অন্য সকলের আগমন বন্ধ করা হইয়াছে তখন সাম্রাজ্ঞী ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন,—তোমরা আমার অন্যকার সুখই নষ্ট করিয়াছ—"you have spoilt my day."

ইহা রাণীর মতই মহৎ হৃদয়ের উক্তি! এমন রাজারাণীর দর্শনলাভ করিয়া আমরা আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছি। ঈশ্বর তাঁহাদের নিরাপদ করুন।

সাহিত্য-পরিষদে শিল্প-প্রদর্শনী।

সাহিত্য-পরিষদগৃহে সেদিন যে ঐতিহাসিক প্রদর্শনী দেখিলাম অন্যত্র আর কোথাও তাহা দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না। প্রেমের অবতার চৈতন্যদেবের, রাজর্ষিতুল্য রাজা রামমোহন রায়ের এবং প্রাতঃস্মরণীয়া দেবী রাণী ভবানীর হস্তাক্ষর দেখিয়া মনে যে অভূতপূর্ব্ব ভাবের

সঞ্চার হইয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। ইতিহাস অতীতকে মানবহৃদয়ে চিরদিন সঞ্জীবিত করিয়া রাখে; এই ঐতিহাসিক প্রদর্শনী আমাদের গৌরবপূর্ণ অতীতকে যে কয়দিনের জন্য আমাদের চক্ষের সম্মুখে এবং অন্তর নিভৃতে জাজ্বল্যমান করিয়া তুলিয়াছিল তাহার ফল বর্ত্তমান হইতে ক্রমে ভবিষ্যতে সঞ্চারিত হইবে। যাহা ছিল অথচ আজ যাহা আর নাই তাহাকে দেশের জীবনে পুনরায় জাগ্রত জীবন্ত করিয়া তুলিবার প্রয়াস ক্রমে সাধনায় পরিণত হইবে সে বিষয় সন্দেহমাত্র নাই। সাহিত্য-পরিষদ কে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহা কিরূপ অনলসনিষ্ঠ, তৎপরতা-প্রধান তাহা তাঁহাদিগের সংগৃহীত দ্রব্যাদি দেখিলে বিশেষরূপে উপলব্ধি হয়। গৌড়ের নিবিড় অরণ্য, যশোহরের খনিত্রাদিত দীর্ঘিকার গর্ভ হইতে খোদিত এবং মীনার কাজে অলঙ্কৃত ইষ্টকখণ্ড সকল, পুরাকালের অলঙ্কারের প্রতিলিপি, সিন্দুর-মণ্ডিত সতীপ্রস্তর, বঙ্গগৌরব প্রতাপাদিত্যের ব্যবহৃত লৌহ আগ্নেয়াস্ত্র এবং প্রস্তর গোলক; প্রাচীন কত শত হস্তলিখিত পুঁথি তাহার কোন কোনখানি একাদশ শত বৎসর পূর্ব্বেকার অথচ এখনও তাহার অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট তাহার মসী এখনও কাকচক্ষুর ন্যায় নিবিড় কৃষ্ণ এবং উজ্জ্বল, গ্রন্থের কাষ্ঠখোদিত আবরণগুলি এখনও সুন্দর এবং অক্ষত। ফরাসী লিখিত একখানি শাহনামা দেখিলাম তাহা মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের লালগোলা হইতে প্রাপ্ত; শুনিলাম পুস্তকখানি প্রাচীন কিন্তু তাহার সুস্পষ্ট কৃষ্ণঅক্ষর শ্রেণী এবং উজ্জ্বলবর্ণ চিত্র সকল দেখিলে সহসা একথা যেন বিশ্বাস হয় না। আমাদের তখনকার লিপিকার এবং চিত্রকরগণ কোন্ উপাদানে এরূপ মসী এবং বর্ণ সকল প্রস্তুত করিতেন আমাদের এখনকার রাসায়নিকগণের তাহা আবিষ্কার করা একটি প্রধান কর্ত্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য। আজকালকার ব্যবহৃত মসী অল্পদিনের মধ্যেই অস্পষ্ট এবং ক্ষীণ হইয়া আসে। শ্রীচৈতন্যদেবের বেদান্তভাষ্য অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত তাহা Magnifying Glass এর সাহায্য ব্যতীত পড়িতে পারা যায় না—তাহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। বুদ্ধদেবের অনেকগুলি প্রস্তর এবং পিত্তলমূর্ত্তি দেখিলাম। ইহার কতক মালদহ মেদিনীপুর এবং কতক নেপাল ও তিব্বত হইতে সংগৃহীত। এ মূর্ত্তিগুলির অনুপম সুন্দর প্রশান্ত মুখশ্রী। অভিজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন এরূপ সুন্দর পিত্তল বুদ্ধমূর্ত্তি কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই মূর্ত্তিগুলি অন্যূন চারিশত বৎসর পূর্ব্বের হইবে। ইহা ভিন্ন ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেকগুলি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিলাম, হিন্দুকুলকলঙ্ক কালা-পাহাড়ের অত্যাচারে, অধিকাংশই নষ্টশ্রী। দুইখানি পুরাতন চিত্র দেখিলাম একখানি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দোললীলা, অপরখানি যুগলরূপ; ছবি দুইখানির অঙ্কনরীতি প্রাচীন প্রাচ্য আদর্শের। ভাবের মাধুর্য্যে এবং বর্ণসুষমায় মনোহর। ছবিদুইখানির অনেকাংশ কীট-দষ্ট তবুও বর্ণলালিত্যের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। শুনিলাম এ দুখানি অতি অযত্নে দিল্লীর কোনও পুরাতন গৃহে পড়িয়াছিল, এলাহাবাদ প্রদর্শনীর সময় আবিষ্কৃত হইয়া তথায় নীত হয়, সাহিত্য

পরিষৎ সেখান হইতে ক্রয় করিয়াছেন। অনেকগুলি সুবর্ণ এবং তাম্রমুদ্রা দেখিলাম তাহার কোনটি চন্দ্রগুপ্ত, কোনটি কনিষ্ক রাজার রাজত্বকালে প্রচলিত ছিল, সেগুলি কত শত বৎসরের পুরাতন তাহা পাঠক অনুমান করিবেন। শুনিলাম স্থানাভাবে প্রদর্শনীর এই সকল অমূল্য দ্রব্যাদি ইহার পর গুদামজাত হইয়া থাকিবে। দেশে যাঁহাদিগের সাহিত্য এবং ইতিহাসের প্রতি সম্মান আছে যাঁহারা অতীতের গৌরবমর্য্যাদা বুঝিয়া থাকেন, আশা করি তাঁহারা সকলেই এই মহামূল্য সামগ্রীগুলি যাহাতে সুন্দরভাবে, সর্ব্বদা সংরক্ষিত হইতে পারে এমন গৃহনির্ম্মাণের জন্য সাহিত্য পরিষদকে অর্থ সাহায্য করিয়া সমগ্র দেশকে উপকৃত এবং আপনাকে গৌরবান্বিত করিবেন।

প্রাচ্য চারু-শিল্প-প্রদর্শনী।

গত ২০শে জানুয়ারি হইতে ৩রা ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত চৌরঙ্গীতে এই প্রদর্শনী খোলা ছিল। ইহাতে প্রাচীনকালের চিত্রাবলীর সহিত চিরন্তন প্রাচ্য আদর্শে অঙ্কিত অনেকগুলি আধুনিক চিত্রও প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রদর্শনী-গৃহ এমন সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়াছিল যে তাহাতে যে কেবলমাত্র গৃহখানির শোভাবর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহা নহে, প্রদর্শিত প্রত্যেক চিত্র এবং চারুসামগ্রী যেন সুন্দরতররূপে ফুটিয়াউঠিয়াছিল। চিত্র ব্যতীত অনেকগুলি পিত্তল বুদ্ধমূর্ত্তি; সূচের কারুকার্য্য, শাল শাড়ী, পুরাতন গঠনের তৈজসপত্রও সজ্জিত ছিল। এ প্রদর্শনী একবার দেখিয়া মনের তৃপ্তি হয় না—প্রদর্শিত চিত্রাবলীর সৌন্দর্য্য এবং নৈপুণ্য সম্পূর্ণ উপভোগ কিম্বা উপলব্ধি করাও কঠিন হইয়া উঠে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের একবারের অধিক দেখিবার সুবিধা ঘটে নাই, তবুও যে সকল চারুচিত্র প্রথম দর্শনেই মনকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং এখনও পর্য্যন্ত মনে যাহাদের সৌন্দর্য্য-স্মৃতি ক্ষীণ হয় নাই সেইগুলির উল্লেখ করিব। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সমুদ্র-গৃহিতা' এবং "পদ্মপর্ণ" সুকুমার বর্ণসুষমায়, গঠনলালিত্যে এবং ভাবমাধুর্য্যে প্রথম দৃষ্টিতেই মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর অজন্তাগুহার চিত্রাবলীর প্রতিলিপি বড়ই সুন্দর; তাঁহার অঙ্কিত রামায়ণ দৃশ্যাবলি অতীব মনোহর। আমাদের মনে হয়, সমস্ত পৌরাণিক চিত্র এইভাবে অঙ্কিত হওয়া উচিত। এ চিত্রগুলি যেন সত্যই পৌরাণিক যুগের—ইহার মধ্যে একালের এতটুকু আভাষ নাই—দেখিতে দেখিতে আমরা যেন রামায়ণের কালের মধ্যে গিয়া পড়ি। ইহাই ইহার বিশেষত্ব। দুঃখের বিষয় আরো অনেক দৃশ্য অঙ্কিত না হইলে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ সম্পূর্ণ হইবে না, আশা করি নিপুণ চিত্রকর এ অসম্পূর্ণতা রাখিবেন না। শ্রীযুক্ত নন্দলালের আর একখানি উৎকৃষ্ট চিত্র—রাধাকৃষ্ণ।

শ্রীমান অসিতকুমার হালদারের "বাতায়ন পার্শ্বে" নামক ছবিতে অঙ্কিত রমণীমুখখানি বড় রমণীয়, তাহা প্রতীক্ষার ব্যাকুলতায় এবং প্রেমের করুণায় পরিপূর্ণ; এখানি দেখিলে

কবি রবীন্দ্রনাথের রচিত মায়ার খেলার "সেই মধুর মুখ জাগে মনে কি স্বপনে কি স্বপনে" গানটি শ্রবণ হইতেই মনে আসে।

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত চিত্রগুলি বিশেষ আনন্দদায়ক। মাত্র দুএকটি নিপুণ রেখাপাতে চিত্রকর কেমন অবলীলাক্রমে সুন্দর ভাব ও গঠন একত্রে উজ্জ্বল ও পরিষ্কার করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহা তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় সন্দেহ নাই। তাঁহার 'পুণ্যের মন্দির' দৃশ্য বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

পুরাতন চিত্রাবলীর মধ্যে অমরনাথ তীর্থের সোপান রচনা এবং পার্শ্বতী কর্ত্তৃক মহাদেবকে ভাঙ্গ ঢালিয়া দিবার চিত্র দুইখানি বড় সুন্দর। অমরনাথ তীর্থে যাইবার সোপানাবলী প্রতি বৎসরই গঙ্গার প্রবল স্রোতে ভাঙ্গিয়া যায়, প্রতি বৎসরই প্রভূত পরিশ্রমে আবার তাহা গঠন করা হয়। প্রথম ছবিখানিতে সেই দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে: একদিকে প্রবল স্রোতের মুখে সুসজ্জিত তরণীতে অনেকগুলি যাত্রী গীতবাদ্যোচ্ছ্বাসসহকারে ভাসিয়া চলিয়াছেন, অপর দিকে আবার অনেকে বহুপরিশ্রমে প্রস্তর সংগ্রহ, বহন ও স্থাপন করিয়া দিব্য তীর্থের আরোহণ সোপানসকল নির্ম্মাণ করিতেছেন। যাঁহারা ভাসিয়া চলিয়াছেন তাঁহারা বিলাসমুগ্ধ নরনারীর মত ভাসিয়াই যাইবেন, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য যাহাই হউক অমরনাথে গিয়া পৌঁছান তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিবে কিনা সন্দেহ কিন্তু যাঁহারা প্রাণপণ শ্রমে ঊর্দ্ধমুখে সোপান রচনা করিয়াই চলিয়াছেন তাঁহাদের এত কষ্টের মধ্যে নিশ্চিত সান্ত্বনা এই যে অমরনাথের চরণ দর্শন সৌভাগ্য হইতে কেহই তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। দ্বিতীয় চিত্রে ভাবেভোলা মহাদেব আনন্দে আত্মবিস্মৃত, ভাঙ্গের পাত্রটী বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, পার্ব্বতী হাসিমুখে অতি সুন্দর ভঙ্গীতে উষ্ণোদক পানীয় ঢালিয়া দিতেছেন, তাঁহার মুখের ভাবে আনন্দের হাসির সঙ্গে সঙ্গে পতি সোহাগিনী সতীর গর্ব্বটুকু বেশ ফুটিয়াছে; ভাবটা, বিশ্বেশ্বর তুমি, ত্রিলোক তোমার দ্বারে প্রার্থী; তবু আমারই সম্মুখে তৃষ্ণার্ত্তপাত্রটি বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছ।

মহামান্য বড়লাট বাহাদুর এবং তাঁহার পত্নী লেডি হার্ডিং এই শিল্পপ্রদর্শনী একদিন দেখিতে আসিয়াছিলেন। সেদিন শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও অসিতকুমার হালদার প্রভৃতি চিত্রশিল্পীগণ উপস্থিত ছিলেন। লর্ড হার্ডিংএর নিকট তাঁহাদের সকলেরই পরিচয় প্রদান করা হয়। বড়লাট বাহাদুর এই সকল তরুণ শিল্পীদিগকে সুমধুর ভাষায় উৎসাহ প্রদান করেন। লেডি হার্ডিং এই প্রদর্শনীর চিত্রাবলী বিশেষ যত্নের সহিত পরিদর্শন করিতে থাকেন এবং ভারতীয় শিল্পের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

দেখিলাম, অজন্তার চিত্রসমূহের আদর্শে গবরমেণ্ট-আর্ট স্কুলের কয়েকটি ছাত্র কতকগুলি রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এইগুলি মুদ্রিত হইয়া রেখাচিত্রের আদর্শরূপে প্রচারিত হইবে শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। এই রেখাচিত্রগুলি অভ্যাস করিলে আমাদের দেশের ভাবীচিত্রকরগণ অতি সহজে প্রাচ্য আদর্শে অভ্যস্ত হইতে পারিবেন এবং ভবিষ্যতে আমাদের প্রাচীন চিত্র-

কলা নবীন সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া সুন্দর অতীতকে সুন্দরতর ভবিষ্যতে পরিণত করিতে পারিবে সে বিষয় সন্দেহ নাই।

আজকালকার দিনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ঐতিহাসিক প্রদর্শনী এবং প্রাচ্য চিত্র প্রদর্শনী যে কত উপকার করিতেছে ও করিবে তাহা অধিক করিয়া বলাই বাহুল্য। বিরাট সভাসমিতির ন্যায় এগুলি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না সত্য কিন্তু এ সকল বিষয় জনসাধারণ অপেক্ষা ব্যক্তি বিশেষেরই সাধনার সামগ্রী। যে সকল নিভৃত সাধক আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ গঠন করিয়া তুলিতেছেন যাঁহাদের বহির্দৃষ্টি ভবিষ্যতে, অন্তর্দৃষ্টি অতীতে নিহিত তাঁহারাই এই সকল প্রদর্শনী হইতে সাধনার উৎসাহ এবং আকাঙ্ক্ষার প্রবলতা সঞ্চয় করিয়া আমাদের দেশ ও কালকে ঐশ্বর্য্যান্বিত করিবেন এই আশার আলোক আমাদের মনে নূতন আনন্দ সঞ্চার করিতেছে।

কবি-সম্বর্দ্ধনা।

ঘরের বস্তু পরের কাছে দেখা বস্তুর স্বরূপজ্ঞানের এক উপায়। ছেলেবেলায় যাহা আমরা সহস্রবার গাহিয়াছি, সহস্রবার আবৃত্তি করিয়াছি, সহস্রবার নকল করিয়াছি —তাই দেখি সেদিন একটি বালিকাবিদ্যালয়ের বালিকারা অভ্যাস করিতেছে, সেড হার্ডিং আসিবেন, প্রাইজ দিবেন, তাঁকে শুনাইবে। "বাল্মীকি-প্রতিভা" রবীন্দ্রনাথের একখানি আদিকাব্য। বোধ হয় ত্রিশাধিক বর্ষ পূর্ব্বে কোন শ্রীপঞ্চমীতে পূজনীয় কবিবরের অগ্রজগণ প্রবর্ত্তিত সারস্বত সম্মিলন উপলক্ষে রচিত ও অভিনীত। বাড়ীর উৎসব, বাড়ীর লোকেই অভিনেতা, বাড়ীর দুটী মেয়ে লক্ষ্মী ও সরস্বতী, এবং কবি নিজেই বাল্মীকি। বড়রা যাহা করে ছোটরা তাহার অনুকরণ করিয়াই থাকে। বড়দের অভিনয় হইয়া গেলে বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েরা বাল্মীকি প্রতিভা লইয়া পড়িল। কেহ বাল্মীকি, কেহ ব্যাধ, কেহ সরস্বতী, কেহ লক্ষ্মী—কেহ গেরুয়া পরা, কেহ মণিমাণিক্যে ঝলমল করা—সেই সুর, সেই ভঙ্গি, সেই রস—তোতার মত অবিকল অনুকরণ। তাই তোতার মত বোধশক্তি শূন্যতায় উহার যথার্থ মর্ম্মটি উপলব্ধি করণেও অসমর্থ। যাহা আপৈশবের লীলার খেলায় জড়িত মিশ্রিত তাহার অন্তর্নিহিত সত্য রসটুকু আয়ত্তগম্য নয়। কখন হয়ও না বুঝি—যদি না কিছুকালের ব্যবধানে একদিন সে হঠাৎ ধরা দেয়! জন্মাবধি নিত্য আপনার মুখ দেখিলে নিজের প্রতিবিম্বদর্শনে আর কোন বিস্ময়ের উদ্রেক হয় না, কিন্তু যে মানুষ বহু বর্ষান্তে আপনাকে পুনরায় আদর্শে দেখে সে একটু নূতন রসে অভিভূত হয়, সেটি সত্য উপলব্ধির রস। রবীন্দ্র-জীবনের যে সত্যটুকু তাহা সেদিন এইরূপে হঠাৎ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। একটি নয় দশ বৎসরের মেয়ে বাল্মীকি সাজিয়াছে। স্বাভাবিক প্রতিভাশালিনী

বালিকা বক্ষে দুটী হাত রাখিয়া শির আনত করিয়া শিশু-বনদেবীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া যখন গাহিল—

নমি নমি ভারতী তব চরণ কমল
পুণ্য হল বনভূমি ধন্য হল প্রাণ!
পূর্ণ হল বাসনা দেবি কমলাসনা
ধন্য হল ধন্যাপতি পলিল পাষাণ।

কঠিন ধরাভূমি এ কমলাসনা তুমি যে
জনম লভিলে হেন কমল কর মাঝ
তব কমল পরিমলে মাখ ছবি ভরিয়ে
চির দিবস করিব তব চরণ সুধা পান।

তখন তাহার ভক্তিরসধারায় ধরণী যেন প্লাবিত হইল। আর চকিতে সভা দর্শন করাইয়া দিল যে, এ দস্যুপতিরূপী কবি রবির

"যাও লক্ষ্মী অলকায় যাও লক্ষ্মী অমরায়"—বাল্মীকি-প্রতিভা।
বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ।

নিজের মর্ম্মের কথা। লক্ষ্মীপ্রতিম একটি মেয়ে লক্ষ্মী সাজিয়া রয়াদি দিয়াও যখন বাল্মীকি-রূপী বালিকাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিলনা—সে লক্ষ্মীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া উদাস ভাবে দিশার দিশার দৃকপাত করিয়া গাহিতে লাগিল—

কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা
তুমি ত নহ সে দেবী কমলাসনা
কোরোনা আমারে ছলনা।

তখন মনে হইল বুঝি বাল্মীকির আত্মা ক্ষণকালের জন্য এই কন্যার দেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কি এনেছ বলবান, তাহা যে চাহে না প্রাণ
দেবি গো চাহিনা চাহিনা
মণিময় ধূলারাশি চাহি না,
তারা সুখী যারা ঘর ছোট ঘর ছোট
আমি দেবি সে সুখ চাহিনা।
যাও লক্ষ্মি অলকায় যাও লক্ষ্মি অমরায়

এ বনে এসনা এসনা—এসনা এ যৌবনস্থ ভূমিতে।
যে বীণা শুনেছি কাণে মনপ্রাণ আছে তোর
আর কিছু চাহি না চাহি না!

কার বীণা শুনিয়া কার মনপ্রাণ তোর আছে? প্রশ্নটা আবার অকস্মাৎ মনের প্রান্তে আসিয়া উঠিল। এ যে কবিরই নিজের আত্মকথা। এ কথা এতদিন কেন বুঝি নাই! শেষ দৃশ্যে বীণাপাণির নিকট হইতে নতজানু বাল্মীকি-বাল্মীকি বরলাভ করিল।

আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান।
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ প্রাণ।
যে রাগিণী শুনে তোর গলেছে কঠোর মন
সে রাগিণী তোরি কণ্ঠে বাজিবে হে অনুক্ষণ।
অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণতলে,
চারিদিকে দিক্-বধূ আকুল নয়ন-জলে।
মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা
অবনি পলিয়া শিশা হইবে অশ্রুর ধারা।
যে কলপ্রপাতে আমি ডুবিলাম এ ভুবন
শতস্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগজ্জন।
যেথায় হিমাদ্রি আছে, যেথা তোর বাস হবে
যেথায় জাহ্নবী বহে, তোর কাব্য-স্রোত ব'বে।
সে জাহ্নবী বহিবেক অমৃত ভুবন দিয়া
পুণ্যময় পবিত্র করি মরভূমি উর্ব্বরিয়া,
তোর পদ্মাসন তলে রহিবে আসন তোর
সিন্ধু সব মরু গীতে পড়িবে ঘুমায়ে ঘোর,
যদি তোর পদতলে কবি বালকেরা সব
তুমি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত নব।
এই যে আমার বীণা দিনু তোরে উপহার
যে গান গাহিতে সাধ জাগিবে হৃদয়ে তার।

অনুভব করিলাম এ ভারতবর্ষের আদি কবি বাল্মীকির অতীত ইতিহাস নহে, এ যুগের নবীনকবি রবীন্দ্রের ভবিষ্যপুরাণ। এবং সেদিন টাউন হলের বিপুল জনতার মহোৎসবে সে পুরাণ কলিত দেখিলাম।

যাঁহারা পুরীতে সমুদ্র দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন সাগরতরঙ্গ যখন বেলাভূমুখে ধাবিত হয় তখন কেমন করিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া আসিয়া সুদূর ফেনাংশটুকু আক্ষয় করে, প্লাবিত করে, তিরোহিত করে। এক একটা উত্তালতরঙ্গ উত্থিত হয় আর তখন এ পিঠের ও পিঠের কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হয় না। সেদিনকার সভায় কার্য্যারম্ভকালে জনতরঙ্গ সেইরূপ উদ্বেল সমুদ্রের প্রায়ই আবেগ করিয়াছিল। লোকপুঞ্জের পর লোকপুঞ্জ অগ্রসর হইতেছে ও বেদীর সম্মুখভাগ ও দুই পার্শ্ব স্ফীত করিতেছে। ক্রমে সেই প্রকাণ্ড হলের সমস্তটা লোকে লোকময় হইয়া গেল, আর স্থানং তিলধারয়েৎ। কিন্তু এখনও দূরাগত তরঙ্গসঙ্ঘর্ষের ন্যায় সিঁড়ির উপর পদশব্দ শ্রুত হইতেছে। যখন সভার কার্য্য-সূচী, অভিনন্দন, বা আর কোনরূপ কাগজ সভাসীনগণের মধ্যে বিতরণের প্রয়াস হইল তখন তাহা প্রাপ্তির জন্য আগ্রহ অধৈর্য্য ও কলকলা এক মহা বন্যাবায়ুর সৃজন করিল। সেই বাত্যাবিক্ষুব্ধ লোকসমুদ্র আর প্রশান্ত হইবে কিনা সন্দেহ হইতে লাগিল।

রবীন্দ্র আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতে নানা প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী ও সেবিকার হলে পদার্পণ বা বেদীতে আরোহণের সময়কালেই তাঁহাদের অভিজ্ঞান ও সম্মানজ্ঞাপনসূচক করতালি ধ্বনিত হইতেছিল। লোকবিশ্রুতির বা উপস্থিত জনগণের অভ্যর্থনানুসারে শব্দের প্রগাঢ়তার তারতম্য উপলব্ধি হইতেছিল। সাহিত্য-পরিষদের সভা পরিবৃত রবীন্দ্রনাথের মূর্ত্তি যখন লোকের নয়নপথে উদ্ভাসমান হইল তখন একটা মত্ত আবেগে

সেই বৃহতী সভা বিলোল হইয়া উঠিল। এতক্ষণে সাহিত্য-সম্রাট আসিলেন। যাঁহাকে পুরস্কার করিয়া আজ বাঙ্গালী জগৎবাসীর নিকট আপনাকে এক পুরাই জাতি প্রতিপন্ন করিতে চায় এতক্ষণে তাঁর শুভাগমন হইয়াছে। করতালি আর থামে না, হর্ষকাকলীর আর অবসান নাই। ভারতবর্ষীয় কবি সম্রাট, সুতরাং তাঁহার চেহারাখানাও রাজর্ষি তুল্যই। ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য মানুষের হাতে পড়িয়া যতদূর অবহেলিত হইতে পারে তা হইয়াছে। জীবাত্মার প্রভাটি অসম ও অসংযত দাড়ির ঝোপে প্রচ্ছন্ন, কিন্তু ভস্মঢাকা অগ্নির ন্যায় প্রতিভার তেজ কিছুতেই আচ্ছাদন করিতে পারিতেছে না। রবীন্দ্রনাথ

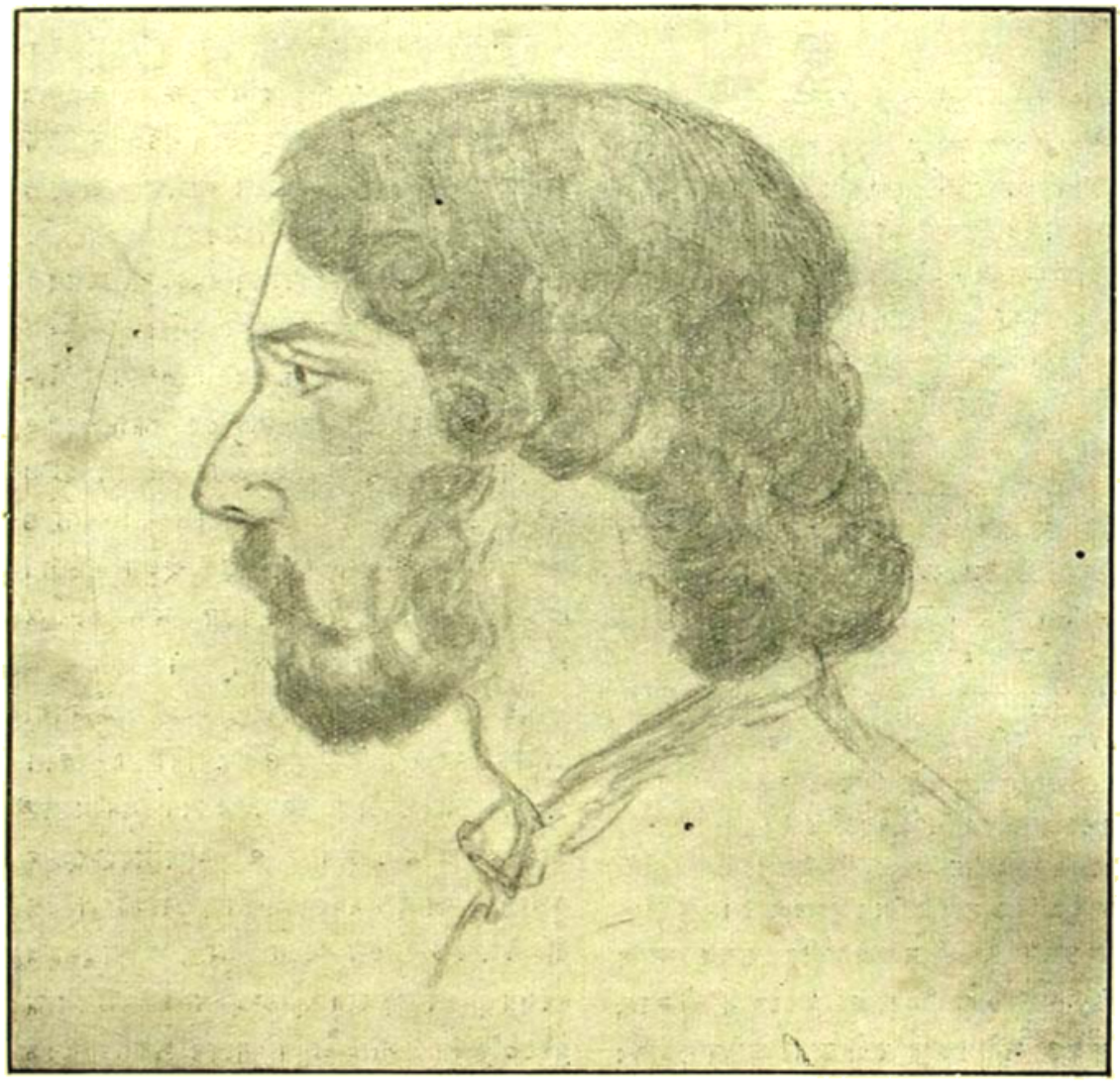

১৮৯২ সালে রবীন্দ্রনাথ
শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক রেখা চিত্রিত

আসন গ্রহণ করিলে বেদীর নীচে তাঁহার সম্মুখেই একটা লোকময় প্রাচীর উঠিয়া গেল, লম্বা লাইতে বসা দর্শকবৃন্দ তার আড়ে পড়িয়া গেলেন, তাঁরা বেদীস্থগণের অদৃশ্য হইলেন—এবং বেদীস্থ সকলে তাঁদের অদৃশ্য হইলেন। কখন কখন প্রাচীরের মধ্যে ফাটল ঘটিলে আবার পরস্পরকে দেখা যায় ও পরস্পরের উৎসাহপূর্ণ মুখচ্ছবিতে আনন্দ প্রাপ্তি হয়।

কার্য্য আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভার উদ্বোধন করিলেন। প্রবল হাতমর, ব্যাধি ও জরার ফলে পতনোন্মুখ হইলেও দেশের মঙ্গলজনক সকল অনুষ্ঠানে অনলসভাবে উৎসাহশীল, মতদ্বৈধের মধ্যে ঐক্য অন্বেষী, বিসম্বাদের মধ্যেও প্রীতিকর্ষী, রক্তের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে দেশানুরাগে ভরা সজ্জন দ্বিজোত্তম ওটিবত প্রীতিপূর্ণ সুসঙ্গত কথায় কার্য্যারম্ভ করিয়া দিলেন। তৎপশ্চাৎ আচার্য্যকৃত মঙ্গলাচরণ হইল। আমার মতে এইখানটায় কার্য্যসূচী প্রণয়নকারীগণের অগ্রপশ্চাৎ বিভ্রম হইয়া গিয়াছে।

প্রতীচ্য দেশের কানুন অনুসারে সভাপতির প্রারম্ভিক বক্তৃতার পূর্ব্বে সভার আর কোন কার্য্যই হইতে পারে না। কিন্তু প্রাচ্য কানুনে মঙ্গলাচরণ সভাপতির উদ্বোধনার অপেক্ষা রাখে না—তাহা সর্ব্বাগ্রেই উচ্চার্য্য। কি নাটকে, কি উপন্যাসে, কি ইতিহাসে কি পুরাণে কি সভায় কি পরিষদে মঙ্গলাচরণ সর্ব্বত্রই অগ্রাসন পাইয়া থাকে।

যে কবিং পুরাণমনুশাসিতারং
অণোরণীয়াংসং
সর্ব্বস্য ধাতারং অচিন্ত্য রূপং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
গূঢ় মনুপ্রবিষ্টং।

বিশ্বচক্ষুঃ কে মনন করিয়া শুভবুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত হইতে হইবে তাঁহার আবাহন প্রথমে না রাখা নিতান্ত ভ্রমবশতঃ হইয়া থাকিবে। বিশেষতঃ তন্ত্রীযন্ত্রের একতানবাদন যখন পূর্ব্বেই হইয়াছিল তখন মঙ্গলাচরণ তৎপূর্ব্বেও হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। সভাপতির উদ্বোধনার পর নবীন কবি যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চি বিরচিত অভ্যর্থনা সঙ্গীত গীত হইল। তাহার প্রথম দুইটি চরণেই সভার মর্ম্মটিতে একেবারে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

স্বাগতবচনে আজি স্বাগত সভা মাঝে
অমৃত-চিত-কমলে বেথা আসন তব রাজে।

কিন্তু গীতটি ভাল হইলে কি হইবে সুরটি হরবারী হওয়ায় একদিন মাত্র গাহিয়া সেলফে উঠাইয়া রাখিবার যোগ্য হইয়াছে—নিত্য ব্যবহারের প্রলোভন বর্জ্জিত। অতঃপর মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে সুললিতছন্দে কবিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার শব্দ বিন্যাসনৈপুণ্য এমন সুন্দর যে জানা না থাকিলে তাঁহার শ্লোকগুলিকে অনায়াসে বহুশতাব্দী পূর্ব্বের কোন সংস্কৃত কবির রচনা বলিয়া চালান যাইতে পারিত। পণ্ডিত ঠাকুর-প্রসাদ আচার্য্যের উপনিষদ গাথা পাঠ ও মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্নের আশীর্ব্বচনে বিংশশতাব্দীর রবীন্দ্র সম্বর্দ্ধনা সভা এক অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্যে ও সম্ভ্রমে ভরিত হইল।

তদনন্তর কবিবর নাট্যোল্লাধিপতি শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র-

মাইকেল এঞ্জেলো ১৫০০ সালে অঙ্কিত

মাইকেল এঞ্জেলো ১৫০০ সালে অঙ্কিত

ইটালির শিল্পীকুলগুরু মাইকেল এঞ্জেলো বুয়োনারোটি কর্ত্তৃক অঙ্কিত

নাথ অর্ঘ্যদান করিতে উঠিলেন। অনেকদিন ইঁহাকে কোন সভাসমিতিতে দেখা যায় নাই। ইহার বঙ্গসাহিত্যপ্রেম, ভালমন্দ নির্ণয়ের বিচক্ষণতা ও স্বাভাবিক কতকগুলি উচ্চ মনোবৃত্তির সংস্পর্শ হইতে বঙ্গের মনীষী সমাজ কিছুকাল হইতে বঞ্চিত এবং সে বঞ্চনা তাঁহার আত্মপ্রবঞ্চনাও বটে। তাই আজ তাঁহাকে অনপেক্ষিত ভাবে বেদীর উপর অর্ঘ্য হস্তে দেখিয়া দর্শকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই আনন্দিত হইলেন। কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের ন্যায় নির্ভীক সত্যসন্ধ মহারাজ আজিকার কবিসূয় যজ্ঞে শিশুপালধর্ম্মী যাহারা ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া বাধাদানের চেষ্টা করিয়াছিল বড় নিপুণতার সহিত প্রথমে তাহাদের খবর লইলেন। সভামধ্যে একটা বৈচিত্র্যের ঢেউ খেলিয়া গেল। তিক্ত স্বাদের সম্ভাবনার আভাসটুকু দিয়া মধুরস্বাদকে আরও তিনি ঘনীভূত করিয়া দিলেন। বক্তব্যের পরিশেষে মহারাজ কবিসখাকে অর্ঘ্যদান করিলেন। একটি রৌপ্যপাত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে রক্ষিত ধান্য দুর্ব্বা, অক্ষত, সিদ্ধার্থ, চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কুঙ্কুম, দধি, মধু, ঘৃত পুষ্প ও গোরচনা। মাল্যদান করিলেন সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়—একটি স্বর্ণসূত্রমাল্য ও একটি পুষ্পমাল্য। তৎপরে একটি স্বর্ণপদ্ম উপায়ন প্রদত্ত হইল। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যময় প্রস্ফুটিত শতদল। ইচ্ছামত তাহাকে মুদিত করা যায়। তাহার আধারটিও অত্যন্ত মনোহারী! জিনিষটি সংগৃহীত হইয়াছে প্রাচ্যোশিল্প প্রদর্শনী হইতে —অনুমান হয় এটি কাশ্মীর অঞ্চলের একটি বহু পুরাতন দুর্লভ কারুকার্য্য।

সাহিত্যপরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যখন পুঁথির আকারে হস্তীদন্তের পত্রে উৎকীর্ণ অভিনন্দন পাঠ করিতে উঠিলেন—তখন স্পষ্টই দেখা গেল বৃদ্ধ সাহিত্যরথী নিতান্তই অভিভূত হইয়াছেন। তাঁহার অভিনন্দনের ছত্রে ছত্রে বর্ণে বর্ণে সত্যের হস্ত চিহ্ন দেখাইতে দেখাইতেই যেন তাঁর কণ্ঠস্বর বিগলিত হইতে লাগিল—দেহ কম্পায়মান হইল। তিনি গদগদকণ্ঠে কহিলেন—

কবিবর, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অঙ্কশোভা বর্দ্ধন করিয়া বাঙ্গালার মাটি ও বাঙ্গালার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের নবজীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্দ্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল। সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণজীবন স্পন্দিত হইল, সেই স্পন্দন-প্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব কুসুমসম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইল। তোমার পূর্ব্বগামিগণের চিত্তক্ষেত্র তোমাকে বঞ্চিত করিল, অনুগামিগণের মুক্তক্ষেত্র তোমাকে পুরস্কৃত করিল। বাগ্দেবতার স্নেহাননের শুভ্রজ্যোতি তোমার ললাটদেশে প্রতিফলিত হইল। তদবধি বাণীবন্দিরের প্রতিষ্ঠিত নানাপ্রকোষ্ঠে তুমি বিচরণ করিয়াছ; রত্নবেদির পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী আতাতন্ত্রিনীকে মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার আতাতন্ত্রিনী দেবপ্রসাদের আনন্দসুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। বীণাপাণির অঙ্গুলি প্রেরণে বিশ্বযন্ত্রের তন্ত্রীসমূহে অনুক্ষণ যে ঝঙ্কার উঠিতেছে, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ; সুপর্ণরক্ষিণী গায়ত্রীকর্ত্তৃক পঞ্চর্ষিরক্ষিত অমৃতরসের দেবলোকে সমবণ্টনে মর্ত্ত্যোপরি যে ধারাবর্ষণ হইয়াছিল, পৃথিবীর ধূলিরাশি হইতে বিকর্ষিত করিয়া মর্ত্ত্যলোকে সেই অমৃতকণিকার বিতরণে তোমার সহকারিতা গ্রহণ যাহা তাঁহারা তোমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। পঞ্চাশৎ সংবৎসর

তোমাকে অঙ্কে রাখিয়া তোমার স্তন্য অমৃত তোমাকে স্নেহপীযূষে বর্দ্ধন করিয়াছেন; সেই সুধন-মনোমোহিনীর উপাসনাপরায়ণ সন্তানগণের মুখপত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশ্বপিতার নিকট তোমার শতায়ুঃ কামনা করিতেছেন।

কবিবর, শতায় তোমার অনুমোদন করুন।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পূর্ব্বে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও কিছু বলিয়াছিলেন। বাণী যে রবীন্দ্র প্রতিভাকে শৈশবেই উদ্বোধিত করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—

যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়
শতস্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগৎময়
সে জাহ্নবী বহিবেক অমৃত হৃদয় দিয়া
প্লাবনে পবিত্র করি মরুভূমি উর্ব্বরিয়া—

গুরুদাস বাবু সেই বাক্যের সার্থকতা দেখাইলেন। তাঁহার ন্যায় আইন ও গণিত-ব্যবসায়ীর শুষ্ক হৃদয় মরুকেও রবীন্দ্রের কাব্য জাহ্নবী কিরূপে সিক্ত ও উর্ব্বরিত করিয়াছে তাহা বর্ণনা করিলেন—প্রমাণ স্বরূপ স্বরচিত এই গীতটি শুনাইলেন—

"ওই বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে কোলেতে আয়
অজান তিমিরে তব সুপ্রভাত হলো কোথা
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের রবি,
নব 'বাল্মীকি-প্রতিভা,' দেখাইতে পুনর্ব্বার।
দেহ তারে প্রাণ ভরে, সুধাসুখা যাবে ঘুরে,
পুজিবে মায়ের আজি, পাবে মাতি অবিরাম।
'মণিময় ধূলিরাশি', খোঁজ যারা দিবানিশি,
তাদের মজিলে মন খুঁজিতে চাবেনা আর॥

তাঁহার বক্তব্যে গুণগ্রাহী তীক্ষ্ণদর্শী মনীষী বৃদ্ধ এই কবি-সম্বর্দ্ধনা সভাকে যে বিশেষরূপে বিশেষিত করিয়া ছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিলেন—'এই আবালবৃদ্ধবনিতা শোভিতা সভা।' বাস্তবিকই এই সভায় অপূর্ব্বতা তিনি একটি বিশেষত্বেই পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। কল্পনা কর টাউনহলের মত স্থানে এমন বিরাট-সভা, তার প্রায় অর্দ্ধেক বঙ্গমহিলাগণে ভরা। ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন—"বাণী মন্দিরের যজ্ঞবেদীর পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী ভ্রাতাভগিনীকে মুক্ত হস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার ভ্রাতাভগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দ সুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে।" সে আনন্দসুধা এত প্রগাঢ়, তজ্জনিত কৃতজ্ঞতানুভূতি এত তীক্ষ্ণ যে আজ বঙ্গজননীর অঙ্কশোভা বর্দ্ধনকারিণী কন্যারাও পুত্রগণের সহিত একক্ষেত্রে সমবেত না হইয়া পারিলেন না। যে সকল মেয়েরা জন্মে কখনও টাউনহল দেখেন নাই তাঁহারাও আজ কর্ত্তব্যবোধে কেবলমাত্র দেশ-পূজ্য কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তাহাতে আজিকার সভার মান কত বাড়িয়া গিয়াছে—আর তাহার কি সুন্দর শোভাই হইয়াছে। অগণিত পুরুষরাজির মধ্যে বিদ্যুদ্জ্যোতিবৎ একএকটি বঙ্গললনার মুখ যখন নয়নে প্রতিভাত হইতেছে তখন মনে হইতেছে আজি এ সভা ধন্য, কবি ধন্য, মাতা বঙ্গভূমি ধন্যা।—কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ—এ মুনি বাক্য বঙ্গদেশ পালন করিয়াছে ও করিতেছে সুতরাং বঙ্গমঙ্গল বিধাতার নিয়ত।

এ সভার সমাপ্তি উদীয়মান নবীন কবিগণের ও বঙ্গ দুহিতাগণের কবিকে পুষ্প গুচ্ছোপহার দানে। উনবিংশ শতাব্দীতে নব জাতীয় জীবনের অভ্যুদয়ের প্রারম্ভে বাঙ্গালী গুণীর আদর যথেষ্টভাবে করিতে শেখে নাই। জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে গুণগ্রাহিত

শক্তিও পুষ্টিলাভ করিয়াছে—আজিকার সভা তাহাই প্রমাণ করিতেছে। মাইকেল, হেমচন্দ্র ও বঙ্কিমকে যে সম্মান দিতে পারা যায় নাই—সে ত্রুটি যেন আজ রবীন্দ্র সম্মানে বঙ্গবাসী পূরা করিয়া লইতেছে। রবীন্দ্রের প্রতিভা যেমন সাগরাভিমুখী বিশালনদের ন্যায় বহুদীকে অন্তর্লীন করিয়াছে, রবীন্দ্রের প্রাপ্যও যেন সেইরূপ হইল। বুঝি অগ্রগামী-গণকে দেয় কড়িও তাঁহারই হাতে সমর্পণ করিয়া বঙ্গবাসী আপনাকে ঋণমুক্ত করিল। এমন মহান উপলক্ষ পাইয়া সকলে বাঁচিল। শুধু কবিগণ নয়, শুধু যুবকগণ নয়, শুধু নারীগণ নয় —শতমুখে প্রবাহিত আধুনিক বঙ্গজীবনের সকল ধারাগুলি আজ আসিয়া প্রতিভাসম্মানে মিলিত হইয়াছে,—উকীল ব্যারিষ্টার জজ ডাক্তার রাজা জমিদার মুন্সেফ ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যাপারী ব্যবসায়ী, কবি চিত্রকর মন্ত্রীসভার সদস্য বা সংবাদপত্রের সম্পাদক সকলেই এখানে সাগ্রহে উপস্থিত।

কেননা

"বাজাও তুমি সোনার বীণা, হে কবি! নবরঙ্গে,
নাচাও তুমি, কাঁদাও তুমি, হাসাও তুমি রঙ্গে
তোমার গানে—তোমার সুরে—
উঠিছে জাগি বঙ্গ ঘুরে,
লক্ষ হিয়া গাহিয়া আজি উঠিছে তব সঙ্গে।"

কেননা

"কীর্ত্তি গগন-সূর্য্য হে।
বঙ্গভুবন-পূজ্য হে।
প্রতিভা তোমার
করিল প্রচার
আঁধারে যা ছিল উহ্য হে।
পূজা হে।
যা ছিল অজানা তুচ্ছ হে
কর কটাক্ষে উচ্চ সে
জগতের কবি
সভামাঝে রবি।
বাজাও বঙ্গ তূর্য্য হে!
পূজা হে।"

"ভগবানে আজি করিয়া আহ্বান
তাই এ প্রার্থনা—হয়ে আনুকূল্য
থাক জননীর দুলাল সন্তান
মহিমা ছটায় বাঙ্গালা লভাক
উজলিয়া বঙ্গভূমি।"

'বাণী'র-প্রতিষ্ঠায়' শেষ দৃশ্য পটখানি আর একবার উঠাইয়া দেখ, এবং তাহার সঙ্গে আজিকার দৃশ্য মিলাইয়া লও।

সমালোচনা।

কৃষি-রসায়ন। শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ চৌধুরী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচসিকা মাত্র। গ্রন্থকার কৃষিবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত প্রথমখণ্ডে কৃষি-রসায়ন-পরিচয় ও দ্বিতীয়খণ্ডে কৃষি বিজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে। রসায়ন পরিচয়ে যাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্ব্বন, ফস্ফরস, পটাসিয়ম, সোডিয়াম, তাম্র, লৌহ, স্বর্ণ, রজত, পারদ, টিন প্রভৃতির গুণাগুণ সম্বন্ধে গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন। কৃষি বিজ্ঞানে, খনিজ, মাটি, সার প্রভৃতির বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশে—বিশেষতঃ 'শস্যশ্যামলা' বঙ্গভূমিতে কৃষির এই সারের দুর্দ্দিনে গ্রন্থকারমহাশয়

ভারতবর্ষ বিশেষজ্ঞ কৃষির বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাতে শুধু বক্তৃতাদিতেই পুষ্টি হইবে, এমন নহে—অল্পকালের মধ্যে বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপায়ও নির্দ্ধারিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের পক্ষে ইহা মহা কল্যাণের সূচনা করিতেছে। যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকারের সহিত আমরাও একমত হইয়া বলিতেছি, 'অবিলম্বে হইবে। জনসাধারণের অন্ন সংস্থান নির্ভর কৃষি অবলম্বন করিতে হইবে। প্রচলিত পুরাতন প্রণালী দ্বারা উহাদের কৃষি লাভজনক হইবে না।' বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে সকল প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সেই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, ভিন্ন উপায় নাই। এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি সেই কারণে যে সর্ব্বথা কালোপযোগী হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের অণুমাত্র সংশয় নাই। গ্রন্থ পঠন ও প্রচার করিয়া গ্রন্থকার বঙ্গবাসীমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

মন বুলবুল। শ্রীসুশীলবালা প্রণীত। প্রকাশক শ্রীবিজয়কুমার সরকার, পত্রপার, কলিকাতা। ডেট ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। এখানি কবিতাগ্রন্থ। বহু খণ্ড কবিতায় পরিপূর্ণ। প্রথম খণ্ডের কবিতাগুলিতে রচনার কোন বিশেষত্ব নাই। তবে দ্বিতীয় খণ্ডে 'স্বপ্নজীবন' শীর্ষক অধ্যায়ের কয়েকটি কবিতাগুলি আন্তরিকতার গুণে হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে। সেগুলি সরল ও অকপট, ছন্দে মধুর, ভাবে তরুণ, আন্তরিকতায় উজ্জ্বল। যেন লোকের সম্মুখে বেদনার জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস। সেগুলির রচনার কোন চেষ্টা নাই, যতঃ উৎসারিত নির্ঝরিণীর ধারার মত সেগুলি মধুর।

সর্ব্বানন্দ। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসাক, আলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য আট আনা। পূর্ব্বঙ্গলীর অন্তর্গত সিরেলগী গ্রামের জনৈক সাধুর উপাখ্যান অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। চরিত্রটি মধুর, সন্দেহ নাই। তবে আখ্যানটি ভালো ফুটে নাই। গ্রন্থে অনেকগুলি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি সাদাবর্ণের কাগজে মুদ্রিত। বাঁধাবোটুকুও বেশ ঝক্‌ঝকে। ছাপা কাগজ চমৎকার।

ফোয়ারা। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ প্রণীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা। পল্লীর পাড়ী, সুখের প্রবাস, পল্লীচিত্র, পানে, বোধোদয়ের ব্যাখ্যা প্রভৃতি ষোলটি হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধের সমষ্টি। হাস্যরসের অবতারণায় লেখকের দক্ষতা অসাধারণ। এ হাস্যরসধারায় একটুকু পঙ্কিলতা নাই। ফোয়ারার ধারার ন্যায়ই তাহা শুভ্র, অবাধিল ও উপভোগ্য। পাঠে একাধারে আনন্দ ও শিক্ষালাভ হয়। বঙ্গসাহিত্যে 'ফোয়ারা' এক নূতন সামগ্রী, অবকাশ-যাপনের পক্ষে অতুলনীয়। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ প্রভৃতি সুন্দর। আকারও ছোট পকেটে রাখা যায়।

ব্যাকরণ-বিভীষিকা। শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ প্রণীত। কলিকাতা ৬৩।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে, ও ৭০নং অখিল মিস্ত্রীর লেনে গ্রন্থকারের নিকট প্রাতব্য। মূল্য চারি আনা। অধুনা, বঙ্গসাহিত্যে ভাষা ও বানান প্রভৃতি লইয়া রীতিমত যথেচ্ছাচার চলিয়াছে। লেখকগণের মধ্যে কেহ ব্যাকরণ জানিয়াও তাহার বিধি-নিয়মাদি মানিতে চাহেন না, কেহ বা ব্যাকরণ না জানিয়াই আসরে নামিয়াছেন। এই দুঃসময়ে অসাধারণ গবেষণা ও চিন্তার ফলস্বরূপ, গ্রন্থকারের অমূল্য ব্যাকরণ-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া সকলে উপকৃত হইবেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন, "আমার বোধ হয়, লেখা সাধু গদ্যভাষাই আপনার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য; পদ্য নাটক ও উপন্যাস প্রভৃতির রচনা উহার লক্ষ্য নহে।" আমাদিগের ধারণাও এইরূপ। কারণ, 'পদ্য নাটক উপন্যাস' প্রভৃতি কলাসাহিত্য-রচনায় ব্যাকরণের কঠিন নিয়ম মানিয়া চলিতে হইলে, বড়ই অসঙ্গত হইবার সম্ভাবনা। তবে ব্যাকরণের নিয়ম কতটা মানিয়া চলিতে হইবে ইহাই আলোচ্য। এ

বিষয়ে বীতিমত আলোচনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থকার নিরপেক্ষভাবে সুবিধা অসুবিধাদির আলোচনা করিয়াছেন,—অনেক ব্যাকরণ-অসঙ্গত পদ বাঙ্গালায় চলিয়া গিয়াছে, সেগুলার সম্বন্ধে এখন কি ব্যবস্থা হইবে,তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। সেই গুলির দোহাই দিয়া নব্য লেখকগণ যদি আরও নূতন কথা গড়িয়া চালাইবার চেষ্টা করেন, তবে তাঁহাদিগকেই বা থামাইবেন কি বলিয়া? এ সকল বিষয়ে চুপ করিয়া থাকা উচিত নহে। গ্রন্থকারের এই আলোচনা পাঠ করিয়া দায়িত্বজ্ঞানবিশিষ্ট সাহিত্যসেবী মাত্রেই আপন-আপন মত লিপিবদ্ধ করুন, পরে সেই সকল মতের সম্যক্ আলোচনা করিয়া একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সময় আসে নাই কি? এই গ্রন্থ লইয়াই সে আলোচনা আরম্ভ হউক,—ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

পালি-প্রকাশ।—অর্থাৎ পালি-পাঠাবলী ও শব্দকোষসহ পালিব্যাকরণ। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রণীত। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ। মূল্য বাঁধাই ৩৲ তিন টাকা। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত। পালি-শিক্ষার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় এতকাল একখানিও ব্যাকরণ ছিল না। এই সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় একটি গুরুতর অভাব মোচন করিলেন। সংস্কৃতের সহিত পালিভাষার যেরূপ সাদৃশ্য আছে—সুতরাং সংস্কৃতজ্ঞের পক্ষে এই ব্যাকরণ সাহায্যে পালিভাষা শিক্ষা করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিবৃত্তাদি সংগ্রহ করিতে হইলে পালি শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে—এক্ষণে সেই পালিশিক্ষার উপায়টুকু অনায়াসলভ্য করিয়া শাস্ত্রীমহাশয় প্রকৃতই সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের বিপুল অধ্যবসায়, পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় পাইয়াছি। ইহাতে এমন সহজভাবে বিষয়াবলী ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে যিনি মোটামুটি সংস্কৃত জানেন, এই গ্রন্থ সাহায্যে তাঁহার পক্ষেও পালি শিক্ষা করা সুকঠিন হইবে না।

জাপান-প্রবাস।—শ্রীযুক্ত সত্যব্রত ঘোষ, এম, সি, ই (জাপান) প্রণীত। উইলকিন্স প্রেসে মুদ্রিত। কলেজ ষ্ট্রীট, এম্পায়ার লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷৹ এক টাকা চারি আনা মাত্র। গ্রন্থকার প্রায় তিন বৎসরকাল শিল্প শিক্ষার্থে জাপানে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় জাপানীগণের সহিত একত্র বাস করিয়া জাপানবাসীর বিষয়ে বহুতর আকৃষ্ট হইয়া তথেশ ও তদ্দেশবাসীর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা সরল, মার্জ্জিত ও সুন্দর—পড়িতে কোথাও বাধে না। নানা তথ্য সমাবেশে গ্রন্থখানি বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। বাঙ্গালীর অমার্জ্জনীয় কার্য্যের অবতারণা করিলে এ শ্রেণীর গ্রন্থ নিরর্থক হইয়া পড়ে, জাপান সম্বন্ধে দুই একখানি বাঙ্গলা গ্রন্থ যাহা পাঠ করিয়াছি তাহাতে এই দোষটির প্রাবল্য লক্ষ্য করিয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে "জাপান-প্রবাসে"র গ্রন্থকার সে পথের পথিক হন নাই। বাক্যের ঘুরফাঁকে তিনি পাঠকের বুদ্ধি ধাঁধাইবার চেষ্টা না করিয়া আপনের গৃহকোণটি অবধি যাহাতে পাঠকের চক্ষে সমুজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন। জাপানে ও জাপানের অধিবাসীগণের একটি পরিপূর্ণ চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে ফাঁকি নাই। পাঠ করিতে করিতে মনে হয়—আমরা যেন কখনও জাপানের কোন পথে ভ্রমণ করিয়াছি কখনও বা কোন জাপানীর গৃহে অতিথি হইয়াছি। গ্রন্থে অনেকগুলি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—চিত্রগুলি সুন্দর হইয়াছে। ছাপা কাগজ বাঁধাইও মনোরম।

ভারত-উচ্ছ্বাস বা রাজভক্তি।—শ্রীযুক্ত ভাবাবতার সেনগুপ্ত প্রণীত ও প্রকাশিত। মুক্তকণ্ঠ প্রেসে মুদ্রিত।

রাজ-অভিনন্দন।—শ্রীযুক্ত মনিমোহন মুখোপাধ্যায় বি,এ, প্রণীত। ভবানীপুর ডায়মণ্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত।

রাজ-পূজা।—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র, কোন্নগর। কলিকাতা প্রেসে মুদ্রিত।

তিনখানি প্রত্যেই সম্রাট ও তৎপত্নীর ভারত আগমন উপলক্ষে রচিত। তিনখানিরই রচনা ভালো প্রশংসিত।

Bangabasi College Magazine. vol. x. No. 1. January, 1912.—এই পত্রিকাখানি বঙ্গবাসী কলেজ হইতে প্রকাশিত। ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত তিন ভাষাতেই প্রবন্ধ থাকে: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ নানা কলেজ হইতে এখনে পত্রিকাদি প্রকাশিত হইতেছে—কিন্তু বঙ্গবাসী কলেজই এতদ্দেশমধ্যে এবিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক। ছাত্রগণকে সাহিত্যচর্চ্চায় দীক্ষিত করিবার জন্য এই পত্রিকার স্থাপনা। সাধারণতঃ শিক্ষকদিগের রচনা অল্পই প্রকাশিত হয়। অপর কলেজের রচনা গৃহীত হয় না। বর্ত্তমান সংখ্যায় সম্রাট-সংবর্দ্ধনা ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি কৌতুক প্রবন্ধ "অনুপ্রাসের অবসর" প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ইহার উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সাত ভাই চম্পা।—কলিকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। কাস্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র 'সাত ভাই চম্পা ও পাঁচল বোনের' চিরপরিচিত রূপকথা অবলম্বনে নাট্যাকারে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। ছাপাখানিতে কাগজও বেশ ফুটিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ছবিও আছে। শিশুগণের অভিনয়ের পক্ষে গ্রন্থখানি সর্ব্বথা উপযোগীও হইয়াছে। রঙ্গ, হাস্য প্রভৃতি নানা রস অবতারিত হওয়ায় শিশুহৃদয় বিচিত্রভাবে সাড়া দিয়া উঠিবে। গ্রন্থে তিনখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ছাপা কাগজ ভাল।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

বিশ্ব-স্বয়ম্বরা।

বাসবের দীপ্ত সহস্রলোচন
নিমেষ-বিহীন তারা,
ধরণীর শ্যাম রূপের ধেয়ানে
সারানিশি জেগে সারা!

করুণ কাঁদিছে করুণ রোদনে
বিরহ সাগর জলে,
শ্যামা বসুধার প্রেমের লাগিয়া
পড়িয়া চরণ তলে!

কহিতেছে বায়ু ক্ষণ পরমায়ু
নিশিদিন হাহাকার,
শ্যামল তনুর পরশ লালসে
ছুটে আসে বার বার!

অন্তহীন ব্যোম সুধাভরা সোম
তোমারে নিমন্ত্রি করে,
দিগন্তে লুটায়, জ্যোৎস্নাধারায়
সোহাগে ঘেরিয়া ধরে!

একব্রতা তুমি ওগো মর্ত্তভূমি,
সতী পার্ব্বতীর মত,—
শিবের মতন শুভ্র কিরণ
সবিতার ধ্যানরত!

তুষ্ট আরাধনে অক্ষয় যৌবনে
সাজালেন কলেবর,
পুষ্পপুঞ্জ কুসুমমাধুরী
চিরদিন সহচর,

প্রচ্ছন্ন গভীর নিবিড় তিমির
খনির বুকের তলে
অচপল জ্যোতি মানিকের আলো
তাঁহারি প্রসাদে জ্বলে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কাস্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত ও ৩৩, ৩৪ বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

বসন্তশেষ

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত

ভারতী

৩৫শ বর্ষ] চৈত্র, ১৩১৮ [১২শ সংখ্যা

অন্নপূর্ণার মন্দির।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ভট্টাচার্য্যের পুরাতন বাড়ীর ধীরে ধীরে সংস্কার হইয়া গেল। বাটীর বাটীজন্মের পর রামশঙ্করের পিতা একবার কলিচুণ ফিরাইয়া ছিলেন। বহুদিন পরে তাই বুভুক্ষিত বাড়ীটাও অনেক মাল মসলা গিলিল। জাহ্নবী বিশ্বেশ্বরকে নিষেধ করিলেন। বিশ্বেশ্বর নীরবেই রহিল, অন্নপূর্ণা উত্তর দিলেন তবে আর এ বাড়ীতে থেকে কাজ নাই, কোন্‌দিন ঘর চাপা পড়ে যাবে ও বাড়ী চল"। অগত্যা জাহ্নবী নীরবে রহিলেন।

ভট্টাচার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া পাড়া প্রতিবেশীরা নীরবে মনের আগুনে পুড়িতে লাগিলেন। "একে বাড়ী ঘর নূতন হ'ল, তাতে ঝিনও বেশ যাচ্ছে, আবার হরিটাও দিব্যি বাড়ী এসে শান্ত শিষ্ট ছেলেটি হয়েছে, বিস্তর কাজকর্ম্ম দেখে শোনে। তার নাম ক'রেও যে কেহ জাহ্নবীকে খোঁটা দিবে সে উপায়ও আর নাই।" এক উপায় মৃতা সতীর নামে কিছু জল্পনা করা, নতুবা জীবিতা সাবিত্রীর নামে কিছু অপবাদ সৃষ্টি করা! কেহ কেহ বলিল, "বিশ্বেশ্বর বুঝি ভটচাযদের জামাই হবে গো, তাই এত টান।" অন্য একজন চোখ ঠারিয়া বলিল "ঢাক ঢোল বাজিয়ে জামাই হলে ত ভাল কথাই,—গোপনের জামাই হলেই গোঠা। কিন্তু যখন সকলে শুনিল সাবিত্রীর জন্য বিশ্বেশ্বর পাত্রানুসন্ধান করিতেছে, সম্মুখে শ্রাবণ মাসে তাহার বিবাহ; তখন সকলে অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়িল।

অন্নপূর্ণা দেবী বিশ্বেশ্বরের উৎসাহহীন মনকে একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "আর দেরী ক'রনা বিন্ত দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেয়ে পনের বছরের হ'তে চল্‌ল; মাগী মুখে কিছু বলে না কিন্তু হাপ্‌সে পড়েছে। পাত্রের জন্য ভাল ক'রে চেষ্টা কর।"

"আমি কি চেষ্টা করছি না মাসিমা? কিন্তু ভাল পাত্র চাইত! অনেক খোঁজার পর আজ একখানা পত্র পেয়েছি। পাত্রটি বিদ্বান, দু তিনটি পাস করা, অবস্থা ঘর সবই ভাল। পাত্রের বাপ আছে। কেমন মাসিমা পাত্রটি কেমন হবে?"

"শুনতে ত' মন্দ বোধ হচ্ছে না, তবে বিশেষ করে খোঁজ নিয়ে কাজ ক'রো বাপু, না পস্তাতে হয়।"

"তা তুমি নিশ্চিন্দি থাক মাসিমা।"

"হ্যাঁরে তা পাত্র পণ কত টাকা নেবে?

বিশ্বেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিল,

"অমন পাত্রটি কি বিনে পয়সায় পেতে চাও? টাকা কিছু লাগবে বই কি! তার জন্যে ভেবো না, বিয়ের দিন তখন শুনো। তোমার ক্যাস বাক্সটা আমার হাতে দিও।" মাসিমা রাগিয়া বলিলেন "যা, যা, সকল তাতে খোকামী। আর দেরী যেন না হয়।"

নিকটে বসিয়া নিবের মা পাকা আমগুলা সারি দিয়ে সাজাইতেছিল। কার্য্য স্থগিত রাখিয়া অন্নপূর্ণাকে বলিল "হাঁ মা তা দাদা বাবুর কবে বিয়ে হবে? দাদা কি বিয়ে করবেই না।

মাসিমা একবার বিশ্বেশ্বরের পানে চাহিয়া আবার অধোমুখে বলিলেন "আমি তার কি জানি মা, ভগবান আর বিশুই জানে; নিবের মা বলিল "ওমা বয়েস হ'লো, ছোক্ মানে, ভদ্দরদের ধরণই ভেন্ন।" বিশ্বেশ্বর নিবের মাকে পরিহাস করিত, কিন্তু সহসা মাসীর কাতর দৃষ্টি দেখিয়া থামিয়া গেল। পূর্ব্বে বিবাহের সম্বন্ধে কোন করুণাসূচক বাক্যে বা দৃষ্টিতে তাহার মন কিছুতেই দমিত না, কিন্তু এখন দেখিল তাহার মন অতিশয় কোমল হইয়া গিয়াছে। মাসিমার বেদনা অনুভব করিয়া সহসা আজ যে তাহার প্রাণে ব্যথা বাজিয়া উঠিল। ভাবিল কি এক সামান্য খেয়ালে মাতৃসমা স্নেহশীলার অন্তঃকরণে সে কি বিষম আঘাত দিয়াছে, ও দিতেছে। এই খেয়ালে সেও কি বিশেষ সুখী হইয়াছে? মাসিমাকে দুঃখ দিয়াছে বলিয়া মনে ক্ষোভ জন্মে নাই? সেই অবিমৃষ্যতার পরিণাম কি শোচনীয় হইয়াছে! বিশ্বেশ্বর সহসা যেন বুঝিল সংসার যে নিয়মে চলিতেছে তার সঙ্গে সেই নিয়মেই চলিতে হইবে, এক চুল এদিক ওদিক করিলে তাহার চক্রনেমিতে পেষিত হইবে।

কিন্তু তাহা ভাবিয়া আর এখন কার্য্য নাই। হস্তচ্যুত পাশা হস্তে কখনো ফিরিয়া আসেনা! এখন কেবল সেই পাশার চালেই চলিতে ফিরিতে উঠিতে বসিতে হইবে। সে চাল আরত ফিরিবে না! এখন আর বিদ্রোহিতার কোন' ফল নাই। বিশ্বেশ্বরের সতীর অভিশাপ মনে পড়িল। সে পত্রের প্রত্যেক অক্ষর তাহার অন্তরে মুদ্রিত আছে। সে একজনকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবে, ভাল বাসিবে, সুখী হইয়া বুঝিবে সংসারে এই আদান প্রদানই শ্রেষ্ঠ সুখ!" না না, তাহা হইবে না! সতীর এ অভিশাপ কখন' সফল হইতে দেওয়া হইবে না। সংসারে যতই অশান্তি জাগিয়া উঠুক, দুঃখ বেদনা প্রকাশ পাক্, এ প্রতিজ্ঞা অটল রাখিতেই হইবে। তাহার কাপুরুষতায় সতী যেন পরলোক হইতে ব্যঙ্গের তীব্র হাসি না হাসে। তাহার অভিশাপ ব্যর্থ করিতেই হইবে।"

কয়েক দিনের মধ্যেই বরপক্ষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা স্থির হইল। অন্নপূর্ণা বলিলেন "আর দেরী না করা হয়, সম্মুখে ১৫ই শ্রাবণ ভাল দিন আছে, ঐদিন স্থির কর"।

বিশ্বেশ্বর বলিল "আজ ৭ই—মধ্যে কেবল সাতটা দিন—এর মধ্যে সব জোগাড় হবে মাসিমা?"

"খুব হবে। আমি যেমন বলি এখনি সব আনাতে আরম্ভ কর দেখি, আলিস্যি করিস্‌নে।" বিশ্বেশ্বর কোমর বাঁধিয়া লাগিল। ভট্টাচার্য্যদের বাটীতে মস্ত একখানা চালা ঘর উঠিল,—সেই খানা বাহিরের ঘরের কার্য্য

করিবে। ভিতরের অঙ্গন পরিষ্কার হইয়া তিন চারখানা চালাঘর উঠিল! অঙ্গনে বাঁশ পোঁতা হইল, পাছে বৃষ্টি হয়, সেই জন্য সামিয়ানা টাঙ্গাইতে হইবে। অন্নপূর্ণা অন্নপূর্ণার মত ভাণ্ডার সাজাইয়া ফেলিতে লাগিলেন। জাহ্নবী কেবল নীরবে কাষ্ঠপুত্তলিকার মত চাহিয়া দেখিতেন, কেবল অন্নপূর্ণা যাহা আদেশ করিতেন তাহাই পালন করিয়া যাইতেন। সাবিত্রী অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া তাহার তুলসীতলাটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। তাহার তলায় প্রদীপটি দিয়া, মাতাকে ও ভ্রাতাদের যথা সময়ে খাওয়াইয়া, সাবিত্রী অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অন্নপূর্ণার সঙ্গে তাহার বিবাহের খাটুনি খাটিত। কেহ পরিহাস করিলে গ্রাহ্য করিত না। বাড়ীতে এখন লোকের অভাব নাই, অনেক লোক খাটিতেছে। পাড়া প্রতিবেশীরাও সর্ব্বদা সংবাদ লইতেছে, আসিতেছে যাইতেছে, কুটুম্বিতা পাঠাইতেছে। জোঠাইমাও আসিয়াছেন।

সাবিত্রীর গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া হইল। মধ্যে বিবাহের আর একদিন মাত্র দেরী, সাবিত্রীকে আদর করিয়া পাড়া প্রতিবেশীরা "আইবড়-ভাত" খাওয়াইতে লাগিল। অন্নপূর্ণা তাহাকে একবার নিজের বাটীতে লইয়া গিয়া উভয়ে মিলিয়া রন্ধনাদি করিলেন। বিশ্বেশ্বর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "তোমরা যে আজ এবাড়ীতে মাসিমা?"

মাসিমা হাসিয়া বলিলেন,—

"আজ যে সাবিকে আইবড়-ভাত দেব। দেখদেখি বারাণসী কাপড় খানা পরিয়ে দুল দুটো কানে দিয়ে সাবিত্রীকে কেমন দেখিয়েছে?" বিশ্বেশ্বর চাহিয়া দেখিল এ যেন খাপ খাইতেছে না, তাহার রুক্ষ চুলে মলিন ছিন্নবাসে ইহাপেক্ষা ভাল দেখায়! এ যেন বিলাসিতার মধ্যে আত্মসমাহিতা, উদাসিনীর মূর্ত্তি! বিশ্বেশ্বর সুখী হইল না, ভাবিতে ভাবিতে নিজ কক্ষে চলিয়া গেল।

আহারের ডাক পড়িল। বিশ্বেশ্বর খাইতে বসিলে মাসী বলিলেন "সাবিত্রী আজ নিজের আইবড়-ভাত নিজে রেঁধেছে! এমন পাগলা মেয়েও দেখিনি। কেমন হয়েছে?"

"বেশ! বিশ্বেশ্বর নীরবে ভোজন করিয়া উঠিয়া গেল। সাবিত্রীকে খাওয়াইয়া মাসিমা বলিলেন "মা একটু শোও গে! আমি ও ভাত কটা সেদ্ধ করে নেবেনি।"

সাবিত্রী পাখা হাতে লইয়া মাসিমার রন্ধনের নিকটে বসিল। মাসিমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—

"আজ এসব খাওয়া দেখতে নেই মা, আমার ঘরে একটু গড়াওগে, একা ত বাড়ী যেতে দেবেনা আমার বেশী দেরী হবে না। তুমি যাও মা, যাও।" অগত্যা সাবিত্রী উঠিয়া গেল। অন্নপূর্ণার কক্ষে গিয়া পরিহিত বস্ত্রখানা খুলিয়া ফেলিয়া নিজের সাধারণ বস্ত্রখানা পরিয়া লইল। ইয়ারিং দুটা খুলিয়া বালিশের উপরে রাখিয়া দিল। তাহার পরে অনন্যোপায় হইয়া মাসিমার শয্যাপার্শ্ব হইতে মহাভারত খানা টানিয়া লইয়া মুখ তুলিয়া দেখিল বিশ্বেশ্বর।

বিশ্বেশ্বর নিকটে আসিল, শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া বলিল "কি দেখছিলে? মহাভারত?"

সাবিত্রী তখন শয্যা হইতে একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মাথা নাড়িল, হাঁ।

"তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে সাবিত্রী! জিজ্ঞাসা করব বল্‌বে?"

সাবিত্রী নীরবে পুনর্ব্বার মস্তকান্দোলন করিল, বলিবে।

আমার কাছে কিছু লজ্জা ক'রনা, আমি তোমার লজ্জার উপযুক্ত কেউ নই। কথাটা বলি; যে পাত্র তোমার জন্য স্থির করেছি, অতি সুপাত্র। তোমার কোন' অমত নেই ত?"

সাবিত্রী নীরবে নত মস্তকে রহিল, দৃষ্টি ভূমিতে নিবদ্ধ। বিশ্বেশ্বর পুনর্ব্বার বলিল,—"বল, নইলে আমি অন্য কিছু ভেবে নিতে পারি। তোমার অমত আছে?"

সাবিত্রী এবারে কথা কহিল, মৃদু স্বরে বলিল "আমার অমত? একথা কেন বল্‌ছেন?"

"কি জানি আমার কেমন মনে হ'ল যে তোমার একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত। আমার বিশ্বাস এ বিয়েতে তুমি ভবিষ্যতে খুব সুখী হবে। হবেনা কি?"

"আমায় কেন জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন। আপনি যখন বলছেন তখন নিশ্চয়ই তাই হবে"।

"আমি বল্‌ছি বলে কেন বল্‌ছ সাবিত্রী? তোমারও কি সে বিশ্বাস নয়?"

"হ্যাঁ! আপনি যখন সব করেছেন তখন আমার ভালর জন্যেই কর্‌ছেন!"

"সত্যই তাই সাবিত্রী! আমি কেবল কিসে ভাল হবে, সেই চিন্তাই কচ্ছি—সেই"—

বাধা দিয়া সাবিত্রী বলিল "তাত' আমি জানি। আমি জানি আপনি দেবতা।" বলিতে বলিতে সাবিত্রী নতজানু হইয়া বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করিল। অপ্রতিভ হইয়া "কিকর সাবিত্রী', বলিয়া বিশ্বেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল। গম্ভীর মুখে বলিল "আমায় তুমি চেননা, তাই ওকথা বল্‌লে—যা বল্লে আমি ঠিক তার উল্‌টো! দেবতা নয় দুর্ব্বল মানুষ"—বলিতে বলিতে বিশ্বেশ্বর ক্ষীণ হাসি হাসিল। ক্ষণেক পরে নতমুখী সাবিত্রীকে বলিল "আমায় কি কিছু বল্‌বে সাবিত্রী? যদি বলবার হয় বল।"

সাবিত্রী একবার তাহার দিকে চাহিয়া আবার তখনি নিমদৃষ্টি হইল। মৃদু কণ্ঠে বলিল "একটা কথা আপনাকে বল্‌তে চাচ্চি। আমার,—বিয়ের পর তারা কি নিয়ে যাবে?"

"তা নিয়ে যাবে বই কি! একথা কেন বল্‌ছ? সবাই ত স্বামীর ঘর করে।"

"এই জন্যে বলছি, আমার মার কাছে কে থাকবে? দিদি নেই, আমিও থাকব না, মাকে কালীকে কে দেখবে! আমায় কি বিয়ের পর এখানে রাখতে পারেন না? অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য?"

বিশ্বেশ্বর একটু হাসিল,—বোধ হয় সাবিত্রীর লজ্জাহীনতার জন্য একটু, ক্ষোভের নিমিত্ত একটু। হাসিয়া বলিল, "তা কি হয় সাবিত্রী! এ অনুরোধ কি করা যায়?"

সাবিত্রী একটু ভাবিল। ক্ষুদ্র একটু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "তবে থাক আপনি ত এখানে থাকবেন। দাদাও এখন মার কথা শোনে। আপনারাই মাকে দেখবেন—আমার বলা বেশীর ভাগ।"

বিশ্বেশ্বর আবার হাসিয়া বলিল "বিয়ের কথা বল্‌তে তোমার লজ্জা হয়না বুঝি?"

সাবিত্রী ঘাড় নাড়িল, না! বিশ্বেশ্বর আবার বলিল "সকলের ত হয়, তোমার হয় না কেন?"

"যাদের হয় তারা কি আমার মত আত্মীয় বন্ধুর, মায়ের, বুকের রক্ত ভাবনার ভাবনার জমাট বাঁধিয়ে দিয়ে সকলের ভার স্বরূপ, দুর্ভাবনাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বিশুদাদা?"

"সাবিত্রী অমন কথা বলো না, তুমি কি আমাদের ভারস্বরূপ?"

"নই কিসে? আমার জন্ত কি আপনার কম কষ্ট পেতে হচ্ছে। কম খোঁজা খুঁজি কম চেষ্টা করছেন।"

"এতে ত কষ্ট নয় সাবিত্রী! তোমাকে কিসে সুখী করব সেই আমার ভাবনা; তোমাদের সুখেই আমি সুখী হব। এই যে পাত্র আমি স্থির করেছি, তোমার অমত হয় বল আমি এখনি এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে এর অপেক্ষাও ভাল পাত্র ঠিক করব। বল তোমার কি অমত আছে?"

"এমন কথা একতিলও ভাববেন না। আপনারা সংসারে যাকে মন্দ মনে করেন এমন কারু সঙ্গেও যদি বিয়ে দেন, তবু জানবেন আমি সুখী হব। তবুও জানব আপনি দেবতা, আপনি আমার মাকে, আমাদের মহা বিপদে রক্ষা করছেন। দিদি আমাদের আপনাকে দিয়ে গেছেন।"

সাবিত্রী ভক্তিভরে নতমস্তকে মৃদুপদে চলিয়া গেল। আত্মহারা স্তম্ভিত বিশ্বেশ্বর ভাবিতেছিল এ দেবীরা মর্ত্যভূমিতে কেন আসিয়াছে? কেবল কি দুঃখ ভোগ করিতে? সংসারের পাষাণ চরণে কেবল কি আত্মবলি দিতে? এ কথা বলিলে বিধাতার অপমান করা হয়! সতীর আশীর্ব্বাদ সাবিত্রীর মস্তকে আছে, নিশ্চয়—নিশ্চয় সে সুখী হইবে।

বিশ্বেশ্বর আবার কোমর বাঁধিয়া বিবাহ বাটীতে গিয়া কার্য্য আরম্ভ করিল। অনেক রাত্রে বাটী গিয়া শুইল। পর দিন বৈকালে বর ও বরযাত্রীরা আসিয়া পৌছিল। বিশ্বেশ্বর তাহাদের বাসা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল; সমাদরে তাহাদের যথাযোগ্য স্থান দিল। বরের সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্ট হইল কিন্তু বরকর্ত্তার আত্মম্ভরী স্বভাবে ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় কিছু অসন্তুষ্ট হইল। যাহা হউক আদর আপ্যায়িত ভোজনে ঘুমে সে রাত্রি কাটিয়া গেল। অতি প্রত্যূষে বিশ্বেশ্বর দুই হস্তে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বিবাহ বাটী ছুটিল। সানাইওয়ালা চালার মধ্য হইতেই তান ধরিয়াছে।"

তুলসীতলায় নতজানু হইয়া প্রণাম করিয়া সাবিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন বাটীতে কেহ উঠে নাই, বিশ্বেশ্বর একটু পরিহাস করিতে গেল কেন না সকলের অগ্রেই সাবিত্রী উঠিয়াছে। পরিহাস মুখে আসিল না, সে অচঞ্চলা স্থির মূর্ত্তি উদাসিনীর পানে নীরবে চাহিয়া থাকিতে হয়; না জানি সে যোগিনী কোন যোগে নিমগ্না! বাহিরের চঞ্চল স্রোত তাহাকে একটুও স্পর্শ করিতে পারে নাই! না জানি সে দেবী কোন আরাধ্য দেবতার ধ্যানে নিযুক্ত।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বাটী লোকজনে পূর্ণ, চারিদিকে গোলমাল চেঁচামেচি। গ্রামস্থ সকল লোকই নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া নিজ

নিজ কৃতিত্ব প্রকাশ করিতেছেন। সন্ধ্যার পর চারিদিকে আলো জ্বলিল, অল্প রাত্রেই লগ্ন। বিশ্বেশ্বর একা চারিদিকে তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত। অন্তঃপুরে অন্নপূর্ণা গৃহিণী। জাহ্নবী আজ সকলের চক্ষে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়াছেন। যেখানে সতী প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, সেইখানে গিয়া নীরবে শুইয়া আছেন। ক্ষণেক পরে সাবিত্রী আসিয়া নিকটে বলিল, তাহার নববধূর বেশ, মস্তকে কন্যাপত্রিকা। জাহ্নবী শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া রুদ্ধস্বরে বলিলেন "তুমি এখানে কেন মা—এখন যে পীঁড়ির ওপর বসতে হয়, যাও মা যাও।"

যা"চ্ছি মা, একটু তোমার কাছে বসে থাকি।"

"না না যাও যাও—দিদি—দিদি কোথায় গেলে?"

সাবিত্রীকে কন্যাপীঁড়িতে না দেখিতে পাইয়া অন্নপূর্ণা ছুটিয়া সেই কক্ষে আসিলেন। জাহ্নবীকে তিরস্কার করিলেন। জাহ্নবী তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া কন্যাকে লইয়া যথাস্থানে গিয়া কন্যাপীঁড়িতে বসাইয়া দিলেন। বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার নিকট হইতে তখন বরের জোড়, হীরকাঙ্গুরীয় প্রভৃতি লইতে আসিয়া দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল। বাহিরে বাদ্যের তুমুল কোলাহল ও হুলুধ্বনি উঠিল—একজন ভদ্র লোক ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"ওহে বাপু বর যে দ্বারে উপস্থিত,—এরপরে ও সব নিলে চলবে,—যত সব ছেলে মানুষের কাজ, চল চল"

"যাই" বলিয়া বিশ্বেশ্বর একবার কক্ষের মধ্যে চাহিল। সাবিত্রী তখন চণ্ডী কোলে লইয়া কাঠায় করিয়া ধান লইয়া তোলাপাড়া করিতেছে; বস্ত্রে, সোনার মুকুটে তাহার মুখ আচ্ছন্ন। বিশ্বেশ্বর ধীরে ধীরে সভাভিমুখে চলিল। কি এক অজ্ঞাত ভয়ে সভাই তখন তাহার পা কাঁপিতেছিল।

বর সভায় হইল। বরপক্ষে কন্যাপক্ষে তুমুল বাদানুবাদ তর্ক রসিকতা গোলমাল চলিতে লাগিল। পাত্র গম্ভীর মুখে দর্পণ লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল, বিশ্বেশ্বর এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এক এক বার তাহার পানে চাহিল। বরকর্ত্তা এক পার্শ্বে বসিয়া অতি অল্প পাওনায় যে তিনি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার অজস্র যথেষ্ট অনুতাপ করিতেছেন,—উৎসুক পরোপকারী গ্রামের হর্ত্তাকর্ত্তারা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে নানাপ্রকার ভরসা দিতেছে।

নরসুন্দর আসিয়া বলিল "বাবু আর দেরি কেন ভেতরে সব ঠিক হয়েছে।" বিশ্বেশ্বর হরিকে ডাকাইয়া যাহা বলিতে হইবে শিখাইয়া দিলেন। হরি গলবস্ত্রে যোড়হস্তে বলিল "তবে সকলে অনুমতি করুন কন্যা পাত্রস্থ করা যাক।"

"হাঁ হাঁ! অবশ্য অবশ্য"র সঙ্গে সঙ্গে বরকর্ত্তার জয় ঢক্কার ন্যায় নিনাদ উঠিল "অগ্রে পণের টাকা আনুন—তবে সে কাজ।" "হাঁ হাঁ তার আর কথা আছে! এই নিন তোড়া এখন পাত্র উঠাতে পারি?"

বরকর্ত্তা টাকা গুণিতে গুণিতে বারম্বার উত্তোলন করিয়া নিবারণ করিলেন। বিরক্ত হৃদয়ে হরি ও বিশ্বেশ্বর নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। টাকা গুণিয়া মহিষাসুর কান্তি বরকর্ত্তা বলিলেন 'হাঁ, এ ত তিন হাজার পাওয়া গেল এখন বরাভরণ কন্যাভরণ সব দেখার দরকার!

দেখে যে "গোলে হরি বোল" হবে তাতে আমি নেই। কন্যা সভায় আনয়ন করুন। এখন কার বিবাহের এই প্রকার নিয়ম।"

বিশ্বেশ্বর ঈষৎ উত্তপ্ত হইয়া বলিল "আমাদের এত ছোটলোক ভাববেন না। কন্যা সভায় টভায় আনা হবে না। ভেতরে চলুন, সেইখানে গিয়ে দেখে নেবেন।

"এ ত রাগারাগির কথা নয় বাপু! লেন দেনা পাওনার কথা! সভায় কন্যা আনায় দোষ কি? আমাদের দেশে এই রকম নিয়ম। অনেকে বরকর্ত্তার বাক্যের অনুমোদন করিল। বিশ্বেশ্বর স্থিরকণ্ঠে বলিল "আপনাদের নিয়ম এখানে চলবে না—কন্যা সভায় আনা হবে না।" অগত্যা বরপক্ষীয় দুই জন লোক বরকর্ত্তাকে চুপি চুপি বলিল "একে আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না—ভেতরেই চলুন। সেখানে সব হবে।"

বর, বরকর্ত্তা ও কন্যাপক্ষীয় বরপক্ষীয় কয়েক জন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বরাভরণাদি দেখিয়া বরকর্ত্তার হাসিমুখ নিষ্প্রভকণ্ঠে বলিলেন "কন্যা আন, কন্যা নিয়ে এসো।

স্ত্রী মহলে রব উঠিল "ওমা আগে স্ত্রী-আচার হবে তবে ত বিয়ে।"

হরি রোষাকে উঠিয়া তাহাদের তাড়া দিয়া বলিল "রাখ তোমাদের স্ত্রী-আচার! আগে বরকর্ত্তার পছন্দই হোক; এ বিয়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছি না, এ মাল যাচাই করা।"

অবগুণ্ঠনবতী সাবিত্রীকে হাঁটাইয়া লইয়া আসিয়া হরি বরকর্ত্তার নিকটে বসাইয়া দিল। বরকর্ত্তা একে একে অলঙ্কারাদি দেখিয়া ঈষৎ প্রসন্ন মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "হাঁ তা কন্যাকে আর ঘরে নিয়ে যেওনা তোমরা স্ত্রী-আচার আরম্ভ কর। হাঁ—হাঁ—কন্যাকর্ত্তা কই?" হরি বিশ্বেশ্বরের পানে চাহিতেই বিশ্বেশ্বর হরিকে দেখাইয়া দিয়া বলিল "উনিই কন্যাকর্ত্তা। কন্যার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।"

"তা গিয়ে, তা বেশ! হাঁ হাঁ হাঁ আর একটা কথা! এ কথা তোমাদের আগে স্বীকার করা উচিত ছিল, তাহলে কি আমি এ কার্য্য করতে আসি? যাহোক আর এক হাজার টাকা পেলেই আমি রাজি হ'তে পারি ভদ্রলোক তোমাদের জাত যাতে চাইনে!"

বিশ্বেশ্বর বাধা দিয়া বলিল "আবার কিসের টাকা মশায়? আপনি যে নানান্ ফেঁকড়া তুলছেন? বিবাহ কি হতে দেবেন,না।"

"হাঁ হাঁ হাঁ তুমি কেহে বাপু? মধ্যে থেকে কথা কও? হচ্চে কন্যাকর্ত্তার সঙ্গে কথা—"

বিপন্ন হরি বাধা দিয়া বলিল "উনিই কর্ত্তা, মশায়! যা বলতে হয় ওঁকেই বলুন।"

"হাঁ হাঁ হাঁ তোমরা দেখছি জুয়োচ্চোর হা? কে কন্যাকর্ত্তার ঠিক নেই যেমন পবিত্র কুল তেমনি জোচ্চোরি এমন জায়গাতেও মানুষে বে দিতে আসে?"

বিশ্বেশ্বর অতিকষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া বলিল "বলুন কি বলতে চান, আমিই কন্যাকর্ত্তা।"

"হাঁ হাঁ তা এতক্ষণ জোচ্চরি হচ্ছেল কেন? আর হাজার টাকা না হলে আমি বে দিতে দেব না।"

"কেন? কিসের জন্যে? আপনার সব টাকা ত শুদে পেয়েছেন।"

তোমাদের কুল এমন পবিত্র তাকি জানি?

কন্যার বড় ভগ্নী নষ্ট চরিত্র বিষ খেয়ে মরেছে শুন্‌ছি।"

বিশ্বেশ্বর গর্জ্জন করিয়া উঠিল "সাবধান! কার এত বড় আস্পর্দ্ধা! মুখ সাম্‌লে কথা কন্।"

কিসের মুখ সাম্‌লাব? দিলুম না ত বে! দেখি তোমরা কি করতে পার, চল্ বরেন্দ্র ওঠ!" বর বরাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলে হাঁ হাঁ করিয়া গিয়া বরকে ধরিল, কেহ গিয়া বরকর্ত্তাকে ধরিল 'মশায় করেন কি— করেন কি থামুন আমরা মিটিয়ে দিচ্ছি— এমন কাজ করবেন না।'

মেয়ে দিতে এসে এত ভোগ জুটবি? দেখি কি করে মেয়ে পার করিস্?"

"থামুন থামুন আমরা মিটিয়ে দিচ্ছি।" পরশুতাকাঙ্ক্ষী মণ্ডলের দুএকজন আসিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় রুদ্ধহস্তপদ বিশ্বেশ্বরের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া বলিল "ওহে এত করলে ত এ সামান্যর জন্যে আর কেন! একটা হাজার টাকা বইত নয়, দিয়ে ফেল, আমরা এর পরে না হয় চাঁদা তুলে ও টাকাটা তোমায় দিয়ে দেব, যাও টাকা এনে মিটিয়ে ফেল, লগ্ন ভস্ম হয়।"

নারীমণ্ডলী চিত্রপুত্তলির ন্যায় বোয়াকের উপরে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের হাতের শঙ্খ হাতে; মুখের হুলুধ্বনি মুখে নিরুদ্ধ। বিশ্বেশ্বর চাহিয়া দেখিল কে একজন পার্শ্বে মূর্চ্ছিতের মত বসিয়া পড়িয়াছে; অন্নপূর্ণা তাঁহার শুশ্রূষা করিতে করিতে উচ্চকণ্ঠে হস্ত পাড়িয়া বলিলেন "টাকা এনে নিয়ে যাও— লগ্ন ভস্ম হয়, দেরী ক'রোনা।

বিশ্বেশ্বর বুঝিল মূর্চ্ছিতা স্ত্রীলোক জাহ্নবী। নিকটে দাঁড়াইয়া হরি ভয়ার্ত্তভাবে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিয়াছে। নিমেষে একবার সাবিত্রীকে দেখিয়া লইল, সে তেমনি অবগুণ্ঠনমুণ্ডী মৃত্তিকার মত নীরব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বিশ্বেশ্বর স্থিরকণ্ঠে বলিল "শুনুন, আমার শেষ কথা! কন্যার ভগিনী দেবীতুল্যা, তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। আমি আর কোনোমতেই টাকা দিব না। এতে আপনার যা ইচ্ছা করুন।"

সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, কর কি বিশ্বেশ্বর! কর কি! হরি আর্ত্তকণ্ঠে বলিল "বিশু বাবু কি বল্‌ছেন।" স্থিরকণ্ঠে বিশ্বেশ্বর বলিল,"হরি থাম। আপনারা মনেও কর্ব্বেন না যে আর আমি টাকা দেব। তবে বরকে এই কথা বল্‌ছি! মশায় যে রত্ন আপনাকে আজ দিতে এসেছি তার মূল্য যদি আপনি বুঝতে পারেন ত বুঝবেন, আপনি ভাগ্যবান্ ব্যক্তি! দেখুন দেখি এ দ্রব্য কি মূল্য দিয়ে বিক্রী হয়?"

বিশ্বেশ্বর সাবিত্রীর নিকটে আসিয়া তাহার অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া শোলার ময়ূর টানিয়া ফেলিয়া দিল। সাবিত্রীকে বরের মুখের পানে ফিরাইয়া বলিল "দেখুন এ রত্নের কি মূল্য হয়?"

বর গম্ভীরকণ্ঠে বলিল "পিতা বর্ত্তমানে আমাকে এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।"

বরকর্ত্তা ডাকিলেন, "এস হে বাপু উঠে এস—এদের যে দেওয়া নয়—ধাপ্পেমো— চল আমরা যাই।" যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষীরা বলিল,—"বিশু করছ কি? এখনও বোঝো!"

"আমি বেশ বুঝেছি।"

বরপক্ষেরা বলিল—আচ্ছা হাজার না দাও ত পাঁচশো দাও।"

"এক পয়সাও নয়।"

বিচক্ষণেরা গিয়া বরকর্ত্তাকে চোখ টিপিল বলিল "আর কাজ নাই, এ দাঁও ফসকাইল, এখন যথালাভ করিয়া আগের সর্ত্ত মতই রাজি হোন্।" তখন তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিল "আচ্ছা এস আমরা মিটিয়ে দিচ্ছি ; মশায় ভদ্র লোকের আত্মমান ধর্ম্ম সয় না। আপনি না হয় একটু ক্ষতি স্বীকার করে আগের সর্ত্ত মতই রাজি হন্। যাওহে হরি কন্যাকে পীঁড়িতে বসিয়ে এসো ; বর বাবাজী পীঁড়িতে গিয়ে বসুন। চলহে বিশ্বেশ্বর—আর কেন! বিশ্বেশ্বর নড়িল না। অটল কাষ্ঠের মত দাঁড়াইয়া অটল কণ্ঠে বলিল "আপনারা আর আমায় অনুরোধ করবেন না। পাত্র উঠিয়ে নিয়ে যান্, এমন ঘটনার পরেও যে এরূপ চক্ষালদের হস্তে একটী বালিকাকে বিসর্জ্জন দিতে পারে সে চণ্ডালেরও অধম। আপনারা যান্ আমরা বিয়ে দেবনা।"

সকলে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, বিশ্বেশ্বরের যে কথা সেই কাজ তাহা সকলেই জানে। নিতান্ত অপমানিত জ্ঞান করিয়া বরপক্ষেরা আস্ফালন করিতে করিতে বাটী হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। হিতাকাঙ্ক্ষী রামতনু সান্যাল বলিলেন, "বিশ্বেশ্বর কি করলে! এখনো বল, ফিরিয়ে আনি—নইলে ব্রাহ্মণ কন্যার জাত যাবে।"

"জাত কেন যাবে? অন্য পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেন"

"আর পাত্র কই? এত কোথায় পাবে?"

"বেশী দূরে খুঁজতে যেতে হবেনা, নিকটেই আছে। সান্যাল মহাশয়! আপনার ওপরে নিমন্ত্রিতদের ভার দিলাম, সব দেখুন শুনুন, নিবারণ, হরীশ! তোমরাও যাও যাও! আমিই এ বিবাহের পাত্র।"

সহসা সেখানে বজ্র পতিত হইলেও কেহ এতদূর আশ্চর্য্য হইতনা! মণ্ডপের আমোদ করা ঘুরিয়া গেল। সকলে সেখানে সমবেত হইয়া ব্যাপার কি ব্যাপার কি বলিয়া গোলমাল বাধাইল।

বিশ্বেশ্বর বলিল "ব্যাপার আর কিছুই নয়। আমার পিতা নেই, কাজেই আমাকেই আপনাদের অভ্যর্থনা করতে হচ্ছে, আপনারা শুভকার্য্যে যোগ দেন।" সকলে ক্ষণেক নীরব রহিল। দুএকজন মাতব্বর, অগ্রসর হইয়া বিশ্বেশ্বরকে অনেক সাধুবাদ দান করিতে লাগিল। বিশ্বেশ্বর তাঁহাদের সংক্ষেপে প্রণাম করিয়া মাসিমার নিকটে আসিয়া ডাকিল "মাসিমা"!

অন্নপূর্ণা ভিড় হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বিশ্বেশ্বরের মস্তকটা শিশুর মস্তকের মতন বক্ষে লইয়া চুম্বন করিলেন। দুই হস্তে নীরবে মস্তকোপরি স্নেহাশীষ বর্ষণ করিলেন। বিশ্বেশ্বর একবার জাহ্নবীর পদতলে মস্তক অবনত করিয়া ছাদ্নাতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। সান্যালকে বলিল "তবে আমি বসতে পারি! সব ভার আপনার"।

"সেজন্য তোমার ভাবনা নেই। আমরা সব ভার নিচ্ছি—তুমি যা ভাল বোঝ কর."

বিশ্বেশ্বর বরের পোড় তুলিয়া নীরবে পরিয়া লইল। বরাসনে গিয়া উপবিষ্ট হইলে,

পুরোহিত বলিলেন "উহুঁ উহুঁ অগ্রে স্ত্রী আচার সাত পাক, শুভ দৃষ্টি পরে দান।" বিশ্বেশ্বর এইবার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইল। তখন নিকদাম যুবকবৃন্দ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া বরকে শিলের উপরে লইয়া গিয়া দাঁড় করাইল। তুমুল রবে শঙ্খ ধ্বনি করিয়া নারীগণ আসিয়া বরকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। বরের নাসিকা ও কর্ণের উপরে কেহই কোন মায়া দেখাইল না, যুবকেরা কেহ কেহ হাসিয়া বিশ্বেশ্বরকে বলিল "শুধু বর হওয়া নয়, এখন বোঝ।"

কন্যাকে পীঁড়িতে করিয়া আনিয়া সাত পাক আরম্ভ হইল। অন্নপূর্ণা জাহ্নবীকে টানিয়া তুলিয়া বলিতে লাগিলেন—"হতভাগী তাখ একবার—একবার চেয়ে তাখ।"

সাত পাক শুভদৃষ্টি হইয়া গেল। বর-কন্যাকে সম্প্রদানের স্থানে বসান হইল, হরি দক্ষিণে বসিয়া কন্যা সম্প্রদান করিল। বিশ্বেশ্বর দক্ষিণ হস্তে কন্যার হস্ত গ্রহণ করিয়া নীরবে হরির প্রতি ইঙ্গিত করিল। সে অনেকক্ষণ হইতে সাবিত্রীর নিস্পন্দাবস্থা লক্ষ্য করিয়াছিল। হরি তখন একবার সাবিত্রীর মুখস্পর্শ করিয়া ব্যস্ত ভাবে বলিল,—

"তাইত—এখন উপায়!"

পুরোহিত বলিল,—

"কি উপায়? কি হয়েছে?"

"আজ্ঞে কন্যা অসুস্থা হয়ে পড়েছেন"।

"তাত' হওয়াই সম্ভব। যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড। এই হ'ল আর কি, বলত বাবা শীগ্‌গির মন্ত্র কথা"।

বিবাহ শেষ হইয়া গেল। হরি ভীতি-কণ্ঠে ডাকিল "পিসিমা, এদিকে কেউ আসুন"। জাহ্নবী আসিয়া সাবিত্রীর লুণ্ঠিত মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। অন্নপূর্ণা নীরবে বাতাস ও জলের ছিটা দিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে সাবিত্রী একটু যেন সুস্থা হইল। জাহ্নবী ডাকিলেন "সাবি কেন মা অমন হয়? আজ যে আমি সাগর ছেঁচা মাণিক পেয়েছি মা"। সাবিত্রী দুই হস্তে মাতার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল "মা আমার দিদি কই মা! দিদিকে ডাক মা"।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কাল ধীরে ধীরে আপনার সাম্বৎসরিক আবর্ত্তনের অর্দ্ধ পথ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রতিবৎসরের মতন এবারও বিশ্বেশ্বরের বহির্বাটীর পার্শ্বস্থিত উদ্যানের আম্র-বৃক্ষগুলা গুচ্ছ গুচ্ছ মুকুলে তাম্রবর্ণ কিশলয়ে ভরিয়া উঠিয়াছে; মৌমাছি গুলার তিলার্দ্ধ অবসর নাই। সরল উন্নতশীর্ষ নারিকেলস্তরু শীতের কবল হইতে নিস্তার পাইয়া নূতন শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া নবীন বায়ু ভরে মস্তক দুলাইতেছে। বাতাবি লেবুগাছ দুটী নববধূর মত রক্তাম্বর পরিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অর্দ্ধস্ফুট ফুলগুলা লইয়া বাতাসের বড়ই আমোদ, দুলাইতেছে, ঝরাইতেছে, গন্ধ হরণ করিয়া এদিকে ওদিকে ছুটিয়া পলাইতেছে। ক্ষুদ্র বালিকার মত বেলা যুঁই মল্লিকারা আপনার শোভা সুগন্ধ লইয়া বড়ই বিব্রত। বৃথাসাধ্য গুপ্ত হইয়া বায়ুর দৃষ্টিপথ এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। সবই প্রতি বৎসরের মত, কিন্তু বিশ্বেশ্বর প্রভাতে পুস্তক হস্তে নারিকেল বৃক্ষের নিম্নে ভ্রমণ

করিতে করিতে দেখিতেছিল এবারে সমস্ত ঋতুরই সাজ সম্পূর্ণ নূতন।

কতকগুলা খাতাপত্র হস্তে কর্ম্মচারী নিবারণ আসিয়া বলিল,—

"এই হিসাব গুলো আপনাকে দেখে নিতে হবে। মন্দিরের জন্য যে টাকা এষ্টিমেট্ করা হয়েছিল তার কিছু বেশীই খরচ পড়বে বোধ হচ্ছে।" বিশ্বেশ্বর হস্তের পুস্তক খানা মুড়িয়া ধরিয়া বলিল,—

"এষ্টিমেটের অপেক্ষা কিছু বেশী হয়েই থাকে। চলুন ঘরে গিয়ে বসে দেখা যাক্।" এমন মনোহারী শৃঙ্খলাহীন প্রকৃতির মধ্যে এসব সাংসারিক ব্যাপারের আলোচনা করা তাহার পসন্দ হইলনা। হস্তস্থিত কাষ্ঠ খানা বেঞ্চের উপরে ফেলিয়া রাখিয়া উভয়ে বৈষয়িক হিসাব নিকাশের কক্ষে গিয়া বসিল। খাতা পত্র দেখিতে দেখিতে বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, মন্দিরটা তৈরি হ'তে আর কতদিন লাগ্‌বে মনে করেন?

"বাড়ীটাত শেষ হয়েছে এখন মন্দির, আর যাহা বাকী আছে সারতে ছমাসের উপরও সময় লাগবে মনে হচ্ছে। হাঁ হরীশ বল্লে যে, যে হিসাবের কাগজ তৈরি করতে বলে ছিলেন, সেগুলোর কতক হয়েছে—একবার দেখবেন।

"আচ্ছা। মাসিমা আসছে বছর সংক্রান্তির দিনে মন্দির আর ঠাকুর প্রতিষ্ঠার দিন স্থির করেছেন।"

"তার আগে সব শেষ হয়ে যাবে।"

যথা কর্ত্তব্য সমাপনান্তে বিশ্বেশ্বর স্নানার্থে উঠিল। বাটির মধ্যে গিয়া ডাকিল "মাসিমা তেল।"

মাসিমা তখন রন্ধনে ব্যস্ত, নিকটে বধূ বসিয়া কলুদ বাঁটিতে ছিল, আদেশ করিলেন,—

"বিশুকে তেল দিয়ে আয়ত' মা।"

বধূ একবার ইতঃস্তত করিয়া অগত্যা অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া তেল লইয়া বাহির হইল। নিধুর মা উঠানে বসিয়া মাছ কুটিতে ছিল, বিশ্বেশ্বর তাহার চক্ষু এড়াইবার জন্য সরিয়া গিয়া বারান্দার থামের পাশে দাঁড়াইল। বধূ অবগুণ্ঠন ঈষৎ সরাইয়া দেখিল যিনি তৈল চাহিয়া গেলেন তিনি সেখানে উপস্থিত নাই। সেইখানে বাটি রাখিয়া রন্ধন গৃহে প্রবেশ করিতেই মাসিমা বলিলেন,—

"বিশু ওখানে আছে?" বধূ নত মুখে বলিল,—"না"।

"কোথায় গেল গিয়ে দেখে দিয়ে এস, যে ছেলে, হয়ত এখনি কথুই নাইতে চলে যাবে একটু ত' তর সয়না। এত দিনেও ওর স্বভাব বুঝতে পারনি মা?"

বধূ কিন্তু মাসিমার অপেক্ষা স্বভাবটা আরও একটু পরিষ্কার বুঝিয়া লইয়াছিল, তাই কুণ্ঠিত হইয়া, অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া অগত্যা তৈলের বাটী লইয়া প্রাঙ্গণে নামিল। মৃদু স্বরে নিধুর মাকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিল, নিধুর মা নিজ কার্য্যে ব্যস্ত বলিল,—"কি জানি, ঘরে যেয়েছেন হয়ত।" প্রাঙ্গণ পার হইয়া শয়ন কক্ষের বারান্দায় উঠিয়া কয়েক পদ যাইতেই থামের পার্শ্ব হইতে বধূর অঞ্চল ধরিয়া কে একটু টান দিল। বিব্রত মুখে সাবিত্রী চারিদিকে চাহিয়া দেখিল অন্য কাহাকেও দেখা যাইতেছে কিনা! তার পর স্বামীর পায়ের নিকটে বাটী রাখিয়া মৃদু স্বরে বলিল "তেল"।

"তা দেখেছি, একটা দরকার কথা আছে শোন"।

অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে বধূ মিনতি চক্ষে চাহিয়া বলিল,—"এখন কাজ আছে, আমি যাব"।

"যাওনা কেন, কে তোমায় ডাকতে গেছ্‌ল! অত কম ঘোমটা মানুষ দেয়! আর একটু।"

বলিয়া বিশ্বেশ্বর বধূর ঘোমটা সুদীর্ঘতর করিয়া টানিয়া দিল। বধূ বিপদ দেখিয়া দ্রুতপদে পলাইল।

শোন, শোন, আচ্ছা বেশ। এর শোধ দেব।"

নদীতে স্নান করিয়া আসিয়া বিশ্বেশ্বর খাইতে বসিল। মাসিমাতা পরিবেশন করিতে করিতে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

"হরির ভন্নে যে মেয়েটি দেখ্‌তে গেলি, কেমন মেয়েটি! তোর খাশুড়ী কাল তোদের নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে; বৌমাকে এখন দুদিন হয় মার কাছে পাঠাব, বাছা এখানে একটি সমবয়সী পায়না, মুখটি বুজে থাকে, তা আমারও তাকে বেশীদিন ওখানে রাখ্‌লে চল্‌বেনা, দিন চারেক রাখ্‌ব। তোর দোকানে এখন নাকি খুব লাভ হচ্ছে, হরীশ বল্‌ছিল!" ইত্যাদি প্রশ্নে বিশ্বেশ্বর "হাঁ" "বেশ" ইত্যাদিতে উত্তর দিয়া যাইতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে একবার চকিত নেত্রে রন্ধনগৃহে, দ্বারের ফাঁকে, জানালার পাশে চাহিতে ছিল, আশা, অবশ্য তাহার রাগ রাগ ভাব কাহারও লক্ষীভূত হইবে।

আহারান্তে শয়ন কক্ষে আসিয়া দেখিল, সাবিত্রী বিছানার পার্শ্বে টুলের উপরে জলের গ্লাশ, পানের ডিবে, গামছা রাখিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ভয়ানক রাগ হইল,—রাগ করিয়া পান না খাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। ক্ষণেক পরে মনে পড়িল একদিন এইরূপ রাগ করিয়া পান না খাওয়াতে সাবিত্রী কিরূপ বিষণ্ণ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া ছিল। ডিবা খুলিয়া পান মুখে দিয়া বিশ্বেশ্বর স্বগতঃ সাবিত্রীকে শাসাইল, ভবিষ্যতে এরূপ দোষ সে আর ক্ষমা করিবেনা।

ঘণ্টাদুয়েক নিদ্রা দিয়া উঠিয়া বিশ্বেশ্বর বিষয়কার্য্যাদি তত্ত্বাবধানের জন্য জুতা জামা পরিয়া লইয়া বাহির হইল। তখন আর খেলাধূলার সময় নয়, অনেকক্ষণ মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন। তথাপি মাসিমার শয়নকক্ষের নিকট দিয়া নিঃশব্দপদে যাইতে যাইতে কান পাতিয়া শুনিয়া গেল, সেখানে মাসিমার মহাভারত শ্রবণ কার্য্য চলিতেছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বিশ্বেশ্বর বাটী ফিরিল। সন্ধানে জানিল অন্নপূর্ণা জাহ্নবীর নিকটে গিয়াছেন। দেখিয়া ভাবিল এরূপ সময়টা কলহে কাটান অতি নির্ব্বোধের কার্য্য। নিঃশব্দপদে এঘর ওঘর খুঁজিয়া ঠাকুরঘরের দ্বারের নিকটে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল সাবিত্রী পট্টবস্ত্র পরিয়া একখানা তামার পাত্রে ফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছে। বিশ্বেশ্বর একবার প্রেমের যুগলমূর্ত্তি বিগ্রহের পানে চাহিয়া দেখিল, আবার তখনি মন্ত্রমনা সাবিত্রীর পানে চাহিল, নিপুণ শিল্পীদেবীর মুখে প্রেমের যে একটী বিশ্বভাব ফুটাইয়া তুলাইয়াছে, সিংহাসন নিম্নে মানবীর মুখেও সেই মধুর ছায়া। ধীরপদে নিকটে গিয়া

দাঁড়াইয়া বলিল "কার জন্যে মালা গাঁথা হচ্ছে?"

চমকিত হইয়া সাবিত্রী একবার চাহিয়া দেখিয়া মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া লইল। মৃদুস্বরে বলিল "ঠাকুরের জন্যে?"

"কোন্ ঠাকুরের জন্যে?"

সাবিত্রী একবার মুখ তুলিয়া স্বামীর পানে চাহিল। বিশ্বেশ্বর পরম গম্ভীর মুখে বলিল "তোমার ঠাকুর কদিন অন্তর বদলি হয়ে থাকে? দেবত্ব পদ দিতে নিতে, তোমার দেখ্‌ছি বেশীক্ষণ লাগে না।" সাবিত্রী এইবার মৃদু হাসিয়া মুখ নীচু করিল, বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা হইল মুখটা তুলিয়া ধরিয়া সেই লুকায়িত হাসিটুকু দেখিয়া লয়। একে বারে তাহার নিকট গিয়া বসিয়া হস্ত হইতে অর্দ্ধ গ্রথিত মালাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল "আমি তা বলে সহজে পদ ছাড়্‌ছি না, এ মালা আমার।" অর্দ্ধ লজ্জিত মুখে সাবিত্রী বলিল "ওকি কর্‌লে? ওতে যে অপরাধ হয়। ঠাকুরের জন্যে মাসিমা—" "কেন, বল্লেনা কোন্ ঠাকুরের জন্যে? তখনকার পণ্ডিতি কথাগুলো বুঝি আর মনে নেই?"

সাবিত্রী গতিক বুঝিয়া ফুলের ডালাটা তাড়াতাড়ি সরাইয়া রাখিল, ঠাকুরের সম্মুখে স্বামীর এই কার্য্যে মনে বুঝি একটু ভয় পাইয়াছিল, গলায় অঞ্চল দিয়া তাড়াতাড়ি বিগ্রহের উদ্দেশে প্রণাম করিল। তৎক্ষণ বিশ্বেশ্বর মালা গাছটা আপনার কণ্ঠে বেশ করিয়া বাঁধিয়া লইল। প্রণতা সাবিত্রী মুখ তুলিলেই বলিল—

"এদিকে আর একজন দেবতা হাঁ করে দাঁড়িয়ে, এমনি ভক্তি যে একটা প্রণামও করে না, হা পোড়া অদৃষ্ট!" সাবিত্রী অপলক দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিল, বুঝি অনেক কথা তাহার মনে আসিতেছিল, বুঝি মনে হইতেছিল সত্যই বিশ্বের ঈশ্বর তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। সহসা উচ্ছ্বাসে ভরে সাবিত্রী নত জানু হইতে না হইতে একটা সুদৃঢ় বাহুপাশ তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল, ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল "ওকি ওকি?" লজ্জিতা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে বলিল "কেন নমস্কার কর্‌লে কি দোষ হয়?"

"হা বই কি! গুরু শিষ্যের কেবলই নমস্কার আর আশীর্ব্বাদ কেমন? লজ্জা বোধ হয় না।"

"লজ্জা কেন হবে! ঠাকুরকে নমস্কার কর্‌তে কি লজ্জা হয়?"

বিশ্বেশ্বর অপলকদৃষ্টিতে সাবিত্রীর মুখের প্রতি চাহিল, তিরস্কার, অভিমান, বেদনা সে দৃষ্টিতে যেন মাখামাখি। সাবিত্রী সে দৃষ্টি সহিতে না পারিয়া মুখ অবনত করিল। বিশ্বেশ্বর গম্ভীরকণ্ঠে বলিল "সাবিত্রী! এখনও কি তোমার সেই কথা? তোমার মনের কথা আমি এখনও বুঝ্‌তে পারি না। এখনও কি তুমি আমায় এত দূর, এত পর ভাব?"

স্বামীর কণ্ঠস্বরে সাবিত্রীও ব্যথা পাইল, ম্লানমুখে বলিল "এতে কি পর ভাবা হয়?"

"নয় কিসে? ঠাকুর দেবতা কাকে বলে?"

"যে অনাথাদের আশ্রয় দেয়, দুঃখীর দুঃখ দূর করে, পথের কাঙালকে সিংহাসনে বসায়।" সাবিত্রীকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বিশ্বেশ্বর ধীরস্বরে বলিল "আর যে ভালবাসে,

যে শুধু ভালবাসাই চায় তাকে বলে মানুষ। অন্যে যে যা বলে বলুক তুমি এ কথা ব'লো না। এত কাছে রয়েছ তবু তুমি আজও কি আমার কিছু জান? এত কাছে থেকেও কি আমরা দুজনে এত দূরে আছি সাবিত্রী?" সাবিত্রী এইবার স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইল। একবার বলিতে গেল "তুমি আমায় যা দিয়াছ একি কখনও আমি আশা করিতে পারিয়াছিলাম। আমি কি এখন নিজেকে তোমার যোগ্য ভাবিতে পারি? ঝড়ের মুখে তৃণের ন্যায় আমরা কোথায় ভাসিয়া যাইতাম, তুমি আশ্রয় দিয়াছ, আমার অধিক পাত্রেও স্থান দিয়াছ ইহার বেশী আর অধিক কথা তুলিও না, আমার তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই।

বাহির হইতে বালকণ্ঠে ধ্বনি উঠিল "ছোট্‌দি"। কালী এসেচে বলিয়া সাবিত্রী চলিয়া গেল। বিশ্বেশ্বর অন্য দ্বার দিয়া নিজ কর্ম্মে পলাইল, কেননা প্রাঙ্গণে আসিয়া। কিছুক্ষণ পরে সাবিত্রী আসিয়া দীপ জ্বালিল। বিশ্বেশ্বর পানের ডিবা হস্তে লইয়া দেখাইয়া বলিল "ঝগড়াটা এখন থামা চাপা দেওয়া থাকুল, আমি ভুলে গেছি মনে ক'রনা।" সাবিত্রী পলাইল।

বিশ্বেশ্বর পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। কিছু পড়িতেছে না, অথচ দেখিয়া দেখিয়া যাইতেছে। চক্ষে কেবল একটা আনন্দের রশ্মি, প্রাণে কেবল কতকগুলা কল্পনার ক্রীড়া, শরীরে কেবল একটা পুলকের হিল্লোল বহিয়া যাইতেছিল। সহসা হস্তে একখানা পত্র উঠিয়া আসিল। সেই পত্র, সতীর সেই অন্তিম অভিব্যক্তি। বিশ্বেশ্বর একবার নিজ মনে পত্রখানা পড়িয়া লইল। অনেক দিনের কথা মনে হইল, তখন সতীর এই কথাগুলা মর্ম্মাহত হৃদয়ের অভিশাপ বাণী বলিয়া মনে হইত, এখন মনে হইল তাহাত নয়। ঈষৎ বেদনাচ্ছন্ন অথচ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের অজস্র আশীর্ব্বাদ। এই যে সতী লিখিয়াছে এই "অধর্ম্ম জানিয়াই স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবে, ভালবাসিবে। অধর্ম্মজাতি বক্ষের মধ্যে কত সমুদ্র লুকাইয়া রাখে তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিবে। স্বীকার করিবে এই স্নেহের আদান প্রদানই শ্রেষ্ঠ সুখ। একি অভিশাপ? এ যেন ভবিষ্যৎবক্তার দৈব বাণী। সত্যইত' সে মূঢ়ের মত ইহার মর্ম্ম বোঝে নাই। আবার পড়িল "তুমি সুখী হও, অন্যকে সুখী ক'রো।" বিশ্বেশ্বর পত্রখানা লইয়া মস্তকে ঠেকাইল।

ভাবিয়া দেখিল পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলা উচিত। কি জানি কখন যদি সাবিত্রী দেখিতে পায়। এ পত্র পড়িলে সে যে বিগুণ ব্যথা পাইবে তাহা নিশ্চয়। সে তাহার দিদির জন্য একেই কাতর তাহাতে এ পত্র ঘৃতাহুতির কার্য্য করিবে। সাবিত্রীকে লুকাইতে হইবে এ চিন্তায় বিশ্বেশ্বর ক্লিষ্ট হইল, কিন্তু নহিলে নয়। অগত্যা বিশ্বেশ্বর পত্রখানা প্রদীপের শিখায় অর্পণ করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অন্নপূর্ণা দেবীর ইচ্ছা ছিল বৎসরান্তে চৈত্র মাসে তিনি তাঁহার অভীপ্সিত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবেন। কিন্তু সাংসারিক নানা ঘটনায় তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

বিশ্বেশ্বরের বিবাহের দুই বৎসর পরে শ্রাবণ মাসে ঘটনাক্রমে সেদিন তাহার বিবাহ হইয়াছিল সেই দিনেই অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিন পড়িল।

ইতিমধ্যে সাবিত্রীর আর একটা আঘাত পাইল। জাহ্নবী দেবী পুণ্যবীতে যেন কোন অবস্থাতেই শান্তি প্রাপ্ত হইতে ছিলেন না, এক্ষণে তিনি চির শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাবিত্রী প্রথমে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল, শেষে মনে ভাবিয়া লইল তাহার দিদির কাছে গিয়া মা ভালই আছেন। তাঁহাদের সুখী করিয়া রাখিয়া মাতা তাহার অভাগিনী কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়াছেন, সাবিত্রী চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিল। হরি এখন বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছে, বালক কালী দিদিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। কাজেই ভট্টাচার্য্যবাড়ী এখন নূতন লোক লইয়া নূতন সুখ দুঃখে আবর্ত্তিত।

মন্দির ও বিগ্রহ 'অন্নপূর্ণা' মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। উৎসবে গ্রাম তুমুল আন্দোলিত হইল। সকলে ভাবিয়াছিল অন্নপূর্ণাদেবীর নিজ সম্পত্তিতে নিশ্চয় প্রকাণ্ড অতিথিশালার সদাব্রত প্রভৃতি বসিবে। বিশ্বেশ্বরও প্রথমে তাহাই ভাবিয়াছিল কিন্তু অন্নপূর্ণা বলিলেন "বিশু, ভগবানের রাজ্যে আহার একরকমে তিনি জুটিয়ে দেন কিন্তু যারা মানুষের, সমাজের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয় তাহাদেরি কষ্ট সব চেয়ে বেশী। এই সম্পত্তিতে এই ব্যবস্থা কর যাতে নিঃস্ব ব্রাহ্মণেরা কন্যাদায় হতে উদ্ধার পায়। অন্য কোন পুণ্যলাভে আমার কামনা নেই, কেবল আমাদের দেশের দুখের মেয়েরা যেন বাপমায়ের অর্থের অভাবে জন্মের মত জলন্ত আগুনে না পড়ে এই আমার কামনা। এই সামান্য অর্থে যদি একটী মেয়েরও চখের জল মোছে তাতেই আমার এ অর্থ সার্থক হবে।' বিশ্বেশ্বর নীরবে মাতৃআজ্ঞা পালন করিল। 'অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার' এই উদ্দেশ্যেই উৎসর্গিত হইল। এইরূপ নামকরণে মাসিমাতা বহু আপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু বিশ্বেশ্বর তাহা শোনে নাই।

"অন্নপূর্ণার মন্দিরে" সেদিন বিষম ব্যাপার। বস্ত্রাদি দান, বিদেশ হইতে আগত পণ্ডিতদিগকে যথাযোগ্য সম্মানে বিদায় প্রদান প্রভৃতি কার্য্যে গ্রামবাসীরাও অদ্য সকলে নিজ নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন। সকলে এখন বিশ্বেশ্বরের অত্যন্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, নিতান্ত বিশ্বস্ত।

সাবিত্রীও সেদিন কোমরে কাপড় জড়াইয়া মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গণে লক্ষ্মীমূর্ত্তিতে অন্ন পরিবেশনে নিযুক্তা। অন্নপূর্ণা অনেক বারণ করিয়াছিলেন কিন্তু সে তাহা শোনে নাই। বেলা ক্রমশ ঢলিয়া আসিল, অন্নপূর্ণা তখন তাহার হস্ত ধরিয়া অন্ন ব্যঞ্জন স্তূপের মধ্য হইতে টানিয়া আনিলেন। বলিলেন পাগলীর মেয়ে! আজকে মাথা গেলি যে দেখ্‌চি। একটু ব'স্, ঠাণ্ডা হ', একটু জল মুখে দে।" চারিদিকে লোকের গণ্ডগোলে,—অন্নপূর্ণা দেবী উজ্জ্বল শোভায় হাসিতেছেন। সাবিত্রী কোমরের কাপড় খুলিয়া ঘর্ম্মবারি মুছিয়া লইল, অঞ্চল দিয়া একটু বাতাস খাইতেছে, এমন সময়

দ্বার প্রান্তে আসিয়া কে বলিল "ভেতরে কে আছ একটু দ্বার চরণামৃত দাও ত',—বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।" সাবিত্রী মুখ বাড়াইয়া দেখিল সম্মুখে অন্নব্যঞ্জন মাথিয়া বিশ্বেশ্বর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পরিশ্রমে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ঝরিতেছে, অন্য কেহ নাই দেখিয়া বিশ্বেশ্বর মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সাবিত্রী অঞ্চল দিয়া স্বামীর গাত্রে বাজন করিতে করিতে বলিল "তুমি কেন এত পরিবেশন কত্তে গিয়েছ?" "আর তুমি?" বলিয়া বিশ্বেশ্বর হাসিল। সাবিত্রী তাড়াতাড়ি দেবীর চরণামৃত এক গ্লাস সত্বর স্বামীর হস্তে দিল। পান করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বিশ্বেশ্বর বলিল "সাবিত্রী আজ কোন্ তারিখ মনে পড়ে?" 'পড়ে' বলিয়া সাবিত্রী হাসিল।

"আজ এত কাজের মধ্যে রয়েছি তবু ঘুরে ঘুরে সেই কথাই মনে আস্‌ছে। আচ্ছা সাবিত্রী যদি তারা বিয়ের সময় সে রকম কাণ্ড না বাধাত, তা কি হত।"

"ওকথা আর কতবার শুন্‌ব! বেশ হ'ত, খুব হ'ত।

"আমারি বুঝি একা খুব হ'ত, মশায় কি সাধু!"

সাবিত্রী স্নিগ্ধনেত্রে স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল "এখন তাই মনে হয় বটে কিন্তু তখন সত্যি আমি যেন জড়ের মত ছিলাম। তখন যদি সে কাণ্ডটা হয়ে যেত, বোধহয় আমি কিছুই ভালমন্দ জ্ঞান কর্‌তে পার্‌তাম না। যা ভাবনা থেকে যে উদ্ধার পাচ্ছেন সেই যেন আমার পরম লাভ বোধ হচ্ছিল। কোন আশা বা বাসনা তখন যেন কর্‌বারও ক্ষমতা ছিল না।" বিশ্বেশ্বর অনিমেষলোচনে সেই ভাবময়ী প্রেমময়ী মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল, মনে মনে বলিল "তুমি এমনি সন্ন্যাসিনী সাবিত্রী ছিলে বটে, নহিলে কি অজ্ঞানাচ্ছন্ন মৃত স্বামীর নবজীবন দিতে পার।"

সৌম্য ক্ষৌমবস্ত্রা অন্নপূর্ণা একটী অতি ক্ষুদ্র কুসুমকলিকা তুল্য শিশু আনিয়া সাবিত্রীর অঙ্কে দিয়া বলিলেন "এটা যে গলা শুকিয়ে মারা গেল, এখন মা দেখিনি কিন্তু।" বিশ্বেশ্বর অঙ্কে অন্ন দিয়া পলাইতে পলাইতে একবার লুব্ধ নয়নে মন্দিরের ভিতর চাহিয়া লইল, দেখিল 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে'র প্রেমময়ী-প্রতিমা মাতৃত্বের পূর্ণমূর্ত্তিতে জগতে অজস্র স্নেহধারা বর্ষণ করিতেছেন।

সমাপ্ত

শ্রীনিরুপমা দেবী।

অন্বেষণ।

[বিশ্বমঙ্গলের প্রতি চিন্তামণি]

আমারে খুঁজিছ কিগো ওগো প্রিয়তম!
পলক-বিহীন নেত্রে সারা অঙ্গে মম
অযাচিত কৌতূহলে? ঘন কৃষ্ণালকে
অরুণাক্ত বন-বীথি, ললাট-ফলকে
ঊষা-জ্যোতি, মুকুলিত বসন্ত-যৌবন
স্তনি-কুঞ্জে, রূপ-জ্যোৎস্না করিয়া দর্শন
সর্ব্বদেহে, ক্ষণ-মোহে হ'য়ে আত্মহারা
তন্তুর অণুতে রূপে বিহ্বলের পারা
নিমজ্জিত কেন সখে?

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের হিন্দু রমণী

[কোনো প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির হইতে প্রাপ্ত]

আপনা সম্বরি'
চেয়ে দেখ,—যে মাধুরী পড়িছে ঝরিয়া'
অঙ্গে মম, অনুরক্ত নহে সে নির্ঝর ;
লুকায় শিশির গর্ভে বসন্ত সুন্দর ;
ঝরে ফুল, নিত্তে উষা, নিকুঞ্জ শ্মশান ;—
এ দেহ ভিতরে মোর না পা'বে সন্ধান।

২

নীল স্বচ্ছ জ্যোতির্ম্ময় নীলিমার মত
নেত্রে মোর কি দেখিছ চাহি' অবিরত
ওগো চির-মিত্র মম ? দেখিছ কি তথা
কামনার সৌর-চক্র ঘুরিছে সর্ব্বথা,
শব্দ-হীন ? বাসনায় ক্ষুব্ধ ধরা প'রে
নীরবে নিরাশা-সন্ধ্যা স্নিগ্ধ ছায়া ধরে ?
আশা-শশী উদি' ধীরে, ধীরে অস্তে যায়
বিষাদের অন্ধকারে ?

পা'বে না তথায়
আমার সন্ধান কভু—রচে যথা মায়া
সুখ দুঃখ হাসি অশ্রু দীপ্তালোক ছায়া
অহরহ।

তার সীমা করি' অতিক্রম
গাহন করিতে বুঝি চাহ প্রিয়তম,
অগাধ এ হৃদয়ের অসীম অতলে,—
রবি চন্দ্র গ্রহ তারা যথা মাহি জ্বলে ?

ওগো অনন্তের পান্থ ! সাধনার বলে
পায় যদি প্রবেশিতে সে অতল-তলে,
মুক্ত-কাম হইবে তখনি !

নাহি তথা
সুখ দুঃখ, হাসি অশ্রু, চিত্ত-চপলতা,
দেহ-রতি, ভেদ-মতি, বিরহ-মিলন,
কামনা বাসনা আশা, জনম-মরণ,
তন্তুর লহর-লীলা ; অন্ধ মমতার
ঘন ঝঞ্ঝা, নাহি তথা জড় চেতনার
ঘোর দ্বন্দ্ব।

সে চিন্ময় নিত্য নিকেতনে
আত্ম পর বিসর্জ্জিয়া সে মাহেন্দ্র ক্ষণে
বুঝিবে—তোমারি আমি, তুমি যে আমার ;
বুঝিবে—না রহে তথা তুমি আমি আর ;
নাহি কাল, নাহি দেশ, নাহি রূপ নাম ;
আনন্দ ! আনন্দ শুধু !—সেইত সন্ধান !

শ্রীকুমুদরঞ্জন রায় চৌধুরী।

ডাকঘর।*

"We live within the shadow of a veil that no man's hand can lift. Some are born near it, as it were, and pass their lives striving to peer through its web, catching now and again visions of inexplicable things; but some of us live so far from the veil that we not only deny its existence but delight in mocking those who perceive what we cannot."

Laurance Alma Tadema.

(১)

উপরের কয়েকটি ছত্র পাঠ করিয়া সমালোচনা লিখিতে আর ভরসা হয় না,

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস, ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা।

কারণ 'veil' এর কাছাকাছি আছি এমন কথাতো বলিতে সাহস হয় না। অবগুণ্ঠনের ভিতরকার কথাতো কিছুই জানি না। তবে যাঁহারা জানেন তাঁহাদের পরিহাস করিতে আনন্দ পাই, এত বড় বর্ষরতার অপবাদ ঘাড়ে করিতে-রাজি নই।

যাঁহারা উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব শিক্ষা দেন তাঁহারা ফুলকে ছিঁড়িয়া তাহার অংশপ্রত্যংশের কোন্‌টার কি কাজ তাহা বুঝাইয়া দেন। কিন্তু সাহিত্যের বাগানে যে ভাবের ফুলটি ফোটে তাহার সম্বন্ধে কি সেই একই প্রণালীতে তত্ত্বখবর লওয়া যায়? সে বাগানে যাহারা যায় তাহারা কি তত্ত্বের জন্ত যায়, না আনন্দের জন্ত যায়? অনেকগুলি ফুল যে একটি বাঁধনে ধরা দিয়া অখণ্ড একটি ফুল হইয়া উঠিয়াছে, ইহাতেই তো আনন্দ, আবার যদি ছুরি ধরিয়া সেই অখণ্ডতাকে খণ্ড খণ্ড করা যায়, তবে আনন্দ থাকে কেমন করিয়া?

আমার মনে হয় যে ভাল কাব্য বা সাহিত্যগ্রন্থ সম্বন্ধে এইটুকু বলাই পর্য্যাপ্ত যে ইহা আমার খুব ভাল লাগিয়াছে, বা ইহা পড়িয়া আমি বড় আনন্দ পাইয়াছি! কবির সৃষ্টির যে আনন্দ তাহাই পুনরায় নিজের মধ্যে সৃজিত করিয়া তোলা, ইহারই নাম সমালোচনা। কবি যে ফুল ফোটান সমালোচক ঠিক তারি পাশে তারি অনুরূপ আরেকটি ফুল ফোটান, ভাল সমালোচনা সেই জন্তই এক রকমের সৃষ্টি। কিন্তু হায়, তেমন সমালোচনার শক্তি কিম্বা সুযোগ কোথায়? ইচ্ছা থাকিলেও ঠিক মনের আনন্দটুকু আপন করিয়া এখন বিদায় লওয়া যায় না। তাহার কারণ কবির সঙ্গে পাঠকদের সঙ্গে এখন বোঝাপড়া নাই। কবির আসরে পাঠকেরা স্থান পান না,—কবি থাকেন "hidden in the light of his thought" আপনার চিন্তার আলোকে আপনি আবৃত। কাজেই বেচারা সমালোচককে মধ্যস্থের কাজ করিতে হয়। একবার কবির দরবারে, একবার পাঠকদের আড্ডায় দুই জায়গায় ঘুরিয়া তাহাকে সম্বাদ বহন করিয়া বেড়াইতে হয়। যদি লেখকে পাঠকে কোন ব্যবধান না থাকিত, তবে সমালোচকও আপনার কাজ সহজে করিতে পারিতেন! অনেক কথার জঞ্জাল জড়ো করিবার উপদ্রব তাঁহাকে সহ্য করিতে হইত না।

'ডাকঘর' ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী 'রাজা' যে ধরণের নাটক এ ধরণের নাটক বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে নূতন। বলা বাহুল্য এ দুইটিই "হেঁয়ালী" শ্রেণীভুক্ত। ইহার পূর্ব্বে বোধ হয় "সোনার তরী" এবং "পরশপাথর" ধরণের কবিতা ছাড়া কবি আর এমন কিছুই লেখেন নাই যাহার জন্ত তাঁহাকে লোকে দুর্ব্বোধ বলিয়া অপবাদ দিয়াছে। ঐ কবিতাগুলিই ঠিক্ কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থের মধ্যে ধরা দিতে নারাজ।

অথচ সেই পূর্ব্বের রূপকজাতীয় কবিতার সঙ্গে আর এখনকার এই নাটকগুলির সঙ্গে আমি তারি একটি মিল এক জায়গায় দেখিতে পাই। আমার মনে হয় ইহাদের মূলভাব একই, কেবল রূপ পৃথক্। কত গুলি রস যাহা কাব্যের বিষয়ীভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত

আছি, কিন্তু তাহাদের মধ্যেই যে মানুষের সমস্ত ইমোশন্ অর্থাৎ হৃদয়াবেগের প্রকাশ নিঃশেষিত হয়, তাহা নহে। প্রেম ভক্তি করুণা সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তি যে রসোদ্রেক করে তাহার ধারণা আমাদের মনে সুস্পষ্ট, কিন্তু অনন্তের জন্য পিপাসা যে রসকে জাগায়, তাহার ধারণা তো তেমন স্পষ্ট হইবার নহে। কারণ সেই বিশেষ অনুভূতিটাই কোন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরা দেয় না, সেই কারণে তাহাকে ভাবের প্রকাশ করা আরও কঠিন হইয়া বসে। তখন symbol অথবা বিগ্রহকে আশ্রয় করিতে হয়, অর্থাৎ ইঙ্গিতে ইসারায় সেই রসের খানিকটা আভাস দিতে হয়।

'সোনার তরী' মানেই কোন বিশেষ রূপ নয়, কিন্তু অপরূপ। কালিদাস বলিয়াছেন যে, রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্—রম্য দৃশ্য দেখিয়া এবং মধুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া মন যখন পর্যুৎসুক হয়, তখন জননান্তরসৌহৃদানি, জন্মজন্মান্তরের ভালবাসার কথা মনে পড়ে। এই যে একটি রস, ইহাকে কি নাম দিব? উপলক্ষ্যটা হয়ত কোন বিশেষ রূপ বা বিশেষ ধ্বনি—কিন্তু তাহাকে ছাড়াইয়া মন যে উতলা হয়, সে এমন একটি অপরূপ সুদূরের জন্য যাহার কোন নাম নাই, রূপ নাই। বর্ষার ভরানদী হয়ত 'সোনার তরী'র উপলক্ষ্য, কিন্তু সে যে বিরহকে জাগায়, তাহা আর তাহাকে আশ্রয় করিয়া তো থাকে না।

কিন্তু কেনই বা symbol লইয়া এত ঝকাঝকি করিতেছি? আমাদের দেশে এটা-তো অপরিচিত জিনিষ নহে। হিন্দুর ধর্ম, কর্ম, আচার, অনুষ্ঠান, শিল্প সমস্তই তাহার বিগ্রহে আগাগোড়া মণ্ডিত। হিন্দু তো একথা বলে না যে ভাবকে কোন দিন কেহ জানিয়া, ব্যবহার করিয়া, বলিয়া শেষ করিয়া দিতে পারে? সেইজন্যই তো সে চিহ্ন মানে, বিগ্রহ মানে—সে জানে যে ভাব অসংখ্যরূপে আপনাকে ক্রমাগত লীলায়িত করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে এবং সেই সমস্ত রূপরূপান্তরকে অনন্ত গুণে অতিক্রম করিয়াও বিরাজ করে। হিন্দুর চিত্ত কেননা বলিলে যে 'সোনারতরী' বল, 'চিঠি' বল, 'পরশপাথর' বল, 'রাজা' বল, ও সমস্তই ছল;—অনন্ত সৌন্দর্যকে একটি মূর্তির মধ্যে ক্ষণকালের মত বাঁধিবার আয়োজন; —তবে ভুল এইটুকু উহাকে দিয়া বলানোই উহার চরম সার্থকতা?

আসল কথা, অনন্তের রসবোধ যখন সাহিত্যের দরবারে আসিয়া রূপ প্রার্থনা করে, তখন সাহিত্যস্রষ্টাকে বিপদে পড়িতে হয়। তাহাকে পণ করিতে হয় কি করিয়া রূপ দিয়াও রূপ না দেওয়া যায়। কারণ রূপ যে সীমাবদ্ধ, সে এমন ভাবকে কি করিয়া প্রকাশ করিবে যাহা সীমায় ধরা দিবে না? তখন তাহার একমাত্র সম্বল হয় উপমা বা রূপক। উপমা খানিকটা বাঁধে, খানিকটা আল্‌গা রাখে। সে বাঁধন এতই সুকুমার, যে তাহার আবরণ সরাইয়া ভাবকে দেখা কিছুমাত্র কঠিন হয় না।

আশা করি, আমি কেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোন কবিতা এবং আধুনিক নাটকগুলির মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করিয়াছি তাহা পাঠকের নিকটে স্পষ্ট হইয়াছে। আমি বলিতে চাই এই যে,

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রূপের ভিতরে অপরূপকে দেখিবার জন্য একটা বেদনা আছে বলিয়াই তাঁহাকে অপরূপের ভাবটিকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হইয়াছে যাহাতে সে নির্দ্দিষ্ট না হইয়া উঠে। অর্থাৎ তাঁহাকে symbol আশ্রয় করিতে হইয়াছে।

Symbol লইয়া এত ব্যাখ্যাবাহুল্য করিবার আর একটু কারণ আছে। symbol এর ঠিক অর্থটি হৃদয়ঙ্গম না করিয়া অনেকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন, তবে সোনার তরীটা কি, তাহার উদ্দিষ্ট মানুষটি কে? সোনার ধানটা কি? অমল কি তবে মানবাত্মা? চিঠি মানে কি মুক্তি? অর্থাৎ তাঁহারা সমস্ত একেবারে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে চান্! আধ্যাত্মিক সত্যকে এই সকল লোকই বৈজ্ঞানিক সত্যের মত পরিষ্কার না দেখিতে পাইলে অধীর হইয়া উঠেন এবং ধর্ম্মকে কল্পনা বলিয়া উপহাস করিতে উদ্যত হন্। ইঁহারা একটা কথা মনে রাখেন না যে বুদ্ধির উপরেও মানুষের একটা Intuition —একটা সহজ প্রত্যয় আছে, বুদ্ধি যেখানে নাগাল পায় না, সেইখানে তাহার শরণাপন্ন হইতে হয়।

(২)

'ডাকঘর'কে symbol অর্থাৎ বিগ্রহরূপী নাটা নামকরণ করা গেল। এটা ঠিক্ নাম নয়, কিন্তু নির্দ্দেশ মাত্র। এখন দ্বিতীয় কথা এই যে ইহা নাটিকা বটে, অথচ ইহার মধ্যে নাটকত্ব কিছুই নাই। অর্থাৎ কোন গল্পও নাই, ঘটনাও বড় নাই। তবে ইহাকে সোনারতরী-গোছের কবিতার মত করিয়া লিখিলেই হইত? নাটিকা বলিয়া আড়ম্বর করিবার কি প্রয়োজন ছিল?

একটি রুগ্ন বালকের সৌন্দর্য্যমুগ্ধ কল্পনা-পীড়িত চিত্ত বিশ্বের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ব্যাকুল, শুধু এই ভাবটুকু যদি থাকিত তবে তাহা গীতে ব্যক্ত করা যাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু অমলের সঙ্গে সঙ্গে মাধবদত্ত, ঠাকুর্দ্দা, মোড়ল, সুধা প্রভৃতি যে মানুষগুলিকে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যে নানা বৈচিত্র্য আছে। কেহ বা অনুকূল কেহ বা প্রতিকূল। সুতরাং ঐ মূলভাবটুকুকে সূত্রের মত করিয়া এই সকল বৈচিত্র্যকে তাহার সহিত সম্মিলিত করিয়া একটি ঘনীভূতব্যূহ রচনা করিতে হইয়াছে। এই বিচিত্রতার সমাবেশেই তো নাটারস। শুধু একটি মাত্র ভাবের রস হইলে গীতিকবিতার রূপ গ্রহণ করা উচিত ছিল। সুতরাং এ নাটিকার শেষ পর্য্যন্ত না পড়িলে পুরা রসাস্বাদন হয় না, ইহা মাঝখানে পড়িয়া থামিবার জো নাই।

ঘটনার পর ঘটনা সাজাইলেই কি সব সময়ে ঔৎসুক্য বেশি করিয়া জাগে? আমারতো মনে হয় ভিতরের চিন্তা কল্পনা ও অনুভূতির একটা ক্রমবিকাশের গতিবেগ বাহিরের ঘটনাপুঞ্জের গতিবেগের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। যেমন ধর 'গোরা' উপন্যাসটি। তাহার উপাখ্যান-অংশটুকু এক নিশ্বাসে শেষ করা যায়। কিন্তু মানব-হৃদয়ের কি বেগবান্ প্রচণ্ড ঘাতপ্রতিঘাত ঐ উপন্যাসে তরঙ্গিত হইয়া চলিয়াছে— অধ্যায়ে, অধ্যায়ে, এমন কি ছত্রে ছত্রে

যে ঔৎসুক্য খাড়া হইয়া জাগিয়া থাকে—এমন কোন্ ঘটনাবহুল উপন্যাসে থাকে আমি তো জানি না।

এই নাটিকাটিতেও কবিজীবনের যে সকল নিগূঢ় অভিজ্ঞতা, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের যে সকল সূক্ষ্ম অনুভাব নানা স্থানে মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে, কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা পাঠ করিতে করিতে পদে পদে বিস্ময় অনুভব করিতে থাকিবেন। ঠিক্ যেন একটি অজানা দেশের মত। তাহার পথের প্রত্যেক মোড়ে, প্রত্যেক বাঁকে নব নব বিস্ময়—তাহা ছাড়া তাহার নানা গলিঘুঁজির তো কথাই নাই। সেই বিস্ময়ের আলোড়নেই সমস্ত নাটিকাটি সজীব হইয়া আছে।

(৩)

মাধবদত্ত সংসারী লোক, সে তাহার স্ত্রীর গ্রামসম্পর্কে ভাইপো অমলকে পোষ্য লইয়াছে। ছেলেটি রুগ্ন,—শরতের রৌদ্র আর হাওয়া যাহাতে ছেলেটি না লাগায়, সে বিষয়ে কবিরাজ মাধব দত্তকে সতর্ক করিয়া গিয়াছে। অমলের মন বাহিরে যাইতে না পারিয়া ছট্ ফট্ করিতেছে। সে তাহার বাড়ীর জানালার নিকটে বসিয়া থাকে—দূরে পাহাড় দেখা যায়—পাহাড়ের নীচে ঝরণা, ঝরণাতলায় ডুমুর গাছ—জানালার সাম্‌নেই রাজপথ, ফিরিওয়ালা সুর করিয়া কিরি করে, রাজার প্রহরী মধ্যাহ্নের স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজায়। ঐ দূর পাহাড়, ঐ ঝরণা, ঐ ফিরিওয়ালার সুর, ঘণ্টার ঢং ঢং তাহাকে আন্‌মনা করিয়া দেয়—কোন্ সুদূরের একটি ডাক তাহার বুকের মধ্যে বহন করিয়া আনে।

'জীবনস্মৃতি' এবং 'ডাকঘর' প্রায় একই সময়ে বাহির হইতেছে, সুতরাং এ দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কল্পনা করিতে পারি নাকি? সেই ফিরিওয়ালার ডাক, রাত্রে ঘণ্টার শব্দ, সেই কল্পনাভারাক্রান্ত মন—এতো কোনমতেই আমাদের অপরিচিত নয়?

'কণিকা'র 'কবির বয়স' নামক কবিতায় কবি তাঁহার কেশে পাক ধরিয়াছে শুনিয়া মহা রাগ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন তিনি সকলের সঙ্গে একবয়সী।

প্রৌঢ় বয়সে তিনি যে কবিতা লিখিয়াছেন,

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী!
দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে!—

তাহার সুরের সঙ্গে বাল্যজীবনস্মৃতির সুর মেলে এবং ডাকঘরেরও সুর মেলে! কবির বয়স যে চিরকাল সমানই থাকিয়া যায়, তাহার প্রমাণ হাতে হাতে পাওয়া যায় বটে!

বাস্তবিক এই সুদূরের জন্য ব্যাকুলতার ভাবটিই ডাকঘরের মূলভাব।

কবির মুখে অনেকবার শুনিয়াছি যে তিনি অনেক সময় এই পৃথিবীর পরিচিত দৃশ্যশব্দগন্ধকে এমন ভাবে অনুভব করিতে চেষ্টা করেন যেন এই পৃথিবীতে তিনি সদ্য আসিয়াছেন। এখানে সমস্তই যেন নূতন, কিছুই যেন তাঁহার পরিচিত নহে। এই যে নিকটতম, অত্যন্ততম, পরিচিততম জিনিসকে বহুদূরের একটি বিরলব্যাপ্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে ছাড়া দিয়া দেখা—ইহাতেই

অভ্যাসের ও পরিচয়ের জড় আবরণ তাহার মুখের উপর হইতে সরিয়া যায়—সে আশ্চর্য্য সুন্দর হইয়া উঠে!

এমন করিয়া দেখিলে সমস্তই কি রহস্যময়! দইওয়ালা যে রাস্তা দিয়া দই হাঁকিয়া চলিয়াছে সেতো একটি স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন মানুষ নয়, তাহার চারিদিকে কত দূরদূরান্তরের কত সৌন্দর্য্য ঘিরিয়া আছে! সেই পাঁচচূড়া পাহাড়ের তলার সৌন্দর্য্য, সেই শাল্‌মলীনদীর সৌন্দর্য্য, সেখানকার সেই লাল মাটির রাস্তাটি, বড় বড় গাছের ছায়া, পাহাড়ের গায়ে যে গরু চরিতেছে তাহাদের সৌন্দর্য্য, সেই যে গোপবধূরা দুধে সাড়ী পরিয়া জল তুলিয়া লইয়া যাইতেছে তাহাদের সৌন্দর্য্য, সেই গ্রামের সমস্ত দেহপ্রেমমাধুর্য্যের কত সৌন্দর্য্য—এই সব সেই দইওয়ালাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তাইতো সে এমন রমণীয়! তাই তাহার ফিরির সুরটিকে বিশ্ব-বাঁশীর মত সকরুণ করিয়া দিয়াছে—বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে তাহার কোন মাহাত্ম্যই নাই।

তেম্‌নি ঐ যে সম্মুখের পথটি, তাহারো রহস্য ঐখানে—সে যে বহুদূরের রাত্রীকে ক্ষণিকের মত চকিতের মত একবার ঐ একটি জায়গায় পাঁড় করাইয়া দেখাইতেছে—বলিতেছে, অনন্তপ্রবাহের একটিমাত্র পরিপূর্ণ মুহূর্ত্তের ছবিখানি দেখ! অনন্ত সমুদ্রকে একটিমাত্র তরঙ্গের মধ্যে দেখ—ইহার পশ্চাতে অনন্ত সমুদ্র—ইহার সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র—সেই সমস্ত প্রবাহ যেন এই একটি তরঙ্গে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে!

তার মানে কি? তার মানে এই যে আমরা এখানে যাহা কিছু দেখিতেছি বা পাইতেছি তাহা ক্রমাগতই চলিবার মুখে, সরিবার মুখে। আমরা তাহার আদিও জানিনা, তাহার অন্তও জানিনা, জানি শুধু তার মাঝখানের খণ্ড একটুখানি কালের কথা। সেই খণ্ডকালে যেটুকু যাহা দেখিতেছি, তাহাকেই বাস্তব বলিয়া সত্য বলিয়া যে আমরা চালিয়া ধরি, তাহাতেই তাহাকে হারাই, তাহার যথার্থ সত্তাকে পাই না। যদি সেই খণ্ডকালের খণ্ড জিনিসের উপর তাহার অনাদি অতীত এবং অনন্ত ভবিষ্যতের একটি আলো ফেলিয়া সেই খণ্ডের মধ্যে একটি অখণ্ডের পরিচয় পাই তবেই সেই জিনিস আশ্চর্য্য অপরূপ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। তাহা তখন একদিকে ব্যক্ত, অন্যদিকে অব্যক্ত, একদিকে সসীম, অন্যদিকে অসীম, একদিকে রূপ, অন্যদিকে অপরূপ। তখন সে কি বিস্ময়—কে তাহা বর্ণনা করিবে?

এ তত্ত্বের কথা নয়, কিন্তু দৃষ্টির কথা। এই দৃষ্টি লইয়াই কবি রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বুদ্ধি যে মানুষের শেষ সম্বল নয়, তাহার সঙ্গে যে কেবল বহির্বিষয়মাত্রের যোগ, মানুষের অধ্যাত্ম-প্রকৃতির গভীরতা পরিমাপ করিতে বুদ্ধি যে অক্ষম,—এ সকল কথা আধুনিক যুগে ইউরোপের তত্ত্বজ্ঞানীদল স্বীকার করিতেছেন দেখিতে পাই। দার্শনিকশ্রেষ্ঠ হাঁরি বার্গসঁ (Henri Bergson) বলেন "আমাদের বুদ্ধি এবং বাহিরের বিষয় পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা রাখে; (Creative Evolution ১৯৭পৃঃ) চৈতন্যকে যদি বুদ্ধির গণ্ডী দিয়া ঘিরিয়া রাখ তবে তাহা বাহ্যবিষয়ের সঙ্গে

জড়িত হইয়া পড়িবে।" সুতরাং বুদ্ধির দৃষ্টি খণ্ডিত দৃষ্টি—আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সমগ্রতা তাহার নাই। কিন্তু যাঁহারা মানবচিত্ত যে কতদূর অগ্রসর হইতেছে তাহার কোন সংবাদ রাখেন না, তাঁহারা সকল বড় জিনিসকেই পরিহাস করিতেই থাকিবেন। ইহাদেরি জন্য কি ম্যাথিউ আর্নল্ডকে 'কিলিস্টাইন' কথাটা উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল?

(৪)

ডাকঘরের মূলভাব না হয় বুঝা গেল, কিন্তু 'ডাকঘর,' 'চিঠি,' 'রাজা' প্রভৃতি ব্যাপার কি? এই যে কল্পনাব্যাকুল সৌন্দর্য্যানুভূতিময় চিত্ত ইহাকে রুদ্ধ করিয়া ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবারই বা তাৎপর্য্য কি এবং রাজার চিঠির জন্য উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিবারই বা অর্থ কি?

আমরা যে রুদ্ধ এবং বদ্ধ কেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার কি প্রয়োজন আছে? আমরা বাহির হইতে চাই, একথাটা যতখানি সত্য, ততখানি সত্য এই কথাটাও যে আমাদের অন্তরে বাহিরে নানা বাধা জড়াইয়া আছে। বারবার কি আমাদের বদ্ধ ঘরে অভিসারের বাঁশীর ডাক আসে না? কিন্তু হায়, বাঁধন কি একটি, নিষেধ কি সামান্য?

মাধবদত্ত-কবিরাজরূপী সংসারতো আছেই, সুধাও আসিয়া যে আধখানা দরজা খোলা আছে তাহাও বন্ধ করিয়া দিতে চায়!

ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সেকথা যে হায় পাশরি!

কিন্তু কল্পনা তো বাঁধ মানে না, সে যে পাখা মেলিয়া সর্ব্বত্র উড়িতে চায়! তার পর, সে সব দেখিবে, সব কিছুর আনন্দ সম্ভোগ করিবে। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় তাহাকেও ফুলাদে ফিরিতে হয়! তখন বলিতে হয়:—

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি।—
খেয়া।

এইরূপে কবির জীবন যখন গিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে মিলিয়া যায়, তখন ঐ একটি মাত্র ইচ্ছা প্রাণ জুড়িয়া রাজে, যে তাঁর চিঠি চাই,—তিনি কবে আসিবেন? সেইখানেই যে সমস্ত বিচিত্রতার অবসান, সেইখানেই সমস্ত জীবনের পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তি!

নাটিকার মধ্যে এই যে এক ভাব হইতে আর এক ভাবে গিয়া পড়িতেছি, (progression of thought) ইহাতেই তাহার মধ্যে একটি গতিসঞ্চার হইয়াছে। এখন আর পথের ধারে 'অনেকের সনে দেখা' নয়, এখন ঘরের মধ্যে চিঠির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকা, এখন আর বহু বিচিত্রতাময় দিন নয়, এখন শীতল অন্ধকারপূর্ণ রাত্রি!

নাটিকার পরিণামটা আমার স্পষ্টতই মৃত্যু বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠক মাত্রেই জানেন যে তিনি জীবনকে এবং মৃত্যুকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন না, তিনি মৃত্যুকে জীবনেরই পূর্ণতর পরিণাম বলিয়া মনে করেন। 'নিষ্কৃপারে' কবিতাটিতে এই

ভাব, 'ঝরণাতলা' কবিতাটিতেও এই একই ভাব—যে জীবনে যেটা ঝংশারূপে সাত-পাহাড়ের সীমানার মধ্যে রহিয়াছে, মৃত্যুর পরে তাহাই সেই সীমা অতিক্রম করিয়া নদী হইয়া বহিয়া গিয়াছে, মৃত্যু ছেদ নয়, সে পরিপূর্ণতা।

শুধু তাই নয়। পূর্ব্বের কোন কোন কবিতাতে কবি মৃত্যু-মাধুরীর কথাও বলিয়াছেন।

পরাণ কহিছে ধীরে, হে মৃত্যু মধুর
এই নীলাম্বর কি তব অন্তঃপুর ?—চৈতালী

মৃত্যু যেন একটি পরিপূর্ণ সুদূর—সমস্তই তাহাতে বিলম্বিত হইয়া সীমা-আবরণ উন্মোচন করিয়া মধুর হইয়া উঠে। আমরা একটু আগে ডাকঘরের যে মূল ভাবটির কথা আলোচনা করিয়াছি, মৃত্যুকে এমন পরিপূর্ণ ও মাধুর্য্যময় করিয়া দেখিলে সে ভাব মৃত্যুর সঙ্গে দিব্য সঙ্গত হয়।

কারণ, কিছুই যে থাকিবে না, সেই জন্যই তো বাস্তবিক সমস্তই এমন সকরুণ, এমন সুন্দর। মৃত্যু আছে বলিয়াই জগতের কোথাও কোন ভার নাই। সমস্তই একটি সুদূরের ব্যাপ্ত বিষাদে বেদনার মত বাজিতেছে! সুতরাং এখানে মৃত্যু যদি পরিণাম হয়, তবে তাহাকে কোন মতেই খাপ্‌ছাড়া বা আকস্মিক বলা চলেনা। কবি যে বলিয়াছেন,

সে এলে সব আসন যাবে ছুটে
সে এলে সব বাঁধন যাবে টুটে—

মৃত্যু যেন সেই একটি বন্ধনমোচনের আনন্দ হইয়া উঠিবে।

তবে কি রাজার চিঠির জন্য অমলের যে ব্যাকুলতা সে এই মৃত্যুর জন্য ব্যাকুলতা ?

না। সে কথা বলিলে রাজার চিঠিকে অত্যন্ত ছোট করিয়া দেখা হইবে।

রাজা যে অমলের মত ছোট মানুষের কাছে আসিতে পারেন এই কথাই তো মোড়ল-জাতীয় লোক বিশ্বাস করেনা—তাহারা পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দেয়। তাহারা জানে যে তিনি রাজা—তিনি কেবল বড় বড় মানুষকেই দেখা দেন্। কিন্তু তাঁহার যে একটি আনন্দ ঐ ছোট বালকের উপরেও অনন্ত হইয়া আছে, উহার নামে যে তিনি কোন্ অনাদিকাল হইতে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, কতবার যে সেই লিপির আহ্বান কত প্রভাতে সন্ধ্যায় বহিয়া গিয়াছে,—তাহা কি মোড়লজাতীয় বুদ্ধিজীবী অবিশ্বাসীরা জানে ? না মাধবদত্তের মত ঘোর সংসারীরা জানে ? একমাত্র লোক যে সেই বার্ত্তা জানে সে ঠাকুর্দ্দা।

'শারদোৎসব' নাটকের সময় হইতেই এই ঠাকুর্দ্দাকে কবির প্রয়োজন হইয়াছে। এই একটি মুক্তপ্রাণ মানুষ—যে সকলের সঙ্গে সব হইয়া আছে, যে পরিপূর্ণ আনন্দকে জানে—ইহাকে নহিলে কবির কল্পনাগুলি সমর্থন পাইবে কেমন করিয়া ? সোনার তরী, ক্ষণিক দীপ, হাস্য কৌতুক প্রভৃতি ব্যাপার যে সত্য সত্যই আছে—সে কথার সাক্ষ্য ঠাকুর্দ্দা ভিন্ন দিবে কে ? ফিলিষ্টাইন্ দলকে শাসাইয়া সংবৃত করিয়াই বা রাখিবে কে ?

ঠাকুর্দ্দা বলিতেছেন—শুনেছি ত তাঁর চিঠি রওনা হ'য়ে বেরিয়েছে।

কিন্তু কবে ?

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে ?

• • •

অমল উত্তর করিতেছে—তা আমি জানিনে। আমি যেন চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাই—মনে হয় যেন আমি অনেকবার দেখেছি—সে অনেক দিন আগে—কতদিন তা মনে পড়ে না। বলব? আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলি নেমে আস্‌চে—বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কত দিন কত রাত ধ'রে সে কেবলি নেমে আস্‌চে। পাহাড়ের পায়ের কাছে যেখানে পথ ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধ'রে সে কেবলি চলে আস্‌চে—নদীর ধারে জোয়ারির ক্ষেত; তারি সরু গলির ভিতর দিয়ে দিয়ে সে কেবলি আস্‌চে—তার পরে আখের ক্ষেত—সেই আখের ক্ষেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চ'লে গিয়েছে সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলি চ'লে আস্‌চে—রাতদিন একলাটি চ'লে আস্‌চে; • • • যতই সে আস্‌চে দেখ্‌চি, আমার বুকের ভিতরে ভারি খুসি হয়ে হয়ে উঠ্‌চে।"

সুতরাং এ চিঠি কখনই সে চিঠি নয়, যে অমুক দিন অমুক সময়ে তোমার মৃত্যু ঘটিবে। এ চিঠি সেই চিঠি যে আমি তোমাকে বড় আদর করিয়া আমার এই আহ্বান লিপি পাঠাইলাম। তুমি আমার, তোমাতে আমার আনন্দ আছে।

আমি এই জায়গায় আমার পাঠকদিগকে রবীন্দ্রনাথের 'চিঠি' কবিতাটি স্মরণ করিতে অনুরোধ করি! সে চিঠিখানিও বিশ্বচিঠি, তাহার লিখন কবি জানেননা, কে লিখিয়াছে তাহাও জানেননা—কিন্তু পাইয়াছেন এই সুদূরে তিনি খুসি, তাঁহার বুকের ভিতরটা আনন্দিত হইয়া উঠিতেছে!

অমল তাই ঠাকুর্দাকে বলিতেছে যে প্রথমে যখন তাহাকে ঘরে বসাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার মন ছট্‌ফট্ করিতেছিল, এখন ডাকঘর দেখিয়া অবধি প্রত্যহই তাহার ভাল লাগে, "ঘরের মধ্যে বসিয়া বসিয়াই ভাল লাগে।" "একদিন আমার চিঠি এসে পৌঁছবে সে কথা মনে কর্‌লেই আমি খুসি হ'য়ে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌তে পারি।"

(৫)

এইবার পরিণামে আসা গিয়াছে। চিঠি পাইবার ভরসার পর পরিণাম সত্যই পরিণাম, পরিণাম পরিপূর্ণতা।

প্রথমে আমরা বিশ্বে বাহির হইবার ব্যাকুলতা দেখিলাম, তারপর রাজার চিঠির প্রত্যাশায় ঘরে চুপ করিয়া থাকিতেও ভাল লাগে দেখিলাম।

এখন দেখি • • "চোখের উপরে থেকে থেকে অন্ধকার হয়ে আস্‌চে। কথা কইতে আর ইচ্ছে করচে না। রাজার চিঠি কি আস্‌বে না?"

বোধ হয় জগতের কোন কবিই মৃত্যুকে জীবনের বর বলিয়া কল্পনা করেন নাই—জীবনে মৃত্যুতে যে বিবাহের অতি নিবিড় সম্বন্ধ সে কথা বলেন নাই। রবীন্দ্রনাথের মাঝের বয়সের কবিতার জীবন ছিল বালিকা-বধূ, তখন তাহার বরকে ভয় করিত—'প্রতীক্ষা' প্রভৃতি কবিতায় তাই তিনি আরও কিছু দিনের মত খেলাধূলার ঘরের মধ্যে বাস করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ

বয়সের কবিতার ক্রমাগতই তিনি মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন।

ওগো আমার এই জীবনের শেষ
পরিপূর্ণতা*
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও
আমারে কথা।

সুতরাং রাজদূতকে তিনি যদি মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে উপস্থিত করেন, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই!

তবু শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সংশয় যায় না। বাহির হইতে মোড়লের অবিশ্বাসের পরিহাসের খোঁচাও আছে। কিন্তু যে অবিশ্বাসী সে সত্যকেই অবিশ্বাস করে কিনা, সে ইঙ্গিতে কেহ না বলিতে চায় কিনা, তাই তাহার অবিশ্বাসই তাহার বিশ্বাসকে যথার্থরূপে পাইবার উপায় হইয়া দাঁড়ায়। সত্যকে সে যত আঘাত করে, ততই তাহার নিজের প্রাচীর একটু একটু করিয়া ভাঙিয়া যায়, শেষে সে দেখে যে সে পরিহাস-ছলে যাহা বলিয়াছে তাহাই সত্য সত্যই ঘটে। সে জানেনা যে, অক্ষরশূন্য কাগজেই রাজার চিঠি আসে। কারণ তাঁহার চিঠির তো বাহ্যিক কোন নিদর্শন নাই, সে চিঠি আমাদের আশা এবং নির্ভরের ভিতরে আসিয়া যে পৌঁছায়। মুড়িমুড়কি খাইতেও তিনি সামান্ত লোকের ঘরেই আসেন—কারণ, তাঁহার আসা যে নিঃশব্দ গোপন—তিনি তো আগে-ভাগে জানাইয়া কাহাকেও দেখা দেন্না। সে একেবারেই আচমকা হঠাৎ আবির্ভাব, তাহার জন্ত কেহই কখনই প্রস্তুত থাকে না।

মোড়লের পরিহাসের মধ্যে ঠাকুর্দ্দা এই সত্যটিকেই দেখিতে পাইলেন। তিনি অমলকে ইহা পরিহাস বলিয়া বুঝিতেই দিলেন না। রাজারই চিঠি আসিয়াছে! রাজাই স্বয়ং আসিতেছেন! হাঁ এই কথাই সত্য!

তার পর রাজদূতের প্রবেশ এবং রাজ-কবিরাজের আগমন। দ্বার ভাঙিয়া গেল, প্রদীপ নিভিয়া গেল, ঘরের সমস্ত দরজা জানালা এক নিমেষে খুলিয়া গেল! অর্দ্ধরাত্রে রাজা আসিবেন শুনা গেল। অমল স্থির করিল যে সে তাঁহার ডাকহরকরার কাজটি প্রার্থনা করিবে। বাস্তবিক কবি কি সেই কাজই করেন না? শূন্য কাগজে অক্ষর পড়িয়া দেওয়াই তো তাঁহার প্রধান কাজ!

নাটিকা সমাপ্ত হইল।

রবীন্দ্রনাথের এইখানেই আশ্চর্য্য কৃতিত্ব যে তিনি তাঁহার সমস্ত জীবননাট্যের নানা অঙ্কের বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলিকে এমন সরল একটি সূত্রের মধ্যে করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা, সৌন্দর্য্যব্যাকুলতা, আধ্যাত্মিক বেদনা, সংশয়, দ্বন্দ্ব, অপেক্ষা, শান্তি সমস্তই এই নাটিকার কোথাও হয়ত একটি ছত্রে বা আধখানি পংক্তিতে তিনি ছুঁইয়া ছুঁইয়া গিয়াছেন, —কোথাও বা সোজা পথ ছাড়িয়া গলিতে ঘুঁজিতে এমন সব রহস্য ছড়াইয়াছেন যে বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। যেমন সুধার কথা। সে অমলের আধখানা দরজা বন্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল;—তাহার সেই ক্ষণিক মোহটুকু সে অমলের মৃত্যুর পরেও হাসিয়া গেল,—সে বলিল—"ও যখন জাগবে তখন বোলো যে সুধা তোমাকে ভোলেনি।" এই এতটুকুর মধ্যে সমস্ত নারীপ্রকৃতির একটি রহস্য কবি কৌশলে ছুঁইয়া গিয়াছেন। শেষ ক'টি কথা ব্রাউনিংএর Evelyn Hopeএর শেষ ছত্রগুলি মনে

করাইয়া দেয়;—মৃত Evelyn এর প্রণয়ী বলিতেছে—"এই একটি পদ্মব আমি তোমার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিলাম, ঘুমাও, যখন জাগিবে তখন তোমার মনে পড়িবে, তখন সব বুঝিতে পারিবে!"

এমন ইঙ্গিত কতই আছে!

ইউরোপেও Symbolical নাটকের যুগ সুরু হইয়াছে। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের এই নাটিকাটি মেটরলিঙ্কের নাটাগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়। লরেন্স এল্‌মাটেডেরা প্রভৃতি মেটরলিঙ্কের সমালোচকবর্গ তাঁহার নাটকের মধ্যে প্রাচীন ধর্ম্মের জীর্ণ ভিত্তির উপর নূতন অধ্যাত্মবোধের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করিতেছেন। অন্তরাল মেটরলিঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনায় এ বিষয়ে কথা কহিবার ইচ্ছা রহিল।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও কি সে চেষ্টা নাই? তিনিও আমাদের দেশের পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম-বোধের দৃষ্টি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল। বৈষ্ণবতন্ত্রের সাধনায় সেই অধ্যাত্মবোধ যেমন অন্তর্নিগূঢ় হইয়াছিল, তেমনি বিশ্বানুপ্রবিষ্ট হয় নাই। সেইজন্য আমাদের দেশ ভেককে বিশ্বাস করে, বাস্তবকে করে না —স্বাভাবিকের চেয়ে অলৌকিককেই বেশি শ্রদ্ধা করে।

সেই অন্তর্নিগূঢ় অধ্যাত্মবোধকে কোন গোপন পন্থায় চালাইতে না দিয়া তাহাকেই বিশ্বের দিকে ব্যাপ্ত করিবার সত্য করিবার জন্য কি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি একান্ত প্রয়াস নাই?

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

৬। ব্যবহারিক দ্বৈতবাদ।

শঙ্কর শুদ্ধাদ্বৈতবাদী, কিন্তু তাঁহার অদ্বৈত-বাদ কেবল মাত্র পারমার্থিকেই (Absolute) নিবদ্ধ। ব্যবহারিক (Relative) দ্বৈতবাদ তিনিও সম্পূর্ণই স্বীকার করেন। শঙ্কর প্রতিপক্ষের আপত্তি বর্ণনা করিতেছেন (ব্রহ্ম সূত্র অ-২পা-১সূ-১৩)—"যদিও শ্রুতি স্ববিষয়ে প্রমাণরূপে গণ্য, তথাপি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তর দ্বারা অপহৃত বিষয় (অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি সিদ্ধ বস্তু) সম্বন্ধে শ্রুতি বাক্য প্রত্যক্ষাদি বিরুদ্ধ হইলে তাহার অন্যরূপ অর্থ করা উচিত। তর্কও সেইরূপ স্ববিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে নির্ভরের অযোগ্য,—যেমন ধর্ম্মাধর্ম্ম, অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান। অতএব ইহা অযুক্ত যে যাহা প্রমাণান্তর দ্বারা সম্যক্ সিদ্ধ, শ্রুতি দ্বারা তাহা বাধিত হইবে।" "প্রমাণান্তর দ্বারা সম্যক্ সিদ্ধ বিষয় কিরূপে শ্রুতি দ্বারা বাধিত হইতে পারে?" তাহার উত্তর এই:—"ভোক্তৃভোগ্য-বিভাগ লোকপ্রসিদ্ধ, ভোক্তা—চেতনশরীরী জীব, এবং ভোগ্য—শব্দাদি বিষয়, যথা—ভোক্তা দেবদত্ত, ভোগ্য ওদন (ভাত)। ভোক্তা যদি ভোগ্য ভাব প্রাপ্ত হয়, অথবা ভোগ্য যদি ভোক্তৃভাব প্রাপ্ত হয়, তবে সেই লোক-প্রসিদ্ধ বিভাগের অভাব প্রতি-পাদিত হয়। পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে তাহাদের অভিন্নত্ব স্বীকার করিলে, তাহারা পরস্পরের ভাব

প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা এই লোক-প্রসিদ্ধ ভোক্তৃভোগ্য-বিভাগের বাধা অসঙ্গত। অতএব অদ্বৈত-ব্রহ্ম-কারণতারূপ সিদ্ধান্ত অযুক্ত"। (আপত্তি খণ্ডন) ইহার উত্তরে * বলিতেছি :—"আমাদের মতেও সেই ভোক্তৃ-ভোগ্য-বিভাগসঙ্গত, কারণ লোকেও তাহা দেখা যায় :—যেমন সমুদ্র জলাত্মক, এবং ফেনবীচি-তরঙ্গ বুদ্বুদাদি তাহারই বিকার মাত্র, সমুদ্র হইতে অভিন্ন। ফেনবীচি প্রভৃতির পরস্পর বিভাগ, এবং পরস্পর সংযোগ দৃষ্ট হয়। উদকাত্মক সমুদ্র হইতে অভিন্ন বলিয়া ফেন-তরঙ্গাদি উদকের বিকার, একটীর মধ্যে আর একটী মিলিয়া যায় না, অথবা তাহারা একটির মধ্যে অন্যটি মিলিয়া যায় না বলিয়া, তাহারা সমুদ্র হইতে ভিন্ন হয় না। সেইরূপে এই স্থলেও ভোক্তৃ-ভোগ্য একটার মধ্যে অন্যটা মিলিয়া যায় না, অথবা একটার মধ্যে অন্যটা মিলিয়া যায় না বলিয়া, পরব্রহ্ম হইতে তাহাদের ভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হয় না। যদিও ভোক্তা (জীব) ব্রহ্মের বিকার না হউক, কারণ শ্রুতি বলিতেছে "তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন" অর্থাৎ স্রষ্টা নিজে অবিকৃত ভাবেই তাহার কার্য্যমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, এবং তাহাতেই তাঁহার ভোক্তৃত্ব, তথাপি কার্য্যে অনুপ্রবিষ্ট হওয়াতে, সেই কার্য্যোপাধি নিমিত্ত বিভাগ রহিয়াছে, যেমন ঘটাদি-নিমিত্ত আকাশের বিভাগ। অতএব পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও ভোক্তৃভোগ্য লক্ষণ ব্যবহারিক বিভাগ, সমুদ্র-তরঙ্গাদির ন্যায় উৎপন্ন হয়।"

পরের সূত্রে শঙ্কর বলিতেছেন :—"কিন্তু ব্যবহারিক বিভাগের পারমার্থিক সত্তা নাই —কারণ কার্য্যকারণের অনন্যত্ব *। কার্য্য এই বহু বিস্তীর্ণ জগৎ, কারণ পরব্রহ্ম। পারমার্থিক দৃষ্টিতে কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব,—যেহেতু কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের অভাব দেখা যায়। এইরূপে এই ভোগ্য-ভোক্তৃত্বাদি প্রপঞ্চ জগতের ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অভাব। আপত্তি :—"তবে বস্তুতঃ ব্রহ্মও অনেকাত্মক হইল। বৃক্ষ যেমন অনেক শাখাযুক্ত, সেইরূপ ব্রহ্মও অনেক শক্তি এবং প্রবৃত্তিযুক্ত। অতএব ব্রহ্মের একত্ব এবং নানাত্ব উভয়ই সত্য, যেমন বৃক্ষ এই অর্থে একত্ব, শাখা এই অর্থে নানাত্ব ;—সমুদ্ররূপে একত্ব, ফেন তরঙ্গাদি রূপে নানাত্ব,—মাটি রূপে একত্ব, ঘটসরাদিরূপে নানাত্ব। সেই একত্ব অংশের জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ-সিদ্ধি, এবং নানাত্বের জ্ঞান দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডাশ্রিত লৌকিক এবং বৈদিক ব্যবহার সিদ্ধি। এরূপ হইলে মৃদাদির দৃষ্টান্ত ও অনুরূপই হয়।" উত্তরঃ—"তাহাও বলা যায় না, কারণ মৃত্তিকা ইহাই সত্য। বিকারজাতকে শ্রুতিতে মিথ্যা বলা হইয়াছে। শ্রুতি 'তৎ সত্যং' বলিয়া পরম কারণ এক ব্রহ্মকেই সত্য বলিতেছে, এবং 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জীবের ব্রহ্মভাব উপদিষ্ট হইয়াছে। জীবের ব্রহ্মাত্মত্ব স্বতঃ সিদ্ধ, যত্নান্তরসাধ্য নয়। শাস্ত্রোক্ত এই ব্রহ্মাত্মত্ব-জ্ঞানলাভ, জীবের স্বাভাবিক শারীরাত্মত্বের বাধক হয়। চক্ষু আদি জ্ঞান যেরূপ সর্পাদি বুদ্ধির বাধক সেইরূপ শারীরাত্মত্ব বাধিত হইলে তদাশ্রিত সমস্ত

* পরে (৬) দ্রষ্টব্য,—'কারণ' শব্দে এস্থলে উপাদান কারণকেই লক্ষ্য করিতেছে।

স্বাভাবিক ব্যবহারও বাধিত হয়। সেই সকল লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের সিদ্ধির জন্যই ব্রহ্মের নানারূপ অপর এক অংশ কল্পিত হইয়া থাকে। একত্বই পারমার্থিক। নানাত্ব মিথ্যা জ্ঞান বিজৃম্ভিত মাত্র। একত্ব এবং নানাত্ব উভয় সত্য হইলে, একত্ব জ্ঞান দ্বারা নানাত্ব জ্ঞান কিরূপে দূর হইবে।" আপত্তিঃ—"কিন্তু যদি একত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করা যায়, তবে নানাত্বের অভাব-জনিত বিষয়-শূন্যত্ব হেতু প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণ সকলের বাধাভাব হয়,—খুঁটি প্রভৃতিতে পুরুষ বুদ্ধির ন্যায় হইয়া পড়ে। আর বিধি নিষেধ শাস্ত্রও ভেদাপেক্ষী, ভেদ না থাকিলে তাহাও মিথ্যা হয়। এমন কি মোক্ষশাস্ত্রও গুরু শিষ্য ইত্যাদি ভেদাপেক্ষী। ভেদ না থাকিলে, তাহাও মিথ্যা হয়। তবে মিথ্যা-ভূত মোক্ষ-শাস্ত্র-সিদ্ধ একত্বের সত্যত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে।" তাহার উত্তর এই :—"এরূপ কোন দোষ নাই। ব্রহ্মাত্মত্ব-বিজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে সকল লৌকিক ব্যবহারেরই সত্যত্ব যুক্তি-সঙ্গত, জাগরণের পূর্ব্বে স্বপ্ন ব্যবহারের ন্যায় যতক্ষণ না পারমার্থিক একাত্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, ততক্ষণ প্রমাণ-প্রমেয় এবং ফলাদি-যুক্ত ব্যবহারে কাহারও মিথ্যাত্ব বুদ্ধি হয় না। ততক্ষণ অবিদ্যা বশতঃ স্বাভাবিক ব্রহ্মাত্মতা পরিত্যাগ করিয়া বিকার সকলকেই 'আমি' 'আমার' এইরূপ আত্মা-আত্মীয় ভাবে সকল জন্তুই গ্রহণ করে। অতএব ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের পূর্ব্বে, সকল লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারই যুক্তিসঙ্গত।"

ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম প্রপাঠকোক্ত বিখ্যাত ইন্দ্র-বিরোচনাখ্যায়িকার ভাষ্যে শঙ্কর ব্রহ্মলোকে মুক্তাত্মাদিগের দ্রষ্টব্য অর্ণব-বৃক্ষ-পুর-স্বর্ণময়পাদির মানস সত্তায় আলোচনা করিতে গিয়া বলিতেছেন :—(ব্রহ্মলোকে দ্রষ্টব্য) "মূর্ত্তি সকল মানস-আকার যুক্ত হইলেই (মুক্তাত্মাদিগের) মানস দেহের অনুরূপ সম্বন্ধ যোগ্য হয়। স্বপ্নেও মানস আকার যুক্ত স্ত্রীপুংস্ত্রী আদিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। আপত্তি হইতে পারে যে স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তি সকল মিথ্যা, কিন্তু ব্রহ্মলোক সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছে :—"সত্যাঃ কামাঃ।" অতএব ইহাতে শ্রুতি-বিরোধ হয় তাহা নয়। মানস প্রত্যয়েরও সত্য যুক্তিসঙ্গত। স্ত্রীপুরুষাদ্যাকার মানস প্রত্যয় সকল স্বপ্নে সৃষ্ট হয়। যদি বলা যায় স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু সকল জাগ্রদ্বাসনানুরূপ, বস্তুতঃ স্বপ্নে স্ত্র্যাদি থাকে না। এ কথা কিছুই নয়। জাগ্রদ্বিষয় সকলও মানসপ্রত্যয় হইতে উৎপন্ন —কারণ জাগ্রদ্বিষয় সকলও সৎস্বরূপের ইচ্ছা (বা জ্ঞান) জনিত, তেজ অপ্-অন্নময়। শ্রুতি বলিতেছে "সংকল্পই লোক সকলের মূল" —প্রত্যগাত্মা বা সত্যাত্মস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই আকাশ পৃথিবীর উৎপত্তি, তাহাতেই তাহাদের লয় ও স্থিতি। রথনাভি-প্রোথিত রথ-চক্রের পাখির (অর) ন্যায়। অতএব মানস এবং বাহ্য বিষয়সকল বীজাঙ্কুরের ন্যায়—পরস্পরের কার্য্যকারণ। যদিও বাহ্যই মানস, এবং মানসই বাহ্য, তাহাদের নিজের সম্বন্ধে তাহাদের কোনটিই মিথ্যা নয়। তবে স্বপ্ন দৃষ্ট বিষয় সকল জাগরিতের সম্বন্ধে মিথ্যা, এ কথা সত্য। জাগ্রদ্বোধের তুলনাতেই তাহাদের মিথ্যাত্ব—তাহাদের নিজের মধ্যে কোন মিথ্যাত্ব নাই। সেইরূপই আবার স্বপ্ন-দৃষ্ট বিষয়ের তুলনায় জাগ্রদ্দৃষ্ট বিষয়ের

মিথ্যাত্ব। তাহার নিজের মধ্যে কোন মিথ্যাত্ব নাই। তবে স্বপ্নেই হউক, আর জাগ্রদবস্থায়ই হউক, বিশেষ-আকারতা মাত্রই মিথ্যা প্রতীতি জনিত। কিন্তু তাহাও কেবল আকার বিশেষ সম্বন্ধেই মিথ্যা। বস্তুতঃ নিজের সম্বন্ধে সম্বিৎ-রূপতা হেতু সত্য। সদাত্ম প্রতিবোধের পূর্ব্বে, স্ব স্ব বিষয়ে, সকলই সত্য। অতএব ব্রহ্মলোকের মূর্ত্তিসকল স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় বলিলে, শ্রুতি-বিরোধ-দোষ হয় না। ব্রহ্মলোকের সাগর এবং সঙ্কল্প-মাত্র উত্থিত পিত্রাদি কামজাত ও মানস। অষ্টম প্রপাঠকের দ্বাদশ খণ্ডের ভাষ্যে মুক্তাত্মা সম্বন্ধে শঙ্কর আবার বলিতেছেন:—"যেখানে অন্য কাহাকেও দেখে না, অন্য কিছুই শোনে না, তাহাই ভূমা"—তবে এক হইয়া মুক্তাত্মা কিরূপে ব্রহ্মলোকে 'পিতৃ-মাতৃ-লোকাদি' দর্শন করিয়া, অথবা স্ত্রীর সহিত' বা 'জ্ঞাতিদিগের সহিত' বিহার করিয়া, আনন্দিত হয়েন? ইহা বিরুদ্ধ, কারণ একই ব্যক্তি যে সময়ে (ব্রাহ্মলৌকিক কর্ম্ম সকল) দর্শন করে, সেই সময়েই বলা হইতেছে যে অন্য কাহাকেও সে দেখে না, "নানাৎপশ্যতি" ইহাতে দোষ হয় না। ভূমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও সে দেখে না। শ্রুত্যন্তরেও সে দোষ পরিহৃত হইয়াছে,—দ্রষ্টার দৃষ্টির আবশ্যিলোপ হেতু সে দেখেই। তবে দ্রষ্টা হইতে পৃথক কোন কাম্যবস্তুর অভাব হেতু, দেখে না বলা যায়। যদিও শ্রুতিতে সুষুপ্ত সম্বন্ধেই ঐরূপ বলা হইয়াছে, মুক্ত ব্যক্তিরও সটীকত্ব হেতু, দ্বিতীয়াভাব সমান। "কি দিয়া কাহাকে দেখিবে?" তাহাও বলা হইয়াছে। মোক্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, যে শঙ্কর মুক্তাত্মার অবস্থা আমাদের রোগ মুক্তাবস্থার সহিত তুলনা করিতেছেন:—"যথা রোগনিবৃত্তাব-রোগোঽভিনিষ্পদ্যতে।" (ব্রহ্মসূত্র। অ-৪।পা-৪। সূ-২।) তিনি আবার বলিতেছেন যে মুক্তাত্মাদিগের "অনিমাদ্যাত্মক ঐশ্বর্য্যও" সেই নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন,—"নিত্য-সিদ্ধেশ্বরাধীনমিতরেষামৈশ্বর্য্যং" (সূত্র ১৭, ১৮।) এতদ্বারা পাঠক দেখিবেন যে ব্যবহারিক দ্বৈতভাব শঙ্করাচার্য্যের মতে মুক্তাবস্থাতেও থাকে,—মুক্তাত্মা নিয়ম্য এবং ঈশ্বর নিয়ামক।

শ্রীবিজয়দাস দত্ত।

গিলগিটবাসীদিগের আমোদ প্রমোদ।

শ্রীনগরের উত্তর পশ্চিমাংশে ২২৮ মাইল দূরে গিলগিট অবস্থিত। এই স্থানটী সমুদ্র বক্ষ হইতে প্রায় ৫৪০ ফুট উচ্চে। গ্রীষ্ম-কালে তাপমানের উত্তাপ ১১৫০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত হয় কিন্তু শীতকালে ১৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত নামিয়া থাকে। গিলগিটের উত্তরে "হুনজা" (Hunza) এবং নাগীর নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য। পশ্চিমে পুনিয়াল (Punial) ও ইয়াসীন, দক্ষিণে চিলাস ও কাশ্মীর এবং পূর্ব্বে "স্কারডু" অবস্থিত।

এই স্থানটী ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের মহারাজের অধীনস্থ কর্ম্মচারী সৈয়দ নথিসা

খুস্‌ওয়াক্তি সেনাপতি ইয়াসিনের শাসন কর্ত্তা গৌহরআমনকে (Gauharaman) পরাজিত করিয়া স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। গৌহর আমন আবার উহার প্রকৃত অধিকারী সিকান্দর খাঁ ও তাহার ভ্রাতা করিম খাঁর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক দেশটী কাড়িয়া লয় নাপি সার গিলগিট আক্রমণ করিলে পর করিম খাঁ পলায়ন করিয়া কাশ্মীরের মহারাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে এবং নাপি সার অধীনে কাশ্মীর মহারাজের প্রচুর সৈন্য লইয়া গিলগিটে উপস্থিত হয়। ইহাদের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া গৌহর আমন ইয়াসীনে পলায়ন করে এবং বিনা রক্তপাতে তাহারা স্থানটীকে পুনরায় অধিকার করিয়া লয়। কাশ্মীর মহারাজ প্রথমে ইহার যথার্থ অধিকারী করিম খাঁকেই তাহার রাজ্য ফিরাইয়া দেন কিন্তু পরবর্ত্তী কতিপয় ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া তিনি দেশটীকে প্রকৃতরূপে আপনার রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তথায় বৃটীশ উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্টের একজন রাজনৈতিক কর্ম্মচারী এবং ওয়াজীরই ওয়াজীরাত নামক কাশ্মীর মহারাজের একজন কর্ম্মচারী গিলগিটে অবস্থান করিতেছেন। কাশ্মীর মহারাজের কর্ম্মচারী কেবলমাত্র খেলা সংক্রান্ত বিচার কার্য্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু বৃটীশ কর্ম্মচারী গিলগিটের শাসন ও তৎসঙ্গে নিকটবর্ত্তী হুন্‌জা, নাগীর, পুনিয়াল, ইনকুমান্ ইয়াসীন, যিয়ির ও প্রজাতন্ত্রশাসন চিলাসের সহিত রাজনৈতিক সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহারা সকলেই কাশ্মীর মহারাজকেই প্রধান ভূস্বামী বলিয়া সম্মান করে। কাশ্মীর মহারাজের সৈন্যসামন্তই গিলগিটের শাসন কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে, দুর্গটী কাশ্মীর মহারাজের এবং তাহারই নিযুক্ত সর্ব্ব প্রধান সেনাপতির দ্বারা শাসিত। সৈন্যগণকে ছয় বৎসরান্তর ছুটী দেওয়া হয়।

শ্রীনগর, গিলগিট, চিত্রল এবং হুন্‌জা প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট রাস্তা আছে কিন্তু এই সকল রাস্তায় জুন হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত যাতায়াত চলিতে পারে। নবেম্বর হইতে মে পর্য্যন্ত অত্যধিক তুষার পাতে জোগ্‌বল্ এবং ব্রাজিল গিরিপথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তবে সাধারণতঃ ডাকবিভাগের কার্য্যাদি সুযোগানুসারে স্থানীয় ডাকহরকরা দ্বারা কোন প্রকারে নির্ব্বাহ করা হয়। কাশ্মীর, গিলগিট, এবং চিত্রল এই স্থান কয়টীর মধ্যে তারে সংবাদ প্রেরণের বন্দোবস্ত আছে।

এই স্থানের বর্ত্তমান অধিবাসীরা সকলেই মুসলমান এবং প্রায় সকলেই "সিয়া" শ্রেণীয়। "সুন্নি" ও মৌলেইস্‌দের সংখ্যা অতি অল্প। রোনো, সিন্, বেশাকুন, কাশ্মীর, ক্রামিন, ডুম এবং শুজরাস ইহারাই ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইহারাও আবার বংশানুক্রমে বিভক্ত হইয়াছে এবং বংশের একজন খ্যাতনামা পূর্ব্বপুরুষের নামানুসারে এক একটী বংশের নামকরণ হইয়াছে। বোধহয় ক্রামিন্‌রাই গিলগিটের আদিম অধিবাসী, তৎপর বেশাকুন, সিন্, রোনো প্রভৃতিরা অপরাপর অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া সেই স্থানে আধিপত্য লাভ করিয়াছে। সম্ভবত বেশাকুনরা হিন্দুকুশ দিয়া মধ্য এসিয়া হইতে

আসিয়াছে এবং তাহারা আর্য্যবংশোদ্ভব। তাহারা বলপূর্ব্বক স্থানীয় অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া সমস্ত স্থানগুলি অধিকার করিয়া লয় এবং তাহাদিগকে তাহাদের দাসত্ব করিতে বাধ্য করে ও ক্রমিন্ অর্থাৎ অনুচর এই আখ্যা প্রদান করে।

"সিন্"রা বলে যে তাহারা আরব বংশোদ্ভব। বোধহয় তাহারা ইহুদী। আফগানি স্থানের মধ্য দিয়া পারস্য ও তুর্কীস্থান হইতে আসিয়াছে। তাহারা স্বায়ত্বশাসনের পক্ষপাতী এবং তাহারা যে যে স্থানে গিয়াছে সেই সেই স্থানে এই শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সিনেরা মাংস, দুগ্ধ, ঘৃত (গোবৃন্দ হইতে প্রাপ্ত হয় বলিয়া) গ্রহণ করিত না। কুকুর পোষাকেও ঘৃণা করিত এবং মৎস্যকেও অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিত।

যদি কোন 'সিন্' নিম্ন বংশে বিবাহ করিয়া পুনরায় যেশাকুন বংশে দার পরিগ্রহ করিত তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বস্ত্রীর সন্তানগণ সিন্ ও শেষোক্ত স্ত্রীর সন্তানগণ যেশাকুন আখ্যা প্রাপ্ত হইত। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মাতৃবংশই পুত্রগণের বংশ নির্দ্দেশক।

'রোনো'রা বলে যে তাহারা কাশ্মীরের রাজপুরী হইতে আসিয়াছে এবং তাহারা তথাকার রাজবংশোদ্ভব।

গুজরাসগণ অল্পদিন হইল এখানে আসিয়াছে এবং তাহারা ভারতবর্ষে যেরূপ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিত এখানেও সেই ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন এই স্থানের পূর্ব্বাধিপতি মুসলমানদিগের 'রা' নামক একটী বংশ আছে। তাহারা এলেক্‌সেন্ডরের (Alexander) বংশোদ্ভূত এবং প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে স্কার্দু (Skardu) হইতে আসিয়াছিল। স্থানীয় অধিবাসীরা বলে যে "রা" বংশ পরীর (Fairy) বংশ। এই জন্য তাহারা মনে করে যে তাহাদের অধিপতিরাই সর্ব্বপ্রধান জাতি এবং দেবতাদেরও অত্যন্ত নিকটাত্মীয়। সুতরাং এই বংশকে সম্মান করা ও তাহাদের আজ্ঞাধীন হওয়া অত্যন্ত সম্মানজনক।

ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ প্রণালীও অত্যন্ত আড়ম্বরহীন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও সাদাসিধে রকমের, অতি অল্পেই ইহারা সুখী, এক জনেই কৃষিকার্য্য, বস্ত্রবয়ন, ছুতারের কার্য্যাদি করিয়া থাকে।

পোষাকপরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাহারা নিজের হাতে বোনা ভেড়া ও ছাগলের লোমের মোটা জামা, পেণ্টুলন, কামিজ এবং একটি ভাঁজকরা টুপি ব্যবহার করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা একটী ঢিলা পায়জামা, কামিজ টুপি এবং রূপার গহনা, শঙ্খের মালা ইত্যাদি ব্যবহার করে। ছাগল কিম্বা গরুর চর্ম্মে নির্ম্মিত পাবু (pabboo) নামক এক প্রকার মোজার ন্যায় নরম জুতা ইহারা ব্যবহার করে, এবং পর্ব্বতে উঠানামা করিতে হইলে এক খানা প্রকাণ্ড ছাগলের চামড়া পায়ে জড়াইয়া লয়। তাহাকে ইহারা তাউতি বলে।

ইহারা পলো খেলিতে বড়ই ভালবাসে এবং ইহাই তাদের প্রধান আমোদ। ক্রীড়ার সময় তাহাদিগকে যারপর নাই উৎফুল্ল ও উৎসাহিত দেখা যায়। যেন সংসারের সকল বিষয়ই তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। শীকার কার্য্যেও তাহারা বিশেষ পটু। সময়ে সময়ে

স্ত্রীগন্ধলে এবং মাংস চর্ম্ম ও পশমের নিমিত্ত-মার্কহোর নামক (Morkhor) পার্ব্বত্য ছাগল এবং উড়িয়াল প্রভৃতি পশু হনন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে ইহারা সংস্কৃত ভাষার কথাবার্ত্তা বলিত কিন্তু এক্ষণে তাহারা যে ভাষায় কথা বলিয়া থাকে তাহাকে সিন্‌হা (Shianha) বলে এবং চিত্রলগণ ইহাকে ডানগ্রিক্ (Danghrik) বলিয়া থাকে। ইহাতে সংস্কৃত ও পারসী শব্দ বহুল পরিমাণে মিশ্রিত।

বহুকাল বৌদ্ধ ও মুসলমানদিগের অধীনে থাকায় এই জাতির প্রত্যেক শাখার আচার পদ্ধতি ও চলিত গল্প প্রবন্ধাদির মূল নির্ণয় এবং উৎসবাদির কোনটী কখন কোন শাখা দ্বারা প্রচারিত ও নির্ব্বাহিত হইয়াছিল এই সত্যোদ্ঘাটন করা অতীব কঠিন। নিম্নে তাহাদের উৎসবের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

সিন্ বাজনো উৎসব।

বসন্তের প্রারম্ভে গিলগিট নগরে এই উৎসবের উদ্বোধন হয়। ইংরেজী 'মে'ডের (Mayday) সঙ্গে এই উৎসবের সাদৃশ্য আছে। এই উৎসব প্রায় ১৫ দিন ব্যাপী। ফেব্রুয়ারীর মধ্যভাগে আরম্ভ হইয়া মার্চ্চের প্রথমে সমাপ্ত হয়। উৎসবের উদ্দেশ্য এই যে যন্ত্রণাদায়ক হুরন্তনীত অনুচর তুষার রাশি লইয়া অন্তর্হিত হইতেছে এবং মধুর বসন্তকাল তরুবল্লরী নব পত্রমুকুলে সজ্জিত করিয়া মনুষ্যের জীবনীশক্তিকে পুনরায় উদ্দীপিত করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার সূচনা করিয়াছে। এ নিমিত্তই তাহাদের এই অপূর্ব্ব উৎসব। গিলগিটের অধিবাসীগণ এই উৎসব সাতিশয় আনন্দের সহিত সম্পাদন করিয়া থাকে এবং দীর্ঘকাল ইহার আগমন প্রতীক্ষায় আশাপথ চাহিয়া থাকে। এই উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিবার অভিপ্রায়ে তাহারা উৎসবারম্ভের বাদশ দিবস পূর্ব্বে একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত পাত্রে ১০ সের পরিমাণ গোধূম ৫ দিবস পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া রাখে। তৎপর নির্দ্দিষ্ট দিবসে সেই গুলি উঠাইয়া আটীতে পেষিত একটী গর্ত্তে ঢালিয়া পাথর চাপা দিয়া রাখে। এইরূপে ৪দিন অতিবাহিত হইলে যখন গোধূম অঙ্কুরিত হয় তখন সেইগুলি উঠাইয়া উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে পর গিলগিটের স্রোতে চালিত যন্ত্রে চূর্ণ করা হয়। এই গোধূম চূর্ণকে ইহারা 'ডিবাম' বলে এবং ইহাতে মাসের ঠিক প্রথম দিনে খানিকটা জল, খুবানি ও আখরোটের তৈল মিশ্রিত করিয়া অগ্নি সংযোগে পিষ্টক প্রস্তুত করে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে ইহাতে বিন্দুমাত্রও চিনি দেয় না। এই অপূর্ব্ব জিনিসটীকে "ওয়েইলেই ডিবেম" বলে। চিনি বর্জ্জিত হইলেও ইহাতে বেশ একটা মিষ্টগন্ধ পাওয়া যায়। তাহাদের বিশ্বাস যে কোন এক অলক্ষিত অমানুষিক ভাবের অঙ্গুলি সঙ্কেতেই এইরূপ অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। অবশিষ্ট গোধূম চূর্ণে "ডিবাম পিঠি" নামক এক প্রকার চ্যাপ্টা সমতল পাউরুটী প্রস্তুত করিয়া তৈল ও কিস্‌মিস্ সংযোগে মহোল্লাসে তাহা উদরস্থ করে। এই ডিবাম পিঠিরূপ অপূর্ব্ব জিনিষটীর সহিত তৈল ও কিস্‌মিস্ যুক্ত হইলেই ইহার নাম বদ্‌লাইয়া যায়। তখন ইহাকে "ভ্রাগা ভাত" বলে।

এই উৎসবে তাহারা কেবলমাত্র উদ্ভিদের কল্যাণ সাধন করিয়া ক্ষান্ত হয় না। নরমাংসে

অর্থাৎ নবেম্বরের কোন সময়ে একটি শুভদিন নির্দ্দেশ করিয়া প্রত্যেক পরিবারের প্রধানেরা কতকগুলি ভেড়া হত্যা এবং তাহাদের মাংস সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিয়া এই উৎসবের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। ভেড়াগুলির মধ্যে ১টী ভেড়ার লেজ ও একখানি পা যত্ন পূর্ব্বক ছিন্ন করিয়া রাখা হয় এবং "সিনহো বাজনো" উৎসবে ড্রাচা ভাতের" সঙ্গে তাহা একত্র সুসিদ্ধ করা হয়। উৎসবের সময় সকলেই আহারাদি করিয়া থাকে। আহারান্তে তাহাদের অপূর্ব্ব নৃত্য আরম্ভ হয় এবং নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী গীত হয়—

ঐদিন যেন আমার আসে যে দুই সকল
এ দিন যেন আসে আমার ;
পূর্ণ হবে শস্যে ভাণ্ডার,—এ দিন যেন আসে আমার ;
প্রচুর 'ঘি' উৎপন্ন হবে ; পরের বছর যেন এমন হয় ;
মাংস রাশির সঞ্চয় করে, পরের বছর যেন এমন হয় ;
বহু রাশি ভাণ্ডার ভরে, এ দিন যেন আসে আমার ;
শুভ দিনত আজ এসেছে, ঐদিন যেন আসে আমার।

দুপ্রহরে খেলোয়াড়গণ একত্রিত হয় এবং সকলেই পলোখেলার আয়োজনে ব্যস্ত থাকে। ক্রীড়া স্থানে গমন কালে তাহারা সেই দিন একটী বিশেষ শোভাযাত্রার বন্দোবস্ত করে। স্ত্রীলোকেরা গৃহের চালে, ছাদের উপরে এবং রাস্তার দুই পার্শ্বে থাকিয়া এই অপূর্ব্ব শোভা-যাত্রা আনন্দের সহিত দর্শন করে। কেবল তাহাই নহে, স্ত্রীলোকদিগের প্রত্যেকের হস্তে সেদিন এক একটী করিয়া লম্বালাঠি থাকে এবং সেই লম্বালাঠির দ্বারা পুরুষগণকে নির্দ্দয় রূপে প্রহার করিতে থাকে। কলিওয়ালারা গিলগিটের ব্যবসায়ী জাতি, তাহারাই প্রধানত প্রহারটা অধিক খাইয়া থাকে। এবং এই উপলক্ষ্যে স্ত্রীলোকেরা তাহাদের বাকী পাওনার শোধ অনেকটা তুলিয়া লয়। কোন নূতন ব্যবসায়ী তাহাদের হাতে পড়িলে ত কথাই নাই। তাহাকে প্রচুর পরিমাণে সুবর্ণচূর্ণ প্রদান করিয়া নিস্তার লাভ করিতে হয়। তৎপর "রা" অর্থাৎ প্রধান শাসন-কর্ত্তার উপর প্রহার বর্ষণ হয়। তিনি ঘোড়ার উপর চড়িয়া দুই হাতে সুন্দরীদিগকে সেলাম করিতে করিতে দ্রুতগতিতে চলিয়া কোন প্রকারে তাহাদের হস্ত হইতে নিস্তার পান। কিন্তু তাঁহাকেও বিশেষ রকম অর্থ দণ্ড দিতে হয়। তবে তাঁহার প্রতি ব্যবস্থাটা একটু লঘু হইয়া থাকে কারণ তাঁহার কোপে পড়িলে অনেক লাঞ্ছনা ও অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

এই অপূর্ব্ব শোভাযাত্রা এইরূপে ক্রিয়া ভূমিতে উপস্থিত হইবামাত্র একদিকের সীমা-স্তম্ভে প্রস্তরের (goal) উপর একটি ছাগ বলি দেওয়া হয়। এই উৎসর্গকে "বাজনো আইকয়াই" বলে। ছাগমুণ্ডটি এক গাছি রজ্জুতে আবদ্ধ করা হয় এবং প্রত্যেক খেলো-য়াড় তাহার পলো খেলিবার দণ্ড দ্বারা এক একবার তাহা স্পর্শ করে। তৎপর একজন বাজনদার সেই রজ্জুটি ধরিয়া দৌড়াইতে থাকে ছাগমুণ্ডটিও ভূমিতে অদ্ভুতভাবে বিলুণ্ঠিত হয়। তৎপশ্চাৎ রাজা বা তাহাদের প্রধানমণ্ডল একখানি প্রকাণ্ড লাঠি হস্তে অশ্বারোহণ করিয়া বাজনদারের মস্তকে প্রহার করিতে করিতে অন্য সীমান্তে উপস্থিত হয়। ইহাই উৎসবের শেষ অঙ্গ। তৎপর 'পলো' খেলা আরম্ভ হয় এবং শুভদিনের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত ক্রীড়া চলিতে থাকে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

চোর।

১

মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙ্গাইয়া স্ত্রী বলিলেন, "ওগো শুন্‌চো, নীচে যেন কে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বোধ হয় চোর!"

"ক্ষেপেছ! স্বপন দেখছিলে তুমি!" এই বলিয়া পাশ বালিশটাকে আলিঙ্গন করিয়া নূতন করিয়া নিদ্রার জোগাড় করিতে লাগিলাম। কিন্তু স্বামীর স্বাচ্ছন্দ্যাপেক্ষা বাসন কোশনের সিন্দুকটার উপরেই একেলে সহ-ধর্ম্মিণীটির প্রখর স্নেহ। তিনি কেবলি বলিতে লাগিলেন "হাঁগো জেগে থেকে সর্ব্বস্ব চোরের হাতে দেবে? একবারটি উঠে দেখবেওনা?" বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। সেই মুহূর্ত্তেই আমার নীচের ঘরের ঘড়িতে ঢং করিয়া সজোরে একটা বাজিয়া উঠিল। আমার স্ত্রীও বিছানার উপরে উঠিয়া বসিয়া সেই কাল্পনিক শব্দের উদ্দেশে কান পাতিয়া বলিলেন, "ঐগো বড় ঘরে ঢুকলো, যাবে যদি শিগ্‌গির যাও। রূপোর বাসন কোশন সাল বেনারসী সবই ঐঘরের আলমারিটাতে রয়েছে।"

মিথ্যা বলিয়া লাভ কি,—সাধারণ লোকের চেয়ে যে আমি কিছু অধিক সাহসী ছিলাম তা নয়। চোর ধরিবার উৎসাহের চেয়ে জিনিষ পত্রগুলার প্রতি কতকটা মায়ার ও তাহাদের অধিকারিণীর অত্যন্ত কাতর অনুরোধেই আমাকে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে দায়ে পড়িয়া প্রবৃত্ত করিল! কটক হইতে মনের মতন করিয়া কতকগুলি সৌখীন রূপার বাসন এই সেদিন মাত্র গড়াইয়া আনিয়াছি। তাহা-দের চমৎকার শিল্পনৈপুণ্য ও চাকচিক্য সর্ব্বদা চোখে পড়িবে বলিয়া গৃহিণী সেগুলিকে নিজের বসিবার ঘরে কাঁচের আলমারিতে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। আমি তখনি তাঁহাকে একবার্ধা করিতে বারণ করিয়াছিলাম। ঘরের কোণে একগাছা বেতের ছড়ি ছিল, আলো জ্বালিয়া তাহার অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু ছেলেদের দয়ায় তাহার কোন অস্তিত্বই পাওয়া গেল না। অগত্যা প্রাণটিই হাতে করিয়া চলিলাম। অন্ধ আইনের কর্ত্তাদের চাপা-চাপিতে পাটাকোটা ভোজালেখানা শুদ্ধ খিড়কির পুকুরে ফেলিয়া দিতে বাধ্য করিয়াছিল। চারু তখন হাঁফ্ ছাড়িয়া উঠিয়া চুপিচুপি সাবধান করিয়া দিল "ওগো দেখো যেন মারে টারে না!"

তাহার ভয়ার একটু হাসিও আসিল; সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় সত্য কথা বলিতে কি আমার গাটা কেমন যেন ছম ছম করিতে-ছিল। নাজানি আমার জন্য সিঁড়ির নীচেতেই কি একটা রহস্য অপেক্ষা করিয়া আছে। অন্ধকার রাত্রি, কোথাও আলোর ছায়াটুকু পর্য্যন্ত নাই, বাড়িতেও দ্বিতীয় কেহ সাহায্য-কারী ছিল না। আমার হাতেরি ছারিকেনের মিটমিটে আলোতে হঠাৎ দেখিতে পাইলাম চারুর কথাই সত্য! বড় ঘরের দরজাখোলা ও ভিতর হইতে মানুষের চলাফেরার সাবধনতা-পূর্ণ মৃদু আওয়াজ পাওয়া যাইতেছে! এইবার আমার বুকের মধ্যে চলন্ত রক্ত যেন কোন অদৃশ্য হিমহস্তস্পর্শে জমিয়া আসিতে লাগিল। হয়ত ঘরের মধ্যের লোকটা বা লোকগুলা অস্ত্রধারী! কিন্তু পরক্ষণেই আবার

নিজের কাপুরুষতা নিজেরই কাছে সুপ্রচুর লজ্জার আঘাতে উত্তেজনায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। নাঃ, হাজার হোক পুরুষ মানুষ তো! যেতে হবে, হয়ত ভয় পেয়েও তারা পালাতে পারে। ভাবিতেছি লাঠনটা তেজ করিয়া দিব কিনা, এমন সময় হঠাৎ পিছন হইতে কে একজন বজ্র হস্তে আমার গলা টিপিয়া ধরিল। লাঠনটা আচমকা হস্ত চ্যুত হইল বটে কিন্তু সৌভাগ্য যে সেটা ভাঙ্গে নাই বা নিবিয়া যায় নাই। আমিও প্রাণপণে তাহার হাত ছাড়াইবার জন্য তাহার সহিত ধস্তাধস্তি করিতে লাগিলাম। অবশেষে আমার আততায়ী আমাকে মাটিতে ফেলিয়া আমার বুকের উপরে হাঁটু দিতে গিয়া আমায় ছাড়িয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"ও হরি! তুমি!" আমি এই কথায় নিজের অবস্থা ভুলিয়া গিয়া পূর্ণ কৌতূহলে চোরের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। আমাকে দেখিয়া সে যেমন বিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিয়াছিল আমিও ঠিক তেমনি ভাবেই বলিয়া উঠিলাম "নীলরতন!"

হাঁ সে নীলরতনই বটে! এবং এতদূর অধঃপতন তার হওয়া সম্ভব না ভাবিলেও সে যে কোনখানে একটা সমাজ বিগর্হিত দুর্ব্বহ জীবন বহন করিতেছে আমারও এই রকমই একটা ধারণা ছিল। নীলরতন কটক কলেজে আমার সহিত কিছুদিন পড়িয়াছিল। সেই সময়েই তাহার সহিত আমার আলাপ হয়, একটু বন্ধুত্বও হইয়াছিল। তার পর দুজনের জীবনের গতি দুইদিকে বহিয়া গেল। পৈতৃক যথা সর্ব্বস্ব পান ভোজন এবং তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যাপারে ব্যয় করিয়া বড় লোকের ছেলে শীঘ্রই একদিন আমার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল এবং 'কাল দিব' বলিয়া কুড়িটি টাকা ধার লইয়া সেই যে সে সরিয়াছিল আজ সাত বৎসর পরে আবার এই সাক্ষাৎ!

"আমার বাড়ি বলে জানতে না বোধ হয়? না জেনে শুনেই এসেছিলে, নীলরতন?"

নীলরতন মাথা হেঁট করিয়া উত্তর করিল "ঈশ্বর জানেন মণি, তা জানলে কখনই আজ আমাকে এত বড় লজ্জায় ও পাপে লিপ্ত হতে হোতনা! হা ভগবান! মণি ভাই আমায় একটু জল দেবে? উঃ—"

এক মুহূর্ত্তেই সব ভুলিয়া গেলাম। স্ত্রী যে উপরের ঘরে শুয়ে অর্দ্ধমৃত হইতেছে সে কথাও মনে রহিল না। চোরের দিকে চাহিয়া বলিলাম "এসো।" বলিয়া তাহাকে অন্য একটা ঘরে লইয়া গিয়া আলোটা বাড়াইয়া দিয়া এক গ্লাস জল গড়াইয়া তাহার হাতে দিলাম। তাহার জল পান করা হইয়া গেলে নিজেও এক গ্লাস জল মুহূর্ত্তে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া একখানা চৌকিতে বসিয়া পড়িলাম এবং তাহাকে অন্য-খানাতে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "সঙ্গে আর কেউ আছে?" সে বিষণ্ণ লজ্জার মুখ হেঁট করিয়া বলিল, "আমার অতটা পাপিষ্ঠ ভেবো না মণি! কেউ না। এই আমার প্রথম অপরাধ, আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এই শেষ! উঃ প্রাণের ভয়ে শেষে তোমাকেই হত্যা করে ফেলছিলুম! ধিক্কার হয়ে গেছে জীবনে!"

একটু ভর্ৎসনার সঙ্গে বলিলাম "এই কি এখন তোমার জীবিকার উপায়! এর চেয়ে কি কোন রকম ভাল কাজ এত বড় জগতের

মধ্যে তুমি খুঁজে পেলেনা নীলরতন ? আমার কাছে আসনি কেন, আমি তোমায় কাজ দেখিয়ে দিতুম !"

নীলরতন কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তবে আমার সমুদয় দুঃখের কথা তোমায় বলি শোন মণি, শুনলে তখন তুমি আমার উপরে রাগ করতে পারবেনা বরং দয়া হবে। তুমি জানো ত মণি বড় লোকের ছেলে ছিলুম, বাবা মরতেই পাঁচটা বয়াটে বন্ধু জুটে আমার সর্ব্বনাশ করলে ! তারপর যখন সর্ব্বস্বান্ত হলুম তখন তারা আমায় ফেলে সরে দাঁড়ালো। চাকরী অনেকবার জুটেছিল, কিন্তু অভ্যাস নেই খাটতে পারিনে ; তাতে হাতের লেখা ভাল নয়, দুচার মাস কেউ রাখে না। তার উপর নানা রকম কঠিন কঠিন রোগে ধরেছে ! এই তো অবস্থা এর পর আবার মুমূর্ষু ব্রাহ্মণের অনুরোধ না ঠেলতে পেরে তরঙ্গিনীকে বিয়ে করতে হোল ! তখন আমার দশা কি রকম হয়ে দাঁড়াল ভেবে দেখো ! স্ত্রী চূড়ান্ত দুঃখের অবস্থাতেও কখনও মুখফুটে আমায় কিছু বলে না। খেটে খেটে না খেয়ে তার হাড়গুলি গোণা যাচ্ছে তবু কথাটী নেই ! তার ওপোরছেলেমেয়ে ! উঃ আমার যে কি কষ্ট মণি—"

হঠাৎ আমার হৃদয়ে করুণার উৎস উথলিয়া উঠিল, রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম "কটি ছেলেমেয়ে ?" "চারটি" বলিয়া হঠাৎ নীলরতন নেত্র মার্জ্জনা করিল। তাহার কণ্ঠের কণ্ঠ রুদ্ধবাষ্পে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছিল, পরিষ্কার করিয়া লইয়া আবার বলিতে লাগিল "দুটি ছেলে দুটি মেয়ে, ম্যালেরিয়ার জীর্ণ কঙ্কাল কখানা। খেতে পায়না মণি, দিনের পর দিন উপবাসে কেটে যায় তাদের ! এ কথা তুমি কল্পনা করতে পারো—তোমারও তো ছেলে আছে ?" আমি শিহরিয়া উঠিলাম। "আমার সন্তান সব না খেয়ে মুখ মুখে পতিত আর রাস্তার দুধারে দোকান ভরা খাবার ! ঘরে ঘরে সিন্দুক ভরা টাকা—সুখান্ত পুষ্ট ছেলেমেয়ে—মণি ভেবে দেখোদেখি এ কি প্রলোভন !" সে আমার মুখে তাহার আলা-পূর্ণ দুই চক্ষু স্থির করিল, তাহার মধ্য হইতে বুভুক্ষিত অগ্নি সহস্র ধারায় ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। "কথাটা ঠিক ! আমার অজিত, আমার নীহার ! না অসম্ভব !" উঠিয়া চোখের হাত বন্ধুর হাতের মতন করিয়াই ধরিলাম।

"নীলরতন ! তুমি বলেছ এই তোমার প্রথম চেষ্টা, এখনও তোমার হাত কলঙ্কিত হয়নি। তুমি তোমার স্ত্রীপুত্রের জন্য সাধু পথে উপার্জ্জন করবে ? বেশ ! আমি তোমায় আমার তহবিলের আফিসে কালই ঢুকিয়ে দেব। এখনই কুড়ি টাকা করে তুমি পেতে পারবে।" নীলরতন রুদ্ধবাক্ হইয়া নীরবে কৃতজ্ঞনেত্রে চাহিয়া দেখিল। বলিলাম "তবে আজ যাও—কাল আমি নিজেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাবো এখন, তুমি কোথায় থাক ?" "দীঘির পশ্চিম পাড়ে একটা খোলার ঘরে। আমি নিজেই আসবো, কি জানি যদি তুমি ভুলে যাও, দেরি হলে আমার বড় ছেলেটি মারা পড়বে ; তার ভয়ানক জ্বর কাল বিকেল থেকে খেতে পায়নি।" আমি পকেটটা খুঁজিলাম, ভাগ্য ক্রমে এক-খানা দশ টাকার নোট কোটের পকেটে ছিল এবং তাড়াতাড়িতে কাহিল না পড়িয়া

কোটটাই পরিয়া আসিয়াছি। তাহার হাতে গুঁজিয়া তাহার লজ্জ আপত্তি না শুনিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সেও আমার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে করিতে বিদায় লইল।

হাত ধরাধরি করিয়া দুজনে ঘর হইতে বাহির হইতেছি এমন সময়ে কে একজন ছুটিয়া পলাইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল "একি তুমি! কার সঙ্গে কথা কচ্ছ তবে?" বিস্ময়ে সে সেইখানেই যেন জমিয়া গেল। আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নীলরতন তাহাকে নমস্কার করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল "বৌদিদি অভাগা আপনাদের বড় কষ্ট দিয়েছে, মাপ কর্ব্বেন। বলিকে সব বলেছি তার কাছে আপনি জগতের একটি সবচেয়ে দুঃখের কাহিনী এক্ষুণি শুন্‌তে পাবেন এখন। নীলরতনের নাম শোনেন্ নি? আমি সেই দুর্ভাগা নীলরতন।"

চারু তেমনি আড়ষ্ট হইয়া চাহিয়া রহিল। আমি বহির্দ্বার পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিলাম। দ্বার খোলাই ছিল, হতভাগা চাকরটা বন্ধন করিতে ভুলিয়াছে। এ অবস্থায় কে এই মুক্ত দ্বার প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? আহা বেচারা। "দেখো ভাই ভুলে যেওনা যেন। তোমার উপরে দুটি জীবনের সমস্তটাই নির্ভর। আমার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই রাতটা স্মরণ থাকবে।" গভীর সহানুভূতি-পূর্ণ স্নেহে বন্ধুকে প্রথম জীবনের মতই সানন্দে আলিঙ্গন করিলাম, বলিলাম "কাল সকালেই তুমি আমায় দেখতে পাবে।"

ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম বারান্দার রেলিংএ ঠেস দিয়া চারু বসিয়া আছে, আমাকে দেখিয়া বলিল "আমার জন্মে এমন আশ্চর্য্য আমি কখনও হইনি!" "আমিও না" এই বলিয়া আমি তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদয় ঘটনা তাহার নিকটে বর্ণনা করিলাম।

কাহিনীর গোড়ারদিকটাতেই চারু একবার শিহরিয়া বাধা দিয়া উঠিয়াছিল "মাগো! কি ভয়ানক লোক? তোমায় পাঠিয়ে দিয়ে পর্য্যন্তই কেবলই আমার মনে হচ্ছিল, ছাই জিনিষের জন্যে তোমাকে কোথায় বিপদের মধ্যে পাঠালুম। তাই আর থাকতে না পেরে নিজেই এলুম।" তার পর সমস্তটা শুনিয়া সে হঠাৎ বেদনার সহিত কহিয়া উঠিল "আহাহা বেচারা! আহা তুমি যদি আমায় একটু বল্‌তে ছেলেগুলোর জন্য কিছু খাবার দিয়ে দিতুম। ঘরে অনেক সন্দেশ আর গজা রয়েছে।" আমি সপ্রেমে তাহাকে চুম্বন করিয়া কহিলাম "আমি তাকে একখানা দশ টাকার নোট দিয়েছি। চারু, চলো উপরে যাই এখনও বিস্তর রাত রয়েছে। যদিও ঘুম আর হচ্চে না"—চারু উঠিতে গিয়া হঠাৎ কি কথা স্মরণ করিয়া আবার বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ওর সঙ্গের লোকটা কেগো?"

"সঙ্গের লোক? না সঙ্গে কেউ ছিল না তো?"

স্ত্রী মাথা নাড়িয়া অবিশ্বাসের সঙ্গে বলিলেন "সেকি আমি স্বচক্ষে একটা লোককে বড় ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি!" হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা চট করিয়া দুজনকারই মনে আসিয়া উঠিল। চারু হ্যারিকেনটা তুলিয়া লইয়া কম্পাদে প্রথমেই বড় ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল। আমিও হতবুদ্ধির মত

তাহার অনুসরণ করিলাম। আলমারির দুইটা দরজাই খোলা, তাহার মধ্যকার সমস্ত রৌপ্য মায় তাহাদের গঠন সৌকুমার্য্য ঔজ্জ্বল্য নিশ্চিহ্নরূপে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

বলা বাহুল্য পরদিন দীঘির চতুষ্পার্শ্বের ত্রিসীমানার মধ্যেও নীলরতনের কোন অস্তিত্বই পাওয়া যায় নাই।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

হিজলীর প্রাচীন কীর্ত্তি ও দর্শনীয় স্থান সমূহ।

বাহিরী।

হিজলীর প্রাচীন কীর্ত্তি ও দর্শনীয় স্থান সমূহের উল্লেখ করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে বাহিরীর নাম উল্লেখযোগ্য। বাহিরীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। কথিত আছে মহাভারতীয় যুগে এখানেও মৎস্যাধিপতি বিরাট রাজার একটী গোগৃহ ছিল। সাধারণের বিশ্বাস এক্ষণে বাহিরীর চতুষ্কোণে "পাল টিকরী," "শাপ টিকরী," "ধন টিকরী" ও "গোধন টিকরী" নামে যে চারিটী জঙ্গলাবৃত সুরম্য মৃত্তিকাস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায় সে গুলা ঐ সকল গোগৃহের ধ্বংসাবশেষ। স্তূপ এক একটী উচ্চে প্রায় ৭০।৮০ ফুট এবং দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় ২০০।২৫০ ফুট হইবে।

সাধারণের বিশ্বাস যাহাই থাকুক, আমাদের কিন্তু ঐ গুলিকে বৌদ্ধ কীর্ত্তির নিদর্শন বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমান যুগের পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে রাজপুতানার মধ্যেই মৎস্যদেশের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিশেষতঃ উত্তরে রঙ্গপুর জেলার গাইবান্ধা মহকুমা হইতে দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের নানা স্থানেই কেন যে মৎস্যাধিপতি বিরাট রাজার বাড়ী ও গোগৃহাদির চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়া থাকে তাহার কারণ নির্ণয় করা সুকঠিন। অনুমান হয়, কালসহকারে বৌদ্ধধর্ম্ম লোপের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারগুলি স্থানে স্থানে যেরূপে হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরে পরিণত হইয়াছে, এই স্থানগুলিও সেই কারণেই এই সকল পৌরাণিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। আর যেখানে সেরূপ সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই সে সকল স্থান বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া হিন্দুদিগের পরিত্যাজ্য হইয়াই রহিয়াছে। উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অন্যের কথা দূরে থাক্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও যখন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যান তখন পথে যে সকল তীর্থ পাইয়াছিলেন তাহাই দেখিয়া ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু উদয় গিরি ও খণ্ডগিরির উপর উঠিয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রামাণিক গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় তাঁহার "উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "উদয় গিরি ও খণ্ড গিরি তখন পৌরাণিকদিগের প্রায়ই ত্যাজ্য ছিল। এখনও গিরিদ্বয় আমাদের তীর্থ নহে।"

মহাভারতীয় যুগে এ প্রদেশ তাম্রলিপ্ত

রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং তাম্রলিপ্তের রাজারাই এ দেশের উপর শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেন। তাম্রলিপ্তের রাজাগণও অতিশয় ক্ষমতাশালী ছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাম্রলিপ্তাধিপতি তাম্রধ্বজ-রাজার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ঘটনা সুপ্রসিদ্ধ। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে তাম্রলিপ্তের রাজাদিগের অধিকৃত ভূভাগের মধ্যে মৎস্য-দেশাধিপতির অধিকৃত কেবল যে একটী গোগৃহই অবস্থিত ছিল এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কারণ তাম্রলিপ্তাধিপতি বা মৎস্যদেশাধিপতির মধ্যে কেহই বোধ হয় সেরূপ হীনবল ছিলেন না যে একজন অন্যজনকে তাঁহার রাজ্যমধ্যে নির্ব্বিবাদে অধিকার স্থাপন করিতে দিবেন বা একজন অপর একজনের অধীনে নিরীহ প্রজার ন্যায় বাস করিতেও স্বীকৃত হইবেন। এই সকল কারণে বিরাট রাজার সহিত বাহিরীর যে কোন সম্বন্ধ ছিল তাহা মনে হয় না।

মেদিনীপুর সহরের নিকটবর্ত্তী "গোপ-গিরি" নামক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর যে স্থান বিরাট রাজার গোগৃহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে তাহারও কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। গোপগিরির মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠগুলি বিরাট রাজার গোগৃহ অপেক্ষা বৌদ্ধ "গুম্ফা"র কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। "গোপ" শব্দ "গুম্ফা" শব্দ হইতেই উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। উত্তর কালে পৌরাণিকদিগের হাতে পড়িয়া "গোপ শব্দ "গোতে আসিয়া "গোপগিরি"কে "গোগৃহ"তে পরিণত করিয়া থাকিবে।* এইরূপে যেখানেই বৌদ্ধদিগের কোনরূপ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে তাহারই সহিত একটা না একটা পৌরাণিক আখ্যান জুড়িয়া দিয়া বৌদ্ধচিহ্ন লোপ করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক সুবিখ্যাত হুয়েন-থ্ সঙ্গ তাম্রলিপ্ত এবং সমুদ্রোপকূলের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে দশটী বৌদ্ধ মঠ, একটী দুই শত ফুট উচ্চ অশোক স্তম্ভ এবং সহস্রাধিক বৌদ্ধ পুরোহিত দেখিয়া গিয়াছিলেন।—উক্ত সংখ্যক পুরোহিতের অন্যূন দশ সহস্র শিষ্য ছিল। এই অসংখ্য লোকবর্গের অবলম্বিত ধর্ম্ম ও তাঁহাদের কীর্ত্তিরাশি যে চিহ্নমাত্র না রাখিয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। বঙ্গদেশের বহুসংখ্যক নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্মপূজার ভিতরে বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও যেরূপ প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে বলিয়া পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন, সেইরূপ তাহাদের অসংখ্য কীর্ত্তিরাশিও এইরূপ এক একটী পৌরাণিক আখ্যায়ের অন্তরালে পড়িয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছে। তাহাদিগকে চিনিয়া লওয়া দুষ্কর।

বাহিরীর প্রাচীন কীর্ত্তিরাশির মধ্যে অধিকাংশই বৌদ্ধ কীর্ত্তির নিদর্শন। বাহিরী

* বৌদ্ধ যুগের গ্রন্থেও অনেক স্থলে "গিরি" শব্দ "গৃহ" অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। মানিক টাঁদের গানে ইহার ব্যবহার আছে। ডক্টর দীনেশ বাবুও এইরূপ অর্থই করিয়াছেন।—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য দ্বিতীয় সংস্করণ ৭৭ পৃঃ।

নামটীও বৌদ্ধ "বিহার" শব্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। বাহিরীতে একটী অতি প্রাচীন মঠ আছে—কতদিনের তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কে জানে ইহা সেই সকল কোন প্রাচীন বৌদ্ধ মঠের রক্তমাংস-হীন কঙ্কাল কিনা? মঠটীর চতুর্দ্দিকে সুউচ্চ প্রাচীর এবং মধ্যস্থলে সন্ন্যাসীদিগের বাসোপযোগী গৃহ ও দালানাদি আছে। স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম; মনোহর তপোবনের ন্যায় পরম রমণীয়। সেখানে উপস্থিত হইলে মনে স্বভাবতঃ একটী পবিত্র ভাবের উদয় হয়। ক্ষণও বসিয়া প্রকৃতির মনোমোহিনী শোভা অবলোকন করিলে মনোপ্রাণ ভক্তিরসে পরিপ্লুত হয়।

মঠটীতে এখন রামচন্দ্র প্রভৃতির মূর্ত্তি পূজিত হইতেছে। কিন্তু চিরদিন হয়ত সেরূপ হইত না। একদিন সেখানে হয়ত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিই বিদ্যমান ছিল। শ্রমণগণ তাঁহার ধ্যানেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—কাটাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু কালের কঠোর হস্ত আজ সেখানে অনেক পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে। এক্ষণে সেখানে সেই মহাযোগী রাজপুত্রের লোকমধুর চরিত্রকাহিনীর বা তাঁহার পবিত্র নিবৃত্তি ও আত্মসংযমের কোন আলোচনা দূরে থাক্ বাহিরীর ত্রিসীমার মধ্যে তাঁহার কোন মূর্ত্তিই দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে বর্ত্তমান কাঁথির সবডিভিসন্যাল আফিসের সম্মুখে যে প্রস্তর মূর্ত্তীটী স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় উহা বাহিরীর নিকটবর্ত্তী কোন জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন সল্ট এজেন্ট কর্ত্তৃক ঐ মাটী নির্ম্মিত হয় তখন মূর্ত্তীটী বাহিরী হইতে আনীত হইয়া ঐ স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। মূর্ত্তীটীর নাসিকা এবং চক্ষু দুটী খানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে; মুখের চিবুকাংশের কিয়দংশও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মূর্ত্তীটী দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ ফুট। কেহ কেহ উহাকে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের মুখের সহিত ইহার মুখের বিশেষ সাদৃশ্য আছে বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। সেই কারণে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতামতের জন্য আমরা এই সঙ্গে এই মূর্ত্তীটীরও একখানি ছবি দিলাম। তাঁহারা যদি দয়া করিয়া এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করেন তাহা হইলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব। মূর্ত্তিটী সম্বন্ধে তাঁহারা যদি আরও কিছু জানিবার ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আমাদিগকে লিখিলে আমরা আহ্লাদের সহিত তাহা জানাইব।

বাহিরীতে একটী পুরাতন মন্দিরও আছে। তাহার কিয়দংশ ইষ্টক ও কিয়দংশ প্রস্তর নির্ম্মিত। গঠন প্রণালী উড়িষ্যাঞ্চলের মন্দিরাদির ন্যায় এবং অনেকাংশে পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের অনুরূপ। মন্দিরটীর প্রবেশদ্বারের সম্মুখে যে খোদিত লিপিটী রহিয়াছে তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রস্তর ফলকটীতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী রহিয়াছে।

শকাব্দে রস-ভূক্ত-বাণ-বরণী-যানে তৃতীয়া
বৈশে যে বৃষবাসরে মুনিথিতে পক্ষে শুক্লাদৌসিতে।
শ্রীকৃষ্ণে সবাবরায় গুরবে তদ্দেবতামাং মুদে
মন্ত্রং গ্রাম বরোহিতঃ প্রতিদিবং তদ্দেউল বাড়া
খ্যাকং।

(১৫০৬ শকাব্দার বৈশাখ মাসের ৭ই উক্ত গুরু দেবরাজকে কেউনাড় নামক গ্রাম তাম্রিখে বুধবার শুক্ল-পক্ষের দ্বাদশীতিথিতে দান করা হইয়াছিল।)

শ্রীযুক্ত গদাধর নামক গুরুর হস্তে এই মন্দির এই প্রস্তরফলকখানি বাহীত মন্দিরের সেবা অর্পণ করিয়া দেবতাগণকে সমর্পণ করা অন্যান্য বিবরণে ও মন্দিরের সম্মুখস্থ দ্বারের হয় এবং তাঁহাদের প্রীত কামনা করিয়া। উপর অংশে দুই পংক্তি খোদিত লিপি আছে।

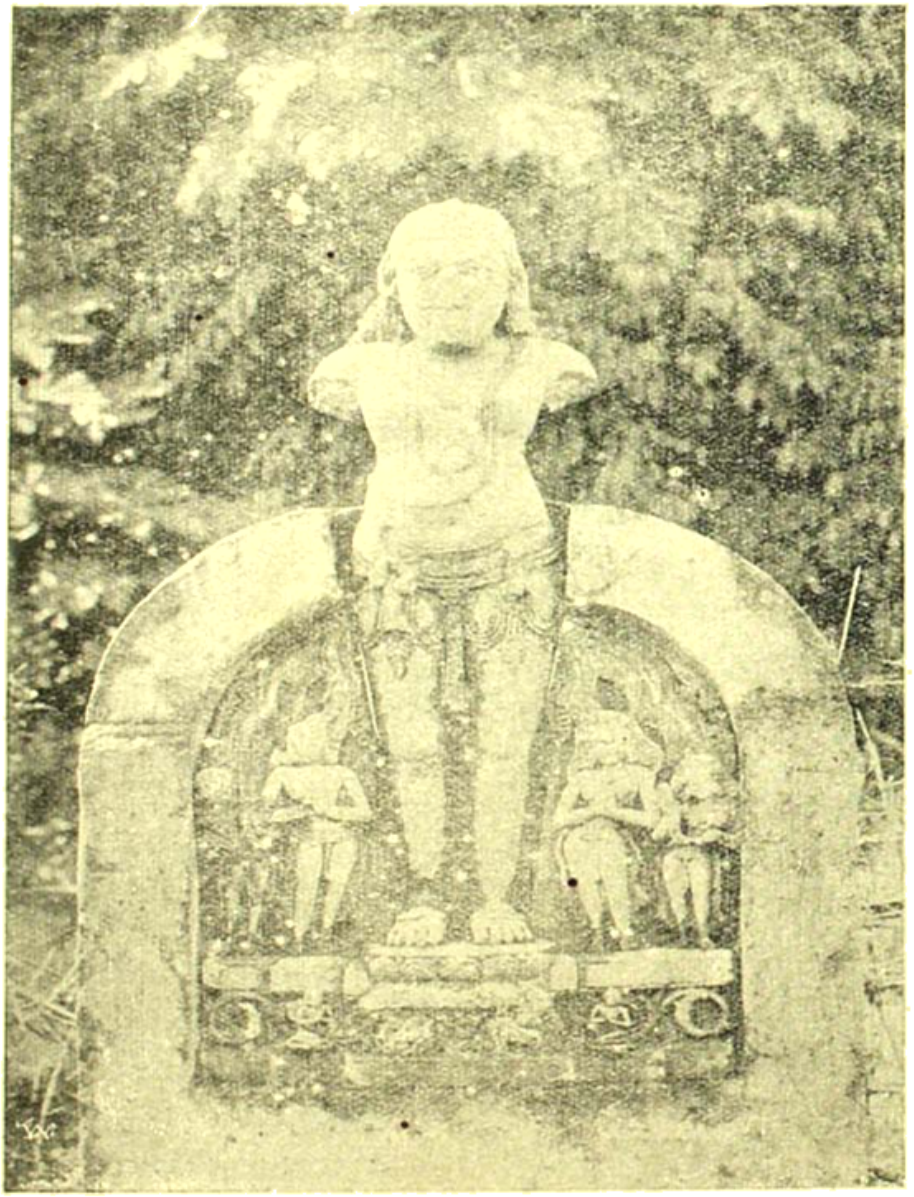

উহার দ্বারা জানা যায় যে বাঙ্গিবাসের কুলে শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ নামের পুত্র বিভীষণ নামে নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া সেই স্থানে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা

শ্রীযুক্ত অর্জ্জুন মিশ্র নামক আচার্য্য পৌত্র ভগবান নামক কোন ব্যক্তির পুত্র শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ নামক এক ব্যক্তি এবং উক্ত আচার্য্য-চূড়ামণির চন্দ্রধর নামক এক পুত্র, ইহারা উৎসবেই উক্ত

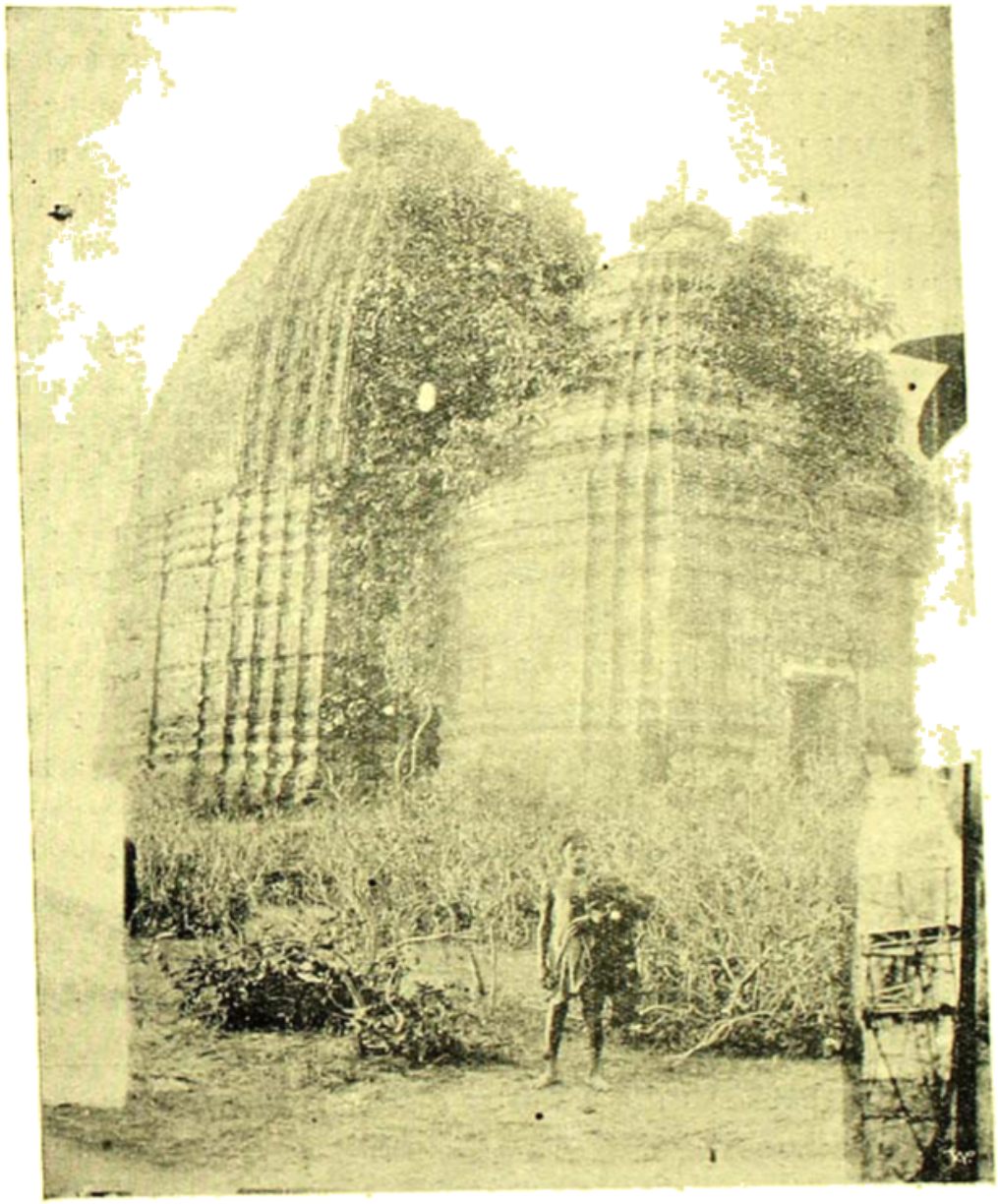

প্রাসাদের প্রতিষ্ঠাবিধি যথাবিধানে সম্পন্ন করিয়া পরলোক গমন করেন।*

মন্দিরটীতে এক্ষণে জগন্নাথ, বলরাম বা সুভদ্রার কোন মূর্ত্তিই নাই। তাঁহারা বহু দিন হইল স্থানান্তরিত হইয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন তাহারও কোন নিদর্শন নাই। এতদিন মন্দিরটী ভিতর ও বাহির পার্শ্বের চারিদিকে নিবিড় জঙ্গলে আবৃত থাকিয়া নানা প্রকার হিংস্রজন্তুর আবাসস্থলেই ব্যবহৃত হইতেছিল, সম্প্রতি এক ব্যক্তি দেবীর স্বপ্নাদেশ হইয়াছে বলিয়া মন্দিরটীর জঙ্গলাদি পরিষ্কার করতঃ তথায় এক কালীমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছেন।

কাশীবাসের বংশে এক্ষণে কেহই বর্ত্তমান নাই। বাহিরীর মধ্যে একটী স্থান অদ্যাপি "বিতীষণের ভিটা" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই বিতীষণ দাস ভিতলীর নবাব আলখাঁ মসন্দরীর দেওয়ান ভীমসেনের পিতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ভীমসেন কোন পারিবারিক দুর্ঘটনায় মনঃকষ্টে সপরিবারে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করায় তাঁহার বংশের চিহ্নমাত্র লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভীমসেন যে পুষ্করিণীতে জলমগ্ন হইয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি ভীমসাগর নামে পরিচিত।

বাহিরীতে ভীমসাগর ব্যতীত হেমসাগর, কৃষ্ণসাগর, লোই (লোহিত) সাগর প্রভৃতি নামে আরও অনেকগুলি বৃহৎ সরোবর বিশাল বক্ষ বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছে। এই সকল পুষ্করিণী যে কতদিন পূর্ব্বে কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে জানিবার কোন উপায় নাই। তবে ইহাদের অবস্থা দেখিলে ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে অন্যূন ২।৩ শত বৎসর পূর্ব্বে এগুলি খাত হইয়াছিল এবং হিন্দু কর্ত্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কারণ মুসলমানদিগের হইলে পুষ্করিণীগুলি পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা হইত। পূর্ব্বে এদেশে এইরূপ জলাশয়াদি খনন করা জীবনের শ্রেষ্ঠ সৎকার্য্য বলিয়া লোকে ধর্ম্ম বিশ্বাসে এ বিষয়ে বিপুল অর্থ ব্যয় করিত। কিন্তু বর্ত্তমানকালে সেই ধর্ম্ম বিশ্বাস ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া পড়াতে, এক্ষণে সংস্কারাভাবে ঐ সকল সরোবর ক্রমশঃই অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িতেছে। ২১টীর অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। শীঘ্রই উহা দিগকে শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইতে হইবে।

বাহিরী গ্রামে এক্ষণে একটীও কূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পুষ্করিণী আদি খনন করিতে গেলে ৭।৮ ফুট মাটীর নীচে প্রায়ই এক একটী কূপ বাহির হইতে দেখা যায়। কূপগুলি সাধারণতঃ ১৩।১৪ ইঞ্চি লম্বা, ৭ ইঞ্চি চওড়া ও ৪ই ইঞ্চি পুরু অর্দ্ধ বৃত্তাকার ইষ্টকখণ্ডের দ্বারা নির্ম্মিত দেখা যায়। বাহিরীর ভূগর্ভে এবং ভূ-পৃষ্ঠেও স্থানে স্থানে এখনও যথেষ্ট প্রাচীন ইষ্টক

---

* (১) কাশীবাস কুলে বিভীষণ ইতি শ্রীসম্রাজ্ঞাজ্ঞয়া; শ্রীভাগীরথি তুরুষ্কের দক্ষে প্রাসাদ মুচ্চৈঃরিদম্। গোপাল প্রতিমাযুতে সমাসনাদ্বৎ সাস্তঃ প্রতিষ্ঠাং বিধৈঃ; রামাদেব ভক্তত্বয়া সহ কপদ্মাখ্য যাযাসীদপি। (২) শ্লোকঃ শ্রীযবনীভূতো তদবধঃ সুরুষিজন্মাত্মনীঃ; শ্রীমান্ধর্জ্জন ভিন্ন ইতাভিহিত আচার্য্য চূড়ামণেঃ। পুত্রস্তস্যবরঃ কবীন্দ্র ইতি যদ্যাসিং প্রতিষ্ঠাবিধিং, প্রাসাদেক বিভীষণস্ত বিবিধা কৃত্যা বিধায়ব্যধাত্ত।

ও প্রস্তরাদি দেখিতে পাওয়া যায়। যে মৃত্তিকা স্তরে ওই সমস্ত প্রাচীন গৃহ বা মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, কাল সহকারে তাহার উপর নূতন মৃত্তিকাস্তর সঞ্চিত হইয়া প্রায় পাঁচ ফুট উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরীতে "ধন টিকরী" নামক যে একটি স্তূপ আছে বলিয়া আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি; প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বকালে সেই স্থানে সিরাট রাজার কোষাগার ছিল। প্রমাণ স্বরূপ কথিত হইয়া থাকে যে অদ্যাপি লোকে কোন কোন সময়ে উক্ত স্থানের মৃত্তিকাভ্যন্তরে অর্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে যাহা পায়, তাহা অতি সংগোপনে আত্মসাৎ করে। শুনা যায় পূর্ব্বকালে বাহিরীর চতুর্দ্দিকে একটী পরিখা ছিল এবং গ্রামে প্রবেশ করিবার একটী মাত্র দ্বার ছিল।

বাহিরীতে একটী অতি প্রাচীন তেঁতুল বৃক্ষ আছে; এরূপ বড় বৃক্ষ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। বৃক্ষটী সম্বন্ধে ওই অঞ্চলে নানাপ্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। উহা ঐ অঞ্চলে "জাহাজ বাঁধা তেঁতুল গাছ" নামে পরিচিত। নৌকাদি দড়ী বা চেনের দ্বারা কোন বৃক্ষাদিতে বাঁধিয়া রাখিলে ক্রমাগত দড়ীর ঘর্ষণে বৃক্ষাদির গাত্রে যেরূপ দাগ পড়িয়া যায় সেই বৃক্ষটীর গাত্রেও সেই রূপ দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ কিম্বদন্তী, প্রাচীন কালে এখান হইতে একটী নদী প্রবাহিত হইয়া বরাবর বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সেই সময় যে সকল বড় বড় নৌকা ও 'ছালতি' আদি সরল ব্যবসায় জন্য এ প্রদেশে আসিত তাহা ঐ তেঁতুল গাছেই বাঁধা হইত। এক্ষণে ঐ স্থান দিয়া কোন নদী প্রবাহিত দেখা দূরের কথা উহার ত্রিসীমার মধ্যে কোন ক্ষুদ্র খালের অস্তিত্বও দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে বাহিরীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের অবস্থা পর্য্যালোচন করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে এক সময় এই স্থান কোন নদী তীরেতেই অবস্থিত ছিল। বাহিরীর নিকটবর্ত্তী লাউদা, কুমিরদা, আপরদা, অমরদা, মাহিসদা প্রভৃতি 'দ' অন্তর্যুক্ত গ্রাম গুলির দা শব্দ "দহ" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবতঃ ঐ নদীটী ঐ সকল স্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া দহগড়া নামক গ্রামের নিকট বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই কারণেই ওই স্থান দহগড়া নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমান হলদিপুর নদী যেখানে বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে তাহার অনতিদূরেই এই দহগড়া গ্রাম অবস্থিত।

বাহিরীতে এক্ষণে একটী থানা একটী পোষ্টাপিস ও একটী মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় আছে। কাঁলি মাকুমার সদর ষ্টেশন কাঁথি সদর হইতে বাহিরী অন্যূন আট মাইল উত্তরে অবস্থিত। পূর্ব্বে বাহিরীতে একটী আউট পোষ্ট ছিল এবং উহা কাঁথি থানারই অন্তর্গত ছিল; মাত্র ৫।৭ বৎসর হইল বাহিরীকে একটী পৃথক থানার পরিণত করা হইয়াছে। বিগত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আদম সুমারীতে বাহিরীর লোকসংখ্যা ২৪, ৪৪৩ জন ধার্য্য হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু।

সহধর্ম্মিণী

আমরা নারীজাতির সহিত পুরুষজাতির তুলনা করিয়া দেখিলে এইটাই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করি যে, নারীজাতি সাধারণতঃ হৃদয়শক্তিতে এবং পুরুষজাতি বুদ্ধিশক্তিতে অধিকতর পরিমাণে শক্তিমান। সংসারে এই উভয় শক্তিরই বিশেষ প্রয়োজন।

মানুষের জীবন সংগ্রামের জীবন, আমাদিগকে আজীবন কেবল সংগ্রাম করিয়াই কাটাইতে হয়। বুদ্ধি এই জীবন-সংগ্রামের কেবল উপায় বলিয়াই দেয়, কিন্তু সংগ্রামে শক্তি ও সাহসের তুগুযান করিতে হৃদয় ভিন্ন আর কাহারও শক্তি নাই। তাই মানুষের পক্ষে এই উভয়-শক্তির সম্মিলন-সাধন অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। আমাদের যে দাম্পত্যজীবনবন্ধন, তাহার মূলে উক্ত দুই শক্তির মিলন-সাধনের চেষ্টা ব্যতীত, আর কিছুই নাই। সুতরাং মানুষের দাম্পত্যজীবন তখনই সার্থক হয়, যখন দম্পতির জীবনে উক্ত উভয় শক্তি মিলিত বা সামঞ্জস্যীকৃত হয়।

কিন্তু ইহাকে এইরূপে সার্থক করিতে গেলে, স্ত্রীর পাতিব্রত্য এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর গভীর প্রেম থাকার একান্ত প্রয়োজন। নতুবা এই অপেক্ষাকৃত পরস্পরবিরোধী চিত্তবৃত্তিসমূহের মিলন-সাধনের চেষ্টা কেবল ব্যর্থতার মধ্যেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়। ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ দাম্পত্য-জীবনের এই সূক্ষ্মতত্ত্বটী বিশেষরূপেই বুঝিয়া ছিলেন; প্রাচীন আর্য্য সাহিত্যোদ্যানের দিকে সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি করিলে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু এদেশে এমন লোকও অনেক আছেন যে তাঁহারা এই কথাটার বিপরীত কথাই বলিয়া থাকেন; তাঁহারা বলেন—

"প্রাচীন হিন্দু সমাজকর্ত্তৃগণ দাম্পত্য-জীবনের মাধুর্য্য ও দার্ঢ্য যে বিশেষ গভীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যায় না। বরং তখনকার সামাজিক ইতিহাস এবং শাস্ত্রের বিধিব্যবস্থাদি পাঠ করিয়া দেখিলে এইটাই মনে হয় যে, মানবচরিত্রের স্বাভাবিক গতি ও বেদনা অনেক সময়েই তাঁহারা বুঝিতেন না। তাহা যদি বুঝিতেন, তবে শাস্ত্রে স্ত্রীলোকদের পক্ষে স্বামীর প্রতি সকল অবস্থাতেই একনিষ্ঠ প্রেমের ব্যবস্থা দিয়া পুরুষজাতিকে ইচ্ছানুসারে বা সামান্য কারণে বিবাহ করিবার অধিকার দিতেন না। শাস্ত্রে দেখিতে পাই, স্বামীর মৃত্যু হইলেও তাঁহার যুবতী স্ত্রী যদি মনে মনেও অন্য পুরুষ কামনা করেন, তবে সেই আর্য্য স্ত্রীর পক্ষে নরকভোগ অনিবার্য্য। আর পুরুষ—তিনি যদি পত্নীসত্ত্বেও অন্য পত্নী গ্রহণ করেন, তবুও তাঁহার স্বর্গ গমনের কিছুমাত্র বিঘ্ন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই।"

ইহা মানুষের হৃদয়শক্তি ও বুদ্ধিশক্তি মিলনের বা দম্পতীজীবন গঠনের অনুকূল নহে। হিন্দু স্ত্রীর উপর হিন্দু স্বামীর যে প্রেম, তাহা সাধারণতঃ দয়ামাত্র। হিন্দু স্ত্রীও নামে মাত্র স্বামীর সহধর্ম্মিণী, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি স্বামীর দাসী। তাঁহার পাতিব্রত্য কেবল অপরিবর্ত্তনীয় চির দাসীত্ব

ছিল অন্য কিছুই নহে। হিন্দুর প্রকৃতি নারীজাতির এই দাসীত্বের এত অনুকূল যে, যে নারী যখন দাসীত্বে অধিষ্ঠিতা হইয়া উঠিয়াছেন তখনই তাঁহার প্রশংসা হিন্দুর সাহিত্য ইতিহাসে আর ধরে নাই। হিন্দু কবির লেখনীও এই দাসীত্বের আদর্শ-চিত্র অঙ্কন করিবার চেষ্টা চিরকাল করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। সুতরাং দাসীত্বের মধ্যে নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ চরিতার্থতা না থাকিলেও ইহার উপর একটা লোভ এবং দাসীত্ব সাধনের একটা প্রবল চেষ্টা, সাধারণ হিন্দু রমণীর একেবারে প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে স্বামীর উন্নত ধর্ম্মজীবনের সঙ্গিনী হইবার এবং তাঁহার শ্রদ্ধা প্রীতি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা হইতে তাঁহারা বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। কাজেই পুরুষ জাতি শক্তিহীন হইয়া আছে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কে লইয়াই সমাজ শরীরের পূর্ণাঙ্গ, এক অঙ্গ দুর্ব্বল ও ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিলে অন্য অঙ্গ স্বাস্থ্য-সম্পন্ন থাকে না।" ইত্যাদি।

এখন আমার বক্তব্য এই যে, এই অপরিণামদর্শিতা ও ভ্রান্তির জন্য প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ দায়ী নহেন। তাঁহাদের কালে হিন্দুনারীর পাতিব্রত্য দাসীত্বমাত্র ছিল না। তত্র দ্রৌপদী, সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি আদর্শ রমণীগণ পুরুষের দাসী মাত্রই ছিলেন না। যাঁহারা সংসারে এবং ক্ষেত্রে গৃহে এবং অরণ্যে, গার্হস্থ্য জীবনে এবং সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে স্বামীর চিরসঙ্গিনী হইয়া তাঁহাদের বাহুতে শক্তি, মনে সাহস এবং হৃদয়ে বল ও বিবেকবুদ্ধি যোগাইতেন তাঁহাদের সকল শক্তিই যে, স্বামীর প্রেম সাধনের মধ্যে পর্য্যবসিত হইয়া যাইত, তাহা কদাপি মনে করা যাইতে পারে না। বাস্তবিক তাঁহাদের শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চরিতার্থতা ছিল স্বামীর প্রেম সাধনে। পতির ঘরই তাঁহাদের এক মাত্র উচ্চ লক্ষ্য ছিল।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগ হইতে পুরুষকর্ত্তৃক নারীর অধিকার—নারীর সম্মান লোপ হইতে আরম্ভ হইয়া বর্ত্তমান যুগে তাহা প্রকৃতপক্ষেই দাসীত্বে পরিণত হইয়াছে। আধুনিক যুগে বহুসংখ্যক বাঙ্গালা উপন্যাস ও নাটকাদির চিত্রে স্বামীর এক মাত্র প্রেম সাধনের চেষ্টাতেই সতীত্বের চরম বিকাশ দেখিতে পাই। এই সকল অপূর্ব্ব কাব্যের অপূর্ব্ব চিত্রকর শিল্পীরা জগতে প্রকাশ করিতে চান যে, কেবলমাত্র স্বামীর প্রেম সাধনের চেষ্টাতেই হিন্দু নারীর সতীধর্ম্মের চরম পরিচয়। ইঁহারা এই কথাটাই লোককে বুঝাইতে উদ্যত যে, স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য তাঁহার সুখের জন্য—তা সে সুখ যতই আপাত মনোরম যতই ভ্রমাত্মক হউক না কেন—যে নারী আত্মবলিদানে আত্মসুখবিসর্জ্জন করিতে পারিল, সেই নারীই সতীকুলের বরণীয়া। এই আদর্শ নিরবচ্ছিন্ন দাসীত্বের আদর্শ। কিন্তু এখন কথা হইতেছে এই যে, এই আদর্শ যদি আর্য্যনারীর বা আর্য্য সাহিত্যের আদর্শ না হয়, তবে এ আদর্শ কোথা হইতে? ইহাতে প্রতীচ্য জগতের আদর্শ নয়।

ইহার উত্তরে এই বলিতে পারা যায় যে,

এই আদর্শ প্রচার জগতেরই বিকৃত আদর্শ। এ কথা অর্থহীন নহে যে, আর্য্য সভ্যতার বিজয়-বৈজয়ন্তী একদিন সমগ্র পৃথিবীর শিরোদেশে উড্ডীয়মান হইয়া তাহার অখণ্ড প্রতাপের অতুল মহিমা ঘোষণা করিয়াছিল। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে পৃথিবীর গুরুতর আসন তখন ভারতেরই একচ্ছত্র হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের তপঃপরায়ণ পুরাকালে আর্য্য ঋষির অপূর্ব্ব যোগশক্তি হইতে যে অশেষ প্রতিভা রাশি বিকীর্ণ হইত, এবং ক্ষত্রিয় রাজার বাহুবল হইতে যে অভাবনীয় ক্ষাত্রতেজ নিঃসৃত হইত সেই একীভূত বিরাট শক্তি জগৎকে একদিন বিস্ময়স্তম্ভিত করিয়াছিল। তখনকার সেই ভারতবর্ষ হইতে সেই জ্ঞান ধর্ম্মের, ভক্তিপ্রীতির সাধনাক্ষেত্র হইতে, নারী শক্তিকে নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টাও করা হয় নাই। তাঁহাদের শক্তিবিকাশের সমস্ত ক্ষেত্রকে তখন উন্মুক্ত করিয়াই রাখা হইয়াছিল। এইজন্যই আর্য্য নারী তখন যে, শুধু আর্য্যের গৃহক্ষেত্রকেই অতুল মহিমায় উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র বা ধর্ম্মক্ষেত্রকেও অপূর্ব্ব প্রভাসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন!

কিন্তু হিন্দু-সভ্যতার এই গৌরব-রশ্মি বহুদিন ধরিয়া সমভাবে প্রভা বিকিরণ করিতে পারে নাই। নানা ম্লেচ্ছ-জাতির সংস্পর্শে এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় সে মহারশ্মি ক্রমে ক্রমে ম্লানপ্রভ হইয়া আসিয়াছিল। ক্রমে আলস্য, অবসাদ ও বিলাসিতার আধিপত্য ক্ষীণবীর্য্য হইয়া পড়িলেন। তখন উন্নতি অপেক্ষা লোকে শান্তি ও সম্ভোষেরই অধিক প্রার্থী হইয়া উঠিল। সমাজের মুকুটমণিস্বরূপ ব্রাহ্মণগণ ব্যবসাদারভাবে স্বার্থপর হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের আত্মদৃষ্টি পূর্ব্বের ন্যায় আর তীব্র রহিল না। আত্মপ্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহারা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মহৎ অংশের আশ্রয় হইতে সাধারণ জনদিগকে ধীরে ধীরে অপসারিত করিয়া ফেলিলেন। শাস্ত্রানুশাসনের নানাবিধ জটিল বন্ধনের দ্বারা জনসাধারণকে নিজেদের চরণতলে এমনভাবে বাঁধিয়া ফেলিলেন যে আপনাদের গণ্ডীর বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার সুযোগ ও প্রবৃত্তিমাত্রও তাঁহাদের রহিল না।

এই সময় হইতে ভারতের প্রকৃত অবনতির সূত্রপাত! ভারতের আর্য্য নারীও এই সময় হইতে তাঁহাদের মর্য্যাদার আসন হইতে বিচ্যুত হইলেন। বেদাদি উন্নত ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহাদের অধিকার সংকুচিত হইল এবং উন্নত ধর্ম্মজীবনের যে একটি সূক্ষ্ম যোগবন্ধন ছিল, তাহা উপেক্ষিত হইয়া স্বামীর সেবাধর্ম্মই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল।

নারী হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি ও বেদনাকে উপেক্ষা করিয়া, পুরুষগণ ব্যবস্থা দিলেন যে, স্বামী যেমন চরিত্রেরই হউন, স্ত্রী তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিবে। তিনি পানাসক্ত ব্যভিচারী হউন, নরহত্যা দস্যু হউন, স্ত্রীকে তিনি যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা দিন, প্রহারের উপর প্রহার করুন, তবুও স্ত্রী যদি তাঁহাকে দেবতা ভিন্ন অন্য কিছু ভাবে, মনে মনেও যদি তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য নিন্দা করে তবে পরকালে অনন্ত নরক ভোগ ভিন্ন তাহার আর উপায়ান্তর নাই।

নারীজাতিকে এই শোচনীয় দাসীত্বধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিবার জন্য কেবলমাত্র স্বর্গের লোভ ও নরকের ভয় দেখাইয়াই তাঁহারা লেখনী সংযত করেন নাই। এই ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য পুরাণাদি শাস্ত্রে তাঁহারা বহুসংখ্যক কাল্পনিক পৌরাণিক আখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং বহুস্থলে প্রাচীন সাহিত্যেতিহাসের সতীধর্ম্মের বহু আদর্শ চিত্রের উপর এই নবীন আদর্শের ছাঁচ নির্ম্মাণ করিয়া সে সকলকে একেবারে বিকৃত করিয়া গিয়াছেন। ইহার উপর ভারতে মুসলমান অধিকারের পর এই সকল বিকৃত আদর্শের অনুকরণে যে সকল আখ্যান সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা আরও বিকৃত।

আধুনিক বহুসংখ্যক বাঙ্গালা নাটক ও উপন্যাসে হিন্দুনারীর আদর্শরূপে সৃষ্ট যে সকল নারী চরিত্রের চিত্র আমরা দেখিতে পাই, এবং বৈদ্যুতিক আলোকমালা মণ্ডিত, রঙ্গমঞ্চের বিচিত্র দৃশ্যপটের মধ্যে, যে সকল চিত্রের অভিনয় দর্শনে, অসাধারণী রূপবতী যুবক বৃন্দ বিস্ময়ে স্তম্ভিত এবং পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠেন, সে সকল চিত্র, পরম্পরাক্রমে উপরি উক্ত পৌরাণিক আখ্যানের ও তদনুকারী অন্যান্য আখ্যান সাহিত্যের আদর্শ চিত্রের অনুকরণেই সৃষ্ট।

বলা বাহুল্য সাহিত্যে নারীজাতির এই একান্ত দাসত্ব মাত্র বর্জ্জিত আদর্শ, সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করে না; এবং সমাজেরও তাহাতে মঙ্গল হয় না। নিজে ভক্তির যোগ্য না হইয়া স্ত্রীর কাছে ভক্তি পাইবার যে চেষ্টা, সাহিত্যে এই প্রকারের আদর্শ-চিত্র অঙ্কন সামাজিক কৌশল মাত্র। কিন্তু আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত ইহাতে, আমাদের লাভ কি! ইহাতে যেমন নিজেদের ক্ষুদ্রতার পরিচয় দেওয়া হয়, তেমনি নারীগণকেও ক্ষুদ্র করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়।

ফলতঃ নারীর নিকট হইতে ভক্তি যদি আমরা পাইতে চাই তবে সর্ব্বাগ্রে সেই ভক্তির যোগ্য আমাদিগকে হইতে হইবে। এবং নারীও যাহাতে মহত্ত্ব হেনে তজ্জন্য তাহাদের তদুপযোগী চিত্ত বিকাশের উপায় করিতে হইবে। নারীকে দাসী মনে করিয়া কেবল মাত্র তাহাকে দাসীর কর্ত্তব্য শিক্ষা দিলে চলিবে না। কারণ বস্তুতঃ নারী দাসী নহে।

নারী দাসী নহে, কিন্তু এ কথায় এমন বুঝাইতেছে না যে নারী পুরুষের সেবাধর্ম্ম ত্যাগ করিবে। সেবা আমরা নারীর নিকট হইতেই চাই। কারণ সেবার স্নেহ ও তৃপ্তি-দান করিতে নারী ভিন্ন আর কাহারও শক্তি নাই। কিন্তু তাহার সমস্ত শক্তিই যদি এই সেবাধর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়া যায়, তবে আমরা সংসারের কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইব কাহার অবলম্বনে। সুতরাং আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রী যেমন দাসীর ন্যায় সেবা করিবেন, সেইরূপ আমাদের সামাজিক জীবনেও তিনি সখার ন্যায়, বন্ধুর ন্যায়, উপদেষ্টার ন্যায়, আমাদিগকে কর্ত্তব্যের পথে অটল রাখিতে চেষ্টা করিবেন। এ বিশ্ব সঙ্কুল সংসারে মানুষ সকল সময়ে লক্ষ্যের পথ ঠিক রাখিয়া চলিতে পারে না। এইরূপে পুরুষের লক্ষ্যচ্যুতির সম্ভাবনা যখন প্রবল হইবে, স্ত্রী তখন আত্ম-শক্তির প্রভাবে তাঁহাকে আত্মজ্ঞান ও সংযমের মধ্যে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিবেন। ইহাই সহধর্ম্মিণীর কাজ। সুতরাং স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী হইতে হইবে।

কিন্তু সহধর্ম্মিণী হইতে গেলে নারীকে সর্ব্বদা স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে সচেতন হইয়া থাকিতে হইবে। আত্মজ্ঞান ও আত্মশক্তিকে স্বতন্ত্র ভাবে সর্ব্বদা জাগ্রৎ করিয়া না রাখিলে তাঁহার চলিবে না। যে স্ত্রী স্বামীর বিশ্বাসের মধ্যে নিজের বিশ্বাস এবং স্বামীর জ্ঞানের মধ্যে নিজের জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়াছেন অথবা যাঁহার স্বতন্ত্র জ্ঞান ও বিশ্বাসের বিকাশই হয় নাই, তিনি স্বামীর প্রেম সাধন করিতে পারেন কিন্তু স্বামীর অধঃপতনের প্রাক্কালে তাঁহার বিবেকবুদ্ধিতে শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন না, তাঁহার প্রেম সাধনের পথ তিনি দেখিতেই পান না। এরূপ পত্নী অন্ধভক্তিমতী বা সঙ্কীর্ণগণ্ডীর প্রেমিকা হইতে পারেন কিন্তু উচ্চশ্রেণীর সহধর্ম্মিণী হইতে পারেন না। যিনি সহধর্ম্মিণী হইবেন, স্বামীর উপর তাঁহার গভীর প্রেম থাকিবে বটে কিন্তু সেই প্রেমের মধ্যে তাঁহার অন্য সকল বৃত্তির সমাধি হইয়া যাইবে না।

যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে আদর্শ পত্নীচিত্র অঙ্কন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই যে, এই সহধর্ম্মিণী আঁকিবার চেষ্টা করেন নাই, এমন কথা আমি বলিতে পারি না। তবে তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস লেখক হইতে সুবিখ্যাত বহুসংখ্যক উপন্যাস লেখক পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই দাসীর আদর্শ আঁকিবারই চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে যে কেবল এই লেখকগণেরই দোষ তাহা নহে, ইহাতে সাধারণ পাঠক সমাজেরও দোষের সীমা নাই। তাঁহাদের মানব চরিত্রজ্ঞান ও কাব্যরসজ্ঞতার এমন নিদারুণ অধঃপতন ঘটিলে এই সকল উপন্যাসের এমন প্রচারবাহুল্য কদাপি ঘটিতে পারিত না।

কিন্তু উন্নত সাহিত্যের দ্বারাও আমরা ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু লাভবান হইতে পারিব না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার উচ্চশিক্ষা হইতে নারীজাতিকে বঞ্চিত করিয়া রাখিব। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা এবং সেই সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া মানব জাতির একটা চিরন্তন আদর্শকে আকার দেওয়াই যখন উন্নত সাহিত্যের একমাত্র কাজ, তখন এটা বোধ হয় কাহাকেও কষ্ট পাইয়া বুঝিতে হইবে না যে, সাহিত্যের সৃষ্টি তখনই সার্থক হয় যখন পুরুষ ও নারী উভয়েই তাহার আদর্শের অনুসরণে এবং তাহার রসে তৃপ্তি ও শক্তিলাভ করে।

সুতরাং উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য প্রচারকে যদি আমরা সম্পূর্ণরূপে সফল করিতে চাই তবে তাহার উন্নত শিক্ষা হইতে নারীগণকে বঞ্চিত রাখিতে পারি না।

শুধু সাহিত্যের শিক্ষা বলিয়া নহে, প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষাতেই নারীগণকে শিক্ষিতা করিয়া তুলিতে হইবে। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি কোন বিষয়ের শিক্ষাতেই তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিলে চলিবে না। অবশ্য আজকাল এ দেশের কতক লোকের এ বিষয়ে দৃষ্টি পড়িয়াছে; এবং কতকগুলি স্ত্রীলোকও যে, উচ্চশিক্ষা না পাইতেছেন তাহা নহে, কিন্তু সমগ্র হিন্দুসমাজের তুলনায় তাহাদের পরিমাণ, সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদ সদৃশ। সাধারণ হিন্দুসমাজে নারীজাতির উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চেষ্ট। এ নিশ্চেষ্টতার কারণ নারীর পক্ষে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা-জ্ঞানের অভাব। সাধারণ হিন্দুগণের বিশ্বাস, নারী সাধারণতঃ

শক্তিহীন, সে কেবল পতিপুত্রের সেবা করিবে, গৃহস্থালীর কার্য্য করিবে, উচ্চশিক্ষায় তাহার আবশ্যক কি! যে দাসী, উচ্চ দর্শন শাস্ত্র শিখিয়া সে কি করিবে! ইহাতে তাহার স্বধর্ম্ম-পালনের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই!

তাই আমাদের পুনঃ পুনঃ বলিতে হইবে নারীর জীবন দাসীর জীবন নহে, প্রাচীন হিন্দু সমাজে আর্য্যনারী দাসী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সহধর্ম্মিণী; আমরাও চাই সহধর্ম্মিণী। অন্তঃপুরনিবাস অন্তঃধর্ম্ম-রক্ষিতের প্রোজ্জ্বল আলোক বর্ত্তিকাধারী রমণী পথ প্রদর্শিকা সহচরী আমরা চাই; স্বামীর ধর্ম্ম কর্ম্মে চির অবিকৃত চিত্তা, তাহাতে চির উপেক্ষাশালিনী আত্মগৌরব জ্ঞানশূন্যা, একান্ত অন্ধভক্তিমতী সেবিকা আমরা চাই না। যিনি দাসীমাত্র, কোনও প্রকার উচ্চশিক্ষার তাঁহার প্রয়োজন না থাকিলেও না থাকিতে পারে; কিন্তু যিনি সহধর্ম্মিণী, স্বামীর সর্ব্বোচ্চ কার্য্যেও যিনি সহায়, শিক্ষাব্যতীত তাঁহার স্বধর্ম্ম পালনের উপায়ান্তর নাই। প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ব্যতীত যখন আমরা কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি পরিবারিক বা সামাজিক জীবনে পূর্ণরূপে প্রেম লাভ করিতে পারিব না, এবং যখন সমাজমধ্যে উচ্চ স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার ভিন্ন যথার্থ সহধর্ম্মিণী লাভ করিবার আমাদের আশা নাই, তখন পুরুষগণ যেরূপ শুদ্ধ, স্ত্রীলোকদিগেরও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদিগকে করিতেই হইবে। কারণ বর্ত্তমান যুগের এই উদ্ভটমান জগতে জড়তা অবলম্বন করিয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না। আমাদিগকে উঠিতেই হইবে, চলিতেই হইবে।

শ্রীসুধারাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

বালির গৃহ।

সকাল বেলা করছে খেলা
ভাই বোনে ঐ নদীর চরে;
সূর্য্যোদয়ের স্বর্ণ কিরীট
জ্বলছে তা'দের মাথার পরে।

ধূসর রঙের বালির রাশি—
অরুণ করে সোনার ভাস,
দৃষ্টি কভু পায় না নাগাল্—
কূল কিনারা কোথায় তার!

স্বচ্ছ শীতল ছুটছে সলিল
হীরক চূর্ণ বক্ষে ল'য়ে,
দুই পাশে তা'র ঝুরু ঝুরু
খসছে বালি ঢেউয়ে ঢেউয়ে।

ভাই বোনে সেই বালির উপর
জলের ধারে খেলে বেড়ায়,
সিক্ত সমীর এসে তাদের
রক্ত কপোল চুমিয়ে যায়।

ওপারে ওই শালের বনে
প্রভাত পাখীর মধুর স্বর
বীণার তানে আসছে ভেসে
শ্রবণ-মানস মোহকর।

গড়ছে তা'রা বালির গৃহ
তাজন ধরা নদীর চরে;
ভাঙছে যত, নাই নিরাশা,
গড়ছে তত যত্ন ভরে।

হয়ত কচিৎ হচ্ছে স্বামী
যন্ত্রে গড়া বালির ঘর ;—
ক্ষুব্ধনিত মুখ দু'খানি
হাসির প্রভায় উজলতর।

একটু জোরে বইল বাতাস—
খসে পড়ল বালির ভার ;
সাধের গৃহ গেল ভেঙ্গে
কষ্ট কেবল র'ল সার।

মর্ম্মে বড়ই বাজ্‌ল ব্যথা ;
চেষ্টা তবু অবিশ্রাম ;
মনির মত কোমল গালে
কর্‌ ঝরিয়ে কর্‌ছে ঘাম।

শেষে যখন রক্ত রবি
শেষ আকাশে বর্ষে কর ;—
অসম্পূর্ণ গৃহ ফেলে
ফিরল তা'রা আপন ঘর।

এইল পড়ে বালির গৃহ
অনন্ত সেই নদীর চরে ;
বর্ষা এসে মুছিয়ে দিবে
চিহ্নটী তা'র দু'দিন পরে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্কিম-যুগের কথা।

(৭)

আশ্বিন মাসের প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম, বারান্তরে জগদীশনাথ রায়ের জীবনের কয়েকটি গল্প বলিব। অতঃপর, সেই চেষ্টাই করিতেছি।

যে সময়ের কথা বলিতে যাইতেছি জগদীশনাথ তখন, উড়িষ্যার ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট। নন্যাস্ সাহেব সেখানকার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ম্যাক্‌ফার্সন সাহেব ডিঃ সিনিয়র জজ। এই ম্যাক্‌ফার্সন, পরে হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন।

শোভান্ সিংহ নামক এক ব্যক্তি, সেখানকার পুলিশে কাজ করিত। শোভান সিংহ, কোন্ দেশীয় লোক ছিল, আমার তা ঠিক স্মরণ নাই—কিন্তু দেখিতে সে অতি সুপুরুষ ছিল। গৌরবর্ণ, শোভন মুখ-শ্রী, দীর্ঘ বপু এবং বীরোচিত গাম্ভীর্য্যে সে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। জাতিতে সে ব্রাহ্মণ ছিল। এই শোভান সিংহকে লইয়া হঠাৎ এমন একটী ঘটনা হইল—যাহা উপন্যাসের মত বিচিত্র। মীন-কেতনের গতি, সর্ব্বত্র অনাহত। তাই চৌকিদারীর কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রেও, বেচারা শোভান সিংহ এক ছুঁচোনারীর প্রেমজালে বাঁধা পড়িল। জগদীশনাথ, যে বাংলোয় নিশাযাপন করিতেন, শোভান সিংহও রাত্রিতে তাহার ভিতরে থাকিত। বাংলোর বাহিরে সশস্ত্র প্রহরী, পাহারা দিত। কিন্তু শোভান সিংহ, প্রায়ই প্রহরীর চোখে ধূলা দিয়া পূর্ব্বকথিতা বনিতার আলয়ে গমন করিত।

এমনি কিছুদিন যায়। ইতিমধ্যে শোভান সিংহের প্রাণরঞ্জিনী, দ্বিতীয় এক নায়কের সন্ধান পাইল। এমন অবস্থায়, শোভান সিংহ কখনও আনন্দিত হইতে পারে না। অতএব, সে উক্ত রমণীকে নানা প্রকারে বুঝাইল। কিন্তু পণে ধর্ম্মবিক্রয় যাহার ব্যবসায়, তাহার কাছে কথার দাম কোথায়? রমণী

'যোক্' বাহির না। তখন বিয়োগান্ত দৃশ্যে এই প্রণয় বিপ্লবের অবসান সূচিত হইল। এক রাত্রিতে রমণীর দ্বিতীয় প্রণয়ী হঠাৎ শোভান সিংহের সম্মুখে পড়িয়া গেল। উদ্দীপ্তক্রোধ শোভান সিংহ, তৎক্ষণাৎ উলঙ্গ করবাল উদ্যত করিল এবং চকিতের মধ্যে সেই হতভাগ্যের প্রাণ দেহ কারা ত্যাগ করিল। হত্যাকারী শোভান সিংহ, তাহার পর সকলের অগোচরে আবার আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল। পরদিন এই হত্যাকাণ্ড লইয়া চারিদিকে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। শোভান সিংহ সকলের অলক্ষিতে রমণীর নিকটে যাইত বটে, কিন্তু তাহার প্রণয়কাহিনী অনেকেই জানিত। সুতরাং তাহার উপরেই সন্দেহ হইতে বিলম্ব হইল না। ভোরবেলা শোভান সিংহ প্রাতঃস্নান সমাপন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে প্রহরীরা আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইল। শোভান সিংহ, সিংহেরই মত গর্জ্জন করিয়া বলিল "খবর্দ্দার! তোরা কেউ আমার কাছে আসিস্ না! আমি স্বীকার কর্‌চি, খুন করেচি আমিই!" বলিয়াই সে তরবারি খুলিয়া, সেখানে পাগলের মত ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং এক একবার সম্মুখস্থ গাছের উপরে তরবারি দিয়া আঘাত করিতে লাগিল। প্রহরীরাও সকলে সশস্ত্র ছিল। গোলমাল শুনিয়া আরও অনেকে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু শোভান সিংহের সেই উদ্যত ও রোষদীপ্ত দীর্ঘদেহ দেখিয়া, অতগুলি অস্ত্রধারী লোকের ভিতরে কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তাহাকে গিয়া বন্দী করে। সকলে কেবল, শোভান সিংহের চারিদিকে দূর হইতে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া কোলাহল করিতে লাগিল।

জগদীশ নাথ, তখন চা পানের পরে বাংলোয় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। একজন প্রহরী ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে জানাইল, "শোভান সিংহ খুন ক'রে পাগল হয়ে গেছে। কেউ তাকে ধর্ত্তে পারছে না।" শুনিবামাত্র, জগদীশনাথ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তদ্দণ্ডে ঘটনাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিয়া রাখি, তিনি নিরস্ত্র। তাঁহাকে দেখিয়া ভিড় সরিয়া গেল। তিনি অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই শোভান সিংহ উন্মত্ত। সে তেমনি ভাবেই সদর্পে চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে,—তরবারি আস্ফালন করিতেছে! কাহার সাধ্য তার কাছে গিয়া দাঁড়ায়!

কিন্তু জগদীশনাথ একবারও দাঁড়াইলেন না—তিনি বরাবর চলিয়া গিয়া একেবারে শোভান সিংহের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। পূর্ব্ব-প্রসঙ্গেই বলিয়াছি, তাঁহার দৃষ্টি সাতিশয় তীক্ষ্ণ এবং অন্তর্ভেদী ছিল—সে দৃষ্টির সম্মুখে কেহ মুখ তুলিতে পারিত না। তাঁহার সেই অন্তর্ভেদিনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তিনি শোভান সিংহের দিকে প্রসারিত করিয়া গম্ভীরস্বরে আজ্ঞা দিলেন, "তরোয়াল ফেল্!"

শোভান সিংহ, একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল এবং কুণ্ঠিতক্ষণ সর্পবৎ অবনত হইয়া পড়িয়া তাঁহাকে সেলাম করিল, ও অস্ত্র ফেলিয়া দিল।

বিচারে, হতভাগ্য শোভান সিংহের প্রাণদণ্ড হয়। মরণকালেও বেচারার রূপের ঘোর কাটে নাই। ফাঁসির আগে তাকে

যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহার কি প্রার্থনা আছে, তখন সে সেই রমণীর উদ্দেশে বলিয়াছিল, "যখন সে আমার কাছে এসে বসত, তখন তার দুকাণে দুটি দুল্ দুলে দুলে উঠ্‌ত—সেই দুল্‌পরা মুখ দেখ্‌লে আমি সব ভুলে যেতাম। আমি আর একবার তাকে দেখ্‌তে চাই।"

আর একদিনের ঘটনা বলি। ঘটনাটি, মেদিনীপুরে ঘটিয়াছিল। এই জেলার মহনা গ্রামক স্থানের রাজা ছিলেন তখন—ভাগেরন্দ বাহুবল খাঁ। জগদীশনাথের সঙ্গে, রাজা, একবার তমলুকের দিকে শিকারে গেলেন। তাঁহাদের সঙ্গে পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টার মহীন্দ্রনাথ মল্লিক এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন।

তাঁহারা সকলে অনেকখানি পথ ঘুরিয়া একটী ঝোপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ, অতর্কিতভাবে একটী ভীষণ বন্য বরাহ তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল।

বরাহের সেই বিভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া শিকারীদের চক্ষুস্থির! কেহ পলায়নে দক্ষতা দেখাইলেন, কেহ স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্যামাচরণ বাবুর অত বুদ্ধি জুটিল না,—তিনি চট্ করিয়া বন্দুক ফেলিয়া দিয়া নিকটস্থ একটী গাছের ডালে চড়িয়া বসিলেন। সকলে যখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, জগদীশনাথ তখন অটলভাবে দাঁড়াইয়া বন্দুকের লক্ষ্য স্থির করিতেছেন। তাঁহার অব্যর্থ লক্ষ্যে বরাহ পলকের ভিতরেই আহত হইয়া ভূতলে লুটাইয়া পড়িল।

বিষাক্ত সাপের কবল হইতে জগদীশনাথ একবার আশ্চর্য্যরূপে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। বঙ্গিবহাটে রাজকর্ম্মোপলক্ষে একবার তিনি পুলিশ-বোটে করিয়া যাইতে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন, মেজর পার্সন। বোটের ভিতরে বসিয়া, জগদীশনাথ স্নান করিতে ছিলেন। ঘটনাক্রমে, মেজর পার্সন বোটের ভিতরে গিয়া দেখিলেন, একটী বৃহৎ গোখুরা সাপ, জগদীশনাথের পিছনে ফণা তুলিয়াছে। সাহেব, তখনি আপনার বুট দিয়া সাপের ফণা চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন।

জগদীশনাথ, একদা রাত্রিতে যানে আরোহণ করিয়া নোয়াখালি হইতে বাসায় আসিতে ছিলেন। পথের মাঝখানে হঠাৎ এক জেলখালাস কয়েদী তাঁহাকে আক্রমণ করে। কিন্তু জগদীশনাথ, তাহাকে এক ধমকেই স্তম্ভিত করিয়া দেন। তাঁহার উপরে উক্ত কয়েদীর আক্রোশ ছিল। তাই সে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু পুলিশের কাজে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, জগদীশনাথ লোকচরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি লোকটিকে দেখিয়াই বুঝিলেন, এ মন্ত্রগুপ্ত সর্প, অভ্যাসবশতঃ ফোঁস্ করে বটে, কিন্তু দংশন করিবে না। তিনি তাহাকে আপনার যানে বসাইয়া বাসায় লইয়া গেলেন। এবং নিজেরই আর্দ্দালির কাজে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। বলিয়া রাখি, পরে এই ব্যক্তি বিশ্বস্তভাবে চিরকাল তাঁর পদানত ছিল।

জগদীশনাথ যে কাজ করিতেন—তাহাতে নির্দ্দিষ্ট মাহিনা ছাড়া উপরি রোজগারের সুযোগযথেষ্টই ছিল। সেকালে, পুলিশের একজন সামান্য দারোগাও যে রকম উপরি লাভ

করিত, একালের বেশ মোটা মাহিনার উচ্চ কর্ম্মচারীর কাছেও তাহা লোভনীয়। কিন্তু জগদীশনাথ ভিন্ন ধাতুর লোক ছিলেন। একটী ঘটনায় আমরা তার প্রমাণ পাই। একবার কোন ধনী ব্যবসায়ী বিপাকে পড়িয়া তাঁহাকে ৩০ হাজার টাকা ঘুষ দিয়া বিপদ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করে। জগদীশনাথের স্বজাতীয় ও তৎকর্ত্তৃক পালিত কোন ব্যক্তি, এই সংবাদ লইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হন। সমস্ত শুনিয়া, জগদীশনাথ সংবাদদাতাকে কহিলেন "কেন বাপু, তার চেয়ে আমরা আর এক কাজ করি না কেন! এস, তুমি আমি ডাকাত হই; হয়ে, লোকের ঘরবাড়ী লুট করি,—তা হলে ত' আমরা রাতারাতি বড়লোক হয়ে পড়তে পার্ব্ব।"

প্রস্তাবকারী, অধোবদনে প্রস্থান করিলেন।

বাস্তবিক পুলিশের কাজে, এইরূপ সাধু-প্রকৃতিরই দরকার। কারণ, লোকের ধন-প্রাণ তাঁহাদের হাতে। রাজকর্ম্মের দুর্লভ অবসরে, জগদীশনাথ মুক্তপ্রাণে আনন্দোৎসবে মাতিতেন। এক একদিন তাঁহার কলিকাতার ভবনে তাৎকালিক বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সমাগম হইত। তন্মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব, দ্বারকানাথ মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতিও থাকিতেন। জগদীশনাথ গান করিতেন, রাজকানাথ মিত্র তবলা বাজাইতেন এবং ডাঃ জগবন্ধু বসু এম ডি মহাশয়, স্ত্রীলোক সাজিয়া, ঘোমটে চাদর বাঁধিয়া, অপূর্ব্ববেশে নৃত্য করিতেন। এই প্রমোদতরঙ্গে ভাসিয়া, সকলেই যেন শিশুরই মতন সরল হইয়া পড়িতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র, বেশভূষায় খুব যে জমকালো ছিলেন, তা নয়। তিনি সাদাসিধা ভাবের* যেমন পক্ষপাতী ছিলেন—বেশভূষাতেও তেমনি। একবার তিনি কলেক্টরের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছেন, হঠাৎ জগদীশনাথের সামনে পড়িয়া গেলেন। জগদীশ দেখিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মাথার চুলগুলি এলোমেলো। দেখিয়া, বলিলেন, "বঙ্কিম, এরকম উস্কোখুস্কো চুলে কলেক্টরের কাছে যেওনা; মাথাটা একবার আঁচড়ে নাও।"

"হাঁ, ঠিক কথা।" বলিয়া বঙ্কিম তখন আর্শি-চিরুণি লইয়া কেশ-প্রসাধনে মনোযোগী হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র, সকল বিষয়েই যেমন সাদাসিধা, তেমনি চিন্তাশীলও ছিলেন। শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাশীলতা বাল্যকাল হইতে। এখানে, তাঁহার একটী অভ্যাসের কথা বলিলে, আমার বক্তব্য সপ্রমাণ করিতে পারিব।

বঙ্কিমচন্দ্র, ঢালা-বিছানায় শুইয়া ডানহাতে

---

* বঙ্কিমচন্দ্র সরল ভাষার কতটা পক্ষপাতী ছিলেন নিম্নলিখিত ঘটনায় তাহা জানা যায়। একবার উঁহারা কয় বন্ধুতে মিলিয়া বাজারে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে কেহ উঁহাকে বাজারের বর্ণনা করিতে বলেন। সকলে যখন আশা করিতেছিলেন, প্রেমাঙ্কুর বিপদি গোছের কোন ভাষায় হিন্দু বলিবেন, তখন সোজা কথায় বলা করিলেন, "হরি দাসের দোকান।" এই সরলতার প্রসঙ্গে, বঙ্কিম, জগদীশনাথকে কোন পত্রে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন:

"ভাষার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার—সরলতা। অনেক বর্ষের পরে, আমি সরলতাকে পাইয়াছি।"

মস্তকরক্ষা করিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছেন। এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া চা দিয়া গেল। বঙ্কিম, মাঝে মাঝে চা পান করিয়া আবার পুঁথিতে মন দিতেছেন। ক্রমে তাঁহার পাঠ-তন্ময়তা এতদূর বাড়িয়া উঠিল, যে হাতের পেয়ালা হইতে চা পড়িয়া গিয়া বিছানা ভাসিয়া গেল। কিন্তু সেদিকে তখন তাঁহার লক্ষ্য নাই—তিনি তখন ধ্যানের রাজ্যে। এমন সময়ে, হয়ত' অন্য কেহ আসিয়া বলিলেন, "এ কি, চা পড়ে যে সব নষ্ট হচ্ছে!" তখন, বঙ্কিমের চেতনা হইত।

শুনিয়াছি ইহা একদিনের ঘটনা নয়—এমনি ধারা ব্যাপার প্রায়ই ঘটিয়া যাইত।

কবিবর ঈশ্বর গুপ্তই নাকি বঙ্কিমকে চা ধরাইয়াছিলেন। গুপ্তকবি, তখন মাঝে মাঝে কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন।

আমরা, এইখানেই আমাদের কথা সমাপ্ত করিলাম। কিন্তু এখনও আমাদের অনেক বক্তব্য রহিল; ভবিষ্যতে বিস্তৃত প্রবন্ধে তাহা বলিতে চেষ্টা করিব।†

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

সুন্দর।

২

তোমায়, তোমার রূপের বলে। হলেই বা তুই কালো,
তোর রূপেতে সুন্দরেরই পূর্ণতা দেউল আলো।
সুন্দরেরই পূজার লাগি;
ফুলের বনে আসিস্ জাগি',
বাহির দেখে কে বোঝে তোর? সুন্দর তুই প্রাণে।
রূপের তোমার মধুর বাহা
পানটি করিস্ নিত্য তাহা,
ঢালিস্ পুনঃ হৃদয়ালোর শুভ্রতনে আর গানে।
হলেই বা তুই কালো,—
সুন্দর তুই; সুন্দরেরে বাসিস্ যে রে ভালো।

ও কালো মেয়, সুন্দর তুই বহ্নি তুই কালো,
বুক ভরে' তুই ফুটাস্ যে রে সুন্দরেরই আলো।
ইন্দ্র-ধনুর স্বপন দেখিস্,
রঙ্গ হেসে গায়ে মাখিস্।
রূপের শিখা মেতে উঠে মেঘের পরশনে,
সুন্দরেরে বার্তা কহিস্
রূপের হাটে পশরা বহিস্,
অন্তরে তোর সুধার ধারা বর্ষণে আর ঘনে।
কে বলে তোর কালো?
সুন্দর তুই, সুন্দরে তুই বাসিস্ যে রে ভালো।

---

† এই প্রবন্ধ রচনা করিতে, আমি বঙ্কিম-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জগদীশনাথের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ রায় ও কবিবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের নিকট হইতে সম্পূর্ণ সাহায্য পাইয়াছি। আংশিকভাবে আরও অনেকে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। এই সুযোগে তাঁহাদের সকলের নিকটে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

৩

ওরে গভীর কালো দীঘি, বলিই যা তুই কালো,
তোর বুকেতে উঠ্‌লো ফুটে সবার রূপের আলো।
রূপের মোহে মরাল ছুটে,
রূপ ছড়ায়ে কমল ফুটে,
চন্দ্র তারা,—সব সুষমা আঁকছে তোরে ঘরে,
রূপসীরা স্নানের ছলে,
মোহায় মাখা তোর ও জলে।
রূপটি তাদের আপন রূপে দিস্ রে উজল করে'।
কে বলে তোর কালো?
সুন্দর তুই, সুন্দরে তুই বাস্‌তে পারিস্ ভালো।

৪

ওরে আঁধি কালো হরণ, যদিও তুই কালো,
জগতে তুই ফুটিয়ে দিলি সবার রূপের আলো।
রূপে রে তুই দিলি জীবন,
রূপের বুকে তোর যে ভবন,
সব সুষমা লুটিয়ে পড়ে তোর ও পায়ের কাছে।
রূপসায়রে নিত্য স্নানে,
মুখে থাকিস্ রূপের ধ্যানে,
রূপ সে তোর ও সর্ব্বখানে, তোর মাঝে কি আছে।
যদিও তুই কালো,
সুন্দর তুই, সুন্দরে তুই বাসিস্ যে রে ভালো।

শ্রীকালিদাস রায়।

চয়ন।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

সেই ব্যক্তি উত্তর করিল "আমি আপনার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, একরাত্রি বাক্যব্যয় না করিয়া অতিবাহিত করা ত সামান্য ব্যাপার।" এই উত্তরে প্রীত হইয়া প্রভু একটী বেদী নির্ম্মাণ করিয়া, বিধিমত বিয়ম অতিপালনে তৎপর হইলেন। উপবিষ্ট হইয়া তিনি রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রি সমাগত হইলে, উভয়ে নিজ নিজ কার্য্যে ব্রতী হইলেন। প্রভু তাঁহার মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন এবং বীরপুরুষ হস্তে তীক্ষ্ণধার তরবারিসহ দণ্ডায়মান রহিলেন। অনুলোমের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বীরপুরুষ একটী অস্ফুট ধ্বনি করাতে, তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে অগ্নি পতিত হইতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিকে ধূম ও অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রভু নিমেষ মধ্যে বীরপুরুষকে লইয়া হ্রদমধ্যে অবতীর্ণ হইলেন এবং তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বলিলেন "আমি তোমাকে মৌনাবলম্বন করিতে আদেশ দিয়াছিলাম, কি জন্য তুমি তাহা করিলে?"

বীরপুরুষ উত্তর করিল "আপনার আদেশে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত কোন উপদ্রব হয় নাই। বিপ্রহরে আমার বোধ হইল যে আমি স্বপ্ন দেখিতেছি আমার পূর্ব্বপুরুষ প্রভু আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সান্ত্বনাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হইলেও আমি বাক্যব্যয় করি নাই। পরে, আর এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, ক্রোধে আমাকে বধ করিল এবং আমি আমার মৃতদেহ দর্শন করিতে লাগিলাম। আমি নিজেকে মৃত বোধ করিলাম এবং অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম। কিন্তু আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা বশে আমি অগত্যা মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিব স্থির করিলাম। পরে আমি দেখিলাম যে আমি দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মলাভ করিব এবং জন্মগ্রহণও করিলাম! যদিও, গর্ভমধ্যে যথেষ্ট ক্লেশভোগ করিতেছিলাম, তত্রাপি আমি কোনরূপ বাক্যব্যয় করি নাই। কিছুদিন পরে, আমি বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলাম এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহ করিলাম। মাতাপিতার মৃত্যু হইল এবং আমি একটী সন্তানলাভ করিলাম। প্রত্যহ আমি আপনার অপার করুণার বিষয় স্মরণ করিয়া—মৌনাবলম্বন করিয়া

থাকিতাম। আমার আত্মীয় কুটুম্বগণ এই দৃশ্যে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করিত। ৬০ বৎসরের অধিক কাল আমি জীবিত ছিলাম। অবশেষে আমার স্ত্রী আমাকে বলিল যে, তুমি অবশ্য কথা কহিবে, অন্যথা আমি তোমার পুত্রকে বধ করিব। তখন আমার মনে হইল যে এই পুত্র মৃত হইলে, আমি আর পুত্র লাভ করিতে পারিবনা, যেন না আমি বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়াছি আমার স্ত্রীকে প্রতিরোধ করিবার জন্যই আমি এইরূপ চীৎকার করিয়াছি।

প্রভু উত্তর করিলেন "সকলই আমার দোষ; ইহা পিশাচেরই দোষ।" বোধিসত্ত্ব কোথা সমাধা করিতে পারেন নাই, এই চিন্তায় বিমনস্ক হইয়া, ভ্রমে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি অগ্নিদাহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন বলিয়া এই হ্রদের পূর্ব্বোক্তরূপ নামকরণ হইয়াছে এবং যেহেতু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, সেই জন্য ইহাকে "বোধি-সত্ত্বের হ্রদ" বলে।"

এই হ্রদের পশ্চিমে একটী স্তূপ আছে। বোধিসত্ত্ব, পূর্ব্বজন্মে এই স্থানেই নিজ শরীর দান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই নিবিড় অরণ্যে একটী শৃগাল, একটী শলক ও একটী বানর বন্ধুভাবে বাস করিত। এই সময়ে যাঁহারা বোধিসত্ত্বের ন্যায় জীবনাতিপাত করিতেছেন, তাঁহাদের চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ জন্য বৃদ্ধের রূপ ধারণ করিয়া দেবরাজ শক্র, ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি ঐ তিনটী জন্তুকে নিম্নলিখিত ভাবে সম্বোধন করিলেন "বৎসগণ। তোমরা স্বচ্ছন্দচিত্তে এবং নির্ভয়ে বাস করিতেছ ত?" তাহারা উত্তর করিল "আমরা তৃণের উপর শয়ন করি, নিবিড় অরণ্যে বিচরণ করি এবং যদিও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়, তথাপি আমরা একমত হইয়া সুখে ও শান্তিতে কালাতিপাত করিতেছি।" বৃদ্ধ বলিলেন "বৎসগণ। তোমরা সুখে ও শান্তিতে কালাতিপাত করিতেছ জানিতে পারিয়া, আমি আমার বার্দ্ধক্য বিস্মৃত হইয়া তোমাদের দেখিতে আসিয়াছি; কিন্তু আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, এখন কি আহার করিব?" তাহারা উত্তর করিল "কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করুন; আমরা আহার অন্বেষণে বহির্গত হইতেছি।" এই বলিয়া তাহারা একাগ্রচিত্তে চতুর্দ্দিকে বৃদ্ধের জন্য আহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। শৃগাল নদীগর্ভে অন্বেষণ করিয়া জীবন্ত কর্কট আহরণ করিল। বানর বনমধ্যে নানাপ্রকার পুষ্প ও ফল সংগ্রহ করিল, কেবল শলকই বনমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া শূন্যহস্তে প্রত্যাগমন করিল। বৃদ্ধ শলককে বলিলেন "আমার বোধ হইতেছে, শৃগাল ও বানরের সহিত তুমি একমত নও; ইহারা আমার সুখোৎপাদনের জন্য চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু তুমি শূন্যহস্তে প্রত্যাগমন করিয়াছ।" শলক এই কথা শ্রবণ করিয়া শৃগাল ও বানরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তোমরা কাষ্ঠসংগ্রহ কর; তাহা হইলে আমি কিছু করিতে পারিব।" শৃগাল ও বানর কাষ্ঠ আনিয়া তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিলে, শলক বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহাশয়, আমি ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল; আপনার আহার সংগ্রহ আমার পক্ষে অসম্ভব কিন্তু আমার দেহ আপনার খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে।" এই বলিয়া শলক প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিয়া দেহত্যাগ করিল। তখন, বৃদ্ধ শলকের পরিত্যক্ত পূর্ণদগ্ধ অস্থি সংগ্রহ করিয়া শৃগাল ও বানরকে স্বীয় স্বীয় গৃহে নিবেদন করিলেন; আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি; পশ্চাৎ শলকের এই ত্যাগ স্বীকারের কথা যাহাতে সকলে বিস্মৃত না হয়, এইজন্য আমি ধর্ম্মের চক্র-মধ্যে তাঁহাকে স্থাপনা করিব।" এই জন্যই-সকলে বলিয়া থাকেন যে ধর্ম্মে শলক আছেন। পরে, জনসাধারণ এই স্থানে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করেন।

এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া এবং আন্দাজ ৩০০ শত লি যাইয়া আমরা চেন-চু রাজ্যে পৌঁছি।

চেন্-চু (গাজীপুর)

এই রাজ্যের পরিধি প্রায় ছিয়ত্তর লি; গঙ্গাতীরবর্ত্তী রাজধানীর পরিধি ২০ লি। অধিবাসীরা ধনবান ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন; নগর ও গ্রামগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট। তুষি উর্ব্বরা এবং রীতিমত কর্ষিত হয়। জলবায়ু মনোরম ও নাতিশীতোষ্ণ। অধিবাসীরা সাধু

ও পবিত্রচেতা। বেশে বিষর্ম্মী ও সত্যধর্ম্মাবলম্বী উভয় প্রকার লোকই আছে। দশটী সঙ্ঘারামে হীনযান মতাবলম্বী প্রায় এক সহস্র যতি আছেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বিষর্ম্মীগণের দশটী দেব মন্দির আছে।

রাজধানীর উত্তর-পশ্চিম কোণে রাজা অশোক নির্ম্মিত একটী স্তূপ আছে। ভারতবর্ষে প্রচলিত কিংবদন্তী এইরূপ যে, এইস্থানে তথাগতের শরীরের অংশবিশেষ রক্ষিত আছে। পূর্ব্বকালে যখন পৃথিবীপতি এই স্থানে বাস করিতেন, তখন দেবতাদিগের প্রীত্যর্থে তিনি সাত দিবস ধরিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। নিকটে পূর্ব্ববর্ত্তী অপর তিন জন বুদ্ধের ভ্রমণ ও উপবেশনের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। নিকটেই বৈদেহের বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি; আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, ইহার অপার ঐশ্বরিক ক্ষমতা অত্যাশ্চর্য্যরূপে মধ্যে মধ্যে প্রকটিত হয়।

রাজধানী হইতে প্রায় দুই শত লি পূর্ব্বে যাইয়া, আমরা তপিটোকিলাম্বা (অধিষ্ঠকর্ণ) সঙ্ঘারামে উপস্থিত হই। সঙ্ঘারামের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর বৃহৎ না হইলেও, মন্দিরের কারুকার্য্য অত্যন্ত প্রীতিকর। বৃক্ষের তলে পুষ্পগুলির প্রতিবিম্ব সুন্দর দেখায়। পুষ্পোদ্যিতগণ তত্ত্ব প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং নিয়মাবলী যত্নের সহিত প্রতিপালন করেন। কিংবদন্তী এইরূপ পূর্ব্বে বিদ্যানুরক্ত ৩০ জন শ্রমণ তুষার পর্ব্বতের উত্তরাংশস্থ তুষারা দেশে এক মঠ হইয়া বাস করিতেন। পূজা ও শাস্ত্রপাঠের ব্যবস্থা সময়ে প্রত্যহ তাঁহারা এমপ্রকারে কথোপকথন করিতেন "ধর্ম্মের তত্ত্ব নিগূঢ় এবং দুখা যকোযায়ে শিক্ষা করা অসম্ভব। পবিত্র চিহ্নগুলি তাহাদের স্বধর্ম্মোচিত ভাবে উদ্দীপন; চলুন, আমরা সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া আমাদের বন্ধুবান্ধবগণকে আমরা যে সকল চিহ্ন দর্শন করিয়াছি তাহাই বর্ণনা করি।'

এই বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রমণ-যষ্টি সব বহির্গত হইলেন। ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া, তাঁহারা যে মঠে গমন করিতে লাগিলেন, সেইখানেই বৈদেশিক বলিয়া ঘৃণার চক্ষে উপেক্ষিত হইতে লাগিলেন এবং কেহই তাঁহাদের মঠের মধ্যে স্থান দিলেন না। তাঁহারা ক্ষুধায় কাতর ও আশ্রয়শূন্য হইয়া, অশেষ ক্লেশভোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তক্ষশীলার নরপতি রাজধানীর উপকণ্ঠে, ভ্রমণ করিতে করিতে এই বৈদেশিক যতিগণকে দেখিতে পাইলেন। বিস্মিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "হে ভিক্ষুগণ, আপনারা কোন দেশবাসী? আপনাদের কি অভিষ্ট কেন এবং আপনাদের কৌষেয় বসন কেন?" শ্রমণগণ উত্তর করিলেন "আমরা তুহোলো দেশবাসী। আমরা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, সংসার সুখে বিতৃষ্ণ হইয়া পবিত্র চিহ্নগুলি দর্শন এবং পূজার্থ বহির্গত হইয়াছি। কিন্তু আমাদের বস্ত্রপুথা হেতু, সকলেই আমাদের পরিত্যাগ করিয়াছেন; ভারতীয় শ্রমণগণ কেহই আমাদের আশ্রয় দিতেছেন না এবং আমরা স্বদেশ প্রত্যাগমনে অভিলাষী হইয়াছি কিন্তু আমরা আমাদের অভীপ্সিত কার্য্য সমাধা করি নাই। সেইজন্য পারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদ সত্ত্বেও, যতদিন আমাদের অভিলাষ পূর্ণ না হয়,-ততদিন আমরা পন্থাপথে চলিতে থাকিব।"

রাজা এই আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবংতৎক্ষণাৎ এই স্থানে একটী সুরম্য সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া বস্ত্র খণ্ডে নিম্নোক্ত আদেশ লিপিবদ্ধ করিলেন। "বৌদ্ধধর্ম্ম এবং সঙ্ঘের অনুগ্রহেই আমি পৃথিবীপতি হইয়াছি এবং সকল মনুষ্যের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছি। রাজত্ব লাভ করিয়া কৌষেয় বস্ত্রধারী ব্যক্তিকে রক্ষা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। আমি এই সঙ্ঘারাম বৈদেশিকের জন্যই নির্ম্মাণ করিয়াছি। বিদ্ধ-কর্ণ-বিশিষ্ট কোন যতিই যেন এই মঠে বাস না করেন।" এই ঘটনার জন্যই এই স্থানের এরূপ নামকরণ হইয়াছে।

এই মঠ হইতে প্রায় একশত লি দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে যাইয়া এবং গঙ্গাপার হইয়া আমরা মোহোপালো নগরে পৌঁছি। এই নগরের অধিবাসীবর্গ ব্রাহ্মণজাতীয় এবং বৌদ্ধধর্ম্মকে সম্মান করে না। আমাকে দেখিয়া তাহারা প্রথমতঃ আমার শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল; পরে, সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া সম্মান করিতে লাগিল।

গঙ্গার উত্তর পার্শ্বে নারায়ণ দেবের মন্দির। ইহার অভ্রভেদ ও উচ্চ প্রাসাদ গুলি অত্যাশ্চর্য্য কারুকার্য্যে

শোভিত। প্রস্তর নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি গুলি মনুষ্যের অদ্ভুত শিল্প চাতুর্য্যের প্রমাণ।

এই মন্দির হইতে ৩০ লি পূর্ব্বে রাজা অশোক নির্ম্মিত এক স্তূপ। অর্দ্ধাংশ মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত হইয়াছে। ইহার সম্মুখে বিশফুট উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ; তাহার দীর্ঘদেহে সিংহমূর্ত্তি। স্তম্ভগাত্রে খোদিত লিপি আছে। পূর্ব্বকালে একস্থানে বলবান নয়তুক বৈত্যগণ বাস করিত। তাহারা মনুষ্যের অত্যন্ত ক্ষতি করিত! মনুষ্যের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া তথাগত স্বকীয় ঐশ্বরিক শক্তি বলে বৈত্যগণকে তাঁহার শরণ লইতে বাধ্য করিলেন। বৈত্যগণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিল। পরন্তু তাহারা এক বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড আনয়ন করিয়া, তথাগতকে তদুপরি আসন গ্রহণে অনুরোধ করিল। সেই সময় হইতে বিধর্ম্মীগণ এই প্রস্তরখানি স্থানচ্যুত করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছে; কিন্তু দশ সহস্র বিধর্ম্মীর চেষ্টাতেও তাহা নড়ে নাই। স্তূপের চতুষ্পার্শ্বেই নিবিড় অরণ্য ও বজ্রশিলা ভূধর,—সন্ন্যাসত ব্যক্তিমাত্রের হৃদয়ে তাহা স্বতঃই ভয় উদ্রেক করে।

যেস্থানে বৈত্যগণ বশীভূত হইয়াছিল, তাহার সন্নিকটেই অনেকগুলি সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ আছে; মহাযান সম্প্রদায় ভুক্ত কয়েকটী মাত্র যতি এই সকল প্রাচীন সঙ্ঘারামে বাস করেন।

এই স্থান হইতে প্রায় একশত লি দক্ষিণ পূর্ব্বে যাইয়া আমরা একটী স্তূপের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাই; এখনও স্তূপটি দশফুট উচ্চ। পূর্ব্বকালে, তথাগতের নির্ব্বাণান্তে আটজন পরাক্রান্ত নরপতি তাঁহার শরীর চিহ্ন বিভক্ত করিয়া, একএক নরপতি, এক এক অংশ গ্রহণ করেন। যে ব্রাহ্মণ এই অংশ সকল বিতরণ করিতেছিলেন, তিনি নিজ জলাধার মধ্যে প্রতিস্তূপ করিয়া, সকলকে অংশ বিতরণ করিয়া, জলাধার সহ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে, জলাধার মধ্য হইতে চিহ্ন বহির্গত করিয়া তদুপরি এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন এবং স্তূপ মধ্যে জলাধার স্থাপিত করিলেন। এইজন্য উহা জোণ স্তূপ বলিয়া কথিত হয়। পরে রাজা অশোক পুরাতন স্তূপের স্থানে নূতন বৃহদাকার স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। উপরোক্ত বিবরণ, বর্ত্তমানেও এই স্তূপ হইতে আলোক রশ্মি বিগলিত হয়। এই স্থান হইতে উত্তর পূর্ব্বদিকে ১৪০।১৫০ লি পথ অতিক্রম করিয়া ও গঙ্গা পার হইয়া আমরা বৈশিলি [বৈশালী] রাজ্যে উপস্থিত হই।

বৈশালী।

বৈশালী রাজ্যের পরিধি পাঁচসহস্র লি। ভূমি উর্ব্বরা, প্রচুর পরিমাণে ফলপুষ্প উৎপাদিত হয়। আম্র ও কদলীর অন্ত নাই এবং বিশেষ আদরের দ্রব্য। জলবায়ু মনোরম ও স্বাস্থ্যকর। অধিবাসীরা সাধু প্রকৃতিবিশিষ্ট। উহারা ধার্ম্মিক ও বিদ্যানুরক্ত। বিধর্ম্মী ও ধার্ম্মিক একত্রেই বাস করে: কয়েকশত প্রাচীন সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ আছে। বর্ত্তমান যে ২০৩টী সঙ্ঘারাম আছে, উহাতে অত্যল্প সংখ্যক যতিই বাস করে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের কয়েকটী দেবমন্দির আছে। নিগ্রন্থ সম্প্রদায়ান্তর্গত অনেক ব্যক্তি এদেশে বাস করে।

রাজধানী বৈশালীর অবস্থা প্রায় অবনত। ইহার প্রাচীন ভিত্তি প্রায় ৬০।৭০ লি। রাজপ্রাসাদ বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমানে অত্যল্প সংখ্যক লোকেই এখানে বাস করে। রাজপ্রাসাদের ৭লি উত্তর পশ্চিমে একটী সঙ্ঘারাম আছে; ইহাতে মাত্র কয়েকটি ভিক্ষু বাস করে। উহারা সম্মিতি সম্প্রদায়ভুক্ত হীনযানান্তর্গত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে।

নিকটেই একটী স্তূপ। তথাগত, এইখানে বিমলকীর্ত্তিসূত্র প্রচার করেন এবং এইখানেই গৃহস্থ রত্নাকর এবং অন্যান্য সকলে বুদ্ধদেবকে মূল্যবান ছত্র উপহার প্রদান করে। এই স্থানের পূর্ব্বে অন্য একটী স্তূপ। সারীপুত্র এবং অন্যান্য কয়েক জন এই স্থানেই অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শেষোক্ত স্থানের উত্তর পূর্ব্বে একটী স্তূপ, এইস্তূপ বৈশালীরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পর, এই দেশের একরাজা শরীর চিহ্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং উহার সম্মানার্থ এই স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় কিংবদন্তীতে এইরূপ অব-

গত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বে এই স্তূপে দশ 'হো' পরিমিত চিহ্ন ছিল। রাজা অশোক উহার নয় দশমাংশ লইয়া, আর এক দশমাংশ রাখিয়া যান। পরে, এতদ্দেশীয় রাজা পুষ্যমিত্র স্তূপ উন্মোচনে উদ্যুক্ত হইয়া, কার্য্যারম্ভ করিলেই পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল এবং তিনি আর স্তূপ উন্মোচনে সাহসী হইলেন না।

ইহার উত্তর পশ্চিম কোণে রাজা অশোকনির্ম্মিত একটী স্তূপ। সন্নিকটে ৫০।৬০ ফুট উচ্চ প্রস্তর স্তম্ভ; শীর্ষদেশে এক সিংহমূর্ত্তি। প্রস্তর স্তম্ভের দক্ষিণে একটী হ্রদ। বুদ্ধদেবের ব্যবহারের জন্য এবদল মর্কট এই হ্রদ খনন করে। পৃথিবী বাসকালীন কয়েকজন বুদ্ধদেব এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। হ্রদের অনতিদূরেই একটী স্তূপ। এই স্থানেই মর্কটগণ বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্র লয় বৃক্ষে আরোহণ করিয়া মধু আহরণ করিয়াছিল।

দক্ষিণেই অন্য একটী স্তূপ; এই স্থানেই মর্কট বুদ্ধদেবকে মধু প্রদান করিয়াছিল। হ্রদের উত্তর-পশ্চিম কোণে বর্ত্তমানেও একটী মর্কট মূর্ত্তি আছে। সঙ্ঘারামের ৩।৪ লি উত্তর-পূর্ব্বে একটী স্তূপ; এই স্থানেই পূর্ব্বে বিমলকীর্ত্তির গৃহ ছিল; অত্যাশ্চর্য্য ঐশ্বরিক ঘটনা এই স্থানে সম্পাদিত হয়। অনতিদূরেই ইষ্টকস্তূপ। কিম্বদন্তী এইরূপ যে গৃহী বিমলকীর্ত্তি পীড়িত হইয়া এই স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন।

অনতিদূরেই আর একটী স্তূপ, রত্নকরণ্ডের গৃহ এইস্থানেই অবস্থিত ছিল। সন্নিকটেই আর একটী স্তূপ, এই স্থানেই বুদ্ধদেবের পিতৃব্যসা ও অন্যান্য ভিক্ষুণিগণ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। ৯০ সঙ্ঘারামের ৩.৪ লি উত্তরে একটী স্তূপ; সে সময়ে তথাগত মনুষ্য ও কিন্নর পরিবৃত হইয়া মৃত্যুর জন্য কুশীনগরাভিমুখে যাইতেছিলেন, তখন তিনি এই স্থানেই বিশ্রাম করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিমে অনতিদূরেই অন্য একটী স্তূপ। বুদ্ধদেব এই স্থান হইতেই বৈশালীর প্রতি শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহার দক্ষিণেই একটী বিহার; বিহারের সম্মুখভাগে আর একটী স্তূপ। 'আম্র-বালিকা' বুদ্ধ দেবকে যে উদ্যান দান করিয়াছিলেন, এই স্তূপ, তাহারই স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে।

এই উদ্যানের পার্শ্বেই অন্য একটী স্তূপ; তথাগত এই স্থানেই তাঁহার মৃত্যুঘোষণা করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব পুরাকালে যখন এই স্থানে বাস করিতেন। তখন আনন্দকে নিম্নোক্ত মর্ম্মে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন—"যাহারা চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিতে পারে, তাহারা কল্পান্ত পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। তাহা হইলে, তথাগত কতকাল জীবিত থাকিবেন?" তিনি, তিনবার আনন্দকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন কিন্তু মারের প্রলোভনে আনন্দ প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। আনন্দ, নিজ আসন পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র মধ্যে নির্জ্জনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মার, বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তথাগত যতকাল যাবৎ পৃথিবীতে বাস করিয়া ধর্ম্ম প্রচার ও দীক্ষিত করিতেছেন। যাহাদের তিনি পুনর্জ্জন্ম হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা বালুকণার ন্যায় অগণ্য। নিশ্চয়ই নির্ব্বাণ লাভের এই প্রশস্ত সময়।" তথাগত নখাগ্রভাগে কয়েকটী বালুকণা লইয়া মারকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার নখাগ্রস্থিত বালুকণাগুলি পৃথিবীর বালুকণার সমান কিনা?" মার উত্তর করিলেন, "পৃথিবীর বালুকণার সংখ্যা অধিক।" বুদ্ধ উত্তর করিলেন "যাহারা রক্ষা পাইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা আমার হস্তস্থিত বালুকণার ন্যায়; যাহাদের উদ্ধার হয় নাই, তাহাদের সংখ্যা পৃথিবীর বালুকণার ন্যায়। যাহা হউক তিন মাস পরে আমি নির্ব্বাণ লাভ করিব।

ইতিমধ্যে অরণ্যমধ্যে ভ্রমণরত আনন্দ অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখিয়া বুদ্ধদেবের নিকট আসিয়া এইরূপ বিবৃত করিলেন "আমি যখন বনমধ্যে ছিলাম, তখন স্বপ্নে এক বৃহৎ বৃক্ষ দর্শন করিলাম। বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা চতুর্দ্দিকে ছায়া প্রদান করিতেছে; অকস্মাৎ এক ঝটিকা বৃক্ষকে বিনষ্ট করিয়া, বৃক্ষের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিল। ভগবান করুন, যেন আপনার মৃত্যু না হয়। আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়াছে, তাহাতেই আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। (ক্রমশঃ)

মাতৃঋণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কৌতুক।

কারখানার লোকগুলা যখন রুডিক পরিবার সম্বন্ধে বক্র ইঙ্গিত করিয়া কৌতুক-হাস্যে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিত, ম্যাক তখন নীরবে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিত। এ কুৎসিত রঙ্গ-রহস্য তাহার নিকট অত্যন্ত বিরক্তিকর বোধ হইত। নিষ্ফলরোষে তাহার ক্ষুব্রদেহ জ্বলিতে থাকিত। নাস্তেঁ ও ক্লারিসার অবৈধ প্রণয় ব্যাপার কাহারও অগোচর ছিল না। ম্যানেজার এই কুৎসার মূল উৎপাটন করিবার মানসেই নাস্তেঁকে লণ্ডনে কর্ম্ম দিয়াছিল। কিন্তু ইহাই ক্রমে ক্লারিসার ক্রত পতনের কারণ হইয়া উঠিল।

নাস্তেঁ যতদিন ইস্ট্রেতে অবস্থান করিতেছিল, ক্লারিসার মোহ ততদিন একটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। নাস্তেঁর প্রতি আকর্ষণটা তেমন প্রবল হইয়া উঠে নাই। প্রত্যহ দুই চারিটা গল্প ও কৌতুক পরিহাস করিয়া ক্লারিসা প্রাণে কেমন একটা তৃপ্তি অনুভব করিত—সেটা নিত্যকার, অপ্রার্থিত—বায়ু ও আলোকের মতই সহজলভ্য ছিল, প্রয়োজনীয় বলিয়াও মনে হইত। সে সম্বন্ধে যে কোথাও কোনরূপ অসুযোগাদি উঠিতে পারে—এ কল্পনাও তাহার মনে স্থান পাইবার কারণ ছিল না। কিন্তু এই দূরত্বের ব্যবধান তাহার প্রাণে একটা দারুণ অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তুলিল। সন্ধ্যার নিঃসঙ্গ অবসরগুলা কিছুতেই কাটিতে চাহিত না। নাস্তেঁর সহিত সেই কত গল্প, ক্ষণিকের কত মান-অভিমান, কলহ প্রণয়ের সে কত খেলা—বিচিত্র স্মৃতির তরঙ্গ তুলিয়া এখন তাহার অলস চিত্তটিকে একান্ত ক্ষুব্ধ বিচলিত করিয়া তুলিত! আজ কোথায় নাস্তেঁ? ক্লারিসার কর্ম্মহীন সমস্ত অলস অবসরটুকু সে জুড়িয়া বসিয়াছিল! তাই আজ জ্যোৎস্নালোকিত নিশীথে বাতায়ন-পার্শ্বে বসিয়া ক্লারিসা যখন হৃদয়মধ্যে একটা শূন্যতা অনুভব করে, অদূরে বৃক্ষশাখার অন্তরালে নাইটিংগেল মধুর সঙ্গীতে চারিধার ভরাইয়া তুলে, তখন ক্লারিসা নাস্তেঁর অভাব অনুভব করিয়া একান্ত কাতর হইয়া উঠে! কোথায় নাস্তেঁ—কোথায়? এ অভাব আজ কে মিটাইবে? এ শূন্যতা কে পূর্ণ করিবে?

অবশেষে এ বিচ্ছেদ ক্লারিসার অসহ্য হইয়া উঠিল। একদিন সে নাস্তেঁকে পত্র লিখিতে বসিল। নাস্তেঁও সে পত্রের বেশ গুছাইয়া বানাইয়া উত্তর দিল। তাহার পর হইতে উভয়ের মধ্যে পত্র ব্যবহার নিয়মিত চলিতে লাগিল—এবং ক্রমশঃ উভয়ের সাক্ষাৎ হইবার পক্ষেও বিশেষ বিঘ্ন রহিল না।

বাসিদাঁরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইত। বাসিদাঁর ইস্ট্রের অপর পারে অবস্থিত—মধ্যে নদীমাত্র ব্যবধান। বাসিদাঁর হইতে লণ্ডনে দুই ঘণ্টার পথ। নাস্তেঁ ইচ্ছা করিলেই এক বেলার ছুটি লইতে পারিত—সে বিষয়ে নিয়মের কোনরূপ কঠিন বাঁধাবাঁধি ছিল না।

ক্লারিসাও জিনিষপত্র কিনিবার ছল করিয়া মধ্যাহ্নে নদী পার হইয়া বাসিঁদারে আসিত।

ইহার এ সংবাদ ক্রমে কাহারও জানিতে বাকী রহিল না—এ বিষয় লইয়া স্পষ্টই তাহারা আলোচনা করিত। মধ্যাহ্নে রুডিক জ্যাক প্রভৃতি সকলে কারখানায় থাকিত এবং সেই অবসরে ক্লারিসা যখন পথ দিয়া ষ্টীমারঘাটের অভিমুখে চলিত, তখন রাস্তায় লোকের মধ্যে ইঙ্গিতের ধূম পড়িয়া যাইত! তাহার দিকে চাহিয়া সকলেই একটু বক্র হাসি হাসিয়া লইত। গৃহবাসিনী রমণীরাও পরস্পরের গা ঠেলিয়া অবজ্ঞার সুরে বলিত—লজ্জাও নেই গা, মাগীর!

সত্যই তাহার এতটুকু সঙ্কোচ বা দ্বিধা ছিল না! পথে রাজ্যের লোকের ঘৃণা ও অবজ্ঞার মধ্য দিয়া সে অবাধে চলিয়া যাইত! কি এক দুর্লঙ্ঘ্য শক্তির পরিচালনায় সে চলিত, কোনমতে আত্মদমন করিতে পারিত না—কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শঙ্কিত ত্রস্ত চরণে সে ধীরে ধীরে ষ্টীমারে উঠিয়া বসিয়া নিশ্চিন্তভাবে মৃদু নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, সুগন্ধি রুমালে ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া পরপারের দিকে চাহিয়া থাকিত! রৌদ্র মাখিয়া রুপালি ঢেউ তুলিয়া নদী ছুটিয়া চলিয়াছে—বহু ঊর্দ্ধে গগনে দুই চারিটা পাখী ছোট কৃষ্ণ বিন্দুর মত উড়িয়া বেড়াইতেছে—তীরবর্ত্তী কারখানার চিমনি হইতে ঘনকৃষ্ণ ধূমরাশি উঠিয়া সমস্ত আকাশটাকে ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে! এ দৃশ্য-বৈচিত্র্যের প্রতি ক্লারিসার লক্ষ্য থাকিত না—সে অর্থহীন লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে শুধু পরপারে তীররেখার পানে চাহিয়া থাকিত। শুধু মুখে মধ্যে একটা অজানা শঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিত, তথাপি বাসিঁদারে যাইতে হইবেই। মুক্তি নাই—দুর্ব্বল চিত্তকে দমন করিবার শক্তিও নাই!

জ্যাক এ সকল ব্যাপারই জানিত। এই গোপন অভিসার-যাত্রা তাহার নিকট গোপন ছিল না। কারখানায় প্রবেশ করিয়া তাহার চোখ ফুটিয়া ছিল। তাহার সম্মুখেই কারখানার কোকগুলা রুডিকের দুর্ভাগ্যের কথা লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে মাতিত! এ সকল ব্যাপার লইয়া রঙ্গরহস্য তাহাদিগের নিকট পরম উপভোগ্য ছিল!

জ্যাক এ রঙ্গরহস্যে যোগ দিত না। এই নির্ভরশীল সরল-হৃদয় পল্লীপ্রেমিক বৃদ্ধের দুঃখে তাহার প্রাণে সমবেদনার উদ্রেক হইত। আর এই বুদ্ধিহীনা নারীর দুর্ব্বলতায় সে একান্ত ব্যথা পাইত। তাহার মনে হইত, একবার সে ক্লারিসাকে সতর্ক করিয়া দিবে,—সাবধান, সাবধান নারী, যে পথে চলিয়াছ, সে পথ ত্যাগ কর—সে তোমায় কোথায় কোন নরকের অন্ধকারময় গহ্বর-তলে নিক্ষেপ করিবে! আর নার্ত্তে—একবার নার্ত্তেকে পাইলে, তাহাকে সে রীতিমত শিক্ষা দেয়—তাহার চুলের গুচ্ছ ধরিয়া প্রবলভাবে নাড়া দিয়া বলে—দূর হ, পামর—এই দুর্ব্বলা অভাগিনী নারীর সম্মুখে তোর এ কুহক-জাল বিস্তার করিস নে—তাহার সর্ব্বনাশ করিস নে!

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাহার ক্ষোভ হইত যখন সে দেখিত তাহার বন্ধু বেলিসার এই পৈশাচিক লীলা-অভিনয়ে একটি প্রধান ভূমিকা লইয়া বসিয়া আছে! এই ফিরিওয়ালা নার্ত্তে ও ক্লারিসার পত্রবাহকের কার্য্য করিত। বেলিসারকে সে গোপনে বহুবার রুডিকগৃহে

আসিতে দেখিয়াছে—মাদাম রুডিকের হাতে সে পত্র দিয়া গিয়াছে—তাহার পরিবর্ত্তে যৎকিঞ্চিৎ রৌপ্যমুদ্রা পাইয়াই সে পরম আপ্যায়িত হইয়া গিয়াছে। তাহার বন্ধু যে এই সর্ব্বনাশী পাপাচরণে কোনমতে সহায়তা করিবে,—ইহা ভাবিয়াই জ্যাক অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার আতিথ্যের প্রসঙ্গ তুলিয়া বেলিসার জ্যাকের মাতার প্রশংসায় প্রায়ই মুখর হইয়া উঠিত, জ্যাক কিন্তু সে প্রশংসায় তৃপ্তি পাইত না—সে ভাবিত একবার বেলিসারকে স্পষ্ট শুনাইয়া দিবে যে এরূপ গর্হিত কর্ম্ম করিয়া তাহার প্রীতি-আকর্ষণ করিবার চেষ্টা নিতান্তই ব্যর্থ প্রয়াস! কিন্তু তাহার মুখ দিয়া সে কথাটা বাহির হইতে পারিত না—কেমন বাধিয়া যাইত।

একদিন রুডিকের গৃহের সম্মুখে ক্লারিসাকে দেখিতে না পাইয়া বেলিসার জ্যাককে চুপি চুপি ডাকিয়া নিভৃতে তাহার হস্তে একখানি নীল মোড়কের আবরণে এক পত্র দিয়া বলিল "মাদাম রুডিককে এখনি দিও—সাবধান, কেহ যেন জানিতে না পারে, আর কাহারও হাতে দিওনা যেন!"

জ্যাক পত্র-মোড়কের উপর চাহিয়া দেখিল,—মোড়কের উপর মাদাম রুডিকের নাম—আর সে নাম্বেঁর হস্তাক্ষর। দেখিয়া সে রোষে জ্বলিয়া উঠিল, বেলিসারের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া শাণিত বচনে কহিল, "খবরদার! আমাকে এমন নীচ মনে করোনা, যে, তোমার এই হীন কাজে আমি কোন রকম সহায়তা করব? আমি যদি তুমি হতাম—তাহলে এই হীন কাজ করে পয়সা উপার্জ্জন করার কথা আমার মনে একদণ্ডের জন্যও উদয় হতোনা—এতে আমার অনাহারে থাকতে হত যদি, তবুও—।" বেলিসার বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

জ্যাক কহিল, "তুমি জান বেলিসার, এ পত্র কোথা থেকে আসছে—কে দিয়েছে—আর এ পত্রের মর্ম্মই বা কি! আমিও যে জানিনা তা ভেবো না—আমি কেন, এ কথা দেশশুদ্ধ লোকের অবিদিত নয়! এই সরলহৃদয় বৃদ্ধের সঙ্গে এরকম প্রতারণা করতে তোমার একটু লজ্জা বোধ হয় না?"

বেলিসার জ্যাকের দিকে চাহিল। অবিচলিতভাবেই উত্তর করিল, "এটা অন্যায় অপবাদ হচ্ছে, মাষ্টার জ্যাক! বেলিসারকে যারা ভাল জানে,তারা হলপ করে বলতে পারে যে সে কখনো কারো সঙ্গে জীবনে প্রতারণা করে না—সে কল্পনাও তার মনে কখনো স্থান পায় না! আমার হাতে কতকগুলো কাগজ দেয়—আমি সেগুলো পৌঁছে দিই—ব্যস্ খালাস! কি বৃত্তান্ত তাতে আছে তা কি জানি! তুমি জান আমার অবস্থা—তোমায় কতবার বলেছি! বাড়ীতে অনেকগুলি পোষ্য আছে—আমার রোজগারই তাদের একমাত্র নির্ভর। তাদের মুখে অন্ন না দিয়ে ত আমি খেতে পারিনে। তার উপর আমার স্ত্রী-পুত্রের অসুখ—তার আর একটি পয়সা রোজগার করবার সামর্থ্য নেই! টাকার বাজার কেমন, জান ত! নিজের পায়ের জুতো এক জোড়া এ পর্য্যন্ত করাতে পারলেম না! যদি প্রতারণা করবার ইচ্ছা থাকত ত এতদিন মস্ত লোক হয়ে যেতাম!"

বেলিসারের স্বরে এতটুকু কম্পন ছিল

না—দৃষ্টিতে এতটুকু ঢাকলা ছিল না। জ্যাক তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, এরূপভাবে পত্র বহন করা অত্যন্ত গর্হিতকর্ম্ম। রুডিকের স্ত্রী ও নাতের মধ্যে এই গোপন পত্র-ব্যবহার একান্ত অনুচিত—তাহা পাপ! স্ত্রীর উপর বৃদ্ধ রুডিকের অগাধ বিশ্বাস—সে যেচারা তাহার স্ত্রীকে এতটুকু সন্দেহ করে না, এক্ষেত্রে ইত্যাদি। কিন্তু সকলই বিফল হইল! বেলিসারের কিছুতেই এ সরল কথাটা বুঝিবে না! টাকার বাজার অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য, গৃহে তাহার পোষ্য অনেকগুলি, ভগ্নীপতির কঠিন ব্যারাম—তাহার উপার্জ্জনের উপরই সকলের অন্ন নির্ভর করিতেছে, এ যুক্তির বিরুদ্ধে জ্যাকের কোন কথা খাটিতেই পারে না! সে কাহারও সহিত প্রতারণা করিতেছে না, কোন পাপের সহায়তা করিতেছে না,—সৎপথে থাকিয়া সদুপায়েই সে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে! জ্যাকের চেষ্টা বিফল হইল।

জ্যাক তখন অনেক কথা ভাবিতে লাগিল। সে আজ রুডিক পরিবারের এক জন! তাহার চোখে জল আসিল। সে বেলিসারকে আর কোন কথা না বলিয়া ধীরপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

রুডিক যে এই ভীষণ ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানিত না, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না! তাহার সারা জীবনটাই কারখানায় কাটিয়া আসিতেছে। কারখানার সহকর্ম্মিবর্গ সকলেই এই বৃদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধানুরক্ত ছিল। এমন স্নেহসরল আশুতোষ লোক,—তাহার সরলতাটুকু বাঁচাইয়া তাহার অগোচরেই সকলে কানাঘুষা করিত। কিন্তু জেনেদা—? জেনেদা ত সমস্তই জানে! সে কেন ইহার প্রতিকারে মনোযোগ অর্পণ করে না! সে কি এখন কিছু দেখিতে পায় না? কোন ইঙ্গিত, কোন আভাষ? সে কি সহসা অন্ধ হইয়া গিয়াছে? কোথায় সে—রুডিক-গৃহ কি সে ত্যাগ করিয়াছে?

না। জেনেদা রুডিক-গৃহ ত্যাগ করে নাই। আজ এক মাসকাল সে কর্ম্মস্থল হইতে অবসর লইয়াছে! তাহার দৃষ্টিও যেন তীক্ষ্ণ ছিল বরং সে দৃষ্টির উজ্জ্বলতা এক্ষণে সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে—একটা বিপুল সুখ-সম্ভাবনায় সে দৃষ্টি সম্প্রতি উজ্জ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বিবাহের দিনস্থির হইয়া গিয়াছে। কষ্টমহাউসের এক তরুণ কর্ম্মচারীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে। পাত্রের নাম মঙ্গিন। ঈষৎ সবুজ বর্ণের পোষাকে, সৈনিকের মত সুগঠিত দেহ ও দীর্ঘ গুম্ফে মঙ্গিনের রূপ যেন উছলিয়া উঠিত। কষ্টমহাউসে এমন সুশ্রী যুবক আর দুইটি দেখা যায় না—জেনেদার চক্ষে অবশ্য! তাহাকে স্বামী-রূপে বরণ করিবার সৌভাগ্য মিলিয়াছে জেনেদার! ধন্য সে, সার্থক তার জীবন! বিবাহে পণের মাত্রা অত্যন্ত অধিক—তাহা রুডিকের সঞ্চিত অর্থের সমস্তই প্রায় গ্রাস করিয়া ফেলিবে। নগদ চারি হাজার দুই শত মুদ্রা। পণ কমাইতে গেলে মঙ্গিনকে মিলিবে না, দুর্ম্মূল্য হইলেও মঙ্গিনকে চাই, নহিলে জেনেদা সুখী হইবে না। নগদ মূল্য পাইলেই মঙ্গিনের চক্ষে জেনেদার কুৎসিৎ দেহ অপরূপ লাবণ্যে ভরিয়া উঠিবে, শ্যাম বর্ণ পরমোজ্জ্বল স্বর্ণের আভায় উদ্ভাসিত হইবে, গঠন দিব্য লালিত্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিবে। এই পণের জন্যই শুধু সে অপরিণীতা সহস্র কিশোরীর পাণি পরিত্যাগ করিয়া

জেনেদার দিকে ঝুঁকিয়াছিল। কারণ সারা ইংলণ্ড ও নিকটবর্ত্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশের কোন কন্যারই এ মূল্য প্রদানে সামর্থ্য ছিল না। কুডিক যখন এ পণের কথা শুনিয়া বলিয়াছিল, "এত টাকা দিবার আমার ক্ষমতা নাই। বৃদ্ধ বয়সে গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে কিসে? আমার অবর্ত্তমানে ক্লারিসারই বা উপায় কি হইবে? ক্লারিসার যদি পুত্র কন্যা হয় তাহাদের জন্য সংস্থান থাকিবে কি?" তখন জেনেদার ছল ছল মুখ দেখিয়া ক্লারিসাই সাগ্রহে বলিয়াছিল, "আমাদের জন্য ভাবতে হবে না! এখনও তোমার যে শক্তি আছে, রোজগার কর, বুঝে সংসার করলে টাকা আবার হতে কত দিন? মজিনের সঙ্গেই জেনেদার বিয়ে দাও। দেওয়া চাইই। জেনেদা ওকে অত ভালবাসে, না হলে ও বেচারীর মনের সুখ চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যাবে!"

ভালবাসা! কি কুহক জান তুমি! এই ভালবাসার নামেই ক্লারিসা আপনাকে উৎসর্গ করিয়া বসিয়াছিল!

মাদাম মজিন হইবার আশা যখন জেনেদার পক্ষে আর দুরাশা রহিল না, তখন সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। সে সাগ্রহ সুখের কল্পনা করিত,—মজিনের হাত ধরিয়া নদীতীরে বেড়াইতেছে, কত সুন্দরী কিশোরীর লোলুপ দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইয়া ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে! নিভৃতকুঞ্জে বসিয়া মজিনের বুকে শির রাখিয়া সে কত দেশের গল্প শুনিতেছে,—সন্ধ্যার পাখী বাসায় ফিরিতেছে! ক্রমে সন্ধ্যার পর রাত্রি আসিল, মাথার উপর চাঁদ উঠিল, চারি ধার স্তব্ধ হইয়া আসিল, সেই নির্জ্জনতার মধ্যে তাহারা দুই জনে বসিয়া,—জগতে যেন আর কেহ নাই, শুধু দুইটি নয়নালো—তাহাদিগের প্রাণের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ভাবের রাশি ছাড়া পাইয়া আজ সাড়া দিয়া উঠিয়াছে,—কোথাও এতটুকু বাধা নাই, সঙ্কোচ নাই! একি সুগভীর পরিতৃপ্তি, কি বিশ্বপ্লাবী সুখ! জেনেদা ভাবিত, সে কুরূপা। এই তুচ্ছ অর্থগুলার জন্যই শুধু সে মজিনের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছে—নহিলে সে কোথায় থাকিত! মজিন তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিত না! তুচ্ছ অর্থগুলাই সর্ব্বস্ব হইল? এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের নিবিড় প্রেম,—ইহার কোন মূল্য নাই? ইহার দিকে মজিন চাহিয়া দেখিবে না? নাই দেখিল—একবার মজিন শুধু তাহাকে গ্রহণ করুক, তার পর সে মজিনকে, তাহার প্রেমের মহিমা কি, তাহা বুঝাইবে! তখন মজিনও বুঝিবে, মণিমাণিক্যের জ্যোতি ম্লান করিয়া, কি রত্ন তাহার বক্ষে সঞ্চিত,—সে দিন জেনেদার কি সুখ হইবে!

ক্লারিসার প্রতি জেনেদার শ্রদ্ধা হইয়াছিল। সে যদি কুডিককে বুঝাইয়া এই পণে সম্মত না করাইত, তাহা হইলে—তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশ হইত! আর নার্ভে ইংলণ্ড ছাড়িয়াছে, নিজের বিবাহের সম্ভাবনা লইয়া সেও সমধিক ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এই সকল কারণেই ক্লারিসার প্রতি জেনেদার পূর্ব্বকার সতর্ক দৃষ্টি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। ক্লারিসা আবার স্বহস্তে জেনেদার বিবাহ-পরিচ্ছদ তৈয়ার করিতেছিল। কৃতজ্ঞতায় জেনেদা কাজেই ইদানীং ক্লারিসার প্রতি বেশ আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল।

আর পনের দিন পরে বিবাহ হইবে।

আসন্ন সমারোহের একটা আভাষ ইতিমধ্যেই কড়িক গৃহটিকে আঘাত করিয়াছিল। আত্মীয় বন্ধু ও অনুগতবর্গের নিকট হইতে প্রত্যহ কিছু না কিছু পরিণয়োপহার আসিতেছিল। চারিদিকে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। আত্মীয়স্বজন আনাগোনায় পরামর্শাদির ধুম লাগিয়াছিল। কুরূপা হইলেও জেনেদা অনেকের আদরলাভে সমর্থ হইয়াছিল কাজেই উপহারেও ঘটা ছিল। জেনেদাকে তাহার এই শুভপরিণয় উপলক্ষে কি উপহার দিবে, তাহা ভাবিয়া জ্যাক একটু ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। ইদা তাহাকে এজন্য আপনার সঞ্চয় হইতে গোপনে ষাট টাকা পাঠাইয়াছিল। কবি আর্জেন্তি এ সংবাদ জানিত না।

ইদা জ্যাককে লিখিয়াছিল, "তোমাকে আজ ষাট টাকা পাঠাচ্ছি, জ্যাক! এই টাকায় জেনেদার জন্য কিছু উপহার কিনে তুমি তার বিয়েতে দিও। কোন ভাল পোষাক একটা কিনতে পার যদি ত ভাল হয়। তোমাকেও বিয়েতে একটু সাজগোজ করতে হবে, নিশ্চয়। তার জন্য তোমার নূতন পোষাক চাই বোধ হয়? অনেক দিন তুমি পোষাক টোষাক কিছু কেননি, যা ছিল সেগুলোও এতদিনে পুরন হয়ে গেছে। নিজের জন্য একটা ভাল পোষাকও কিনো! এ টাকা সম্বন্ধে আমার চিঠিতে কোন কথা লিখো না! কড়িকদের কারো কাছেও এ টাকা পাঠানোর কথা বলো না। এ টাকাটা তোমাকে আমি লুকিয়ে পাঠাচ্ছি। ইনি এ টাকার কথা জানেন না, জানলে রাগ করবেন। এখানে এঁর শরীর ভাল নয়, টাকার টানাটানি যাচ্ছে, কাজেই ওঁর মেজাজটাও কিছু রুক্ষ। সেই জন্যই ভয় হয় পাছে এ টাকার কথা শুনে তিনি বিরক্ত হন, বলেন বা 'এত নবাবি কেন?' তাই তোমায় এত করে সাবধান করে দিচ্ছি। যদি কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে ত বলো, ও টাকা তুমি জমিয়েছিলে।

আর পৃথিবীর লোকগুলোও এমন হিংসুকে! এঁর বিরুদ্ধে সবাই এমন ষড়যন্ত্র করে বসে আছে। এঁকে কিছুতেই মাথা তুলে সাহিত্যসমাজে দাঁড়াতে দেবে না অথচ এঁর লেখবার শক্তি কত!"

আজ দুইদিন জ্যাক এই টাকা কয়টি পাইয়াছে। পাইয়া সে মনে মনে যথেষ্ট আনন্দগর্ব্ব উপভোগ করিতেছিল। এ বিবাহে সে যে নিতান্ত উপহারহীন রিক্ত হস্তে দাঁড়াইবে, সেটা কেমন যেন তাহার মনঃপূত হইতেছিল না! এখন সে ভাবনা দূর হইয়াছে। আবেগে মার পত্রখানা সে বুকে চাপিয়া ধরিল।

উপহারের জন্য এখন কি কিনিবে, সে? কাহার সহিতই বা সে পরামর্শ করিবে? সন্ধ্যার পর বাগানে বসিয়া সেদিন সে এই কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিয়া সে স্থির করিল, জেনেদাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবে, তাহার কি পছন্দ। তখন সে জেনেদার উদ্দেশে চলিল। তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। কক্ষে আলোক ছিল না, যেমন সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে, অমনই কাহার সহিত ধাক্কা লাগিয়া গেল। জ্যাক চকিত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" অপর ব্যক্তি উত্তর দিল না। সে বাহিরের দিকে চলিয়া গেল,

লোকটি ফটকের নিকট আসিতে বাহিরের ক্ষীণ আলোকে জ্যাক দেখিল, সে আর কেহই নহে, তাহার পুরাতন বন্ধু ফেলিসার।

জ্যাক ডাকিল, "ফেলিসার—"

কেহ উত্তর দিল না। জ্যাক ফিরিয়া দেখিল, অদূরে দাঁড়াইয়া ক্লারিসা। পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে তখন একটা ক্ষীণ আলোকরশ্মি আসিয়া পড়িয়াছিল—সেই ক্ষীণ আলোকে জ্যাক স্পষ্ট লক্ষ্য করিল, ক্লারিসা দাঁড়াইয়া একখানা পত্রপাঠ করিতেছে। তাহার মুখে কি উত্তেজনা! জ্যাকের মনে পড়িল, নার্ভের কথা! কারখানায় সেই দিনই সে শুনিয়াছিল, জুয়াখেলায় নার্ভে বিস্তর অর্থ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, আর তাহার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার শক্তি বা উপায় নাই। বোধ হয় এ পত্রে ক্লারিসাকে নার্ভে সেই সংবাদই জানাইয়াছে।

ভিতর কক্ষে মঞ্জিন ও জেনেদা বসিয়া সান্ধ্য অবসরটুকু নানা কথায় গল্পে আরও উপভোগ্য করিয়া লইয়াছিল। কন্যার জন্ম সার্টিফিকেট আনিবার জন্য রুডিক সেদিন সহরে গিয়াছিল—পরদিন ফিরিবে। কাজেই এমন সুন্দর সঙ্কোচহীন অবসরটুকু নবীন প্রণয়ীযুগলের পক্ষে নিতান্তই অনায়াসলভ্য হইয়া উঠিয়াছিল। মঞ্জিন বসিয়া গল্প করিতেছিল, গোধূম, কয়লা, নীল, কডলিভার প্রভৃতি আমদানী রপ্তানীর মাশুলের হারই ছিল প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। কথাগুলা, জেনেদা ভাল না বুঝিলেও, তাহার সুনিবিড় মনঃসংযোগলাভে বঞ্চিত ছিল না।

ইহার কারণ আর কিছু নহে। সেই দুজের দুর্মদান্ শক্তি, প্রেম—সেই দুশ্চতুর কুহকীর সুমোহন কুহকের ফাঁদে যে ধরা দিয়াছে, সেই জানে প্রেমের নিকট সকল শক্তি সকল তেজ কিরূপ অভিভূত হইয়া পড়ে! স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া কেমন করিয়া লোক প্রেমের পায় সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া বসে, তাহা বিশ্বের ইতিহাসে যুগযুগান্তর হইতে অমর অক্ষরে ক্ষোদিত হইয়া আসিতেছে! এই তুচ্ছ গল্পও তাই আজ জেনেদার নিকট এত তৃপ্তিদায়ক।

এমন সময় জ্যাক আসিয়া দেখা দিল। ক্লারিসাও তৎপশ্চাতে আসিয়া কহিল, "বেশী বেরি করে কাজ কি মঞ্জিন? নটা বাজে, আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাড়ী যাও। মেঘ করে আসছে। ঝড় বৃষ্টি হয় যদি!"

জ্যাক স্থিরদৃষ্টিতে ক্লারিসার দিকে চাহিল, মনে মনে ভাবিল, 'হায়! দুর্ভাগিনী নারী।'

রাত্রে ভোজনান্তে মঞ্জিন বিদায় লইলে ক্লারিসা কহিল, "তোমরা শুয়ে পড়—বেশী রাত্রি জাগা ঠিক নয়, জেনেদা, অসুখ হতে পারে! জ্যাক সারাদিন খাটে খোটে, রাত্রে তাড়াতাড়ি শুয়ে একটু ঘুমোও—না হলে শরীর থাকবে কেন?"

তাহাদিগকে বিদায় করিতে পারিলে ক্লারিসা যেন বাঁচে—এই ভাবখানা ক্লারিসার কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে জ্যাক লক্ষ্য করিল। সে ভাবিল, এ অধীরতার অর্থ কি?

জেনেদা বসিয়া মঞ্জিনের কথা ভাবিতেছিল। সে এখন কতদূর গিয়াছে? বোধ হয়, নদীর তীরে নৌকায় সন্ধান করিতেছে—ঐ মঞ্জিন নৌকায় উঠিতেছে! নাচিয়া নাচিয়া নৌকা তীর ছাড়িয়া চলিল। মঞ্জিন কি

ভাবিতেছে, এখন? বোধ হয় জেনেদারই কথা,—জেনেদার এত প্রেম, এত ভালবাসা! —জেনেদা কি মজিনের সমস্ত হৃদয়খানি এতদিনে জুড়িয়া বসে নাই? কে জানে? কেন বসিবে না? জেনেদার হৃদয়ে ত, এখন আর কোন চিন্তা নাই—সে শুধু মজিনের কথাই ভাবে! স্বপনে স্বপনে মজিন ও জেনেদার সমস্ত হৃদয়টুকু অধিকার করিয়া বসিয়া আছে! তবে, জেনেদা কেন মজিনের হৃদয়ে এমন স্থানটি করিয়া লইতে পারিবে না! সে রূপহীনা? ছাই রূপ! এত প্রেম—তাহার পার্শ্বে রূপ,—সে ত অতি তুচ্ছ! জেনেদা আবার ভাবিল, কত রাত্রি হইয়া গিয়াছে—বাহিরে কনকনে শীত! এ শীতে তাহার না জানি কত কষ্ট হইতেছে! ঘড়িতে দশটা বাজিল।

ক্লারিসা ডাকিল "জেনেদা এস শুইগে আমরা।"

জ্যাক অভ্যাসমত সদরদ্বার বন্ধ করিবার জন্য উঠিলে ক্লারিসা ব্যস্তভাবে তাহাকে নিবারণ করিল, কহিল, "দোর আমি নিজে বন্ধ করে এসেছি। সব ঠিক আছে—কোন ভয় নাই—চল উপরে চল—শুইগে সকলে।"

জেনেদা তখনও মজিনের চিন্তায় বিভোর ছিল, জ্যাককে কহিল, "মজিনকে কেমন দেখলে জ্যাক? বেশ সুপুরুষ না? চাঁদের মাণ্ডল কত পড়ে, মনে আছে তোমার? শুনলে ত সব?"

মাদাম রুডিক পরুষকণ্ঠে কহিল, "জেনেদা শোবে? না এমনভাবে পাগলামি করবে বসে?" ঈষৎ লজ্জিত হইয়া জেনেদা উঠিল। ক্লারিসা কহিল, "ওঃ, এমন ঘুম পেয়েছে আমার, যে মাথাটা অবধি ধরে উঠেছে!"

জেনেদা আপনার কক্ষে আসিল। জ্যাক ভাবিল, পরামর্শ করিবার উপযুক্ত অবসর, ইহাই! দিনের বেলা সময় অল্প, যেটুকু বা পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে পরামর্শ করা যায় না—বন্ধুবান্ধবের ভিড়ে সুবিধা হইয়া উঠে না। জ্যাকও জেনেদার কক্ষে আসিল। টেবিলের উপর অজস্র উপহার সম্ভার ছড়ানো রহিয়াছে। ফটো, স্বর্ণনির্ম্মিত কাঁটা-চামচ, চাদানি, সুগন্ধসার, রঙ্গীন ও চিত্রবিচিত্র করা চিঠির কাগজ, ইয়ারিং, অঙ্গুরীয়, ঘড়ি, ব্রেসলেট, কড়ির খেলানা, কত রকমের অসংখ্য সামগ্রী! জ্যাক আসিয়া টেবিলের পার্শ্বে দাঁড়াইল।

জেনেদা কহিল, "কি? সব দেখছ জ্যাক? এ'ত বাইরের যা আছে—যা তুলে রেখেছি তা'ও তোমায় দেখাচ্ছি! দেখ।"

জেনেদা তখন আলমারি খুলিয়া পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি দেখাইতে লাগিল। এই বহুমূল্য সূক্ষ্মবস্ত্রের পোষাক, তাহার সুরসম্পর্কীয়া মাতুলানী উপহার পাঠাইয়াছে—এই 'ট্রসো' তাহার সখী লেলির স্বহস্ত রচিত প্রীতি-উপহার! এই স্বর্ণহার তাহার পিতার আশীর্ব্বাদী!

পরে একটি ক্যাস বাক্স বাহির করিয়া জ্যাকের সম্মুখে জেনেদা তাহা খুলিল, ভিতরে স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রার চারি হাজার দুই শত টাকা—ইহাই তাহার যৌতুক! এ যৌতুক মজিনকে উপহার না দিতে পারিলে তাহার শান্তি জেনেদার স্থান হইত না! জেনেদা কহিল, "এই আমার বিয়ের যৌতুক! আমার সর্ব্বস্ব—আমার পুণ্য! এর সাহায্যেই

মন্ত্রিমকে পেয়েছি! নগদ চার হাজার ৫'শ টাকা। বাবা আমাকে একেবারে বড়লোক করে দিচ্ছেন—এ যৌতুকের কথা মনে হলে আমার কি আহ্লাদ হয়—"

এমন সময় দ্বারে করাঘাত হইল। বাহির হইতে কে কহিল, "ভেনেসা, ছেলেটাকে কি ঘুমোতে দেবেনা তুমি? এ কি বুদ্ধি হচ্ছে তোমার! দিনের বেলা কথাবার্ত্তা হয় না কি?"

এ স্বর ক্লারিসার—কিন্তু ঈষৎ কম্পিত। ক্লারিসা কক্ষে প্রবেশ করিল।

লজ্জিত হইয়া ভেনেসা জ্যাককে বিদায় দিল। জ্যাকও শয্যায় আশ্রয় লইল।

ইহার কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সমস্ত গৃহ নীরব হইল। বাহিরে তখন মৃদু তুষারবর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। এই রাত্রের নিস্তব্ধতার মধ্যে অন্য গৃহগুলির মত রুডিক-গৃহও নিদ্রায় আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। কিন্তু বাহিরের ছদ্মাবরণে মানুষ যেমন আত্মগোপন করিয়া অপরকে প্রতারণা করে, গৃহও সেইরূপ প্রতারণা করিতে পারে! রুডিকগৃহ অন্যান্য গৃহগুলির মত রুদ্ধদ্বার ও রুদ্ধ বাতায়ন লইয়া বাহির হইতে নিদ্রাতুরের মত বোধ হইলেও আজ সে আপনার বক্ষে এক দারুণ শোচনীয় ও মর্ম্মভেদী নাটকের অভিনয় প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিল!

নিম্নতলে এক আলোকহীন ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া দুইজনে মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিল। সম্মুখস্থ চিমনির প্রজ্বলিত কয়লা-স্তূপ হইতে অস্পষ্ট আলোক বিচ্ছুরিত হইতেছিল—সেই আলোকে বেশ বুঝা যায়, একজন পুরুষ, অপরটি নারী।

নারীর কণ্ঠোচ্চারিত একাধিকবার রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল। নারী দাঁড়াইয়াছিল,—পুরুষ তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া তাহার হাত আপনার হাতে ধরিয়াছিল।

পুরুষ বলিতেছিল, "তোমায় মিনতি করছি,—যদি আমায় ভালবাস তুমি—এক বিন্দু ভালবাস—"

মিনতি! কি চাহে সে? ক্লারিসার দিবার আর আছেই বা কি? সে ত তাহার সর্ব্বস্বই নার্ভের হাতে তুলিয়া দিয়াছে! কিছুই রাখে নাই! সে ত তাহারই—কায়মনোবাক্যে নার্ভের! একটি জিনিস সে শুধু ত্যাগ করিতে পারে নাই, সে তাহার স্বামীর গৃহ! সে আশ্রয়টুকু ছাড়িতে তাহাকে বলিও না, নার্ভে। কোথা রুডিক—আহা, সে কি অপরাধ করিয়াছে?

নার্ভে সেদিন সন্ধ্যার সময় পত্র পাঠাইয়াছিল, "দ্বার যেন বন্ধ না থাকে, আজ রাত্রে আমি যাইব—বিশেষ প্রয়োজন আছে।" সে জানিত, রুডিক সে রাত্রে গৃহে থাকিবে না।

ক্লারিসা শুধু দ্বার খুলিয়া রাখিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল না। গৃহের পরিজনবর্গকে ঘুম পাড়াইয়া অবধি রাখিয়াছে সে! সকলে নিদ্রা গেলে ক্লারিসা আপনাকে সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত করিল। যে পরিচ্ছদটি নার্ভের চক্ষে শোভন দেখায়, সেইটি পরিল। যেমন করিয়া কেশবিন্যাস করিলে নার্ভের ভাল লাগিবে তেমনভাবেই কেশবিন্যাস করিল। কোথাও কোন ত্রুটি নাই! আজ সে নিতান্ত নির্লজ্জা হইয়া নায়িকার মত বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া নার্ভের সম্মুখে আসিয়াছে!

নাস্তে আবার কহিল, "এত করে মিনতি কচ্ছি, ক্লারিসা তবু তোমার দয়া হচ্ছে না? শোন ক্লারিসা—শুধু দুদিনের জন্য। সাড়ে তিন হাজার টাকার দরকার আমার। ছ হাজার দেনা আছে, সেইটে শুধে ফেলব—তার পর বাকীটা দিয়ে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করব—এই শেষ! দু-বার বাজি খেললেই একেবারে সব ফিরে পাব।"

ক্লারিসার প্রাণ শিহরিয়া উঠিতেছিল,—সে নাস্তের হাত ছাড়াইয়া প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, না, নাস্তে—এ আমি পারব না।"

নাস্তে কহিল, "কিছুতে পারবে না? আমার সর্ব্বনাশ হয়ে যায় যে ক্লারিসা—"

"না—ও হবে না। অন্য উপায় কিছু ঠিক করা যাক বরং।"

"আর কোন উপায় দেখছিনে আমি!"

"শোন। সাতুর্ত্রার আমার এক বন্ধু আছে—বেশ বড়লোকের মেয়ে সে! স্কুলে আমরা এক সঙ্গে পড়তুম। আমি তাকে লিখছি আমার দরকার বলে,—সাড়ে তিন হাজার টাকা এখনই ধার চাই—"

নাস্তে কহিল, "অসম্ভব—এ হতেই পারে না—কাল আমার টাকা চাইই—"

ক্লারিসা কহিল, "তবে বরং ম্যানেজারের সঙ্গে তুমি দেখা কর। তোমায় ভালবাসেন তিনি—সাহায্য করতে পারেন—"

"ম্যানেজার? ম্যানেজার একথা জানতে পারলে সেই দণ্ডেই আমার চাকরিটুকু শেষ করে দেবে। এইটুকু আশা হবে! আর আমি যা বলছি, তা কত সহজ, বল দেখি। কেউ জানতেও পারবে না। দুদিন পরে আমি নিশ্চয় টাকা দিয়ে যাব। তার অন্যথা কোনমতে হবে না।"

"তুমি বল কি নাস্তে—দুদিন পরে তুমি যে—"

"হাঁ—টাকা শোধই। এর নড়চড় হবে না—এ আমি শপথ করে বলতে পারি।"

ক্লারিসা কোন কথা বলিল না—দুই হাতে সে আপনার বুক চাপিয়া ধরিল। তাহার বুকের মধ্যে একটা ঝড় বহিতেছিল—সে ঝড়ে তাহার চেতনা লোপ পাইবার উপক্রম করিয়াছিল।

নার্ভে কহিল, "আমি গর্দ্দভ, তাই তোমার কাছে এত ভূমিকা করতে এসেছিলুম! তোমায় না বলে, নিজেই টাকাটা দ্বি বার করে নিয়ে যেতুম, তাহলে আর এত গোল হত না—"

ক্লারিসা নার্ভের হাত ধরিল, অশ্রুরুদ্ধ স্বরে কহিল, "কিন্তু তুমি জান না, নার্ভে, জেনেরা নিজে এখন তার বাক্স খুলে চোরাই টাকা নাড়াচেড়া করছে—একে তাকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, কতবার করে গণে রাখছে—আজ রাত্রেই ত জ্যাককে সে বাক্স দেখাচ্ছিল—"

"তাই নাকি? জ্যাককে দেখাচ্ছিল?"

"হাঁ। আহ্লাদে একেবারে সে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। সে মরে যাবে—একাও বাঁচবে না। তাছাড়া চাবি সে কোথায় রাখে, আমি জানি না।"

কথার বাহুল্যে ক্লারিসার যুক্তিগুলা ক্রমশই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল, ইহা সে নিজেও বুঝিতেছিল। ক্রমে সে স্থির হইল। দুঃখ আরও ছিল ইহাই যে, ক্লারিসা নার্ভেকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল। এই বাক্-যুদ্ধের অন্তরালে উভয়ের অধরে অধরে নয়নে নয়নে যে ইঙ্গিত চলিতেছিল, তাহা রোধ করিবার শক্তি ক্লারিসার ছিল না!

"তবে আমার আর কোন আশা নাই! কোন উপায় নাই।" বলিয়া নার্ভে অবোধ শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিল।

ক্লারিসার চিত্তে করুণার বান ডাকিল। উপায় কি? উপায় কি? কি করিবে সে? কেমন করিয়া নার্ভেকে এ বিপদে সে রক্ষা করিবে! দুর্ব্বলা নারী সে—তাহার কি শক্তি আছে? সে মাটির উপর বসিয়া পড়িল।

চোখের জল মুছিয়া নার্ভে কহিল, "তা হলে তুমি সাহায্য করতে পারবে না। বেশ! আমি জানি আমার এখন এক পথ আছে—তবে বিদায় ক্লারিসা—এক উপায় আছে, দেখি—"

"কি সে উপায়?"

"হুঁ! এ কলঙ্কের বোঝা নিয়ে লোকের সামনে মুখ দেখাবে—নার্ভে তা পারবে না!"

নার্ভে ভাবিল, এবার ক্লারিসাকে বিচলিত করিয়াছে সে—এবার—। কিন্তু ক্লারিসা তেমনই অটল স্থির রহিল। সে শুধু মুহূর্ত্তের জন্য।

পর মুহূর্ত্তেই ক্লারিসা নার্ভের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "তুমি আত্মহত্যা করবে? বেশ, আমারও এখন সেই পথ! এ জীবনে আমার আর সাধ নাই! এই কলঙ্ক, এই মিথ্যা, এই পাপ, এই গোপনতা আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে! আর না—আমিও এ সমস্ত শেষ করে দিতে চাই।" ক্লারিসা ফোঁপাইতেছিল।

নার্ভে ক্লারিসার হাত ধরিল, কহিল, "সে কি? তুমি আত্মহত্যা করবে! কি ভয়ঙ্কর! এ দুর্ব্বুদ্ধি হঠাৎ তোমার মাথায় উঠল কেন? না, ক্লারিসা—তুমি আত্মহত্যা করতে পাবে না।"

নারীর দুর্ব্বলচিত্ত সহসা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া নার্ভের পক্ষে আত্মসম্বরণ

করা শুরু হইয়া পড়িল। একটা পাপ বাসনা তাহার মস্তিষ্ককে চূর্ণ করিবার উপক্রম করিতেছিল।

"অসম্ভব!" বলিয়া নার্ভে সিঁড়ির দিকে চলিল।

ক্লারিসা তৎক্ষণেই ছুটিয়া তাহার সম্মুখীন হইয়া বলিল, "কোথায় যাচ্ছ, তুমি?"

"যেখানেই যাই, বাধা দিওনা, ক্লারিসা, টাকা আমার চাইই!"

ক্লারিসা সজোরে নার্ভের হাত ধরিয়া কহিল, "না—না—আমার কথা রাখ,—"

কি এক উন্মাদনা তখন নার্ভেকে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল। সে ক্লারিসার হাত ছাড়াইয়া লইল।

ক্লারিসা কহিল, "সাবধান নার্ভে—তুমি যদি আর এক পা উপরে ওঠ, তাহলে এখনই আমি চীৎকার করে সকলকে জাগাব।"

"জাগাবে? জাগাও তুমি। সকলে স্পষ্ট আজ জাগুক, তোমার দেবর নার্ভে তোমার প্রণয়ী—আর সেই প্রণয়ী চোর, চুরি করতে এসেছে।"

কথাগুলা নার্ভে ক্লারিসার কাণে কাণে কহিল। উভয়ে এতক্ষণ মৃদু স্বরেই কথা কহিতেছিল—পাছে কাহারও নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, সে বিষয়ে উভয়েই সতর্ক ছিল।

চিমনির আলো নিভিয়া আসিতেছিল—সেই উজ্জ্বল রক্তিম আলোকে আজ নার্ভের প্রকৃত মূর্ত্তি সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া ক্লারিসার চোখে ধরা পড়িয়াছে! এই দুর্বৃত্ত দস্যুর জন্য ক্লারিসা ইহজগতের সমস্ত ধর্ম্ম, পুণ্য, স্বামী সব ত্যাগ করিয়াছে! হায়রে বুদ্ধিহীনা দুর্ভাগিনী,—এই পাপিষ্ঠকে তুই কাহার আসনে বসাইয়াছিলি? রুডিক, বেচারা, সরলহৃদয়, প্রেমানুরক্ত রুডিক—কি বলিয়া ক্লারিসা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে? তাহার মত অভাগিনী কে আছে?

বাহিরে তখন ঝড় উঠিয়াছিল—দুর্যোগ নামিয়াছিল। এ প্রাণের পক্ষে প্রলয়-রাত্রিই উপযুক্ত বটে!

সহসা দারুণ অনুতাপে ক্লারিসার সমগ্র চিত্ত হাহাকার করিয়া উঠিল। সে কি করিয়াছে—কি হারাইয়াছে? নার্ভে যখন সিঁড়ি বহিয়া সতর্কপদে উপরে উঠিতেছিল, চিরপরিচিত গৃহে চোরের মত নিঃশব্দে প্রবেশ করিতেছিল, ক্লারিসা তখন হলঘরের সোফায় ঝটিকাহতা ছিন্না লতার মত লুটাইয়া পড়িল। তাহার চোখ বহিয়া অশ্রুর বন্যা নামিয়া আসিল। বাধা ঠেলিয়া সঙ্কোচ ঠেলিয়া সে প্রাণ ভরিয়া আজ কাঁদিয়া বাঁচিল। পাছে উপরকার পাপ-অভিনয়ের কোন সাড়া তাহার শ্রুতির মূলে লাগিয়া এ ক্রন্দনে বাধা দেয়, অন্তরের এই আকুল অনুতাপকে কালিমা জর্জ্জরিত করে, এই ভয়ে এ দারুণ দুঃখেও দুই হাত দিয়া আপনার শ্রুতিরোধ করিতে ক্লারিসা ভুলিয়া যায় নাই! (ক্রমশঃ)

শ্রীদৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ভারতীয় নাট্যের উপর গ্রীসীয় প্রভাব।

(Sylvain Levi র ফরাসী হইতে)

আমরা ভারতীয় নাট্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে আলোচনা করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছি। নাট্যের প্রথম উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শকুন্তলা পর্য্যন্ত ভারতীয় নাট্য কিরূপে ঠিক ধাপে-ধাপে গড়িয়া উঠিয়াছিল, সাহিত্য-ইতিহাস হইতে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন আমরা প্রাপ্ত হই নাই। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তটি কি অবশ্যম্ভাবী যে ভারতীয় নাট্য আপনা হইতে স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হইয়া উঠে নাই, পরন্তু পার্শ্ববর্ত্তী কোন দেশের পূর্ণপরিণত নাট্য-পাদপ আহরণ করিয়া আনিয়া ভারতভূমিতে রোপণ করা হইয়াছে? প্রাচীনকালে যে সকল জাতি ভারতের সংস্রবে আসিয়াছিল, তন্মধ্যে কেবল গ্রীকজাতিরই একটি নাট্য-সাহিত্য ছিল। অতএব গ্রীস হইতেই কি ভারত নাট্যকলা লাভ করিয়াছে? Mr. Weber যিনি ব্রাহ্মণিক সভ্যতার উপর গ্রীসীয় প্রভাবের নিদর্শন দেখাইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তিনিই তাঁহার "ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস" নামক একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থে, এই প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াছেন।

"আমরা যে সকল ভারতীয় নাট্য-রচনার কথা অবগত আছি তাহারা সকলেই পরিণত রচনা। অবশ্য অধিকাংশ নাটকের প্রস্তাবনায়, উপস্থাপিত নাটকটিকে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের রচনার তুলনায় নূতন রচনা বলা হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের রচনা কিছুই রক্ষিত হয় নাই। অতএব স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে,—বাহ্লিক, পঞ্জাব ও গুজরাটে (কেননা, গ্রীক্ আধিপত্য ঐ সকল প্রদেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল) গ্রীক্ রাজার দরবারে গ্রীক নাট্যের অভিনয় দেখিয়া ভারতবাসীর অনুকরণ-স্পৃহা উদ্বোধিত হইয়াছিল কি না এবং উহাই ভারতীয় নাট্যোৎপত্তির মূলীভূত কারণ কি না? অবশ্য ইহার অনুকূলে কোন প্রমাণ দেওয়া যায় না। তবে ঐতিহাসিক কতকগুলি তথ্য, এই সিদ্ধান্তটি সম্ভব বলিয়া নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাদন করে। আর একটা কথা এই—সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ভারতীয় নাটকগুলি ভারতের পশ্চিম প্রদেশে রচিত হয়। তা ছাড়া, এই দুই জাতির নাট্য-সাহিত্যের মধ্যে কোন আন্তরিক যোগ নাই।" (১)

এই সিদ্ধান্তের কথা এইরূপ সংযতভাবে ব্যক্ত করিয়াও তবু Weber সাহেবের মনে হইয়াছে তিনি যেন এ সম্বন্ধে একটু বেশী একদেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছেন। তাই তাঁহার উত্তরবর্ত্তী গ্রন্থে তাঁহার উক্তির একটু সংশোধন করিয়াছেন। "নিশ্চিত কারণ" এই বাক্যটির পরিবর্ত্তে তিনি এই বাক্যটি বসাইয়াছেন :— "ভারতীয় নাট্য-বিকাশের উপর একটা বিশেষ প্রভাব প্রকটিত হয়।" M. Pischel যিনি বোধ হয় পাশ্চাত্য সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের মধ্যে, ভারতীয় অলঙ্কার ও কাব্যসাহিত্যের

(১) Ind. Lit., 224 এবং টীকা।

সহিত সমধিক পরিচিত—তিনি সংক্ষেপে এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন:—"গ্রীসীয় নাট্য-সাহিত্য,—ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যসংগঠনে একটা বিশেষ প্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছিল,—যে ব্যক্তি এইরূপ কল্পনা করে, সে কি গ্রীক্, কি ভারতীয়—উভয় নাট্য-সাহিত্যসম্বন্ধেই সমান অজ্ঞতার পরিচয় দেয়।"

তাঁহার এই উক্তি যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। এই প্রকার পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিগত অভিরুচির বিনিময়ে জ্ঞানের পরিসর কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় না। M. Windischকে এইজন্য প্রশংসা করিতে হয় যে তিনি এই প্রশ্নটিকে একটি সুনির্দ্দিষ্ট ও সারবান ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন। তিনি গোড়ায় মানিয়া লইয়াছেন যে, ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যের সংগঠনে গ্রীক প্রভাবের হয় ত একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, এবং তাহার পর উভয় নাট্য-সাহিত্যের খুঁটিনাটি তুলনা করিয়া তিনি এই সম্ভাবনাকে বাস্তব বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি তাঁহার সন্দর্ভ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বার্লিনের প্রাচ্যতত্ত্ববেত্তাদিগের বিচার-সভায় পাঠাইয়াছিলেন; ঐ বিচারসভার বিবরণ-পুস্তিকায় সন্দর্ভটি ছাপা হয়। পরে গ্রন্থাকারে পৃথক্‌ভাবেও প্রকাশিত হয়।

অ্যালেকজাণ্ডারের দিগ্‌বিজয়ের পরে, প্রাচ্যভূভাগে যে সকল গ্রীক নাট্যের অভিনয় হইয়াছিল, সেই সকল অভিনয়ের প্রমাণ-স্বরূপ কতকগুলি বচন M. Windisch প্রথমতঃ সংগ্রহ করিলেন; গ্রীস ও ভারত—এই উভয়ের মধ্যে কিরূপ যোগাযোগ ছিল সেই সম্বন্ধে Bohlen, Reinand, Benfrey, Weber প্রভৃতি কর্তৃক যে সকল প্রমাণ লেখা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাও তিনি একত্র করিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, অ্যালেকজাণ্ডারের শিবিরে অনেকগুলি অভিনেতা ছিল, তাহারা অ্যালেকজাণ্ডারের সঙ্গে আসিয়াছিল এবং তাহারা বড় বড় উৎসবে নাট্যাভিনয় করিত। কিন্তু এই সমস্ত প্রমাণ-লেখ্যের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে কিছুই সপ্রমাণ হয় না।

অ্যালেকজাণ্ডার ভারতের কেবল গা ছুঁইয়া গিয়াছিলেন মাত্র। ঐতিহাসিকেরা যে গ্রীক্‌নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, সে উক্তি সুসিয়ানার সম্বন্ধে, পারস্যের সম্বন্ধে, পার্থিয়ার সম্বন্ধে আর্মিনিয়ার সম্বন্ধে,এবং গ্রীসীয় আধিপত্য-কেন্দ্রের অভিমুখী যে সকল প্রদেশ, সেই সকল প্রদেশ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু বিনা প্রমাণেও একথা স্বীকার করা যাইতে পারে যে, বাক্ট্রিয়ানার গ্রীক্ রাজারা তাঁহাদের রাজদরবারে একটি গ্রীকনাট্য-সম্প্রদায়কে পোষণ করিতেন। কিন্তু ভারতীয় নাটকের আবির্ভাবের সহিত এই সকল নাট্যাভিনয়ের সম্বন্ধ কিরূপ নিরূপিত হইতে পারে তাহাই বিবেচ্য। ডেমেট্রিয়স ও মিনান্দরের ক্ষণস্থায়ী ভারত বিজয়ের কথা ছাড়িয়া দাও —সিন্ধুনদের অপরপারে যে গ্রীক্ আধিপত্য স্থায়িভাবে স্থাপিত হইয়াছিল তাহা খৃষ্টীয় যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই ভারত হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হয়; পাঁচ কিম্বা ছয় সাত বৎসর আরও পরে, কালিদাস স্বকীয় গ্রন্থাদি রচনা করেন। ইহা কি স্বীকার করিতে হইবে যে, এই দীর্ঘকাল ধরিয়া,ব্রাহ্মণ্যিক কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে

গ্রীক্ আদর্শের অনুশীলন চলিয়া আসিয়াছে? এই অনুমানটি বিনা তর্কে স্বতই খণ্ডিত হইয়া যায়।

তবে কি এইরূপ অনুমান করিতে হইবে যে ৭০০ বৎসরের নাট্য-সাহিত্য, কোন চিহ্ন না রাখিয়াই একেবারে অন্তর্হিত হইল? উৎকৃষ্ট রচনা আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে, একটা নাট্যকলা যে ধীরে ধীরে বিকসিত হইতেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। একথা যদি সত্য হয় যে গ্রীক্ নাট্যাভিনয় দেখিবার পূর্ব্বে ভারত, নাট্যকলা সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিল,—তাহা হইলে ভারত অবশ্য নিজ রুচির উপযোগী করিয়া লইবার পূর্ব্বে, বিদেশীয় আদর্শের নকল করিয়া নাট্যকলার অনুশীলন আরম্ভ করে এইরূপ অনুমান করিতে হইবে। সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে, বিদেশীয় সাহিত্য হইতে ধার করিবার সময়, গোড়ায় দাসবৎ অনুকরণ আরম্ভ হয় এবং এই অনুকরণ হইতে যে সাহিত্য প্রসূত হয় তাহাতে বরাবর একটা কৃত্রিমভাব, একটা 'টুলো-পণ্ডিতী' ভাব থাকিয়া যায়, এবং তাহার ফলে ঐ সাহিত্যের বিকাশ আড়ষ্ট হইয়া পড়ে—স্থগিত হইয়া যায়। ভাল পরিপাক না হওয়ায়, রক্তের সঙ্গে মিশিয়া না যাওয়ায়, উহার উৎপাদনীশক্তি চলিয়া যায়—উহা নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং অবশেষে ধ্বংসমুখে পতিত হয়। গ্রীক্‌নাট্য, ভারত-সাহিত্যে-মধ্যে অবিকল উঠাইয়া আনিলেও কখনই ভারতীয় নাট্যে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। যদি গ্রীক্ আদর্শ, ভারতীয় কবিদিগকে কেবল অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে, যদি জীবন্ত ভারতীয় নাট্যকলার উপর একটা প্রভাব মাত্র প্রকটিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই প্রভাবের সীমা কিরূপে নির্দ্ধারিত হইবে? ছয় বা সাত শতাব্দীব্যাপী ক্রমবিকাশের পর শেষ পত্রাঙ্কচিহ্নগুলি কিরূপে যথাযথরূপে নির্ণয় করা যাইবে?

এ কথা সত্য, Windisch একটা অপ্রচলিত কালগণনার পদ্ধতিকে ভিত্তি করিয়া উপরি-উক্ত কাল-ব্যবধানকে আরও খর্ব্ব করিয়া আনিয়াছেন:—"ভবভূতি খৃষ্টপূর্ব্ব ৭০০ শতাব্দীতে, শ্রীহর্ষ ৬০০ শতাব্দীতে, কালিদাস আরও নিকটবর্ত্তী শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; নাটকের মধ্যে মৃচ্ছকটিক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।" আপেক্ষিক কালগণনার দ্বারা সমর্থিত এই অস্পষ্ট উক্তিগুলিতে প্রকৃত কাল নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হওয়া দূরে থাকুক, গবেষণার কার্য্য আরও বিপথে যাইবারই সম্ভাবনা। কালিদাস ও শূদ্রকের নাম, এইরূপ কুয়াসার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া, কোন্ একটা অনির্দ্দিষ্ট সুদূরবর্ত্তী কালে মিশিয়া গিয়াছে। M. Windisch ভবভূতিকে ছাড়াইয়া আর অধিক দূর অগ্রসর হন নাই; তিনি অবশিষ্ট ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যকে একেবারেই আমলে আনেন নাই। সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক রচনাগুলিই তিনি ধরিয়াছেন; কোন্‌টি কবির ব্যক্তিগত উদ্ভাবনা ও কোন্‌টি গতানুগতিক সাধারণ রচনামাত্র—তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করিবার জন্য উভয়ের মধ্যে যে তুলনা অপরিহার্য্য, এইরূপে তিনি সেই তুলনা হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। ইহার ফলে নিত্যের স্থানে আগন্তুককে, নিয়মের স্থানে ব্যতিক্রমকে গ্রহণ করিবার পক্ষে বিলক্ষণ সম্ভাবনা ও আশঙ্কা আছে।

আমরা শুধু পদ্ধতিটির দুর্ব্বলতা নির্দ্দেশ

করিলাম। এক্ষণে ঐ পদ্ধতি-নিঃসৃত সিদ্ধান্তের মূল্য কিরূপ তাহা বিচার করিয়া দেখিব।

M. Windisch স্বীকার করেন যে, এই ভারতীয় নাটকগুলির সহিত এসকাইলস্ ও সফোক্লিসের ট্রাজেডির অনেই সাদৃশ্য আছে। তাই তিনি "নূতন গ্রীক্ কমেডি"র উপরেই তাঁর তুলনার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। "কি রোম, কি উজ্জয়িনী, সর্ব্বত্রই এই নূতন কমেডির প্রতিধ্বনি পৌঁছিতে পারে। কেননা, এই নূতন-কমেডি, মানব জীবনের সচরাচর ব্যাপার লইয়া ব্যাপৃত এবং উহাতে একটা স্থানীয় সুর থাকিলেও উহার মধ্যে এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা বিশ্ব-মানবের সাধারণ সম্পত্তি।"

নিজ পদ্ধতি সমর্থনের জন্য,—প্রাচ্যখণ্ডে গ্রীক্ অভিনয় সম্বন্ধে তিনি প্লুটার্ক হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই সকল বাক্যে তাঁহার সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হয় না। প্রথম উদ্ধৃত বাক্যটি সফক্লিস ও য়ুরিপিডিস সম্বন্ধে, য়ুরিপিডিসের Bacchantes সম্বন্ধে প্রযুজ্য। তাহাতে কমেডির কোন উল্লেখ নাই। M. Windisch যে কমেডিকেই তুলনার ভিত্তি-রূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাহার বিশেষ কোন সার্থকতা দেখা যায় না। গ্রীক্ কমেডিতে বিশ্বমানবের সাধারণ লক্ষণ ও সাধারণ স্বার্থ থাকা সত্ত্বেও, গ্রীক্ কমেডি আথেন্স্ হইতে রোমে স্থানান্তরিত হইবার সময়, অনেকটা রূপান্তরিত হয়। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই গ্রীসীয় সভ্যতা রোমীয় লোকদিগের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। Plautus ও Terrance তাঁহাদের ছায়া-রচনাগুলি (adaption) লোকগ্রাহ্য করিবার জন্য দুইটি নাটক ও দুইটি আখ্যানবস্তু একত্র মিশ্রিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে ইটালি গ্রীসের প্রতিবেশী ও আত্মীয় সেই ইটালির নিকট যদি গ্রীসীয় ভাব ও গ্রীসীয় রীতিনীতি সহজ-বোধ্য না হইল তবে যে ভারত,—কি প্রকৃতি, কি রুচি, কি মতবাদ, কি অনুষ্ঠান—সকল বিষয়েই গ্রীস হইতে এত তফাৎ, সেই ভারতের পক্ষে সেসমস্ত ত আরও দুর্ব্বোধ হইবার কথা। ঐ সকল গ্রীক্ নাটকে যে সামাজিক অবস্থা চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতবাসীর বিচার-বুদ্ধি ও কল্পনা নিশ্চয়ই শিহরিয়া উঠিবে। উহাদের আখ্যানবস্তু, শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপার ও আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উহা ভারতবাসীর কৌতূহল উৎপাদন করিতেও অসমর্থ। অতএব ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, উইনডিস সাহেবের সিদ্ধান্তের পক্ষে কোন অনুমানই অনুকূল নহে। কিন্তু এ কথা সত্য, হৃদয়ের ভাবে রঞ্জিত কোন কথাই বাস্তব তথ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে না। যদি উভয় নাট্য-সাহিত্যের রচনাপদ্ধতি ও পারি-ভাষিক খুঁটিনাটি তুলনা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে কি উহাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সুস্পষ্ট ও অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে? আচ্ছা, ঐরূপ তুলনা করিয়াই দেখা যাক্।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নারিকেল।

অতি অল্প দিনের মধ্যে নারিকেল পাশ্চাত্য জগতে যেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অতি নগণ্য অবস্থা হইতে এই ফল যেরূপ একটী অত্যাবশ্যক পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়োদ্দীপক। শুষ্ক নারিকেল শাঁসের রপ্তানি গত চারি বৎসরে প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। ইহার মূল্য টন প্রতি ১৯ পাউণ্ড হইতে ক্রমে ক্রমে ২৮ পাউণ্ডে উঠিয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নারিকেল বৃক্ষ সমূহের ফলোৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি এবং নারিকেল-জাত-দ্রব্য-নিচয়ের ব্যবহারের পথ সুবিস্তৃত হওয়াতেই যে নারিকেলের এই অভাবনীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে, কোন সন্দেহ নাই।

অনেক দিন হইতেই নারিকেল তৈল সাবান নির্ম্মাণ কার্য্যে একটী অত্যাবশ্যক উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মূল্যের সুলভতা ইহাকে এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী করিয়াছে। অন্যান্য অধিকাংশ তৈলাপেক্ষা ইহা উৎকৃষ্টতর ফেণোৎপাদন করিতে সমর্থ এবং যানাগারের ব্যবহারোপযোগী সৌষিন গাত্রপরিষ্কারকর-সুলভ সুন্দর বিচিত্র বর্ণও ইহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত শুষ্ক নারিকেল বহুল পরিমাণে রন্ধনশালে এবং মিষ্টান্ন প্রস্তুতকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পূর্ব্বে বহুদিন পর্য্যন্ত উপরোক্ত কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়েই নারিকেলের ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। নারিকেলের কতকগুলি বিশেষ দোষ ইহাকে বিস্তৃততর ব্যবহারের অনুপযোগী করিয়াছিল। আহারোপযোগী হইলেও নারিকেল তৈলের তীব্র নারিকেলগন্ধ ঘুচিত না। বিশেষতঃ, নারিকেল শাঁস কতিপয় জীবাণুবিস্তারের একটী উৎকৃষ্ট পরিচালক হওয়ায়, অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইহা দুর্গন্ধবিশিষ্ট হইয়া উঠিত; এবং নির্ম্মাণ-প্রণালী অতি সুকৌশলে নিয়ন্ত্রিত হইলেও জীবাণুসমূহকে পৃথক করা যাইত না।

সময়ক্রমে কতিপয় বিচক্ষণ রসায়নতত্ত্ববিদ্ আবির্ভূত হইয়া নারিকেলদ্রব্যজাতের পূর্ব্বোক্ত অসুবিধা সমূল দূর করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহাদের উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় নারিকেল তৈলের লুপ্তাবশিষ্ট গন্ধ দূরীভূত এবং উহার অম্লোৎপাদনপ্রবণতা নিরাকৃত হইল। ফলে নারিকেল ব্যবহার সহস্র পথে উন্মুক্ত হইয়া গেল। অপেক্ষাকৃত নগণ্য অবস্থায় তমসাচ্ছন্ন গহ্বর হইতে ইহা সহসা সভ্যজগতের তাড়িতালোকিত বিপণিনিচয়ের পণ্যবীথিকার মধ্যে একটী বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়া লইল। অধুনা ইহার ব্যবহার প্রণালী সহস্রবিধ। সাবান নির্ম্মাণকার্য্যে ইহা এখনও পূর্ব্বের ন্যায়ই উপযোগী। নারিকেল শাঁস এখনও শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া ইউরোপ এবং আমেরিকার রন্ধন-শালায় ও মিষ্টান্নবিপণিসমূহের ব্যবহারার্থ বহুল পরিমাণে প্রেরিত হয়। লণ্ডনস্থিত একটী কারখানাতেই দৈনিক অন্যূন সহস্র নারিকেল ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত, বহুতর নূতন বিষয়ে নারিকেল বিশেষরূপ উপযোগী। ঔষধ প্রস্তুত কার্য্যে নানারূপ

মলম ও পমেটম প্রস্তুত করিতে ইহা প্রাণীজাত চর্ব্বির স্থান প্রভূত-পরিমাণে অধিকার করিয়াছে। ক্ষারকাশ ও তৎসদৃশ যোগে ইহা কড্‌লিভার তৈলের ন্যায় ফেন প্রদ, অপচ অধিকতর সুস্বাদু। অন্যান্য বহুবিধ চর্ব্বি অপেক্ষা বহু পরিমাণে ও অল্পায়াসে জলশোষণ করে বলিয়া ইহা মার্গেরিণ নির্ম্মাণে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের এই শেষোক্ত গুণ প্রকাশ পাওয়ার অতি অল্প দিনের মধ্যে, পরীক্ষার ফলে, ইহা হইতে এক প্রকার মাখন প্রস্তুত হইতেছে, যাহা কি গুণে, কি পুষ্টিকারিতায়, গোদুগ্ধোৎপন্ন নবনীত অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। অতি বড় ভোজন-বিলাসীও জীবদেহোৎপন্ন মাখন হইতে ফলজাত এই মাখনের পার্থক্য বুঝিতে সমর্থ হন না। নারিকেলের চর্ব্বি আকারে এবং সাধারণ ধর্ম্মে জীবজাত চর্ব্বির এতই অনুরূপ যে, তাহাদের পার্থক্য অনুভব করা সুকঠিন এবং পাশ্চাত্যদেশের কোন গৃহকর্ত্রীই পিষ্টকনির্ম্মাণে একবার এই নারিকেলোৎপন্ন চর্ব্বির ব্যবহার করিয়া পুনরায় জীবজাত চর্ব্বি ব্যবহার করিতে সম্মত হন না।

নারিকেলের চর্ব্বি বিস্ফোটক, ক্যান্সার অথবা অন্য কোন আশঙ্কাজনক রোগোৎপাদন করে না, এবং বহুদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে। শ্বেতবর্ণ ক্রিম প্রস্তুত কার্য্যেও নারিকেল তৈল ব্যবহৃত হয়। এইরূপে, দৃষ্ট হইবে যে, নারিকেল তৈলের ব্যবহারপ্রণালী বহুবিধ। এমন কি, যখন কারখানায় শুষ্ক নারিকেলশাঁসের সমুদায় ব্যবহার নিঃশেষ করিয়া ইহার সমস্ত সার নিষ্কাশিত করিয়া লওয়া হইয়াছে মনে হয়, তখনও ইহার তাক্তাবশেষ অব্যবহার্য্য হওয়া দূরে থাকুক, গবাদির পুষ্টিকর ও মূল্যবান্ খাদ্যে পরিণত হয়।

নারিকেল তৈলের পারীরিক পুষ্টিকারিতা ইউরোপে আবিষ্কৃত হইতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। আমেরিকাও ইহার গুণ সম্বন্ধে অধিক-দিন অজ্ঞান থাকে নাই। আজ সমস্ত আমেরিকা মহাদেশ ব্যাপিয়া নারিকেল তৈলের ব্যবহার ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে তথায় নারিকেল তৈলের প্রয়োজন এতই অধিক যে, এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কলকারখানা কেবল তিসি, কার্পাস বীজ প্রভৃতি লইয়াই কারবার করিতেছিল, তাহাদিগকে এক প্রকার বাধ্য হইয়াই নারিকেলের শরণ লইতে হইয়াছে।

জার্ম্মানীতেও এই তৈলের ব্যবহার আশ্চর্য্যরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কেবলমাত্র নারিকেল উৎপন্ন মাখনের দৈনিক পরিমাণই ১২০ টনের অধিক এবং নারিকেলের সর্ব্ব সমেত আমদানী বৎসরে এক লক্ষ টন! ফ্রান্সের ন্যায় নারিকেলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমদানীর স্থানেও নারিকেল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে না। ইউরোপের সর্ব্বত্রই নারি-কেলের অভাব অনুভূত হইতেছে। কয়েক বৎসর পরে এ বিষয়ে কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। তবে ইহা আশা করা অসঙ্গত নহে যে নারিকেলের ব্যবহার ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে এবং কালক্রমে, ইহার প্রসার এমন সুবিস্তৃত হইবে যে, সর্ব্ব দেশের নারিকেল-উদ্যান-অধিকারীই তখন আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিবেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই প্রয়োজনীয় বৃক্ষের আদিম উৎপত্তি স্থান এপর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। ইহা দক্ষিণ সাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জ অথবা ভারতীয় উপকূলভাগ হইতে প্রথম রপ্তানী হইয়াছিল বলিয়াই লোকের বিশ্বাস। কিন্তু কোন্ আদি জন্মস্থান হইতে ইহা প্রথম প্রসারলাভ করিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। নারিকেলের নির্ম্মাণকৌশল —উহার আকৃতি, কঠিন ত্বক, অভ্যন্তরে জলপূর্ণ বাহিরাবরণ ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এইরূপ অনুমিত হয় যে, প্রকৃতিদেবী ইহাকে ৬০।৭০ ফুট উচ্চ হইতে পতন-জনিত আঘাত এবং দীর্ঘকালব্যাপী নিমজ্জনঘটিত অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নারিকেল বৃক্ষের আদিম বাসস্থান যেখানেই হউক না কেন, ইহা নিশ্চিত যে, ইহার ফলসমূহ —বৃক্ষশির হইতে স্খলিত হইয়া বালুময় তীর দিয়া গড়াইতে গড়াইতে সমুদ্রজলে পতিত হইত। এবং তরঙ্গভঙ্গে নাচিতে নাচিতে সৈকত-ভূমির যে যে স্থানে নীত হইয়া আশ্রয়লাভ করিয়াছিল, তথায় অঙ্কুরোৎপাদন করিয়াছিল। এইরূপে, কাল ক্রমে, নৈসর্গিক নিয়মে, নারিকেল বৃক্ষ ভূভাগের নানাস্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অবশিষ্ট কার্য্য মানবহস্ত দ্বারা সাধিত হইয়াছে। ফলস্বরূপ, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, নারিকেল বৃক্ষ সমগ্র গ্রীষ্মমণ্ডলের বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান, যবা, সিংহল, বর্ণিয়ো, সিঙ্গাপুর, মানিলা, পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং অন্যান্য নানা প্রদেশই স্ব স্ব অংশ দানে পৃথিবীর পণ্যশালায় নারিকেলের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে।

শ্রীদীনবন্ধু সেন বি, এল।

কৃষকের কাহিনী।

উত্তর এলবামার রেল সেতুর উপর দাঁড়াইয়া একজন লোক নিম্নস্থিত জল প্রবাহ দেখিতেছিল। উষার ক্ষীণালোক তখন চারিদিকের কুয়াশা ভেদ করিয়া দেখা দিয়াছে। তরুণ সূর্য্যের অরুণ আভায় নদীর জল ইস্পাতের ছুরির মত ঝলকিয়া উঠিতেছিল। লোকটার হস্ত দুইটী পশ্চাৎদিকে শক্ত করিয়া বাঁধা; এবং কোমরে বেষ্টিত মোটা দড়িটী সম্মুখে একটী লম্বা বাঁশে আবদ্ধ। একজন সেনাধ্যক্ষের অধীনে দুইজন সৈনিকবেশী ব্যক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সে রেলের লাইনের উপর অসংলগ্নভাবে রক্ষিত কাঠের তক্তার উপর দাঁড়াইয়াছিল। সেতুর অপর পার্শ্বে এই সৈন্যদলের কাপ্তেন মুক্ত তরবারি হস্তে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। রেলসেতুর দুইদিকে প্রথমে ও শেষে বন্দুকহস্তে দুইজন প্রহরী পাহারা দিতেছিল। তাহাদের স্থির ও সোজা ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন দুইটী প্রস্তরমূর্ত্তি সেতুকে পরিশোভিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা জানিত না আজ এই সেতুর মাঝে কি ভীষণ দৃশ্য সংঘটিত হইবে। তাহারা

মনে করিয়াছিল সেতুর পথ রুদ্ধ করিয়া রাখাই তাহাদের কাজ। তাহারা জানিত না এই রক্তার্দ্র উষার সেতুর মাঝে একটী পুণ্য আত্মার উর্দ্ধ অনন্তকালের জন্য অবিচ্ছিন্ন যবনিকা পতিত হইবে!

নদীর দুই ধারে জনহীন ও অন্তর্হীন প্রান্তর পড়িয়া আছে। সেতুরক্ষীরা সেতু অতিক্রম করিয়া সেই জনহীন প্রান্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু প্রান্তরের মধ্যে বক্রগতি অবলম্বন করায় সেতুর উপর দাঁড়াইয়া বেশদূর আর লাইন দেখিতে পাওয়া যায় না; শেষে চক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া যায়। নদীর ধারে একটু উচ্চস্থানে কামানের গোলার দ্বারা ছিদ্রিত কতকগুলি অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠের গুঁড়ি পড়িয়া আছে এবং সেই ছিদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট কামানের মুখ সেতুর দিকে তাকাইয়া আছে। অদূরে নদীতীরে একজন সেনানায়কের অধীনে একদল পদাতিক সৈন্য বন্দুকের উপর ভর দিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। সেনাধ্যক্ষের উন্মুক্ত তরবারি তরুণ সূর্য্যের আলোকে চক্‌চক্ করিয়া উঠিতেছিল। তাহারা আগ্রহে ও ভয়পূর্ণনেত্রে প্রত্যূষমুহূর্ত্তে সেতুর মধ্যবর্ত্তী সৈন্যদের কার্য্য দেখিতেছিল। সেতুর চারিধারে তখন পূর্ণশান্তি বিরাজ করিতেছিল। গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত যেন অবিচলিত। সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতি যেন আজ কোন ভয়ানক রুদ্র অতিথির আগমন প্রতীক্ষায় পাষাণস্তূপের মত ধীরস্থিরভাবে চাহিয়া আছে। মৃত্যু যখন আপনার আগমনকে চারিদিকে বিস্তারিত করিয়া উপস্থিত হয় তখন বুদ্ধিমানেরা এই রুদ্র অতিথিকে প্রেয়সীসঙ্গের মত অত্যন্ত আনন্দের ও স্থিরভাবে সহিত আলিঙ্গন করিয়া লয়। তাই আজ এখানে এত শান্তি ও নীরবতা!

যে মানুষের উপর আজ মৃত্যু যবনিকা পতিত হবে তাহার বয়স ৩২ বৎসর! তাহার মুখের কমনীয়তা, অবিচলিতভাব, প্রশস্ত ললাট, চক্ষের কঠোরদৃষ্টি দেখিয়া বোধ হইতেছিল সে একজন ভদ্রলোক। তাহার কোঁকড়ান চুল সযত্ন যত্নের আদর করিয়া পিঠ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে এবং তাহার পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইতেছিল সে একজন উচ্চশ্রেণীর কৃষক। তাহার স্নেহের, বিনয়ের ও মহত্বের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল কোনরূপ হীন কার্য্য করা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে, সৈন্য দুইজন ধীরে ধীরে সেই ব্যক্তিকে তক্তার একধারে দাঁড় করাইয়া অন্যধারে আসিয়া দাঁড়াইল। আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তাহারা কাপ্তেনের সাঙ্কেতিক আদেশে তক্তা হইতে সরিয়া পড়িবে, এবং মুহূর্ত্ত-মধ্যে হতভাগ্য ব্যক্তি তক্তার সহিত লাফাইয়া উঠিয়া, হস্তপদ আবদ্ধ অবস্থায়, সেতুর মধ্য দিয়া অতল জলস্রোতের মধ্যে তলাইয়া যাইবে। এই সকল দৃশ্য ও আয়োজন তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। সে একবার সেতুর নীচে চাহিয়া দেখিল, উন্মত্ত মৃত্যুস্রোত ফুলিয়া ফাঁপিয়া প্রলয় গর্জ্জনে দূরে এই জলপ্রবাহের উপর প্রবাহিত একটী কাষ্ঠের টুক্‌রার ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে। হায়! আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরে এই কাষ্ঠের মতই প্রাণহীন বাক্যহীন অবস্থায় সে কোন

অজানিত ভাবে কোন্ সীমাহীন, অন্তহীন পারাবারের মধ্যে ভাসিয়া চলিবে কে জানে! এক অব্যক্ত মর্ম্মব্যথা তাহার নির্জ্জাবোন্মুখ হৃদয়ের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য আনিয়া দিল। একবার চক্ষু বন্ধ করায়-মাত্র সে দেখিল তাহার সেই তরুণী পত্নীর গৃহপ্রাঙ্গণ; আর গৃহপ্রাঙ্গণে তাহার স্ত্রীর করুণ মুখচ্ছবি সন্ধ্যাতারকার মতই সুন্দর! তাহার মনে হইতে লাগিল, আজ অনন্ত অন্ধকারে ভাসিতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সে একবার তাহার তরুণীর নিকট ফিরিবার প্রার্থনা করিয়া আসে, এবং চুম্বনদ্বারা তাহার একমাত্র শিশুর ওষ্ঠে, বিদায়ের শেষ ছবি অঙ্কিত করিয়া দেয়! হায়! মূর্খ মানব, সে পর্য্যন্ত না শেষ আশা তোমার সমস্ত ভ্রান্তিকে চূর্ণ করিয়া মায়ের মত অদৃশ্য হইয়া পড়ে সে পর্য্যন্ত কুহকিনী আশাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য কেন ব্যাকুল হইয়া পড়!

এই বিচ্ছেদ বেদনার সহিত সুখ মিলাইয়া আর একটী পক্ষ তাহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিল। কিন্তু সে বুঝিতে পারিতেছিল না, কোথা হইতে এই শব্দ আসিতেছে। একবার মনে হইল দূর নিকটে—তাহার হৃদয়ের মধ্যে, আবার মনে হইল যেন একটা ক্ষীণ শব্দ অনেক দূর হইতে আসিতেছে। ক্রমশ তাহার মনে হইতে লাগিল কে যেন তাহার বুকের উপর হাতুড়ির আঘাত করিয়া হাড়গুলিকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। সে স্থির থাকিতে পারিল না। একবার কাঁদিবার উপক্রম করিল। আবার একটু স্থির হইয়া দেখিল ইহা পকেটে রক্ষিত ঘড়ির টিক্ টিক্ ধ্বনি ব্যতীত কিছুই নয়! তখন নির্ব্বোধ দীনদরিদ্রের মত তাহার মুখে হাসি দেখা দিয়া চিরতরে মিলাইয়া গেল। চক্ষু খুলিয়া আবার সেই উন্মুক্ত জলস্রোত দেখিবা মাত্র বেতসলতার মত তাহার হাড়গুলি কাঁপিয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিল "আজ যদি আমি এই শত্রু এবং এই মৃত্যুর হইতে মুক্ত হইতে পারি, তবে জলযানের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এবং জলমগ্ন অবস্থায় সাঁতার দিয়া ইহাদের বন্দুকের গুলি হইতে নিশ্চয় রক্ষা পাইব, তার পর তীরে উঠিয়া এই শত্রুদের অপরিচিত—আমার কুটীরে অনায়াসে যাইয়া দেখিব আমার স্ত্রী ভালবাসাপূর্ণ করুণনেত্রে আমার জন্য বসিয়া আছে এবং আমার শিশুর হাসির তরঙ্গে গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত!" তাহার এই ভাবের উচ্ছ্বাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই কাপ্তেনের আদেশে সেই দুইটী সৈন্য তরণী হইতে জলমগ্ন হইয়া পড়িল!

(২)

পেটন্ ফার্কার একজন উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্তবংশীয় কৃষক; কৃষক বলিয়া গর্ব্ব আপনার জমাজমা লইয়াই সে ব্যস্ত থাকিত না; দেশের উন্নতির জন্য একজন পুরোপ্রাপ্রকের মত সর্ব্বদা চিন্তা ও উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিত। স্বাধীনপ্রেমিক হইলেও সে যে কেন এখনও আপনার দেশের সৈন্যদলের সহিত যোগদান করিয়া ফেডারেল (federal) সৈন্যদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারে নাই তাহা আজও পর্য্যন্ত কেহ উত্তমরূপে মীমাংসা করিতে

পারে নাই। কিন্তু পরীক্ষাগারে ও শিক্ষার ভালবাসায় অন্ধ একজন যুবকের নিকট ইহার কোন অবিদিত নাই। ফেডারেল সৈন্যগণ তাহাদিগকে হারাইয়া দেশের স্বাধীনতা একপ্রকার বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। এবং যেটুকু অবশিষ্ট আছে নানা উপায় অবলম্বনে তাহা নষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বদেশের উপকারের জন্য দেশের সৈন্যদলের সহিত যোগ দিতে না পারায় ফার্কার দুঃখের আগুনের মত জ্বলিতেছিল। সংস্থ বন্ধন ছিন্ন করিয়া সৈনিকের মুক্ত জীবনযাপনের জন্য সে এখনও লালায়িত! আত্মসুখ নষ্ট না করিয়া স্বদেশের জন্য সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ ও ক্ষতি কার্য্য পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিতে এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃসাহসিক কার্য্যে ঝাঁপ দিতেও প্রস্তুত ছিল।

একদিন সন্ধ্যাকালে তরুচ্ছায়াতলে একটী স্তম্ভ হেলিয়া বসিয়া, ফার্কার ও তাহার স্ত্রী গল্পে নিমগ্ন ছিলেন, এমন সময়ে এক তৃষ্ণার্ত্ত অশ্বারোহী সৈনিক তাহার নিকটে আসিয়া জল প্রার্থনা করিল। মিসেস ফার্কার জল আনিবার জন্য গৃহের মধ্যে চলিয়া গেলে, ফার্কার উহাকে নির্জ্জনে যুদ্ধের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল, তখন সে বলিল "ফেডারেল সৈন্যগণ এই দেশে প্রবেশ করিয়া আইলক্রীক সেতু পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; এখন তাহারা রেল লাইন মেরামত করিতে ব্যস্ত। তাহাদের সেনানায়ক ঘোষণা করিয়াছেন যদি কেহ সেতুর উপর, রেলওয়ের বা রেলগাড়ীর নিকট আসিয়া এই মেরামত কার্য্যে বাধা প্রদান করে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিনাবিচারে ফাঁসি দেওয়া হইবে। আমি নিজ চক্ষে এই ঘোষণা পত্র দেখিয়া আসিয়াছি।"

সে জিজ্ঞাসা করিল "এখান হইতে আউ-ক্রীকসেতু কত দূর?"

"প্রায় ৩০ মাইল।"

সেতুর পার্শ্বে এখনও কি বিপক্ষ সৈন্যেরা পাহারা দিতেছে?"

"হাঁ, একটী ক্ষুদ্র সেনাদলে এবং সেতুর উপর কয়েকটী সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত আছে।"

তারপর সে একটু হাসিয়া নির্জ্জনে সৈনিককে কহিল "মনে কর আমার মতন একজন সাধারণ কৃষক যদি ঐ ক্ষুদ্র সেনাদলটী পার হইয়া এবং প্রহরীদের চক্ষে ধূলা দিয়া আইলক্রীক্ সেতুর মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে দেশের জন্য কি মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে?"

একটু চিন্তার পর সৈনিক ফার্কারের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া গোপনে কহিল, "আমি দুই মাস পূর্ব্বে সেই সেতুর নিকট ছিলাম এবং দেখিয়াছি সেতুটী সম্পূর্ণরূপে কাঠ দ্বারা প্রস্তুত, গত বৎসরের জলপ্লাবনে অনেক শুষ্ক কাঠের স্তূপ ভাসিয়া আসিয়া সেতুর দুই পার্শ্বে সমবেত হইয়াছে। সাহস করিয়া এই শুষ্ক কাঠে আগুন দিতে পারিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত সেতুটী ভস্মে পরিণত হইয়া শত্রু আগমনের পথ রুদ্ধ করিয়া দিবে।" এমন সময়ে মিসেস ফার্কার জল লইয়া উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল এবং জলপান শেষ হইলে মিসেস ফার্কারকে ধন্যবাদ দিয়া সৈনিক বিদায় গ্রহণ করিল। বলা বাহুল্য এই দুঃসাহসী অশ্বারোহী বিপক্ষ ফেডারেল সৈন্যদের গুপ্তচর।

(৩)

অজ্ঞান ও মৃত অবস্থায় সেই সেতুর নিম্নে কার্তার ভীষণ জলস্রোতের উপর পড়িয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে তাহার একটু জ্ঞান হইল। কত যুগ যুগান্তর পরে যেন আজ তাহার ঘোর-নিদ্রা কাটিয়া গিয়াছে; কত কাল পরে যেন আজ সুখদুঃখ বর্জ্জিত অন্ধকার ও আলোকের সম্মিলন স্থানে এক নব জগতের মায়ার মধ্যে চির নিমজ্জিত হইয়া আছে।

সে সমস্ত দেহে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিল এবং বেদনায় কাতর হইয়া মধ্যে মধ্যে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল আজ যেন কে দেহের মধ্যে তরল অনলপ্রবাহ ঢালিয়া দিয়া তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে রক্তবর্ণ লৌহ শলাকার মত উত্তপ্ত ও জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছে। বহির্জগতে সুখ দুঃখ, আনন্দ আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবের কথা, কি এক অপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক মায়াবলে তাহার মন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে এই অন্ধকার জলপ্রবাহের মধ্যে তরুণ সূর্য্যের আলোকচ্ছটা পুরাতন জগৎকে মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চক্ষুর সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিল। তখন সহসা তাহার সেই সেতুর মধ্য দিয়া অজ্ঞান অবস্থায় জল পতনের কথা মনে পড়িল এখনও সেই মোটা দড়ি দ্বারা তাহার হাত দুগলা সম্পূর্ণরূপে বাঁধা।

বেদনাকাতর কার্তার আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ক্রমে তরুণ সূর্য্যের আলোকচ্ছটা ক্ষীণ হইয়া আসিল। কত যেন বেলাভূমের মধ্য দিয়া, কত নদী পর্ব্বত মাঠ অতিক্রম করিয়া যে আলোক তাহাকে বন্ধুরূপে দেখা দিয়াছিল তাহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমে চিরতরে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

একটু জ্ঞান হইলে সে দেখিল যে, সে তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু তাহার হাত বাঁধা। এতক্ষণ সে হস্ত চালনা না করিয়া কেবলমাত্র স্রোতের মুখে ভাসিয়া আসিয়াছে। এখন হস্তকে মুক্ত না করিলে আর চলে না; তাহার সমস্ত দেহ অবসন্নপ্রায়। সে জলের মধ্যে প্রাণপণ করিয়া বাহুদ্বয়ের মত সমস্ত শক্তি দ্বারা ঝাঁক মারিল। আজ এই জলের মাঝখানে কে তাহাকে এত সাহস, এত অদম্য শক্তি দিয়াছে? মুহূর্ত্ত মধ্যে হাতের দড়ি ছিঁড়িয়া গেল। তার পর মুক্তহস্ত দ্বারা গলার দড়ি খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবামাত্র জল সর্পের মত কাঁপতে কাঁপিতে সেই দড়ি অতল জলে ডুবিয়া গেল। বেদনায় কাতর হইয়াও সে উৎসাহের সহিত তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। সম্মুখে বনের মধ্যে অসংখ্য গাছের শ্রেণী, গাছের প্রত্যেক পাতা, ডাল বায়ু হিল্লোলে কম্পমান; বড় বড় প্রাকৃতিক ডাল বিস্তীর্ণ করিয়া আহারের আশায় বসিয়া আছে। শিলাময়তীরের উপর তরুণ সূর্য্যের আলোক প্রতিফলিত হইয়া নানা বর্ণ বিকীর্ণ হইতেছে। বড় বড় জলকাকের শুশুংখান পাখীর সঙ্গীতের সহিত মিলিয়া এক অপূর্ব্ব বিশ্ব সঙ্গীত সৃষ্টি করিতেছে। মধ্যে মধ্যে নানাবর্ণে চিত্রিত প্রজাপতির শ্রেণী তাহার চক্ষের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। এই সকল দৃশ্য দেখিয়া সন্তরণের জন্য সমস্ত শরীর

তার তাহার মন হইতে দূরীভূত হইয়া গেল। কিন্তু অন্য দিকে চোখ ফিরাইবামাত্র সেই তরুর সেতু সে পুনরায় দেখিতে পাইল। সেই সৈন্যেরা নগ্ন আকাশের গায় প্রস্তর মূর্ত্তির মত তেমনি ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া তাহারা গুলি করিতে উদ্যত হইল। তাহাদের দ্রুতপদবিক্ষেপ এবং চীৎকার শুনিয়া মনে হইতেছিল যেন একদল ভূতের তাণ্ডব নৃত্য।

অকস্মাৎ ভীষণ শব্দে কি যেন তীব্রবেগে ছুটিয়া তাহার মস্তকের সম্মুখে জল ভেদ করিয়া প্রবেশ করিল। তখন আর তাহার কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। বুঝিল সৈন্যেরা তাহাকে গুলি করিতেছে। সে আবার স্রোতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। নাসাগ্রের জল প্রপাতের মত জলস্রোত গর্জ্জন করিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ জলের মধ্যে থাকিয়া সে পুনরায় তীরে উঠিয়া দেখিল তাহার সমস্ত হাত পা অবশ হইয়া গিয়াছে। চোখের পাতা ফুলিয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় বিশ্রাম করিতে করিতে পুনরায় তাহার সম্মুখে একটা গুল আসিয়া সমস্ত জলকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। তখন সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, পাগলের মত দৌড়াইয়া দূরে একটি মাটির স্তূপের অপর পার্শ্বে লুকাইয়া রহিল। সেখানকার সুন্দর ফুলের গন্ধে পাখীর গানে তাহাকে তন্দ্রাতুর করিয়া তুলিল। কিন্তু তাহার পক্ষে বিশ্রাম কোথায়? শান্তি কোথায়? কিছুক্ষণ পরেই সম্মুখে কয়েকটী কামানের গুল আসিয়া তাহার মস্তকের উপরে স্থিত গাছের ডাল তরু করিয়া তাহার গায়ের উপর ফেলিয়া দিল। অন্য উপায় না থাকায় সে বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। তারপর সমস্ত দিন এই বনের মধ্যে চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় একটী প্রকাণ্ড নির্জ্জন রাস্তায় আসিয়া পড়িল। রাস্তার ধারে কোন মানুষের বাসস্থান ছিল না। দুধারে কেবল অন্তহীন নির্জ্জন মাঠ। মধ্যে মধ্যে মাঠের ধারে নানাপ্রকার বৃক্ষশ্রেণী তার দৈত্যপুরীর দুর্গ শ্রেণীর মত দাঁড়াইয়া আছে। গাছের মধ্য দিয়া সে ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিল আকাশ তারায় আচ্ছন্ন; আর অনন্ত গগনব্যাপ্ত নিঃশব্দতাকে ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে পাখীর ক্ষীণ সঙ্গীত তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। নিস্পন্দ জ্যোৎস্নাপ্লুত পৃথিবীর উপর দাঁড়াইয়া তাহার বোধ হইতেছিল যেন প্রকৃতিদেবী দুঃখের পর তাহাকে শান্তি ও আনন্দ দিবার জন্য অন্ধকার নিশীথিনীকে নির্ব্বাসিত করিয়া তাহার সম্মুখে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জ্জন ও বিশ্বয়ানন্দপূর্ণ পৃথিবীকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

এইরূপে চলিতে চলিতে সে গলার অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিল; চক্ষু ক্রমেই বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। পা এত ফুলিয়া গিয়াছে যে আর সে চালনা করিতে পারিল না। তাহার বোধ হইল যেন তাহার চারিদিকে পৃথিবী অবিশ্রান্ত ভাবে ঘুরিতেছে। সে অবসন্ন হইয়া বৃক্ষছায়াতলে শুইয়া পড়িল।

তখন জ্যোৎস্নার আলোক একটু ম্লান হইয়া আসিয়াছে; সুপ্ত জগতের ক্লান্তি হরণ করিয়া বাতাস বহিতেছে। কার্ভার ঘুমাইয়া পড়িল। এখন সে অনন্ত নিদ্রার মধ্যে প্রবেশ

করিতে প্রস্তুত। এই অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেখানে অনেকক্ষণ অতিক্রম করিয়া সে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সারদার তাহার অপেক্ষায় সিল্কের কাকার দাঁড়াইয়া আছে। আজ সে কত সুন্দরী! কত ভাবময়ী! সৌন্দর্য্য যেন তাহার চারিদিকে পরিস্ফুটের মত বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে! কাকার গৃহ উঠিয়া তাহার স্থানে আসিয়া সে করিতে গেল। কিন্তু এই সময় কি এক তীব্র বেদনায়, স্ত্রী গুণ, সমস্তই মুহূর্ত্তের মধ্যে ছায়ার মত অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার চক্ষের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী সাদা হইয়া ক্রমে কালো হইতে লাগিল। ক্রমশ সে হিমানীসিক্ত চির অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল।

* * *

কয়েক দিন পরে ফর্কাসের মৃতদেহ গভীরবাধা অবস্থায় আউল ক্রীক সেতুর ধারে ভাসিতে দেখা গিয়াছিল।

শ্রীসুধীর চন্দ্র সরকার।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর সন ও দিন।

রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে, সুনামখ্যাত ডাক্তার ফ্লিট বুদ্ধদেবের মৃত্যুর সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ডক্টর মহাশয় বলিতেছেন যে, যে সময় বুদ্ধদেব জীবিত ছিলেন ও নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, সে সময়ের প্রচলিত কোন অব্দ ছিল না। এবং সেই জন্য আমরা এ বিষয়ে সহসা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। ভারতীয় ইতিহাসের তারিখ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের তারিখ হইতে তাহা গণনা করিতে হয়। গ্রীকদিগের বর্ণিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, চন্দ্রগুপ্ত ৩২৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ ও ৩১১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের মধ্যে সিংহাসনারোহণ করেন এবং সকল দিক বিবেচনা করিলে ৩২১ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দই তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভ কাল বলিয়া বোধ হয়। দীপবংশ ও মহাবংশ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, চন্দ্রগুপ্তের ও অশোকের রাজ্যাভিষেকের মধ্যে ৫৬ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। অবশ্য ঠিক যে ৩৬৫ দিনের ৫৬ বৎসর অতীত হইয়াছিল তাহা নহে; অর্থাৎ ৫৬ বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত হইয়াছিল এবং খৃষ্টীয় জন্মের ২৬৩ বৎসর পূর্ব্বে অশোক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এ স্থলে এই হইতে আমরা জানিতে পারি যে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের ২১৮ বৎসর পরে অশোকের অভিষেক সম্পাদিত হইয়াছিল। এ স্থলেও, আমরা ঠিক ২১৮ বৎসর ধরিতে পারি না, অর্থাৎ ২১৭ বৎসর অতীত হইলে এই অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। সে হিসাবে খৃষ্টীয় জন্মের ৪৮১ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। ফ্লিটের মতে এই তারিখ একেবারেই ঠিক তাহা নহে; তবে সকল দিক বিবেচনা করিলে ইহাই একপ্রকার স্থির বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

দিন সম্বন্ধেও দুইটী মত আছে। প্রথম

কিংবদন্তী এইরূপ যে বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায় বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। অন্য কিংবদন্তী মতে কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী দিবসে এই চিরস্মরণীয় ঘটনা সম্পাদিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ, শেষোক্তটীই অধিক বিশ্বাসযোগ্য কিন্তু অধিকাংশ লোকে প্রথমোক্তটীই গ্রাহ্য করেন।

কল্প, ব্রহ্ম ও জ্যোতিষের মতে কিংবদন্তী মতে ৪৪৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ হইয়াছিল। ডাক্তার ফ্লিটের মতে, ইহা আদৌ বিশ্বাস যোগ্য নহে। এই তারিখ অনুসারে গণনা করিলে অশোকের রাজ্যাভিষেক উহার ৩২৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিতে হয়। ডাক্তার স্মিথের মতে ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাসের যোগ্য। কেননা, অশোকের দ্বিতীয় ও ত্রয়োদশ গুহা লিপির রাজ্যারম্ভ এই সময়ে হইয়াছিল।

এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে এ সম্বন্ধে অশোকের রাজ্য এবং আলেকজান্দারের অভিযান সেই সময়েই ঘটিয়াছিল।

সত্যবালা দেবী।

সাধারণের পাঠকবর্গেই নিঃসন্দেহ সত্যবালা দেবীর নাম অবগত আছেন। এই বঙ্গমহিলা স্বামীসহ সুদূর প্রবাসে বীণাবাদন এবং রাগরাগিণী গান করিয়া, সে দেশে হিন্দুসঙ্গীত প্রচার করিতেছেন।

অল্পবয়স্কা বঙ্গমহিলার পক্ষে এরূপ চেষ্টা ও সাধনা—একদিকে যেমন অসাধারণ সাহস ও অধ্যবসায় পরিচায়ক—অন্যদিকে সেরূপ যে দেশগৌরবসূচক তাহাতে সন্দেহ নাই।

সঙ্গীতশাস্ত্র পারদর্শিনী পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী সত্যবালা দেবীর এই মঙ্গলকার্য্যে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বহুতর উৎসাহপূর্ণ একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রোক্ত স্থানে তাঁহার ছবি ও বিজ্ঞাপনাদি পাঠাইয়া দিয়াছেন। প্রকাশিত হইল।

সঙ্গীত-বিদ্যায় তিনি বাস্তবিক কতদূর পারদর্শী স্বকর্ণে তাঁহার গীতবাদ্য না শুনিলে

সমাজে বুঝিবার উপায় নাই। তবে সভ্যদাতা দেশীয় স্বামী ভাকার বেলাই চিকিৎসা প্রবাসে, পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে স্বদেশীয় ব্যবসায়ী একজন শক্তিশালী ডাক্তার। সভ্যতের মহিমা প্রচার করিতেছেন তাহাতে ইংরাজ নিউইয়র্কে বিস্ময় এবং দর্শনপাত্র সকলের আনন্দ হয়। শ্রীমতী সভ্যবালা এ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া থাকেন।

শিবরাত্রি।

জীবন অরণ্যে যবে দুঃখের বেশে
ছিল মম মৃগয়ায়, এবে শুষ্ক তার
স্কন্ধে পুষ্পধনু সম, দুঃখ নিশা এসে
কৃষ্ণা শুক্ল ঘুগ্ন চক্ষে ঢালে অন্ধকার।
আশ্রয় সংসার তরু আকর্ষি দুহাতে
ধরি আছে ভীত মনা, আর্ত্ত বিকম্পিত,
বাষ্পাক্ত নয়ন হ'তে শুষ্ক পত্র সাথে
মুহুঃ মোর অশ্রু ধারা হয় বিগলিত।
সে কণ্টকী বৃক্ষতলে ওগো মহেশ্বর!—
তুমি যে জাগিয়া আছ জানে না অজ্ঞান!
সে শুষ্ক পল্লব দল সে অশ্রু নির্ঝর
তোমার পূজার আজ শ্রেষ্ঠ উপাদান!
তাই এই রাতি যাহে শোক মোহ তার
পুষ্প রূপে পরশিছে চরণ তোমার!

শ্রীনিরুপমা দেবী।

চৈত্র।

আজ এসেছে ফিরিয়া চৈত্র,
যবে স্নিগ্ধ মধুর হাসে;
তার মণির পুলকে নেত্র,
কেন মেলিছে কুসুম রাশি।
পথে ক্লান্ত পবন লুটায়ে,
কার বিকশিত ভালবায়
মম অন্তর মাঝে ফুটায়ে
সব নব ফুলমায়।
ওগো এসেছে বরষ অন্তে,
চির পুরাণো প্রেমের অতিথি;
যবে মুরছে চরণ প্রান্তে,
উঠে শিহরিয়া ফুলবীথি।
যত বসন্ত আসে জীবনে,
তার ফুলগুলি অবচয়ি,
কত বাসনা যে জাগে প্রাণে
মালা গেঁথে নিতে শোভাময়ী।
সেথে আসে শুধু যেতে দিয়ে,
দিয়ে চকিতের মত দেখা;
সেথে নয়ন ভরিয়ে নীরে
রবে বিদায়ের বাঁশী লেখা।
তার স্মরণে গাঁথিব মালা,
রবে স্তব্ধ হয়ে একাকিনী;
শুধু নিভৃতে কাটিবে বেলা,
কেটে যাবে নিশীথিনী।

শ্রীমতী স্বর্ণলতা কাঞ্জিলাল।

বিভ্রম।

প্রথম চাকরি পাইলাম শিমলা পাহাড়ে। বিবেচনা এবং পরামর্শ উভয়েই উপদেশ দিল যে অজ্ঞাত বিদেশে একেবারে প্রথমেই স্ত্রীটিকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত হইবে না। সুন্দরী অল্পবয়স্কা স্ত্রী আজকালকার দিনে বিপজ্জনক না হইলেও সুবিধাজনকও নহে। কারণ, তাঁহার সমস্ত ভার আমাকে বহন করিতে হইবে, কিন্তু আমার কোনও ভার তাঁহাকে বহন করিতে দেওয়া আজকালকার সভ্যযুগে তদ্রোচিত হইবে না। বহুমন্ত্রের কুসংস্কারের প্রভাবে অদ্যাবধি আমাদের স্ত্রীগণ আমাদিগের যাত্রা জুতার লেস বাঁধাইয়া লইতে একটু ইতস্ততঃ করেন কিন্তু তাঁহাদের ক্ষীণহস্ত হইতে দৈবাৎ রুমালখানি পড়িয়া যাইলে আমরা তাহা উঠাইয়া না দিলে তাঁহারা বিরক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা হইতে আশা হয় যে অচিরাৎ আমাদের জাতির পরিচ্ছদ হ্যাট-কোট এবং আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ মেম হইয়া উঠিবেন।

আমার স্ত্রী তত্তোধিক সভ্যা না হইলেও বর্ত্তমান যুগের প্রভাব তাঁহাতে কতক পরিমাণে বিদ্যমান আছেই। তিনি বলিয়া বসিলেন, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

আমি বলিলাম, "বেশ, তা'হলে হ্যাটকোট প'রে আপিস যাওয়াটা আজ আর তুমিও যা হয় একটা জড়িয়ে নিয়ে মেম হয়ে পড়—নাহ'লে এমন বেশে সেখানে গিয়ে ত' আর হোটেলে উঠ্‌তে পারব না।'

অগত্যা স্ত্রী বলিলেন "তবে শিমলায় গিয়ে একটা বাড়ি ঠিক করে মাস খানেকের মধ্যেই কিন্তু আমাকে নিয়ে যেতে হবে।

"তথাস্তু!"

(২)

তখন এপ্রিল মাসের প্রথম। গ্রীষ্ম। আফিসের পরিশ্রম হইতে যেটুকু অবসর পাইতাম সেটুকু পুস্তক পাঠ করিয়া এবং বাড়িতে পত্র লিখিয়া কাটাইতাম। শিমলার প্রশান্ত এবং বিরাট সৌন্দর্য্য আমার চক্ষে ঠিক ভাল লাগিত না; তাহার গুরুত্ব এবং গাম্ভীর্য্য যেন আমার হৃদয়কে চাপিয়া ধরিয়া থাকিত। বক্রগতিতে পার্ব্বত্য পথ চলিয়া গিয়াছে তাহার উপর দিয়া উটের শ্রেণী এবং 'বয়েল' গাড়ি চলিয়াছে; চালকদের গম্ভীর বদন এবং বৃহৎ দেহ দেখিয়া আমার মনে হইত যেন কোন রঙ্গালয়ে উপবেশন করিয়া প্রবাস দৃশ্য দেখিতেছি। আমিও যে সেই দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত একটী প্রাণী তাহারই মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছি তাহা ঠিক অনুভব করিতে পারিতাম না। ঘুমাপেই গিরিশ্রেণীর দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে যেন দেখিতাম পর্ব্বত এবং উপত্যকা ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে কলিকাতার একটী জনাকীর্ণ পল্লী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল; সেই পল্লীর মধ্যদিয়া একটি সঙ্কীর্ণ গলি এবং তাহার পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল অট্টালিকার গায়ে দুইটি উৎসুক নয়ন। কিন্তু সে ক্ষণেকের মোহ। রিক্সর শব্দে চমকিত হইয়া দেখিতাম সেই পর্ব্বত এবং সেই উপত্যকা তাহাদের

গাম্ভীর্য্য এবং নির্জ্জনতা লইয়া প্রকাশ রহিয়াছে! কোথায়ই বা কলিকাতার গলি, এবং কোথায়ই বা উৎসুক নয়ন! একটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে নিশ্বাস শীতবায়ুতে মিশিয়া মিলাইয়া যাইত।

সেদিন রবিবার। আফিসের উপদ্রব ছিল না। কৃত্য টেবিলের উপর চা'এর পেয়ালা রাখিয়া গেল। সেই তপ্ত তরল পদার্থ টুকু নিঃশেষ করিবার পর কি করিয়া সময় নষ্ট করিব মনে মনে চিন্তা করিতেছি এমন সময়ে শুনিলাম—"বাবুজি, ফুল!"

চাহিয়া দেখিলাম ফুলের গুচ্ছ হস্তে লইয়া একটি পাহাড়ী বালিকা আমার উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার পরণে নীল বর্ণের পাহজামা এবং কুর্ত্তী, এবং গাত্রে একখানি শীতবর্ণের অঙ্গাবরণ। বিসদৃশ পরিচ্ছদের মধ্য হইতে সবল সুগঠিত দেহ এবং সরল সপ্রতিভ মুখখানি সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহার বয়স অনুমানিক পঞ্চদশ বৎসর হইবে।

তাহার হস্ত হইতে ফুলের গুচ্ছটি লইয়া দেখিলাম পাহাড়ী গোলাপ এবং কার্ণ দিয়া সেটি প্রস্তুত। টেবিলের উপর তোড়াটি রাখিয়া মনিব্যাগ হইতে একটি চুয়ানী লইয়া বালিকাটিকে দিলাম। বালিকাটি চুয়ানী দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, আমাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল—"বাবুজী, ইহার মূল্য একপয়সা মাত্র। আপনি আট পয়সা দিতেছেন!"

তাইত! দরদস্তুর না করিয়া একেবারে আট পয়সা দেওয়া উচিত হয় নাই। কিন্তু একবার দিয়া কিরাইয়া লওয়াও ভাল হয় না। বলিলাম—"তা'হক তুমি আট পয়সাই লও।"

কিন্তু সে কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইল না। অন্যায় মূল্য সে কিছুতেই গ্রহণ করিবে না। অগত্যা একটা রফা করিতে হইল। আমি তাহাকে বলিলাম—"তুমি চুয়ানীটিই লইয়া যাও তাহার পরিবর্ত্তে আমাকে আটদিন ফুল দিয়া যাইও।"

আমার প্রস্তাব তাহার মনঃপূত হইল। "আচ্ছী বাৎ" বলিয়া চুয়ানীটি লইয়া সে চলিয়া গেল।

(৩)

পরদিন হইতে প্রত্যহ সকাল বেলা বালিকাটি ফুল দিতে আসিত। আমাকে যেদিন সম্মুখে পাইত আমার হস্তে দিয়া যাইত যেদিন আমাকে দেখিতে পাইত না টেবিলের উপর রাখিয়া যাইত।

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিতাম বালিকাটির যেমন সপ্রতিভ ভঙ্গী, তেমনি অবাধ গতি। সে যেমন সহজভাবে আমার সহিত কথা কহিত তেমনি অবলীলা ক্রমে আমার ঘরে প্রবেশ করিত।

সেরূপ সহজ সপ্রতিভতার সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে অধিক বিলম্ব হয় না। আমি বাঙ্গলা-দেশের হিন্দিতে তাহার সহিত কথা কহিতাম সে পাহাড়ী হিন্দিতে তাহার উত্তর দিত। কতকটা সেও আমার প্রশ্ন বুঝিত না এবং কতকটা আমিও তাহার উত্তর ভুল বুঝিতাম। কিন্তু মোটের উপর আমাদের কথাবার্ত্তা এক-রকম চলিয়া যাইত।

তাহার নাম জান্‌কী। খড়্‌এর অর্দ্ধপথে তাহাদের বাড়ি। তাহার পিতা 'জঙ্গল দফ্‌তরের (Forest Office) অমাদার। তাহারা তিনটী ভগিনী এবং চারিটি ভাই।

তাহার বড় ভাই তিন মাস হইল 'সরকারে' চাকরি পাইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি আপাদ মস্তক শীতবস্ত্রে আবৃত হইয়া বসিয়া থাকিতাম দেখিয়া জান্‌কী বলিত "বাবুজী তোমার এখনই এত ঠাণ্ডা বোধ হয় বরফে তুমি কি করিয়া থাকিবে?"

'বরফ' অর্থাৎ শীতকাল। শীতকালে শিমলায় তুষারপাত হয় বলিয়া সহজ কথায় শীতকালকে 'বরফ' বলিয়া থাকে।

আমি বলিতাম—"বরফ পড়িবার দুইমাস পূর্ব্বেই আমি কলিকাতা চলিয়া যাইব।

জান্‌কী আশ্চর্য্য হইয়া বলিত—"বাবুজী, তুমি বরফে থাকিবে না?"

বলিয়া বরফের গল্প আরম্ভ করিত। সে কি সুন্দর! যখন পাহাড় পর্ব্বত গাছ পালা সমস্ত বরফে একেবারে সাদা হইয়া যায় তাহার উপর সূর্য্য কিরণ পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে তখন তাহারা কি আনন্দের সহিত বরফের উপর বেড়াইয়া বেড়ায়—বরফ লইয়া খেলা করে! সেই বরফকে বাবুজীর এত ভয়!

তাহার উত্তরে আমি কলিকাতার গল্প করিতাম। শিমলার মত ত্রিশটা সহর একত্র করিলেও কলিকাতার মত বড় হয় না—সেখানে কত লোক কত গাড়ি কত আনন্দ। যে 'হাওয়াগাড়ি' শিমলায় একটা দেখিলে জান্‌কী অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে—সে 'হাওয়াগাড়ি' কলিকাতার পথে গণিয়া শেষ করা যায় না। মাঠে মনুমেণ্ট, পথে ট্রামগাড়ি, গঙ্গায় জাহাজ।

সমস্ত শুনিয়া জান্‌কী বিস্মিতহৃদয়ে কলিকাতার ঐশ্বর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিত। সকলের চেয়ে তাহার আশ্চর্য্য লাগিত হাওয়াগাড়ির কথা। এখানে যত রিক্স আছে কলিকাতায় তাহার অধিক সংখ্যক হাওয়া-গাড়ি আছে একি পরমাশ্চর্য্য! কিন্তু তাহা হইলে কি হয় কলিকাতায় শীতকালে বরফ পড়ে না! জান্‌কী মাথা নাড়িয়া বলিত—"বাবুজী শিমলাই ভাল।"

এমনি করিয়া দিনে দিনে জান্‌কীর সহিত আলাপ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমশঃ ফুলের তোড়া উপলক্ষ মাত্র হইল—গল্প করাই প্রধান ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। প্রত্যূষে উঠিয়া বারান্দায় নিস্তেজ রৌদ্র কিরণে বসিয়া সম্মুখের পর্ব্বত-গুলির দিকে চাহিয়া থাকিতাম—কালো কালো পাহাড়গুলা দেখিয়া মনে হইত যেন আরব্যোপন্যাসের দৈত্যগণ তাহাদের বিরাট দেহ লইয়া অলসভাবে লেজ গুটাইয়া বসিয়া রহিয়াছে। মনের মধ্যে কেমন একটা পীড়া অনুভব করিতাম। প্রভাতসূর্য্যোদ্ভাসিত প্রসন্ন আকাশের তলায় হিমমর্জ্জর পর্ব্বতগুলা কেমন খাপছাড়া বলিয়া মনে হইত—এমন সময়ে একমুখ হাস্য এবং একতোড়া ফুল লইয়া জান্‌কী আসিয়া উপস্থিত হইত—"বাবুজী, ফুল!"

ফুলের প্রসঙ্গ সেই পর্য্যন্ত শেষ—তাহার পর জান্‌কী গল্প করিতে বসিয়া যাইত।

এই সরলহৃদয় সপ্রতিভ পাহাড়ী বালিকাটিকে আমার কেমন অতিরিক্ত ভাবে ভাল লাগিত। কঠিন বন্ধুর পর্ব্বতের মধ্যে চতুর্দ্দিকের গাঢ়নিবদ্ধ গাম্ভীর্য্য এবং কঠোরতার সহিত তাহাকে একেবারে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হইত। তাহার মধ্যে যে প্রফুল্লতা এবং

চাপল্য তাহাকে নিরন্তর উদ্বেলিত করিয়া রাখিত—তাহারি উপমা পর্ব্বতের মধ্যে আমি আর কোনও পদার্থে পাইতাম না—একমাত্র গিরি নির্ঝর ছাড়া! মনে হইত সে যেন নির্ম্মম পাহাড় ভেদ করিয়া তরল প্রস্রবণ নির্গত হইয়াছে। তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ না হইয়া উপায় নাই—গল্প বলিতে সে যেমন মজবুত—গল্প শুনিতেও তাহার তেমনি আগ্রহ। তাহার কথা শ্রবণ করা এবং তাহার সহিত কথা কওয়া—এই দুই প্রক্রিয়ার একমাত্র পরিণতি হইতেছে দ্রুততা।

দু-আনীর হিসাব যেদিন শেষ হইল তাহার পরদিন ফুল লইয়া আসিলে আমি জান্‌কীকে বলিলাম—"জান্‌কী তোমার দু আনার ফুল দেওয়া হয়ে গেছে—আজ থেকে আবার নূতন হিসাব।" বলিয়া তাহাকে পুনরায় একটি দু-আনী প্রদান করিলাম।

জান্‌কী দু-আনীটি আমাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল আর তাহাকে পয়সা দিতে হইবে না আজ হইতে সে বিনামূল্যেই ফুল দিয়া যাইবে।

আমি বলিলাম—"তাও কি হয়—।"

কিন্তু তাহাই হইল। সে বলিল—ফুল বিক্রী করা তাহার ব্যবসায় নহে—ফুল এবং পাতা বিনামূল্যেই সে পর্ব্বতগাত্র হইতে লইয়া আসে অতএব পয়সা না লইলেও তাহার কোন ক্ষতি নাই। ফুলের পরিবর্ত্তে 'বাবুজীর' অনুগ্রহই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

পীড়াপীড়ি করিয়া দেখিলাম ফুলের মূল্য প্রদান করিলে জান্‌কীকে ক্ষুণ্ণ করাই হইবে এবং পীড়াপীড়ি করিলেও তাহাকে রাজি করিতে পারিবার ক্ষমতাও ছিল না সম্ভাবনাও ছিল না। অগত্যা বিনামূল্যেই ফুল লাভ করিতে লাগিলাম।

(৪)

দিনের পর দিন শেষ হইয়া তিন মাস কাল কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে একদিনও জান্‌কী আমাকে ফুল দিয়া যাইতে ভুলে নাই। যেদিন প্রাতে ঝড়বৃষ্টির জন্য আসিতে পারে নাই সেদিন বৈকালে আসিয়া দিয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে এই তিন মাসের মধ্যে সে আমার সহিত এত অধিক ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইয়াছে—তাহার মাত্রা, আমার মনে হয়, ক্রমশঃ সঙ্গতির সীমা অতিক্রম করিয়াছে। সে শুধু ফুল দিতে আসেনা—সে আমার জন্য আসে, ফুল তাহার উপলক্ষ—আমিই তাহার লক্ষ্য!

কি আশ্চর্য্য এই দুরন্ত পাহাড়ী বালিকার হৃদয়েও সেই প্রেম স্থানাধিকার করিয়া বসিয়াছে। এ শুধু হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া বেড়াইয়াই ক্ষান্ত হয় না—এ আবার ভাবেও আসে। ক্ষুধার সময় আহার এবং শয়নের সময় নিদ্রালাভ করিয়াই ইহার বাসনা সমাপ্তি লাভ করে না—তাহারও সীমা লঙ্ঘন করিয়া চলে।

কিন্তু আমিত এই পর্ব্বতবালিকাকে ভালবাসি নাই—শুধু অমিশ্র সহৃদয়তা ভিন্ন আমি আর কিছুত ইহাকে দান করি নাই। আমার নিকট হইতে এমন কি পদার্থ সে লাভ করিয়াছে যাহার বিনিময়ে তাহার হৃদয় লইয়া সে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম সে ফুল লইয়া আমার উপাসনা করিতে আসিত।

আমি এই হৃদয়ের দেখিয়া

মনে মনে কৌতুক অনুভব করিতাম। কেমন ধীরে ধীরে অথচ অনন্তগতিতে এই উদ্ধাম এবং চঞ্চল হৃদয়খানি আমার নিকটে আসিয়া ধরা দিল। কিসের প্রভাবে? কিসের আকর্ষণে! আমার মধ্যে এমন কি শক্তি আমার অগোচরে বিরাজ করিতেছে যাহার অদৃশ্য প্রভাব হইতে এই বালিকা কোন ক্রমেই পরিত্রাণ লাভ করিল না। সময়ে সময়ে আত্মমহিমায় কেমন একটা প্রচণ্ড আনন্দের অস্তিত্ব অনুভব করিতাম।

কিন্তু তাহা হউক—ইহাকে রোধ করিতে হইবে—ইহাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। এই অপরিণতবুদ্ধি বালিকা যে মিথ্যা আশাকে আশ্রয় করিয়া দিন দিন নিজেকে বিপদের পথে লইয়া যাইতেছে আমার কর্ত্তব্য তাহা হইতে তাহাকে রক্ষা করা। এই হৃদয়সংঘাতের মধ্যে আমার পক্ষে বিশেষ আশঙ্কার কারণ কিছু নাই—কিন্তু বেচারী জানকী একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িবে তখন তাহাকে এই অপরিণামদর্শিতার ফলভোগ করিতে হইবে। আমার নিকট হইতে সহৃদয়তার অধিক যতটুকু সে আশা করিবে—ততটুকুর জন্য তাহাকে ভবিষ্যতে আঘাত সহ্য করিতেই হইবে।

স্থির করিলাম জানকীকে সাবধান করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু কি তাহাকে বলিব—কেমন করিয়া তাহাকে সাবধান করিব! সে ত একদিনও প্রকাশ করিয়া আমাকে বলে নাই যে আমাকে ভালবাসে; এরূপ স্থলে কেমন করিয়া বলি যে আমাকে ভালবাসিয়ো না—ভুল করিয়ো না। বিশেষতঃ সে যখন আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত সহজ এবং সরলভাবে গল্প করিতে থাকে তখন নির্ব্বিবাদে তাহার গল্প শুনা ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না। তখন তাহাকে গম্ভীরভাবে উপদেশ দিতে যাওয়া নিতান্ত বাপছাড়া হইয়া পড়ে এবং তাহার অকৃত্রিম সারল্যে বাধা দিয়া তাহাকে পীড়ন করা নিতান্ত হৃদয়হীন বর্ব্বরতা মনে হয়।

কিন্তু ক্রমশঃ এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে একটা কোনও প্রতিকার না করিলেই নয়! দুই একজন বন্ধু বান্ধব জানকীর বিষয় লক্ষ্য করিতে ভুলিল না। এবং তদুপলক্ষে আমাকে পরিহাস করিতে ছাড়িল না। ভৃত্য এবং পাচকও যেন জানকীকে লইয়া তাহাদের মধ্যে কি কথা বলাবলি করে। আমার সন্দেহ হয় তাহারা আমারই বিষয়ে আলোচনা করে। এবং সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্য কথা আমি একজন বিবাহিত ব্যক্তি জানকীকে এ বিষয়ে প্রশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে কোনও ক্রমেই উচিত নহে।

অবশ্য একথা বলিলে জানকীর মনে নিশ্চয়ই কষ্ট হইবে। কিন্তু উপায় নাই। প্রয়োজনস্থলে আঘাত না করাই অন্যায়, কষ্ট না দেওয়াই নিষ্ঠুরতা।

স্থির করিলাম জানকীকে স্পষ্ট কিছু না বলিয়া তাহার সহিত ঘনিষ্টতা বন্ধ করিতে হইবে। মূলের মূল্য গ্রহণ না করিলে তাহার নিকট হইতে ফুল লওয়া হইবে না। বিনামূলে ফুলগ্রহণের সুযোগে তাহার সহিত যে হৃদ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে মূল্য দিয়া ফুল গ্রহণ করিলে তাহা সহজেই নষ্ট হইয়া যাইবে।

(৫)

সেদিন প্রভাতে একপসলা শ্রাবণের বর্ষণ

খাইয়া কেলুগাছগুলি সজীব হইয়া উঠিয়াছিল এবং ছিন্ন মেঘের অবকাশ দিয়া সূর্য্যের কিরণ আকাশ এবং পর্ব্বতকে পরিপ্লুত করিয়া ফেলিয়াছিল।

ফুল লইয়া জান্‌কী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার পশ্চাতে একজন পাহাড়ী যুবক পৃষ্ঠে মস্তবড় বোঁচ্‌কা লইয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম আজিকার ফুলের তোড়াটি সবদিনাপেক্ষা বৃহৎ—নানাবিধ পুষ্পলতায় গ্রথিত। নিমেষের মধ্যে আমার মনকে প্রস্তুত করিয়া লইলাম এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানকে বিশেষভাবে সচেষ্ট করিয়া তুলিলাম।

বলিলাম—জান্‌কী ফুলের দাম তুমি যদি না লও ত আর আমি ফুল লইব না।

জান্‌কীর প্রফুল্লমুখ সহসা ম্লান হইয়া গেল। "কেন বাবুজী?"

আমি কহিলাম—"তা বলিতে পারি না কিন্তু দাম তোমাকে লইতে হইবে।"

জান্‌কী একটু দুঃখিতস্বরে কহিল—"বাবুজী আমি যদি অপরাধ করিয়া থাকি আমাকে ক্ষমা করিবেন—আপনাকে আর বিনামূল্যে ফুল লইতে হইবে না—আপনাকে আমি আজ শেষ ফুল দিতে আসিয়াছি!

অন্তরের মধ্যে একটা আঘাত অনুভব করিলাম, তাড়াতাড়ি কহিলাম—"কেন?"

জান্‌কী কহিল—"আমি আজ বিদেশ যাইতেছি—এখান হইতে একবেলার পথ—ইনি আমার স্বামী।"

জান্‌কীর মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল।

আমি কহিলাম—"জান্‌কী তোমার বিবাহ হইয়াছে একদিনও বল নাই ত। কতদিন তোমার বিবাহ হইয়াছে?"

জান্‌কী কহিল—"পাঁচ বৎসর।"

দেখিলাম বর্ষার অনুজ্জ্বল সূর্য্যকিরণের মধ্যে জান্‌কীর মুখখানি অম্লান পবিত্রতায় নির্ম্মল হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামীর প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া জান্‌কী নীরবে ইঙ্গিত করিল। সেই ইঙ্গিতে পাহাড়ী যুবকটি তাড়াতাড়ি আমার সম্মুখে আসিয়া পুনরায় আমাকে অভিবাদন করিল এবং করযোড়ে কহিল—"বাবুজীর যদি অনুগ্রহ হয় একবার আমাদের গ্রামে বেড়াইতে যাইবেন—পথ ভাল—আমি স্বয়ং আসিয়া লইয়া যাইব।"

আমি কহিলাম—"ছুটি পাইলে আমি তোমাকে তোমার শ্বশুরের দ্বারা সংবাদ দিব।"

জান্‌কী এবং তাহার স্বামী সকৃতজ্ঞনেত্রে আমার দিকে চাহিল।

বিদায়কালে জান্‌কী বলিল—"বাবুজী আপনার দয়া এবং ভালবাসার কথা আমার চিরকাল মনে থাকিবে—আপনি আমাকে যে দো-আনীটি দিয়াছিলেন—সেটি আমি আপনার দয়ার নিদর্শনস্বরূপ রাখিয়া দিয়াছি—খরচ করি নাই।" বলিয়া একটি ক্ষুদ্র কৌটা হইতে দো আনীটি বাহির করিয়া আমাকে দেখাইল।

জান্‌কী এবং তাহার স্বামী খড়ের পথে নামিয়া গেল। যতক্ষণ তাহাদের দেখা গেল আমি তাহাদের দেখিতে লাগিলাম।

তখন আকাশ আরও মেঘমুক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং চতুর্দ্দিক রৌদ্রপাতে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

আত্মীয় স্বজন স্নেহপূর্ণ আচরণকে আমি যে বিকৃত আকার দিয়া মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলাম তাহা হইতে মুক্ত হইয়া মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু যখন মনে হইল কাল হইতে আর "বাবুজী কুল" বলিয়া একখানি সরল অন্তঃকরণ আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইবে না তখন একটা অদৃশ্য বেদনায় মনটা নিপীড়িত হইয়া উঠিল।

সেইদিন অফিসে গিয়া বলিলাম—"সাহেব আমাকে ১০ দিনের ছুটী দাও—স্ত্রীকে আনিতে যাইব।"

সাহেব বলিলেন—তথাস্তু!

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বর্ষবিদায়।

গত বৎসর ঠিক এই দিনে সম্মুখের যে নূতন বৎসরের প্রতীক্ষায় আমাদের মন যুগপৎ আশায় আশঙ্কায়, আনন্দে বিষাদে আন্দোলিত হইয়াছিল, যাহার আবাহনের জন্য উৎসব আয়োজন করিয়াছিলাম আজ তাহার বিদায়ের দিন সমুপস্থিত। একদিন আশৈশব যাহাকে সুখের আকাঙ্ক্ষায় নিগূঢ় সুগন্ধ সুকুমার পুষ্প-কোরকের ন্যায় মনোহর এবং দুঃখের আশঙ্কায় ভীষণ বজ্রবিদ্যুৎপোষণকারী বৈশাখের সান্ধ্যমেঘ সঞ্চারের ন্যায় ভয়ঙ্কর মনে হইয়াছিল, সেই অজানিত নূতন রহস্যময় বৎসর, আজ দীর্ঘ পরিচয় সুযোগে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত পুরাতন। দৃষ্টিরোধকারী কালের আবরণ আজ নিঃশেষে অপসারিত, রুদ্ধকোরক সৌরভে সৌন্দর্য্যে বিকসিত হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে; নিবিড় গম্ভীর মেঘপুঞ্জ বর্ষণে, ঝঞ্ঝাবজ্রপাতে আমাদিগকে নিতান্ত বিপন্ন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছে। তাই আজ পুরাতনের হিসাবের খাতা খুলিয়া লাভালাভ গণনা করিতে বসিয়াছি, কি পাইলাম আর কি হারাইলাম।

এবৎসরে জীবনে অনেক গুলি আনন্দের আয়োজন হইয়াছিল, আবার অনেক গুলি শোকের ঘটনাও ঘটিয়াছে। রাজ আগমনের সমারোহ, সম্রাটের বদান্যতা, বঙ্গব্যবচ্ছেদ নিবারণ আমাদের জীবনে নূতন যুগের সূচনা করিয়াছে। সম্রাট স্বয়ং আমাদিগকে আশার বীজমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন, এই মন্ত্র সাধনায়, হৃদয়ে নূতন বলের সঞ্জীবনী উপলব্ধি করিয়া অখণ্ড বঙ্গের সম্মিলিত উৎসাহে হিন্দু মুসলমানকে একত্রে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বঙ্গব্যবচ্ছেদ বেদনা দূরীভূত হইল, কিন্তু আমরা রাজধানী হারাইলাম, পুরাতন ইন্দ্রপ্রস্থে ভারতের মহানগরীর নূতন প্রতিষ্ঠা! ফলাফল ভবিষ্যতের গর্ভে! রাজধানী পরি-বর্ত্তনে বঙ্গদেশের ক্ষতি কিম্বা সমগ্র ভারতবর্ষের উন্নতির সম্ভাবনা এবিষয় আলোচনার সময় এখনও আসে নাই, তবে যতদূর বুঝা যায় বঙ্গ বিশেষ কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিহারে নূতন প্রদেশ সংগঠন আশা-আনন্দজনক। সমগ্রকে মহৎ এবং সম্পূর্ণ করিতে হইলে প্রত্যেক ক্ষুদ্র অংশের সমন্বয় এবং সুগঠন আবশ্যক, বঙ্গ বিহার উৎকল দ্রাবিড় মহারাষ্ট্র গুর্জ্জর রাজপুতানা সিন্ধু আর্য্যাবর্ত্ত প্রত্যেক প্রদেশকেই অগ্রসর এবং

উন্নতিশীল হইতে হইবে, সমগ্রের উপকার স্থলে কোন অংশের সামান্য ক্ষতি গণনা করিলে চলিবে না।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কল্পনা এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় পণ্ডিত মদনমোহন মালবা প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম, গত প্রায় বৎসরের একটি গৌরবজনক ব্যাপার। বিকানীর এবং দ্বারবঙ্গের মহারাজা এই কার্য্যে কেবল মাত্র উৎসাহ এবং অর্থ সাহায্য দান করিয়া বিরত হয়েন নাই যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত হইয়া এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে তাহার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশসমূহে পরিভ্রমণ এবং সভাসমিতি আহ্বান করিয়া জন সাধারণে তাঁহাদের উদ্দেশ্য বহুলভাবে প্রচার করিয়াছেন। জন সাধারণের কার্য্যে অভিজাতবর্গের সহানুভূতি এবং সাহায্য দেশের উন্নত এবং সুমঙ্গল ভবিষ্যতের সূচনা।

পাঁচবৎসর পরে এবার আবার কলিকাতায় কংগ্রেসের অনুষ্ঠান হয়। কংগ্রেস সম্বন্ধে জন সাধারণের উৎসাহ পূর্ব্বাপেক্ষা যেন অনেক কমিয়া গিয়াছে। বঙ্গভঙ্গ দূর হওয়া সত্ত্বেও এবার প্রতিনিধি সংখ্যা অধিক হয় নাই, কংগ্রেস যে জনসাধারণের সম্মিলনভূমি এ ধারণা যেন ক্ষীণ হইয়াছে, ইহা যেন দল বিশেষের স্বেচ্ছাচালিত ব্যাপার, ইহার অনেক ব্যাপার রহস্যময়, ইহাতে দেশের এবং দশের হাত নাই এই বিশ্বাস অনেকেরি মনে বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে এবং প্রথম প্রতিষ্ঠাকালে যে উৎসাহ এবং আনন্দ দেশের সকলের মন অধিকার করিয়াছিল এখন আর তাহা দেখা যায় না। এই নিরুৎসাহ যাহাতে দূর হয় এবং ভবিষ্যতের আশাউন্নতির স্থল নবীনযুবকগণ যাহাতে বহুসংখ্যায় ইহাতে যোগদান করিয়া ইহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন তাহার জন্য দেশনায়কগণের বিশেষ রূপে চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক। কংগ্রেস সর্ব্ব সাধারণের এমনি আশ্রয় ভূমি যে আজ পর্য্যন্ত সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আমেরিকার উপনিবেশ হইতে অত্যাচারপীড়িত ভারতবাসী আপন আপন দুঃখ কাহিনী বিবৃত করিয়া সাহায্যের চেষ্টায় এবং বল সঞ্চারের আশায় এখানে সমাগত হইতে দ্বিধা বোধ করেন না। ইহা কি স্বদেশের প্রতি কম সম্মান, স্বদেশীয় প্রতি কম প্রীতির নিদর্শন? দেশনায়কগণ তাঁহাদের কার্য্যগুণে এবং আদর্শবলে এই মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখুন এবং সমগ্র ভারতবাসীকে দিনে দিনে ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করুন ইহাই আমাদিগের একান্ত অনুরোধ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রদর্শনী, কবি সম্বর্দ্ধনা, চারুশিল্প প্রদর্শনী এবং সাহিত্য সম্মিলনী এবৎসরের আরও কয়েকটি মঙ্গল অনুষ্ঠান। সাহিত্যপ্রদর্শনী অতীতকে বর্ত্তমানে আবাহন করিয়া পুরাতন গৌরবকে চিরন্তন করিবার সাধনায় অতীতের মহিমালোকে বর্ত্তমানকে উদ্ভাসিত করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ যাত্রাপথ সুন্দর ও উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় এই প্রদর্শনী বৎসরে বৎসরে অনুষ্ঠিত হইয়া আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত এবং দেশের আদর্শ দিনদিন সম্মানিত এবং দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করুক এই আমাদের প্রার্থনা। কবিসম্বর্দ্ধনার বহুদিনের একটি অকৃত কর্ত্তব্যের ত্রুটি আমরা এতদিনে সংশোধন করিলাম। ঈশ্বরচন্দ্র, মাইকেল, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র

আমাদের কত না উপকার করিয়াছিলেন কিন্তু প্রতিদানে আমরা কিছুই করি নাই, এবারও যে বহুবাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও এ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইল তাহার মূলে বঙ্গের নূতন চেতনা ও ঐকান্তিক স্বদেশপ্রীতি এবং বঙ্গবাসীর ঐক্যবন্ধন। যিনি দেশের গৌরব তাঁহাকে সম্মান না করিলে মাতৃভূমিকে মাতৃভাষাকে অমান্য করা হয়। এই অবহেলা প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে পীড়া দান করিয়াছিল তাই এ মঙ্গল কার্যের উদ্যোগে এত সহানুভূতি, এমন উৎসাহ, ইহার অনুষ্ঠানে এমন আনন্দ দেখা গিয়াছিল। সাহিত্য প্রদর্শনীর ন্যায় চারুশিল্পপ্রদর্শনীও আমাদের অতীত গৌরবকে সঞ্জীবিত করিবার প্রয়াস। তবে পার্থক্য এই যে শেষোক্ত প্রদর্শনী কেবল মাত্র অতীতকে আমাদের মানস পটে উদ্ভাসিত করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই; বর্তমানে তাহাকে আবার লাভ করিবার জন্য দেশে কি অক্লান্ত সাধনা চলিয়াছে তাহাও দেখাইয়াছে। অতীত মহিমায় অনুপ্রাণিত বর্তমান আমাদিগকে ক্রমে কোন্ ঐশ্বর্য্যময় ভবিষ্যতে অগ্রসর করিবে ইহা হইতে তাহারও উজ্জ্বল চিত্র নেত্রপথে বিকশিত হইয়া উঠে। এ যেন প্রবোধের অরুণরাগ স্মরণে প্রভাতের পরিকল্পনা।

গত ১৯শে ফাল্গুন চুঁচুড়ায় সাহিত্যসম্মিলনীর পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—সাহিত্য সম্মিলনের এই পঞ্চম বর্ষ; বিদ্যারম্ভের কাল, জীবনের গতি নির্ণয় করিবার শুভ অবসর। এখন হইতে সাহিত্যসম্মিলনী কোন কাজে জীবন উৎসর্গ করিবে তাহা স্থির হওয়া আবশ্যক। তাঁহার অভিভাষণে আধুনিক চুঁচুড়া—প্রাচীন সপ্তগ্রামের অনেক ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়া যায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রবীণ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার অভ্যাগতদিগকে স্বাগত জ্ঞাপন করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, যে বঙ্কিমযুগে যেরূপ ভাষায় বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল এখন তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, তাঁহার মতে এই পরিবর্তন অবনতিজনক। এ কথায় আমরা অনুমোদন করিতে পারিলাম না—৺বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যগুরু সন্দেহ নাই; তবে ভাষা যদি চিরকাল তাঁহারি অনুকরণে লিখিত হয় তাহা হইলে তাহার উন্নতির আশা কোথায়! উন্নতি অর্থে গতি, তাহা কখনো স্থির স্থবির হইয়া থাকিতে পারে না। প্রত্যেক যুগেই অতীতের শ্রেষ্ঠ আদর্শে, বর্তমানের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। ভাষা নদীর ধারার মত, তাহা যদি চিরকালই গঙ্গোত্রীতে আবদ্ধ থাকে, যদি বিচিত্র প্রবাহে, অবিরত ধারায়, আবর্তে উচ্ছ্বাসে, প্লাবনে, তরঙ্গে, সঙ্গীতে সাগরাভিমুখে যাত্রা না করে তবে তাহা জীবনহীন পল্বলে পরিণত হইয়া দেশকালের জীবন নাশ করে। অতীতের আদর্শ আমাদের মনে চিরদিন উজ্জ্বল থাকুক আমরা যেন তাহার অবমাননা না করি,—আবার যেন কেবলি অনুকরণ করিয়া তাহাকে হীন না করি। ঐকান্তিক অনুকরণ হীনতার পরিচায়ক, যাহা শ্রেষ্ঠ যদি যথার্থ তাহার উপলব্ধি থাকে তবে তাহার প্রাণ সঞ্জীবিত রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করি বটে কিন্তু তাহার ভঙ্গী আমরা অনুকরণ করি না। জননী ভারতী আমাদের প্রাণে সেই সঞ্জীবনী রস সঞ্চার করুন। আমরা

যেন মাতৃভাষার পূজা জীবনের সাধনা করিতে পারি।

এবৎসর আমাদিগকে অনেকগুলি কঠোর শোকের আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে।

মনোমোহন বসু এবং গিরীশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রের দুইজন অগ্রণী কর্ম্মী চলিয়া গিয়াছেন। মনোমোহন বসু, ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যসেবকগণের সমসাময়িক। বঙ্কিমযুগেও সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছিলেন ইহা তাঁহার কম ক্ষমতার পরিচয় নহে।

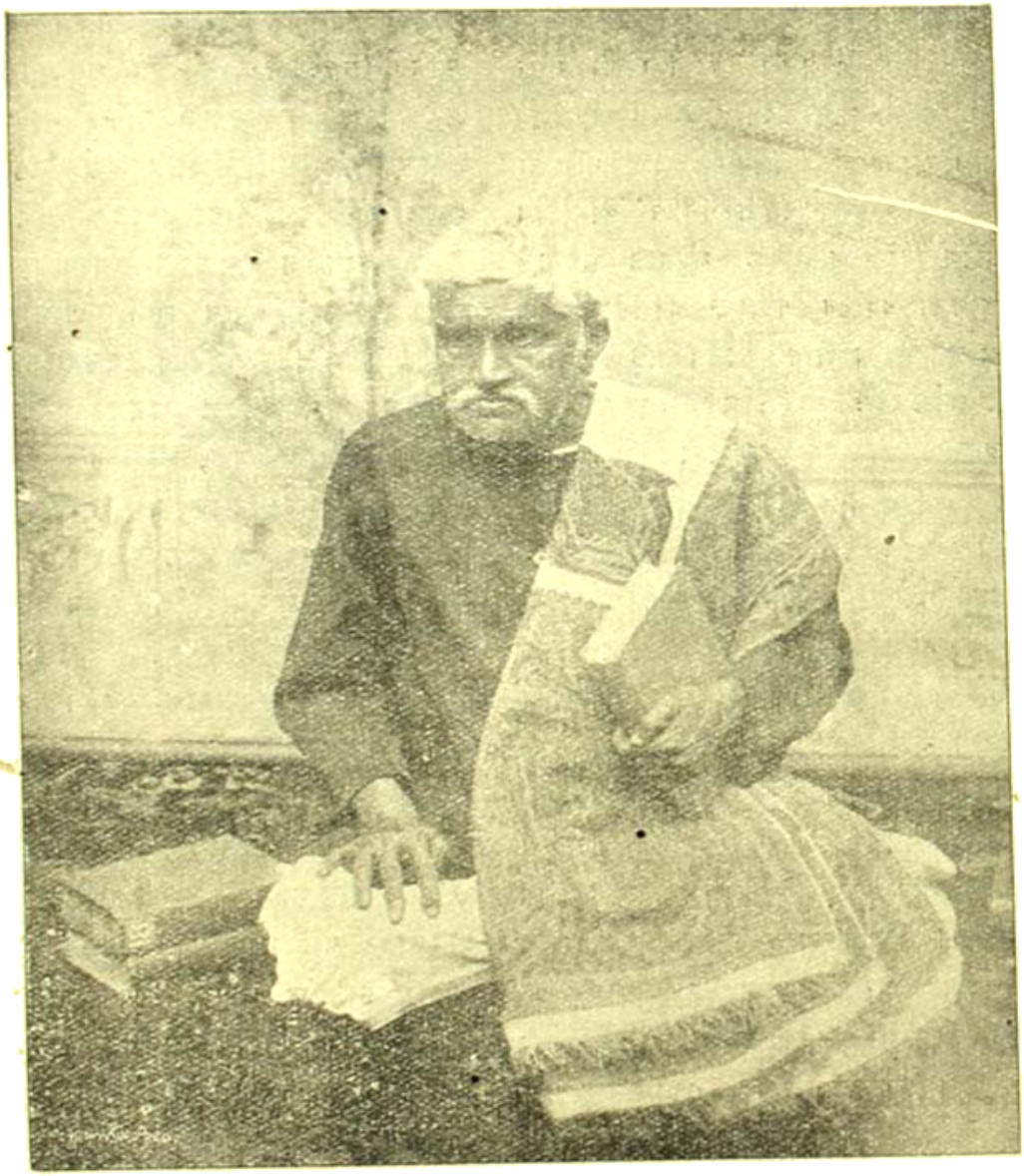

মনোমোহন অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। রঙ্গে রঙ্গালয়সমূহে এগুলি সমাদরে অভিনীত হয়। বিচিত্র চরিত্র চিত্রণে তাঁহার দীপ্ত স্বদেশানুরাগের উজ্জ্বল সাক্ষ্য।

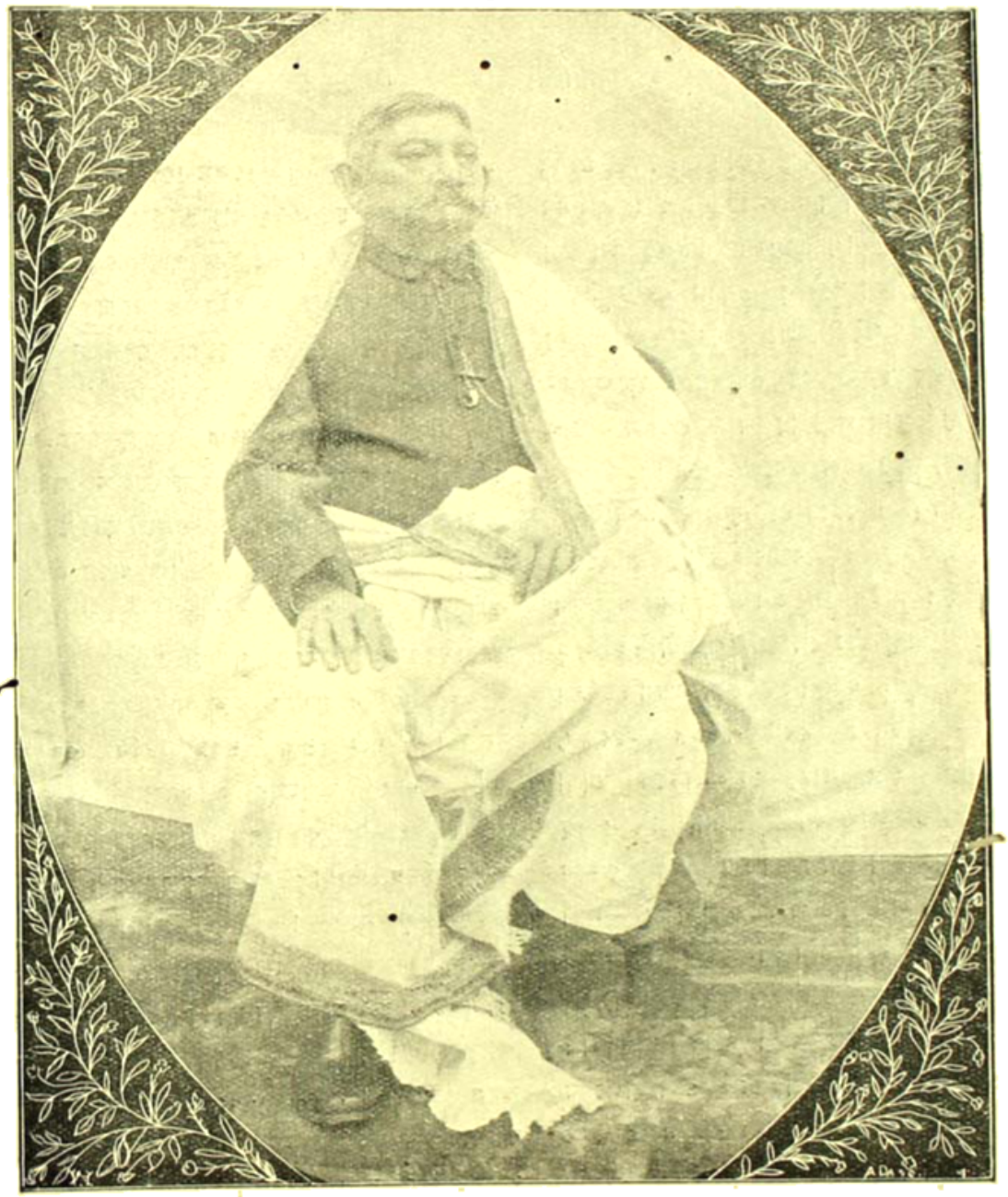

তিনি সুদীর্ঘ জীবনে অনেক শোকতাপ সহ্য করিয়াছিলেন—কিন্তু রোগশোকের যন্ত্রণা তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য, ধৈর্য এবং ধৈর্য্য নষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার মৃত্যুতে প্রাচীন সমাজের সৌজন্য এবং উদার অমায়িকতার একটি নিদর্শন বঙ্গের বক্ষ হইতে অন্তর্ধান হইল।

গিরীশচন্দ্র ঘোষ বঙ্গীয় রঙ্গালয়গুলির জন্য প্রায় শতাধিক নাটক এবং প্রহসন রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি! কোন একটি রচনা অন্যের অনুরূপ নহে—প্রত্যেকটির মৌলিকতা এবং অভিনবত্ব তাঁহার গৌরব এবং অনন্য-সাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। কেবল নাটক রচনা নহে, নাটক অভিনয়েও তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। এবিষয়ে নাট্যকুশলী ৺অর্দ্ধেন্দু-শেখর মুস্তফির পরেই অনেকে তাঁহার কৃতিত্বের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। গিরীশচন্দ্রের নাটকগুলি প্রধানতঃ পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। পৌরাণিক রচনায় যে শক্তির উন্মেষ, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকে তাহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। তিনি বহু চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু প্রায়ই কোন একটির ছায়া অন্যটিতে পড়িতে দেখা যায় না। গান রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বঙ্গীয় পাঠকসমাজে তাঁহার রচিত কবিতাসমূহ সামান্য সমাদর লাভ করে নাই। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গালয়ের দারুণ ক্ষতি হইল। আবার কতদিনে এ ক্ষতি পূরণ হইবে কে বলিতে পারে?

মহারাজ কুচবিহারের নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ-বাহাদুরের মৃত্যু কেবল মাত্র তাঁহার রাজ্যের ক্ষতি নয়, সমগ্রবঙ্গভূমির ক্ষতি; তিনি সৎকার্য্যের উৎসাহদাতা, এবং দীনের সহায় ছিলেন। সাহায্য প্রার্থনায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কেহ কখনো রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসে নাই। দেশের মঙ্গল কার্য্যে যোগদান করিয়া উন্নতি চেষ্টায় যত্ন এবং উৎসাহ দেখাইয়া নিয়তই স্বীয় সহানুভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার স্বভাব উদার মনুষ্যত্ব এবং রাজযোগ্য গুণসকলের আকর ছিল। তাঁহার স্থান পূর্ণ হওয়া কঠিন।

ময়ূরভঞ্জ মহারাজ শ্রীশ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব বাহাদুরের আকস্মিক মৃত্যু যে দেশবাসীগণের আত্মীয়স্বজন, এবং বন্ধুবান্ধবের পক্ষে কি দারুণ বজ্রাঘাত তাহা বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না। তাঁহার ন্যায় উদার, সংযতস্বভাব, প্রজাবৎসল নিষ্কলঙ্কচরিত্র কদাচ কচিৎ দেখা যায়। তাঁহার কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে ত্রেতার সত্যসন্ধ নির্ম্মলচরিত্র শ্রীরামচন্দ্রকেই মনে পড়ে।

অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও বনবাসী রামচন্দ্রের ন্যায় তিনি একান্ত-নিষ্ঠা এবং তপস্যায় জীবনযাপন করিয়াছেন। প্রজার কল্যাণ এবং রাজ্যের উন্নতি সাধন ভিন্ন তাঁহার আর অন্য চেষ্টা, অন্য চিন্তা ছিল না। কিছুদিন পূর্ব্বে জাপান, ইংলণ্ড, আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া সভ্যদেশে প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শ দেখিয়া আসিয়া, নিজের রাজ্যে তাহা প্রবর্ত্তন করে অনেক নূতন এবং উদার অনুষ্ঠানের সূচনা করিয়াছিলেন। প্রভূত অর্থব্যয়ে ময়ূরভঞ্জেও রেলপথের স্থাপনা করিয়াছেন—খনিজ এবং বনজাত দ্রব্যসমূহের নূতন ব্যবসা

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র

মধুবন্ত মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী

বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। মহারাজার তরুণ বয়সে পঠদ্দশায় একবার ৺কেশবচন্দ্র সেনের তৃতীয়া কন্যা সুচারুদেবীর সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয় কিন্তু রাজপরিবারের অমত এবং তৎকালীন গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন না করায় তাহা তখন ভাঙ্গিয়া যায়, মহারাজা বাধ্য হইয়া ধামড়ামোড়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু সুচারুদেবী সংযতচিত্তে চতুর্দ্দশ বৎসর একান্ত নিষ্ঠার সহিত তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া কুমারী ছিলেন। অদৃষ্টবিধানে দুই পুত্র এবং এক কন্যার জন্ম হইবার পর মধ্যমতম মহারাণীর মৃত্যু হয় এবং তাহার কিছুকাল পরে মহারাজা আবার পূর্ব্ববাঞ্ছিত সুচারুদেবীকেই বিবাহ করেন। জীবনের এই একান্ত আকাঙ্ক্ষিত মিলনে উভয়েই সম্পূর্ণ সুখী হইয়াছিলেন—এবং চরিত্রগুণে সুচারুদেবী সর্ব্বতোভাবে মহারাজার যোগ্যপত্নী হইয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্যলালসা কোনদিন তাঁহাকে বিচলিত করে নাই বিলাস প্রমোদ কখনো তাঁহাকে আকৃষ্ট করে নাই। এই দুই আদর্শচরিত্র পুরুষরমণীর মিলন যে মণিকাঞ্চন সংযোগ হইয়াছিল তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন! হায় সুখ ক্ষণভঙ্গুর, নিয়তি রহস্যময়! মাঘমাসের শেষে মহারাজা স্বীয়রাজ্যে ভল্লুক শীকার করিতে গিয়া, সঙ্গীদিগের মধ্যে একজনের গুলিতে আঘাত প্রাপ্ত হন। প্রথমে এ আঘাত গুরুতর বলিয়া মনে হয় নাই। কলিকাতায় আসিয়া X আলোক দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, গুলির ভগ্ন অংশসকল শরীরের নানা স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। অস্ত্র ব্যবহার দ্বারা চিকিৎসকগণ অনেক বাহির করিয়াছিলেন কিন্তু দক্ষিণ করপ্রকোষ্ঠের উপরিভাগে যাহা নিবদ্ধ ছিল তাহা বাহির করা অত্যন্ত কঠিন এবং যন্ত্রণাদায়ক হওয়ায়, তাহা বাহির করা হয় নাই। ফলে রক্ত দূষিত হইয়া গত ২২শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে মহারাজার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। সবে চল্লিশ বৎসর বয়সে, পুরুষের পূর্ণ যৌবন-কালে মহারাজার মৃত্যু হইল। তাঁহার আরব্ধ কত সদনুষ্ঠান অসমাপ্ত পড়িয়া রহিল কত মহৎ কার্য্যের কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইল না। তবে নিষ্কলঙ্ক জীবনের যে অক্ষুণ্ণ গৌরব যে নির্ম্মল শুভ্র যশোদীপ্তি তিনি রাখিয়া গেলেন তাহা দেবতা-দুর্লভ। দেশের এমন সন্তান, রাজ্যের এমন রাজা, পুত্রের এমন পিতা, পত্নীর এমন স্বামীরত্ন হারান যে কি দারুণ শোক তাহা হৃদয় যাহার আছে তিনিই অনুভব করিতে পারিবেন—আর সান্ত্বনা সঞ্চয় করা যদি কখনো সম্ভব হয় তবে যিনি ছাড়িয়া গিয়াছেন তাঁহারই কীর্ত্তি তাঁরই গুণাবলী স্মরণ করিয়া সান্ত্বনালাভ করিতে হইবে। অক্ষম এবং হীনের জন্য শোক চিরদিনই ব্যর্থ তাহা কেবলি অনুশোচনা, কিন্তু মহতের জন্য শোক নিষ্ফল হয় না, বিচ্ছেদের অন্ধকার তাঁহার মহত্ত্বের স্মৃতিগৌরবে উজ্জ্বল হইয়া হৃদয়ে পরমা শান্তির প্রতিষ্ঠা করে।

যে রহস্যময় মহাপুরুষ এই অভাবনীয় শোক বিধান করিয়াছেন তিনিই অপার করুণাবলে সান্ত্বনা সৃজন করুন এই প্রার্থনা।

সমালোচনা।

ON FOOD & COOKING.—By L. M. Mallik, D.L.M.A.M.D. Published by the Indian Medical Record Office, Calcutta. Price Re 1-8. গ্রন্থখানি কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে পরিপূর্ণ। প্রবন্ধগুলিতে গ্রন্থকার বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালীর আহারবিধি ও আহার্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন চিকিৎসক। বর্ত্তমান কালে খাদ্যাদি বিকৃতিতে হইয়া পড়িতেছে—খাদ্যাদিতে নানারূপ ভেজাল মিশিতেছে এবং সেই খাদ্য গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর বিশেষতঃ ছাত্রগণের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে। অজীর্ণ কলেরা প্রভৃতি রোগ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে নীতিমত শিকড় গাড়িয়া বসিতেছে। তিনি আরও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, প্রধানতঃ কলিকাতাবাসী বা কলিকাতা প্রবাসী মফস্বলস্থ ছাত্রগণের মধ্যেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক। নিপুণ গ্রন্থকার এই সকল রোগের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহারও ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে যক্ষ্মারোগ কলিকাতায় অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডে কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত ঘটিতেছে—সেখানে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে। গ্রন্থকারের মতে, অপচুর ও মন্দ খাদ্যই ইহার প্রধান কারণ। তাহার সহিত ছাত্রগণের পরীক্ষার জন্য দারুণ দুর্ভাবনা ও গুরু পরিশ্রম, ব্যায়ামের অভাব—এগুলিও বিশেষ ক্ষতি করিতেছে। গ্রন্থকার আহার সম্বন্ধে কয়েকটি Golden Rules বাঁধিয়া দিয়াছেন—সেগুলি বহু দেশজ্ঞের অনুমোদিত। গ্রন্থকারের মতে বর্ত্তমান [illegible] মাংস ভোজনের একান্ত প্রয়োজন আছে। দুগ্ধ [illegible] বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ বলকারক নহে—তবে [illegible] উৎপন্ন ছানা, মাখন প্রভৃতি স্বাস্থ্যের পক্ষে [illegible]। লবণ, ছানার পায়স, পান্তুয়া, [illegible] উৎকৃষ্ট খাদ্য। ঘি ও দোল সকল [illegible] রোগের বীজাণু নাশ করে। ডাল বিশেষ বলকারক। গ্রন্থকারের মতে খাদ্যের এই কয়টি গুণ থাকা প্রয়োজন,—তাহা সহজে হজম হইবে এবং বলকারক, সুবাদু, সুলভ ও সহজপ্রাপ্য হইবে। তৎপরে তিনি কয়েকটি খাদ্যের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করিয়া উৎকৃষ্ট খাদ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তাহার সন্ধান পাঠক মূল গ্রন্থে গ্রহণ করুন। গ্রন্থখানি সুলোপযোগী হইয়াছে। ইংরাজীতে রচিত হইলেও ভাষাটুকু বেশ সহজ—এবং কোথাও দুর্ব্বোধ্য যুক্তির অবতারণা করা হয় নাই। দরিদ্র দেশে সকলের নিকট এগ্রন্থ সহজপ্রাপ্য হইবার পক্ষে একটি ক্ষুদ্র অন্তরায় আছে—গ্রন্থের মূল্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের ধারণা। মূল্য কিছু কমাইয়া এক টাকা করিলে, বোধ হয়, সাধারণে এ গ্রন্থপাঠের সুযোগ পান। ছাপা কাগজ বাঁধাই মনোরম হইয়াছে।

সমবায় বিভাগ। কান্তিসাগরের রাজবাড়ী। সাময়িক কার্য্যবিবরণ। ১লা মাঘ ১৩১৮ সাল। কান্তিসাগর সত্যযন্ত্র যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য তিন আনা। সমবায়ের উদ্দেশ্য,—দশে মিলিয়া কার্য্য করা এবং তাহার ফল পরিশ্রম যোগ্যতা ও সহায়তা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যথাযোগ্যরূপে বণ্টন করিয়া লওয়া। ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য কিন্তু বর্ত্তমানকালে আয়ের অল্পতা হেতু অধিকাংশ স্থলেই যথাবিহিত ভাবে গৃহস্থ কিছু সঞ্চয় করিতে পারেন না, তাহার ফলে দারিদ্র্য, অশান্তি ও দুঃখ ক্রমেই [illegible] হইয়া উঠিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে সমবায়ের কয়েকজন গৃহস্থ মিলিয়া পল্লীতে পল্লীতে বা গ্রামে গ্রামে এক একটি Co-operative Store বা 'সমবায় পণ্যাগার' খুলিলে আয় বৃদ্ধি ও সঞ্চয়ের উপায় হইতে পারে। এই ক্ষুদ্র কার্য্যবিবরণীটিতে এইরূপ পণ্যাগারের উপযোগিতা ও উপকারিতা বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে সমবায় ব্যাঙ্কও পল্লীগ্রামে বিনা মূলধনে স্থাপন করা যাইতে পারে এবং অবসরের দশ আনা অনুবিধার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন, অথচ উত্তমর্ণগণেরও বিশেষ অসুবিধা হয় না। আমরা

এই সমিতিটির উন্নতি কামনা করি। ইহার উদ্দেশ্য মহৎ, পরিচালনাও কার্য্যবিবরণ-পাঠে সুশৃঙ্খল বলিয়া মনে হয়।

Speeches of His Majesty George the Fifth, delivered in India and the Official Despatches. On the Removal of the Imperial city to Delhi and the Modification of the Partition of Bengal, an Introduction by Mr. Surendranath Banerjea, Calcutta. Price Four Annas. এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের ভারতবর্ষের পূর্ব বক্তৃতার সংগ্রহ। সম্রাটের এই অমৃতবাণীগুলি এতদ্দেশবাসীর হৃদয়ন্তরে রাজ-ভক্তিতে উজ্জীবিত রাখিবে, সন্দেহ নাই।

শৈলজা। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল প্রামাণিক প্রণীত ও প্রকাশিত। মুক্তকীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। এখানি পঞ্চাঙ্ক সামাজিক নাটক। উপাখ্যানটি চলনসই, তবে লেখকের কাঁচা হাতে নাটকের ঠিক পরিস্ফুট হয় নাই। প্রসিদ্ধ নাট্যকার ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের সামাজিক নাটকগুলির কয়েকটি চরিত্রের ছায়া অনেকগুলি বিকাশোন্মুখ চরিত্রে স্পষ্ট হইয়া উঠিলেও, সরযূ, সরস্বতী, সুধা, সন্ধ্যা, কোকিল, শিবদাস, পদ্মলোচন জীবন্ত ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। নাটকখানির ভাষা মন্দ নহে।

উৎসবে উপহার। শ্রীমতী সুখপ্রভা গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রিন্টার হোসখানা।

পূজার নির্ম্মাল্য। শ্রীযুক্ত গৌরীজনাথ ভট্টাচার্য্য রচিত। কার্ত্তিক প্রেসে মুদ্রিত। শ্রীমতী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

উপর্য্যুক্ত দুইখানি গ্রন্থ ভক্তির উচ্ছ্বাসমূলক কবিতাগ্রন্থ।

বর্ষশেষ।

গেল বর্ষ গেল পুরাতন,
হিমবায়ু তিরোধান, স্বপ্ন সম অবসান
বসন্তের সুখের স্বপন,
হাতাশে দক্ষিণ শ্বাস ঝরিল অশোক দল
হোরি খেলা হল সমাপন।
ছুটাছে আমের গুটি মুকুল পড়িল টুটি
মধু তায় সার্থক জীবন।

অস্তে গেল বর্ষ পুরাতন,
চৈতালি শস্যের ভার ক্ষীণ প্রাণ সুকুমার
গোধূলির কিরণ যেমন,
ধরার বুকের পরে আজিকে লুটায়ে প'ড়ে
বিছাইল বিশ্রাম শয়ন,
শূন্য মাঠ শস্যহীন সুদূর দিগন্তে লীন,
স্বভাব শেষে নিস্তব্ধ মগন!

যাবে বর্ষ আসিবে নূতন,
দীক্ষার আদেশ দিয়ে চলিল বিদায় নিয়ে
চৈত্র শেষ সন্ধ্যার তপন,
শ্মশানে বাজে ঢাক বলে আজ পড়ে পাক্
ক্ষণিকের তুচ্ছ আয়োজন,
সর্ব্বত্যাগী মহেশ্বর বিষাণে পূরিয়া স্বর
ডাক আজি বেন ঘন ঘন!

বসুন্ধরা করি যোগাসন,
বসিতে হইবে ধ্যানে রুদ্ধ করি ত্রিনয়নে
উন্মীলিয়া ললাট নয়ন,
অলোক আলোক বলে কমল ফুটিবে ফলে
অমৃত সিঞ্চন,
দূরতর দিগন্তরে দেখা দিবে নব মেঘে নবীন জীবন

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কাস্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩৩, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।